আহমদ শরীফ রচনাবলী

৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী
৩

আহমদ কবির সম্পাদিত

AMARBOI.COM

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ৮০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanaboli 3 : Collected works of Ahmed Sharif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
First Published : February 2010

Price : Tk 800.00 only

ISBN 978 984 04 1274 7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আহমদ শরীফ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৬ সালের মার্চ মাসে। নানা কারণে গত দুই বছরে রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডগুলো বের হয়নি। এখন তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশের প্রয়াস নেওয়া হল। এ খণ্ডটিও আহমদ শরীফের জন্মদিন-মৃত্যুদিনের (১৩ই ফেব্রুয়ারি–২৪শে ফেব্রুয়ারি) মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশরূপ পেল।

গ্রন্থগুলোর প্রকাশকাল অনুযায়ী আহমদ শরীফ রচনাবলী বিন্যাস হবে এটি বলা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সামান্য ওলট পালট হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সংকলন। এগুলো হল, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* প্রথম খণ্ড (১৯৭৮), *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* (১৯৮৫), এবং *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* আহমদ শরীফের সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও সুখ্যাত রচনা। মধ্যযুগে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাহিত্যসৃষ্টির সকল ধারার একটি অনুপুঙ্খ দলিল এটি; তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর, গভীর বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ অনাচ্ছন্ন ও সমীক্ষী বিবেচনাজাত। প্রথম খণ্ডে চৈতন্যের ভাববিপ্লবপূর্ব সাহিত্য-ইতিহাস বর্ণিত। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যাবদানেরও পূর্ণ চিত্র এই বইতে লব্ধ। নিঃসন্দেহে, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি রচনা। অন্যদিকে, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থটি ডক্টর আহমদ শরীফের সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস, প্রথমে এর নাম ছিল 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র'। তবে বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট রচনা, কেননা এতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় দিক ছোট পরিসরে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছে। ডক্টর শরীফ প্রশংসিত এই জন্য যে সব তথ্য বিবরণকে দারুণ সংযম ও সংক্ষিপ্তিতে আবদ্ধ করার নৈপুণ্য তিনি দেখিয়েছেন। *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*ও ডক্টর আহমদ শরীফের একটি উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম। *কালের দর্পণে স্বদেশ* সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ না হলেও এর ভাবপ্রত্যয় গ্রন্থভুক্ত অন্য দুটি রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আহমদ শরীফ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে ডক্টর শরীফের দ্বিতীয় পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিমের (ফৈজী) বিশেষ আগ্রহ, তৎপরতা ও প্রযত্নের কথা বলতেই হয়। তৃতীয় পুত্র যাহেদ করিমের (স্বপন) সহযোগিতাও উল্লেখ্য। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনির আনুকূল্যে আহমদ শরীফ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এজন্য ওসমান গনিকে ধন্যবাদ জানাই। রচনাবলীতে আহমদ শরীফের বানান অক্ষুণ্ন থাকে নি।

আহমদ কবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সূচিপত্র

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা ৩ দেশ-কাল ৩ বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৬ বাঙলা ভাষা : গোত্রপরিচয় ১০ বাঙালী-সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ১৫ বিদেশ-বিভাষার সাহিত্য-ঋণ ১৭ বাঙলা সাহিত্যের আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীরূপ ১৯ বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা ২৪ মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ ৫২ ক. বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চা ও সংস্কৃত রচনা ৬৬ খ. প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ রচনা ৭৭ সেক শুভোদয়া ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাঙালীর মৌল ধর্ম ৯১ বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে ৯৮ ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী ১০২ বাঙলায় ইসলামের প্রসার ১১৭ সাহিত্যের রূপে ও রসে বিবর্তনের ধারা ১২৪ বাঙলা সাহিত্যের তথাকথিত আঁধার যুগ ১২৮ বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ১৪০ বাঙলা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ ১৪৫ বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক উদ্ভবকাল ১৫০ বাঙলা ভাষার ও রচনার লিখিত নিদর্শন ১৫৪ বাঙলা ভাষার বিবর্তন ধারার নমুনা ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায় : চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা ১৬৫ চৌরাশীসিদ্ধা তত্ত্ব ১৭৮ সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা ১৮৩ চর্যাগীতির দেশ-কাল ভাষা ১৮৪ চর্যাগীতিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র ১৯৬ চর্যাগীতির সাহিত্যমূল্য ২০২ চর্যাগীতিকার পরিচিতি ২০৫

চতুর্থ অধ্যায় : আদি কবি ও কাব্য [পনরো শতক অবধি] ২১৬ রাজকীয় প্রতিপোষণ তত্ত্ব ২১৬ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস সমস্যা ২২১ ক. বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চা ২৪৩ খ. বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস ২৪৭ শাহ মুহম্মদ সগীর ২৫১ অনুবাদ-সাহিত্য ২৬৯ জাতীয় মহাকাব্য ২৭২ কৃত্তিবাস ২৭৬ মালাধর বসু ২৮৭ ব্রতকথা, মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালী ২৯৩ কানাহরি দত্ত ৩০৪ বিজয় গুপ্ত ৩০৬ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ৩১২ জয়েনউদ্দীন ৩১৫ বিদ্যাপতি ৩৩১ কবিচন্দ্র মিশ্র ৩৪৫ রামাই পণ্ডিত ৩৫১

পঞ্চম অধ্যায় : মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপ : ক. ধর্মঠাকুরতত্ত্ব ও সাহিত্য ৩৫৩ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য ৩৫৯ ধর্মপূজা : ধর্মঠাকুর পরিচিতি ৩৬২ শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান ও রামাই পণ্ডিত ৩৬৬ বড় জালালী ও ছোট জালালী; নিরঞ্জনের রুষ্মা ৩৬৮ শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব ৩৭১ ধর্মমঙ্গল উপাখ্যান ৩৭২ ধর্মমঙ্গলের কবি পরিচিতি ৩৭৬

খ. নাথপন্থ ও নাথ সাহিত্য ৩৯৪ নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ ৩৯৪ নাথ সাহিত্য ৩৯৭ মহাজ্ঞান ও উপাখ্যানসমূহ ৪০০ মানিকচাঁদ-ময়নামতী আখ্যান ৪০১ ময়নামতী-গোপীচাঁদ উপাখ্যান ৪০২ মীন-চেতন বা গোরক্ষবিজয় উপাখ্যান ৪০২ নাথ সাহিত্যের রচয়িতা পরিচিতি ৪০৩ নাথ সাহিত্যে প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতির নিদর্শন ৪১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. সহজিয়া-বাউল মত ও সাহিত্য ৪১৩ মৈথুন তত্ত্ব ৪১৩ তান্ত্রিক শৈব-শাক্তধর্ম ৪১৫ বৌদ্ধতন্ত্র ৪১৬ মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত উপমতসমূহ ৪১৭ নাথধর্ম ৪২০ বৈষ্ণব সহজিয়া ৪২১ বাউল ৪২২ বাউল নামের উৎপত্তি ৪২৪ বাউল সাধনা ৪২৬ বাউলমত ও বাঙালীচিত্তের উৎকর্ষ ৪২৭

ঘ. বাঙলার সূফী সাহিত্য ও কবি পরিচিতি ৪৩৪ সূফীমতের উদ্ভব ৪৩৪ সূফীর দেহতত্ত্ব, মোকাম মঞ্জিল, হাল ও দর্শনের দেশী অবয়ব ৪৩৮ কবি পরিচিতি ৪৩৯

মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য

আশ্চর্যচর্যাচয় বা চর্যাগীতি ৪৫৭ লিখিত বাঙলা সাহিত্য ৪৬৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ৪৭১ মহাভারত ৪৭৩ রামায়ণ ৪৭৫ ভাগবত ও কৃষ্ণবিষয়ক রচনা ৪৭৬ লৌকিক দেবতার পাঁচালী ৪৭৬ চণ্ডীমঙ্গল ৪৭৭ মনসামঙ্গল ৪৮০ পীর-পাঁচালী ৪৮১ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য ৪৮১ লোকসাহিত্য ৪৮৩ রাজকীয় প্রতিপোষণ ৪৮৫ মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্য ৪৮৭ উপাখ্যান ৪৮৭ তত্ত্বসাহিত্য ৪৮৯ জীবনী সাহিত্য ৪৯২ জঙ্গনামা ৪৯৩ বিবিধ রচনা ৪৯৩ দোভাষীরীতি ৪৯৩ বাঙালীর জীবন ও মননধারা ৪৯৫

কালের দর্পণে স্বদেশ

ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালী ৫০৭ ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাঙলাদেশ ৫১৩ উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ ৫১৭ বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ৫২৯ বে-আদবি ৫৪০ জাতি দ্বেষণা ও সহাবস্থান ৫৪৫ মানুষ ও তার পরিবেশ ৫৫২ আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ ৫৬৩ স্রষ্টা ও শাস্ত্র ৫৬৮ বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের রেশ ও লেশ ৫৭০ সাহিত্য ও জনতা ৫৭৩ জনতা ও মানবতা ৫৭৫ সংকটের উৎস ৫৭৮
একালে শিল্পীর দায়িত্ব ৫৮২
গ্রন্থ পরিচিত ৫৮৫
বাঙালা ও বাঙালি সাহিত্য ৫৮৫
মধ্যযুগের সাহিত্য ৫৮৭
কালের দর্পণে স্বদেশ ৫৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

AMARBOI.COM

আহমদ শরীফ রচনাবলী-১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর
অপূর্ণ বাঞ্ছার অক্ষম রূপায়ণ মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করছি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য
[প্রাচীন ও মধ্যযুগ]

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

সাহিত্য জীবনবিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। জীবন আবার জীবিকাভিত্তিক। তাই মানুষের সর্বপ্রকার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ জীবিকাসম্পৃক্ত ও জীবনপ্রসূত। কাজেই জীবনের জন্যেই জীবন থেকে সাহিত্য উৎসারিত। অতএব জীবন নিয়েই সাহিত্য। জীবন নিরবলম্ব নয়। দেশ-কাল প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠে জীবন। সেই জীবনের শিকড় থাকে অতীতে এবং আলো-হাওয়া থাকে সমকালে। এ তাৎপর্যে সাহিত্য প্রতিবেশউদ্ভূত জীবনকথা। তাই সাহিত্য মাত্রই শাস্ত্র-সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার এবং দেশ-কাল-প্রতিবেশ প্রভাবিত। এই জন্যে কোন ব্যক্তির বা গোত্রের বা জাতির সাহিত্য বিচারে তার দৈশিক, কালিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। নইলে কাণ্ডজ্ঞান প্রসূত খণ্ডদৃষ্টির বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকে না কোন সিদ্ধান্ত। তাই আমরা সর্বাগ্রে দেশ, জাতি ও কালের সন্ধান নেব।

AMARBOI.COM

১

দেশ-কাল

আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এই দেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এইসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনো মানুষ গোষ্ঠী-জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বসতি ছিল বিরল।

কেননা সেকালে রোগের প্রতিষেধক অজ্ঞাত ছিল বলে নানা ব্যাধিতে মহামারীতে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লোকক্ষয় হত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ফলে গোষ্ঠীর মিলনে গোত্রীয় সমাজগঠন বিলম্বিত হয়েছিল। মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়া, পুণ্ড্রা, বঙ্গা, রাঢ়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। তাই আমরা ঐতরেয় আরণ্যক [আনু খ্রী. পূ. পাঁচ শতক] গ্রন্থে বঙ্গা. [বঙ্গাবগধশ্বর পাদা.][১] এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলিরভাষ্যে গৌড়া, রাঢ়া, পুণ্ড্রা, প্রভৃতি গোত্রীয়

---

১. বঙ্গ শব্দের এক অর্থ কার্পাস তুলা, [হিন্দি-বাঁগা-তুলা]
[ডক্টর সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা পৃ. ৮]
খ. বঙ্গা বগদ [বাগদী?] = মগধ, চের-ওরাওঁ প্রভৃতি অস্ট্রিক গোত্রীয় একটি। ছোট নাগপুরে নিবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের উল্লেখ পাই। উত্তর ভারতের কোশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে [আনু খ্রী. প্রথম শতক] 'বঙ্গপাল' নামের রাজার উল্লেখ রয়েছে। মানসোল্লাসে 'গৌড় বঙ্গাল' নাম মেলে। হাজার বছরের পুরোনো চর্যাগীতিতে বঙ্গালী, বঙ্গাল [দঙ্গাল?] দেশ-এর উল্লেখ রয়েছে। তার আগেই যে গোত্রজ্ঞাপক গ্রাম [গাঁই] যে অর্থান্তর লাভ করে নিবাসস্থল রূপে নির্দেশিত হচ্ছিল, তাও নানা সূত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতেই বোঝা যায় খ্রীস্টপূর্ব প্রায় হাজার বছর আগেই ওদের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর জীবন পরিহার করে কৃষিনির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে। প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর মধ্যেই এ তথ্য মেলে।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদির প্রমাণে মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই উত্তর ভারতীয় আর্যসমাজ এ অঞ্চল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং দাক্ষিণাত্যের মতো এ অঞ্চলকেও অবজ্ঞা ও কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত তারা। শতপথব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের মানুষকে বায়াংসি ভাষী অসুর [বিকৃত আর্যভাষী, 'সুর' দেব বিরোধী দল] এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের দস্যু বলে আখ্যাত করা হয়েছে।[১]

পাণিনি [খ্রী. ৭ম/৫ম শতক] তাঁর ভাষাবিজ্ঞানগ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতে যে 'গৌড়'-এর উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয়। ওই গৌড় গোত্র, জাতি বা গোত্রবাচক উত্তর বা মধ্য ভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভাবনা। পরবর্তীকালের 'পঞ্চগৌড়' নামই একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। রাজতরঙ্গিনীতে গৌড়, সারস্বতদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে 'পঞ্চগৌড়' বলা হয়েছে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়নও অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ-এর উল্লেখ করেছেন। বোধায়ন ধর্মসূত্রেও [১/২/১৪] পুণ্ড্রের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গও উল্লিখিত।[২] রামায়ণে 'বঙ্গা'-এর এবং মহাভারতে বঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির এবং তারও আগের বন্দর Portalis বা পরস্থলী [সম্ভবত নদীয়ার কাছে] উল্লেখ পাই

AMARBOI.COM

১. মহাভারতোক্ত অসুর বলি রাজার পাঁচ পুত্র : বঙ্গ, অঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং রুরকার্থ সম্ভবত এই যে-এ অঞ্চল সুরবিরোধী অসুর পূজক আর্যভাষী বা আর্যেতরভাষী লোকে অধ্যুষিত ছিল। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে সুহ্ম < সুহ্ম মানে বীর্যশালী দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। গৌড় > গুড় উৎপাদন স্থান বা উৎপাদক অথবা গোণ্ড গোত্র নির্দেশক; সাত শতক থেকে 'গোড়' নাম লেখ্যভাবে পাওয়া যায়। তেমনি রাঢ় সৌন্দর্য ও বৈভব অর্থে, পুণ্ড্র এর ইক্ষু উৎপাদক অর্থে; বরেন্দ্র-উৎকৃষ্ট, উর্বর ভূমি [সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা]।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বঙ্গ-এর আরো উল্লেখ রয়েছে। ক. শক্তি সঙ্গম অন্দ শিবপ্রোক্ত বঙ্গদেশ [পার্বতীকে শিব জানাচ্ছেন কথাপ্রসঙ্গে]। খ. মহাভারতে ভীষ্মপর্বে নবম অধ্যায়ে ৪৬ তম অঙ্গা বঙ্গা, কলিঙ্গাশ্বর ইত্যাদি। গ. ঐতরেয় আরণ্যকের মতো ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং শতপথব্রাহ্মণে মেলে বঙ্গের উল্লেখ। ঘ. রামায়ণেও বঙ্গ অজ্ঞাত দেশ নয়। ঙ. মনুসংহিতার দশ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র গোষ্ঠীর উল্লেখ মেলে। চ. কাত্যায়নকৃত সূত্রের মহাভাষ্যেও বঙ্গ উল্লিখিত রয়েছে। ছ. এগুলো ছাড়াও কশ্যপ আর্যভট্ট মিহির ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীহর্ষণ, পুলিতা প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছেও বঙ্গ অজ্ঞাত ছিল না। জ. ১৯৬২-৬৩ সনে অজয়নদের দক্ষিণে বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যেসব সামগ্রী মিলেছে সেগুলো প্রায় দেড় হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের। এটি তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা। [রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃ. ২০]

২. D.C Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 2nd edition, 1971, pp. 36-38, 'বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ডক্টর আবদুল করিম উক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান ঐতিহাসিক Plini-র লেখায়।[১] আচারাঙ্গ সূত্র [আয়ারাঙ্গ সুত্ত] নামের জৈনগ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে। বৌদ্ধ 'মহাবর্গে' [মহাবগ্‌গো] রাঢ়-এর 'মিলিন্দপঞ্‌হে' বঙ্গের আর 'দিব্যাবদানে' পুণ্ড্রের উল্লেখ মেলে। তাছাড়া ললিতবিস্তরে ও মহাবস্তুতে [মহাবস্তু] বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। গ্রীকসূত্রে প্রাপ্ত গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গাহৃদয় [গঙ্গারিডই] সম্ভবত গৌড়ে পুণ্ড্রেই বিস্তৃত ছিল। ১৯৬২-৬৩ সনে অজয়নদের দক্ষিণে নানা স্থান উৎখননের ফলে জানা যায় অনেক কিছু।

পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, হরিনন্দনপুরে বা হরিনারায়ণপুরে, চব্বিশপরগনার বেরাচম্পায়, দেগঙ্গায় কিংবদন্তীর চন্দ্রকেতুর গড় প্রভৃতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন-বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও অন্তত রাঢ় অঞ্চল তিন হাজার বছর আগেও আমাদের চিরকেলে ধারণামতো বুনো বর্বরের দেশ ছিল না, যদিও তাদের কোন স্বতন্ত্রভাষার নমুনা নেই। এ দেশে যে উন্নয়নশীল দু'চারটি গোত্র ছিল, তাদের যে বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল, তা জানা যায়। দু'তিনটে বৌদ্ধ জাতককাহিনীর উদ্ভবস্থল ও তথা কাহিনীর বর্ণিত ঘটনাও বর্ধমান অঞ্চলের। ক্রীটদ্বীপের সঙ্গে এদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলেও কোন কোন বিদ্বান অনুমান করেন। মহাভারতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম রাজারা ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষে। কালিদাসের রঘুবংশে নৌযুদ্ধে নিপুণ ও সাহসী বাঙালীদের রঘু পরাস্ত করেছিলেন বলে বর্ণিত রয়েছে। এতে মনে হয় বাঙালীদের গোত্র-রক্ত পরিচয় যাই হোক, রাজনীতিতেও তারা পিছিয়ে ছিল না। রক্ত সঙ্কর বাঙালীর স্বভাব-চরিত্র যেমন অনন্য, তাদের কৃতি-কীর্তিও বিচিত্র।

'পাণ্ডববর্জিত' দেশ বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষীর স্বীকৃতির স্বাক্ষর মেলে। প্রমাণে অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মহাবীর স্বয়ং এবং জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমণ ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড়ে-রাঢ়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তার আগে হয়তো পূর্বাঞ্চলীয় কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী নানা কাজে এসে ফিরে গিয়ে সমাজে নিন্দিত হয়েছে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজেই ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু ব্রাত্যদোষ এড়ানোর প্রয়াসে ব্রাহ্মণ্য সমাজে এ তথ্য অস্বীকৃত রয়েছে। আর্যভাষীর গৌরবগর্বী বহিরাগত এবং আর্যাবর্তে ও ব্রহ্মাবর্তে নির্বাসিত লোকেরা বহুকাল স্থানীয় অনার্য-ভাষীদের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলবার প্রয়াসী ছিল— তা আদিশূর সম্পৃক্ত কিংবদন্তী ও বল্লালী কৌলীন্য চেতনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।[২] অতএব জৈব-বৌদ্ধ শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষুর মাধ্যমেই উত্তর ভারতের শাস্ত্র-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-শাসন, অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি জীবনপদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এ দেশীয়দের পরিচয় ঘটে। এভাবে এদের জীবন-জীবিকার আর্যায়ন সম্ভব হয়। মৌর্য আমলে আর্যায়ন হয়তো গৌড়ে, রাঢ়ে, পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্তযুগে তা কলিঙ্গে সুহ্মে বঙ্গে সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে তথা আধুনিক উড়িষ্যায় বাঙলায় আসাম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল— যদিও শিশুনাগ, মৌর্য, কণ্ব, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল বা সেন— কোন শাসনই সমগ্র বঙ্গে চালু ছিল না। এঁদের মধ্যে কোন কোন রাজবংশের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও ওদন্তপুরীভুক্তি। মধ্যযুগপূর্ব বঙ্গের স্থিতি ঠিক এখনকার কোন অঞ্চলে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না। তবে মহাভারতবর্ণিত ভীমের লোহিত্য নদই ছিল

১. সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৮-১৯।

২. 'আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন রাজা/বিষ: সেনের ক্ষেত্রপুত্র বল্লাল সেন রাজা। সম্বন্ধ নির্ণয়, পৃ: ২০৮, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙলার ইতিহাসের ধারা গ্রন্থের উদ্ধৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজয়সীমা। বঙ্গ লোহিত্যের তীর সীমায় অবস্থিত থাকার কথা। কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায় রঘু সুহ্ম জয় করেই বঙ্গ জয় করেন। গঙ্গার বঙ্গীয় নাম ভাগীরথী ও পদ্মা। অতএব ভাগীরথী তীরে সুহ্ম এবং পদ্মা তীরে বঙ্গ অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা চলে। বখতিয়ার খালজি জয় করেন লাখনৌতি গৌড় এবং বঙ্গও কামরূপ তখনো ছিল অবিজিত। গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খালজি ও পরবর্তী শাসকগণ বঙ্গ-কামরূপ জয়ে প্রয়াসী ছিলেন। এতে বোঝা যায় বঙ্গ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কামরূপের ও সমতটের মতো।

চর্যাপদে বঙ্গাল, বঙ্গালী নাম মিললেও, 'বঙ্গ'-এর পরিবর্তে 'বঙ্গালা' ব্যবহৃত হয় ইবন বত্তুতার বৃত্তান্তে। মিনহাজ সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন 'বঙ্গালা' 'বঙ্গ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন, দেখতে পাই। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বয়ং 'শাহ্-ই-বঙ্গালা' নাম গ্রহণ করেই ১৩৩৮ সনে গৌড় সিংহাসনে বসেন।[১] তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মুঘল আমলে এক বিস্তৃত পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলীয় ভূখণ্ড সুবাহ-ই-বাঙ্গালা বা ব্রিটিশের 'বেঙ্গল Presidency'। তবু উনিশ শতক অবধি 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে দু'ভাবে নির্দেশিত হত এ বৃহৎ অঞ্চলটা। তুর্কী পূর্বকালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বগুড়া থেকে মিথিলা অবধি বরেন্দ্র, বঙ্গ ও কামরূপ [আসাম] নামে পরিচিত হত বিভিন্ন অঞ্চল এবং স্বাধীন শাসক বা সামন্তের রাজ্য অনুসারে এসব এলাকার পরিসরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত। আশ্চর্য চিরকালের অবজ্ঞেয় বঙ্গ-বঙ্গাল-বাঙ্গলা শেষ অবধি গোটা অঞ্চলের মাটির ও মানুষের নামের ও পরিচয়ের ভিত্তি ও অবলম্বন হল। এটি পর্তুগীজ বেঙ্গলা ও ইংরেজি বেঙ্গল-এরই জনপ্রিয়তার এবং বহুল প্রচারের ফল। রামমোহন রায়ের বা মধুসূদন দত্তের 'গৌড়' এভাবে হল বিলুপ্ত। মোটামুটিভাবে 'গৌড়'-রাজশাহী, মালদহ, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ; রাঢ়-বর্ধমান বিভাগ, সুহ্ম-প্রেসিডেন্সি বিভাগ; পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, মিথিলা। বঙ্গ-ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা; সমতট-কুমিল্লা, নোয়াখালি; হরিখেল [<অরিক্রীড়া [ক্ষেত্র]-চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। বঙ্গাল-সোমদ্বীপ>চন্দ্রদ্বীপ, সন্দ্বীপ [বাকলা শহর-বরিশাল] আর তাম্রলিপ্তি তমলুক ছিল বলে মনে করা চলে। সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশী-বিজাতি-বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই। কাজেই তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্য রকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসূত।

২

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়া এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবু বলা চলে এদেশে রক্তসাঙ্কর্য একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছে।[২] তাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও হয়তো নির্ভুল তথ্য মেলা ভার। আনুমানিক তেরো শতকে সংকলিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে বাঙালীকে বর্ণভেদে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভাজন

---

১. Sir Jadunnath Sarkar, Commemoration Volume, Hoshiapur, India, Part II P. 56. 'বঙ্গ বাঙ্গলা : বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ডক্টর করিম উদ্ধৃত, পৃ. ১৪।

২. ময়নামতীতে প্রাপ্ত লড়হচন্দ্রের তাম্রলিপিতে সমতট পোণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গাল-এর পাশে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃতাত্ত্বিক নয়–বৃত্তিসংপৃক্ত সমাজভিত্তিক।[১] এছাড়া আধুনিককালে রিজলি, রমাপ্রসাদ চন্দ, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ অনেকেই বাঙালীর আঙ্গিক বিচার করেছেন ও করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট কিংবা চোখ-চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের সাঙ্কর্য কারুর কোনো লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি। তাই সমস্যা রয়েই গেছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো, আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড) ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মোঙ্গলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সঙ্কর আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজ্জার, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প সঙ্কর মোঙ্গলীয়।[২] তাছাড়া ২৪ পরগনার বেরাচম্পার ও হরিনন্দনপুর বা হরিনারায়ণপুর কাল প্রবাহে কত কত গৌড়, মালব, চৌড়, শক, হূন, কুলিক, কর্ণাট, লাট,

---

১. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা অরিক্রীড়া [ক্ষেত্র] ১ হরিখেল, চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙের গ্রন্থে উল্লিখিত প্রান্ত ভূমি হরিখেল।

২. বঙ্গ ও বাঙলা

তুর্কীবিজয়কালেও 'বঙ্গ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বলেন : বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের আতঙ্ক বিহারে লক্ষ্মনৌতিতে, বঙ্গে ও কামরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময়ে লক্ষণ সেনের ব্রাহ্মণ ও বেণে প্রজারা পালিয়ে বঙ্গে-কামরূপে আশ্রিত হয়েছিল। পরে লক্ষ্মণ সেনও তাঁর রাজ্যভুক্ত সত্তানশাসিত বঙ্গে আশ্রয় নেন। নানা প্রসঙ্গে মিনহাজ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বারবার 'বঙ্গ' রাজ্যের নাম উচ্চারণ করেছেন। কামরূপ যেমন কামরূপের তেমনি 'সকোনত'-ও নাকি সমতটের বিকৃতিমাত্র। মেঘনার পূর্ববর্তীরবর্তী অঞ্চলই সম্ভবত সমতট।

রণবঙ্কমল হরিকেল দেবের ১২২০ খ্রীস্টাব্দের তাম্রশাসন এবং দামোদর দেবের ১২৩০ খ্রীস্টাব্দের তাম্রশাসন সূত্রে মনে হয় সমতট কুমিল্লাদি অঞ্চলই ছিল, কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যোক্ত গঙ্গার স্রোতের পূর্বাংশ বঙ্গ বলেই অনুমান করা হয়, যদিও কালিদাস গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী অংশকে 'বঙ্গ' নামে চিহ্নিত করেছেন। সতেরো শতকের অর্বাচীনগ্রন্থ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সাগর (বঙ্গোপসাগর) থেকে ব্রহ্মপুত্র অবধি অঞ্চলকে বঙ্গ বলে সীমিত করা হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহই ছিল বঙ্গ। ইবনে বতুতাই প্রথম মধ্যযুগে 'বঙ্গালা' নাম উচ্চারণ করেন, বঙ্গবাসীই বঙ্গাল। 'বঙ্গালা পাইক' তাই বঙ্গবাসী বাঙালী পদাতিক সৈন্যই নির্দেশ করে। লখনৌতি, গোড়, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র (পরে বরেন্দ্র অনেককাল স্ব স্ব আঞ্চলিক নাম অক্ষুণ্ন রেখেছিল। 'সুবেহ বাঙ্গালাহ'-ই-শেষাবধি উক্ত সব অঞ্চলকে 'বঙ্গ' বা বাঙলা নামের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেয়। চর্যাপদেও 'বঙ্গজকে বাঙ্গালাহ'-ই-শেষাবধি উক্ত সব অঞ্চলকে 'বঙ্গ' বা বাঙলা পাইক' তাই বঙ্গবাসী বাঙালী পদাতিক সৈন্যই নির্দেশ করে। লখনৌতি, গোড়, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র (পরে বরেন্দ্র) অনেককাল স্ব স্ব আঞ্চলিক নাম অক্ষুণ্ন রেখেছিল। 'সুবেহ বাঙ্গালাহ'-ই-শেষাবধি উক্ত সব অঞ্চলকে 'বঙ্গ' বা বাঙলা নামের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেয়। চর্যাপদেও 'বঙ্গজকে বঙ্গালী বলা হয়েছে– আজ ভুসুকু বঙ্গালি ভইলি। নিয় ঘরনী চণ্ডালী লেলি।' এ সময়ে বঙ্গালী অবজ্ঞেয় হয়তো অস্পৃশ্যজাত ছিল সংস্কৃতিহীন অর্থে আজো 'বাঙাল' অবজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। বাঙলা ঘর, বাঙলা কচু, বাঙলা কলা আজো নিম্নমানজ্ঞাপক। গোড়ায় 'বঙ্গ' বাসীই ছিল বাঙালী। পরে বাঙলাভাষীমাত্রই হল বাঙালী। এজন্যেই পর্তুগীজদের 'সিটি অব বেঙ্গলা' আলাদাভাবে খোঁজাখুঁজি নিরর্থক। এটি হচ্ছে বাঙলা রাজ্যের বন্দর নির্দেশক পরিভাষামাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(মনহলিপট্টোলী-মদন পাল দেব) দ্রাবিড়, মুরণ্ডা, কুষাণ, ইউচি, আরব, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, আফগান, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ-রক্ত মিশ্রিত তো হয়েইছে। তবে তা পরিমাণে বেশি নয়। পুণ্ড্র, রাঢ়া, বঙ্গ, সুহ্ম ছিল ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রধান। অপ্রধানের মধ্যে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি ডোম, চণ্ডালেরা ছিল নির্জিত। পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি দেগঙ্গায় কিংবদন্তির চন্দ্রকেতুর গড় চব্বিশ পরগনার বেরাচম্পার হরিনন্দনপুর বা হরিনারায়ণপুর উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও তিন হাজার বছর আগেও এদেশে উন্নয়নশীল গোত্র ও বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল। এই রক্ত-সঙ্কর মানুষের স্বভাব-চরিত্র হয়েছে অনন্য।

[ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙলার ইতিহাসের ধারা/পৃ. ৮৭]

মহাভারতোক্ত অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম রাজারা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কুরুপক্ষে ছিলেন, কালিদাসের রঘুবংশে নৌযুদ্ধে নিপুণ ও সাহসী যোদ্ধা বাঙালীদের রঘু পরাজিত করেছিলেন বলে বর্ণিত। এতে বোঝা যায় বাঙালীদের গোত্র-রক্ত পরিচয় যা-ই হোক রাজনীতিতে তারা পিছিয়ে ছিল না।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ধারণায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এইরূপ :

> "শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য... আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায়, বাঙালীর প্রবৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব-স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে।"॥

বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধযান, যোগ, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন ও পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরি দেবতার পূজা প্রবণতার কারণ এ-ই। ডক্টর রায় তাই বলেন :

> "প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে ও দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।.... সিদ্ধারা বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই।... অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প এবং শিথিল। বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল... বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত করে নাই।... তখন (মুসলিম বিজয় কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার–সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মতো প্রকট হইয়াছিল।"

[বাঙালীর ইতিহাস–আদিপর্ব]

বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাও কখনো ভাল ছিল না। মিথ্যা কথন, ভীরুতা, মামলা-প্রিয়তা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বাঙালী চরিত্রে ছিল সুলভ।

বাঙালী ভোগলিপ্সু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব মতবাদ বাঙালী চিত্তে কর্মকুণ্ঠা আরো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালীচরিত্রে যে একদিকে মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, ছদ্ম বৈরাগ্যভাব, চাতুর্য, সুবিধাবাদ ও সুযোগসন্ধান, তোয়াজ ও তদবিরপ্রবণতা প্রভৃতির প্রাবল্য এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবানুগ্রহজীবিতা রয়েছে, তা ঐ কর্মকুণ্ঠারই প্রসূন। তাই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে আমরা বাঙালীকে কেবল তুক-তাক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগতন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী নির্ভর দেখতে পাই। তার সাহিত্যে পাই দেবতার স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তন। তার গানে গাথায় পাই বৈরাগ্যমহিমা ও পারত্রিক-চেতনা। চিরকাল বিদেশী শাসন-শোষণের ফলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ মেলেনি বলেই হয়তো বঞ্চিত দরিদ্রের নিঃস্ব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের এ প্রয়াস, দৈবশক্তির সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছা সিদ্ধির ও প্রয়োজন পূর্তির এই আগ্রহ এবং বাঁচার তাগিদেই অনন্যোপায় মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি, মিথ্যার আশ্রয় ও প্রতারণার পথবরণ আবশ্যিক হয়েছে। সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মচরিতে বাঙালী মানসের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন,—"বাঙালীরা 'পদ'-কেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আমরা তখতের প্রতি বিশ্বস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমরা তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি।"

প্রতীচ্য মানুষ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় বের করেছে। আর আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্য মানুষ অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার উপায় সন্ধানী।

প্রাচ্যের এই নিষ্ক্রিয় দলের জীবন-স্বপ্ন মানসকে করেছে কল্পনাবিলাসী। ভূত-প্রেত-দেও-দানব, গন্ধর্ব-পরী-অপ্সরা তাদেরই কল্পলোকে সহচর। মন্ত্র বলে আকাশে উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে অথবা নদ-নদী উল্লঙ্ঘনে কিংবা মরু-কান্তার উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পনা ও বাসনার জগতে। রূপকথা, উপকথা, ধর্মকথা, পুরাণকথা প্রভৃতি এদেরই সৃষ্টি।

যারা উদ্যমশীল তারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তবক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে। তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার কৌশল; সাগর তলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ নিরাময়ের নিদান, কর্মে সাফল্যের কল এবং অন্যান্য বাঞ্ছাসিদ্ধির সামর্থ্য অর্জনে হয় ব্রতী। এমনি মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে মানুষের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্তু আবিষ্কার ও নির্মাণ। শস্য-উৎপাদন অথবা মৃতে প্রাণ সঞ্চার থেকে আণবিক শক্তি সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সব কিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও সাধ।

আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতায় ও দৈব নির্ভরতায় প্রাচ্য-মানবের পরিচয়। প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তাই বাস্তব, প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, প্রতীচ্যে তাই যান্ত্রিক সম্পদ। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস, আর প্রাচ্য মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তিলিপ্সা, আজন্মলালিত বিশ্বাস-সংস্কারে নিষ্ঠা, প্রশ্নহীন প্রত্যয় এবং আত্মসামর্থ্যে অনাস্থা। জিজ্ঞাসার ও আকাঙ্ক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও জীবিকায়, মনে ও মননে যে-জীর্ণতা আসে, তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে ব্যক্তির বা সমাজের মুক্তি ঘটে না, তার সাক্ষ্য আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত ও আরণ্য সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

বাঙলা ভাষা— গোত্রপরিচয়

আমরা আজ যে-ভাষাকে আমাদের মাতৃভাষা বলে জেনে গর্ববোধ করছি, তা উত্তর ভারত হয়ে আসা আর্যভাষা। আগেই বলেছি আমরা কেবল রক্তসঙ্কর জাতি নই, মিশ্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষও। গ্রহণে বরণেই আমরা আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছি। এক হিসেবে আমরা আত্মবিস্মৃত ও স্বকীয়তাবিরহী মানুষ। আমাদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতিনীতি সবটাই বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মী থেকে পাওয়া। তা সত্ত্বেও বাঙালী তার মৌলিক স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। আপাতদৃষ্টে তার পৈত্রিক ভাষা হারিয়ে গেছে বটে, তবে নানাভাবে নিদর্শনও রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত এবং ইসলাম গ্রহণ করলেও সে তার আদিম ধর্মসংস্কার কখনো ছাড়েনি। সাংখ্য যোগতন্ত্র ও লৌকিক সংস্কারপুষ্ট মননে ও জীবনে তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য সে উক্ত ধর্মাচারের আবরণে সযত্নে রক্ষা করেছে। যথাস্থানে আমরা তা আলোচনা করব।

এখানে কেবল ভাষার কথাই বলছি। ঐতরেয় আরণ্যকের 'বায়াংসি বঙ্গ বগধশ্চেরপাদাঃ'—এই উক্তিতে আমাদের অনার্য ভাষার ইঙ্গিত মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের বলা হয়েছে দস্যু। তবু বৈদিক যুগ থেকেই দেশী বিভিন্ন অনার্য শব্দ ও বাকভঙ্গী ঋকবেদীয় ভাষাকেও প্রভাবিত করেছিল। আমাদের অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদগঠনরীতির প্রভাব দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতে ও প্রাকৃত ভাষায় নেহাত কম মেলে না। পশীলস্কি, শিলভ্যাঁ লেভী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বানদের গবেষণার ফলে আজকাল এসব তথ্য আর কারো অজানা নয়। যেমন—

ক. ফলফসল–ধান, ডাল, কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন, আদা, হলুদ এদেরই আবিষ্কার।

খ. গণনা পদ্ধতির–কড়ি, পণ, গণ্ডা, কড়া, গুটি, গুঁড়া, ঘুটি প্রভৃতি।

গ. ভাব ও বস্তুবাচক–খাঁখার, ঠেঙ, ঠোঁট, কলি, পেট, ঝাড়, ঝোপ, চোঙ প্রভৃতি।

ঘ. জলবাচক–দামদাক (দামোদর), কবদাক (কপোতাক্ষ)। দহ-ঝিনাইদহ, বাঁশদহ। ড়-বাঁকুড়া, হাওড়া, বগুড়া। গুড়ি–শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জুলি-নয়নজুলি প্রভৃতি।

ঙ. ধন্যাত্মক অনুকার, শব্দদ্বৈত–খাঁখাঁ, হনহন, ভনভন, টলটল, ঢলঢল, রি রি, শিরশির, শোঁ শোঁ, ভেঁ ভোঁ ইত্যাদি।

চ. আসবার তৈজস–ঢেঁকি, কুলা, ডালা, লাঙ্গল, কাপার্স, কম্বল, বাণ, ধনু, পিনাক, দাও, ডোঙা।

ছ. পশু-পাখি-মেড়া, কাক, গণ্ডার, মাতঙ্গ ইত্যাদি।

ঝ. তিব্বতী-চীনা তথা মোঙ্গলীয় কিছু কিছু দেশ ও বস্তুবাচক শব্দও দুর্লভ হবে না। যেমন, ফা (>পা>পাদ), নাথ, ফুঙ্গী, লুঙ্গী, সাম্পান, গঙ্গা, বঙ্গ, বাণিয়াচঙ্গ, বুড়িচঙ্গ এবং সোয়াঙ, পালঙ অন্তক দক্ষিণ চট্টগ্রামের গ্রামনাম।

কল্পনা করা যাক এ দেশের বিভিন্ন গোত্রের লোকগুলো গোত্রীয় ভাষা ও আঞ্চলিক বুলিতে কথা বলত। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচারক-প্রশাসকরা যখন এই দেশে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা (অধিকাংশের মুখের বুলি মাগদী প্রাকৃতও) নিয়ে এল, তখন নিশ্চয়ই ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে একদিনে বা এক পুরুষে গোটা দেশের মানুষ প্রাকৃত, পালি বা সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করতে পারেনি। এই জন্যে প্রায় দুই তিন পুরুষের প্রয়াস প্রয়োজন ছিল। শিক্ষিত জন অধ্যুষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্রে কৃত্রিমভাবে লেখা-পড়ার মাধ্যমে হিব্রু শেখানো যত সহজ হয়েছে নিরক্ষতার সেই যুগে তা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। প্রায় দু-হাজার বছর আগে বাঙালীরা মুখে মুখে অল্প অল্প করে মন্থর গতিতে আর্যভাষা শিখে নিয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। যেমন– এযুগে বুনো মানুষেরা খ্রীস্টান প্রচারকদের কাছে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-সংস্কৃতিতেও শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে, কিংবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধৃত আরণ্য নিগ্রোরা যেমন করে অল্প সময় পরিসরের মধ্যে আমেরিকায় য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিখে নিয়েছিল (তেমন দ্রুত না হলেও) সুদূর অতীতের বাঙালীরাও শাস্ত্রের ও শাসকের ভাষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নিয়েছিল। তবু স্বদেশে স্ব-সমাজে স্থায়ীভাবে বাস করতো বলে তারা উত্তর ভারতীয় ভাষা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করত পারেনি। কোন বিদেশীই তা পারে না। তাই তাদের গৃহীত ভাষার শব্দে, উচ্চারণে, ব্যাকরণে ও বাক্‌রীতিতে নিজেদের ভাষার লক্ষণীয় প্রভাব রয়েই গেছে। বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজো আমাদের অস্ট্রিক জ্ঞাতি কোল, খাসি, মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতালী, হো, কুরকু, শবর, গদর প্রভৃতি গোত্রীয় কৌম রয়েছে। তাদের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বাঙলা ভাষায় যে আমাদের অস্ট্রিক ভাষার সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন— ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষার ওপর মুণ্ডা ভাষার প্রভাব নিরূপণ করেছেন নিম্নরূপভাবে :

বাঙলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব

॥ ক ॥ ধ্বনিগত

১. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও যুগ্ম স্বরধ্বনি রয়েছে। যেমন– ঐ ঔ ও আও আই ইত্যাদি।
২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও যে কোন স্বরবর্ণে নাসিক্য উচ্চারণ সম্ভব।
৩. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও শব্দে স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি বহুলপ্রচলিত। যেমন— গোলা-গুলি, ছোরা-ছুরি, তুমি-তোমার, দেখা-দেখি, লেখা-লিখি ইত্যাদি। এই স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতির লক্ষণ করকু ও সাঁওতালী ভাষায়ও লক্ষণীয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন কোন ভাষাতেও এই লক্ষণ সুলভ।
৪. মুণ্ডা ভাষার মতো যুক্তাক্ষর দিয়ে বাঙলা কোন শব্দ আরম্ভ হয় না। তেমনি য় ব-ও কোন বাঙলা শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ শব্দে আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় না।
৫. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও শ ষ স তিনটেই শ রূপে উচ্চারিত হয়। সাঁওতালী ও কুরকু ভাষাতেও এই বিকৃতি বর্তমান।
৬. বাঙলা বুলিতে বিশেষত অশিক্ষিতা নারী ও শিশুদের উচ্চারণে ল-ন এবং ন-ল রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— লবণ-নুন-নুন, লাল-নাল, লঙ্গর-নঙ্গর, লোষ্ট্র-নোড়া, লাঙ্গা-নাঙ্গা, লাচার-নাচার, লোকসান-নোকসান ইত্যাদি।
৭. মুণ্ডা ভাষার মতো কোন বাঙলা শব্দেই ণ ও ঋ আদ্যক্ষররূপে ব্যবহৃত হয় না।

॥ খ ॥ শব্দ ও ব্যাকরণগত

১. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও বচনে, লিঙ্গে এবং কারকচিহ্নে বিশেষণ বিশেষ্যের অনুগত হয় না। যেমন— ছোট ছেলে, ছোট মেয়ে, ছোট গ্রাম ইত্যাদি।
২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও ভিন্ন শব্দ যোগে লিঙ্গান্তরের নিয়ম চালু রয়েছে। যেমন— বেটা ছেলে, মেয়ে ছেলে, পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, নর কবুতর, মাদী কবুতর, পুরুষ লোক, মেয়ে লোক ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. কারক-বিভক্তি যোগের ব্যাপারেও মুণ্ডা ভাষার সঙ্গে বাঙলার ঐক্য রয়েছে। বাঙলা কে, তে, র, এর প্রভৃতি মুণ্ডা ভাষার প্রভাবপ্রসূত এবং মুণ্ডা ভাষার মতোই এগুলো বচননিরপেক্ষ।
৪. বাঙলা টা, টি যেমন ছেলেটা, একটি ইত্যাদি মুণ্ডা প্রভাবপ্রসূত বলে বিদ্বানদের ধারণা।
৫. সম্বন্ধের 'র' 'এর' যোগে বিশেষণ পদের প্রয়োগও মুণ্ডা ভাষার প্রভাবজ। যেমন— সোনার কলম, সোনার বাঙলা, লোহার খাট, কলমের আঁচড় ইত্যাদি।

॥ গ ॥ বাক্যগঠনরীতি

১. বাঙলায় যেমন একটি বাক্যে (১) সম্বোধন, (২) সম্বন্ধ পদ (৩) কর্তা, (৪) কর্ম (৫) ক্রিয়াপদ বসে। যেমন— (২) রামের (৩) ছেলে (৪) গাছ (৫) কাটে। মুণ্ডা ভাষাতেও বাক্যে এই ভাবেই পদ বিন্যস্ত হয়।
২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলাতেও পরোক্ষ উক্তি (Indirect narration) নেই।
৩. বাঙলা ভাষাতে যেমন সে ভাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে– এইরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডা ভাষাতেও এই ভাবে দেখিয়া (seeing in this way)— এইরূপ বাক্য গঠিত হয়।
৪. বাঙলা ভাষাতে যেমন শব্দদ্বৈত বহুল ব্যবহৃত, মুণ্ডা ভাষাতেও তাই। যেমন— অলি-গলি, আবল-তাবল, এবড়ো-থেবড়ো, আশে-পাশে, গোল-গাল, হৈ-চৈ, আলা-ছালা, আঁকু-বাঁকু। সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও এমনি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়।
৫. বাঙলা ভাষাতে যেমন ক্রিয়াবাচক বিশেষণ রয়েছে যথা— চেনা লোক, আসছে কাল, প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় দুহিল দুধ, ছুড়িল তীর, কাটিল কদলী, ফুকিল কাক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, মুণ্ডা ভাষাতেও এমনি ব্যবহার দুর্লভ নয়।
৬. আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছু মুণ্ডা শব্দ এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন— কাঁড়া (মহিষ), মেনি (বিড়াল), মেড়া (ভেড়া)। মুণ্ডা ভাষার শব্দ বলে অনুমিত তথা খাসী, মোনক্ষের প্রভৃতি অস্ট্রিক গোত্রীয় ভাষার শব্দ বলে অনুমিত। এইরূপ কিছু শব্দ আকাল, আখড়া, বঁড়শি, বট, বেঁটে, ভোড়া, বোকা, চাউল, কুটা, চুলা, ঢাল, ডোঙা, হ্যাঁ, হাড়, হুড়কা, কালা, খচ্চর, খুঁটি, লড়াই, মোটা, রাঁড়, ঠোঙা, তোতলা ইত্যাদি।
৭. সংখ্যাবাচক কুড়ি, গণ্ডা, কড়া; পণ প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ।

মধ্যযুগে উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। যেমন 'অষ্টাদশ, পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ/ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে এ ছিল 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। যেমন—হিন্দুয়ানী লেখা তারে না পারি লিখিতে (হাজী মুহম্মদ)। কারুর চোখে এ ভাষা 'প্রাকৃত ভাষা' (দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও রামচন্দ্র খান, ১৬ শতক)। কারো মতে এ 'লোক ভাষা' (মাধবাচার্য, ১৬ শতক) এবং কেউ বলেছেন একে 'লৌকিক ভাষা' (কবিশেখর, ১৭ শতক)। আর অধিকাংশ লেখক যেমন শ্রীকরনন্দী, দৌলত কাজী একে 'দেশী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র রায় উল্লেখ করেছেন কেবল 'ভাষা' বলে—অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল। আবার কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলেও আখ্যাত করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল 'গৌড়িয়া'। উনিশ শতকে রামমোহন প্রমুখ কেউ কেউ একে 'গৌড়ীয় ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'গৌড়, গৌড়জন, গৌড়দেশ'-এর মতো ভাষার গৌড়ীয় নামও টেকেনি। দেশের নামে জাতি ও ভাষা আখ্যাত হয়। তাই বঙ্গদেশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালী, বাঙ্গলাভাষা, বাঙলাদেশ, বাঙালীজাতি, বাঙ্গালী ভাষা 'বঙ্গভাষা ও বাঙলা ভাষা' নামই অবশেষে টিকে গেল।

নিকট অতীতেও যে বিহারে, উড়িষ্যায়, বাঙলায়, আসামে বিশেষ করে উড়িষ্যায়, বাঙলায়, আসামে অভিন্ন 'প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ' বুলি রূপে ব্যবহৃত হত, এমন কি চর্যাগীতির আমলেও অর্থাৎ হাজার বছর আগেও বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-ব্যাপী একটি অভিন্ন লেখ্যভাষা (বুলির পার্থক্য সত্ত্বেও) চালু ছিল তার প্রমাণ মেলে অবহট্‌ঠ রচনায়, প্রমাণ পাই বিভিন্ন অঞ্চলের পদকার রচিত চর্যাগীতিতে। ভাষাবিদ বিদ্বানেরা বলছেন— তেরো শতক অবধি বাঙলা-উড়িয়া-আসামীতে কোন ভেদ ছিল না এবং ষোল শতক অবধি বাঙলা আসামী অভিন্ন ছিল। কাজেই বারো-তেরো শতকে যদি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম কোন একচ্ছত্র শাসনে থাকত এবং এখানকার যে কোন অঞ্চলের ভাষা যদি প্রশাসনিক তথা দরবারী লেখ্য ভাষারূপে (শৌরসেনীর বদলে) ব্যবহৃত হত তাহলে আজ ঐ বিরাট দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একভাষী জাতিসত্তা (Nationality) গড়ে উঠত তাতে রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থবশে একটি বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ও স্বয়ম্ভর রাষ্ট্রিক জাতি গড়ে উঠতে পারত। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র্যে এবং বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট্যতা লাভ করত। আজো লেখ্য বাঙলা-উড়িয়া-আসামীতে প্রভেদ সামান্য। আজো এই তিন ভাষা ও সাহিত্যকে অভিন্ন করে দেখা সম্ভব। বাঙলা ও আসামী হরফে পার্থক্য সামান্য। উড়িয়া বর্ণমালা ভিন্ন হলেও উড়িয়া ও বাঙলা বাক্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে কেবল ক্রিয়া পদে এবং আসামীর সঙ্গে লেখা বাঙলার পার্থক্য মুখ্যত স-হ উচ্চারণে। এ-যুগ মিলনের যুগ, দূরকে নিকটবন্ধু করার এবং পরকে ভাই করার যুগ। বাঁচার তাগিদেই বিশ্ব মানব আজ কেবল বাণিজ্যে কিংবা বৈষয়িক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়— আত্মার ক্ষেত্রেও আত্মীয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও মন মানসের ঐক্য ও সংহতি কাম্য। এ আন্তর্জাতিকতার যুগে আজো আমরা মিথ্যা অহমিকা ও ছদ্ম স্বাতন্ত্র্যবাঞ্ছা বশে আমাদের সহজবোধ্য দুটো প্রতিবেশী ভাষা-সাহিত্যকে অবহেলা ও ঔদাসীন্যে দূরে ঠেলে রাখছি—অপরিচয়ের প্রাচীর নিরন্তর উঁচু করে তুলছি। আজো চর্যাগীতিকারদের নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি। মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণদেব সমভাবে বাঙলা আসামের গর্ব। আজো বাঙলা ও আসাম কবিশঙ্করদেবের দাবিদার। জয়দেবকে নিয়ে উড়িয়া-বাঙালীর বিবাদ চলছে। আন্তরাঞ্চলিক আত্মীয়তার চিহ্ন বিমোচনে ও যোগসূত্রের অস্বীকারে উদ্বেগ নেই আমাদের, যদিও আজকাল বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করে করে আমাদের সাহিত্যকে ঋদ্ধ করার সাধনায় আমরা সদা নিরত।

অর্জিত সম্পদের অধিকার হেলায় হারিয়ে অর্জনের ঔৎসুক্য পাকা বিষয়ীর লক্ষণ নয়। আজো আমরা হরফের ব্যবধান স্বীকার করেও বাঙলা উড়িয়া আসামী ভাষার চর্চা করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা সাহিত্য বিভাগে বাঙালীরা উড়িয়া-আসামী এবং অন্যেরাও স্বভাষার সঙ্গে অন্য দুটো ভাষা ও হরফ আবশ্যিকভাবে শিখে নিলে আজো তিনটে ভাষাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বন্ধনে বাঁধা সম্ভব। এতে ভাবীকালে এই বিস্তৃত অঞ্চলবাসীর বৈষয়িক ও আত্মিক কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা অশেষ।

জাতি পরিচয়ে বাঙলা ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত। প্রকৃতির কোলে লালিত প্রাকৃত জনের তথা লোক সাধারণের মৌখিক বিকৃতিজাত বলে কথ্যরূপের নাম প্রাকৃত। বাঙলাও আঠারো শতক অবধি প্রাকৃত ভাষা বা শুধু ভাষা নামে অভিহিত হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋগ্বেদীয় ভাষার কথ্যরূপ থেকে মুখে মুখে কালিক বিবর্তনের ফলে আজকের লিখিত বাঙলার ও বিভিন্ন অঞ্চলের বর্তমান বুলির উদ্ভব। ছকে এই বিবর্তন ধারা নিম্নরূপ :

১। লেখ্য বা লিখিত

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
বৈদিক ভাষা
(আনু. খ্রী. পূ. ১৫০০-৬০০ খ্রী. পূ.)

কৃত্রিম লেখ্য সংস্কৃত
(আনু. ৬০০ খ্রী. পূ. থেকে)

পালি
(মধ্য দেশীয় কৃত্রিম লেখ্য ভাষা) অশোক লিপি
বৌদ্ধ শাস্ত্র সাহিত্য
(আনু. খ্রী. পূ. ৬০০-২০০ খ্রী.)
|
প্রাকৃত (মধ্যদেশীয় লেখ্য বিবর্তিত প্রাকৃত = শৌরসেনী)
(আনু. ২০০-৬০০ খ্রী.)
|
অপভ্রংশ (লেখ্য বিবর্তিত শৌরসেনী-অবহট্‌ঠ)
(আনু. ৬০০-৯৫০ খ্রী.)
নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা লেখ্য বাঙলা
(আনু. ৯৫০ খ্রী. থেকে)

AMARBOI.COM

২। কথ্য বা কথিত প্রাচীন ভারতীয় ভাষা

আর্যভাষার কথ্য রূপ (ঋগ্বেদের)
(আনু. ১৫০০ খ্রী. পূ. সমকালীন)
আর্যাবর্তের কথ্য প্রাকৃত (বিকৃত পালি)
(আনু. ৬০০ খ্রী. পূ. ২০০ খ্রী.পূ.)
কথ্য মাগধী প্রাকৃত
(আনু. ২০০-৬০০ খ্রী.)
|
কথ্য অবহট্‌ঠ
(আনু. ৬০০-৯৫০ খ্রী.)
কথ্য বাঙলা
(৯৫০ খ্রী. থেকে)

একালে কথ্য আর্যভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক বিকৃতি জ্ঞাতিত্ব চিহ্ন অস্পষ্ট করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে একারণেই। বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন জীবিকার নিরাপদ নিরুপদ্রব লক্ষণ-লালন লক্ষ্যেই মানুষের মানস সংস্কৃতি ও তজ্জাত ব্যবহারিক উপকরণ এবং বৈষয়িক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন-চেতনার বহিঃরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ-বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য-দুর্দশার ওপর নির্ভরশীল। যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের অনুকূল পরিবেশ, সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক বিকাশের এবং জীবিকার স্বচ্ছন্দ প্রসারের লাবণ্যে বর্ধিষ্ণু, যেখানে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জড়তায়, জীর্ণতায় ও চিরন্তনতায় বিকৃত, প্রথাগত নিষ্প্রাণ আচার ও আচরণ মাত্র। কারণ বেঁচে বর্তে থাকার পদ্ধতিই জন্ম দিয়েছে শাস্ত্রের, সমাজের, সংস্কৃতির, সভ্যতার ও রাষ্ট্রের সেই বাঁচার প্রয়াস যখন কোন বিরুদ্ধ বিরূপ শক্তি রোধ করে দাঁড়ায়, তখন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-প্রয়াস ও আচরণ আবর্তনধর্মী হয়েই জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

আমাদের বাঙলাদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষ চিরকাল অন্তত ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিজাতি বিজিত দেশ। এদেশের মানুষ কখনো স্বকীয় মেজাজে আত্মবিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। সৃজনে নয়—অনুকৃতি ও অনুশাসনের বশে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে কোথাও অন্ধের মতো কোথাও পঙ্গুর মতো সে এগিয়েছে স্থান কালের দাবি স্বীকার করেই। তাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। মেদ-মাংসের স্ফীতি ও লাবণ্য তাকে আড়াল করেছে বটে কিন্তু লোপ করতে পারেনি।

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও মনন। বাঙালীর মননে ও অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে ও যাদুতে তার আস্থাও অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, পশু-পাখি দেবতা, দেহচর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তুক-তাক-দারু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচাটন, কবজ-মাদুলী ও বশীকরণে আস্থা তাদের আজো অবিচল। সভ্য বাঙালীর অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় জ্ঞাতি পার্বত্য আরণ্য কৌম-কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, হাজং, খাসিয়া, মণিপুরী, লুসাই, নাগা, মিগো, খুমি, তিপরা, মুরঙ, কুকী, কোচ প্রভৃতির মধ্যে যে-সব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তাদের অনেকগুলোই ভিন্নাকারে বা সামান্য রূপান্তরে সভ্য বাঙালীর প্রথাসিদ্ধ আচারে রয়ে গেছে। আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক অনেক আচারে-অনুষ্ঠানে, প্রথায়, পার্বণে, মৃতের সৎকারে, শ্রাদ্ধে-সংস্কারে আদিম রীতি-নীতির ছিটে-ফোঁটা এখানো মেলে।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান ধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণ করেও বাঙালী তার আদিম ঐতিহ্য কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেনি। তাই গাছের মধ্যে বট, অশ্বত্থ, তাল, তেঁতুল, তুলসী প্রভৃতি; পাখির মধ্যে কাক, পেচক, শকুন, শালিক প্রভৃতি; পশুর মধ্যে গাভী, শেয়াল, সরীসৃপের মধ্যে সাপ, টিকটিকি, নৈসর্গিক তিথি নক্ষত্র দিন-ক্ষণ-মাস অশরীরী ভূত প্রেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিশাচ-(জীন-পরী) ডাইনী প্রভৃতি বাঙালীর চেতনায় রোগের চিকিৎসায়, শুভাশুভ চিন্তায় এবং সিদ্ধি-সাফল্য কামনায় আজো উপযোগ হারায়নি।

আচারিক জীবনে ধান, দূর্বা, হলুদ, আমপাতা, কলাগাছ, কলসী, ঘট, কুলা, দীপ, ধূপ, মাছ, দই, আজো মনোজীবনে বাঞ্ছাসিদ্ধির ভরসা জাগায়। ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী কিংবা সাপ, হাতী, বাঘ, কুমীর আজো সভয় শ্রদ্ধা পায়।

নৈতিক সামাজিক জীবনে গোত্রে বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, বাল্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, ত্যাগ, তালাক প্রভৃতি বিধিনিষেধও আদিম। গোত্রপতি, সমাজপতি ও গৃহপতির দাপট ও নেতৃত্ব আজো নিম্নতর সমাজে অবিলুপ্ত। গুরুবাদ ও মন্ত্রগুপ্তি সর্বসমাজে আজো প্রবল। হাতিয়ারের মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, ঈষ, দা, দড়ি, মই, কোদাল, বর্শা, বাঁটুল, ঝুড়ি, চুপড়ি, চেঙাড়ি, ডিঙ্গি, ডোঙা; তৈজস আসবাসের মধ্যে হাঁড়ি, সরা, পাতিল, ঝিনুক, ডাবা (নারিকেলের মালা), মাচা, নল, পেটি, ঘটি, চাটাই, চাটি, ঝাঁটা, বাখারি প্রভৃতি; নেশার মধ্যে গাঁজা , ধেনো মদ, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি; ফলমূলের মধ্যে ধান, বেগুন, ঝিঙা, কলা, তাম্বুল, গুবাক, গাণ্ডারী, জাম্বুরা, শিমূল, তেঁতুল প্রভৃতি অস্ট্রিক দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় বাঙালীর আবিষ্কৃত। ধানের মধ্যে জিজিরা, ককচি, করা, তুতীয়া, বাদল, শুকুই , লেম্বরু, গেলঙ, মইদল প্রভৃতি এবং মাছের মধ্যে পুঁটি, টেঙরা, শিঙ্গি, গজার, কই, মাগুর, টাকি, পাঙ্গাস প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় নাম।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে গুড়, ভাত, মাড়, খই, চিড়া, মুড়ি, চচ্চড়ি, ভর্তা, আচার প্রভৃতিও অস্ট্রিক হওয়ার কথা।

কড়া, পণ, গণ্ডা, কুড়ি, কাহন, গণনাপদ্ধতি অস্ট্রিক। এমনকি কয়েকশত শব্দ ঢিল, ঢাক, ঢোল, ডাঙর, ডাঁশাল, ডাহা, চোয়াল, খাড়ু, টোপা, খোকা, খুকী, খাড়ি, খোটা, খামার ঘর, আড্ডা, লাড্ডু প্রভৃতি অস্ট্রিক সংস্কৃতির স্মারক।

এ-সব ছাড়াও ধর্মমত সূত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা-পদ্ধতি সূত্রে বিদেশীর জ্ঞান ও চিন্তা এবং বিদেশে আবিষ্কৃত উদ্ভূত দ্রব্য ও ভাবচিন্তার নাম ও ব্যবহার সম্পৃক্ত আচার-সংস্কৃতি অনুকৃতি-অনুসৃতির মাধ্যমে বাঙালীর সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ ও রূপান্তরিত করেছে। যেমন— জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ এক সময় জৈন বৌদ্ধ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও জীবনদর্শন কিংবা ইসলাম ও খ্রীস্টান শাস্ত্র তেমনিভাবে যথাক্রমে হিন্দু মুসলিম ও খ্রীস্টান জীবন প্রভাবিত করেছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগই নিয়ন্ত্রণ করে—বিশ্বাসরূপে, সংস্কার রূপে, ঘরোয়া ও সামাজিক আচার আচরণরূপে, ন্যায়-অন্যায় চেতনারূপে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধরূপে। এক কথায় জীবনের মূল্যবোধ মুখ্যত ধর্মমত থেকেই জাগে। কাজেই বাঙালী নির্বিশেষের অভিন্ন মানস-সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার মতো ক্বচিৎ কিছু মেলে। তবু সাধারণভাবে কিছু আদিম বিশ্বাস-সংস্কার রূপান্তরে তথা ধর্মীয় সংস্কারে সমন্বিত হয়ে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিশেষ বাঙালীর সাধারণ আচরণের অবলম্বন হয়েছে এবং সেখানেই কেবল বাঙালীর অভিন্ন সত্তার সন্ধান মেলে। তাই আমরা আজো হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের কিংবা অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় ঐতিহ্যের ও আচারের অনেক কিছুরই রেশ দেখতে পাই। আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে যেহেতু সংস্কৃতি জীবিকাপদ্ধতি তথা আর্থিক নৈতিক শৈক্ষিক কালিক ও প্রাতিবেশিক পরিবেষ্টনী নির্ভর-সেহেতু সংস্কৃতিরও আঞ্চলিক, সামাজিক, কালিক, শ্রেণীক ও ব্যক্তিক ভেদ থাকে। এই ক্ষেত্রে জানবার বুঝবার জন্যে সামান্যীকরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেওয়াজ চালু থাকলেও তা কখনো বিজ্ঞানসম্মত হয় না। অতএব ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলের ও ধর্মমতবাদীর আচরণে কিংবা জীবিকার ক্ষেত্রে আপাত অভিন্নতা থাকলেও মানস ক্ষেত্রে তথা জীবনভাবনা ও জগৎচেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থেকেই যায়। যেমন— ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকগুলো য়ুরোপীয় আচার আচরণ ব্যক্তিক, ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে গ্রহণ করেছে, তবু স্বাতন্ত্র্য-চেতনা হারায়নি। এতেই বোঝা যায় শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের মন মত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমরা আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখতে পাই। পাক-প্রণালীতে, খাদ্যাখাদ্য নিরূপণে, তামা পিতল ও মাটির থালা-বাসন-গ্লাসের ব্যবহারে, ঘর-দোর স্থাপন পদ্ধতিতে, পোশাকে-পরিচ্ছেদে, মসজিদ-মন্দির গীর্জার আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যেও পার্থক্য সুপ্রকট। আসন ও শয্যাবিন্যাসে, দিক্ নির্বাচনে যেমন শাস্ত্রীয় স্বাতন্ত্র্য সুপ্রকট, তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বক্তব্যে, আদর্শে এবং লক্ষ্যেও এ স্বাতন্ত্র্য অলক্ষ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রসূত মূল্যবোধ ও সমস্যাই সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তাই গল্পে উপন্যাসেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জীবন-সমস্যা ও সমাধান-পন্থা অভিন্ন নয়। তা ছাড়া শাস্ত্রীয় প্রভাবে চিত্রশিল্পে মূর্তিশিল্পে স্থাপত্যে সঙ্গীতে কারো অনীহা আবার কারো আগ্রহ জেগেছে। কেউ চর্চা করেছে, আবার কেউ বিরত থেকেছে। ফলে দৈশিক শিল্পে সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষ বাঙালীর অবদান নয়— আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থানভেদে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি সভ্যতা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বাঙলাদেশেও সেই সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রূপ সর্বত্র দৃশ্যমান।

AMARBOI.COM

৫

বিদেশ-বিভাষার সাহিত্য ঋণ

ভারতবর্ষ কখনো এক দেশ ছিল না। এশিয়া-য়ুরোপ আফ্রিকা বলতে যা বোঝায়, ভারতবর্ষ বলতেও তেমনি বহু জাত বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির লোক অধ্যুষিত একটি বিরাট ভূখণ্ড বোঝায়। ১৮৫৭ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধিই কেবল গোটা ভারতবর্ষ একচ্ছত্র শাসনে ছিল। তখন অবশ্য ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-নির্মিত মানচিত্রে ছিল ভারত বর্হিভূত ব্রিটিশ–অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরও। তার আগে ভারতবর্ষ ছিল য়ুরোপের মতোই বিভিন্ন দেশে ও রাজ্যে বিভক্ত। অধিবাসীদের মধ্যেও গৌত্রিক ভাষিক ও শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ছিল প্রবল। তবে তখনো এক প্রকারের ধর্মীয় ঐক্যবোধ ছিল, এবং সেটাই ছিল প্রাচীন 'জাতি', চেতনার উৎস। এর সাধারণ নাম দেওয়া যায় 'ধর্মীয় জাতীয়তা'। সে তাৎপর্যে ভারতবর্ষে আর্য জাতি, হিন্দুজাতি, বৌদ্ধজাতি ও মুসলিম জাতি ছিল। ঐ সংকীর্ণ সড়কেই বিভিন্ন ধর্মমতবাদীর একটা সংহত ভারতও ছিল–যেমন আর্যভারত তথা হিন্দুভারত, জৈনভারত, বৌদ্ধভারত ও মুসলিম ভারত। এ চেতনা কিংবা ঐক্যবোধ অনেকটা-বৌদ্ধ জগৎ, মুসলিম-দুনিয়া কিংবা খ্রীস্টান বিশ্বের মতোই, তাতে শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক কিংবা মতবাদীর দলীয় ঐক্য বা একাত্মবোধ থাকলেও তা জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কেজো ছিল না। কাজেই এই ঐক্য চেতনা আদর্শিক-দেশ-কাল-জীবিকা ও পরিবেষ্টনী-নিয়ন্ত্রিত জীবনের সমস্যা-সম্পদপ্রসূ বাস্তব কিছু নয়। অতএব মনে-মেজাজে, চিন্তা-চেতনায়, বিষয়ে-ব্যবহারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশের মানুষ ছিল জাত-বর্ণ, ভাষা-গোত্র, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্ভাষিক, আন্তর্ধার্মিক, আন্তর্জাতিক, আন্তঃদৈশিক যোগাযোগে ও প্রশাসনিক সম্পর্কে পারস্পরিক প্রভাব যতটা গভীর, ব্যাপক ও বিচিত্র হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক কেবল ততটুকুই হয়েছিল— য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যেমনটি দেখা যেত প্রাচীন ও মধ্যযুগে— এখানেও প্রায় তেমন এবং ততটুকু প্রভাবই অনুমান করা চলে।

ব্রিটিশ ভারতে একচ্ছত্র শাসকের প্রজা ও প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিন্ন ও অখণ্ড ভারত-চেতনার অনুশীলন করতে থাকে, যদিও তাদের 'জাতীয়তাবোধ' ছিল স্বধর্মীয় ঐক্যবোধের নামান্তর মাত্র। এই সময় থেকেই 'দেশ' বলতে 'সিঙ্গাপুর থেকে খাইবারপাস' অবধি বিস্তৃত ভুবন নির্দেশিত হচ্ছিল, আর পূর্বেকার দেশগুলো হল 'অঞ্চল' মাত্র— যার প্রশাসনিক নাম 'প্রদেশ'।

রাজনৈতিক স্বার্থে কৃত্রিম উপায়ে অখণ্ড দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির জিগির তুলতে হয় এবং ষাট সত্তর বছর ধরে তথা দুই পুরুষ ধরে ক্রমাগত উচ্চারণে তা প্রায় প্রাতিভাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল। এই মিথ্যা ধারণা শেষাবধি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতরাষ্ট্রেও ভাষিক ও গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে ওঠে— যার ফলে ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক প্রশাসনিক প্রদেশ বা 'রাজ্য' বিন্যাস আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ভারতে সদুদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা আবেগ তথা ভারত-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য ও একাত্মবোধ ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছে। ঐ আবেগ তথ্য-নিরূপণে ও তত্ত্ব-উদঘাটনে প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যেই এতো কথা বলা। উত্তর ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের কবলে পড়ে বাঙালীরা উত্তর ভারতীয়দের আদলে জীবনগড়ার প্রয়াসী ছিল। কিন্তু এসব কোন উপসর্গই দক্ষিণভারতীয় ছিল না বলে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় প্রভাব আমাদের জীবনে দুর্লক্ষ্য। বলা বাহুল্য আমাদের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে উত্তর-ভারতীয় প্রভাবে ও আদলে। বৈদিক জৈন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও সাহিত্যের প্রভাব তো ছিলই, তাছাড়া পরবর্তীকালে লেখ্য সংস্কৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও ছিল সর্বাত্মক। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় রচনায় তো বটেই, তা ছাড়াও আমাদের জৈন বৌদ্ধ রচনায়ও ঐ প্রভাব গভীর। শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, ধোয়ী, ধোয়ীর পরে শরণ (উমাপতি ধর), গোবর্ধন, হলায়ুধ কিংবা সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যা সপ্তশতী প্রভৃতির সৃষ্টিশীল কবিগণ যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে বাঙালীত্ব সামান্য। প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ধর্মতত্ত্বেও জীবন জিজ্ঞাসামূলক দোহায় কিংবা প্রকীর্ণ কবিতায় বাঙালীয়ানা বেশি নয়। প্রাকৃতপৈঙ্গল, চর্যাগীতি, দোহা প্রভৃতিতে বাঙালীর অংশ আছে, কিন্তু বিশিষ্ট বাঙালী-চেতনা নেই। বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে-শূন্যপুরাণে ধর্মমঙ্গলে নাথসাহিত্যে-সহজিয়া-বাউল সাহিত্যে ধর্মীয়তত্ত্ব কথার আবরণে এবং লোকায়ত দেব মহিমাকীর্তনছলে হিন্দুর মঙ্গলকাব্যগুলোতে কিংবা পীরনারায়ণ সত্য ও তাঁর অনুসারীদের কথায় বাঙলা ও বাঙালীকে পুরোপুরি পাওয়া যায়; আর আংশিকভাবে মেলে চৈতন্যচরিতসমূহে ও তাঁর পার্ষদচরিত গ্রন্থগুলোতে। অন্যত্র অনুবাদ সাহিত্যে যেখানে মূলানুগত্য শিথিল হয়েছে সেখানে বাঙলা ও বাঙালী দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত উত্তর ভারতীয় প্রাচীন আর্য জীবন চেতনার ও জগৎ ভাবনারই বাহন এবং লোকায়ত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য আর মুসলিম কবি রচিত শাস্ত্র কিংবা প্রণয়োপাখ্যানগুলো দেশ-কাল নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় বা মানবকাহিনী মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি সংস্কৃত, আউধী-হিন্দি, ফারসি, আরবি থেকে নানা গ্রন্থ বাঙলায় অনূদিত হয়ে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে ও দৃঢ় করে এবং বিকাশ বিস্তারেরও পথ নির্দেশ করে। এতে নতুন ভাব ও বস্তুবাচক নতুন নতুন শব্দ ঋণে ও নির্মাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, চালু হয়েছে সাহিত্যের নানা অনুকৃত আঙ্গিক। নানা ছন্দও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এরূপে নতুন ভাবে, শব্দে, ব্যঞ্জনায়, আঙ্গিকে ও অলঙ্কারে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। হিন্দি আউধী থেকে এসেছে আখ্যায়িকা বা প্রণয়োপাখ্যান-ময়না-লোর-চন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মনোহর মধুমালতী, গুলেবকাউলি প্রভৃতি। ফারসি থেকেও উপাখ্যানই অনূদিত হয়েছে– ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, সিকান্দরনামা, সপ্তপয়কর, জেবলমুলুক-সামারোখ, লালমতী-সয়ফুলমুলুক, শাহপরী মালিকজাদা মিশরীজামাল, শাহনামা প্রভৃতি।

আরবি থেকে শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থও অনূদিত হয়েছে, সে সঙ্গে আলেফ-লায়লা থেকে দু'একটি উপাখ্যানও। উল্লেখ্য যে, আরবির সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানের কখনো সাহিত্যিক যোগ ঘটেনি।

মহারাষ্ট্রের হাল রচিত 'গাহাসত্তসই' বাঙলায় অনূদিত হয়নি বটে, তবে পদ রচনার ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থের এবং ফারসি দিওয়ান ও গজলের প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও আন্তর্দৈশিক সংযোগের ফলে শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে আরো নানা ভাবগত ও বস্তুগত ছিটেফোঁটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল; খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে হয়তো তার কিছু নিদর্শন বের হবে। যেমন— দক্ষিণ ভারতের অদ্বৈতবাদ, নেপালী-ভক্তিবাদ, তিব্বতী-চীনা তন্ত্রাচার প্রভৃতি।

অতএব আমাদের সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনায় স্ব-স্ব ধর্মমত ও দর্শন ছাড়াও উত্তর ভারতীয় এবং ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, চিন্তা ও চেতনার প্রভাব ছিল এবং তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর স্বকীয় চিন্তা-চেতনা ও ভাব-কল্পনা ছিল অব্যাহত।

AMARBOI.COM

৬

বাঙলা সাহিত্যের আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীরূপ

॥ ১ ॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক এবং বোধায়ন ধর্মসূত্র মতে আজকের বাংলাদেশে খ্রীস্টপূর্ব যুগে অবৈদিক ও অনার্য দস্যু (পুণ্ড্ররা) প্রভৃতি বাস করত। রামায়ণ-মহাভারতের কালে তথা মহাকাব্য যুগে সুহ্ম বঙ্গ আর তেমন অবজ্ঞেয় নয়–যদিও তখনো ওরা ম্লেচ্ছ মাত্র। জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রেও রাঢ়, সুহ্ম, বজ্রভূমি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও কোটিবর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ মেলে। বৌদ্ধ 'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থে সুহ্মের এবং 'মিলিন্দ পঞহো'তে রয়েছে বঙ্গের নাম। গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গসমতটে নিশ্চিত সীমা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া অভিন্ন নয়। ঊষর ও জলাভূমির পার্থক্য মাটির উৎপাদন শক্তিরও পার্থক্য ঘটিয়েছে।

আওরঙজীব কর্তৃক ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বাবধি আধুনিক বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একক শাসনে সংহত ছিল না। তাই শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভিন্ন বাঙালী সত্তা কখনো গড়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া বর্ণে ও বিত্তে বিন্যস্ত সমাজে এক অঞ্চলের লোকও সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় আত্মিক ও আর্থিক ঐক্য অনুভবের সুযোগ কখনো পায়নি। তাই জীবন ও জীবিকার, শাস্ত্র ও সমাজের, উপাদান ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপভোগের সবক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করে রেখেছিল। মাঠে ঘাটে বাটে হাটে তারা বৈষয়িক প্রয়োজনে সর্বক্ষণ একত্রিত হয়েছে, কিন্তু মিলিত হয়নি কখনো। শ্রম ও পণ্য বিনিময় করেছে, কিন্তু মন দেয়া-নেয়া করেনি। তাদের পরস্পরের নাম জানা ছিল, মুখ চেনা ছিল, কিন্তু সহানুভূতি ও প্রীতিপ্রসূত যে হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা, স্বশ্রেণী বহির্ভূত মানুষের মধ্যে তা গড়ে ওঠার উপায় ছিল না। কাজেই জীবনের, শাস্ত্রের, চিন্তার, কর্মের, স্বার্থের ও অনুভূতির কোন ক্ষেত্রেই আমরা বাঙালী নির্বিশেষের সমমর্মিতা বা সহমর্মিতা দেখিনে। এ অবস্থায় বাঙলার ও বাঙালীর বলে কোন তত্ত্ব, কোন ঐতিহ্য, কোন সম্পদ বা কোন অবদানের পরিচয় দেয়া চলে না। সবটাই শ্রেণীর, দলের, সম্প্রদায়ের বা অঞ্চলের ছাপযুক্ত। সবটাই খণ্ড ও ক্ষুদ্রের প্রতীক, সবটাই দ্বন্দ্বসংঘাতের ইঙ্গিতবাহী। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাসেও সামান্যীকৃত কোন সিদ্ধান্ত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন অবাঞ্ছিত ও অসম্ভব। তবু এক জায়গায় বাস করলে অন্যের ভাব-চিন্তা-কর্মের অনুকৃতিজাত প্রভাবও পারস্পরিক হয়। সে ক্ষেত্রেই কেবল সাধারণীকরণ সম্ভব এবং চরিত্র ক্ষেত্রে তা সুপ্রকট। আসলে সেকালে দেশ, জাতি ও রাজ্য বলতে বোঝাত রাজা, সামন্ত, শাসক ও সওদাগর। এঁদের ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য, গৌরব, গর্ব, দুঃখ, বিপর্যয়, জয়-পরাজয়ই ছিল দেশ-কাল-মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা ও গৌরব-গ্লানির প্রতীক ও প্রতিভূ। তাঁদের চোখে দাস ও বৃত্তিধারী দেশের মানুষ ছিল তাঁদেরই সুখ ও সেবার জন্যেই। তাঁরাই কেবল মানুষ। অন্যদের অস্তিত্ব রয়েছে শ্রমে-সেবায় তাঁদের অসংখ্য প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই। আজকের দিনেও উচ্চবিত্তের মানুষের এ মনোভাব বিলুপ্ত হয়নি। আজো শিক্ষিত ও শাসকরা, বেনে ও বুর্জোয়ারা দেশ বলতে দেশের মানুষ বলতে নিজেদেরই বোঝেন এবং সমাজে সরকারে নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার বলতে, নাগরিকের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ বলতে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সামগ্রীই বোঝেন। তাই সমাজে নিম্ন বর্ণের ও নিম্ন বিত্তের লোকগুলো তাঁদের কাছে গৃহগত হাতিয়ার ও প্রাণীর মতো। সেই মানুষ দাস, ভৃত্য, কর্মী ও শাসনপাত্র প্রজার ওপরে কিছু নয়। এই অবজ্ঞাই বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ দুস্তর করেছে। নইলে ব্যবহারিক জীবনে বর্ণে বর্ণে জাতে জাতে ও হিন্দু মুসলমানে একটা কেজো সহযোগিতা ও সাহচর্য ছিল। যেমন নাপিত-ধোপা-তাঁতী-তিলি-মাঝি-চাষী-মালী প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় প্রাত্যহিক ঘরোয়া সম্পর্ক রাখা যেখানে অপরিহার্য ছিল, সেখানে অস্পৃশ্যতার, অবজ্ঞার, ঔদাসীন্যের, অপ্রেমের ও বিদ্বেষের এই আন্তরিক দুস্তর ব্যবধান সম্ভব হত না। তা সত্ত্বেও হাজার হোক মানুষ তো। ব্যক্তি মানুষ তাই ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রতিবেশে মানবিক গুণের এবং উদার ও মহৎ অনুভূতির বশীভূত হয়ে পড়েই। ফলে আমরা বিভিন্ন বর্ণের, সম্প্রদায়ের ও ধর্মাবলম্বীর মধুর মিলন ও আত্মীয়তা দেখতে পাই এবং এসব দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাছাড়া স্বার্থবুদ্ধিও মানুষের মিলন ও ঐক্য ঘটায়; তখন দেশ, জাত, ধর্ম ও বর্ণ কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আঠারো শতক অবধি তার বহু দৃষ্টান্ত মেলে। অধিকন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে এদেশের যোগ-সাংখ্য-তন্ত্রবাদী অস্ট্রিক-মোঙ্গলীয় সঙ্কর মানুষের ছিল জৈন বৌদ্ধের সাম্য-সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য ও সংস্কার—যে ঐতিহ্য ও সংস্কার প্রাণী নির্বিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করে এবং করুণা, প্রীতি, মৈত্রী, সাম্য ও সহনশীলতা যার ভিত্তি।

চৈতন্যদেবের মধ্যে আমরা নতুন করে এই তত্ত্বেরই প্রকাশ দেখেছি। কাজেই বাঙলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস দ্বন্দ্ব ও মিলনের, ঘৃণার ও গ্রহণের, গ্লানির ও গরিমার, হানাহানির ও মাখামাখির। বস্তুত ১৮০১ সনের আগকার বাঙালীর ভাব-চিন্তা-কর্মের কোন সর্বজনীন রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া প্রায় অসম্ভব। মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার-উত্তর কলকাতা-কেন্দ্রী ও প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রভাবিত ভাব-চিন্তা-কর্মেই ক্রমে ক্ষেত্রবিশেষে অবিশেষ বাঙালী চেতনা ও সত্তা অবয়ব পেতে থাকে।

আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোন রূপ নেই, তেমনি মানুষের চিন্তা-চেতনা-কর্মও নিরপেক্ষ নয়। স্থান-কাল-প্রতিবেশই মানুষের ভাব-চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবন-জীবিকাই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস-প্রযত্নের উৎস। কিন্তু এই স্থান-কাল-পাত্র-প্রতিবেশের কোন অভিন্নরূপ বা স্তর নেই। শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কারো অভিন্ন নয়। কাজেই বোধ-বুদ্ধি-রুচি-সংস্কৃতি, প্রয়োজনচেতনা প্রভৃতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়ই। আমরা সাধারণভাবে শাস্ত্র সমাজ সরকার প্রভৃতির কথা বলি বটে, কিন্তু এ সবের প্রত্যেকটির প্রভাব প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও সংস্কৃতির অবস্থান ভেদে বিভিন্ন হয়। তাই সমাজে কোন ব্যক্তিক কর্মেরই সামগ্রিক প্রভাব প্রতিক্রিয়া থাকে না।

একই দেশে ও কালে রচিত হলেও শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কারের প্রভাবেই সাহিত্যের বক্তব্য ও জীবনের পরিণাম এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক শাস্ত্রশাসিত সমাজে যা সমস্যা, অন্য শাস্ত্রীয় সমাজে তা সুখকর পরিবেশ। যেমন অহিন্দু সমাজে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা চন্দ্রশেখর এবং শরৎ সাহিত্যের একটা বিরাট অংশই রচিত হতে পারত না। কেননা বিধবা বিবাহ সেখানে সমস্যাই নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে শ্যালিকা-প্রেম (দুইবোন, মালঞ্চ) বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ঘরেও ঐ প্রেম সম্ভব কিন্তু বৈধ নয় বলেই তা সাহিত্যের বিষয়গত হতে পারত না কোন মুসলিম লেখকের হাতে। অষ্টম হেনরীর স্ত্রী হত্যা কিংবা বার্ট্রান্ড রাসেলের স্ত্রী বদল অনিবার্য হয়েছে কেবল খ্রীস্টীয় শাস্ত্রের একপত্নীক ব্যবস্থার ফলেই। অতএব, শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কার শাসিত মানুষে কখনো মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ-বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই মানুষের জীবনের সমস্যার ও যন্ত্রণার, পাপবোধের ও বিবেকদংশের উৎস-জীবনের ট্র্যাজেডির কারণ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কার ভেদে বিভিন্ন। এ কারণেই জাত ধর্ম-দেশ-কাল ভেদে সাহিত্য বক্তব্যে ও জীবনদৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লাভ করে।

জ্ঞান-বিদ্যা সাহিত্য-শিল্প সমাজের উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণেরই অনুশীলনে ও প্রয়োজনে সৃষ্ট। লোক বা প্রাকৃতজন নামের নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের গণমানবের এতে অধিকার ছিল না। তেমনি শাস্ত্র শাসন সভ্যতা প্রভৃতি বিত্তবান মানুষের স্বার্থে বিত্তবান মানুষই সৃষ্টি করেছে, গণমানব কেবল শ্রম দিয়েছে এবং শাসন মেনেছে। দুনিয়ার বহুদেশে গণমানব আজো হাজার বছরের পুরোনো জীবন জীবিকা পদ্ধতির নিগড়ে আবদ্ধ। আজকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রসাদ ভোগ করছে কারা— কাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য সুখ এনেছে ঐসব আবিষ্ক্রিয়া! গণমানব এমনকি পরোক্ষেই বা তার কতটুকু প্রসাদ পায়!

রামায়ণ-মহাভারতে বিধৃত যে-জীবন, দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তা বিত্তবান একশ্রেণীর মানুষেরই মাত্র। কালিদাসের রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক কারা? তেমনি গীতগোবিন্দ যে-শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করত, জীমূতবাহনের স্মৃতি কিংবা বল্লাল সেনের দান-সাগর ও অদ্ভুতসাগর তাদের জন্যে ছিল না, অথবা শেখ শুভোদয়া অন্য শ্রেণীর মানুষের জন্যে রচিত কিংবা পবনদূতের পাঠক ছিল অন্যরুচির এবং সবটাই ছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষের জন্যে। এ ভাবে দেখলে জাতীয় ঐতিহ্য বলে অভিহিত এবং সভ্যতা বলে চিহ্নিত ও আলোচিত অতীতের শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, শাস্ত্র, সমাজ, রাজা-রাজ্য বিগ্রহ-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলোর সঙ্গে গণমানবের কোন যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এদের ঘর্মের প্রসূন, রক্তের ফসল থেকেই গড়ে উঠেছে সবকিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেরই শ্রমলব্ধ উদ্বৃত্ত সম্পদে ভাগ বসিয়ে অবসরভোগী শ্রেণী হয়েছে রাজা উজির শিল্পী সাহিত্যিক স্থপতি দার্শনিক সমাজপতি শাস্ত্রবিদ রাজ্যপতি। যে গণমানব ক্ষুণ্নিবৃত্তির ধাক্কায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অপচয় করে মরে গেল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যারা—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার–
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি;
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে–কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া—

বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস, মন্দির-মসজিদ-দুর্গ, রাজকীয় জয়-পরাজয় তাদের জীবনে কি দিল? দশ কোটি নিরক্ষর মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্য থাকা না-থাকা সমান নয় কি? অথচ নির্বিশেষ মানুষের কাছে অন্নই আনন্দের উৎস। জীবমাত্রেই পেটের চাহিদা পূরণে প্রয়াসী। এটিই জীবনের ভিত্তি। আশ্চর্য, জীব-জগতে অনাহারে মৃত্যু প্রায় অসম্ভব; আর মনুষ্যজগতে তাই চিরন্তন সমস্যা। কাজেই শাসক-শোষক শ্রেণীর কৃতিকীর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-আরামকে দেশ, জাতি ও মানুষের নামে চালিয়ে দেওয়া শুধু অমানবিক নির্মমতা নয়, সত্যেরও অপলাপ।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

আমরা যে-সাহিত্যের ইতিকথা রচনা ও পাঠ করতে চাই, সে সাহিত্য সব বাঙালীর সম্পদ নয়। এ সাহিত্যে রয়েছে শ্রেণীর রূপ, রয়েছে আঞ্চলিক রূপ, রয়েছে সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক রূপ।

সেকালের বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে গ্রামীণ কৃষি ও কুটির শিল্প নির্ভর জীবনে ভাগ্যান্বেষণে গণমানবের অঞ্চলান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন কিংবা সুযোগ সহজে হত না। এ যুগের মতো সেকালে যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হয়নি, পুরোনো হাতিয়ার নিয়ে হাতেই করতে হত কাজ। কাজেই কোন পেশায় বেকার সমস্যা ছিল না। বিনিময়ের মাধ্যমে মিলত শ্রম ও পণ্য। মুদ্রার প্রয়োজন আজকের মতো এমন গুরুতর হয়ে ওঠেনি তখনো; যদিও শাসক-সওদাগর ব্যতীত অন্য শ্রেণীর মানুষের আর্থিক জীবন থাকত দৈন্যক্লিষ্ট এবং পরিবর্তনবিরল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদনে উপভোগে বিপর্যয় ঘটত ঘন ঘন, কিন্তু অভাবিত সৌভাগ্য ছিল অজ্ঞাত। তাছাড়া যানবাহনের অভাব ছিল, তাই বড় বেনে, উচ্চ রাজ কর্মচারী ও সৈনিক ব্যতীত অন্যদের জীবন ছিল অঞ্চলের সীমায় সংকীর্ণ ও সীমিত। ফলে শাস্ত্র-সমাজ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ছিল আঞ্চলিক রূপ ও প্রয়োগ। এমনকি ইষ্টদেবতার পূজা-প্রতিষ্ঠার কাহিনীর, প্রবাদ-প্রবচন-কিংবদন্তির ও কথা-কাহিনীর উদ্ভব এবং প্রচার-প্রসারও ছিল আঞ্চলিক। এ কারণেই এবং বুলির ভিন্নতা ছিল বলেই লোকসাহিত্য ও লোকায়ত বিশ্বাস ও রীতিনীতি চিরকালই অঞ্চলের সীমানায় ছিল নিবদ্ধ।

আমাদের লিখিত সাহিত্যেও এই আঞ্চলিকতা ছিল প্রবল। তাই ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চল কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। চণ্ডীমঙ্গলও রাঢ় অঞ্চলের। মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বৈষ্ণব পদাবলী পশ্চিম বঙ্গেই সৃষ্ট। গাথার বিকাশ ময়মনসিংহে, সিলেটে, কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে ও চট্টগ্রামে। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রভাব-প্রসার দক্ষিণবঙ্গে তথা সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্নবঙ্গে ও দক্ষিণ রাঢ়ে।

আবার হিন্দুর ও মুসলমানের সাহিত্যও ছিল পৃথক। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও দেব-পাঁচালীর রচক হিন্দু। ইসলামী শাস্ত্রের রচয়িতারা মুসলমান। প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন মুখ্যত মুসলমানেরা। আঠারো উনিশ শতকে কয়েকজন হিন্দুও রোমান্স রচনায় হাত দেন। অবৈষ্ণবে বৈষ্ণবপদ, দর্শন ও চরিতগ্রন্থ রচনা করেন নি। তেমনি অশাক্ত রচনা করেন নি শাক্তপদ। অবশ্য ক্বচিৎ ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। সহজিয়া পদ রচনা করেছেন সহজিয়া বৈষ্ণবরা। বাউলপদ রচনা করেছেন বাউলেরা। ঢাকা, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রামে বাউল ছিল না, বাউলের প্রভাবও পড়েনি কখনো। কলকাতা বন্দরের আধা-বাঙালী মুসলমানরা আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকে রচনা করেছেন দোভাষী রীতিতে রোমান্স ও অন্যান্য গ্রন্থ। এ অঞ্চলের হিন্দুরা একালে রচনা করেছেন কবিগান।

অবশ্য পীর-নারায়ণ 'সত্যের' মাহাত্ম্যজ্ঞাপক দ্বন্দ্বমিলনমুখী সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান ষোল শতকের শেষ পাদ থেকেই। আবার হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার সন্ধান মেলে বেদনা-মধুর প্রণয়গাথায় ও মানবিক দুর্ভোগ দুর্ভাগ্য চিত্রণে। আরো এক ধরনের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন অনুভবে ও বিশ্বাসে মিলিত হয়েছিল তা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে। নাথ সাহিত্য ও তান্ত্রিক তত্ত্ব সাহিত্যের চর্চা করেছেন হিন্দু-মুসলমান সমান উৎসাহেই। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সাধনপন্থা পরিহার করেনি। তাই ভিন্ন নামের আবরণে সেই পুরোনো বৌদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক সাধনাই করেছে তারা এবং ঐ সাধনার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য পুষ্ট ময়নামতী মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ-হাড়ি পা-মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর স্মরণে ও অনুসরণে মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর কথকতার মাধ্যমে চালু রেখেছেন সেই গূঢ় তত্ত্ব ও সাধনা।

চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান বৈষ্ণবতত্ত্ব নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়পদ রচনা করেছেন, যদিও এগুলোতেও রয়েছে অধ্যাত্ম চেতনার আভাস। আবার তাতেও সাম্প্রদায়িক চেতনার চিহ্ন অস্পষ্ট নয়।

দেখা যাচ্ছে এদেশের শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারি ব্যাপারে নয়, শুধু বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো স্ব স্ব স্বার্থে স্ব-সামাজিক, স্ব-রাষ্ট্রিক ও স্ব-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। সাম্য ও সমাজবাদী আন্দোলন ব্যতীত এ স্বাতন্ত্র্য নির্মূল হবে না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো যথার্থ অর্থে চিরকালই অবিযুক্ত রয়েছে। আস্তিক মানুষের পক্ষে মিলিত ও মিশ্রিত হয়ে অভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তিতেই তাঁদের অস্তিত্বের স্থিতি ও নিরাপত্তা। তার প্রমাণ য়ুরোপে খ্রীস্টান ও ইহুদী ভাষায়, পোশাকে, নামে ও বাহ্যাচারে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও অভিন্ন জাতিসত্তা লাভ করেনি। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যেও এমনি দ্বান্দ্বিক স্বাতন্ত্র্য ছিল প্রকট ও প্রবল। তবু হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা পোষণ করেও সহনশীলতার, সদ্ভাবের কিংবা ঔদাসীন্যের বাহ্যাবরণে প্রতিবেশীসুলভ আবশ্যিক সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে। কাজেই সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তি হচ্ছে সদ্বুদ্ধি ও সন্ধিজাত সহিষ্ণুতা। বিরুদ্ধ মতের লোকের মধ্যে প্রীতির পরিচর্যা অবাস্তব ও অসফল প্রয়াসমাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা

॥ ১ ॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগে জন-জীবনে শাস্ত্র ও শাসকের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। শাস্ত্র ও সরকার বলতে গেলে জন-জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করত, বিশেষ করে এদেশের বর্ণে বিভক্ত তথা জীবিকায় বিভক্ত জনসমাজে শাস্ত্র ও সামন্তের দাপট ছিল প্রবল। তাই জন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বলতে গেলে সরকার প্রভাবিত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাছাড়া যখন শাসকগোষ্ঠী হত বিদেশী বিজাতি বিধর্মী ও বিভাষী, তখন দেশী ও বিদেশী সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিত, তার পরিণামে গ্রহণে-বর্জনে যে মিলনমুখী মিশ্র-সংস্কৃতির ও সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব হত– তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ত সাহিত্য-সঙ্গীত শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিদেশী বিধর্মীর সংস্পর্শে আসার ফলে এভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রথমে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় এবং তাতে দেশী মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎভাবনায় যে রূপান্তর ঘটে, তা সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্তি পায়। এই জন্যেই সাহিত্যাদির ইতিহাসে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও তজ্জাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা ও আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ প্রায় চিরকালই ছিল বিজাতি বিজিত দেশ। কাজেই বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিকথা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ-কালেও আমরা বুঝি শাসক-প্রশাসকের শাসন নীতি, নৈতিক আদর্শ ও হিত-চেতনার ধরনের ওপর নির্ভর করে জন মনের ও জন জীবনের বিকাশ বিবর্তন কিংবা অবক্ষয় ও বন্ধ্যাত্ব। কাজেই শাসকবর্গের আনুকূল্য ও বিরূপতা জন মন ও মনন তথা সামাজিক-নৈতিক-বৈষয়িক-আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে জনজীবনের সব প্রচেষ্টার মধ্যেই শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকে। আজো পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোতে তা-ই হচ্ছে। কাজেই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির পালাবদল তথা যুগান্তর-রূপান্তর ঋতুর প্রভাবের মতো প্রশাসনিক প্রভাবেরই ছাপযুক্ত।

বাঙলা সাহিত্যকে আমরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটিভাবে তিনভাগে নির্দেশ করি এবং অবচেতনভাবেই এ-বিভাগের ভিত্তি করেছি রাজনৈতিক পরিবর্তন। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমল যদিও প্রাচীনযুগ নামে চিহ্নিত কিন্তু এই চার বংশীয় রাজত্বকাল অভিন্ন নয়। গুপ্ত ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ। আবার সেনেরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের লোক, তাঁদের রাজত্বও ছিল বাঙলার সীমায় নিবদ্ধ। পালরাজত্বের শুরু ও শেষ মগধে। বাঙলার অধিকাংশ অঞ্চল যেমন তাঁদের শাসনে ছিল তেমনি বিহার উড়িষ্যা মধ্য ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশও ছিল তাদের অধিকারে। আবার গুপ্তরা ছিলেন উত্তর বিহার সংলগ্ন উত্তর প্রদেশীয়। আর মৌর্যরা ছিলেন বৌদ্ধ ও মাগধী। কাজেই ধর্মীয় গোত্রীয় ভাষিক ও দৈশিক পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন এবং তাঁদের শাসন তথা আমল অভিন্ন যুগলক্ষণে চিহ্নিত করা চলে না। অতএব হাজার বছর কাল ধরে এই চার বংশীয়ের রাজত্বকাল চলেছে এবং লঘু-গুরু যাই হোক না কেন জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্তত চারটে যুগান্তর যে হয়েছিল তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। অবশ্য এই যুগের সবটা আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়। তাই একে আমরা 'প্রাচীন যুগ'–এই সাধারণ নামে চিহ্নিত করে রাখছি। তেমনি তুর্কী বিজয়ে শুরু হয় মধ্যযুগ। পরে যখন মুঘল বিজয় ঘটে তখন মুঘল আমলকেও আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করি। যদিও তুর্কো-আফগান-মুঘল শাসনকালে আরব-ইরানী ও মধ্যএশীয় বহু জাতি উপজাতির প্রভাবে সুদীর্ঘ সাতশো বছরের সময় পরিসরে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রসার ও রূপান্তর ঘটেছে অনেক। জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবু আমরা এই সাতশো বছরের সময় পরিসরকে তুর্কীযুগ, মুঘল যুগ কিংবা আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগ বলে আখ্যাত করি। অবশ্য মানতেই হবে এর বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—তেমনি ব্রিটিশ বিজয়ে আধুনিক যুগের আরম্ভ মনে করি কিন্তু আঠারো শতকের আধুনিক যুগে আর বিশ শতকের আধুনিক যুগে পার্থক্য যে বিপুল ও বিচিত্র তা কে অস্বীকার করবে?

যা হোক শাস্ত্রিক সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যে মুখ্যত রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই প্রসূন এবং সেই তত্ত্ব বোধগত না হলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কিংবা পাঠ করা অনেকটা অসার্থক হয়, তা আমরা জানি ও মানি। সে পরিবর্তন বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীর বিজয়ে, আগমনে ও শাসনে শুরু হলে তা যুগান্তর ঘটায়। এ প্রভাব মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচারে-আচরণে-মনে মননে-পোশাকে-আসবাবে এমনকি জীবিকা পদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটায়। এমনি করে নতুন যুগে নতুন মানুষ নতুন কথা বলে। নতুন সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়, এমন কি একই বংশীয়ের শাসন আমলেও শাসকের মেজাজ-মর্জি এবং আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রকার ভেদে শাসিত জনের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাঙলার যে অংশ নন্দ, মৌর্য, সুঙ্গ ও কণ্ব বংশের শাসনে ছিল, সেই অংশে নিশ্চিতই কথ্য মাগধী প্রাকৃত, লিখিত শৌরসেনী-প্রাকৃত এবং জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি এবং উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রিক শাসনপদ্ধতি চালু হয়েছিল। এ সময় সংস্কৃত নয় বরং প্রাকৃতই যে দরবারী ভাষা ছিল, তার প্রমাণ মৌর্য যুগের বলে অনুমিত মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি। লেখ্যভাষাবিরহী অনুন্নত অস্ট্রিক গোত্রের প্রায় সব কিছুর রাহ্যত ইতি ঘটিয়ে মগধরাজ্যভুক্ত অংশের আর্যায়ন বা আর্যীকরণ এইভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে। এই বৌদ্ধ শাসকদের আমলে রাজ্যভুক্ত শাসিত জৈনদের ওপর যে পীড়ন হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোকেরই এক আদেশ সূত্রে। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্ত আমলে নিশ্চয়ই এই দেশে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সংস্কৃতি আচার-পার্বণ লক্ষণীয়রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই সাত শতকের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন প্রসঙ্গে হিউ এনৎসাঙ বৌদ্ধ বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তেমনি বৌদ্ধ পাল আমলে বৌদ্ধরা স্বধর্মীর শাসনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে তারা তখন আত্মপ্রত্যয়হারা এবং শঙ্করাচার্যের নব জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নির্জিত বৌদ্ধমতের পক্ষে মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায়–যার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এল। এই-সময়েই নিম্নবিত্তের ও সমাজবহির্ভূত বৌদ্ধরা পীড়ন ভয়ে হিন্দু সাজে আত্মগোপন করে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম রক্ষা করে। নাথযোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ও শৈব নাথপন্থীরা–সবাই ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত ঐ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ নিদর্শন বাঙলায় যেন সুপরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। আবার তুর্কী আমলে দেখতে পাই সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির রোষের ভয়ে এতো কাল যারা তাদের বিশ্বাস-সংসারে গড়া লৌকিক দেবতার কথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ঋদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজা কিংবা মাহাত্ম্য কথা নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি, তারা বিদেশী-বিধর্মী তুর্কী শাসকের প্রশ্রয়ে বা ঔদাসীন্যে কিংবা উৎসাহে ক্ষমতাবিচ্যুত সমাজপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ব স্ব ইষ্ট ও অরি দেবতার মঙ্গল-গানে মুখর করে তুলল বাঙলার পরিবেশ। আবার ব্রাহ্মণ্যমত ও ইসলামের দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রসূন মেলে উত্তর ভারতীয় সন্তমতের আদলে সৃষ্ট চৈতন্যদেবের নব বৈষ্ণবমতে। শঙ্কর-রামানুজ-মাধব-নিম্বার্ক-ভাস্কর-বল্লভ, কবির-নানক-দাদু-একলব্য-রামদাস-রামানন্দ কিংবা চৈতন্যদেবের নব প্রেমভক্তি ধর্ম বিজেতার ধর্ম ইসলামের সঙ্গে পরিচয়েরই প্রসূন। এগুলোই আবার ইসলামের প্রসারে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মুঘল বিজয়ের প্রভাবে বাঙালী মনের ও সাহিত্যের যুগান্তর লক্ষণীয়। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব, বাউল মতের প্রসার, ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব-বাহুল্য, উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা-প্রবণতা প্রভৃতি তার সাক্ষ্য। ব্রিটিশ অধিকারেও প্রতীচী-পরিচয়ের-আলো-আঁধারির যুগে-যুগসন্ধিক্ষণে নতুন বন্দরনগরী কলকাতায় পাই হিন্দুর কবিগান ও মুসলমানের দোভাষী সাহিত্য। কাজেই শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও বৈষয়িক জীবনে সবক্ষেত্রেই রাজনীতিক-প্রশাসনিক প্রভাবের গুরুত্ব ছিল সমধিক। আজও তাই আছে।

অতএব আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যুগান্তর বা রূপান্তর কিংবা বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য রাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রভাবপ্রসূত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই লৌকিক পৌরাণিক লোককাহিনীর জনপ্রিয়তা, বিধর্মী তুর্কীর প্রশ্রয়ে বা উৎসাহে শুরু হল শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপজনক কর্ম–শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ। ব্রিটিশ আমলে যেমন ধন-যশ-মান লোভী হিন্দুরা বেপরোয়া হয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে ম্লেচ্ছ-স্পর্শ-দুষ্ট হতে গৌরব বোধ করেছে, তুর্কী আমলেও তেমনি রৌরব নরকভীতি কিংবা সামাজিক নিন্দা উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণ্য কায়স্থই এগিয়ে এলেন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদে। বর্ধিষ্ণু লোকায়ত ধর্মের অনাচার থেকে স্মৃতিশাসিত পৌরাণিক ধর্মরক্ষার প্রেরণাই ছিল এর মূলে।

অতএব তুর্কী আমলের শুরুতে পাচ্ছি লৌকিক কৃষ্ণকথা, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা, নাথ-গীতি, পালগীতি প্রভৃতি। পনেরো ষোল শতকের দিকে তুর্কী প্রতিপোষণে পাচ্ছি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ। তুর্কীর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও সংঘাত মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সনাতন ধর্মের সংস্কার ও রক্ষণ প্রয়াস–রঘুনন্দন-রঘুনাথ-রামনাথ প্রভৃতির ন্যায়-স্মৃতি ইত্যাদির চর্চায়।

আর চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে পাই দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় দলে নব মত প্রচারের মাধ্যমে কাল-উদ্ভূত শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এবং এই প্রয়াসের প্রসূন হচ্ছে পদসাহিত্য, দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ, রাগ-তাল ও বাদ্যযন্ত্র, চরিতগ্রন্থ প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ। ষোল-আঠারো শতকে মুসলিম কবির প্রণয়োপাখ্যান, শাস্ত্র গ্রন্থ ও চরিত গ্রন্থাদি, গাথা-গীতিকা, পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা পীর-দেবতাদের মাহাত্ম্য কাহিনী, সতেরো-আঠারো শতকে পাই সহজিয়া বাউলের নানা উপশাখার সাধনশাস্ত্র হঠযোগগ্রন্থাদি আঠারো শতকের শেষার্ধে কোম্পানি শাসনের গোড়ার দিকে মেলে কবিগান ও দোভাষী সাহিত্য।

এই সব সাহিত্যের উদ্ভবের ও বিকাশের মূলে সমকালীন প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। কাজেই কারণ-কার্য বুঝবার জন্যেই বাঙলার রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের জানা আবশ্যিক। এ-সূত্রে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলাদেশ কিংবা ভাষিক বাঙলাদেশ ব্রিটিশ-পূর্ব কালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। কাজেই বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে বিকাশ-বিবর্তন পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসবিরল এই দেশের অতীত বহু গবেষণায়ও এখনো কায়া ধারণ করেনি। এমন কি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের অবয়ব পেয়েছে কি না সন্দেহ। কাজেই কায়ার প্রতিভাসে ছায়াই আমাদের সম্বল।

নেগ্রিটো মোঙ্গলীয় রক্ত-সঙ্কর অস্ট্রিক বাঙালী জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ-পূর্ব কালে সভ্যতার কোন্ স্তরে ছিল তা আমরা স্পষ্টভাবে জানিনে। তবে পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনটি দৃষ্টে মনে হয় একটা উন্নয়নশীল জাতি ও বিকাশমান সংস্কৃতি তাদের কোন কোন গোত্রের ছিল। মহাভারতিক পৌরাণিক (মৎস্য ও বায়ু) কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না। প্রাচীন বাঙালীর বর্ণমালা কিংবা লেখ্য ভাষা ছিল না, তাদের যোগ-সাংখ্য তন্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান থাকলেও আধুনিক অর্থে কোনো Religion যে তখন গড়ে ওঠেনি, তা জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহজ প্রসার থেকে অনুমান করা চলে। এও হয়তো সত্য যে গোত্র প্রধানের নেতৃত্বে তখনো তারা সর্দারতন্ত্রের আওতায় যৌথ জীবনযাপন করত। জৈন আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত মহাবীরের প্রতি রাঢ় অঞ্চলের লোকের আচরণ এই অনুমানের প্রবর্তনা দেয়। রাজা ও রাজ্য গড়ে উঠবার মতো সংস্কৃতি ও সভ্যতা তখনো তাদের অনায়ত্ত– তাই আর্যরা তাদের দস্যু ও পাখি বলে অবজ্ঞা করত, তাদের স্পর্শও আর্যদের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত হত। কাজেই উত্তর পশ্চিমের আর্যীকৃত অঞ্চলের তথা পাটলীপুত্রের নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কন্বরাজারা জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ কালে রাঢ়ে-পুণ্ড্রে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা যেমন কোন এক নামে পরিচিত ছিল না, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল তেমনি গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিবেশিক রীতি-নীতির পার্থক্যও ছিল। যানবাহনের অভাব স্থূল জীবনযাত্রা এবং স্থানিক ও গৌত্রিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

উত্তর ভারতের সঙ্গে শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক যোগ স্থাপিত হওয়ার পরে আমরা প্রাচীন বাঙলাকে আদি-মধ্যযুগের সীমা অবধি গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, হরিখেল, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভক্ত দেখি। তারপরে পাই গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি নামের অঞ্চল। আবার প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে কিংবা প্রসিদ্ধি অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালা, সুবর্ণবীথি, উত্তর মণ্ডল, সমতট মণ্ডল, হরিখেল, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকার নাম পাই। ঐতিহাসিককালে গ্রীক লেখক Pliny, Ptolemy এবং চীনা পর্যটক প্রভৃতির নানা উক্তিতেও বাঙলার কিছু পরিচয় মেলে। এ-সময় বাঙলা ও বাঙালীর আর্যায়ন পূর্ণতা লাভ করে এবং পুণ্ড্র বঙ্গবাসীরা তখন আর্যরূপে স্বীকৃত।

মোটামুটিভাবে আলেক্সান্দারের ভারত অভিযান কালে (৩২৬ খ্রী. পূ.) গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদ নামে গাঙ্গেয় বাঙলায় একটা রাজ্য ও প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে গ্রীক সূত্রে সংবাদ মেলে। এই সময়কার বাঙলারাজের নৌশক্তি ও গজশক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হয়তো পাটলীপুত্রের রাজারা তথা নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কন্ব বংশীয়রা রাঢ়-সুহ্ম-পুণ্ড্র শাসন করেছেন ৩১৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি গুপ্ত শাসনে ছিল বাঙলার বহু অঞ্চল। সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকে বাঙলার শাসন দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক ভৌগোলিক কিংবা ভাষিক সমগ্র বাঙলায় গুপ্ত শাসন এমন কি ইংরেজ পূর্ব যুগে মুঘল শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়রা ব্যতীত আর কোন সার্বভৌম শাসকই হয়তো বাঙালী ছিলেন না। গুপ্তরা তো নয়ই, পালেরাও বাঙালী ছিলেন কিনা নিশ্চিত প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়ের শাসনকাল সর্বসাকুল্যে ছত্রিশ বছরের বেশি হবে না। অতএব বাঙলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণভাবে চিরকালই বিদেশী শাসিত। কৃচিৎ দেশী সামন্ত স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যের সাময়িক অধিকারী ছিল।

গুপ্তরা প্রধানত পুণ্ড্রে ও গৌড়ে এবং শেষের দিকে বঙ্গেরও কিছু এলাকায় অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু রাঢ়-সুহ্মও তাদের শাসনে ছিল কিনা, থাকলেও কতকাল ছিল তা সঠিক বলা যাবে না। গুপ্ত অনুপ্রবেশের সময়ে রাঢ়ে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা যে রাজত্ব করতেন তার সাক্ষ্য মেলে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া তাম্রলিপিতে। কিন্তু এঁরা রাজপুত (যৌধপুরী) কিংবা বাঙালী সে বিষয়ে সংশয় আছে। মেহেরাউলি লিপিতে প্রাপ্ত বঙ্গবিজেতা চন্দ্র এবং এই চন্দ্র বর্মা অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে করেন। গুপ্তদের পতনকালে ছয় শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ সমতটে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন সামন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন বলে কিছু প্রমাণ মেলে। এঁরা ছাড়াও পৃথু রাজা সুধন্যাদিত্য প্রভৃতি স্বাধীন সামন্ত বা ক্ষুদ্র রাজার নাম মেলে। কাজেই সেকালের পক্ষে এই বিপুল-বিস্তৃত দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্মৃতনাম রাজা ও রাজ্য ছিল।

সাত শতকের প্রথম দশকেই কনৌজ বা বিহার থেকে আগত, গুপ্তদের মহাসামন্ত শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত নামে এক প্রবল প্রতাপ স্বাধীন গৌড়াধিপতির সাক্ষাৎ মেলে। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাঙলা এবং উড়িষ্যা বিহারের কিয়দংশে আপন আধিপত্য বিস্তার করে সম্ভবত বিহারী হয়েও বাঙালীর গৌরব-গর্বের অবলম্বন হয়ে রয়েছেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধপীড়ক। গুপ্তদের ও শশাঙ্কের শাসনকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি প্রায় বিশ বছর প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে–বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে। পূর্ববঙ্গেরও কিছু অংশ হয়তো তাঁর শাসনে ছিল। তিনি ছিলেন উত্তর-ভারতিক রাজা রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের উৎকল-মগধ অংশ হর্ষবর্ধন এবং গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণ দখল করে নেন। ভাস্কর বর্মণের পরে রাঢ়াধিপতিরূপে পাই এক জয়নাগকে। এর পরে রাঢ়-গৌড়ের প্রায় শত বছরের ইতিহাস অজ্ঞাত–এই পরই পাল রাজত্বের শুরু ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে এবং ৭৫০-এর দিকে বঙ্গে দেখি শান্তিদেব বংশীয়দের রাজত্বের শুরু। ৭২৫-এর দিকে জয়বর্ধন নামে (নেপালী?) শৈল বংশীয় এক রাজা কিছুকাল পুণ্ড্র শাসন করেন। মগধরাজ যশোবর্মণও আট শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলার কিছু অংশ জয় করে কিছুকাল শাসনে রাখেন। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কিছুকাল গৌড় রাজ্যের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। হিউএনৎ-সাঙ-এর বঙ্গ ভ্রমণকালে সমতটে ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজপরিবারের সন্তান শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। সামন্তরাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সম্ভবত এই বংশীয় ছিলেন।

নেপালী-তিব্বতী-কামরূপ-মোঙ্গলীয় (?) খড়্গ বংশীয় বৌদ্ধ খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজভট্ট সমতট শাসন করেন।

শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রজারা আসলে সামন্তরা স্ব স্ব স্বার্থে মাৎস্যন্যায়ের অবসানকল্পে এক সামন্ত গোপালকে সার্বভৌম রাজা করে আনুগত্যের স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করল। গোপাল বাঙালী ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্যে গোপালের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন। কিন্তু এই উত্তরকালীন সাক্ষ্য সংশয় ঘুচায় না–কেননা পাল রাজত্বের গোড়ার দিককার প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা পালরাজাদের অনুশাসনগুলো পাচ্ছি বাঙলা-বহির্ভূত অঞ্চলে। উড়িষ্যা ও মগধই ছিল তাঁদের রাজ্যের কেন্দ্রাংশ। তা ছাড়া গোটা আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা কখনো পালদের অধিকারে ছিল না। ধর্মপালের আমলে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অবধি তাঁর রাজ্যের বিস্তার দেখি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্রমশীল, নালন্দা, উড্ডিয়না ওদন্তপুরী প্রভৃতি ছিল পাল রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। কেবল মহাস্থানগড় ও সৌমপুরী বিহারই ছিল উত্তর বঙ্গের প্রান্তে–আজকের বাঙলার সীমায়। রাষ্ট্রকূট ও কালচুরীদের সঙ্গে তাঁদের ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক। এসব তাঁদের অবাঙালী চেতনার সাক্ষ্য দেয়। রামচরিতে পালদের ক্ষত্রিয়, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে দাস বংশোদ্ভূত এবং আবুল ফজল তাঁদের কায়স্থ বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া পাল রাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই। অতএব পালেরা বহুকাল যাবৎ বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও তাঁরা একান্তভাবে বাঙলার ও বাঙালীর শাসক ছিলেন না। পাল শাসনকালের দৈর্ঘ্য ও পালদের বৌদ্ধত্বই বাঙলার ইতিহাসে ও বাঙালীর ঐতিহ্যে পালদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। উত্তর ভারতে ও বিহারে পাল অধিকার যতই সঙ্কুচিত হয়েছে পাল রাজারা ততই বাঙালী হয়ে উঠেছেন এবং তখন থেকেই তাঁদের তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাঙলায় সুলভ হয়েছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ ও রাজচক্রবর্তী সম্রাট হচ্ছেন ধর্মপাল। খালিমপুর তাম্রশাসনসূত্রে মনে হয় গোটা উত্তর ভারত অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর বশীভূত হয়েছিল। বাদাল স্তম্ভলিপির প্রমাণে বলা চলে দেবপাল (আনু. ৮১০-৫০ খ্রী.) অন্তত কিছুকালের জন্যে কম্বোজ থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং প্রাগজ্যোতিষপুর ও পশ্চিম সাগর অবধি তাঁর শাসন বা প্রভাব ব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর পরের রাজারা–বিগ্রহ পাল ওর্ফে সুর পাল-নারায়ণ পাল-রাজ্যপাল-গোপাল (২য়)-বিগ্রহ পাল (২য়) অবধি (আনু.৮৫০-৯৮৮ খ্রী.) পালদের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের কাল। এই সময় পালরাজ্য সংকুচিত হতে থাকে। এমন কি দক্ষিণ এবং পূর্ববঙ্গও হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হরিখেলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম) কান্তিদেব এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘ বর্ষ (৮১৪-৮০ খ্রী.) উড়িষ্যার গুলকিরাজ রণস্তম্ভ, প্রতিহাররাজ ভোজদেব, কালচুরীরাজ গুণাম্বুধি দেব যশোবর্মণ প্রভৃতি দক্ষিণে, উত্তরে, রাঢ়ে, গৌড়ে, পুণ্ড্রে ও সমতটে পাল রাজ্যাংশ দখল করে নেন। কেউ কেউ রাজ্যপাল ও নয়পালকে কম্বোজীয় বঙ্গবিজেতা বলে মনে করেন। এই কম্বোজ কোচ কিংবা কম্বোজীয় বলে অনুমিত হয়। মনে হয় মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র অংশে পাল রাজ্য এই সময় সীমিত হয়ে পড়ে। আবার মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রী.) হৃতরাজ্য ও হৃদ গৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন। এর পরে আরো শতোর্ধ্ব বছর ধরে নয়পাল– বিগ্রহপাল (৩য়)–মহীপাল (২য়)–সুরপাল (২য়)–রামপাল–কুমারপাল–গোপাল (৩য়)–মদন পাল ও গোবিন্দ রাজত্ব করেন। তাঁরা প্রায় সবাই হৃতসম্পদ ও হৃতগৌরব পাল বংশের ম্লান প্রতীক।

দেবপালের পরেই পাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙতে থাকে। তখন থেকে সাধারণভাবে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে-বঙ্গে-সমতটে বিভিন্ন সামন্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চাভিলাষী রণবীরেরা ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রের কৈবর্ত ভীম-রুদ্রক-দিব্য, রাঢ়ের সেনেরা, সমতটের চন্দ্ররা, পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা এবং সমতটের চন্দ্রদের পরে দেবরা প্রধান। বরেন্দ্রের কৈবর্ত রাজ ভীম রুদ্রক দিব্য ছাড়া অন্যেরা বাঙালী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই।

প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস মূলত তাম্রশাসন ও শিলালিপি-নির্ভর-কৃচিৎ কোন রাজা সম্পর্কে গ্রন্থাদিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রশস্তিমূলক উক্তি মেলে। রামচরিত-বল্লালচরিত ব্যতীত কোন চরিতগ্রন্থ মেলে না। তাছাড়া রাজার নাম ও সন্ধি-বিগ্রহের উল্লেখ মাত্র ইতিহাস নয়; এমনকি ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালও নয়– ঝাড়বর্তিকার টুকরো কাচ মাত্র। এইখানে জনজীবন অনুপস্থিত, রাজকীয় জীবনের সাক্ষ্যও আত্মপক্ষের কিংবা সেসব অনুগ্রহজীবীরা তোয়াজের ভাষায় বর্ণিত।

তাছাড়া রাজা গুণী-জ্ঞানী-বিবেচক বা বলবীর্যবান হলেই প্রজার সুখ হবেই তেমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই। কিংবা রাজা দুর্জন-দুরাচারী-অজ্ঞ-অসমর্থ-উদাসীন হলেই প্রজা অবশ্যম্ভাবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখ-পীড়নের শিকার হবে, তাও নয়। কেননা, জনগণ থাকে স্থানীয় শাসক প্রশাসকের অধীনে, তাদের চরিত্রের ও মানবিক দোষ-গুণের ওপর মুখ্যত নির্ভর করে প্রজার জীবন-জীবিকার সুযোগ ও আপদ-সম্পদ। সেসব ইতিবৃত্ত আমাদের অনায়ত্ত। তবু কথায় বলে 'বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস মেলে', 'শিশিরেও সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়' কিংবা 'ঘটেও আকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।' আমরাও এ বিরল ও বিরান অতীতের কোন কোন বিষয় প্রমাণে-অনুমানে অনুধাবন করতে পারি।

সেনেরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় কাণাড়ী ক্ষত্রিয়। রাঢ়ে আগত সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন থেকেই এ বংশের শুরু। তাঁর পুত্র বিজয় সেন সম্ভবত প্রথম স্বাধীন রাজা (১০৯৭-১১৬০)। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনই (১১৬০-৭৮) সেন বংশের মধ্য-মণি। ইনি আধুনিক ভাষিক বাঙলাদেশ ছাড়াও বিহার উড়িষ্যার কতক অংশ স্বাধিকারে আনেন। লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০২ বা .০৬) সগৌরবে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য হারান। এর পরও পূর্ববঙ্গে সেন বংশীয় সামন্তরা কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-২০) এবং কেশব সেনের (১২২০-২৩ খ্রী.) নাম অনুশাসন সূত্রে মেলে।

সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁরা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই বাঙলাদেশে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি, বর্ণানুগ শ্রেণীবিন্যাস, পার্বণ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবিত্তের মানুষ তাঁদের হাতে পীড়িত হয়েছিল। এ কালের নাথ-যোগী (তাঁতী), ধর্ম ঠাকুরের পূজারী, সহজযানী, মীননাথ-গোরক্ষনাথপন্থী বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে শূদ্ররূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ঠাঁই করে নিয়ে আত্মরক্ষা করে। বৌদ্ধদের নির্বাণ ও সাম্যের সমাজ এ ভাবে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিণতি পায়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বের ও লাঞ্ছিতের অভিশপ্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। শূদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিম্নবিত্তের পেশাদারী শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার হরণ করা হয়। কৃত্রিম বর্ণবিন্যাসের ফলে উচ্চবিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন আভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কোন্দলও সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তাই ঘটকের রচিত কৃত্রিম বংশাবলী এবং জাতি-মালা কাচারী সতেরো শতক অবধি সমাজ ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে দেখতে পাই। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে (১৩ শতক) বাঙলায় ছিল ব্রাহ্মণ ও ছত্রিশবর্ণের শূদ্র এবং তাদের অধিকাংশ ছিল বর্ণসঙ্কর বা মিশ্ররক্তের।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও ঐ মতের সমর্থন মেলে। জৈন-বৌদ্ধ সমাজে যখন জীব নির্বিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও জীবিকার স্বাধীনতা ছিল, তখন এই নব-বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকারই অপহৃত হল। নিম্নবর্ণের বৃত্তিধারী তন্তুবায়, কর্মকার, চর্মকার, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি দরিদ্রদেরকে তথা এ দেশের মানুষকে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনেরা অপরিস্রুত অজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করতেন। তাই উত্তর ভারত থেকে তথা আর্যাবর্ত থেকে আর্যব্রাহ্মণ এনে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। গুপ্ত আমলে শাসন কার্যে জনগণেরও প্রতিনিধিত্ব থাকত; তখন ভুক্তি (প্রদেশ), বিষয় (পরগণা), মণ্ডল (জিলা), বীথি (মহকুমা) ও গ্রামে বিভক্ত ছিল প্রশাসনিক কাঠামো। প্রশাসকরা ছিলেন যথাক্রমে উপরিক, বিষয়পতি, মাণ্ডলিক, বীথিপতি ও গ্রামপতি। মহত্তর নাগরিকদের প্রতিনিধি ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী (ব্যাঙ্কার), প্রথম সার্থবাহ (বণিক), প্রথম কুলিক (শিল্পী) ও প্রথম কায়স্থ। কার্যালয়ের নাম ছিল অধিকরণ, অন্যান্য অফিসারের নাম-চৌরোদ্ধরিক, শৌল্কিক, দাশাপরাধিক, তবিট পুস্তপাল, মহাক্ষপটলিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, মহাদণ্ডনায়ক, ধর্মাধিকার, মহাপ্রতিহার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, কোষ্ঠপাল, প্রান্তপাল, অমাত্য, মহামাত্য, সেনাপতি, গূঢ় পুরুষ (গুপ্তচর), করম (সহকারী), অধ্যক্ষ, দূত, মন্ত্রপাল (মন্ত্রী) মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, যূথপতি প্রভৃতি। কিন্তু পাল-সেন আমলে শাসক-প্রশাসকরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এ ভাবেও দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বেকার গণ-অধিকার অপহৃত হয়।

মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল অবধি জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। সে বিষয় আমরা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণ্য পীড়নে বাঙলাদেশ থেকে জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। গণমানব যে দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল তাও আর্যাসপ্তশতী, সদুক্তি কর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল, চর্যাগীতি, শেক শুভোদয়া প্রভৃতি গ্রন্থসূত্রে পাই। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল অবধি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব প্রবল ছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও আচারের বহুল প্রচার সত্ত্বেও দেশের মানুষের চারিত্রিক দৌর্বল্যজাত সর্বপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্গাপূজার সময়ে, হোলি প্রভৃতি পার্বণে নৃত্য-গীতে ও আচরণে অশ্লীলতার নিদর্শন ছিল। তারও সাক্ষ্য মেলে লক্ষ্মণ সেনের আমলের সাহিত্যে এবং অন্যান্য সূত্রে। দৈবনির্ভরতা ছাড়াও রাজশক্তির বীর্যহীনতা ও জনগণের আদিরসাসক্তি ছিল। জনগণের পার্বণ দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত শারদোৎসবে কিংবা কামোৎসব অথবা বাসন্তী হোলিতে বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা ছিল প্রকট। গুপ্তরা ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, জনগণ ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন জড়বাদের সংস্কারপুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ। তার ফলেই মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী বিকৃতবৌদ্ধ মতই এখানে জনপ্রিয়তা লাভ করে লোকধর্মে পরিণত হয়। ফলে গৃহস্থের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা পান বজ্রধর ও বজ্রতারা এবং অবলৌকিতেশ্বর লোকনাথ। করুণা ও মৈত্রীর সূত্র ধরে লোকনাথকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ ভক্তিবাদ দৃঢ়মূল হয়। বজ্রনাথ আদিনাথ শিবরূপে পরবর্তীকালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা হিসেবে অভিন্নরূপ লাভ করেন—নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য তারই পরিণামপ্রসূন। আবার অন্যদিকে লোকনাথ ভক্তিবাদনির্ভর বিষ্ণুতে বিলীন হয়েছেন। যে সংস্কার রক্তের মতো মনমানসের পোষ্টা তা শাস্ত্র কিংবা শাসকের হুকুম-হুমকিতে বিলীন হয় না। ধর্ম ধমকে নিয়ন্ত্রিত হবার নয়। তাই জনগণের দেবতা চণ্ড-চণ্ডী শিব-শক্তিরূপে লৌকিকরূপ শেষাবধি রক্ষা করেছেন, বিষ্ণুও লৌকিক রাধার কৃষ্ণ হয়ে গৃহস্থের আপন দেবতা হয়ে আছেন। বৌদ্ধ যুগের লৌকিক ধর্ম, বাসলী, ক্ষেত্রপাল, গণেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। অভিজাতরা যখন সংখ্যাগুরুর লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন নিজেদের রুচি মতো এ সব দেবতার একটা তাৎপর্যময় মহত্তররূপ সমাজ মানসে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের আর্যাভিমান বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়; পুরাণ এ উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই সব দেবতারই দুইরূপ—লৌকিক ও পৌরাণিক। বৌদ্ধ দেবতা ও অপদেবতা—ধর্ম, তারা, মনসা, যক্ষ, লোকনাথ, আদিনাথ, বাসলী পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার আবরণে এ ভাবে টিকে থাকলেন। যদিও সুপরিকল্পিতভাবেই যেন বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল বাঙলাদেশ থেকে সেন আমলে। তবুও বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র দেহতত্ত্ব স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখল। নামান্তরে এবং ক্বচিৎ রূপান্তরের লৌকিক বৌদ্ধ দেবতা ও সংস্কার চিরকালের জন্যে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। তুর্কী বিজয়ে স্ব স্ব গণমানব তখন পূর্ণ উদ্যমে লৌকিক দেবতার মহিমা-মাহাত্ম্য গানে-গাথায়-পাঁচালীতে প্রচার শুরু করে। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ও লিখিত সাহিত্যের এভাবে আরম্ভ। কাজেই আমাদের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রাচীন অস্ট্রিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোঙ্গলীয় সাংখ্যযোগ-তন্ত্রভিত্তিক দেবতা ও তত্ত্ব, জীবন-চেতনা, জগৎভাবনা ও আচার-পার্বণ বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য আবরণে স্থানিক ও কালিক রূপান্তরে আজো বিদ্যমান। তাই বাঙলা সাহিত্য আলোচনায় বৌদ্ধ প্রভাব ও তার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সে-পথের পথিকৃৎ।

॥ ২ ॥

১২০২ বা ১২০৪ অথবা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খালজী নদীয়া-লক্ষ্মণাবতী জয় করেন। পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এবং পূর্ববঙ্গ অনেককাল তুর্কী শাসনের বাইরে থেকে যায়। এই তুর্কী বিজয় ও শাসন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের অনেক অভিযোগ। তেরো-চৌদ্দ শতকে এবং পনেরো শতকের মাঝামাঝি কাল অবধি অর্থাৎ মাহমুদশাহী রাজত্বের পূর্বাবধি তুর্কীর নির্যাতনে বাঙালীরা নাকি এমনি ত্রাস ও শঙ্কার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে যে পয়ার-ত্রিপদী রচনার মতো মানস-স্বস্তি তাদের সুদীর্ঘ আড়াইশ বছরের মধ্যে একবারও মেলে নি। অবশ্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ তথ্যের স্বীকৃতি নেই। সাহিত্যের ইতিহাসকার পরিবেশিত তত্ত্ব যে ইতিহাস-সমর্থিত নয় বরং তার বিপরীত, তা-ই দেখাবার জন্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal Vol, II থেকে বাঙলার তুর্কী শাসকদের শাসন-সম্পর্কিত ঐতিহাসিকের মন্তব্য তুলে ধরছি।

ক. খালজী আমীরদের শাসনে (১২০২-২৭ খ্রী.)

১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০২-০৭) ১২০২ কিংবা ১২০৬ সনে 'নুদিয়া' জয় করেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এদেশ জয় করেন। তাই শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইনি সামন্ততান্ত্রিক শাসন-সংস্থা গড়ে তোলেন। আর একদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গঠনমূলক কাজে যেমন যত্নবান হন, তেমনি শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। "Malik Ikhtyaruddin Muhammad devoted the next two years (1203-05) to the peaceful administration of his newly founded kingdom. He followed the usual practice of Muslim conquerors by pulling down idol temples and building mosques on their ruins, endowing Madrasa or College of Muslim learning and evincing his zeal for religion by coverting the infidels. But he was not bloodthirsty and took no delight in massacre or inflinching misery on his subjects (pp 8-9)....(He) was indeed the maker of the medieval history of Bengal—He was a born leader of men, brave to recklessness and generous to a fabulous extent." (p, 12)

২. মালিক ইজ্জুদিন মুহম্মদ শিরান খালজী (১২০৭-০৮)— এক বছরের মত রাজত্ব। Shiran was a man of extra-ordinary courage, sagacity and benevolence. (p. 15).

৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (১২০৮-১০) খ্রী.)— ইনি বিদ্রোহী আমীর আলি মর্দানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দক্ষ শাসক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (He) was the most level headed politician, steadfast in ambition, unfettered by any scruple or sentiment, possessed of the rare gift of making himself acceptable even to his prospective rivals and too clever to place all his cards on the table a minute too soon, (p. 18).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. মালিক আলি মর্দান (১২১০-১৩ খ্রী.)— এঁর ঘটনাবহুল জীবন। বিদ্রোহ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃসাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, উন্মত্ততা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির সমবায়ে ইনি বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মানুষ।

হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর হাতে সমভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। (He) was a man of undoubted ability as a soldier, but impolitical, blood-thirsty and of a murderous disposition..... Partly out of policy but mainly actuated by a feeling of vengeance against his Khilji kinsmen who had cast him out, he made the Khilji nobles suffer terribly at his hands. (p. 19).

৫. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (পুনঃ ১২১৩-২৭)— অত্যন্ত জনপ্রিয় সুশাসক। তিনি নৌবহর সৃষ্টি করেন। সম্ভবত তাঁর নৌসৈন্যেরা হিন্দু ছিল।

(Iwaz) proved one of the most popular Sultans that ever sat on the throne of Gour (p. 21) ... Iwaz built more than one Juma Mosque, other Mosques and Madrasas also arose on all sides (p. 25).... the kingdom of Lakhnawati and Bihar enjoyed uninterrupted peace for about twelve years under the vigorous and beneficient rule of Sultan Ghyasuddin Khilji till the first expedition of Sultan Shamsuddin-Iltutmish against Bengal 1225 A. D. (p. 25) Sultan Ghyasuddin's reign of about fourteen years was a prosperity for his kingdom (p. 17) Sultan Ghyasuddin in his exterior and interior graces was every inch a padishah, just, benevolent and wise (p. 28), 'বৃহৎবঙ্গে'ও (পৃ. ৬১২) এঁর উচ্ছ্বসিত তারিফ আছে। এখানেই খালজী আমীরদের শাসনের অবসান ঘটে। তারপরে শুরু হয় দিল্লী সুলতানের মামলুক (ক্রীতদাস) শাসন।

AMARBOI.COM

খ. মামলুক (গোলাম) শাসনে (১২২৭-৮২)

৬. শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২২৭-২৯)— সম্রাট ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড়ের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বছর মাত্র "অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিয়াছেন।" (বৃহৎবঙ্গ পৃ. ৬১৩)।

৭. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বল্‌খ খালজী (১২২৯-৩০) ওরফে দৌলতশাহ্ বিন মওদুদ—নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট ইলতুতমিসের সেনানীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

৮. মালিক আলাউদ্দীন জানি (১২৩১-৩২)— সম্রাট ইলতুতমিস এঁকেই গৌড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সম্রাট স্বয়ং গৌড়ে আসেন এবং অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে মালিক সাইফুদ্দীন আইবককে সুবাদারী দেন।

৯. মালিক সাইফুদ্দীন আইবক (১২৩১-৩৫)— "He possessed all the noble qualities of his race and rose to the front rank of the maliks of his age." (p. 45)

১০. মালিক ইজ্জুদিন তুঘরল তুঘান খান (১২৩৬-৪৫)— ইনি রাঢ় অঞ্চলও দখলে এনেছিলেন। ফলে, বিহার, বরেন্দ্র ও রাঢ়ের অধীশ্বর হয়ে ইনি যোগ্যতার সঙ্গে শাসনদণ্ড চালনা করেন। "He was adorned with all sorts of humanity and sagacity and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

graced with virtues and qualities and in liberality, generosity and power of winning men's heart he had no equal. (p. 46)

১১. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান (১২৪৫-৪৭)— ইনি তুঘরল তুঘান খান থেকে গৌড় জবরদখল করেন। এঁর আমলে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রের অনেকখানি দখল করে নেন। কিন্তু তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি।

১২. মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭-৫১)— ইনি আলাউদ্দীন জানির পুত্র। এঁর উপাধি ছিল মালিক-উস্-শরক্। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

১৩. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেক (১২৫২-৫৭)— ইনি তিনবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এই দিগ্বিজয়ী, সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা গৌড়, বিহার ও অযোধ্যা জয় করেন এবং কামরূপ অভিযানে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করেন।

Rushness and imperiousness were implanted in his nature and constitution; but he was a man of undoubted ability as soldier and proved a successful ruler too. p. 51)

১৪. মালিক ইজ্জুদিন বলবন উজবেকী (১২৫৭-৫৯)— জবরদখলকার। তাঁর উল্লেখ্য কোন কৃতি নেই।

১৫. মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৭-৬৫)— যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু। ইজ্জুদিন যখন 'বঙ্গ' অভিযানে ব্যস্ত তখন তিনি লখনৌতীতে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড ঘটান।

He was an impetuous and warlike man and had attained the acuse of capacity and intrepidity, (p. 55)

১৬. তাতার খান (১২৬৫-৬৮)— আরসালানের পুত্র।

Tatar Khan was a very capable ruler, renowned for his bravery, liberality, heroism and honesty. (p. 57)

১৭. শেরখান (১২৬৮-৭২)— উল্লেখ্য কৃতিহীন।

১৮. আমীন খান—উল্লেখ্য কৃতিহীন।

সহকারী সুবাদার তুঘরল খান (১২৭২-৮১)

১৯. মুঘিসুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৭২-৮১)— অল্পদিন সুবাদার আমীন খানের সহকারীরূপে থেকে গৌড়ের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন। তুঘরলের হিন্দু পাইক (পদাতিক সৈন্যবাহিনী ছিল (p. 61)। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন অসংখ্য পরিকরসহ তুঘরলকে হত্যা করেন। গৌড়ে সে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

"Tughral possessed all the characteristic virtues of Turk, indomitable will, reckless bravery, resourcefulness and boundless ambition." (p. 58) His court at Lakhnawati rivalled that of Delhi in power and magnificence and he was more popular with his people and much better served by them than Sultan Balban who was more feared than loved by his subjects—He was profuse in liberality, so the people of the city (of Delhi) who had been there, and also the inhabitants of that place (Lakhnawati) became very friendly to him. The troops and citizens having shaken off all of the Balbani chastisement, joined Tughral heart and soul. (p. 60-61).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামলুক শাসনকালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক :

"The History of this period is sickening record of internal dissensions, usurpations and murders.—Here in Bengal the political maxim gained ground that whosoever could kill or oust the reigning ruler should be acknowledged without demur as its legitimate master and Bengalees, whether Turks or Hindus remained generally indifferent to the fate of their rulers and enunciated a constitutional principle of their own that the loyality of a subject was due to the masnad (throne) and not to the person who happened to occupy it (p. 42)- Another notable feature of the history of this period was the beginning of a sort of reapprochment between the conquerors and their Hindu subjects. The exodus of upper class Hindus on a wide scale from the Muslim Territory gradually stopped and now for the first time we come across references to Hindus as a class of inhabitants in the Muslim Capital. The Muslim rulers had no internal trouble with regard to their Hindus subjects of Varendra even when the Hindus of Orissa threatened the capital with a siege. (p. 43)

গ. বলবন বংশের শাসনে (১২৮২-১৩০১)

২০. নাসিরুদ্দীন বঘরা খান (১২৮২-৯১)—কর্মকুণ্ঠ, বিলাসপ্রিয় কিন্তু হৃদয়বান সজ্জন। He was wise in counsel, weak in action and unaggressive by temperament. Though there was nothing to admire him he was a lovable and genial personality strong in human virtues. He reigned rather than ruled the kingdom of Bengal, but he enjoyed throughout the esteem of his nobles and popularity with his subjects in the land of his adoption. (p. 47).

২১. রুকুনউদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১-১৩০১)—নাসিরুদ্দীনের পুত্র। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

এবার বলবনী শাসনের ফলশ্রুতি যাচাই করা যাক : "The Balbani regime in Bengal was not only a period of expansion but one of consolidation as well. It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active peity, engergy and foresight began prosetylising on a wide scale not so much by force as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low class of Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression.[1] About of a century after the military and political conquest of Bengal, there began the process of the moral and spritual conquest of the land through the efforts of the muslim religious fraternities that now arose in every corner. By destroying temples and monasteries the muslim warriors of earlier times had only appropriated their gold and silver—the saints of Islam completed the process of conquest—moral and spititual by establishing Dargahs and khankhas deliberately on the sites of these ruined places of Hindu and Buddhist worship. (p. 69)

১. "হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম/আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"-বৃন্দাবনদাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসনে (১৩০১-২২)

২২. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-২২) — 'Shamsuddin Firoz was a ruler of exceptional ability. (p. 82) He died full of years of glory and a fame.' (p. 82)

২৩. ক. গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ—Rebellious son of Firoz Shah.
খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম শাহ
গ. বহরম খান ওর্ফে তাতার খান (১৩২২-২৮)
এখন থেকে কয়েক বছরের জন্যে গৌড় রাজ্যকে তিন অঞ্চলে ভাগ করে তিনজন শাসকের অধীনে দেয়া হয় এবং শাসকদের নিজেদের মধ্যে দখল-বেদখলের কোন্দলও চলতে থাকে।

২৪. ক. কদর খান—লখ্নৌতি-১৩২৮
খ. মালিক ইজুদ্দিন এহিয়া- সাতগাঁও-১৩২৮
গ. বহরম খান — সোনারগাঁও - ১৩২৮ (মৃত্যু ১৩৩৭)

২৫. ক. ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ - (১৩৩৮-৫০) -সোনারগাঁও।
"The lot of Hindu population in Fakhruddin's time was not very enviable for "they are muleted" says Ibn Batuta" of half of their crops and have to pay taxes over and above that." (p. 102)
খ. আলী শাহ (১৩২৮-৪২)— লখ্নৌতি
গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ—লখ্নৌতি—সাতগাঁও (১৩৪২-৫৭)— সোনারগাঁও (১৩৫০-৫৭)
ঘ. ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ (১৩৫০-৫৩)— সোনারগাঁও। ইখতিয়ারদ্দিন ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর পুত্র।

AMARBOI.COM

ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২-১৪১৩)

২৬. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্-ই শেষ অবধি গোটা গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়ে ওঠেন এবং তিনি ১৩৫৩ সন থেকেই গৌড়রাজ্যের স্বাধীন সুলতান।

২৭. সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-৮৯)— ইলিয়াস শাহ্র পুত্র। "During the long period of peace that followed Sultan Sikandar adorned his capital with many noble monuments of architecture." (p. 112).

২৮. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯) —এঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক হয়ে আছে। ইনি সিকান্দার শাহ্র পুত্র। বিদ্যাপতি এঁরই গুণ কীর্তন করেছেন।

২৯. সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪০৯-১০)— উল্লেখ্য কৃতিহীন।

৩০. শামসুদ্দীন (১৪১০-১৩)— ইনি হামজা শাহ্র পুত্র। এঁর আমল রাজা গণেশের প্রভাবের যুগ। এ সময় সম্ভবত রাজপরিবারে গৃহযুদ্ধ ঘটে।

ঙ. গণেশ ও তাঁর বংশধরদের আমলে (১৪১৪-৩২)

৩১. রাজা গণেশ (১৪১৪-১৮)— জবরদখলকার। এঁর নিন্দা-প্রশংসা দু-ই আছে। তবে সুদক্ষ শাসক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২. মহেন্দ্র দেব (১৪১৮)— রাজত্বকাল কয়েক মাস মাত্র। ইনি হিন্দু দলের দ্বারা মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন।

৩৩. যদু বা জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ—(১৪১৮-৩১)- যে সব ব্রাহ্মণ তাঁর প্রায়শ্চিত্তে অংশগ্রহণ করেও তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে নারাজ ছিল, তাদের তিনি লাঞ্ছিত করেন। মোটামুটিভাবে সুশাসক। We can well believe that the province grew in wealth and population during his peaceful reign (p. 129)

৩৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২-৩৩) ইনি জালালউদ্দীনের পুত্র। "His reign was darkened by his crimes and follies, till the nobles finding it intolerable, got him murdered through his slaves Shadi Khan and Nasir Khan in 1433 A. D." (p. 129)

চ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী আমলে (১৪৩৩-৮৬)

৩৫. নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯)

"Chosen by the people the new sovereign, who styled himself Nasiruddin Abul Muzaffar Mahmud, was able to enjoy an undisturbed and prosperous reign. He is described as a just and liberal king by whose good administration" the people, both young and old were contended and the wounds of oppression inflicted by Ahmad Shah were healed... his main interests probably lay in the arts of palace. A large number of inscriptions found all over his kingdom recording the erection of Mosques, khankas, gates, bridges and tombs, testify not only to the prevailing prosperity but also to the enthusiasm for public works and interest in the building art, which he inspired. (p. 130).

AMARBOI.COM

৩৬. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৬)-Histories praise him as "a sagacious and law-abiding sovereign in whose kingdom the soldiers and citizens alike had contentment and security." কৃত্তিবাস এঁর প্রতিপোষকতা পেয়েছিলেন।

৩৭. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-৮১)-মালাধর বসু এঁরই প্রতিপোষকতায় "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" রচনা করেন।

Nizamuddin described him as vastly learned, virtuous and an able administrator. He evidenced a special interest in the administration of justice and interested on the strict and impartial application of the law-like Alauddin, he totally prohibited the drinking of wine and frequently assisted the judges in difficult cases." (p. 136.)

৩৮. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮৭)

Fateh is stated to have been in intelligent and liberal ruler 'who maintained the usages of the past and in whose time the people enjoyed happiness and comfort.' (p. 137)

এবার এখানে ইলিয়াস শাহী রাজত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন উদ্ধৃত করছি :

The dynasty deserved well of Bengal, forwith remarkable consistency it produced a succession of able rulers. They were tolerant, enlightened administrators

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

and great builders. In shaping the economic and intellectal life of the Bengali people for nearly a century and a half; the Ilyas Shahi kings played the leading part. Tolerance was their greatest asset. To have ruled over a people of an alien faith for eight generations was in itself a great achievement, to be instated on the throne after twenty five years' exclusion by a local dynasty was an even greater one. It was a singular proof of their popularity— a popularity which rested on their past services. (p. 137).

ছ. হাবসী গোলাম আমলে (১৪৮৭-৯৩)

৩৯. সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-৯২)— প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে প্রভুপত্নীর অনুরোধে বিশ্বস্ত হাবসী-গোলাম—আমির আন্দিল 'সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ' নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন।

"He is credited with having ruled justly and efficiently. His reputation as a soldier inspired respect and awe and his attachment to the Ilyas Shahi house made the people forget his race. His kindness and benevolence evoked warm praise from the historians. (p. 139)

৪০. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়)— (১৪৯০-৯১)- এক বছর কাল রাজত্ব করার পর সিদিবদরের হাতে নিহত হন।

৪১. শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা (১৪৯১-৯৩)— রক্তপিপাসু নরদানব।

"His was a perfect reign of terror... Commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword fell equally heavily on the Hindu nobility and princes suspected on opposition to his sovereignty." (p. 140)

জ. হোসেন শাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮)

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

হোসেন শাহী শাসন সম্বন্ধে সাহিত্য ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নেই, বরং তারিফ আছে প্রচুর। কাজেই আমরা ইতিহাস আর ঘাঁটতে চাইনে।

আমরা বাঙলার ৩১৫ বছরের ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম। এ ধরনের শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্যার 'তাণ্ডবলীলা' প্রত্যক্ষ করেছেন, গোপাল হালদার দেখেছেন কেবল 'রক্ত' আর 'আগুন', আর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতাই পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা কিংবা বলপ্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৫১৯) অবধি মোট বিয়াল্লিশ জন শাসক গড়ে সাত বছর করে গৌড়রাজ্য শাসন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ স্বাধীন কেউ বা দিল্লীর সম্রাটের সুবাদার। সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসনতান্ত্রিক কানুনের অনুপস্থিতি, সিংহাসনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকারে 'দাবি' ও যোগ্যতা বিষয়ে ধর্মীয় কিংবা শাসনতান্ত্রিক বিধানের অভাব এবং অঞ্চল হিসেবে গৌড়ের প্রান্তিকতা গৌড় শাসকদের উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল হতে সহায়তা করেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিপুলতার কারণও এ-ই। তাই সুবাদার বদল হয়েছে ঘন ঘন। এতেই শাসক সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতাযুগে সুলতানেরা সাধারণত আমৃত্যু রাজত্ব করেছেন।

এঁদের মধ্যে হিন্দুপীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন : ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০৪-০৭), আলী মর্দান (১২১০-১৩), মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫), সোনারগাঁয়ের ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৫৩-৫৭), শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩)। এঁদের মোট রাজত্বকাল বিশ বছর। এই বিশ বছরই 'দুধে চনা' কিংবা দুধে গরলের মতো গোটা তুর্কী আমলকে 'রক্ত ঝরানো ও আগুন জ্বালানো' শাসনরূপে পরিচিত করেছে। সে যুগে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণ নাকি এ-ই।

আমরা জানি, তুর্কী শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেন নি, রাজ্য বিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না।[১] আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজার প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর ওপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে-নয় মাসেই পৌঁছত। সামন্তযুগে প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। এ সম্পর্কে মামলুক শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়। যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করেছিল? শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এদেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, '৪৬, ও '৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রী.) বাঙলা বিজিত হলে বটে; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্তশক্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। জাহাঙ্গীর-শাহ্‌জাহানের বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য, কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না; আবার আওরঙ্গজীবের আমলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোনো কোনো রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।[২]

---

১. এ প্রসঙ্গে Early Muslim rules in Bengal and their non-Muslim subjects (Down to A. D. 1538) by Dr. Abdul Karim, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dacca 1957 দ্রষ্টব্য।

২. "হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন/হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম/আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"-বৃন্দাবন দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) উড়িষ্যা বিজয় কালে শত্রুর আশ্রয়রূপে 'দেউল-দেহারা' ভেঙে বাঙলার হিন্দু মনেও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-শাসনে তাঁর দক্ষতা ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রজাহিতৈষণা এবং তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে শীঘ্রই লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রখ্যাত করে। তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহ কিংবা তাঁর পৌত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তাঁর অপর পুত্র আবদুল বদর ওর্ফে গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ-প্রজাপীড়ক বলে এঁদের কারুর নিন্দা ছিল না। হোসেন শাহ্‌র চট্টগ্রামস্থ লস্কর পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর প্রতিপোষক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র (১৫৩৮-৩৯) হুমায়ুন ও শের শাহ্‌র হাতে রাজ্য হারানোর সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলার স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান ঘটে। শের শাহ, তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ও অক্ষম বংশধরগণ ১৫৫৮ অবধি প্রায় বিশ বছর বাঙলাদেশ শাসন করেন। দিল্লী-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন এভাবেই পুনরারম্ভ হয়। ১৫৫৮ থেকে ১৫৭৫ অবধি উড়িষ্যার সোলেমান কর্‌রানী ও তাঁর পুত্র দাউদ খান কর্‌রানী স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করেন। শের শাহী কিংবা কর্‌রানী শাসন ছিল আফগানী বা পাঠান শাসন।

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর বাঙলাদেশ জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই জয় সম্ভব হলেও বাস্তবক্ষেত্রে বাঙলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বিয়াল্লিশ বছর লেগেছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬১৭ সন অবধি মুঘলদের সঙ্গে পাঠান শক্তি ও ভুঁইয়া নামের স্থানীয় সামন্তদের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যুদ্ধ করে করে ক্রমে ক্রমে ভুঁইয়াদের স্বতন্ত্রভাবে পরাজিত ও বশীভূত করে বাঙলাদেশে মুঘল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই দ্বন্দ্ব কোন্দলের বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রকম অরাজকতাই চলেছিল। জনসাধারণ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীদের তথাকথিত দ্বৈত শাসনে। বিদ্রোহী ভুঁইয়ারা এবং মুঘল-প্রশাসকরা উভয় পক্ষেই রাজস্ব আদায় করত। অবস্থাটা ছিল এরূপ : দুই পক্ষই শাসন এবং শোষণের দাবিদার ছিল, কিন্তু পালন-পোষণের দায়িত্ব স্বীকার করত না। অবশেষে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের আমলে বাঙলাদেশ মুঘলের করতলগত হয়। কিন্তু তখন বাঙলাদেশ লুণ্ঠনের আরো এক ভাগীদার জুটে গেছে–হার্মাদদের উপকূলাঞ্চল লুণ্ঠন শুরু হয়ে গেছে। শাহজাহানের আমলে আরো এক পক্ষ প্রবল হয়ে উঠল। এ-ভাবেই মুঘল শাসক মগ-হার্মাদ লুটেরা এবং য়ুরোপীয় বেনেরা বাঙলাদেশে অবাধে শোষণ, লুণ্ঠন ও ব্যবসা মাধ্যমে স্বাধীন-সুলতানী যুগের বাঙলার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে নিল। আওরঙজীবের আমলেও বাঙালীর জীবনের দুর্ভোগ-দুর্দশা ক্রমাবনতি লাভ করতে থাকে। এর মধ্যে শাহজাহানের বিদ্রোহ-কালে, মীর জুমলা-শায়েস্তা খাঁর আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযানকালে বাঙলাদেশকে বহন করতে হয় যুদ্ধের ব্যয়। দিল্লী সাত সমুদ্রের না হলেও তেরো নদীর ওপারে তো বটেই। তাই স্বাধীন সুলতানী আমল অবসানের (১৫৩৮) পর থেকে বাঙলাদেশ আর কখনো দেশের ধন দেশে রাখতে পারে নি। বস্তুত ১৯৭২-এর আগে বিগত চারশো তিরিশ বছর ধরে এখনকার বাঙলাদেশ রাষ্ট্র ছিল বিদেশী শোষিত।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙজীবের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব-কোন্দলের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—সেই দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের সুবাদারগণ প্রবল হয়ে ওঠে। অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবং অন্যেরাও প্রকৃতপক্ষে নামে মাত্র দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনভাবে নওয়াবী করতে থাকে। বাঙলায় মুর্শিদ কুলি খাঁ এক রকম স্বাধীনভাবেই ১৭১২ থেকে ১৭২৭ সন অবধি প্রতাপে 'সুবেহ বাঙ্গালা' শাসন করেন। রাজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদায়ের সুবিধার জন্যে তিনি দেশব্যাপী যে মধ্যস্বত্বভোগী এজেন্ট নিয়োগ করেন, তারাই উত্তরকালে তালুকদার, তরফদার-জোতদার নামে প্রজাশোষক মধ্যস্বত্বভোগী নতুন শ্রেণীরূপে দেখা দেয়। এবং ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিদ্র ধরে জমির প্রকৃত মালিক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক শ্রেণী ভূমিদাসে পরিণত হয়।

মুর্শিদ কুলি খাঁর পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন ও দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ এবং তারপরে আলিবর্দী খাঁ বাঙলার মসনদে বসেন। কিন্তু ১৭২৭ থেকে ১৭৫৭ অবধি এই কাল-পরিসর ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল। সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর গিরিয়ার যুদ্ধ এবং মীর জাফরের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফলগত। আলিবর্দী ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান শাসক। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়-পরাজয়ে টিকে ছিলেন। মীর জাফর ছিলেন নির্বোধ ও ভীরু, তাই তাঁর পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। আর মীর কাসিম স্বাধীনতাকামী সাহসী ও বুদ্ধিমান হলেও বিশ্বাসঘাতক এবং জমিদার ও মহাজন-পীড়ক হিসেবে সাধারণের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরও পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আমরা তুর্কী-মুঘল শাসকদের প্রায় নামসার কিন্তু ধারাবাহিক পরিচয় নেবার প্রয়াস পেলাম। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এই ধারা-বর্ণনার গুরুত্ব অতি সামান্য। আমাদের প্রয়োজন তিনটি তত্ত্বে—আর্থিক, ধার্মিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লোক-জীবনে শাসক-প্রশাসনের নীতি-আদর্শের প্রভাব।

আর্থিক ক্ষেত্রে ১২০২/৬ থেকে ১৩৩৮ অবধি দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসন-শোষণ কিভাবে চলতো তার স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে প্রমাণে-অনুমানে বুঝা যায়, তখন ক্ষমতার লড়াই যত প্রবল ছিল শোষণের স্পৃহা তত তীব্র ছিল না। তাছাড়া তখনো দেশী সামন্তরাই প্রত্যক্ষভাবে প্রজা শাসন করতেন। কাজেই রাজস্ব দিল্লী পাঠানোর আগ্রহের চেয়ে সেই রাজস্বে যেন সৈন্যদল পোষণের প্রবণতাই ছিল তাঁদের বেশি। দুশো বছর ধরে বিদেশী সুলতানেরা (গণেশ ও হোসেন শাহ বংশীয়রা ছাড়া) একটানা স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করে। শাসকদের স্বদেশী মধ্য এশিয়ার কিছু লোক বড় চাকুরে হিসেবে কিছু ধন-রত্ন তখনো বিদেশে নিয়ে গেলেও রাজস্ব হিসেবে একটা কানাকড়িও এ দুশো বছর ধরে বাইরে যায় নি। কাজেই সেই যুগে নগণ্য সংখ্যক ধনী-মানী ছাড়া দেশের জনসাধারণের মোটা ভাত-কাপড়ের অনাড়ম্বর জীবনে দারিদ্র্য-দুঃখ তেমন না থাকারই কথা। অবশ্য খরা-বন্যা-ঝড়-মহামারী প্রসূত দারিদ্র্য-অনাহার-মৃত্যু প্রভৃতি বিপর্যয় এড়ানো সেকালে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুঘল আমলে মুঘলেরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসারে শাসন ও শোষণের অধিকার লাভ করেছিল, পালন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। তাছাড়া বাঙলাদেশে আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়েই মুঘলেরা চট্টগ্রামে-আসামে ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করেছে। আবার শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ সুবাদারগণ দিল্লীতে বর্ধিত হারে রাজস্ব পাঠিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। তা ছাড়া শায়েস্তা খাঁ, আজিমুশ্‌শান, ফররুখশিয়ার প্রমুখ বাঙলার অনেক সুবাদারই ব্যক্তিগতভাবে লবণ-সুপারী প্রভৃতি নানা দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা করেও বাংলাদেশের সম্পদ চিরকালের জন্যে অপহরণ করেন। শাসকেরা তো এভাবে লুণ্ঠ করেইছেন—তার ওপর মগ-হার্মাদদের ধন-জন লুণ্ঠন নদীতীরাঞ্চলে ও উপকূলাঞ্চলে আওরঙজীবের আমল পর্যন্ত এক রকম অব্যাহত ছিল। আবার মুঘল আমলে য়ুরোপীয় বেনেরা বিশেষ করে ইংরেজ-ফরাসীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বলতে গেলে সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের গোড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে গোটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য তাদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সব কারণে পনেরশো আটত্রিশে যে আর্থিক দুর্ভাগ্যের শুরু হয় সতেরশো সত্তর সনের মন্বন্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। আঠারো শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই অবক্ষয়ের চিহ্ন সত্যপীর পাঁচালীতে ও ভারতচন্দ্রের রচনায় সুপ্রকট।

দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসনের আমলে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী শাসনে স্থানীয় শাসিত সমাজে নিশ্চয়ই বিচলন এসেছিল। পরবর্তীকালে রচিত শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মায় দেখতে পাই, নির্জিত বৌদ্ধেরা বিজয়ী তুর্কীদের মুক্তি-দূতরূপে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সেন আমলে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বাঙলাদেশে যে কোনকালে বৌদ্ধ শাস্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল তা অনুমান করবার মতো কোন নির্দেশনাদি ছিল না। কিন্তু গায়ের ওপর জোর খাটে, মনের ওপর খাটে না। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার জনগণের ওপর ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতি-নীতি জোর করে চাপিয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তারা পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারই লালন করতো। তুর্কী বিজয়ের ফলে বিদেশী রাজশক্তির প্রশ্রয়ে সমাজপতির শাস্তির ভয়মুক্ত হয়ে তারা তাদের লালিত পূর্ব বিশ্বাস-সংস্কার নতুন করে সগৌরবে ও অত্যুৎসাহে প্রকাশ করতে লাগল। তার ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ দেব-দেবী স্বনামে ও বেনামে যথা—তারা, বাসুলী, যক্ষ, বিষ্ণু, আদিনাথ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি ঘট, পাথর ও মূর্তির মাধ্যমে পূজা পেতে থাকেন। আনুষঙ্গিকভাবে এঁদের মাহাত্ম্য-কথা আসরে-অনুষ্ঠানে গান-গাথা-পাঁচালী-কথকতার মাধ্যমে চালু হতে থাকে। উচ্চবিত্তের সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জনগণের এই লোকায়ত ধর্মের কাছে হার মানল। লোকধর্মই বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধর্মের ঠাঁই গ্রহণ করল এবং স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষের দিকে ঐ-সব দেব-কথা বিপুল কলেবরে পাঁচালী-কাব্যে পরিণতি পায়। এ-ভাবে ষোল-সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশী লৌকিক দেবতা বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ-সময়েই বিদেশী-বিভাষী বিধর্মীর প্রভাবে দেশী মানুষের চেতনায় যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তারই প্রমূর্ত রূপ মেলে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে। জৈন-বৌদ্ধ সাম্য-করুণা-মৈত্রীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশে ইসলামী সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনুকূল পরিবেশে। চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশীর ভাব সমন্বয়ের প্রসূন। দেশী নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে লৌকিক ইসলাম গড়ে তুলল। বিভাষায় রচিত বিদেশী ইসলামী শাস্ত্রে তাদের অনধিকার এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ও লালিত অনপনেয় বিশ্বাস-সংস্কার এই লৌকিক ইসলাম সৃজনে স্বাভাবিক প্রবর্তনা দিয়েছে। এই ইসলাম ছিল মূলত পীর বা গুরুবাদী ইসলাম। তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক পীরতত্ত্বে, অলৌকিক কেরামতিতে, বৌদ্ধ-স্তূপের আদলে পরিকল্পিত দরগাহ পূজায়, জল-দেবতা খাজা খিজিরের প্রতি অবিচল আস্থায় ও মানৎ-সিন্নি-তাবিজ-কবচ ঝাড়-ফুঁকে এই ইসলাম ছিল সীমিত। আবার বাঙলাদেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী আফগান-মুঘলের করতলগত হল তখন আর্থিক জীবনের অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবীরূপেই শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করল। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক বিপর্যয় বা অবক্ষয় প্রশাসনিক ঔদাসীন্য বা পীড়নেরই ফল। দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষকের হাতে পড়ে, তখন আর্থিক জীবনে যে অবক্ষয় দেখা দেয়, আত্মপ্রত্যয়হীন নির্বোধ অসহায় মানুষ বাঁচবার তাগিদেই সে অবস্থায় অলৌকিক শক্তিরই আশ্রয় কামনা করে। বাঙলাদেশে এই আর্থিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপর্যয়কালে–ষোল শতকের শেষ পাদ থেকে পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা পীর-উপদেবতাগণ নির্জিত বাঙালীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অবলম্বন দেবতা হিসেবে উদ্ভাবিত হলেন। এ ক্ষেত্রে নির্জিত মানুষ হিসেবে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর একই আদর্শে, উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে মিলন ঘটেছিল। গীতা-স্মৃতি ও মন্দিরে আস্থা হারিয়ে হিন্দুরা এবং মসজিদে আস্থা হারিয়ে মুসলমানেরা পীর-দেবতার অনুগ্রহে বাঁচবার প্রয়াসী হল। বাঙালীর সেই দুর্দিন-দুর্যোগ-দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে সত্যনারায়ণের পুঁথি, পীরমাহাত্ম্য কথা ও উপদেবতা পাঁচালী। বাঙালীর শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকৃতি এই সব গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল অবধি শাসকরূপে যাঁদের নাম ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে ছকে তাঁদের 'পীঠিকা' দেয়া হল :

[বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সন তারিখের পার্থক্য লক্ষণীয়।] শিশুনাগ বংশ, নন্দবংশ, সুঙ্গবংশ, কম্ববংশ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকার একালের বাঙলার সীমান্ত অঞ্চলে কতটুকু ছিল কিংবা আদৌ ছিল কি-না তা ইতিহাস বলতে পারে না। উল্লেখ্য যে, রাঢ় অঞ্চলে উৎখননের ফলে জানা যাচ্ছে যে একালের বর্ধমান বিভাগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সভ্যভব্য সমাজ খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ-চার শতকেও বাস করত। জাতকসূত্রেও এ অঞ্চলের রাজার ও সমাজের সংবাদ মেলে। উত্তরবঙ্গ চিরকালই পাটলিপুত্র শাসনে ছিল বলে আমাদের অনুমান। আজকের বরেন্দ্র অঞ্চল বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অংশ সর্বপ্রকারে কিন্তু পালেরা যে বাঙলার বরেন্দ্র অঞ্চলেই কেবল মহাস্থানগড় বা সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পশ্চিম-পূর্ববঙ্গে যে তাদের কোন কৃতি-কীর্তি নেই এবং দ্বিতীয় মহীপালই স্বল্পকালের জন্যে কুমিল্লা অবধি যে জয় করেছিলেন, ইতিহাসে নয়, বাস্তবেও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। বরেন্দ্র অঞ্চলে উদ্ভূত বলেই গোপাল বংশ বাঙালীর অকারণে গৌরব গর্বের অবলম্বন হয়েছে। তবু পাটলিপুত্র কেন্দ্রী রাজবংশ দিয়েই আমরা আমাদের ইতিবৃত্তান্ত শুরু করি। কারণ জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ওই অঞ্চলে, গুপ্তরাও এসেছিলেন কনৌজ বা বিহার থেকেই।

শিশুনাগবংশ
নন্দবংশ
সুঙ্গবংশ
কম্ববংশ
মৌর্যবংশ [ময়ূর ছিল যাঁদের ট্যাবু-টোটেম]

চন্দ্রগুপ্ত-বিন্দুসার-অশোক [রাঢ়-বরেন্দ্র প্রভৃতির অধিপতি]-বিম্বিসার-অজাতশত্রু। এ সঙ্গে আমাদের গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদি রাজ্যের অস্তিত্বও স্মর্তব্য।

গুপ্তবংশ [আনু ৩২০-৬০০ খ্রী.]
শ্রীগুপ্ত
চন্দ্রগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত [কবি কালিদাস এঁর আমলের কবি]
চন্দ্রগুপ্ত (২য়)
কুমারগুপ্ত
স্কন্দগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দামোদর গুপ্ত
কুমারগুপ্ত (২য়)
মহাসেন গুপ্ত

সম্ভবত গুপ্তশাসন উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়ায় ছিল নিবদ্ধ। তাই এসব অঞ্চলেই মেলে গুপ্তদের তাম্রপট্টলিপি। এ সময়ে প্রাশাসনিক বিভাগের ও প্রশাসকের নাম ছিল সম্ভবত

বিভাগ	প্রশাসক
ভুক্তি	উপরিক
বিষয়	বিষয়পতি
এরপরে বিথী,	মণ্ডল চৌকী

অধিষ্ঠানাধিকরণের বা শাসন পরিষদ সদস্যরা ছিলেন

১. নগরশ্রেষ্ঠী
২. প্রথম সার্থবাহ
৩. প্রথম কুলিক
৪. জ্যেষ্ঠ কায়স্থ
রেকর্ড কিপার পুস্তপাল।

গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে রাঢ় অঞ্চলের স্বাধীনরাজা ছিলেন সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্র বর্মা [বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতলিপি] এবং নাগদত্ত [এলাহাবাদ লিপি]

বাঙলার স্বাধীন ও সামন্ত শাসক [ষষ্ঠ শতক]

১. গোপচন্দ্র [আনু : ৫০০-৩৩ খ্রী.]
২. ধর্মাদিত্য [আনু : ৫৩৩-৩৬ খ্রী.]
৩. সমাচার দেব [দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের রাজা, আনু. ৫৩৬-৫০ খ্রী.]

সম্ভবত এ তিনজন রাজারই উদ্ভবক্ষেত্র বা রাজধানী ছিল ফরিদপুর অঞ্চল। কোটিলাপাড়ায় প্রাপ্ত পাঁচখানি, মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি ও বিদ্যার জয়রামপুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন সূত্রে লব্ধ তথ্যই এ অনুমানের উৎস ও ভিত্তি।

৪. বন্যগুপ্ত [সমতট রাজ্য, রাজধানী শ্রীপুর, ৫০৭ খ্রী.]
৫. সুধন্যাদিত্য
৬. পৃথুবীর
বাঙালী রাজা : শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) আনু. ৬০৫-৩৫ খ্রী.)
[গৌড়-মগধ-দণ্ডভুক্তি-উৎকল অধিপতি]

গৌড়

ভাস্কর বর্ধন (৬ষ্ঠ শতক)	সামন্ত (কুমিল্লার) সামন্ত রাজবংশ (৭ম শতক)
জয়নাগ (৫৫০-৬৫০)	শ্রী জীব ধারণ রাজ
	|
যশোবর্ধন (৭২৫-৩৫)	শ্রীধারণ রাজ
	ত্রিপুরার সামন্ত লোকনাথ (৬৩৬-০৪ খ্রী. — তাম্রশাসন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমতট : আনু. ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ—আনু. ৬৫০-৭০০ খ্রী.

খড়্গোদ্যম
|
জাত খড়্গ
|
দেবখড়্গ
|
রাজারাজ ভট্ট (৭ম শতকের শেষের দিকের চীনা পরিব্রাজক সেঙ-চি কর্তৃক উল্লেখিত)

সমতটের দেববংশীয় রাজা : আনু. ৭৫০-৮০০ খ্রী.

১. শান্তি দেব
|
২. বীর দেব
|
৩. আনন্দ দেব
|
৪. ভব দেব
|
৫. কান্তি দেব

AMARBOI.COM

পাল বংশ	সিংহাসনারোহণ	আনুমানিক রাজত্বকাল
১. গোপাল	৭৫৫ খ্রীস্টাব্দ	৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত
২. ধর্মপাল (বিরুদ বিক্রমশীল)	৭৮১ ,,	৮২১ ,, ,,
৩. দেবপাল	৮২১ ,,	৮৬১ ,, ,,
৪. বিগ্রহ পাল ওর্ফে শূর পাল [ধর্মপালের ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র, জয়পালের পুত্র]	৮৬১ ,,	৮৭৬ ,, ,,
৫. নারায়ণ পাল	৮৭৬ ,,	৯২০ ,, ,,
৬. রাজ্যপাল [মগধ, বরেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতি]	৯২০ ,,	৯৬২ ,, ,,
৭. গোপাল (দ্বিতীয়)	৯৬২ ,,	৯৬৯ ,, ,,
৮. বিগ্রহ পাল (২য়) [হৃতরাজ্য]	৯৬৯ ,,	৯৯৫ ,, ,,
৯. মহীপাল [পাল রাজত্বের নব প্রতিষ্ঠাতা]	৯৯৫ ,,	১০৪৩ ,, ,,
১০. নয় পাল	১০৪৩ ,,	১০৫৮ ,, ,,
১১. বিগ্রহ পাল (৩য়)	১০৫৮ ,,	১০৭৫ ,, ,,
১২. মহীপাল (২য়)	১০৭৫ ,,	১০৮০ ,, ,,
১৩. শূরপাল (২য়)	১০৮০ ,,	১০৮২ ,, ,,
১৪. রামপাল	১০৮২ ,,	১১২৪ ,, ,,
১৫. কুমার পাল	১১২৪ ,,	১১২৯ ,, ,,
১৬. গোপাল (৩য়)	১১২৯ ,,	১১৪৩ ,, ,,
১৭. মদনপাল	১১৪৩ ,,	১১৬১ ,, ,,
১৮. গোবিন্দপাল	১১৬২ ,,	?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরেন্দ্র কৈবর্ত : আনু. ১১০০-২০ খ্রী. রাঢ়ে : ১১ শতকের শেষ ভাগ) দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে) স্বাধীন ঈশ্বর ঘোষ, রাজধানী-ঢেক্কারী পুত্র সোম ঘোষ- ঐ –

ক. দিব্য [মহীপালের আমলে দ্রোহী ও স্বাধীন]
খ. রুদ্রক
গ. ভীম [রামপালের কাছে পরাজিত]

হরিকেল রাজা : আনু. ৮০১-৯০০ =পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম

১. ভদ্র দত্ত
২. ধন দত্ত
৩. কান্তি দেব (৯ম শতকের ১ম পাদ, সম্ভবত ভবদেবের দৌহিত্র)

সমতটের চন্দ্র বংশ :

আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবত মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে। সমতট অঞ্চলে হয় ঐ বিতাড়িত চন্দ্ররা কিংবা তাঁদের জ্ঞাতি সামন্তশাসক বংশীয়রা রাজত্ব করেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের রাজপরম্পরার 'পীঠিকা' দেয়া হল :

AMARBOI.COM

চন্দ্র বংশ : ৮০০-১০৭০ খ্রীস্টাব্দ	
রাজা :	রাজত্বকাল
১. পূর্ণ চন্দ্র	৮০০-৮৪০ খ্রীস্টাব্দ সামন্ত (?) রাজ
২. সুবর্ণ চন্দ্র	৮৪০-৯০০ ,,
৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র	৯০০-৯৩০ ,,
৪. শ্রীচন্দ্র	৯৩০-৯৭৫ ,,
৫. কল্যাণ চন্দ্র	৯৭৫-১০০০ ,,
৬. লড়হ চন্দ্র	১০০০-১০২০ ,,
৭. গোবিন্দ চন্দ্র	১০২০-১০৪৫ ,,
৮. ললিত চন্দ্র	১০৪৫-১০৭০ ,,

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজত্ব : ১০৮০-১১৫০ খ্রীস্টাব্দ (?)

১. বজ্র বর্মণ
২. জাত বর্মণ [কৈবর্তরাজ দিব্যর সমসাময়িক]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. হরি বর্মণ
|
৪. শ্যামল বর্মণ (১০৭৯ খ্রী. ?)
|
৫. ভোজ বর্মণ

সেনবংশ : ১০৭০-১২০২ খ্রীস্টাব্দ

কান্দিরাজবাড়ীর কারিকায় আছে : বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারীগণ প্রতি নির্যাতন কৈল।

১. সামন্ত সেন
২. হেমন্ত সেন (১০৭০-১০৯৭)
৩. বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০)
৪. বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮)

আনন্দভট্ট বল্লালচরিতে বলেন : বল্লাল নিঃসন্দেহে একজন জারজ, অনিষ্টকারী, দুষ্টপ্রকৃতির রাজা ছিলেন। বিষহ্নসেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লাল সেন রাজা [সম্বন্ধনির্ণয় পৃ. ২০৮]

পূর্ববঙ্গের ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসক

৬. বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০) লক্ষ্মণ সেনের পুত্র
৭. কেশব সেন (১২২০-২৩)
৮. অন্য রাজারা (১২২৩-৪৬)

পূর্ববঙ্গের দেববংশ : আনু. ১১৬০-১২৯০ খ্রী.

১. পুরুষোত্তম দেব
|
২. মধুমথন (সূদন) দেব (১১৬০-১১৮০)
|
৩. বাসুদেব (১১৮০-১২০৪)
|
৪. রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব (১২০৪-১২৩০)
|
৫. দামোদর দেব (১২৩০-১২৫৪)
|
৬. অরিরাজ দনুজ মাধব দশরথ দেব (১২৫৪-১২৯০ রাজধানী—বিক্রমপুর)

শ্রীহট্টে দেব বংশীয় রাজাগণ (১২৯০-১৩২০)

১. খরবাণ দেব
|
২. গোকুল দেব
|
৩. নারায়ণ দেব
|
৪. কেশব দেব
|
৫. ঈশান দেব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগ : তুর্কী বিজয়

তুর্কী বিজয়ের ফলে দেশে যুগান্তর ঘটে, যেমন ঘটেছিল ব্রিটিশ বিজয়ের সঙ্গে। এর নাম মধ্যযুগ।

ক. খালজী শাসন-১২০২-১২২৭ খ্রীস্টাব্দ

১. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী	১২০২-০৬	খ্রীস্টাব্দ
২. মালিক ইজ্জুদীন মুহম্মদ শিরান খালজী	১২০৭-০৮	"
৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ (দুইবার)	১২০৮-১০ (১২১৩-২৭	,,
৪. মালিক আলি মর্দান	১২১০-১৩	,,

খ. মামলুক শাসন-১২২৭-৮২

১. শাহজাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ	১২২৭-২৯	,,
২. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলখ খালজী	১২২৯-৩০	,,
৩. মালিক আলাউদ্দীন জানি	১২৩১-৩২	,,
৪. মালিক সাইফুদ্দীন আইবক	১২৩২-৩৫	,,
৫. মালিক ইজ্জুদীন তুঘরল তুঘান খান	১২৩৬-৪৫	,,
৬. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান	১২৪৫-৪৭	,,
৭. মালিক জালালউদ্দীন মাসুদ জানি	১২৪৭-৫১	,,
৮. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেকী	১২৫২-৫৭	,,
৯. মালিক ইজ্জুদীন বলবন উজবেকী	১২৫৭-৫৯	,,
১০. মালিক তাজুদীন আরসালান খান	১২৫৯-৬৫	,,
১১. তাতার খান (আরসালানের পুত্র)	১২৬৫-৬৮	,,
১২. শের খান	১২৬৮-৭২	,,
১৩. আমীর খান	১২৭২-৭৩	,,
১৪. মুঘিসউদ্দীন তুঘরল তুঘান খান	১২৭২-৮১	,,

গ. বলবন বংশীয়ের শাসন—১২৮২-১৩০১

১. নাসিরউদ্দীন বঘরা খান	১২৮২-১২৯১	,,
২. রুকন উদ্দীন কায়কাউস	১২৯১-১৩০১	,,

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসন—১৩০১-১৩২৮ খ্রীস্টাব্দ

১. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্	১৩০১-১৩২২	খ্রীস্টাব্দ
২. লাখনৌতি-সপ্তগ্রাম-সোনার গাঁও এই তিন ইক্তায় :		
ক. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ্		
খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্		
গ. বাহরাম খান ওর্ফে তাতার খান	১৩২২-২৮	,,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. ক. কদর খান-লাখনৌতি ১৩২৮ ,,
খ. মালিক ইজুদ্দীন এহিয়া-সাতগাঁও ১৩২৮ ,,
গ. বাহরাম খান-সোনারগাঁও ১৩২৮ ,,
৪. স্বাধীন সুলতানী আমল
ক. ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ-সোনারগাঁও ১৩৩৮-৫০ ,,
খ. আলাউদ্দীন আলী শাহ-লাখনৌতি ১৩২৮-৪২ খ্রীস্টাব্দ
গ. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-লাখনৌতি-সাতগাঁও ১৩৪২-৫৭ ,,
সোনারগাঁও ১৩৫৩-৫৭ ,,
ঘ. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ-সোনার গাঁও ১৩৫০-৫৩ ,,
(ফকরউদ্দীনের পুত্র)

ঙ. ইলিয়াস শাহী বংশ—১৩৪২-১৪১২

১. লাখনৌতি-সাতগাঁওর ইজারাদার শামসুদ্দীন ইলিয়াস ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাঙলার ও বিহারের কতকাংশের স্বাধীন সুলতান হন। ১৩৪২-৫৩/
১৩৫৩-৫৭ খ্রীস্টাব্দ
২. সিকন্দার শাহ ১৩৫৭-৮৯ ,,
৩. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ ১৩৮৯-১৪০৯ ,,
৪. সইফুদ্দীন হামজা শাহ ১৪০৯-১০ ,,
৫. শামসুদ্দীন ১৪১০-১২ ,,

চ. রায়াজিদ শাহীবংশ—১৪১২-১৪

১. শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪ ,,
২. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪১৪ ,,

ছ. গণেশ বংশীয় সুলতানগণ—১৪১৫-১৪৩৩

১. রাজা গণেশ ওর্ফে দনুজমর্দন দেব ১৪১৫, ১৪১৭-১৮ ,,
২. জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ বা যদু ১৪১৫-১৬ ”
১৪১৮-৩১ খ্রীস্টাব্দ
৩. মহেন্দ্র দেব (গণেশ পুত্র) ১৪১৮ ,,
৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩২-৩৩ ,,

জ. মাহমুদ শাহী বা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ—১৪৩৩-৮৬ খ্রীস্টাব্দ

১. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১ম) ১৪৩৩-৫৮ খ্রীস্টাব্দ
২. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৯-৭৬ ,,
৩. শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬-৮০ ,,
৪. সিকান্দর শাহ ১৪৮০-৮১ ,,
৫. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (মাহমুদ শাহর অন্য পুত্র) ১৪৮১-৮৭ ,,

ঝ. সুলতান শাহজাদা ও হাবসী আমল—১৪৮৭-৯৩

১. বারবক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দ
২. সইফউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪৮৮-৯০ ,,
৩. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়) ১৪৯০-৯১ ,,
৪. শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা ১৪৯১-৯৩ খ্রীস্টাব্দ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঞ. হোসেন শাহী বংশ—১৪৯৩-১৫৩৮

১. সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯	খ্রীস্টাব্দ
২. নাসির উদ্দীন নুসরৎ শাহ	১৫১৯-৩২	,,
৩. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ	১৫৩২-৩৩	,,
৪. গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ ওর্ফে আবদুল বদর	১৫৩৩-৩৮	,,

ট. সুর বংশ—১৫৩৯-৫৯

১. শের শাহ		
২. ইসলাম শাহ		
১. মুহম্মদ শাহ আদিল		
২. শামসুদ্দিন মুহম্মদ গাজী		
৩. গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ	১৫৫৮-৫৯	
২য় গিয়াসুদ্দিন	১৫৬৩	
৩য় গিয়াসুদ্দিন	১৫৬৪	

ঠ. কররানী বংশ—১৫৬৪-৭৫

১. তাজখান কররানী	(১৫৬৪ খ্রী.)	
২. সোলায়মান কররানী		
৩. দাউদ খান কররানী		

ড. মুঘল আমল —১৫৭৫-১৭৫৭

১. আকবর (১৫৭৫-১৬০৫) [বারভূঁইয়া বসি আছে বুকে দিয়া ঢাল—মানিক গাঙ্গুলী] [গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বার ভূঁইয়া [ঘনরাম] :

সুবাদার

ক. মুনিম খান	১৫৭৪-৭৫	খ্রীস্টাব্দ
খ. হোসেন কুলি বেগ	১৫৭৫-৭৯	,,
গ. মুজাফফর খান তুরবতী	১৫৭৯-৮২	,,
ঘ. খানে আজম মির্জা আজিজ	১৫৮২-৮৩	,,
ঙ. শাহবাজ খান	১৫৮৩-৮৪	,,
চ. সাদিক খান	১৫৮৪-৮৬	,,
ছ. ওয়াজির খান	১৫৮৬-৮৭	,,
জ. সাঈদ খান	১৫৮৭-৯৪	,,
ঝ. রাজা মানসিংহ	১৫৯৪-১৬০৬	,,

২. জাহাঁগীর ১৬০৫-২৭

ক. কুতুবউদ্দীন খান কোকা	১৬০৬-০৭	খ্রীস্টাব্দ
খ. জাহাঁগীর কুলি খান	১৬০৭-০৮	,,
গ. ইসলাম খান	১৬০৮-১৩	,,
ঘ. কাসিম খান চিস্তি (স্বল্পকালের জন্যে শেখ হুসাম)	১৬১৩-১৭	,,
ঙ. ইব্রাহিম খান	১৬১৭-২৪	,,
চ. দারাব খান (শাহজাহান অধিকৃত ঢাকায়)	১৬২৪-২৫	,,
ছ. মহব্বত খান	১৬২৫-২৬	,,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ. মুকররম খান (স্বল্পকালের জন্য আজাদ খান) ১৬২৬-২৭ ,,

৩. শাহজাহান ১৬২৮-৫৮

ক. ফিদাই খান ১৬২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দ

খ. কাসিম খান জুঈনী ১৬২৮-৩২ ,,

গ. খানে আজম মীর মুহম্মদ বকর ১৬৩৩-৩৫ ,,

ঘ. ইসলাম খান মাশহাদী ১৬৩৫-৩৯ ,,

ঙ. (মুহম্মদ) শাহ শুজা (স্বল্পকালের জন্য সইফ খান) ১৬৩৯-৬০ ,,

৪. আওরঙজীব ১৬৫৮-১৭০৭

ক. মুয়াজ্জম খান ওর্ফে মীর জুমলা ১৬৬০-৬৩ খ্রীস্টাব্দ

খ. শায়েস্তা খান ১৬৬৪-৭৮ ,,

গ. মুহম্মদ আজম (স্বল্পকালের জন্য ফিদাই খান) ১৬৭৮-৮৮ ,,

ঘ. খান-ই জাহান ১৬৮৮-৮৯ ,,

ঙ. ইব্রাহিম খান ১৬৮৯-৯৭ ,,

চ. আজিম উদ্দীন ওর্ফে আজিমুশশান ১৬৯৭-১৭০৭ ,,

৫. বাহাদুর শাহ (১ম) ১৭০৭-১২

মোয়াজ্জম শাহ আলম

ক. আজিমুশশান ১৭০৭-১২ ,,

৬. জাহান্দর শাহ ১৭১২-১৩ ,,

ক. খান-ই জাহান ১৭১২-১৩

৭. ফখরুখ শিয়ার ১৭১৩-১৯

৮. রাফিদ্দরাজ ১৭১৯ ,,

৯. রফিউদদৌলা ওর্ফে শাহজাহান (২য়) ১৭১৯ ,,

ক. মীর জুমলা ১৭১৪-১৬ ,,

খ. মুরশিদ কুলি খান ১৭১৭-১৯ ,,

১০. মুহম্মদ শাহ ১৭১৯-৪৮

দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে এ সময় থেকে বাঙলার সুবাদারী পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয়। মসনদ দখল করে নওয়াবেরা সম্রাট থেকে নিয়োগপত্র বা সনদ আদায় করতেন।

ক. মুরশিদ কুলি খান ১৭১৯-২৭ খ্রীস্টাব্দ

খ. শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান ১৭২৭-৩৯ ,,

গ. সরফরাজ খান ১৭৩৯-৪০ ,,

ঘ. আলিবর্দী খান ১৭৪০-৪৮ ,,

১১. আহমদ খান ১৭৪৮-৫৪

ক. আলিবর্দী খান ১৭৪৮-৫৪

১২. শাহ আলম (২য়) ১৭৫৪-১৮০৬

ক. আলিবর্দী খান ১৭৪৮-৫৬ ,,

খ. সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬-৫৭ ,,

গ. মীর জাফর আলি খান ১৭৫৭-৬০ ,,

ঘ. মীর কাসিম আলি খান ১৭৬০-৬৩ ,,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ. মীর জাফর আলি খান (পুনঃ)	১৭৬৩-৬৫	,,
চ. নাজিমুদ্‌দৌলা	১৭৬৫-৬৬	,,
ছ. সইফুদ্‌দৌলা	১৭৬৬-৭০	,,

৮

মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ

বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্ম-প্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি এবং উৎস। এর থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-প্রতিবেষ্টনীর সাথে ও জীব-উদ্ভিদের সঙ্গে সখ্য ও শত্রুতা। আগাছার জঙ্গল কাটতে হয়, আবার সযত্নে রাখতে হয় খাদ্য-ফলের গাছ। জীবনের নিরাপত্তার ও জীবিকার সহায় কুকুর পায় লালন আর প্রাণ-বিনাশী সাপ-সিংহ পায় তাড়ন। মানুষের স্বশ্রেণীর মধ্যেও সখ্য ও শত্রুতা ঐ একই কারণে গড়ে ওঠে। সবস্বার্থে গড়ে ওঠে ঐকমত্য ও সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের সদিচ্ছা, আর অসমস্বার্থে জেগে ওঠে বিদ্বেষ-বিষ, বাধে দ্বন্দ্ব ও ঘটে সংঘাত। একদিন ঐ সমস্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল যৌথ-প্রয়াসের, গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংগতি। আরো পরে জীবিকা-সামগ্রীর অপ্রতুলতা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায়। এ স্তরে মিলনের সেতু হয়েছিল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের অঙ্গীকার এবং ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গীকারের ও নীতির রকম-ফের ক্রমে গড়ে তোলে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথ। গোড়ার দিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সার্বিক সংহতি লক্ষ্যে যার উদ্ভাবন, তা-ই এভাবে খণ্ড ও ক্ষুদ্র সংহতির আধার রূপে দলীয় ও উপদলীয় নিত্য কোন্দলের কারণ হয়ে দেখা দিল।

বলেছি সম ও সহ স্বার্থেই গড়ে ওঠে দল। 'প্রবলের উদ্বর্তন' নীতিভিত্তিক সমাজে সম ও সহ স্বার্থবোধ স্থায়ী হতে পারে না। আত্মশক্তি সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কাজেই তৈরি হয় নতুন নতুন দল। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। আবার স্বার্থবোধই মনের ও মতের ঐক্য-অনৈক্যের স্রষ্টা। অতএব, স্বার্থের প্রেরণাবশে মানুষে মানুষে সখ্য ও সংহতি কিংবা বৈর ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্যদলের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করেই স্বদলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা অটল রাখতে হয়। সব দলই এক রকম। শাস্ত্রীয় দল তথা ধর্মসম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন-সম্পৃক্ত বলে ওতে আনুগত্য ও নিষ্ঠা বেশি ও চিরন্তন, আর পার্থিব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দল ত্যাগে কিংবা ভঙ্গে পাপ-ভীতি নেই বলে তা ঘন ঘন প্রয়োজন মতো ভাঙা-গড়া ও ছাড়া চলে। তাই ধর্মীয় দলের পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও মারাত্মক। 'দল' মাত্রেরই পূর্বশর্ত ও জন্মশর্ত অন্য দলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কোন্দল। ফলে ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথরবাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা, স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মৌলশর্ত ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। তাই একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর পরমতসহিষ্ণু হতে পারে কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধা রাখতে পারে না। পুরুষানুক্রমিক শাস্ত্র-শাসন ও ধর্মবোধ আশৈশবের সংস্কাররূপে মনুষ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থায়ী হয়। সাধারণ মানুষ পোষমানা প্রাণীর মতো শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত ও স্বস্থ থাকে। এই শাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। এই শাস্ত্র তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এর বাইরে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ বলেই জানে এবং মানে। তাই বিনা প্রশ্নে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানুষ বিধর্মী বিদ্বেষী না হয়েই পারে না। তাই বিধর্মে অনাস্থা ও বিধর্মী-বিদ্বেষই স্বধর্ম নিষ্ঠার ও আদর্শ শাস্ত্রীয় জীবনের লক্ষণ। হিন্দুতে মিসকিন খাইয়ে মোল্লাকে দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের যেমন আশা করতে পারে না, তেমনি পারে না মুসলমানও কাঙালভোজন করিয়ে ফিতরা বা জাকাত কাফেরকে দিয়ে। এজন্যেই ধার্মিকেরা সাধারণত গোঁড়া, অনুদার এবং বিবেচনাবোধ ও বিবেকবুদ্ধিহীন। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দেশ-জাত-বর্ণ ও শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দলীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল কম হয়নি বা কম হয় না। এ কালে আমরা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বিধর্মী-বিদ্বেষ তো বটেই, সে সঙ্গে জাত-বর্ণ-শ্রেণী বিদ্বেষও প্রবল দেখছি, আফ্রিকায় দেখছি আদিম গোত্রদ্বেষণা ও বর্ণভেদ, আমেরিকায় রয়েছে বর্ণভেদ, অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রদ্বেষণা আজো অবিলুপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' এই জাতীয় নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ্য ও শূদ্র ইত্যাদি প্রাচীন বর্ণমূলক জাতি, কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি। কিন্তু 'হিন্দু' জাতি ছিল না।—হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্য সম্প্রদায়।" ('বাংলা সাহিত্যের কথা' মধ্যযুগ-পৃ. ১৯)। এ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম ও শ্রেণী-দ্বেষণার মূলে জীবিকা-সম্পৃক্ত অসূয়া, বিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ করে। এ যুগের ব্যাখ্যায় এ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষণার কারণ মূলত আর্থিক। কেননা, আমরা দেখতে পাই যেখানে ভিন্ন গোত্রের, বর্ণের, জাতের, শ্রেণীর বা ধর্মের লোক নগণ্য সংখ্যক, সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ নিষ্ক্রিয় বিদ্বেষী অর্থাৎ কেবল অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন। যেখানে বিভিন্ন গোত্রের ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সংখ্যা তেমন নগণ্য নয় বরং সম্পদ সম্ভোগে ও অর্থোপার্জনে একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানেই জাত-বর্ণ ধর্ম-গোত্র ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সক্রিয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রিয় থাকলে সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায়ও ভিন্ন দলের, ধর্মের, গোত্রের, বর্ণের, জাতের ও দেশের মানুষের প্রতি অবচেতন মনে একটা অনাত্মীয়ভাব জেগে থাকে, একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া থাকে—কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম করা যায় না, সে-ব্যবধান ঘুচানো সম্ভব হয় না। কাজেই আন্তিক মানুষের বিধর্মীবিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্রদ্বেষণা এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার যে এ নিয়ে কোন দেশ-জাতি-বর্ণ-গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা অবিবেচকের আচরণ মাত্র। বিদ্বানদের এ অবিবেচনাও মানুষের অনেক দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।

তবু ব্যক্তিসম্পর্কে মানুষ কখনো দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রে-বাধা মানে নি। চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম অস্বীকার করে মানুষ মানুষকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের বাঁধনে বেঁধেছে, আত্মীয় বলে মেনেছে, জীবনের সহায়-সহচর বলে জেনেছে। আমরা রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই বড়ো করে দেখি ও দেখাই। গরজে পড়ে গোঁজামিল দিতে চাই, তাই ফাঁকির ফাঁক থেকেই যায়। এর ফলে ইতিহাস হয় বিকৃত, রাজনীতিও হয় না অভীষ্ট ফলপ্রসূ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে, বাঙালী-অবাঙালীতে এবং বিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী তুর্কী-মুঘল শাসকের সঙ্গে শাসিত জনের দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও সংঘর্ষ সংঘাতের (এমনকি আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষেরও) সংবাদ নানা সূত্রে পাই। তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। এতে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য, শ্রদ্ধা-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলে বটে, কিন্তু তা কখনো শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও সরকারকে প্রভাবিত করেনি। ঐ দল, স্বার্থ ও মতগত অনাত্মীয় ভাবটাই সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সরকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের কাজ করেছে। যেখানে আর্থিক স্বার্থ নেই, সেখানে পর-দ্বেষণা নিন্দা-অবজ্ঞা-উপহাস-ঔদাসীন্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন, অচ্যুতদের প্রতি চর্যাকারের কিংবা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রভৃতির বাঙালীর (মাঝি-মাল্লার) প্রতি উপহাস। যথা—

আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী। (চর্যাপদ)
কান্দেরে বাঙালভাই বাফোই বাফোই—মুকুন্দরাম।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল— ক্ষেমানন্দ।
বাঙালীরে দেখে যেন ভেড়া—রামপ্রসাদ।

বৌদ্ধ ধর্মের আগে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। যদিও জৈন-বৌদ্ধ মতে ও চর্যায় সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামান্য, তবু বৌদ্ধ-প্রসারে জৈন-মত বিলুপ্ত হয়। জৈন-বৌদ্ধে বিরোধ-সংঘর্ষ হয়েছিল নিশ্চয়ই, তার রূপ-স্বরূপও আজ আমাদের কাছে তেমন অস্পষ্ট নয়। দিব্যাবদান সূত্রে জানা যায়, অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করিয়েছিলেন। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোক-প্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের একটি আদেশ ছিল এইরূপ–

"আ-সেতোর আতুষারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান।
যো ন হন্তি স হন্তব্যোভত্যান্, ইত্যশিষন্ নৃপঃ।"

— সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালক সহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে— 'বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারিগণ প্রতি নির্যাতন কৈল।' [বাঙলার ইতিহাস', ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৫৩]

'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজারা—

দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্
অসংখ্যাতান রাজমুখ্যান্ অনেকবিদ্যা
প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষানি পরশু-
ভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য
কট ভ্রমনৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসমাচরণ নির্ভয়ো বর্ততে।"

—অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্যদের অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্ট মত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন।

সেনরাজাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ও সরহের দোহায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকট। আর্যদেবের "চিত্তশোধন প্রকরণে"-ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। সাধনমালা, বজ্রসূচি-তত্ত্বকোষ প্রভৃতিতেও এ বিদ্বেষ মেলে। এমন কি শূন্যপুরাণে বেদশাস্ত্রের ঠাঁই শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং ব্রাহ্মণ্য সব দেবতাই ধর্মনিরঞ্জনের আনুগত্য স্বীকার করে। লাউসেনের কাছে স্বয়ং দুর্গাও হার মেনেছেন। এখানে মনসামঙ্গলের হাসান হোসেন পালাও স্মর্তব্য। সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধ-পীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন হিউ-এনৎ-সাঙের ও হর্ষচরিত প্রণেতা বাণভট্টের। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধ-পীড়ন প্রবণতার কথা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ-পীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা বা কলিমাজালাল' নামের পদবন্ধে। এতে নির্জিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুর্কীবিজয়কে সদ্ধর্মীর মুক্তির আশ্বাস ও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনেছে। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিল। নিম্নবিত্তের ও বর্ণের নির্জিত বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্ম-বিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম ও আচার রক্ষা করেছে, এরা হচ্ছে নাথযোগী নামে পরিচিত তাঁতীরা, বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা এবং শৈবনাথপন্থীরূপে মন্ত্র-বজ্র সহজযানী যোগী-তান্ত্রিকরা আর ধর্মঠাকুরের পূজারীরূপে রাঢ়ের ডোম-চাঁড়াল-বাগদীরা। মতে-আচারে তারা বিকৃত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিচয়ে তারা হিন্দু। এবং অনেক বাউল মুসলমানও। মধ্যযুগে রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধমত প্রকাশ্যে গ্রহণ করায় তাঁকে দেশ-ছাড়া হতে হয়েছিল। বিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী তুর্কী-মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসক-বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হয়েছিল। তা ছাড়া যুদ্ধে মন্দিরাদি ভাঙার ফলে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি মুসলিম তুর্কী-মুঘলের পরিব্যক্ত অবজ্ঞা-উপহাস হিন্দুমনে অপমানের জ্বালা ও বিদ্বেষবিষ তীব্র করেছিল নিশ্চয়ই। তাই হিন্দু অধ্যুষিত মিথিলার হিন্দুরাজ পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ম্লেচ্ছ-স্পর্শদোষ থেকে বাহ্যত দূরে থেকেও মানসপীড়া বশে সক্ষোভে মুসলিমের হিন্দুপীড়নের কটা আদর্শায়িত কাল্পনিক আলেখ্য না এঁকে পারেন নি :

কতহু তুরুক বরকর
বাট জাইতেঁ বেকার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ
মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ।
ফোট চাট জনউ তোড়ু
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়ু।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ পূরলি মহী
পদরুহ দেবাক ধাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার
ছোটে তুরুক। ভড়কী মার। —(কীর্তিলতা)

AMARBOI.COM

কিন্তু এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন :

হিন্দু তুরুকে মিলল বাস
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিশ কতহুঁ ছেদ। —(কীর্তিলতা)

এটিই যথার্থ ভাষণ। এ সূত্রে পরবর্তীকালের ইংরেজদের নেটিব-অবজ্ঞা স্মর্তব্য। বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়ন প্রবণতার চেয়ে তুর্কীদের মস্করা ও পরিহাস-প্রিয়তাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

বিপ্রদাস পিপিলাইও বলেন—

(তুর্কীদের) কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করএ নছাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ধার্মিকরা ইসলামে দীক্ষাও দেয়—

জতেক সৈয়দ মোল্লা জপএ ত বিসমল্লা
সদামুখে কলিমা কেতাব
হিন্দুত কলিমা দিল মুসলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুসলমান।

— এ বর্ণনা যে সত্যসন্ধ হিন্দু কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রসূত, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাভাবিক বিজাতি-বিধর্মী বিদ্বেষ বশে কবি ভবানীদাসও ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণে কল্পচিত্রই দিয়েছেন :

প্রচণ্ড যবনরাজা হবে ক্ষিতিপতি
ধর্মকর্ম লোকের হিংসিবে নিতিনিতি।
প্রয়াগ বারাণসী আদি যত পুণ্যস্থান
সকল স্থানের তারা করিবে অপমান।
বিড়ম্বনে হরিকার্য করিতে না দিব
বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব।

১. এমনি ভারতচন্দ্রেও আছে :

যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানা মতে করে অনাচার
বামনপণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর।

প্রেমবিলাসে দেখি–

সংকীর্তন করিতে সে করএ বারণ
ক্রোধে সে যবন দস্যু যবন লইয়া
খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া।

রাজমালায় পাই (৩য় লহর) —

চতুর্দশ দেবপূজা নিষেধে যবন
কালিকা দেবীর পূজা করিলা বারণ।

বিজয়গুপ্ত যদিও তাঁর স্বগ্রাম ফুল্লশ্রীর পরিচয় প্রসঙ্গে গাঁয়ের শান্তি-সুখে গর্বিত ও সুলতান হোসেন শাহ্‌র (জালালউদ্দিন ফতেহ্ ওর্ফে হোসেন শাহ (১৪৮১-৮৫ খ্রী.) তারিফে মুখর, যেমন—

সুলতান হোসেন শাহ নৃপতিতিলক।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি,
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।

তবু সাধারণভাবে বিজাতি-দ্বেষণার ও বিধর্ম-অসহিষ্ণুতার একটি কল্পচিত্র দিয়েছেন : কাজীর শ্যালক মুলা হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু।

১. তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে।
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার স্কন্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে
কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।

২. পৌত্তলিকতা-দ্বেষী মোল্লা 'খোদা খোদা বুলি যায় (মনসার) ঘট ভাঙ্গিবার।' হিন্দুরাও ছাড়বার পাত্র নয়, বেদম মার দিয়ে ছাড়ে। শুনে কাজীও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে :

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।
গোটে গোটে ধরিবা গিয়া যথেক ছেমরা
এড়ারুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা।
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়।—(বিজয় গুপ্ত)

এ হচ্ছে বিধর্মী-দ্বেষী অসহিষ্ণু মুসলমানের কল্পচিত্র। আসলে বোধ হয় মনসা-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতা-দ্বেষী মুসলিমের প্রথমে অবিশ্বাস-অবজ্ঞার ও পরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত দান লক্ষ্যেই দ্বন্দ্ব-মিলনের এ কল্প-কাহিনী উদ্ভাবিত। হাসান-হোসেন পালা নির্মাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই যে নিহিত, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে মনসাপূজক মুসলিম বেদে গোষ্ঠীর কথা স্মরণীয়। তাই সদুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার কথাও পাই :

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান
সে বলে উচিত নহে, রাখো হিন্দুয়ান।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে
যার তার কর্ম সেই করে ধর্ম জ্ঞানে।
সকলের কুলাচার সৃজিল গোঁসাই
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই।—(দ্বিজ বংশীদাস)

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়ে' দেখি— হাসান হোসেন 'তুরুক' হলেও গ্রাম্য বিত্তবান চাষী। 'তাদের শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত।' গোরামিনা তাদের প্রধান কৃষাণ। ঐ কৃষাণদেরও রয়েছে গোলাম। সে যাচ্ছিল স্নান করতে, পথে গাছতলায় রাখালেরা করছিল মনসাপূজা। অকারণেই

— 'ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুরুক দেখিয়া
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।'

[বলা বাহুল্য মুসলিম মাত্রই তখন হয়তো তুরুক অভিধায় চিহ্নিত হত।]

উক্ত গোলামের নালিশক্রমেই রাখালদের মনসাঘাট ভাঙ্গতে যায় গোরামিনা। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে এভাবেই। এ সূত্রে বিট্রিশ আমলে পুজোর বাজনা ও গরু কুরবানীজাত দাঙ্গা স্মর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুদ্ধা মনসা আদেশ দিল 'বধহ তুরুক সব জনেক রাখিয়া।' বিঘতিয়া সাপ মুসলিম পাড়ায় প্রবেশ করে হত্যা করল বিরানব্বই জনকে, বেঁচে রইল মাত্র একজন। তার নাম ভাঁড়ু। এরূপ দেশী নাম আরো মেলে— দিনু, কিনু, ফুল, ছুটি, ইছাই, বাছাই, টগরি, জিরা, হারি, কালাফুলি, হুলহুলি, নাকুড়ি প্রভৃতি। লক্ষণীয় দেশী মুসলমানকেও বিপ্রদাস 'তুরুক'— এই সাধারণ নামে অভিহিত করেছেন। এই ভাঁড়ুই হাসানহাটি যেয়ে হাসানকে জানাল সব বৃত্তান্ত। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম-মনসার লড়াইয়ের শুরু। বিপ্রদাস স্বধর্মত্যাগী জোলা-মুসলিমদেরও এ সূত্রে স্মরণ করেছেন :

দেখিয়া জোলার পাড়া ধায় বিঘতিয়া বোড়া
আছে জোলা আপনার কাজে
মাথাএ তইকা ভাঙ্গা তাহে কানি কালো রাঙ্গা
কামড় খাইল তার মাঝে।
ফলে— হাসান নগরে যত জোলা বৈসে শত শত
বধে বিঘতিয়া কালানলে।

২

গৌড়ে হিন্দু-মন্দির ভাঙার অপবাদ নেই সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র বা অন্য কোন সুলতানের। উড়িষ্যায় অভিযানকালে অর্থাৎ যুদ্ধকালে সেখানকার ধনাগারস্বরূপ কিংবা শত্রুর শিবিরস্বরূপ মন্দির ভেঙেছিলেন হোসেন শাহ :

যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িষ্যার দেশে
দেব মূর্তি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে। (চৈতন্যভাগবত)

[অবশ্য মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার দৃষ্টান্ত ভারতে একটা দুটো নয়—বহু] লক্ষণীয় যে তুর্কী সুলতান-ফৌজদার-কাজী প্রভৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দু-পীড়নের কথাই সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। দেশজ মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে হিন্দু পীড়ন-প্রাপ্তির কথা নেই। তার কারণ দুটো। এক, তখনো গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দুই, সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কী-মুঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু সামন্তরাই শাসন করত দেশ। রাজস্বও আদায় করত হিন্দু কর্মচারীরাই। কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর শাসন পোষণে। তাই সাধারণ মুসলিমের পক্ষে হিন্দুপীড়ন সম্ভব ছিল না।

আবার সর্বত্র ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার কথাই রয়েছে বর্ণিত। এ নির্যাতন কেবল যেন ব্রাহ্মণের উপরই হত। জয়ানন্দের বর্ণনায় পাই :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে
ঘরদ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী।
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে।
অতএব— 'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।'

কিন্তু এজন্যেই কি 'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ' এবং কেবল ব্রাহ্মণ নির্যাতন? আমাদের মনে হয়, অন্য বর্ণের ও বিত্তের লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত হত, তাদের সঙ্গে প্রচারকরাও মিশনারীসুলভ সদ্ভাব রক্ষা করে চলত। বিপ্রদাসের উক্তিতে 'হিন্দুত কলিমা দিল মুসলমানি শিখাইল' এবং দীক্ষিত 'জোলা' মুসলমানের প্রতি তাঁর সক্ষোভ পরিহাসে আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী ব্রাহ্মণই হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন। এজন্যেই 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।' সুতরাং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণ-নির্যাতনকে ঢালাওভাবে বিধর্মী-পীড়ন বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পাদ্রী-দ্বেষণা সমার্থক নয়। হিন্দুদের পাদ্রী-বিদ্বেষ থাকলেও ব্রিটিশ-দ্বেষণা ছিল না উনিশ শতকে। এখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উক্তি পুনঃস্মর্তব্য— 'হিন্দু' জাতি ছিল না। হিন্দু ধর্মও ছিল না।' কাজেই হিন্দুমাত্রেরই উপর বিদ্বেষপ্রসূত অত্যাচারও হতে পারত না। তাছাড়া তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণের ও শোষণ-পীড়নের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দু সামন্তেরই।

আবার ঐ সংখ্যাগুরু হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা যে শাসক তুর্কী বা যবনদের খুব ভয় করে চলত, তার প্রমাণও দুর্লভ। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত যেমন হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম-দলন চিত্র সগর্বে বর্ণনা করেছেন, তেমনি বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদম্ভে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন—

১. গদাধর বোলে আরে কাজী বেটা কোথা
ঝাটে 'কৃষ্ণ' বোল নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা। (বৃন্দাবন দাস)
২. নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ
আপন ইচ্ছাএ মার, প্রাণে পাছে রাখ। (জয়ানন্দ)
৩. নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন। (বৃন্দাবন দাস)
৪. প্রভু আজ্ঞা দিল 'যাহ করহ কীর্তন
আমি সংহারিব আজি সকল যবন।' (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

এগুলো যে মূলত জাত্যাভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈর জ্ঞাপক অতিশয়োক্তি তার প্রমাণ তুর্কী-মুঘল আমলেই শাসিত প্রজা নির্ভয়ে গ্রন্থে শাসকের পীড়নের কথা লিখেছেন, শাসকের ধর্মের চাইতে শাসিতের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, শাসকগোষ্ঠী থেকে শাসিতের দেবতার অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন— অন্নদামঙ্গল অবধি অনেক কাব্যেই এসব চিত্র মেলে— যা কোন নির্যাতনকারী শাসকই সহ্য করে না; এমনকি এই গণতন্ত্রের যুগেও নয়। তা ছাড়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ প্রমুখ বহু সুলতানের তারিফে সমকালীন বহু কবি মুখর। এ যেন এ যুগের বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদপত্রসুলভ দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক। তাতে যেন পরিহাস রসিকতার ভাবও রয়েছে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও ভূতের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। আবার সতেরো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো-উনিশ শতকে কাল্পনিক পীর-পাঁচালীর মাধ্যমে মুসলিমদেরও তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমান উৎসাহী দেখতে পাই। পীরনারায়ণ 'সত্য', তাঁর চেলা দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, গাজী-কালু এবং ইসমাইল গাজী, জাফর গাজী, মোবারক গাজী-সফী গাজী, মানিকপীর, মছলন্দর পীর প্রভৃতির কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিমের ধর্মমত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে আপোস-মিলনের চিত্রই বিধৃত।

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে। (কৃষ্ণরাম দাস)

বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে এ-ধারার শুরু এবং কৃষ্ণরাম-ভারতচন্দ্র-গরীবুল্লাহ প্রমুখ হয়ে মুন্‌শী আবদুর রহিমে তার অবসান।

সৈয়দ সুলতান, জায়েনউদ্দীন, শাহ বারিদ খান, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ কবিগণ রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রভৃতি ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরদের দিগ্বিজয় বর্ণনা সূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজা ও রাজ-কন্যাদের সপ্রজা ইসলাম বরণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যথায় হত্যার হুমকি দিয়েছেন। সর্বত্র কেবল ব্রাহ্মণই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য। এবং কাফের নয়, কুফরীই (পৌত্তলিকতাই) তাঁদের তীব্র ঘৃণার বিষয়; ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌত্তলিকতার অপকর্ষ দেখানোই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুর্কী-মুঘল শাসনকালে মুসলিমরা ইংরেজ আমলের মতো জীবিকাক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নি, তাই তাঁদের রচনায় হিন্দু-বিদ্বেষ মেলে না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোই তার প্রমাণ :

১. তোর হিত বলি আমি হও মুসলমান
নবীর সাক্ষাতে যাই আমিই ইমান।
কলিমা না কহ যবে করিমু সংহার।

২. এক আল্লাক মান যবে না কাটিব শির
আল্লার রসুল হেন যদি মান মোক
যথ অপরাধ কৈলা ক্ষেমিব তোহোক।

৩. আল্লার পরম মিত্র নবী মুহম্মদ
তাহান কলিমা পড়ি ভুঞ্জ রাজপদ।

৪. নৃপতির করে ধরি তবে পয়গাম্বর
কলিমা পড়াইলা সুখে হরিষ অন্তর। (রসুল বিজয়—শাহ বারিদ খান)

৫. মূর্তি ভাঙ্গিয়া কর মসজিদ নির্মাণ
সৈন্য সমুদিত তুমি হও মুসলমান।
বুতখানা দূর করি মসজিদ উঠাও।
হামেসা কোরান পড়ি কলিমা বুলিবা।

৬. কাফের জুনুদ শাহ বলেন :
না কাটিও শির তুমি রাখ মোর প্রাণ
আজ্ঞা কর মহাশয় হৈমু মুসলমান।

৭. হানিফা— 'রাজ্যে রাজ্যে কাফিরকে করে মুসলমান।'
হানিফা বলেন— ধনে রত্নে কার্য নাহি করি মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদিত রাজ্য জিনি মুসলমান করি
তবে সে মদিনা যাইব এই সত্য ধরি।
(হানিফার দিগ্বিজয়—শাহ বারিদ খান)

৮. অন্দরেতে যাই আলি জব করিব গরু
সেই শের পোন (কাছে) দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির।
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ। (রসুল বিজয়-জায়েনউদ্দীন)

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যেখানে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির, সেখানে সহাবস্থানের গরজে ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতাভিত্তিক একটা আপোস রকা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। নইলে শাসিতজনদের কিংবা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ হয় না। মধ্যযুগে সেই আপোস-প্রয়াস উপরোক্ত ধারায় আবর্তিত হয়েছে। মা যখন মারে, তখন তা বিনা অনুযোগে সহ্য করাই নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণে মেরেও সৎমা নিন্দা থেকে রেহাই পায় না। প্রবল মাত্রই সে কমবেশি পর-পীড়ক, শাসকমাত্রই যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক, দুরাত্মা-প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের যে কোনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নেই ওরা যে আলাদা শ্রেণী-শাসক-প্রশাসকের বিজাতি-বিধর্মী হলে শাসিত-শোষিত-পীড়িত মানুষ এ তত্ত্ব মনে রাখে না। মনে ভাবে বুঝি বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বলেই শাসকরা প্রজাপীড়ন করছে। গোঁয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্খধার্মিক প্রভৃতি যে সুযোগ সুবিধে অতো ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-পীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যতা আজকের দিনের উচ্চশিক্ষিত মানুষের প্রবণতা থেকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবু শাসনের স্বধর্মীর সংখ্যালঘুতার দরুন তা সেকালে কখনো ত্রাসকর হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক বিদ্বানেরাও স্বীকার করেন :

"মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি।" (১৮৯১ সনের আদমশুমারীর রিপোর্ট)

মুসলিম শাসনকালে "শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতিচর্চা, কোন বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয় নি, বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল।" (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : বাঙালী পৃ. ৭৯-৮০)

"পাঠানযুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেনশাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পাঠান আমলে রাজ্যশাসনে, বিশেষত রাজস্ব ব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।" (অসিত বন্দ্যো : বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫) এবং কালকেতুর ছিল মুসলিম সেনাধ্যক্ষ উমর গাজী, রনাগল খান। কৃষ্ণচন্দ্রেরও ছিল শের মাসুদ খানজাদা, মাসুদ জাফর, মুজাফফর হোসেন প্রভৃতি কর্মচারী।

"স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানেরা নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময় মুসলমান কর্মচারীদের উপরেওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারি এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।" (সুখময় মুখো : বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর পৃ. ৪৬৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। (১৫-১৬ শতকে) এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই"। (বাঙ্গালার ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র)।

"তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙ্গালিরাই বাঙালা শাসন করিত। ইঁহারা (হিন্দু রাজাগণ ও সামন্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্য-শাসন করিতেন। (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্দ্র)

"মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে বাঙালী হিন্দু সবিশেষ সহায়তা করিতেছে' (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ৮৮)।

অতএব, মুসলমানেরা তুর্কী-মুঘলযুগে বিধর্মী নির্যাতনের সুযোগ কৃচিৎ কখনো পেয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রামচন্দ্র খান হিন্দু হিসেবে নয়, বাকী রাজস্বের জন্যেই নির্যাতিত হয়েছিলেন। আবার রূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন প্রজাপীড়ক। অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি বিদ্রোহীর মতো আচরণ করেছিলেন বলে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' হোসেন শাহার জবানীতে পরিব্যক্ত :

'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস'।
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-১৯)

আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলিমের পরিচিতি-প্রতিবেশীসুলভ প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের সম্পর্কও গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে গড়ে উঠত। আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় কোন মানুষই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-বৈর দ্বারা চালিত হয় না। আর এক ক্ষেত্রেও মানুষ কোন স্বাতন্ত্র্য অসূয়া অহঙ্কার অবজ্ঞা মনে ঠাঁই দেয় না— সে হচ্ছে দৈব ভয়ের এবং ব্যাধি, স্বার্থ ও লিপ্সার ক্ষেত্র।

এখানে আপাতনিরাপত্তা, নিরাময় ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সর্ব সংস্কারের বাধা অতিক্রমণে প্রবর্তনা দেয়। এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র অনেক মেলে। যেমন :

১. গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা (চৈতন্যচরিতামৃত)

২. শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন। (চৈতন্যভাগবত)

৩. তর্কে পরাজিত চৈতন্যের মাহাত্ম্যমুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে ধরে বলে—
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহ যে যবন
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ। (চৈতন্যভাগবত)

৪. হিন্দু কুলে কেহ যদি হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম। (চৈতন্যভাগবত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. যবন হরিদাসকে মুলুকের পতি বলছেন :
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত। (চৈতন্যভাগবত)

৬. জাজপুরের দেহারা বন্দিব একমন
যেইখানে অবতার হৈল যবন। (ধর্মমঙ্গল)

৭. বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ— (চৌধুরীর লড়াই)

৮. বন্দোঁ পীর ইসমালি গড় মান্দারনে।
দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে
জোড় হাতে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সুফী খাঞে। (ধর্মমঙ্গল—সীতারাম দাস)

৯. যবনেহ যার (রামের) কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে। (চৈতন্যভাগবত)

১০. বিজয় গুপ্তের নায়ক চাঁদ সদাগর লখীন্দরের বাসরে কোরআন পাঠেরও ব্যবস্থা রাখে। শেখ শুভোদয়ায় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্যমানিক পীরাদির মাহাত্ম্যকীর্তন রয়েছে, জাফর খানেরও গঙ্গাস্তোত্র আছে।

১১. ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি (দীন কৃষ্ণদাসের পদ) [ডঃ ভূপেন দত্তের বাঙলার ইতিহাসের ধারায় উদ্ধৃত পৃ. ৮০]

১২. এবং ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে রূপরামের ধর্মমঙ্গলে মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে এরূপ পীর ফকির বন্দনা রয়েছে।

১৩. ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারশ্য পড়িবে
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে। (চৈতন্যমঙ্গল)

আবার গুণরাজ খান মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র (গৌরীমঙ্গল : ১৪৯৭-৯৮ খ্রী.-পুঁথি পরিচয় পঞ্চানন মণ্ডল, ৩য় খণ্ড) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, রূপরাম, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার [ভুঁইয়া মুসা খাঁর আমলের] কৃত্তিবাস, দ্বিজশ্রীকর কবিরাজ, রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, গদাধরদাস, কৃষ্ণরামদাস, মহাদেব আচার্যসিংহ (মালতীমাধব নাটকের টীকাকার, বা. ই. দুশো বছর পৃ. ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না পেয়েও, রুকনউদ্দিন বারবক শাহ, শামসুদীন ইউসুফ শাহ, জালালউদ্দীন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নুসরৎশাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ, পরাগলখান, ছুটিখান, আকবর, শাহজাহান, সুজা, মুসা খাঁ, আওরঙজীব প্রমুখ শাসক-প্রশাসকের অকারণ-সকারণ স্তুতি গেয়েছেন।

সন্ত সন্ন্যাসী ফকিরের ক্ষেত্রেও বিষয়ী মানুষ কখনো পার্থক্য স্বীকার করে নি। এসব হচ্ছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা। কিন্তু কারণে-অকারণে সুপ্ত জাতি-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-বৈর আস্তিক ও দলভুক্ত মানুষের মনে যে-কোন প্রাসঙ্গিক কারণে জেগে ওঠেই এবং প্রয়োজন স্থলে প্রকাশও পায়। এবং এ দিয়ে ইতিহাসের ধারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বকালেও আমরা তা দেখতে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরে গোড়ীয় নববৈষ্ণব মতের উদ্ভবকালেও আমরা বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবের দ্বন্দ্ব-কোন্দল দেখেছি, যেমন উনিশ শতকে দেখেছি খ্রীস্টান-ব্রাহ্ম-সনাতনীদের এবং মজহাবী-ওয়াহাবী-ফরায়েজীদের দ্বন্দ্ব-কোন্দল।

সনাতন লোকধর্মের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্ণবদের ছিল সীমাহীন অবজ্ঞা। তারা বলে—

১. ধর্ম-কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত (চৈতন্যভাগবত)

উত্তর বঙ্গে তখন :

২. উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য মাংস মৎস্য মাগ মলেতে সাধন
কামিক্ষার ব্রত মহীপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব
ভোট কম্বল চর্ম পরিধান সব।
(নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার : সুকুমার সেন পৃ. ৩৩০)

৩. ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্বক্ষণ।
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল। (চৈ. ভা.)

৪. মহাপাপী ব্রাহ্মণ যে আছে দুই ভাই
নবদ্বীপের যে ঠাকুর জগাই মাধাই। (লোচনদাস)

৫. ধিক জাঁউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল
গুপ্ত হত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার। (ঐ)

কীর্তন শুনে সনাতনীরা বলে :

৬. শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে 'হইল প্রমাদ
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ। (চৈ. ভা.)
... এ বামনগুলো রাজ্য করিবেক নাশ-
কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। (চৈ. ভা.)

৭. এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধিজানে
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।—
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সবে রাত্রি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। (চৈ. ভা.)

চৈতন্য ও তাঁর চেলাদের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করে হিন্দুরাই :

৮. আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই
যে কীর্তন প্রবর্তিত কভু শুনি নাই
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি
হিন্দু ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার। (চৈ. চ.)

তর্কে পরাজিত বৌদ্ধরা চৈতন্য-লাঞ্ছনার ষড়যন্ত্র করেছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতে :

৯. বৌদ্ধাচার্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল।
সর্ব বৌদ্ধে মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল,
অবশেষে 'সবে আসি প্রভু পদে লৈল শরণ।'

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণবীয় উত্তেজনা ও ক্রোধবশে তাই এ পাষণ্ডদের সম্বন্ধে বারবার বলেছেন—

এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার মাথার উপরে। (চৈ. ভা.)

কবিগণ রাজবন্দনা করেও আবার সেই রাজার অত্যাচার পীড়নের কথা বলেছেন। যেমন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী প্রতিমাবিনাশক হোসেন শাহ কেবল যে প্রশংসিত হয়েছেন, তা নয়, চৈতন্য দেবের ঐশ্বর্যেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'এসব মানুষি নহে গোসাঞি চরিত্র।' (চূড়ামণিদাস—গৌরাঙ্গ বিজয়) 'সেই ত গোসাঞি উহা জানিহ নিশ্চয়।' (চৈতন্যচরিতামৃত)

আবার বৈষ্ণব অবৈষ্ণবের পারস্পরিক নিন্দাবাদও ঐ একই সাধারণ দল-চেতনার বা ভিন্ন দল-দ্বেষণার প্রকাশ মাত্র।

তাই বলেছি, এসব দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা একটা সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই প্রকাশ, — এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজা নিরর্থক। এসব অভিব্যক্তি কেবল এ যুগে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বক্তব্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার গাঁয়ের নিরক্ষর নিঃস্ব নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা এ স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করার বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনো তেমন অনুভব করেনি। জীবিকাগত আর্থিক জীবনে চির দুস্থ এসব মানুষ নিয়ম ও নিয়তির শিকাররূপে আশ্বাস ও প্রবোধের অবলম্বন খুঁজেছে প্রায় অবচেতন মনেই। তাই দুর্বোধ জটিল শাস্ত্রে আশ্বস্ত হতে না পেরে তারা সহজ ও সরল পথের সন্ধান করেছে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের স্বস্তিবাঞ্ছায়। এভাবে লোকপ্রয়োজনে লোকমনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে লোকধর্ম। পীর-নারায়ণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা বিভিন্ন গুরুনামী বাউল সাধনায় নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দুমুসলিম অভিন্ন মিলন-ময়দান রচনা করে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে। কেবল উচ্চবিত্তের, বর্ণের ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী স্বস্থ মানুষই শাস্ত্র-সংস্কৃতি-সমাজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যগৌরব ও স্বাধর্ম্যগর্ব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষু হতে চেয়েছে। এ হচ্ছে ধর্ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণ-জাত-সম্পদ চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। এর থেকে আস্তিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের নিষ্কৃতি নেই। অথচ এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মুসলিমের ঘরোয়া জীবনে, অন্তত নাপিত, ধোপা, বারুই, বৈদ্য, কামার, কুমার, গো-চিকিৎসক, বাদ্যকর, চাষী, মাঝি, তাঁতী, মুচি প্রভৃতি নানা পেশার লোকের সঙ্গে সেযুগে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হত।

তা'হলে সাহিত্যে-ইতিহাসে বিধৃত বিরোধের স্বরূপটা কি!

আসলে মন ও মত বাঁচিয়ে গাঁয়েগঞ্জে আজকের মতোই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতের মানুষ মাঠে-ঘাটে-হাটে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত। দুই বিরুদ্ধ মতবাদীর মধ্যে যা কাম্য ও কেজো তা হচ্ছে সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণুতা। ভিন্নমতের আস্তিক ও দলীয় মানুষের মধ্যে প্রীতির চর্চা অবাস্তব বলেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই এ প্রয়াস বিড়ম্বিত হয়।

স্মর্তব্য যে, মধ্যযুগে জনগণের জীবনযাত্রা ছিল নিম্নমানের। অন্ন-বস্ত্র-গৃহ ছিল স্বল্পব্যয়ের। অদৃষ্টবাদী অজ্ঞ মানুষ আর্থিক দুর্গতির জন্যে কাউকে দায়ী করত না। গাঁয়ে পণ্য ও শ্রম বিনিময়ই ছিল বৃত্তিজীবী মানুষের আর্থিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু উচ্চবিত্তের মধ্যে শ্রেণীগত সচেতন জীবন ও রাজনীতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ছিল। লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতের জনবহুল বৌদ্ধ সমাজ রাজশক্তিরও অধিকারী ছিল। তাই শঙ্করাচার্যের প্রচারণায় ও প্ররোচনায় ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু জৈনরা ছিল সংখ্যায় অল্প, রাজশক্তি ছিল না তাদের। তাই তাদের প্রতি তেমন বিদ্বেষ ছিল না সংখ্যাগুরু সমাজের। ফলে ভারতে জৈনরা আজো টিকে রয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে মুদ্রার বহুল ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সার্বিক প্রসার ও শিল্পবিপ্লব, কলকারখানার দৈশিক প্রসার, শিক্ষার বিস্তার, রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ও গণতান্ত্রিক অধিকারে অনুরাগজাত দল-চেতনা প্রভৃতিই প্রথমে স্বধর্মী ও স্বসম্প্রদায় চেতনা এবং পরে শ্রেণীচেতনা তীব্র, গভীর ও ব্যাপক করে। বিদ্বেষবিষ, দ্বন্দ্ববোধ, সংগ্রামবুদ্ধি ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে ওঠে প্রবুদ্ধ আত্মোন্নয়নকামী মানুষের মধ্যে এ কারণেই।

৯

ক. বাঙালীর সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত রচনা

॥ ১ ॥

যদিও জৈন-বৌদ্ধরাই সম্ভবত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মগধ অঞ্চল থেকে আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রবেশ করে, তবু অনুমান করা চলে শাস্ত্রীয় ভাষা পালি প্রাকৃতের অপরিমেয় গুরুত্ব সত্ত্বেও জৈন-বৌদ্ধরাও সংস্কৃত একেবারে পরিহার করে চলতে পারে নি। কারণ সংস্কৃত ছিল সর্বভারতীয় ভাষা। আন্তঃআঞ্চলিক মানুষের কথা বিনিময়ের প্রয়োজন ছাড়াও প্রাচীন শাস্ত্র ও ঐতিহ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্যেও তাদের সংস্কৃত চর্চা করতে হত। শাস্ত্র, শিক্ষা ও প্রশাসনের বাহনও সাধারণভাবে ছিল সংস্কৃত। অবশ্য পুণ্ড্রবর্ধনে তথা বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের তাম্রলিপির ভাষা প্রাকৃত এবং তা জনগণের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ। যদিও এই ভাষা প্রশাসনের ভাষা ছিল বলে 'সঙ্গত কারণেই অনুমান করা চলে, তবু মনে হয় বাঙলাদেশে মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমলে সংস্কৃত তার প্রাধান্য কখনো হারায় নি, তা বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্যে প্রমাণিত। কাজেই মৌর্য শাসনে প্রাকৃত চালু করার সুপরিকল্পিত রাজকীয় প্রয়াস [অশোক-অনুশাসনের ভাষাই তার প্রমাণ] থাকা সত্ত্বেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ভাষা, শাস্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অস্ট্রিক-মোঙ্গল অধ্যুষিত বাঙলার আর্যায়ন যে পূর্ণতা পেয়েছিল দু'হাজার বৎসর আগেই, তা আমরা বিনা তর্কে মেনে নিতে পারি। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র কখনো সংস্কৃতের প্রভাব এড়াতে পারে নি। জৈন-বৌদ্ধেরা তাদের শাস্ত্রের বহুল প্রচার মানসে সংস্কৃতেও গ্রন্থ রচনা করেছে। অন্তত দেড় হাজার বৎসর ধরে সর্বভারতীয় শিক্ষা মাত্রই সংস্কৃত বাহনেই সম্ভব ছিল। তাই শাস্ত্র, সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা সংস্কৃতের মাধ্যমেই হয়েছে। অতএব, বাধ্য হয়েই শিক্ষক ও বিদ্বান বাঙালীর সংস্কৃতের চর্চা করতে হয়েছে। শাস্ত্রীয় আচার পার্বণ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এবং পঠন-পাঠনের গরজে তাঁরা গোড়া থেকেই পাঠ্য শাস্ত্রের বা গ্রন্থের টীকাভাষ্য সংস্কৃতেই রচনা করেছেন– পরবর্তীকালের সাক্ষ্যে তাও আমরা অনুমান করতে পারি। যে কোনো বক্তব্য সর্বভারতে প্রচার-প্রয়োজনেও তাঁদের সংস্কৃতের চর্চা করতে হয়েছে। এই জন্যেই টীকা-ভাষ্য-ব্যাকরণের আকারে বাঙালীর বহু সংস্কৃত রচনার উল্লেখ কিংবা সন্ধান মেলে। এগুলো অবশ্যই বিদ্যার বহুল চর্চার স্বাক্ষর। কিন্তু সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন নয়। কাজেই এগুলো সে-কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ্য নয়। তবে বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতার অভিব্যক্তি হিসেবে এই ধরনের রচনাও নিশ্চয়ই বাঙালীর গৌরবের ও গর্বের।

সংস্কৃত চর্চায় বাঙালীর উৎকর্ষের, স্বাতন্ত্র্যের, গৌরবের ও গর্বের বিষয় হচ্ছে বাঙালী সৃষ্ট ভাষাশৈলী— যা 'গৌড়ী' রীতি রূপে সুনামে-দুর্নামে ভারতবিখ্যাত— এ বাঙালী চিন্তা-চেতনার ও রুচি-স্বাতন্ত্র্যের অবিমোচ্য স্বাক্ষর। সাহিত্য ক্ষেত্রে কালিদাস না হোন, নৈষধচরিত ও খণ্ডন খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীহর্ষ যে বাঙালী ছিলেন, তা তাঁর গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও নিদর্শনযোগে নীলকমল ভট্টাচার্য ও ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রমাণিত করেছেন। তা ছাড়া প্রকীর্ণ কবিতায়, গীতিকবিতায় ও সুভাষিত সূক্তিমূলক শ্লোকে-বচনে বাঙালী তার মনীষার ও সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল ও গৌরবজনক সাক্ষ্য রেখেছে এবং কেবল সংস্কৃতে নয়, প্রাকৃতে-অবহট্ঠেও। আর্যাসপ্তশতী, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতরত্নকোষ বা কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয় ও প্রাকৃতপৈঙ্গল সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কাব্যে-নাটকেও তার দান নিন্দনীয় নয়। ন্যায়ে-স্মৃতিতে-দর্শনে নতুনতর শাস্ত্রীয় মতবাদ সৃষ্টিতে তার দান বিপ্লবাত্মক ও যুগান্তকর।[১]

ভাষার বহুল চর্চার প্রসূন ও সাক্ষ্য গৌড়ীরীতি যে অবশ্য আলোচনার বিষয় হয়েছিল, তা বোঝা যায় বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী, বামন, বিশ্বনাথ, রাজশেখর প্রমুখ আলঙ্কারিকের গৌড়ীশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ থেকেই। গৌড়ীরীতি শব্দাড়ম্বর, সমাসবাহুল্য, অনুপ্রাসাধিক্য, অতিভাষণ, ধ্বনি-কার্কশ্য ও প্রচলিত শব্দ প্রযুক্তির জন্যে নিন্দিত, কিন্তু ওজঃগুণ, কান্তি ও কবিত্বের জন্যে প্রশংসিতও।[২]

মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দেড় হাজার বছর ধরে বাঙলায় নানা প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার বহুল চর্চা হলেও সুকুমার সাহিত্য রচনায় বাঙালীর অবদান বেশি নয়— অর্থাৎ কাব্য ও নাটক সৃষ্টিতে তাদের কৃতিত্ব তেমন স্বীকৃত নয়, যদিও আর্যা, গাথা, গীত ও প্রকীর্ণ কবিতার শ্লোক ও বচন রচনায় তারা সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি বাঙলাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাম্রশাসন, পট্টোলী, প্রশস্তিগুলোর মধ্যেও (এগুলোর সংখ্যা প্রায় ১৫০টি)

১. Saraswati Bhavan Studies, Vol. III

২. চিন্ময় বঙ্গ, ৭২-৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিত্ব-পাণ্ডিত্যের দ্যুতি, উচ্ছ্বসিত অতিভাষণ-পটুতা, বাগবৈভব ও অলঙ্কারাড়ম্বর সুপ্রকট। পাল পূর্ব-যুগের বাঙালীর রচিত বলে কথিত গ্রন্থের মধ্যে পালকাপ্য রচিত হস্ত্যায়ুর্বেদ (হাতীর চিকিৎসাশাস্ত্র) ও চন্দ্রগোমী রচিত চান্দ্র ব্যাকরণ ও অন্য বহু তন্ত্র, নাটক, কাব্য ও দর্শনগ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্য রচিত আগম শাস্ত্র 'গৌড়পাদটীকা' ও সাংখ্যকারিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাল আমলে শাসন ও পট্টোলীতে অনেক শাস্ত্রবিদ ও সাহিত্যকলাবিদ জ্ঞানী-গুণীর নাম ও প্রশস্তি মেলে, কিন্তু তাঁদের রচিত গ্রন্থের সন্ধান মেলে নি। দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরবমিশ্র পুরুষানুক্রমে রাজমন্ত্রী ও পণ্ডিত ছিলেন। ভবদেব ভট্ট, চতুর্ভুজ, গৌড় অভিনন্দ, শ্রীধর ভট্ট, সন্ধ্যাকর নন্দী, বৌদ্ধ-বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয় রক্ষিত, বিমলমতি, চিকিৎসাশাস্ত্রী মাধব, চক্রপাণি দত্ত, নিশ্চল কর, সুরেশ্বর, অরুণ দত্ত, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দুকণ্ড, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, বঙ্গসেন, গয়াদাস প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ পাল যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। অতএব পালযুগে আয়ুর্বেদের বহুল চর্চা ও চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৈদিকশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ভবদেব ভট্ট, অনিরুদ্ধ ভট্ট, নারায়ণ প্রমুখের গ্রন্থ মেলে।

পাল আমলের বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন ও তন্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে শীলভদ্র, শান্তি রক্ষিত জেতারি, দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়াকর, গুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, কুমারবজ্র, দনশীল, পুতলি, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মণ, বোধিভদ্র, মোক্ষাকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর এবং চর্যাগীতিকারগণ রয়েছেন (বাংলাদেশের ইতিহাস— রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃ. ১৩৪-৪৩)।

সম্প্রতি মুদ্রারাক্ষস প্রণেতা বিশাখ দত্ত, বেণীসংহার রচক নারায়ণ ভট, অনর্ঘরাঘব প্রণেতা মুরারি, চণ্ডকৌশিক রচয়িতা ক্ষেমীশ্বর বাঙালী নাট্যকার বলে বাঙালীরা দাবি করেন। কিন্তু তাঁদের দাবির ভিত্তি দৃঢ় নয়, তাঁদের যুক্তিগুলো ক্ষীণ ও তুচ্ছ। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার ও অনর্ঘরাঘব প্রসিদ্ধ নাটক। বাঙালীরা যে নাটক রচনা করেন নি, তা নয়, তবে সেগুলো গৌরব করার মতো শিল্পগুণসম্পন্ন নয় বলেই বিদ্বানদের ধারণা। তবু কৃষ্ণমিত্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (১১ শতক) স্মরণীয়। এটি সর্বভারতীয় সমাদর পেয়েছিল এবং ফারসিতেও অনূদিত হয়েছিল। বাঙালী রচিত এমনি অনেক নাটকের নাম মেলে পনেরো শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩১ খ্রী.) সাগরনন্দী রচিত 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' নাটক নাট্যকলা গ্রন্থে। যেমন মারীচ-বঞ্চিতক, কেকয়ীভরত, কৃত্যারাবণ, বালিবধ, কীচকভীম, শর্মিষ্ঠা পরিণয়, উৎকণ্ঠিতমাধব, রেবতীপরিণয়, কেলি রৈবতক, উষাহরণ, রাধা, সত্যভামা, উন্মত্ত-চন্দ্রগুপ্ত, মায়া কাপালিক, ক্ষপণক কাপালিক, মদনিকাকামুক, মায়াশকুন্ত ইত্যাদি (ডক্টর সুকুমার সেন উদ্ধৃত : পৃ. ৩৩, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ।) রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী নাটক, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের চৈতন্যচন্দ্রোদয় বৈষ্ণব সমাজে চির আদৃত।

কাব্যের মধ্যে অভিনন্দের রামচরিত প্রথম উল্লেখ্য কাব্য। কিন্তু তিনি বাঙালী ছিলেন কি গুজরাটী ছিলেন, তা নিয়ে তর্ক আছে। তবে একজন গৌড়বাসী গৌড়াভিনন্দ যে প্রকীর্ণ কবিতার রচক ছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণাকৃত নামের সংকলন গ্রন্থ দুটোতে। 'নৈষধচরিত' নামের মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীহর্ষকে এখন প্রায় নিঃসংশয়ে বাঙালী কবি বলে দাবি করা চলে। কীচকবধ কাব্য রচয়িতা নীতিবর্মার ওপরও বাঙলা ও উড়িষ্যার (কলিঙ্গের) দাবি আজো অমীমাংসিত রয়েছে, যেমন রয়েছে জয়দেবের ওপর। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত তো বাঙালীর বটেই, তারপর আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত, ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী বাঙালীর গৌরব-গর্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলম্বন। তেরো শতকের রামচন্দ্র কবিভারতী ও চতুর্ভুজ প্রসিদ্ধ। এবং ষোল-সতেরো শতকে রচিত মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও স্বরূপ দামোদরের চৈতন্যচরিত রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী ও নাটক প্রভৃতি বহির্বঙ্গে প্রচলিত বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য। এ-ছাড়াও পদ্মনাভ মিশ্র, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণনাথ, রাম দয়াল, রাম গোপাল, লম্বোদর বৈদ্য, গোপেন্দ্রনাথ, অম্বিকা চরণ, মহিলা কবি প্রিয়ংবদা, রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই সতোরো-আঠারো শতকে দূতকাব্যাদি রচনা করেছেন।

আগেই বলেছি, বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার এবং কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল তাম্রপট্ট, শিলালিপি, মন্দির লিপি, প্রশস্তি ও আর্যা বা প্রকীর্ণ কবিতা আর শ্লোক, বচন প্রভৃতি। প্রায় দেড়শ খানার মতো শাসন, শিলালিপি ও প্রশস্তি আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্যযুগে (খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে) উৎকীর্ণ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রথম লিপিটিতে মাগধী-প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী হরফ ব্যবহৃত। আর সব সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এগুলোর কোন কোনটা কবিত্বগুণে ও তোয়াজ-স্তুতি জ্ঞাপক উপমাদি অলংকার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উজ্জ্বল। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর শাসন, ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, বল্লাল সেনের সীতাহাটি অনুশাসন, বিজয় সেনের বরাকপুর শাসন, দেওপড়ায় প্রাপ্ত ভোজ বর্মের তাম্রশাসন, ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর মন্দিরস্থ প্রশস্তি ও বিজয় সেন প্রশস্তি, লক্ষ্মণ সেনের শাসন, নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র প্রশস্তি প্রভৃতি কবিত্ব ও স্তুতি-কাব্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। তাছাড়া এসব অনুশাসন ও প্রশস্তিই আমাদের বিলুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসের দিগদর্শন— সেই কারণে এগুলোর গুরুত্ব অশেষ।

শিক্ষিত বাঙালী দু'হাজার বছর ধরে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় দর্শনচর্চা করছেন। পঠন পাঠন ও যজন-যাজনের তাগিদে তাঁদেরকে শাস্ত্র ও দর্শনের টীকা-ভাষ্যও রচনা করতে হয়েছে। শিক্ষার বাহন যেহেতু সংস্কৃত এবং তা-ই সর্বভারতে শিক্ষিতজন-বোধ্য একমাত্র ভাষা, সেহেতু টীকা-ভাষ্যও রচিত হয়েছে সংস্কৃতে। ফলে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য অধ্যাপক আচার্য পুরোহিতের সংস্কৃতে টীকাভাষ্য লিখতে, পড়তে ও বুঝতে হয়েছে।

বাঙলার মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ পণ্ডিতরা যে সংস্কৃতে এমনি অসংখ্য টীকা-ভাষ্য, তন্ত্রগ্রন্থ এবং মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথপন্থ, কৌলপন্থ প্রভৃতি উপমত সম্পর্কিত বহু তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার অনুবাদমূলক নির্দশন মেলে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রচারে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। তাই রক্ষকের অভাবে ও ব্রাহ্মণ্যবাদীর বিরূপতায় বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য এদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একটা জনবহুল প্রবল ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ঐতিহ্য-নিদর্শন এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত বিস্মৃত হওয়ার নজির বোধ করি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই। আজ জ্ঞানবলে মানুষ জগৎ ও জীবনের জন্ম-রহস্য, তার বিগত জীবনের বিলুপ্ত-বৃত্তান্ত, সৌরজগৎ ও নভোলোকের সব তত্ত্ব ও তথ্য দার্পণিক স্বচ্ছতায় জ্ঞানচক্ষুর গোচরে আনছে। এ-যুগে কিছুই আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। তাই জ্ঞানী মানুষেরা আজ ভারতের বৌদ্ধ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপরেখা নানাভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন।

সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র যে বাঙালী চিন্তা-চেতনার প্রসূন এবং বাঙালীর মননে-আচরণেই যে সেগুলো পুষ্ট ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সে তথ্য আজ আর গুহায়িত নয়। অস্ট্রিক-মোঙ্গল তত্ত্বচিন্তার, অধ্যাত্ম সাধনার ও সাংস্কৃতিক চেতনার এ প্রসূন ও নিদর্শন বাঙালীর স্বকীয়তার স্বাতন্ত্র্যের ও মনন-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য। বাঙালী সত্তার ও মননের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্পৃহা থেকেই এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভব। মহাযান প্রভাবিত বজ্রযান-সহজযান-নাথপন্থ-কৌলপন্থ এবং মন্ত্রযান-কালচক্রযান প্রভৃতি নামসার বিকৃত বৌদ্ধ মতগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ বাঙলাদেশেই এবং এগুলোর বিস্তার ও প্রসার ঘটে কমবেশি গোটা বৌদ্ধ জগতেই। এ পথেই একদিন বাঙালীর অধ্যাত্ম বিকাশ ও আত্ম-বিস্তার ঘটেছিল, সম্ভব হয়েছিল তার বিশ্বব্যাপী তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়। পরিবেশও ছিল অনুকূল। মৌর্য, পাল ও চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধেরা এখানে রাজত্ব করেছেন দীর্ঘকাল। তাছাড়া পর্বতবেষ্টিত বাঙলার পার্বত্য-মোঙ্গলেরাই ছিল সাংখ্য যোগ ও তন্ত্রের হয়তো আদি উদ্ভাবক। অস্ট্রিক-মোঙ্গল রক্তসঙ্কর বাঙালী উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রে, কায়াসাধনে ও দেহতত্ত্বে দীক্ষা। যে-সব জ্ঞানী-মনীষী-তাত্ত্বিক ও সাধকের ঐকান্তিক চর্চা ও চর্যার ফল এই শাস্ত্র ও দর্শন, নাম জানি আমরা তাঁদের কয়েকজনেরই মাত্র— কপিল, পতঞ্জলি ও মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুফা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, শান্তিদেব, শান্ত রক্ষিত, কমলশীল, মহাজেতারি, জেতারি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, সরহ, কঙ্কুরীফা, লুইফা, শবরফা প্রমুখ। চর্যাগীতি ও দোহাকোষ ছাড়া মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলজ্ঞাননির্ণয়, লুইফার অভিসময়বিভঙ্গ, শীলভদ্রের আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান, শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষা-সমুচ্চয় প্রভৃতিই একালে প্রখ্যাত। বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধসংকলিত সুভাষিত রত্নকোষ এবং সদুক্তিকর্ণামৃতে আমরা বহু বৌদ্ধ আর্যাকার ও শ্লোক-বচন রচয়িতার সন্ধান পাই। শেষ বৌদ্ধ রচক সতেরো শতকের রামচন্দ্র কবিভারতী।

বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বৌদ্ধ বংশজ ব্রাহ্মণ্যবাদীর অনুশীলনে ও পরিচর্যায় আরো বিকাশ লাভ করে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ যোগী (তাঁতী), বৈষ্ণব-সহজিয়া, হিন্দু-মুসলিম সমাজভুক্ত বাউল ও নাথপন্থীর মধ্যে এবং অন্যান্য অধ্যাত্মসাধক সম্প্রদায়ে নানা নামের আবরণে আজো চালু রয়েছে। দেহতত্ত্ব, দেহাত্মবাদ ও কায়াসাধন তাই বাঙালীর আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম ও চর্যা। মধ্যযুগে গৌড়পাদ, পরিব্রাজকাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থের সংকলক ও ভাষ্যকার।

আগেই বলেছি, শাস্ত্রীয় গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য রচনায় বাঙালী পণ্ডিতদের উৎসাহের অভাব ছিল না। সেন আমল থেকেই বাঙলার বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্য সমাজে বেদ-বেদান্তের বহুল চর্চা শুরু হয়। উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজারা দীক্ষিত হিন্দুদের বর্ণে বিন্যস্ত করে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ এনে শাস্ত্র ও সংহিতাদির অনুসরণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিরত। তাই এগারো বারো শতকে ব্রাহ্মণ্য পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে। তবু বিকৃত বৌদ্ধ সংস্কার জাত লৌকিক দেবতা এবং লোকায়ত আচার-সংস্কারও রয়ে গেল— বহু চেষ্টায়ও বিদূরণ-বিনাশন সম্ভব হল না—প্রকাশ্যে যেখানে বাধা, সেখানে গুপ্তভাবে চলতে লাগল। তুর্কী বিজয়ের ফলে তা আবার শত গুণে বৃদ্ধি পেয়ে ও প্রবল হয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেরও অনুশীলন প্রবলভাবেই চলতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আলোচনা ও টীকা-ভাষ্য রচনা বৃদ্ধি পায়।

বৈদিক শাস্ত্র-সাহিত্যের টীকা-ভাষ্যকারদের মধ্যে শালিকনাথ (সপ্তম শতক), মদন (নবম শতক), ভট্ট ভবদেব (অষ্টম-নবম), জীমূতবাহন (বারশ), অনিরুদ্ধ (বারশ), বল্লাল সেন (বারশ), হলায়ুধ মিশ্র (বারশ), শূলপাণি (পনেরো শতক), বৃহস্পতি রায় মুকুট (পনেরো শতকের প্রথমার্ধ), শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, রঘুনন্দন (পনেরো শতক) এঁরা ছাড়াও চিৎসুখমণি, পুরুষোত্তম, গৌড়পূর্ণানন্দ কবি চক্রবর্তী, দর্ভপাণি, রামনাথ সিদ্ধান্তবাচস্পতি, শ্রীকর আচার্য, কালি শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতিও উল্লেখ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায় দর্শনে শ্রীধর ভট্ট (৯৯১ খ্রী.-ন্যায় কন্দলী) ও ভট্ট ভবদেব, হলায়ুধ মিশ্র, কুল্লুক ভট্ট, বৃহস্পতি রায়মুকুট, রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম, মধুসূদন সরস্বতী, নরহরি বিশারদ, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি, এবং বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনায় সনাতন-রূপ-জীব-গোপাল ভট্ট, পরমানন্দ সেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

ব্যাকরণ-অভিধান সংকলকদের মধ্যে ব্যাকরণে চন্দ্রগোমী, টীকায় সুভূতি চন্দ্র ও সুখ্যাত বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ উল্লেখ্য। ধ্রুবানন্দ, দৈবকী ঘটক, নুলু পঞ্চানন প্রভৃতিও কুলজি সাহিত্য বা 'কুলপঞ্জী' রচয়িতা হিসেবে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয় নাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং হলায়ুধ মিশ্রের শেখ শুভোদয়া কেবল কাব্য কিংবা জীবনচরিত নয়— সমকালের ইতিহাসও।

অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপ গোস্বামী রচিত উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, কবি কর্ণপুরের অলঙ্কার-কৌস্তভ বিশেষ অবদান। ছন্দ শাস্ত্রে আঠারো শতকের শেষার্ধের নরহরি চক্রবর্তীর ছন্দসমুদ্র স্মরণীয়। বৈদ্যক শাস্ত্রে তথা আয়ুর্বেদে শূলপানি মাধবকর (৭ শতক), চক্রপাণি দত্ত (১০৬০ খ্রী.), নারায়ণ (১১ শতক), গঙ্গাধর (১২ শতক), বিজয়রক্ষিত (১২৪০ খ্রী.), সুরেশ্বর (১৪ শতক), বঙ্গসেন (১৪ শতক), পরমেশ্বর রক্ষিত প্রভৃতি প্রধান। গণিত শাস্ত্রে শ্রীনিবাস বৃহস্পতি ও তাঁর পুত্রদ্বয় বিশ্রাম ও রাম স্মরণীয়। সঙ্গীততরঙ্গ ও সঙ্গীতরত্ন রচয়িতা রাধামোহন সেনের নামও উল্লেখ্য। কবিপণ্ডিত, চূড়ামণি আচার্য, কবিচক্রবর্তী, রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি বাঙলার সুলতানদের প্রিয় ছিলেন।

॥ ২ ॥

তিনটে আর্যা বা শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। এর একটি বারো শতকের কবি গোবর্ধন আচার্য রচিত। ইনিও রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ও সভাপণ্ডিত। জয়দেবও সমকালের শক্তিমান কবি হিসেবে এঁর তারিফ করেছেন। গোবর্ধনের গ্রন্থের নাম 'আর্যাসপ্তশতী' কিন্তু আর্যা বা শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ৭৫৬। 'আর্যা' ছন্দের নাম, প্রাকৃতে যেমন একটি ছন্দের নাম গাথা। আর্যা ছন্দে রচিত বলেই গ্রন্থ নামে 'আর্যা' যুক্ত এবং প্রতিটি শ্লোকও আর্যা নামে পরিচিত। গাথা ছন্দে রচিত বলেই হালের কবিতা সংকলনের নাম 'গাহা সত্তসঈ'। শ্লোকগুলো বর্ণনানুক্রমিক 'ব্রজ্যা'য় তথা গুচ্ছে বিন্যস্ত।

গোবর্ধনের আর্যায় প্রেম, প্রকৃতি, লোকচরিত্র, লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস, ঘরোয়া জীবন, আপ্তবাক্য প্রভৃতি সব কিছুই রয়েছে। তাই এটি সর্বভারতীয় প্রচার ও সমাদর লাভ করেছিল। দারিদ্র্য ও পীড়নের চিত্র রয়েছে ২৭, ৩০৪, ৩১৫, ৩৭১, ৪৯২ সংখ্যক আর্যায়।

বিদ্যাকর সংকলিত বহু কবির প্রকীর্ণ কবিতার সঞ্চয়নের নাম 'সুভাষিত-রত্নকোষ'। এই সংকলন গ্রন্থের নামহীন খণ্ডাংশ আগেই উদ্ধার হয়েছিল, সে অংশ প্রকাশকালে F. W. Thomas নাম দিয়েছিলেন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। অবশ্য পাণ্ডুলিপির একস্থানে এ নামটি পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি সবটাই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটির সংকলক বিদ্যাকর প্রদত্ত নাম 'সুভাষিত রত্নকোষ'।

কবিগণের সবাই বারো শতকের পূর্বেকার বলে মনে হয়। কালিদাস-ভবভূতির শ্লোকও রয়েছে। ১১১ জন কবির অধিকাংশই অশ্রুতপূর্ব নাম, — এঁরা সম্ভবত গুপ্ত ও পাল আমলের এবং বৌদ্ধ সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু নামও রয়েছে কবিদের। তাছাড়া বুদ্ধ প্রশস্তি দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বানেরা অনুমান করেন, সংকলক বিদ্যাকর এবং কিছু কবি বৌদ্ধ ছিলেন। শৃঙ্গার ও ঋতু বিষয়ক পদের সংখ্যাই বেশি। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষারূপে জন-জীবন ও জীবিকার, ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের আচার ও সংসারের চিত্রও সুলভ। বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিবেশ ও জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই অধিকাংশ পদ বাঙলার ও বাঙালীর বলে ধরে নিয়ে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'কে বা 'সুভাষিত রত্নকোষ'কে বাঙলার সম্পদ বলে দাবি করা হয়। বিশেষত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলো দৃষ্টে মনে হয় অধিকাংশ কবি আট-নয়-দশ-এগারো শতকের এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী।

দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থটি সুবিখ্যাত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ২১তম বছরে ১১২৭ শকে বা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে এটি সংকলিত। সংকলক শ্রীধর দাস ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে একজন শাসনকর্তা[১] বা মহামাণ্ডলিক। তাঁর পিতা বটুদাসও ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও প্রতিরাজ বা রাজপ্রতিনিধি। সদুক্তিকর্ণামৃতে সমকালীন বাঙালী কবিদেরও পদ সংকলিত রয়েছে— লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, দিবাক, জয়দেব, বাসুদেব সেন, ধোয়ী, শরণ উমাপতি ধর, গোবর্ধন, গঙ্গোক প্রভৃতির। এই গ্রন্থের প্রকীর্ণ বা চুটকী কবিতায় জীবন-জীবিকা, সমাজ-ধর্ম, রুচি সংস্কৃতি প্রেম-প্রকৃতি, আর্থিক-অবস্থা, নৈতিক-চেতনা প্রভৃতি উপমাদির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে পদ সংখ্যা ২৩৭০টি। কবির সংখ্যা ৪৮৫। প্রায় পাঁচশত পদ অজ্ঞাতনামা কবিদের। পদগুলো বিষয়ানুযায়ী প্রবাহে বিভক্ত।

সুখের ও তুষ্টির চিত্র দেখে মনে হয় বাঙালীর মধ্যে উচ্চবিত্তের মানুষ কমই ছিল। নিম্নমানের জীবনযাত্রায় তারা ছিল সুখী। সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত কবি যোগেশ্বর রচিত একটি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে আশুতোষ গ্রামীণ মানুষের স্বস্তিসুখ :

ব্রীহিঃ স্তম্বকারিঃ প্রভুত পয়সঃ প্রত্যাগতা ধেনবঃ
প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুণা ভৃশমিতি ধ্যায়ন্নপেতান্যধীঃ।
সান্দ্রোশীর কুটুম্বিনী স্তনভর ব্যালুণ্ডঘর্মক্রমো
দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ।

—বারিধারা পেয়ে ধান [গাছ] জাগে, গরু ফিরে আসে ঘরে। অঙ্কুরিত ইক্ষু ক্ষেতে সম্পদ-সম্ভাবনা, জীবনে তাই দুর্ভাবনা অপসৃত। শ্রান্তিমুক্ত যৌবনবতী বধূদের অবসরে উশীর প্রসাধনে রতা, প্রবল বর্ষণকালে আঁধার নিশীথে গ্রামীণ তরুণ সুপ্তিসুখে একা রয়েছে কুটিরে।

ওই সংকলন গ্রন্থের অন্যত্র রয়েছে অনুরূপ আর একটি শ্লোক :

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল-
স্নিগ্ধশ্যাম-যব-প্ররোহ-নিবিড় ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত ধেন্বনড়ুহস্ছাগাঃ পলালৈর্ণবৈঃ
সংসক্তধ্বনদিক্ষু যন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ।

[এখন] কাটা শালিধানে সমৃদ্ধ চাষীর ঘর। যবের ফলনও হয়েছে অধিক। যবের শীষগুলো শ্যামল-স্নিগ্ধ নীলপদ্মের মতো।

---

১. ইখতিয়ারউদ্দীন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত নবদ্বীপ তথা গৌড় জয় করেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এর আগেই সংকলিত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ২৭তম বর্ষে। তা হলে লক্ষ্মণ সেনের অন্তত ১১৭৬ সনের দিকে সিংহাসন পান। অতএব এগুলো ১২০৩ সনের পরের হতেই পারে না। অবশ্য অনুগত স্তাবক লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় স্বীকার না-ও করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরু-ছাগলও ঘরে ফিরে নতুন খড় পেয়ে বেশ আনন্দিত। অবিরাম আখমাড়াই যন্ত্রের শব্দে গ্রামগুলো মুখর এবং নতুন গুড়ের গন্ধে আমোদিত।

যাযাবর জীবনের অবসানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যভিত্তিক নগর সভ্যতার শুরু থেকেই গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা শাসন-শোষণে পীড়ন-পেষণে কেবল বেড়েইছে, অধিকাংশ মানুষ দাস হিসেবে তো গৃহপালিত পশুর প্রাপ্য আদর যত্নও পেত না। অন্যান্য মানুষও কেবল কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণই কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখত— তাও সব সময় সম্ভব হত না। খরা-বন্যা-ঝঞ্ঝা-দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারীতে গাঁ উজাড় হয়ে যেত। সেকালে শাহ-সামন্ত প্রভুর সহচর-অনুচর-নায়েব-গোমস্তা, মুৎসুদ্দি-মোল্লা-পুরুতরা ছিল প্রবলপ্রতাপ মধ্যবিত্ত এবং শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের নিয়ন্তা। তাদের হাতেই মার খেত গণমানব। সে মার ছিল শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক সর্বপ্রকার। এ জন্যেই দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-অনাহার-মৃত্যু-পীড়ন-পেষণ ছিল সমাজে নিত্যকার দৃশ্য। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কয়েকটি শ্লোকে সেই চিরন্তন চিত্রের স্বাক্ষর রয়েছে।

ক. ক্ষুৎ কামা শিশবঃ শবা ইব তর্নু মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে
গোহিন্যাঃ ক্ষুটিতাংশুকং ঘটায়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপাত্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুং সূচীং যথা যাচিতা।

— শিশুসন্তানরা ক্ষুধায় পীড়িত, শবের মত শীর্ণ দেহ, আত্মীয়রা আদর করে না, পুরোনো জীর্ণ পাত্রে স্বল্প জল ধরে, এ সবও আমাকে তেমন দুঃখ দেয়নি, যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছিন্ন কাপড় সেলাই করবার জন্যে বিরক্ত প্রতিবেশীর কাছে সূঁচ ধার চাচ্ছেন।

খ. বৈরাগ্যেক ভনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুৎ সমভ্যর্থিতা
দীন দুস্থ কুটুম্বিয়া পরিগলদবাষ্পাম্বুধোতানাপ্যেকং
তণ্ডুলমানকং দিনশতঃ নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি।

— বৈরাগ্যে তার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়, ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরাগত, পেট বসে গিয়েছে, তারা ব্যাকুল হয়ে খাদ্য চাইছে। দীনা দুস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে— এক মণ চালে যেন তাদের একশ দিন চলে।

গ. চলৎকাষ্ঠং গলৎকুভ্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডু পদার্থি মণ্ডুকাকীর্নং জীর্নং গৃহং মম।।

— ঘরের কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় জড়ো হয়ে গেছে, আমার জীর্ণ ঘর কেঁচো থেকো ব্যাঙে আকীর্ণ।

ঘ. সা বরমবৃনীত পুত্রা মে বহুক্ষীরঘৃতম
ওদং কাংস্যাপাত্র্যাং ভুক্তীরন ন ইতি।
সুকুমার সেন, (বঙ্গভূমিকা পৃ. ৩৩ উদ্ধৃত)

— বর দাও, আমার পুত্ররা যেন কাঁসার পাত্রে দুধ-ঘি দিয়ে ভাত খায়।

এ চিত্র সেকালের নয়, আজকেরও। এ চিত্র চিরকালের-চিরন্তন।

আবার বাঙালী নারীর তথা গৃহবধূর স্বভাব ও লজ্জার বর্ণনায়ও রয়েছে দারিদ্র্যের ছাপ। কবি লক্ষ্মীধরের চোখে বাঙালী নারী বা বধূরা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোত্থদেবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মমধুমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদিয়মঙ্গলা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্।

— লজ্জাবনতা, অবগুণ্ঠিতা ধীরগামিনী, পদে নিবদ্ধদৃষ্টি, মিত-মধুর ভাষিণী [বাঙালী বধূর] ও গুণগুলো তার উচ্চকুলমর্যাদা জ্ঞাপন করেছে।

রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে গৌড়ের নারীদের সাধারণ সজ্জার বর্ণনা রয়েছে:

আর্দ্রদ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ সীমন্ত চুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ।
দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচিরাম্বগুরূপভোগাদ্ গৌড়াঙ্গনাসুচিরমেষ চ কান্ত বেশ।

— বুকে আর্দ্রচন্দন, গলায় সূত্রহার, সীমন্ত ছোঁয়া অবগুণ্ঠন, অনাবৃত বাহুমূল, দূর্বার মতো স্নিগ্ধমসৃণ-শ্যামবর্ণ দেহশ্রী গৌড় নারীর বেশ-ভূষা।

কবি চন্দ্র-চন্দ্রও বলেন :

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণ স্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিল ফলোত্তংসশ্চ কর্নাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিল পল্লবভিষবর্ণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্য নাগর বধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ।

— কপালে কাজলের টিপ, হাতে চাঁদের মতো শাদা মৃণালের খাড়ু, কানে রীঠাফুলের দুল এবং কবরীতে রয়েছে তিলপাতা—বধূদের এ বেশ [মুগ্ধ] পথিকদের চলার গতি মন্থর করে দেয়।

উক্ত দুই সংকলন গ্রন্থের যেসব কবিকে বাঙালী বলে অনুমান করা হয়, তাঁরা হলেন মধুশীল, শ্রীধর নন্দী, রতিপাল, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষ দেব, বীর্যমিত্র, শ্রীধর্ম কর, বৈদ্যধন্য, বন্দ্য তথাগত, বিনয় দেব, শ্রীরাজ্য পাল, ধরণী ধর, লক্ষ্মীধর, সুবর্ণ রেখ, জয়ীক, বিত্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোহ্নোক, হিঙ্গোক, জিতারি নন্দী, কবিরাজ ব্যাস, উদয়াদিত্য, বার, নীলাঙ্গ, বেতাল, বিরিঞ্চি, বাচস্পতি, ধর্মযোগেশ্বর। আর নিশ্চিত প্রমাণের বাঙালী কবি হচ্ছেন গৌড়াভিনন্দ, রাজা লক্ষ্মণসেন— তাঁর সভাসদ ও আত্মীয়রা এবং কমলগুপ্ত, রবিগুপ্ত, যজ্ঞঘোষ, চন্দ্রচন্দ্র, তিলচন্দ্র, লড়হচন্দ্র, দিবাকর দত্ত, প্রভাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল, গাঙ্গোক, নাথোক, বাথোক, ধনঞ্জয়, শবর ও বাঙ্গাল।

[সুকুমার সেন, ১ম পৃ. পৃ. ৩৪-৩৫]

প্রখ্যাত বাঙালী বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ 'অমরকোষের' প্রাচীনতম টীকাকার বলে কারো কারো বিশ্বাস। তাঁর রচিত টীকার নাম, 'টীকাসর্বস্ব'। এতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু আর্যা বা শ্লোক উদ্ধৃত। সেই সব শ্লোককারদের অনেকেই হয়তো বাঙালী। সর্বানন্দ বারো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

তাঁর 'টীকাসর্বস্ব' ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত। তাঁর 'টীকাসর্বস্ব' থেকে সে যুগের ব্যবহারিক জীবনের কিছু আভাস মেলে। যেমন— "বেদেকে 'বাদীয়ারা' বলা হতো তারা সাপ ধরতো। লোকে জুয়া খেলতো। জুয়ার সাথীদের বলা হতো 'সহিঅর' এবং জুয়ার পণকে বলা হতো 'আঢ়'। তেলীরা চামড়ার মশকে তেল রাখতো এবং সেই মশকের নাম ছিল 'কুড়ুআ'। মেয়েরা খোপ্য (খোঁপা) বাঁধতো। বহুখণ্ড (বাউটি), তাড়ঙ্গ (তাড়) প্রভৃতি অলঙ্কার পরতো। পুরুষেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোটাচূড় (বাবরি) রাখতো এবং টোপর পরতো। ঘৌড় ও 'করকচ' নামে দুই রকমের লবণের ব্যবহার ছিল। পূর্ববঙ্গের লোকে 'সিধম্যলা'' (শুঁটকি মাছ) খেতো।"

[মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাংলা সাহিত্যের কথা–১ম খণ্ড]

'বৃত্ত রত্নাকর' নামের গ্রন্থ রচয়িতা বাঙালী কেদার ভট্টেরই হয়তো পিতা ছিলেন 'বাসনামঞ্জরী' প্রণেতা পোব্যোক। পিতা-পুত্রের দুই গ্রন্থেই রয়েছে জন-জীবনের চিত্রসম্বলিত বহু শ্লোক। পনেরো শতকে সংকলিত 'সুভাষিতাবলী' নামের শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থটি এ সূত্রে স্মরণীয় এবং ষোল শতকের রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলীধৃত' কিছু শ্লোক এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বারো শতকে ভারতবিখ্যাত কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। বন্দনাংশে গৌতমবুদ্ধও প্রণাম পেয়েছেন এবং বন্দনাংশে কবি স্বয়ং একে মঙ্গলগান বলেছেন— 'মঙ্গলম উজ্জ্বল গীতি'। গীতগোবিন্দ একটি নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্য। তা সত্ত্বেও এটি একটি উৎকৃষ্ট কাব্যও—এমন কি, মহাকাব্যের আঙ্গিক আদলযুক্ত। 'গীতগোবিন্দ' বারোটি সর্গে বিভক্ত। এতে চব্বিশটি গান রয়েছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে শ্লোক। বসন্তকালে রাধা ও কৃষ্ণের মান জাত বিচ্ছেদ ও পরিণামে সখীর মধ্যস্থতায় মিলনই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ছন্দলালিত্যে, ভাষাসারল্যে, রসমাধুর্যে এবং মৌলিকতায় 'গীতগোবিন্দ' অনন্য।

জয়দেব 'কেন্দ্রবিল্বসম্ভব রোহিণীরমণ' বলে ভণিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় তাঁর জন্ম 'কেন্দ্রবিল্ব' গ্রামে এবং স্ত্রীর নাম রোহিণী। বীরভূমে এখন কোনো কেন্দ্রবিল্ব বা কেঁদুলী গাঁ নেই। কিন্তু অজয় নদীর তীরে 'জয়দেব কেঁদুলী' মেলা আছে। ঐখানেই কেন্দুবিল্লি কেঁদুলী গাঁ আছে। তবে জয়দেব 'কেঁদুলী মেলা' বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে, অথবা তিনি ভিন্ন জয়দেবও হতে পারেন। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যাবাসীরা এখন জয়দেবকে উড়িয়া বলে দাবি করেন। সেখানে নাকি পুরীর অদূরে 'কেন্দ্রবিল্ব' গাঁ আজো বর্তমান। মিথিলাবাসীরাও বলেন তীরহুত জেলায় কেন্দুলীতে ছিল জয়দেবের নিবাস। দ্বিজ মোহনদাসের 'ভক্তমাল'[১] সূত্রে জানা যায় 'কেন্দ্রবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে।' এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের গন্ধর্বমতে মালাবদলের মাধ্যমে 'পুষ্পের বিভা দোঁহার হইলা।'— এ তথ্য যদি বানানো না হয়, তা হলে বলতে হবে পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না।

গীতগোবিন্দের কোনো কোনো পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি শ্লোকে জয়দেবের আত্মপরিচয় রয়েছে। শ্লোকটি :

শ্রীভোজ দেব প্রভবস্য বামা (রামা) দেবীসূতঃ শ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু।

অতএব কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামা বা রামা দেবী। ডক্টর সুকুমার সেন "বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় অর্থে 'বন্ধু' ব্যবহৃত ধরে পরাশরকে শ্যালক ও প্রধান গায়ক বলে অনুমান করেছেন। নাচে পদ্মাবতী এবং গানে পরাশরাদি দোহার ছিল, আর জয়দেব স্বয়ং ছিলেন নৃত্য শিক্ষক [পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী] ও দলের অধিকারী। তা হলে জয়দেব পেশায় ছিলেন কবি গায়েন। গীতগোবিন্দের গানগুলো সখী রাধা ও কৃষ্ণের গেয়। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-যেখানেই জয়দেবের জন্ম হোক না কেন তিনি যে গৌড়ে ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের সভায় ও সভাকবিদের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতএব তিনিও

১. 'ভক্তমাল' পুথির পরম্পরায় 'জয়দেব-পদ্মাবতী কথা' ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল 'সুবর্ণ লেখা' ক. বি. পৃ. ৫৯৬-৬০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাপতির মতোই বাঙলার ও বাঙালীর কবি। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত এ শ্লোকটা আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে :

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারাপিত
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোহাসি হুষ্টাবয়ম্।

তাছাড়া ষোল শতকে রচিত দ্বিজ মোহনদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এবং আঠার শতকে রচিত বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত' গ্রন্থে জয়দেবের জন্মভূমি বীরভূমে 'কেন্দ্রবিল্লি' গাঁয়ে বলে উল্লেখ রয়েছে (সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' জয়দেব, পৃ. ১৩-১৪।) এবং ষোল শতকে সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে ও কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের (১৫৫৫-৮৭) সভাকবি শুক্রধ্বজরচিত গীতগোবিন্দের টীকায় যথাক্রমে জয়দেবকে কবিমন্ত্রী উমাপতিধরের সহচর ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

জয়দেব একটি শ্লোকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন :

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিবরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্ধনস্পর্ধী
কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি।

— উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করেন, জয়দেব শুদ্ধসন্দর্ভরচনায় সমর্থ, দ্রুত দুরূহ পদরচনায় শরণ শ্লাঘ্য, শৃঙ্গার রসের সৎ ও প্রমেয় (পরিমিত) পরিবেশনায় গোবর্ধনাচার্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিশ্রুত আর কবিলক্ষ্ম-পতি (কবিরাজ) ধোয়ী শ্রুতিধর। এতে হলায়ুধ মিশ্রের নাম নেই। বলা বাহুল্য জয়দেব, উমাপতিধর ও শরণের প্রকীর্ণ কবিতা, গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী, ধোয়ীর 'পবনদূত', নট গঙ্গোকের শ্লোক, হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক মীমাংসাগ্রন্থ ও 'শেখ শুভোদয়া' রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভা অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পবনদূতের নায়ক লক্ষ্মণ সেন, এটি বিরহকাব্য 'মেঘদূতের' আদলে রচিত; শ্লোক সংখ্যা ১০৪। বিচ্ছিন্ন শ্লোকও তিনি রচনা করেন। পনেরো শতকে সংকলিত শ্লোকগ্রন্থ 'সুভাষিতাবলী'তেও লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের উল্লেখ রয়েছে :

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতো [বা পঞ্চেতে] লক্ষ্মণ সেনস্য চ।

দীর্ঘজীবী উমাপতিধর বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সভায় ছিলেন, দেওপাড়ার বিজয়সেন প্রশস্তি ও মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন তাঁরই রচিত বলে মনে করা হয়। সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত একটি শ্লোকই তার প্রমাণ :

সাধুম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্নীচে না পি
ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।

—সাধু হে ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, আপনার বীর প্রসবিণী মাতা, নীচ (কুলোদ্ভব।) হলেও আপনার মতো লোক দিয়েই পৃথিবী এখনো সুক্ষত্রিয়পূর্ণ রয়েছে।

কবি ধোয়ীর একটি শ্লোকে বাঙালীসুলভ কামনা প্রকাশ পেয়েছে—ঐশ্বর্য নয় ঈশ্বরী পাটনীর মতো 'দুধ-ভাত', কবিযশ, গঙ্গাতীরে বাস, সজ্জনের প্রীতি ও অচলা বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি। তেরো শতকের কবি রামচন্দ্র কবিভারতীর 'ভক্তি শতক' ও 'বৃত্তমালা' উল্লেখ্য রচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় সংস্কৃত রচনার একটি নামসার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হল। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বাঙলার ও বাঙালীর শাস্ত্র, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবহমান রেখেছিলেন, যাঁরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁদের নাম অন্তত আমাদের স্মরণে রাখা আবশ্যিক। তেমন নাম হচ্ছে শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অতীশ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, কপিল, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুফা, শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত, ভবদেব ভট্ট শ্রীহর্ষ, অনিরুদ্ধ, রঘুনন্দন, ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট, উমাপতি, জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্ধন, বল্লাল সেন, জীমূতবাহন, সন্ধ্যাকর নন্দী, বিদ্যাকর, সর্বানন্দ, গৌড়াভিনন্দ, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গোবিন্দ দাস, শ্রীধর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, ধ্রুবানন্দ, দৈবকী, নুলু পঞ্চানন, স্বরূপ দামোদর, বিল্বমঙ্গল (কর্ণামৃত রচয়িতা) প্রভৃতি।

খ. প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ রচনা

বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলিত বা রচিত কোন প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। মৌর্য বংশীয় রাজার একটি প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে পুণ্ড্রবর্ধন এলাকায় মহাস্থানগড়ে। তাও বাঙালীর রচনা না হওয়ারই কথা। কারণ তখনো বাঙালী আর্যভাষায় পটু হয়ে ওঠেনি।

দাক্ষিণাত্যের মারাঠী-প্রাকৃতে সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' হচ্ছে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পদ সংগ্রহ গ্রন্থ। এর সংকলক হাল। হাল স্বয়ং রাজা বলে উল্লিখিত। কিন্তু কোন্ সময়ের, কোথাকার ও কোন্ বংশের রাজা তিনি তা অনির্ণীত। কেউ বলেছেন তিনি সাতবাহন বংশীয় রাজা। তাহলে তিনি খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন বলে মানতে হয়। কিন্তু তাঁর সংকলিত কবিতাগুলোর অধিকাংশ ভাবে, ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে অন্তত আরো ছয়-সাতশ বছর পরের। কাজেই তিনি ঐ সময়কার সাতবাহন বংশীয় নন। আবার কেউ কেউ বলেন হাল পাঁচ শতকের শালবাহন বংশীয়ই ছিলেন হয়তো। কিন্তু সে বংশীয় হলেই সে কালেরও হতে হবে এমন কোন কারণ নেই। আমাদের অনুমান তিনি সাত-আট শতকে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোন এলাকার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থে ভারতের নানা অঞ্চলের পদ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর সংগৃহীত একটি পদে রাধার (রাহিআর) নাম রয়েছে। আট শতকের আগে রাধা নাম ছিল অজ্ঞাত। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ প্রিয়ার নাম ছিল 'নাপ্পিনাই'—রাধা নয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবৈর্বত, মৎস্য, স্কন্দ, পদ্ম ও দেবী ভাগবত পুরাণে, তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে, পঞ্চতন্ত্রে ও বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে 'রাধা' প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়ে ঐগুলো প্রাচীনত্বের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য লাভ করেছে। অথচ ষোল শতকেও সনাতন গোস্বামী শাস্ত্র গ্রন্থে রাধা নাম খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে ভাগবতের 'অনয়ারাধিতং'-এর মধ্যে রাধা নাম আবিষ্কার করে তুষ্ট ছিলেন [বৈষ্ণবতোষিণী]। আট শতকে রচিত ভট্ট নারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকেই প্রথম নিশ্চিতভাবে রাধা নাম মেলে।

[গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোহ শ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্-। নান্দীশ্লোক]

তাছাড়া 'গাহাসত্তসঈ'-র সব পদের ভাষা সমান প্রাচীন নয়। কাম-প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ সম্পৃক্ত পদসম্বলিত বহুল প্রচলিত এই পদসংকলন গ্রন্থের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা ছিল, বাঙলাদেশেও এর বহুল প্রচার ছিল, বাঙালীর আর্যা, গাথা বা প্রকীর্ণ কবিতা রচনার মূলে হাল-এর 'গাহাসত্তসঈ' বা গাথা সপ্তশতীর ও চৌদ্দ শতকের বলে কথিত পিঙ্গল [ফণীন্দ্র?] সংকলিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের প্রভাব, গভীর ও ব্যাপক ছিল বলে বিদ্বানদের ধারণা। তাই বাঙলা সাহিত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের উপক্রমে এ দুটো গ্রন্থের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। উক্ত দুই গ্রন্থে ধৃত কাম-প্রেম-বিরহের পদগুলো যেন পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের পদগুলো প্রাকৃতে ও শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। এটি ছন্দ গ্রন্থ। ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপই পদগুলো সংকলিত। অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ অংশের কোন কোন শ্লোক হয়তো বাঙলা অঞ্চলের বা বাঙালীর রচনা। কেননা কয়েকটি পদের ভাষা প্রায় প্রাচীন বাঙলার কাছাকাছি। এই পদগুলোতেও প্রেম-প্রকৃতি-বিরহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ছাড়াও সাধারণ গৃহস্থের ঘরোয়া জীবনের বাস্তব আলেখ্যও মেলে। হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য বর্ণনার রূপকে এ যেন দরিদ্র বাঙালীর চিত্র। যেমন :

ক. বালো কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅ হীনা মুই এক্ক নারী।
অহং নিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী

— পুত্র এখনো বালক, ছয়জন পোষ্য অথবা আমার ছয়মুণ্ডধারী পুত্র এখনো বালক, আমি একা উপায়হীনা নারী। ভিখারী-(স্বামী শিব) অনর্হিশ বিষ (নেশা) খায়, আমার কি গতি হবে।

তুলনীয় টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ
দুহিল দুধ কি বেন্টে সামায়। চেন্টনপাদ।

খ. পুত্ত-পবিত্ত বহু তধণা ভত্তি কুটুম্বিনী সুদ্ধমণা
হাক্কা তরাসই ভিচ্চগুণী কো কর বব্বর সগ্‌গমণা।

— নিষ্পাপ পুত্র, বহুধন, শুদ্ধ-স্বভাবা ও ভক্তিমতী গৃহিণী, হাঁকে ত্রস্ত ভৃত্য (যার ঘরে থাকে), সে বর্বর (না হলে) কি স্বর্গ কামনা করে?

গ. সো মানিঅ পুন্নবংত জাসু ভত্ত পং ডিঅ তণঅ
জাসু ঘরিণি গুণবংতি হোবি পুহবী সগ্‌গ নিলঅ।

— সেই পুণ্যবান যার (পিতৃ) ভক্ত পণ্ডিত পুত্র আছে, যার গৃহিণী গুণবতী হবে, তার পৃথিবীই স্বর্গ নিলয়।

ঘ. রাআ লুদ্ধ সমাজ খল
বহু কলহারিণ সেবক ধুত্তউ।
জীবন চাহসি সুকথ জই
পরিহর ঘর জই বহু গুণ জুত্তউ।

(যেখানে) রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী ঝগড়াটে, সেবক ধূর্ত, (সেখানে সুখ নেই), যদি জীবনে সুখ চাও, তাহলে বহুগুণযুক্ত (অর্থাৎ সুখ-সম্পদের অন্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও) গৃহ ত্যাগ কর।

ঙ. ক্ষীণ প্রাণ দরিদ্র মানুষের ভীরু বুকের চরম-আকাঙ্ক্ষার ও স্বপ্নের সুখচিত্র :

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভা পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা
মোইণি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খঅই পুণ্যবন্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কলাপাতার উপর দুধ-ঘি-মাখা ওগরাভাত মোরল্যা (ময়না?) মাছ আর নালতে শাক দিয়ে খাচ্ছেন পুণ্যবান- দিচ্ছেন কান্তা (স্ত্রী)।

চ. সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ড বিস পকাইল নিত্তা
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধুব পাআ
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ।

—একসের ঘি পেলে নিত্যই বিশটা মণ্ডা পাকাতাম, এক টাকার যদি সৈন্ধব [নুন] কেউ পায়, তাহলে সে নিঃস্ব হলেও রাজা।-র মতো অভাবমুক্ত]।

প্রাকৃতপৈঙ্গলধৃত কবি বিদ্যাধর রচিত কিছু পদে কাশীশ্বর বা কাশীরাজের বল-বিক্রম-বিজয়ের সগর্ব বর্ণনা রয়েছে। এই রাজার ভয়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ, তেলঙ্গা, মারাঠা-সৌরাষ্ট্র-মালব কর্ণাট-গুর্জর সব পদানত বা পলাতক। এতেই মনে হয় সংকলক পিঙ্গলও কাশীশ্বরের অনুগত ও প্রসাদজীবী ছিলেন। অবশ্য এখানে রাজপুত বীর হাম্বীর ও সহযোগী সেনাপতি জজ্জলেরও শৌর্য ও রণনৈপুণ্যজ্ঞাপক পদও রয়েছে।

আগেই বলেছি ভারতের শিক্ষা-সাহিত্য-শাসন ও সংস্কৃতির ভাষা ছিল সংস্কৃত। তাই সর্বভারতীয় প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে জৈন-বৌদ্ধরাও শাস্ত্রীয় পালি-প্রাকৃতের টীকা-ভাষ্য সংস্কৃতেই রচনা করতেন। বৌদ্ধের প্রাকৃত-মিশ্রিত ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ সংস্কৃত কালে 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' নামে ধিক্কৃতও হয়। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্যের কারণে কালে বাঙলার জৈন-বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সাগ্রহে সংস্কৃত চর্চা করেছে। হয়তো কতকটা জৈন-বৌদ্ধ বিদ্বেষ কিংবা ঐ ঐতিহ্য-বিস্মৃতির আগ্রহবশেই। তাই বাঙালী ব্রাহ্মণ্যবাদীর প্রাকৃত-অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠেই তাঁদের শাস্ত্র চর্চার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বস্তুত বাঙলাদেশে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙলার যোগসূত্র রক্ষা পেয়েছে বজ্র সহজযানী ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ রচনার মাধ্যমেই। অবহট্‌ঠ বিশেষ করে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ চৌদ্দ-পনেরো শতক অবধি সাহিত্যের জনপ্রিয় বাহন ছিল। তাই শাস্ত্রে ও সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত বিদ্যাপতিকেও রাজা শিবসিংহের প্রশস্তি গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠে রচনা করতে দেখি। আট শতক থেকেই সম্ভবত বাঙলাদেশেও লেখ্য অপভ্রংশ অর্থাৎ শৌরসেনী গণভাষারূপে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই যোগতান্ত্রিক গুহ্যসাধনার কতকগুলো গ্রন্থ উক্ত ভাষায় রচিত ও লিপিবদ্ধ দেখতে পাই।

বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের (হে বজ্র, হেরুক) সাধকরাই বজ্রী ও বজ্রকুল। সেই বজ্রকুলই আধুনিক বাউল, (বজ্রকুল > বজ্জউল > বাজুল > বাউল অথবা বজ্রী > বজ্জির > বজ্জিল > বাজিল]

বৈষ্ণব সহজিয়া ও শৈব নাথপন্থীরা হচ্ছে সেই বজ্র-সহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, অন্য কথায় যোগ-তান্ত্রিক-সহজ সাধক। অনাদিনাথ, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ নাথই বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে ব্রাহ্মণ্য শৈবতত্ত্বের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করেছেন। সহজিয়া ও বাউল গানে ও চর্যায় আজো সেই সাধনার আবর্তিত ও বিবর্তিত রূপ চালু রয়েছে। সহজযানী যোগী সিদ্ধাদের রচিত সাধনতত্ত্ব, দোহা ও চর্যাগীতি আমাদের হাতে এসেছে। এগুলোর অধিকাংশ বাঙালীর রচনা ও বাঙলার নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের ধারক। কাজেই শৌরসেনী অপভ্রংশে-অবহট্‌ঠে রচিত হলেও এগুলো বাঙলার ভাষা-সাহিত্য-শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ও উৎস। অতএব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ডাকার্ণব, সুভাষিত সংগ্রহ, দোহাকোষ পঞ্জিকা, সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, ডম্ভর প্রবোধ বাগচী সংগৃহীত তিলপাদ ও সরহপাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোহাকোষ আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লেখ্য। এগুলো সাত থেকে বার শতকের মধ্যেকার রচনা। উক্ত সব গ্রন্থই সটীক। টীকার ভাষা সংস্কৃত। সরোরুহ, সরহ, সরোজ ও পদ্ম অভিন্নার্থক।

একই ব্যক্তির নাম সংস্কৃত ও প্রাকৃত রূপে ভিন্নতর হতে পারে। তবু এঁরা অভিন্ন কি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তা নিরূপণ করা কঠিন। সরহ হে বজ্রতন্ত্র প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ খানা তন্ত্রগ্রন্থ, অন্যূন ছয়খানি বিভিন্ন বিষয়ক দোহাকোষ এবং চারটি চর্যাগীতি রচয়িতা। সবকয়টি বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রসহজযান তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনা। কাজেই এই সব অভিন্ন ব্যক্তির রচনাও হতে পারে। তবে বিদ্বানেরাও অনুমান করেন, পদকার দোহাকার ও তন্ত্রকার তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি তেমন প্রবল নয়। কৃষ্ণাচার্যও তিনজন বলে অনুমিত। একজন তন্ত্রকার, একজন যোগীসিদ্ধা এবং অন্যজন দোহাকার পদকার।

রাজপুত রাজাদের প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত হয়ে এবং নাটকের সংলাপে স্থান পেয়ে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ লেখ্য বা শিষ্ট ভাষার মর্যাদা পায় প্রায় পাঁচ শতক থেকে। পরে তা অনুকৃত হয়ে সর্বভারতীয় ব্যবহারের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই বাঙালী কানুফা প্রমুখ সবাই ঐ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠকে তাঁদের রচনার বাহন করেন। প্রাগু দোহা ও ডাকার্ণব তা-ই শৌরসেনী অবহট্‌ঠে রচিত। চর্যাপদগুলোও গণবোধ্য করে অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত এবং এই লোকপ্রিয় গীতিগুলো বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে হয়ে বিশেষভাবে স্থানীয় বুলির প্রভাবে পড়েছে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

তবে এ-ক্ষেত্রে একটি গুরুতত্ত্ব ও তথ্য স্মরণীয়। তেরো ও চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অর্বাচীন অবহট্‌ঠে ব্যতীত কোন স্থানীয় বুলিতে কোথাও কোন শিষ্ট বা লেখ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। অর্থাৎ তখনো নব্য ভারতীয় আর্যবুলি লিখবার ভাষায় গৃহীত বা উন্নীত হয় নি। সেই রেওয়াজ চালু হয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি থেকে। আবদুর রহমানের সন্দেশরাসক, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, চন্দ্রবর্দায়ের পৃথ্বিরাজ রাজসূয় প্রভৃতি দিয়ে নব্যভারতীয় আর্যবুলির লেখ্যভাষার মর্যাদা প্রাপ্তির শুরু বলা চলে।

তিল্লোপা, তৈলপা, তিলোপা, তিলিপা প্রভৃতি নানা উচ্চারণে তিলপার নাম বিকৃত ও বিচিত্র। অনেক বিদ্বান মনে করেন তিলপা দুইজন—একজন উড়িষ্যাবাসী, অপরজন চট্টগ্রামবাসী। এঁরা হয় তেলীসন্তান, নয়তো ব্রাহ্মণ। এঁদের যিনি চট্টগ্রামবাসী— তাঁর সিদ্ধনাম প্রজ্ঞাভদ্র এবং তিনি দোহাকার ও চারখানা বজ্রতত্ত্ব রচয়িতা। তাঁরই শিষ্য ছিলেন নাড়োপা।

আমাদের যোগপন্থ, নাথপন্থ, সহজপন্থ তার আধুনিক রূপ সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল পন্থ ছাড়াও তান্ত্রিক ও দেশী সূফী তত্ত্ব ও চর্যা জানবার বুঝবার জন্যেও উৎস হিসেবে এই বজ্রযোগী সহজপন্থীদের চর্যা ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি আবশ্যিক। এঁরা ব্রাহ্মণ্য দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি বিরোধী, এঁরা দেহবাদী, দেহাত্মবাদী, কখনো নাস্তিক, কখনো আস্তিক, কখনো বামাবর্জিত কায়াসাধক, কখনো বা বামাচারী দেহসাধক। এ বিষয়ে সহজিয়া ও বাউল প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। যোগতান্ত্রিক সাধনা সবারই অবলম্বন। এবং সবাই গুরুবাদী। কাহ্নপা বলেন :

আগম বেঅ পুরাণে পংডিত্ত মান বহংতি
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি।'

— আগম-বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিত মান বহন করে, পাকা বেলের চারদিকে যেমন অলি বৃথা ঘুরে বেড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মতে :

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
নিঅ ঘরিণী নই কেলি করন্ত
নিঅ ঘরে ঘরিণী জার ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবণ্ন বিহরিজ্জই।...
তো বিণু তরুণী নিরন্তর ণেহেঁ
বোহি কি লবভই এণবি দেহেঁ।

— তন্ত্রমন্ত্র কোন কাজই করে না, নিজের গৃহিণী নিয়ে খেলা করে। নিজের গৃহিণী না মজলে কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়? তরুণী তোমার প্রেম ছাড়া কি বোধি মেলে?

তিলপা বলেন : দেব ন পূজহ তিথ ন জাবা
"দেব পূজাহি ন মোকখ পাবা।"

— দেবপূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেবপূজায় মোক্ষ পাবে না। সরহ বলেন : যতী ক্ষপণকরা বৃথাই কৃচ্ছ্রসাধনা করে, মোক্ষ এইভাবে লভ্য নয়—

জই নগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ শিআলহ।

— নগ্ন হলেই যদি মুক্তি হয়, তা হলে সূন (কুকুর) শিয়ালেরও মুক্তি হবে।

সরহ আরো বলেন : ব্রহ্মণ হি ণ জানন্ত হি ভেউ [ভেদ]
এমই পতিঅই চউবেউ
অকজ্জেঁ বিরহিঅ হুঅরহ হোমেঁ
অকখি ডহাবিঅ কাড়অ ধূমেঁ...
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লে
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লেঁ।

— ব্রাহ্মণেরা রহস্যভেদ করতে জানে না, বেকার বলেই অকারণে হোমের ধুঁয়ায় চোখে যন্ত্রণা দেয়, মিথ্যার জগৎ বিপথগামী জানে না যে ধর্ম অধর্ম একই।

আবার,

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেবব।
কিন্তহ তিথ তপোবনে জাই।
মোক্খ কি লবভই পানী হ্নাই।

— কি হবে তোর দীপে, কি হবে নৈবেদ্যে, মন্ত্রের সেবাতেই বা তোর কি কাজ হবে? কী হবে তোর তীর্থ-তপোবনে যেয়ে, স্নান করলেই কি মোক্ষ লাভ হয়?

দেহ-ই সব তত্ত্ব ও তথ্যের আধার, কায়াসাধনই সার :

অইরি, এহিঁ উদ্দুলিঅচ্ছারেঁ
সীমসু বাহিঅএ জড়ভারেঁ।
ঘরহী বইসী দীবা জালী
কোণহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী।
অক্খী ণিবেসী আসণ বন্ধী
কণ্ণেহি খুসখুসাই জণ ধন্ধী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণ্ডী মুণ্ডী অণ্ণ বি বেসেঁ।
দিক্‌খিজ্জই দক্‌খিন উদেসেঁ।

—আস্তিকরা ছাই মাখে, মাথায় জটা বয়, ঘরে বসে দীপ জ্বালায়, কোণে বসে ঘণ্টা নাড়ে, চোখ বুজে, আসনে বসে কানে ফিসফিস করে, লোক ধাঁধানো মন্ত্র দেয়, রাড়ী নেড়ী অথবা অন্যবেশধারিণীদের দক্ষিণালোভে দীক্ষা দেয়।

এথু সে সুরসরি জুমণা এথু সে গাঙ্গা সাঅরু
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

—এখানেই (দেহের মধ্যেই) মন্দাকিণী যমুনা-গঙ্গা। এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই আছে চন্দ্র-সূর্য।

অন্যত্র—

ঘরে অচ্ছ, ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।

—ঘরে (দেহে) আছে, ঘরেই আছে, বাইরে কোথায় জিজ্ঞাসা করছ?

সরহ— ঝাণেঁ মোক্‌খ কি চাহুরে আলেঁ
মাআজাল কিঁ লেহু রে কোলে।

—ধ্যানে মোক্ষ সন্ধান করছ—কেন মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছ?

কাহ্নপা বলেন— বুঝি অবিরল সহজ সুণ কাহি করিঅপুরাণ

—সহজ শূন্য বোঝার পর বেদ-পুরাণে কি দরকার?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'য় রয়েছে চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়, সরোজব্রজের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব। সবগুলোই সটীক গ্রন্থ—অর্থাৎ টীকা ভাষ্য সহ।

টীকাকার মুনিদত্ত রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়ে টীকার শুরু 'নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ' টীকাকার অদ্বয়বজ্র রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষের টীকা সহজাম্নায় পঞ্জিকার আরম্ভ 'নমশ্রীবজ্রসত্ত্বায়।' কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষের টীকা মেখলার শুরু 'ওঁ নমো বজ্রধরায়'। ডাকার্ণবের শুরু 'ওঁ নমঃ সর্ববীর বীরেশ্বরীভাঃ' ডাকার্ণব জৈনমতের প্রবর্তক মহাবীর বন্দনায় ও মহাবীরেশ্বর বুদ্ধ উবাচ দিয়ে শুরু হলেও বজ্রধর, মহাসুখ, সহজসুন্দরী, বুদ্ধ, যোগিনীচক্র প্রভৃতি সবটাই বজ্র-সহজ তত্ত্ববিষয়ক। কাজেই ডাকার্ণবও আমাদের তত্ত্ব শাস্ত্রের উৎস।

১০. সেক শুভোদয়া

কয়েকটি বাঙলা পদসম্বলিত গদ্যে পদ্যে রচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল মালদহের বাইশ হাজারী মসজিদে। হলায়ুধ মিশ্রের ভণিতাযুক্ত এ গ্রন্থের নাম 'সেক শুভোদয়া'। মসজিদটি জালালউদ্দিন তাবরেজী নামের দরবেশনির্মিত ও বাঙলার প্রথম মসজিদ বলে পরিচিত। উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ার দিকে মালদহের তখনকার জিলা প্রশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল হরিদাস পালিত নামের স্থানীয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সাহায্যে সেক শুভোদয়া পুথিটি হস্তগত করেন এবং স্থানীয় জিলা স্কুলের শিক্ষক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সাহায্যে উক্ত গ্রন্থের পাঠোদ্ধার সূত্রে একটি খসড়া ও একটি চূড়ান্ত পাঠসম্বলিত পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। বটব্যাল বদলি হওয়ার সময় মূল পুথিটি ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ১৮৯৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে খোঁজ করে এই দুটো পাণ্ডুলিপির একটিও পাওয়া যায়নি। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর খসড়া-নির্ভর একটি সংস্করণ ১৯২৭ সনে বের হয়েছিল। ১৯৬৩ সনে ডক্টর সুকুমার সেন সেই ইংরেজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদসহ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে একটি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ সংস্করণ বের করেন।

মূল পুথিটি কতকালের পুরানো তা আর জানবার উপায় নেই। ১৯২৭ সনের সংস্করণের ভূমিকায় পুথিটি প্রাচীন বাঙলা হরফে (Early Bengali Script) লিপীকৃত বলে উল্লেখ করা হয়। ডক্টর সুকুমার সেন পুথি না দেখেও অনুমান করেন লিপিকাল সতেরো শতকের শেষ বা আঠারো শতকের গোড়ার দিক বলে।

আজ অবধি যাঁরাই 'সেক শুভোদয়া' সম্পর্কে কথা বলেছেন, তাঁরা এর 'অকৃত্রিমতা' সম্বন্ধে সন্দেহ কিংবা অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তার কারণ কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা সুনিশ্চিত নন :

ক. জালালউদ্দিন তাবরেজীর অস্তিত্ব ও পরিচয়—তাঁর বঙ্গে আগমনের দলিলাভাব।

খ. গ্রন্থোক্ত বিষয় সুগ্রথিত নয়। বাস্তবে, কল্পনায় ও গল্পে সামঞ্জস্য নেই।

গ. সম্পত্তির লোভে বাইশ হাজারী মসজিদের মুতোয়াল্লী কর্তৃক এই (জাল) গ্রন্থ রচনা করানো অসম্ভব নয়। কয়েকটি গ্রামকে পীরোত্তর সম্পত্তি হিসাবে দাবি করার জন্যই টোডরমলের জরীপ কালে এটি রচিত—এমন জনশ্রুতি দরগাহ এলাকায় নাকি চালুও আছে।

ঘ. ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত।

ঙ. তুর্কী বিজয়ের পূর্বে মুসলিম বিহীন বা বিরল গৌড়ে হিন্দুরাজার মসজিদ নির্মাণে অনুমতি দানের কারণ নেই। বিশেষত রাজা লক্ষ্মণ সেন তুর্কী বা বিদেশী বিদ্বেষী ছিলেন।

সম্পাদক ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর ভূমিকায় অন্য স্থানে তাঁর মানস দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্বাক্ষর রেখেছেন :

ক. এ গ্রন্থ ষোল শতকের শেষার্ধে রচিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তবু স্বীকার করেন যে এ গ্রন্থে ইতিহাসের ছিটে ফোঁটা রয়েছে, বিশেষ করে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী, গঙ্গো বা গঙ্গোক এবং বিজয় সেন ও রামপাল ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাছাড়া উমাপতি ধর ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে অসদ্ভাবের এবং লক্ষ্মণ সেনের পত্নী বল্লভা ও শ্যালক কুমার দত্তের কাহিনীর ইঙ্গিত তিনি মেরুতুঙ্গাচার্যের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' গ্রন্থেও পেয়েছেন।

খ. লক্ষ্মণ সেন যে বিদেশী তুর্কী বা মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন তাও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্রে স্বীকার করেছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত কবি শরণের একটি রাজস্তুতিমূলক পদে এ কথাটিও রয়েছে 'ম্লেচ্ছান স্বেচ্ছা বিনাশম নয়তি'। (তিনি) স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছ (তুর্কী)-দের হত্যা করান এবং অন্য একটি পদেও এমনি কথা আছে। সেক শুভোদয়ায়ও পাই 'তত্র যো যবন যাতি তম ঘাতয়তি'।

— সেখানে (গৌড়ে) যে যবন (তুর্কী বা মুসলিম বা বিদেশী) যায় তাকেই হত্যা করেন। উমাপতি ধর যে লক্ষ্মণ সেনের বিরোধী ছিলেন বা সুবিধাবাদী ছিলেন তা নতুন প্রভু বখতিয়ার খলজীর স্তুতি রচনাতেই স্পষ্ট। তাঁর তোয়াজের ভাষায়—

সাধু ম্লেচ্ছ-নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৌব বীরপ্রসূঃ
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিন্মারাংকমলে পুরঃ
শস্ত্রম শস্ত্রমিতি স্ফুরতি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— হে ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র (তুমি) ধন্য, তোমার বীরপ্রসবিনী মাতাও ধন্য—যদিও নীচ বংশজ। পৃথিবী (তোমার মতো) সুক্ষত্রিয় শাসিত বলে মানতে হবে। রিপুবিনাশী বলে পরিচিত দেব (রাজা) তখন 'শস্ত্র শস্ত্র' বলে হেঁকে রসনা পত্রান্তরে পলালেন।

গ. সংস্কৃত কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ ও উচ্চমানের এবং প্রাচীন মূল কাব্য-ভিত্তিক গদ্যায়ন বলেও তিনি স্বীকার করেন। সংস্কৃত যে মিশ্র বা অশুদ্ধ নয় বরং সংস্কৃত না-জানা লিপিকরের বাঙলা রীতিতে সংস্কৃত লেখার ফলে অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লিপিকরের পদ্ধতির প্রমাদের ফলে যে 'হরে কর কমবা' শ্রেণীর অশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, তাও ডক্টর সেন স্বীকার করেন এবং বাঙলা রচনাংশকে আদি-মধ্য যুগের বলে স্বীকার করেন। কোন কোন ঘটনা ও গল্প যে তুর্কী-পূর্বকালের তাও তিনি বিশ্বাস করেন।

ঘ. কবি জয়দেব উড়িয়া-মৈথিলী-বাঙালী যেই হন— লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে এসেছিলেন, সে-প্রমাণও রয়েছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' বিধৃত জয়দেবের উক্তি এরূপ : গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজারাজকরভালঙ্কর ...দৃষ্টতো 'সি তুষ্টা বয়ম'। রাজা ও রাজপ্রতিনিধি পরিবেষ্টিত সভার অলঙ্কার স্বরূপ হে গৌড়পতি, (আপনাকে) দেখে তুষ্ট হলাম।

ঙ. ডক্টর সুকুমার সেন কেবল জালালউদ্দিন তাবরেজীর পরিচিতি নিয়েই ধাঁধায় পড়েছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে তিনি সিলেটের জালালউদ্দিন কুনঈয়াইর মধ্যেই জালালউদ্দিন তাবরেজীকে খুঁজেছেন এবং সে তথ্যের উৎস খুরশীদ জাহাননুমা (ইলাহি বখশ হোসাইনী আঙরেজাবাদীর রচিত, ১৬৭৭-৭৮ সন) এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজুস সালাতিন' প্রভৃতি। কিন্তু সেক শুভোদয়ার প্রথম সংস্করণে স্বীকার করা হয়েচে যে, তুর্কী বিজয়ের পূর্বে কোন মুসলিম দরবেশের অনুরোধে পরধর্মমতসহিষ্ণু কোন হিন্দু রাজা এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েও থাকতে পারেন। এবং পরে প্রখ্যাত দরবেশের নাম-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্যে)।

চ. ডক্টর সেনের মতে সেক শুভোদয়ার (কাব্যের) মূল লেখক বা গদ্যে-পদ্যে বর্তমান সংকলক ও পুনর্লেখক গ্রন্থটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার ও গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াবার জন্যে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ও মন্ত্রী 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' নামের স্মৃতিগ্রন্থ সংকলক হলায়ুধ মিশ্রকে প্রণেতা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি এও বলেন যে, মূলকাব্যটি জনপ্রিয় গল্পের সংকলন ছিল এবং তা চৌদ্দ বা পনেরো শতকের। পরে তা পীরকাহিনী সূত্রে শিথিলভাবে গ্রথিত হয়ে বর্তমানরূপ লাভ করেছে।

ছ. দরগাহ এলাকায় 'লক্ষ্মণ সেনী দালান' নামে একটি দালানও রয়েছে, এই লক্ষ্মণ সেনকে পরবর্তী কোনো নায়েব লক্ষ্মণ সেন বলে তিনি অনুমান করেন।

জ. পুষ্পিকায় লিপিকরের উক্তি নিম্নরূপ :

সমাপ্তশ্চায়ং পুস্তকমিতি।
যথাদৃষ্ট ত্যাদ্ধি।
শ্রীমৎসাহ জলালস্য কথাং জনমনোরমাম
শ্রীজগন্নাথ রায়স্য পাঠার্থং যত্নতং।
ভাদ্রামাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে
যত্নেন লিখিতং গ্রন্থ শ্রীরাম ভদ্র শর্মণা।
এ গৃহং বাণ... শ্রীমতাং.. তথা।
দশ সপ্তাং শকে ভাদ্রে লিখিতেয়ং শুভোদয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ।
শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যাবনিক সন ৬০৮ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৪ কার্তিক শ্রীমৎসাহ জলালস্য আশ্রমে আগমনম। শ্রীহরি। যাবনিক সন ৬১০ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৬ চৈত্র কৃষ্ণাতৃতীয়ায়াং অত্র দেশাৎ গমনং রজ্জব চন্দ্রে শ্রীমৎ সাহ জলালস্য শুভমস্তু।

এর থেকে নিম্নের তথ্যগুলো মেলে :

১. লিপিকর রামভদ্র শর্মা জনৈক জগন্নাথ রায়ের পাঠের জন্য এ গ্রন্থ নকল করেছিলেন। বইটি হিন্দুর জন্য হিন্দু কর্তৃক অনুলিখিত। লিপিকরের সময়েও শাহজালালের কাহিনী জনগণের কাছে মনোরম।

২. কৃষ্ণ পক্ষের ভাদ্র মাসের ৫ তারিখ শুক্রবারে লেখা শুরু এবং ১৭ই ভাদ্রে লিপিকাজ শেষ। সনটি অপাঠ্য। '—৯৫' আছে। প্রথম সংস্করণের সম্পাদক আদি বাঙলা হরফে লিপীকৃত বলেছেন, তাহলে ১২৯৫ বা ১৩৯৫ হয়। শকাব্দ ধরলে ১৩৭৩ বা ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দ হয়।

৩. ৬০৮ হিজরী সনে (১২১১-১২ খ্রীস্টাব্দে) শাহজালাল ঐ আশ্রমে (বাইশ হাজারী মসজিদে) এসে ৬১০ হি. (১২১৩-১৪ খ্রী. নভেম্বর মাসে) সনে তিনি দেশত্যাগ করেন। বিক্রম সংর্বতেরও উল্লেখ রয়েছে ১১৩৪-৩৬, এটিকে শকাব্দ ধরলে ১২১২-১৪ খ্রীস্টাব্দই মেলে।

এবার আমাদের বক্তব্য পেশ করছি :

ক. ডক্টর সুকুমার সেন স্বীকার করেন যে পদ্যে রচিত একটি গল্পসংকলন ভিত্তি করেই গল্পগুলো শেখ জালালউদ্দিনের মহিমা-সূত্র দিয়ে গদ্যেপদ্যে পুনর্গ্রথিত হয়েছে। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, অধিকাংশ গ্রন্থই গ্রন্থকারের এলাকায় চালু থাকত। কাজেই কারো লেখা চুরি করে গোঁড়ে বসেই নতুন বই রূপে চালিয়ে দেয়ার মতো জালিয়াতি কি সম্ভব ছিল?

খ. প্রাচীন কাব্যটি কেউ না কেউ সংকলন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' সংকলক হলায়ুধ মিশ্র এই সংকলনকর্তা হতে বাধা কি, বিশেষত যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাহিনীগুলো শেখ ও লক্ষ্মণ সেন নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে? লক্ষ্মণ সেনের সভায় নামকরা জনপ্রিয় সব কবি ছিলেন। পরবর্তীকালে যদি সেন-সভার প্রখ্যাত কারো নাম গ্রন্থের সাথে যুক্ত করতে হয়, তাহলে শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর প্রভৃতির একজনের নাম যুক্ত হল না কেন? বিশেষত এঁদের নামও যখন গ্রন্থে অন্য সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে?

গ. এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই ভাল সংস্কৃত জানা সৃজনশীল হিন্দু পণ্ডিত রচিত, যাঁর লক্ষ্মণ সেনের সভা, সভাসদ, কবি এবং প্রাসাদ-জীবন, জনজীবন, জনজীবিকা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ও ব্যাপক ধারণা ছিল, আর শিল্পীসুলভ সৃজনশীলতা, নৈপুণ্য এবং রসবোধও ছিল। ইতিহাস বিরল সেযুগে চারশ' বছর আগেকার বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ বানিয়ে বানিয়ে রচনা করা কি তার পক্ষে সম্ভব ছিল? যদি জাল বলে স্বীকার করা হয় তা হলে বলতে হবে এই পণ্ডিত নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্র ও দুরাত্মা। নইলে অর্থলোভে যবন পীরের দেবকল্প মহিমা প্রচার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাছাড়া সাহিত্য শিল্পী একজন মিশ্র বাচীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ষোল শতকে এ গ্রন্থ লিখে সমাজে ঠাঁই পাবার কথা নয়, —বিশেষ করে যেখানে হিন্দুরাজার নিন্দা রয়েছে। অবশ্য ছদ্মনামে লেখা সম্ভব। কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার জন্যে একটা তাম্রশাসন কিংবা কাগুজে পাট্টোলী না বানিয়ে এতোবড় গ্রন্থ রচনা করানোর ঝুঁকি কেন নিল মুতোয়াল্লী, তার সদুত্তর মেলে না। আর জালালউদ্দিন তাবরেজী যদি বাঙলাদেশে না-ই আসবেন, তাহলে এ দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে তাঁর নাম ও সিদ্ধি এতো জনপ্রিয় হল কি করে? এ দেশে না এলে জীবন্ত পীর হিসেবে তাঁর নামে গল্পই বা হিন্দু সমাজে চালু হল কি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. বলা হচ্ছে টোডরমলের জরিপের সময় জমি দখলে রাখবার জন্যই মুতোয়াল্লীর উদ্যোগে এই জাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এতেই স্বীকার করা হচ্ছে যে তারও আগে এখানে এক পীর ছিলেন, তাঁর নামে বাইশ হাজার টাকার মুনাফার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পীরোত্তর সম্পত্তিও ছিল। সে পীর কে?

কে দিলেন এই পীরোত্তর সম্পত্তি? এই পীর যদি জালালউদ্দিন না হন এবং দাতা যদি লক্ষ্মণ সেনও না হন, তাহলেও একজন পীর ও একজন সম্পত্তিদাতা সামন্ত কিংবা রাজা নিশ্চয়ই ছিলেন। তাঁদের নাম গোপন করে মুতোয়াল্লী নতুন নামের পীর ও নতুন নামের রাজা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন কেন? পীর বা দরগাহ ব্যক্তি বিশেষের মতো অখ্যাত, অপরিচিত এবং বিস্মৃত-নাম হয় না। সমকালে জনবহুল শহরে তথা জন-সমাজে বাস করে, মুতোয়াল্লীর পক্ষে যে কোনো কারণেই হোক প্রকাশ্যে পীরের ও রাজার নাম বদলানো সম্ভব ছিল কি? তাছাড়া স্বীকারই করা হচ্ছে প্রতি বছর রজব মাসের ২২ তারিখে এখানে উরস হয়, মেলা বসে এবং তাতে হিন্দু-মুসলিম যোগ দেয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এ দরগাহ লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকেই লোকবিশ্রুত। তাই সম্পত্তি রক্ষার জন্য লক্ষ্মণ সেনের আমলের দলিলও প্রয়োজন ছিল। দলিলের অভাবে এ বই দেখানো হয় এবং এটি এমনই বই যা পার্বণিকভাবে পড়া হত এবং যা পড়ে বা শুনে বিপন্মুক্ত হওয়া যেত যা হিন্দুরাও অন্তত সতেরো শতক অবধি বিশ্বাস করত। দরগাতে রক্ষিত পুঁথিটি হিন্দুর জন্যে হিন্দু দিয়ে অনুলিখিত। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে হয়তো দরগায় রক্ষিত আগের পুথিটি কালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ মুতোয়াল্লী হিন্দুর থেকেই এ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে দরগায় পুঁথির পার্বণিক পাঠ কেবল হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। অবশ্য মৌখিক অনুবাদে হিন্দু-মুসলিম ভক্তরা তা শ্রবণ করে পুণ্যলাভ করত। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে, 'সেক শুভোদয়া' নামের পীরমাহাত্ম্য জ্ঞাপক গ্রন্থটি হিন্দুদের জন্যেই হিন্দুভক্ত হলায়ুধ মিশ্র রচনা করেছিলেন।

মুসলিম মুতোয়াল্লী সম্পত্তিলোভেই যদি টোডরমলের আমলে এই গ্রন্থটি লিখিয়ে থাকেন, তাহলে ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা মতে ১৭-১৮ শতক (লিপিকাল) অবধি গৌড়ের হিন্দুরা কেন ঐ পীরমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক জাল পুঁথি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন, বিশেষ করে বিশ শতকেও যখন ঐ পুঁথি জাল বলে মালদহ অঞ্চলেই লোকশ্রুতি রয়েছে?

ঙ. দরগায় 'লক্ষ্মণ সেনী দালান' রাজা লক্ষ্মণ সেনেরই যে স্মৃতি বহন করছে, তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

চ. জালালউদ্দিন তাবরেজী বলে সত্যই এক দরবেশ ছিলেন। তিনি দেওতলায় অবস্থানও করেছিলেন কিছুকাল। আলাউদ্দিন আলী শাহ (১৩৪১-৪২ খ্রী.) তাবরেজী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ স্থানে (পাণ্ডুয়া শহরে) একটি দরগাহ নির্মাণ করেন বলে রিয়াজুস সালাতিন সূত্রে জানা যায়। ভিন্নভাবে তা অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বুকাননের বিবরণীতে মেলে। এই স্বপ্নদর্শন তাবরেজীর মৃত্যুর শতাধিক বছর পরের ঘটনা। এই জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙলাদেশ ত্যাগ করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬ খ্রী.) সময়ে দিল্লীতে যান।[১] এবং

১. Social History of Muslims in Bengal down to 1538 A. D. : Dr. Abdul Karim : Journal of Pakistan Historical Society ; Pp. 97-98, Vol. VIII, Pt. 1, 1960. Pp. 290-96.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খজিনাতুল আফাসিয়া মতে ৬৪২ হি. বা ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দে এবং তাজকেরাতুল আউলিয়া-ই-হিন্দু অনুসারে ৬২২ হি. বা ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[১] নাসিরুদ্দিন নুসরৎ শাহর রাজত্বকালে (১৫১৯-৩১ খ্রী.) ৯৩৪ হি. বা ১৫২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ দেওতলার শিলালিপিতে দেওতলাকে "শেখ জালাল মুহম্মদ তাবরেজী শহর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] গৌড়ের দরবেশ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন সর্কীরাজ্যের দরবেশ জাহাঙ্গীর সিমনানী। সর্কীরাজ ইব্রাহিম সর্কীর কাছে লিখিত সিমনানীর পত্রে প্রকাশ—দেওতলায় জালালিয়া (জলালপন্থী) দরবেশদের সমাধি রয়েছে। জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙলাদেশে ছিলেন; সেবা ও সরাইর দ্বারা তিনি জনগণকে মুগ্ধ ও ভক্ত করেছিলেন।[৩] ইনিই খানকা ও লঙ্গরখানা খুলেছিলেন এবং ভোজবর্মন রচিত 'অমৃতকুণ্ড' সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে আরবিতে অনূদিত হয়। আবদুর রহমান চিশতির মতে[৪] জালালউদ্দিন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবুল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী।[৫] তিনি শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (১১৪৭-১২৩৪) শিষ্য ছিলেন।[৬] তাবরেজী কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, (১১৪২-১২৩৬) বাহাউদ্দিন যাকারিয়া, (১১৬৯-১৩৬৬) নিযামুদ্দিন সুগরা (মৃঃ ১২০০) ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। এঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। দিল্লী এলে তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। আমাদের ধারণা 'সেক শুভোদয়া' রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রেরই রচনা। তুর্কী বিজয়ের পর উমাপতি ধরের মতো তিনিও তুর্কী প্রভুর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই পীর প্রীতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাজেই সেক শুভোদয়া গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা অমূলক। আমাদের ধারণায় জালালউদ্দীন তাবরেজী ১২০০-১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি গৌড়ে ছিলেন। এবং তাজকিরাতুল আউলিয়া মতে ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

'সেক শুভোদয়ায়' ২৭টি পরিচ্ছেদ ছিল। ২৬-২৭ পরিচ্ছেদ হয় ২৫-এর অন্তর্গত অথবা লিপিকর ঐ দুটো পান নি তাঁর মক্কলের আদর্শ পুঁথিতে। রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালউদ্দিনের প্রথম সাক্ষাৎ দিয়েই গ্রন্থের শুরু। বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শেখের প্রতি রাজা, মন্ত্রী, নটী ও অবিশ্বাসীদের ক্রমশ আকৃষ্ট হবার চমকপ্রদ কাহিনী, রাজশ্যালক কুমার দত্ত-মধবী-মধুকর-রানী বল্লভা সম্পৃক্ত ঘটনা, শেখের প্রথম জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী, বিজয় সেনের কাহিনী, কুশল তীরন্দাজ লক্ষ্মণ সেন-মদন-উমাপতি ধর সম্বন্ধীয় ঘটনা, বৃঢ়ণ মিশ্র, পদ্মাবতী-জয়দেবের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, রাজা ও ধোপা সম্বাদ, ধোয়ী ও চার ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী-বিদ্যুৎপ্রভা সম্বাদ, শেখের মসজিদ নির্মাণ ও সম্পত্তি লাভ : নট গাঙ্গোর কাহিনী, বিদ্যুৎপ্রভা ও তাঁতী প্রভৃতির আখ্যায়িকা।

---

১. বাঙলাদেশে মুসলিম আগমনের প্রাথমিক যুগ : ডক্টর আবদুল করিম : সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ সংখ্যা ১৩৭০ সন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পৃ. ৯২-১০২।

২. ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার : ডক্টর আবদুল করিম : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা; শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ সন।

৩. Bengal Past & Present , Vol. LXVII, Sl. No. 130, 1948, PP. 35-36.

৪. Mirat-al-Ansar : Dacca University, M. S. No 16/AR/143/Folio 19.

৫. Akhbar-al-Akhyar : Descriptive Catalouge of Arabic and Persian Manuscripts : Dr. A. B. M. Habibullah : PP 44-45.

৬. ক. Ain-i-Akbari, Vol. III, Jarret, P. 366. খ. History of Sufism in Bengal : Dr. Md. Enamul Huq. PP. 160-67.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে যেসব বাঙলা ছড়া ও পদ রয়েছে সেগুলো এই :

ক. মকদম শেক সাহ জালাল তবরেজ
তব পাদে করোঁ পরণাম
চৌদিশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম
বারেক রক্ষা কর মোর পণ (পণ্য) প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান।

খ. শ্রীমল্লক্ষ্ম সেন মহাবীর
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।

গ. রামরাজা বর্ত ইন্দ্র বর্ষে জল
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।

ঘ. শ্রী লক্ষ্মণ কি রাজা বড় বীর
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর।

ঙ. যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ
যদি না শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস।

সেকের মহিমা কেরামতি :

চ. বনের শাখ খায় সে বনের গোনা
ঝিকরিয়া পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা।

ছ. মধ্যে আছে পীরের মোকাম
তস্যোপরি বিদ্যতে প্রধান পুরুষের স্থান।
তিয়াঞ্জলি তাহার নামে দান
পূর্ব উদয়াচল পর্বতের নাম।
উদয় সূর্য প্রত্যুষ বিহান
কিরাত জানিয়া আমার মোকামের করিব সম্মান
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান।
তথা আমি করিব প্রয়াণ
আমি গেলে তারা করিবে সম্মান।
পঞ্চম অঞ্জলি তাহার নামে দান
আমার বাপ মাও দরিদ্রের পুত্র।
আক্ষাজনিতে তাহারা পাইল বড় দুখ
আমার জলে তার হোক আপ্যান।
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহার নামে দান
পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম।
কহো বলে ভালো কহো করে অপমান
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান
রাজা হৈঞা আমার করিব সম্মান।
প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অন্নপান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অঞ্জলি তাহার নামে দান
আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান
সহিএগ্রা দুঃখ যদি না করে আন
পুনঃ পাছে দেয় সম্মান।
আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম
কেহ বাঞ্ছে ধন-পুত্র কেহ আরোগ্য দান।
আমি তাহার করি ত্রাণ।

বন্দিনী ডাকিনীর সেকের কাছে মুক্তি প্রার্থনা— এটি যথার্থই প্রাচীন বুলি প্রভাবিত বাঙলা রচনা :

হউঁ যুবতী পতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনায়ি কাক গাইয়ে দিন।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি যাউঁ ঘর
সাগর মধ্যে লোহার গড়।
হাত জোড় করিয়া মাঙ্গো দান
বারেক মহাত্মা রাখো সম্মান।
বড় সে বিপাক আছে উপায়
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।
শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল
রাত্রি হৈলে বহে অনল।
পীন পয়োধর রাঢ়ে আর
প্রাণ যায় বহিআঁ ভার।
নয় বহিআঁ পড়ে নীর
জীয়েন প্রাণী পলায়েন বীর।

সেক কর্তৃক মুক্তিদান :

আশেপাশে শ্বাস করে উপহাস
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ
ভাঙ্গিল তাল লম্বিল রেখা
চল যাহ সখি পলাইল শঙ্কা।

সেক শুভোদয়াধৃত দুটো আপ্তবাক্য চির সত্যের মর্যাদায় ভাস্বর :

১. অভ্রছায়া খলপ্রীতিতির্নবশস্যানি যোষিতঃ/ কিঞ্চিৎ কালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ— মেঘের ছায়া, খলের প্রীতি, তাজা ফসল, নারী, যৌবন ও ধন স্বল্পকালের উপভোগ্যমাত্র।

২. যস্মিন দেশোঃ ন সম্মানং ন মিত্রং ন চ বান্ধবঃ/ ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ ন কুর্যাত্তত্র সংস্থিতিম — যে দেশে সম্মান, মিত্র, আত্মীয় এবং শিক্ষা নেই, সে দেশে কখনো বাস করতে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যদ্বাণীরূপে গ্রন্থে ধৃত তুর্কী বিজয়ের উল্লেখ থেকেই 'সেক শুভোদয়া' গৌড় বিজয়ের অব্যবহিত পরেই (১২০৪ খ্রীস্টাব্দে) রচিত বলে অনুমান করি। কারণ বিদেশী বিজাতি-বিধর্মী প্রভুর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের জন্যে বিজিত রাজার মন্ত্রীর এমন একটা কিছু করার প্রয়োজন ছিল। উমাপতি ধরের প্রশস্তি কবিতা এ অনুমান সমর্থন করে। এটি বাঙলায় প্রথম পীরমাহাত্ম্য বা পীরমঙ্গল গ্রন্থ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বাঙালীর মৌল ধর্ম

সাংখ্য ও যোগ— এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত।

বাঙালীর শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানস প্রসূত। তেমনি অনাদি এবং আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোন সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হুন-ইউচি-তুর্কী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশি দিন রক্ষা করতে পারে নি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম সংস্কৃতির পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া, দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষ-দেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মানস প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন ও একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র– তিনটে স্বাতন্ত্র্য দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্যশাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব-কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদিরূপও–তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূর্য] দেবতার স্মারকগুণও বিলুপ্ত হয় নি। বস্তুত দেবাদিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগপন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথ-পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথপন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউ এনৎ সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনে-বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগ তত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হুঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যেরই স্মারক।

"মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া।" (গোরক্ষবিজয়)

এই কড়িও অস্ট্রিক দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের। দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহযন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচকপূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষারও হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ঈঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুষ্চক্র বা ষটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উল্টা সাধনা প্রভৃতির নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এ সাধনার হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ-সূর্য বা অগ্নি, ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ—শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগ গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড'। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধকা যোগ'– গোরখবাণী : ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, পৃ. ১৬]

অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করেনি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা দেশে এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানাফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে-জ্বালন ধারায়-সমন্দরে?), কানুপা উড়িষ্যার, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল।

পূরবদেশ পছাঁহী ঘাটি
[জনম] লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা নাঁবগর কহীএ
মেইট ভরম বিরোগঁ–

[গোরখবাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ]

—'পূর্বদেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী গুরু [আমার] ভব-সাগরের নাবিক, আমি ব্রহ্মরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।'

শেষ বয়স সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের গোর্খা নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রেনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলাদেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউলগীতি, যোগীর গান ও যুগী কাচ আজো বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চ বর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ী ও চাঁড়ালই ছিলেন।

ভণত গোরখনাথ মুছিংদ্রনা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি কোটা কাড়ি লীয়া পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়াঁ খুলি দীবী মেলী।

[গোরখবাণী, পীতাম্বর সম্পাদিত, পৃঃ ১১৭]

এতেও এঁদের বাঙালীত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্মরহস্য থেকে মৃত্যুলক্ষণ অবধি সব কিছুর সন্ধান করেছেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র– শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃত রসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টিশক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনীশক্তি অক্ষত থেকে আয়ুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসেরও পথ হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের—

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাট দেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এর নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া বা আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজঃ ও শুক্র রূপে তরলতা প্রাপ্ত সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজঃ রক্ত ও শুক্র বিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম বাঙালীর ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। তাই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়াপদ, বাউলগীতি, ধর্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, ময়নামতী-মানিকচন্দ্র গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল গীতি, গোরক্ষবিজয়, অনিলপুরাণ, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্য পরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দুমুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুকতাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধ প্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষ বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী–উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র শাসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীন কালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত বাঙালী ভারতবর্ষকে দান করেছে।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালী। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ' অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত-[জ্ঞানপ্রদীপ সৈয়দ সুলতান]। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা রূপকাত্মক। তিনি বলেন "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যা মাত্র।" [ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এর ভূমিকা স্বরূপ নাথপন্থের "সাহিত্যিক ঐতিহ্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১-২। (৬)।] ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মনেও ছিল এ প্রশ্ন। [Obscure Religious cult etc.]

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এ জন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় ধর্মমতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালীর এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালীর জীবনে ও মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্য বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীর কেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর– যাদের দু'চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচরিক রীতিনীতিতে আদিম Animism, Magic belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিকথের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিক ভাবেই সত্য। তিনি বলেন,

It is now becoming more and more clear that Non-Arayan contributed by far that greater portion in the fabric of Indian civilisation, and a great deal of Indian

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Ayan translated in terms of the Aryan speech... the ideas of karma and transmigration, the paractice of yoga, the religious and philosophical ideas centring round the conception of the Divinity as Siva and Devi and as Krishna, the Hindu ritual of puja as opposed to the vedic ritual of Homa– all these and much more in Hindu religion, and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages eg, the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the cocoanut etc, the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legay from our pre-Aryan ancestors." [Indo-Aryan and Hindi, pp. 31-32]

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচারবর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচারবর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষনাথবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জালন্ধরী পাদের অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমতভিত্তিক, তথা আদি সাংখ্য যোগ-মন্ত্র ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষকামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য মনন-প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এ জন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও আপন বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :

"মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।"

[অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১১৮] বাঙালী মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু'চারটা আরবী ফারসী পরিভাষা এবং আল্লাহ্ রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতির বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়াসাধনাকে ইসলামী রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের 'বালকানামায়' পাই :

দিলসে বৈঠে রাম-রহিম দিলসে মালিক-সাঁই
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্থ পাই।
ধড়ে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা।

[প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮]

অতএব, বাঙলার বা বাঙালীর আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলাদেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্য—তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তৃপ্তা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে (লাঙ্গলের ফাল) গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে (যাতে হল পড়েনি) প্রাণ দান প্রভৃতির রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছাসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কি বাধা আসে। কার্য-কারণ জ্ঞানের অভাবেও প্রাতিকূল্যের কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারে নি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র—কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর

---

১. শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু'তে ধর্ম বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষপুরাণ সব রচনায় সুলভ।
ক. মনে মনে ধর্ম আরাধন।
খ. বিনয় ভক্তি করোঁ ধর্ম আরাধন।
গ. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
ঘ. ধর্ম পথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর।
ঙ. জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
চ. ধর্মপদ স্মরি সত্বরে গমন।
ছ. ধর্মের প্রসাদে আজি পুরিলেক আশ।
জ. ধর্ম আজ্ঞা তোমার পূরিব মনস্কাম। ইত্যাদি অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। স্বপ্নও হয়েছে এ বিশ্বাসের সহায়ক।

আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্য কামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জ্বরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণ কুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক চেতনা, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা-পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভুয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার।

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোনো কোনোটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত পরিবেশ ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তাই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা রূপে পরিকীর্তিত। যে কোনো সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি। অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জনমানবের জীবন-চেতনা ও জীবিকা-পদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণসংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এ সবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালীর ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন রহস্য জানবার বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রসাদ কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য প্রলেপে বাস্তব জীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবন বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরীব-ঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদার কণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এই হয়তো দুঃখ-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্য জীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা যেমন-তেমন কাঠামো হয়তো খাড়া করা আজকাল আর শক্ত নয়। সে ইতিহাসও অবশ্যই কোথাও ছায়া, কোথাও কঙ্কাল, কোথাও বা বিবর্ণ কায়ার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং তা কখনো একালীন সর্ববঙ্গীয়ও নয়। বস্তুত ব্রিটিশ-পূর্বকালে আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল বলে প্রমাণ নেই। কাজেই বাঙলার সার্বিক ইতিহাসের ধারণা কল্পনা-সম্ভব—বাস্তব নয়। আমরা যখন বাঙলার আদি ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা আবেগবশে সত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা, জানা তথ্য আমাদের সে অধিকার দেয় না। পূর্বে যেমন রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত ছিল, কোনো একক নামে বা একক শাসনে গোটা আধুনিক বাঙলা কখনো অভিহিত বা প্রশাসিত ছিল না, তেমনি তুর্কী আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি 'সুবাহ বাঙলা'র প্রায়ই অপরিহার্য অঙ্গরূপে থাকত বিহার-উড়িষ্যাও! জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচার সূত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণ পূর্বদেশের যে যোগ ও পরিচয় তা আজকাল অস্বীকৃত নয়, এবং বৌদ্ধ মতের সঙ্গে আসে বৌদ্ধ মৌর্য শাসন। কিন্তু তা যে বিহার-সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমিত ছিল, তাও বিতর্কের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। এভাবে মৌর্য-কণ্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল শাসন-শোষণের খবর আমরা পাই বটে; কিন্তু তুর্কী-মুঘল পূর্বকালের শাসকরা রাঢ় সুহ্ম-গৌড়-পুণ্ড্রের কোথায় কতটুকু শাসনে রেখেছিল, তা আজো অনির্ণীত। আর বঙ্গ সমতট হরিকেলে দেব-রণ্ড-চন্দ্র-খড়্গ রাজাদের কথা শোনা যায় বটে; কিন্তু কারো রাজ্যসীমা জানা নেই।

অতএব, তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বাবধি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসও কখনো নামসার কখনো বা কঙ্কালসার। এই রাজারা কি দেশী? মৌর্য-কণ্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেনেরা ছিলেন বিদেশী। গঙ্গারিডই রাজ কি স্থানীয়? উত্তর মেলে না। পাল রাজত্বের উদ্ভব ও বিনাশ মগধেই, বাঙলার সবটুকু তাদের অধিকারে আসেনি কখনো। শশাঙ্ক নাকি বাঙালী—তিনি কি গৌড়ী না রাঢ়ী? —ইতিহাস নীরব। কেবল দিব্য-রুদ্রক-ভীমেরই সঠিক ঠিকানা মেলে। বর্মণরা যদি আসামী হন, চন্দ্ররা আরাকানী, খড়্গরা নেপালী আর দেবরা যদি কোচ হন, তা হলে?

অতএব, বাঙলাদেশের রাজার এবং বাঙালীর ইতিহাস অভিন্ন নয়। বাঙালীর দুর্ভাগ্য বাঙালী ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি শাসিত। ফলে বাঙলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বিবর্ণ খবর ইতিহাস বহন করলেও তাতে বাঙালী তার স্বরূপে অনুপস্থিত। কাজেই বাঙালীর ইতিহাস নেই। বাঙালীর ইতিহাস আজো বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত। আমরা জানি কোনো জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠী-সমষ্টি একচ্ছত্র শাসনে না থাকলে তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষিক, শাস্ত্রিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা-ভিত্তিক জাতিসত্তাবোধ জাগে না। আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল ব্রিটিশ পূর্বকালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না, অঞ্চলটিও ছিল না একক নামে পরিচিত। তাই ভাষিক ঐক্যও হয়েছিল ব্যাহত। একচ্ছত্র শাসনে থাকলে এবং অঞ্চল-সম্ভূত শাসক বংশ থাকলে আঞ্চলিক প্রাকৃত কিংবা অবহট্‌ঠই হত দরবারী তথা প্রশাসনিক ভাষা। তাহলে আজ আমরা আসাম-বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে এক অভিন্ন ভাষী মানুষ পেতাম। বুলিগত তুচ্ছ পার্থক্য নিয়ে তিন-চারটে তথাকথিত স্বতন্ত্র ভাষা এমন কৃত্রিম ব্যবধানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারত না। রাজশক্তির লালন পেয়ে মধ্য দেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেনী) ও অবহট্‌ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় সর্ব-ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ও সংহতির বাহন হয়েছিল। তেমন ভাগ্য এ অঞ্চলের কোন বুলিরও হতে পারত সীমিত পরিসরে।

অতএব, বহু বহু কাল এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অভিন্ন জাতিসত্তায় সংহত হতে পারে নি। বরং বিভিন্ন বিদেশীর আঞ্চলিক শাসনে ক্লিষ্ট, আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ আত্ম-মর্যাদালাভের বিকৃত বাসনায় মিথ্যা পরিচয়ে আত্মতুষ্টির যে পথ অবলম্বন করেছিল তা পরিণামে আত্ম-হননের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, এতে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। ঐ বৈনাশিক সংস্কারের প্রভাব আজো অম্লান। বাঙালী মাত্র তাই সত্য পরিচয় স্বেচ্ছায় পরিহার করে অঙ্গীকৃত সরকার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিকে স্বদেশ এবং শাস্ত্রকার ও শাসকের স্বজাতি বলে জেনে আত্মপ্রবোধ পেতে থাকে। তাই এদেশের বৌদ্ধ মাত্রই ছিল মগধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী মাত্রই আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্তের আর্য। মুসলিম মাত্রই আরব-ইরানী কিংবা মধ্য এশীয়! ফলে আজো শিক্ষিত অভিজাত বাঙালী মাত্রই চেতনায় প্রবাসী ও বিদেশীর জ্ঞাতিত্বগর্বী, তাই ভিন্নমতের প্রতিবেশী মাত্রই পর।

দুহাজার বছর ধরে এ-সংস্কার লালন পেয়ে পেয়ে এমন গভীর বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে যে, আজকের বিদ্বানেরাও নিজেদের অস্ট্রিক-মঙ্গোলাদির রক্তসঙ্কর সন্তান বলে মুখে স্বীকার করেও মনে মানেন না। তথ্যপ্রসূত জ্ঞান এভাবেই সংস্কারজাত অনুভবের মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে। গোড়ার দিকের উত্তর ভারতীয় ভাষা-ধর্ম-শাসন-সংস্কৃতির ঋণ বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি চিরতরে বিলোপ করেছে। এর ফলে সে আর কখনো স্বমেরুতে স্থির হয়ে, আত্মপ্রত্যয়ে প্রবল হয়ে, রাজনৈতিক কিংবা বৈষয়িক জীবনে স্বতন্ত্র, স্বনির্ভর কিংবা স্বাধীন হবার সাহস পায় নি। তার জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আজো তাই পরাশ্রিত ও পরপ্রভাবিত। আজো হিন্দুমন ঘুরে বেড়ায় আর্যাবর্তে ব্রহ্মাবর্তে রাজস্থানে ও হিমালয়ের কন্দরে। মুসলিম বিচরণ করে ষোলশতক-পূর্ব উত্তর আফ্রিকায় আরবে ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীর, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের মানসউদ্ভূত। কিংবা হিন্দুমুসলিম বিবাদ-বিদ্বেষও ছিল দেশাগত বিদেশীর মধ্যে সীমিত। এরা প্রলুব্ধ করে সরল দেশী লোককেও হয়তো দলে ভেড়াত। আশার কথা, এ-হচ্ছে আত্মবিস্মৃত বিকৃতরুচি নীলরক্তলোভী সংস্কৃতলিপ্সু শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-চেতনা। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক সামান্য। সমাজের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এদের হাতে বলেই আজো বিভ্রান্ত বাঙালী বিপথে চালিত। এদের এখনো স্ব স্ব ও সুস্থ করা সম্ভব। তার জন্যে বাঙালীর সত্যকার ইতিহাস জানা ও জানানো দরকার। পরশাসিত বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নেই মেনে নিলে বাঙালীর ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য নয়। বাঙালীর চিন্তার চেতনার ও কৃতির ইতিহাসের উপকরণ আজো বিলুপ্ত হয় নি। আমরা জানি, ঘটনার সুবিন্যাস ইতিহাস নয়, চেতনার অনুসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস। কারণ মন ও মননই মানুষের কর্মে ও আচরণে অভিব্যক্তি পায়। ইতিহাসের লক্ষ্য সামষ্টিক মনের ও মননের সামান্যকৃত অভিব্যক্তি স্থানিক ও কালিক আবর্তন-বিবর্তন কিংবা অনুবর্তনের ধারায় অনুধাবন ও বিশ্লেষণ।

অস্ট্রিক-মঙ্গোল রক্তসঙ্কর বাঙালী উত্তর ভারতীয় ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি ও শাসন গ্রহণ করে বাহ্যত আর্যীকৃত হলেও, সে তার মানস স্বাতন্ত্র্য কখনো হারায় নি। তার সাংখ্য-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র সে প্রায় সর্বভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও সে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। মহাযান বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান তন্ত্রযান ও সহজযান তারই প্রসূন, বৌদ্ধ চৈত্য যেমন দেবতা উপদেবতায় আকীর্ণ হয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধশাস্ত্রও বজ্রতারা তত্ত্বে, প্রজ্ঞা উপায় তত্ত্বে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলৌকিতেশ্বর তত্ত্বে ও দেহতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। বেদ উপনিষদ গীতা স্মৃতি-শাসিত ব্রাহ্মণ্য মত এখানে জীবন-জীবিকার অরি ও মিত্র দেবতার লীলানুধ্যানে অবসিত হয়েছিল, ইসলামও পেয়েছিল যোগে দেহাত্মতত্ত্বে ও অদ্বৈতবাদে নবরূপ। বাঙালীর মানস রূপের-চিত্তবৃত্তির তথা জীবনদৃষ্টির ও জগৎ চেতনার প্রবহমান স্বরূপ জানা যাবে তার জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত দেবতা সৃষ্টিতে ও স্বকীয় স্বতন্ত্র জীবনচর্যায় ও জীবনাচরণে। বৌদ্ধ যুগে যেমন সে-স্বাতন্ত্র্যের অবাধ প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি মধ্যযুগে স্বাধীন সুলতানী আমলে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্র সমাজ ও সরকারের রক্তচক্ষুর ভীতিমুক্ত বাঙালী জীবনে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুগত্যের মৌখিক অঙ্গীকারের আবরণে সে তার সৃষ্ট আদি দেবতাদের মাহাত্ম্য-মহিমা দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। বাঙালীর স্বশাস্ত্রে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কারু-দারু-চারু শিল্পে, পটে ভাস্কর্যে তত্ত্বচিন্তায় বাঙালী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনার ও জীবনযাত্রার পরিচয় তাই কোন কালেই গুহায়িত ছিল না। আবার বৈষ্ণবে বাউলে ব্রাহ্মে ও সূফীবাদে পীরবাদে তার প্রকাশ ঘটেছে কালান্তরে। যেমন তুর্কী বিজয়ের পরে তেরো-চৌদ্দ-পনেরো শতকে গোটা ভারতেই নিম্নবিত্তের বা নিম্নবর্ণের মধ্যে মুক্তিতৃষ্ণা জেগেছিল, সন্তধর্মে যার প্রকাশ ও সাফল্য। বাঙালীর ইতিহাস এই সব তত্ত্বের কৃতির ধারাবাহিক সুবিন্যাসেই হবে রচিত। শাসকদের স্বার্থে তাদের ভাষা শাস্ত্র ও সংস্কৃতি বাঙালীর ওপর চাপানোর অভিসন্ধি প্রসূত প্রয়াসের যে-সব ইতিকথা ও তথ্য বাঙলার প্রণীত ইতিহাসে আর্যত্বগর্বী বিদ্বানেরা সগৌরবে বর্ণনা করেন, তা বাঙালীর জীবন ও মনন-সম্পৃক্ত নয়।

লোকশ্রুতির কোন্ আদিশূর কিংবা বল্লাল সেন কাদের স্বার্থে আর্য কৌলীন্য সৃষ্টির অজুহাতে আর্য উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসী হলেন, কিংবা লোকায়ত ধর্মাচারে ব্রাহ্মণ্য পার্বণিক শাস্ত্রাচার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কোন্ অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল ছিল—তা আজ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যাচাই করতে হবে। বঙ্গেস্থিত উত্তর ভারতীয় আর্যদের ও তাদের জ্ঞাতিদের চোখে অস্পৃশ্য হাড়ি-ডোম-বাগদী জেলে জোলা কিংবা ম্লেচ্ছ নেড়ে ছিল কারা, বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে নব্যব্রাহ্মণ্য সমাজে কৃত্রিম বর্ণবিন্যাস কাদের স্বার্থে কারা করল, উচ্চবর্ণে ও বিত্তে অধিকারই বা পেল কারা, তার হিসেব নিতে হবে, নইলে বাঙালীর ইতিহাস অস্পষ্টই থেকে যাবে। বস্তুত বাঙালীর ইতিহাস বাঙলার লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকসাহিত্যের, লোকশিল্পের, লোকসঙ্গীতের ও লোক বিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম।

বাঙালীর ইতিহাস, বাঙলার জাতীয় ইতিহাস, বাঙলার সংস্কৃতি-কুলজী-কুলপঞ্জী প্রভৃতি নামে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তাতে বিদেশী শাসক এবং বিদেশীর শাস্ত্র ও সমাজ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অস্পৃশ্য বলে অবহেলিত খাঁটি বাঙালীর জীবনযাত্রার রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা তার শতাংশের একাংশও নেই। ইসলাম ও বৈষ্ণব মতবাদ বাঙলায় মধ্যযুগেও একবার বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও আভিজাত্যবোধ বিলোপ করে নির্বিশেষ বাঙালী সমাজ গড়ার সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিহারে আজো কুলবাচিবিহীন হিন্দু নাম সুলভ।

বাঙলার ইতিহাসের যে অংশে প্রশাসনিক, স্থাপত্য শিল্প কিংবা সংস্কৃতি শাস্ত্রসাহিত্য অথবা শিলালেখ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, সে অংশ বাঙলা বা বাঙালীর ইতিহাস নয়, তা শাসক-শোষকের দর্প-দাপটের নিদর্শন মাত্র। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিলবে বাঙালীসৃষ্ট দেবতার মূর্তিশিল্পের বাহার ও ব্যঞ্জনা, দেব-মহিমা-মাহাত্ম্য চেতনার বৈচিত্র্য, কামার-কুমোর-তাঁতীর-ঘরামির-পটুয়ার কৃৎকৌশলের সঙ্গে রূপচেতনার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভয়মুক্ত বাঙালী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় বিধর্মী তুর্কী শাসনকালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই চৌদ্দ-পনেরো শতকে বাঙালীর চিন্তাচেতনায়, কর্মে ও আচরণে রেনেসাঁসের আভাস মেলে, তার মর্মের কথা, প্রত্যাশার প্রত্যয়ের কথা প্রকটিত হয় তার নাথসাহিত্যে, তার ধর্মমঙ্গলে, শিবায়নে, মনসার ভাসানে, চণ্ডীর অনুধ্যানে, তার অধ্যাত্ম সঙ্গীতে, তার প্রণয়গাথায়, রূপকথায়, উপকথায়, ব্রতকথায় ও জৈব বাসনার বিচিত্র আচারিক প্রকাশে।

আরো আগে জানতে হবে, শশাঙ্কের শক্তির উৎস কারা, মহাযান কাদের মানসপ্রসূন, মহাযানী দেবপ্রতীক, নির্বাণচেতনা ও জীবনচর্যা কাদের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। বাঙালী জনগোষ্ঠী কাদের কাছে অস্পৃশ্য, কারা করেছিল এদের অন্ত্যজ, তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবর্ত দিব্যের দ্রোহের কারণ। ঐ নির্ধন দিব্যকে সার্বভৌম শক্তির আধার পাল সম্রাটের প্রতাপ ও প্রভাবে ভেদ করে শির উঁচু করে নির্ভয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা-উত্তেজনা যুগিয়েছিল কোন্ পীড়ন-শোষণ এবং নির্যাতন; এবং কারা হয়েছিল স্বেচ্ছায় তার সহায় ও সহযোগী!

নদী-হাওর বর্ষাবহুল প্রত্যন্ত এই দেশ অনভ্যস্ত বিদেশীর পক্ষে কিছুটা দুর্জয় বলে তখনকার শাসকরা কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করেছে বারবার। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে প্রশাসক-মনে। কিন্তু সে বাঞ্ছা কি ছিল দেশী লোকেরও! এসূত্রে এও জানতে হবে তুর্কী আমল থেকে কোম্পানি আমল অবধি বাঙালী সৈনিকরা যে বাঙলায় শাহ-সামন্তের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে, তার প্রেরণা দেশপ্রেম না পয়সা।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যেসব বণিক-পর্যটক-প্রচারক বাঙলা দেশে এসেছে, তারা বাঙালীকে ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, কলহপ্রিয়, দরিদ্র ও চোর বলে জেনেছে। আমরা জানি, বিগত দুহাজার বছর ধরে বাঙালী ছিল বিদেশী শাসিত ও শোষিত। চিত্ত বিকাশের ও আত্মোন্নয়নের কোন সুযোগই মেলে নি তাদের। কেননা, উচ্চপদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্বাধীন জীবিকা সংস্থানে পরাধীন মানুষের কোন অধিকার বা সুযোগ সাধারণত থাকে না। কথায় বলে–'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' দারিদ্র্য মানুষের সব গুণই নষ্ট করে, অঙ্কুরে বিনাশ করে সব সম্ভাবনা। আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সড়ক হয় সংকীর্ণ, জীবন-ভাবনার দিগন্ত ঘরে-গাঁয়ে থাকে সীমিত। অন্নের কাঙাল মানুষে শাস্ত্র-সমাজ সম্পৃক্ত মানবিক চেতনা কিংবা নীতি নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ সুদুর্লভ। অন্নসন্ধানী মানুষ তাই ছল-চাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আত্মরতি, হরণস্পৃহা, নিঃসঙ্গ প্রয়াস, ঈর্ষা, অসূয়া ও কলহপ্রবণতা তার নিত্যসঙ্গী। চিত্তবিকৃতির মৌল কারণ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগের অনুপস্থিতি।

এমনি পরিবেশে কারণ-ক্রিয়াবোধের অভাবে কিছু সংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবহিতকামী মানুষের মনে তত্ত্বচিন্তা ও মানবহিতৈষণা জাগে, তাঁরাই হন বিষয়বিরাগী, সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ফকির-দরবেশ এবং শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারক। নীতি কথা ও আপ্তবাক্য শুনিয়ে, ন্যায়বোধ ও আদর্শবাদ জাগিয়ে তাঁরা ব্যক্তিকে অনীহ ও সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে চান। প্রাণের ভিত্তি অন্ন, মনের খাদ্য আনন্দ তাদের চেতনায় গুরুত্বহীন। অথচ মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার ও বিকাশের জন্যে ন্যূনতম আর্থিক সাচ্ছল্য আবশ্যিক। অধিকাংশ বাঙালীর তা কখনো ছিল না।

তাই বোধহয় বিগত দুই হাজার বছর ধরে বাঙালীর জীবনে ও মননে ভোগ ও বৈরাগ্য–এই দুটোরই দ্বান্দ্বিক অবস্থান দেখতে পাই। অক্ষমের ভোগলিপ্সা তাদের যেমন দুষ্ট করেছে, তেমনি বৈরাগ্য নষ্ট করেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা। অসহায় ভোগলিপ্সুরা হয়েছে বিভিন্ন শক্তি ও নিরাপত্তা প্রতীক দেবতা-স্রষ্টা ও দৈবনির্ভর, আর আত্মপ্রত্যয়হীন দরিদ্র মানুষ পার্থিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঞ্চনামুক্তির প্রয়াসে আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তি, প্রবোধ ও প্রশান্তি সন্ধান করেছে, তাদের অবলম্বন হয়েছে যোগ, তন্ত্র, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বৈরাগ্য। তাদের কাছে দারিদ্র্য ভোগবিমুখতা, কর্মভীতি ঔদাসীন্য অক্ষমতা অনাসক্তি আত্মবঞ্চনা সংযম এবং ভীরুতা অনীহা রূপে প্রতিভাত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তাই বাঙালীকে রণ-বিমুখ রূপে দেখতে পাই : 'ভঅ ভজ্জিঅ' বঙ্গা (ভয়ে বাঙলা ভাগল) বঙ্গলা ভঙ্গলা [বাঙালী (রণে) ভঙ্গ দিল।] বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে ব্রাহ্মণ সিপাহি ভয়ে কানে পৈতা দিয়ে সব সময় সন্ধ্যামন্ত্র জপে।

কালিদাসও তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যে বলেছেন— বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নো সাধনোদ্যতান্ নিচযান জয়স্তম্ভানু গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ-'বাঙলার' নরপতিরা রণতরী নিয়ে যুদ্ধে [রঘুর সঙ্গে] এগিয়ে এসেছিলেন, রঘু সবলে তাঁদের পরাজিত করে গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যস্থিত দ্বীপে জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। (৪র্থ সন/৩৬ নং শ্লোক।)

আজ লজ্জা ও গৌরবের মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে দৌর্বল্য ও সাফল্যের মধ্যে বিকাশ ও বিকৃতির মধ্যে আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে সম্পদ ও সংকটের মধ্যে ভয় ও সাহসের মধ্যে সামর্থ্য ও অক্ষমতার মধ্যে নিজেদের স্বরূপ জানতে হবে, তবেই আত্মোপলব্ধি হবে সম্ভব। আত্মশক্তি ও সামর্থ্য এবং আত্মত্রুটি ও দুর্বলতা সমভাবে জানা না থাকলে বিপদ ও ব্যর্থতা বাড়ে, পর-প্রতারণায় আপাত লাভ থাকলেও আত্মপ্রতারণা মরণ ফাঁদ বই নয়। কোন জ্ঞানই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না, তাই জ্ঞানই শক্তি। আত্মজ্ঞান ফিরে পেলে জাতীয় জীবনে অনেক বিপদ-সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হবে।

ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী।

॥১॥

ভারতবর্ষ বর্ণসঙ্কর জাতি অধ্যুষিত দেশ। গ্রীক, শক, হূন, কুষাণ, তুর্কী, মুঘল ও ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস তো ঐতিহাসিক ব্যাপার। তারও আগে যারা এদেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও আরো কত জাতি এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছে—সে-খবর কারুর জানা নেই সত্য, কিন্তু অনুমান করা যায়, এই জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল।

ইতিহাস বলছে, এদেশে যারাই যখন এসেছে কিছুকাল পরে তারা বীর্যহীন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের উপর আধিপত্য করেছে। এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়ারই প্রতিক্রিয়া।

আসল কথা, কোন জাতির চারিত্রিক বিকৃতি না ঘটলে তার পতন হয় না। এ বিকৃতির দরুন যখন সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ দেশের বেশিরভাগ লোক নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে; ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে; মহৎ ও বৃহতের সাধনায় পরাঙ্মুখ হয়, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পুরাকালের কোন খবর ইতিহাস দিতে পারে না। কিন্তু মধ্যযুগের কোন কোন ব্যাপারে আমরা এ বিপর্যয়ের আভাস পাচ্ছি। মধ্যযুগে বিদেশী বহু দরবেশ ও প্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। তাঁদের অনুচর রূপে আসে নানা মন ও মতের বহুলোক। এদেশের সমাজ ও শাসন সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকেরও অভাব ছিল না এদের মধ্যে। রাজনীতি-সচেতন স্বদেশপ্রাণ ও স্বজাতিবৎসল কেউ কেউ হয়তো এদেশের দণ্ডশক্তির দৌর্বল্যের খবর দিয়ে স্বজাতি-স্বদেশীকে এদেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্তত আজকাল ঐতিহাসিকেরা তা-ই অনুমান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-অনুমানের সপক্ষে অন্তত কিছু তথ্যের আকস্মিক যোগাযোগও রয়েছে। হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির আগমনের পর মুসলমানদের দিল্লি রাজ্য দখল, গৌড়ে জালালউদ্দীন তাবরেজীর আগমনের পরে বঙ্গবিজয়, বাবা আদমের আগমনে সোনারগাঁ জয়, শাহ্ জালাল ও বদর আল্লাহর 'খানকা করার পরে যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম বিজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুমানের পরিপোষক। এভাবেই ইংরেজ-ফরাসী-পর্তুগীজের রাজ্যলাভ তো একরকম চোখে-দেখা সত্য। অবশ্য দরবেশ-প্রচারকদের উপর এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেউ আরোপ করে না। ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার কথাই বলি, য়ুরোপীয় বেনেরা এল বাণিজ্য করতে। এদেশের আদর্শচ্যুত নির্বোধ দণ্ডধরদের দুর্বলতা টের পেয়ে শুরু করল লুটপাট আর জনগণের উপর উৎপীড়ন। বাধা না-পেয়ে বেড়ে গেল তাদের সাহস ও লোভ। আর বেনেবৃত্তি হল একসময়ে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পলাশী আর অর্ধভারতের ভাগ্যবিধাতা দুর্ধর্ষ মারাঠাগণ। কিন্তু তাদের সঙ্ঘশক্তি ছিল না। তাই ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিল, সাত সাগরের ওপারের কুমীর এসে জুড়ে বসল। এমনিই হয়। আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমশীল জিগীষু মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এদেশে ক্ষাত্রধর্মের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই 'শক-হূন দল পাঠান মুঘল' শক্তি একই পথে লোপ পেল।

॥২॥

এজন্যেই ভারতবর্ষ সঙ্কর জাতির দেশ। বাঙলাদেশের পক্ষে এ-কথা আরো খাঁটি। আদিকাল থেকে এদেশে নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়া, রাঢ়া প্রভৃতি যে গোত্রবাচক শব্দ তা বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। এগারো-বারো শতকের সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এদের বহুবচনের রূপ পাওয়া যাচ্ছে : গৌড়াঃ, বঙ্গঃ, রাঢ়াঃ প্রভৃতি। এতে বোঝা যায়, এক-এক গোষ্ঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল বাসিন্দাদেরই গোত্রীয় নামে পরিচিতি হত।[১]

অস্ট্রিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধহয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গ-গৌড় রাজ্য গড়ে ওঠে। চর্যাপদে 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও (আনুঃ ৫ম শতক) 'বঙ্গ' শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী' বা 'অদঅ বঙ্গাল দেশ লোড়িউ' আর সর্বানন্দের 'অমরকোষে' (১১৫৯ খ্রী:) 'বঙ্গাল বচ্চার' শব্দ পাচ্ছি। নিত্যাহ্নিকতিলকে (লিপিকাল ১৩৯৫ খ্রীঃ) 'বঙ্গিদেশ' ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলেই কেবল গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চল 'সুবা-ই-বঙ্গাল' নামে আখ্যাত হয়। ফলে কয়েকশ বছরের অব্যবহারে

---

১. মহাভারতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। মহাভারতোক্ত কাহিনী এরূপ :
বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমাকে রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ধর্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করতে অনুরোধ করলেন। তদনুসারে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাকে বর দিয়েছিলেন, "তোমার পুত্রগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাহাদের নামে খ্যাত হইবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য নামগুলো অপরিচিত হয়ে উঠল, আর 'বঙ্গ' নামটি গোটা সুবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কাজেই 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতা চর্যাপদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের প্রাচীনতার ও প্রামাণিকতার ওপর নির্ভর করে।

কোল, ভীল, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, দ্রাবিড়, চাকমা, নাগা, কুকী, আর্য, শক, হূন, তুর্কী, মুঘল, আরব, ইরানী, হাবসী প্রভৃতি দুনিয়ার নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির সমবায়ে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালী জাতির মধ্যে তাই বিচিত্র আচারসংস্কার, মননধারা, চারিত্রিক বৃত্তিপ্রবৃত্তি ও রুচিসংস্কৃতির আভাস আজো দুর্লভ নয়। দেহাকৃতিগত বৈচিত্র্যও কি কম!

॥৩॥

আমাদের দেশে 'আর্য' ছাড়া আর সব গোত্রীয় মানুষই 'অনার্য'—এই সাধারণ নামে পরিচিত। সংস্কারবশত আমরা 'অনার্য' বলতে অসভ্যই বুঝে থাকি, যেন অনার্য 'অসভ্য'-এর প্রতিশব্দ। দেশের পুরনো ইতিহাসের যেসব উপাদান পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সবগুলোই আর্যভাষায় ও আর্য প্রভাবে লিখিত বা উক্ত। তাই ঋগ্বেদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনার্যদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক। অনার্যেরা বিজেতার গৌরবগর্বী আর্যদের কাছে মানুষ নামের যোগ্যও ছিল না। এজন্যই বিভিন্ন গোত্রের অনার্যেরা আর্য সমাজে দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আদিতে এগুলো ছিল ট্যাং টোটেম নাম। কিন্তু আর্যেরা ব্যবহার করেছে অবজ্ঞার্থে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, রাক্ষসকুলে রাবণ, নাগকুলে বাসুকী-জরৎকারু, যক্ষকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনী আমরা পাচ্ছি। মহাভারত ও পুরাণাদিতে অনার্যদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। অথচ এই যুগে আমরা জানতে পারছি কোন কোন অনার্য গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়েরা আর্যদের চেয়েও সভ্য ও উন্নত ছিল। তার প্রমাণ কেবল ময়েঞ্জোদারো, কালিবগাঁন, লোথাল, হরপ্পা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও কোটদিজির আবিষ্ক্রিয়ায় নয়—আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তরকালের আর্য শাস্ত্র-গ্রন্থগুলো যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে শুধু যে অনার্য দেব-দেবীরাই ভিড় জমিয়েছে তা নয়—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্যদর্শনও গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবে অনার্য প্রভাব প্রসূত। এমনকি বেদান্ত বা উপনিষদও অনার্য তত্ত্বচিন্তার প্রসূন। পরেও সিথিয়ান, হূন, গ্রীক, ইরানী সভ্যতাও প্রভাবিত করেছে তথাকথিত ভারতীয় আর্য সভ্যতাকে।

মহাভারতে বর্ণিত ময় দানবের কৌরবের সভা সাজানোর কাহিনীটি অনার্যশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। ভক্তিবাদের উদ্‌গাতা শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ও ব্যাসদেব অনার্য রক্তসম্ভূত। 'নবঘনশ্যাম' কৃষ্ণ আর 'নবদূর্বাদলশ্যাম' রামও হয়তো অনার্যের রক্তে ঋণী। নারী দেবতা এবং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা একান্তভাবেই অনার্য। দেবকী, বাসুদেব, শিব, উমা প্রভৃতি অনার্য নাম। আর্য দেবতা প্রকৃতির প্রতীক। কিন্তু অনার্য দেবতা গুণ ও ভাবকল্পের প্রতিমূর্তি। এভাবে আমরা নানা সূত্রে আর্যদের ওপর অনার্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। প্রতিমাপূজা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও নারী দেবতার পূজা, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, মন্দিরোপাসনা, যোগ, তন্ত্র ও সাংখ্যদর্শন, ধ্যান, সন্ন্যাস এবং ভূত, যক্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পূজা প্রভৃতি অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসূন। উপনিষদ যদি বিদেহ (বিহার) অঞ্চলের হয়, তাহলে তাও অনার্য অবদান। আর বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম তো অনার্যমনন প্রসূত বটেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যরা বিজয়ী হিসেবেই বিদেশ থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংখ্যা বেশি হবার কথা নয়। আমরা অনুমান করতে পারি আর্যবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের উচ্চবিত্তের ও আভিজাত্যের লোকগুলো আর্য সমাজে মিশে গিয়েছিল। নইলে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা উচ্চবর্ণের আর্যশ্রেণীভুক্ত হল কী করে? আর্যদের বসবাসের সাথে সাথেই উত্তর ভারত 'আর্যাবর্তে' পরিণত হল। ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে সামীয় দ্রাবিড় আজো রয়ে গেছে। এ দিকে মগধ পেরিয়ে বহুকাল অবধি আর্যেরা আধুনিক বাঙলাদেশের খবর নেয়নি। এই 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ সম্বন্ধে আর্যদের যেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল, তেমনি এর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ধারণাও তারা পোষণ করত। এভাবে কতকাল কেটেছে জানা যায় না, তবে গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চলে যে বর্বরপ্রায় গোত্রগুলোর বসতি ছিল , তার আভাসও জৈন আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

॥৪॥

অনেককাল অবধি আর্য-অনার্যের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই চলেছিল, বৈদিক-পৌরাণিক ইন্দ্রকথা থেকে এও অনুমান করা কষ্টকর নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অনার্য রাক্ষস, নাগ, দৈত্য প্রভৃতি গোত্রশক্তিকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রণে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে চিরদাসে পরিণত করতে বা এদের উচ্চবিত্তের লোকগুলোকে আর্যসমাজভুক্ত করে নিতে আর্যদের সময় লেগেছিল অনেক। যারা বশ্যতাস্বীকার করেনি, তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে কিংবা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। যেসব বিত্তহীন অজ্ঞ মানুষ আর্য সমাজে দাসরূপে ঠাঁই পেল, তারা কিরূপ উৎপীড়িত হত ও অবজ্ঞা পেত, তার চিত্র মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্রাহ্মণ্য সংহিতার পাঁতিগুলো থেকে পাওয়া যায়। আর্যেরা শতবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি করে একসময় যখন বিজেতা-বিজিতের স্মৃতি গণমন থেকে মুছে গেল, অথচ বেশিরভাগ অনার্য সমাজে হীনবর্ণরূপে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তখন জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথামতো ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজবিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। গৌতমপূর্ব বহু বোধিসত্ত্বের এবং জৈনদের মহাবীরপূর্ব তেইশজন তীর্থঙ্করের উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধে উঠছিল, সাফল্য আসে তথা পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় মহাবীর ও গৌতমের নেতৃত্বে। এই দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী বিপ্লবীদ্বয়ের অনুশাসন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্য সমাজদেহ কিরূপ বিষাক্ত করে তুলেছিল। তাঁরা দুজনেই প্রচারিত ধর্মদর্শন তথা সমাজব্যবস্থা অস্বীকার করলেন। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড, বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য—এককথায় তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুরই বিলোপ সাধনে ব্রতী হয়ে সর্বজীবের জীবনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রচারে এগিয়ে এলেন। এতবড় কথা এর আগে আর কোথাও কেউ বলেন নি। সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীবাহক মানবতার এই মহাসাধকগণ সেদিন কোটি কোটি নিপীড়িত নরনারীকে [দেবী পূজার যুগেও আর্যসমাজে নারীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, শূদ্রের চেয়ে নারীর মর্যাদা বেশি ছিল না।] সম্প্রদায় বিশেষের খামখেয়ালী অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর্য-অনার্যের বিভেদ উঠে গেল, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ঘুচে গেল। সাধারণের 'বুলি' অভিজাত ভাষা আসনও কেড়ে নিল। নিম্নবর্ণের নর নারী নতুন ধর্মচ্ছায়ায় ও সমাজাশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। [উচ্চবর্ণের খুব কম লোকই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিদ্রোহ বিপ্লবের লক্ষণটা আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার : দেবতার নাম করে বামুনেরা শোষণ ও পেষণ করত। গৌতম দেবপূজা অস্বীকার করলেন—আত্মা-নরক-পিণ্ড প্রভৃতির ব্যাপারে নিরীহ লোকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে পীড়ন করা হয়। তাই বুদ্ধ বললেন—সব মিথ্যে। বর্ণাশ্রমে-দুষ্ট সমাজে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখা দিল। তাই প্রচারিত হল সাম্যবাদ। দেব ও দ্বিজের দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে উঠল—তাই দেব-দ্বিজ পূজা অস্বীকৃত হল। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অধিকার ছিল না—তাই গণভাষা পালি ও প্রাকৃত মর্যাদা পেল। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদকে অনার্য অভ্যুত্থান বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে। গৌতম জন্মেছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবাস্তুতে। তিব্বতী ভোটচীনা লিচ্ছবীরা ছিল তাঁর মাতৃকুল। মহাবীরও ছিলেন অনার্য অধ্যুষিত তথা আর্যাবর্ত-বহির্ভূত অঞ্চল দক্ষিণ বিহারসম্ভূত।

যে-দেবতাকে নিজের সুখদুঃখের কথা নিজ মুখে নিবেদন করা চলে না, যে-ধর্মের ক্রিয়া-কাণ্ড নিজের আচরণসাধ্য নয়, যে-ধর্মের বাণী নিজ মুখে উচ্চারণ ও নিজ কানে শ্রবণ সম্ভব নয়, তার সঙ্গে কারো আত্মিক যোগ থাকার কথা নয়। এ-কারণে লোকেরও কোন অন্ধ সংস্কারের বন্ধন ছিল না। তাই ভারতময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সহজেই প্রচারিত হতে পেরেছিল।

আর্য-অনার্যের বিভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ অবিশেষের কাছে বুদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পক্ষে কোন বাধা রইল না। এসময়েই প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মগধের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়ে পুণ্ড্রে তথা আধুনিক বাঙলাদেশে নবধর্ম প্রচারের জন্যে উপস্থিত হলেন। এদেশের বর্বরপ্রায় জনগণের মধ্যে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির আবরণে এই দ্রোহী-ধর্ম অর্থাৎ জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হল। এদের লিপি ছিল না, সাহিত্যের শালীন ভাষা ছিল না, উঁচুমানের সংস্কৃতি ছিল না, তাই আর্য ধর্মের (নামত অবশ্য) সঙ্গে আর্যভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হল। এভাবে বাঙলাদেশে অল্পকালের মধ্যে আর্যধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল এবং এ সঙ্গে কিছুসংখ্যক তথাকথিত আর্যও এদেশে প্রচার উপলক্ষে বসবাস করতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করতে বাধা নেই।

॥৫॥

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনকে আমরা অনার্য অভ্যুত্থানও যে বলতে পারি, তার পক্ষে কিছু তথ্য আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণে দস্যু সর্দারের রাজ্যলাভ এবং নাপিতপুত্ররূপে ঘৃণিত নৃপতির কথা আছে।[১] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"শূদ্রগণ অনার্য বংশসম্ভূত।... শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নী গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থ বোধহয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া 'একরাট' পদবী লাভ করিতে পারেন নাই।"[২] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে যদি ত্রুটিও থাকে, তবু আমরা বলতে পারি, মহানন্দ, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোক—এ তিনজনের যে-কোন একজনের নেতৃত্বে অনার্য

১. সমসাময়িক ভারত ১ম খণ্ড, ভূমিকা–যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

২. বাঙলার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। রাজবংশী প্রভৃতি কৈবর্ত শূদ্রগণও একসময় আর্য শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহিতা এতই তীব্র ছিল যে, নির্বাণকালে তিনি নাকি সংস্কৃতচর্চা করতে নিষেধ করে যান। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের দস্যুবৃত্তির ও যুদ্ধের এবং মহাভারতে আর্য-অনার্যের যুদ্ধবিগ্রহের বহু কাহিনী আছে। বাসুকীর বিদ্রোহ, বৃত্রের দেবতাতাড়ন, রাবণের সীতাহরণ, প্রহ্লাদের আর্যধর্ম গ্রহণ, রামের হরধনু ভঙ্গকরণ, রামের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণলাভ, অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা প্রভৃতি আর্য-অনার্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও মিলনের কাহিনী। ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম অনার্যার গর্ভে। আর্যেরা যে অনার্যা সুন্দরীদের ধর্ষণ করত, এগুলো তারও নজির।

॥৬॥

মনে করা যাক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে বাঙলাদেশে আর্যপ্রভাব পড়েনি। কিন্তু দেশে মানুষ ছিল, অথচ তাদের ভাষা ছিল না, সুখ-দুঃখের গান বা গাথা ছিল না, ছড়া ছিল না, 'বচন' ছিল না কিংবা ধর্মজ্ঞাত সংস্কার ছিল না—এমন হতেই পারে না। কাজেই মেনে নিতে হয় যে, আর্যপূর্ব যুগে এদেশে কোন একটি সর্বজনীন ভাষা কিংবা গোত্রীর ভাষাগুলো চালু ছিল। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করে নিয়ে তারা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে উন্নত আর্যভাষা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ও বস্তুর নির্দেশক কিছু কিছু শব্দ ও বাগ্বিধি আর্যভাষার (সম্ভবত মাগধী প্রাকৃত) সঙ্গে মিশে গেল। কোন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিণত থাকলে সেগুলো উন্নত হলেও কোন কোন অবস্থায় এ বিপদ এড়ানো যায় না। বাঙলা সেদিন এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কোন ভাষা সেকালে কোনো ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার বিকাশ দ্রুততর হত—এ কালে যেমন হয় রাষ্ট্রভাষা কিংবা কোনো মতবাদের বাহন হলে। এর প্রসারও হত, কারণ কোন ভাষা কোন ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার প্রভাব এড়ানো সে-ধর্মে দীক্ষিত জাতির পক্ষে অসম্ভব। এবং যে-কোন ভাষার প্রসার নতুন ভাব, চিন্তা ও নতুন বস্তুভিত্তিক। জৈন ধর্ম নয়—বৌদ্ধ মতবাদই বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা আত্মরক্ষার কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এজন্যেই আজো কোল, ভীল, মুণ্ডা, কুকী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি নিজেদের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, দেখতে পাই। এসব ভাষাকেই সম্ভবত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' (৮ম শতক খ্রী:) 'অসুরভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে : 'অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়-পুণ্ড্রভবা সদা।' কিংবা ঐতরেয় আরণ্যকে 'বায়াংসি'র বুলি বলে নিন্দা করা হয়েছে।

॥৭॥

ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতির উপায় রূপে জনগণ বৌদ্ধ ও জৈন মত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলেও প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় ধর্মে নানা বিকৃতি দেখা দিল। কারণ, এ দুটো ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন জৈবধর্মের এতই প্রতিকূল যে তা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণসাধ্য নয়। সাধারণভাবে , মানুষের জীবনের সাধনা হচ্ছে ধন-জন-মানের সাধনা। অন্তরের অভাব ও অতৃপ্তিবোধই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মপ্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়, ভোগেচ্ছাবিহীন জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল কথা—বৈরাগ্য-তৃষ্ণাবিহীন জীবনসাধনা অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে পঙ্গু ও অথর্ব করে তোলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও বৌদ্ধদের নৈতিক চারিত্রিক দৌর্বল্যের সুযোগে শঙ্করাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যশক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষে দেদার হত্যাকাণ্ড, বহু অত্যাচার ও নানা উৎপীড়ন যে হয়েছিল তার প্রমাণ সে-যুগের পুঁথিপত্রে নানা সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'শঙ্করবিজয়ে' আছে : দুষ্টমতাবলম্বিনঃ জৈনান অসংখ্যাতান অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত্যতেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণেচূর্ণীকৃত চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসম আচরণ নির্ভয়ো বর্ততে। [অর্থাৎ : অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজ্যমুখ্যদিগকে অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত করিয়া তাহাদের মাথা কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে, অনেক উদখলে নিক্ষেপ করে, মুষল দ্বারা চূর্ণ করে, এইরূপ দুষ্টমত ধ্বংস আচরণ করে তিনি নির্ভয় থাকতেন।] এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধগণ নির্মূল হয়ে গেল। তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিও বৌদ্ধদ্বেষী নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক হয়তো বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছিল।

বাঙলাদেশের কথায় আসা যাক। বাঙালীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল সত্য, কিন্তু ধর্মের অনুশাসনের সাথে জনগণের আন্তর যোগ ছিল না, তাই নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য বৌদ্ধ চৈত্যগুলো ক্রমে বহু দেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি নানা মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কারণ সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে স্বস্তি ও প্রবোধ পাবার জন্যে একটি মহাশক্তিকে অবলম্বন স্বরূপ পাওয়া চাই। নইলে ভরসা কি? বাঙলার পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম নামত টিকে ছিল। সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের প্রতিকূলতায় বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হল। বাঙলাদেশে কোনকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তা অনুমান করবার সামান্য উপাদান পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। এতেই বোঝা যায়, কি অসামান্য উগ্রতা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মধ্বজিগণ বৌদ্ধদের ধর্ম, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধ জাতিকে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গেও জনসাধারণের বিশ্বাস সংস্কারের যোগ নিবিড় ছিল না। রাজধর্ম বলে সেনবংশীয় শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুস্যূত হলেও, আসলে ধর্মগ্রন্থ, মন্দির, দেবতা প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক ব্রাহ্মণের মারফত হত বলে, তা কখনও অকৃত্রিম হয়ে ওঠে নি। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (সেন রাজবংশের পতনযুগেই এর সূচনা) রাজরোষের ভয়মুক্ত জনসাধারণ স্ব স্ব বিশ্বাস-সংস্কার দিয়ে নিজেদের ইষ্ট দেবতা পুনঃসৃষ্টি করল। এটাই বাঙলাদেশে ও সাহিত্যে লৌকিক ধর্মান্দোলন। মনসা, চণ্ডী, ওলা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, নাথপন্থ প্রভৃতি দেবতার ও মতের সৃষ্টি হল এবং পূজার প্রসার ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকল। এইগুলো মূলত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনার্য ধর্ম। অবশ্য এতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রচুর। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রামায়ণ অথবা মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে। গভীর তাৎপর্যে, লোকায়ত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাহ্মণ্যবাদ লৌকিক দেবতা ও লোকায়ত মত স্বীকার করে স্মৃতি-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে আপোস সহাবস্থানের সুযোগ করে নিয়েছিল।

এ সব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এক কালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে? যে উপায়ে হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।" রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য একটু কঠোর। আসলে সমাজে যে-স্তরের লোক দ্বারা এ সব লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচিসংস্কৃতি কোনো কালেই উঁচু ছিল না। যে পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে মানুষের মন ও মননের বিকাশ ও প্রসার হয়, তা চিরকাল এদের কাছে রুদ্ধ ছিল, তাই এদের অপরিণত মন-বুদ্ধি-বোধিরই নগ্নরূপ ধরা দিয়েছে দেবতার কায়িক শক্তি ও ঐশ্বর্য পরিকল্পনায়।

খ্রীস্টীয় এগারো-বারো শতকে অর্থাৎ পাল রাজত্বের শেষের দিকে রচিত সংস্কৃত পুরাণগুলোত এ সব লৌকিক দেবতার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' আশুতোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ) যা বলেছেন তা অনেকটা সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—"সেন রাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এতকালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও-যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল-মুখ্যতঃ না হউক গৌণতঃ হইলেও এই সমাজদেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাতমুহূর্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।...তাহারা (বাঙালী হিন্দুগণ) নূতনকে (ব্রাহ্মণ্যধর্মকে) যেভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল; এই দেশীয় প্রচলিত ধর্ম সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গল কাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়।...তাহারই ফলে বর্তমানে বাঙলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।"

॥৮॥

"বৈদিক মতাবলম্বী ও স্মার্তনীতিতে বিশ্বাসী সেনবংশ বাংলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের কিছু মাত্র যোগ ছিল না—তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সুড়ঙ্গপথে গতায়াত করিতেছিল।" (অসিত বন্দ্যো : বা: সা: ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড পৃ: ২৭) অতএব সেন আমলে ধর্মের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লঘু-গুরুভাবে চলছিল। তাছাড়া লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙালীর নৈতিক দৌর্বল্য, চারিত্রিক বিকৃতি ও সামাজিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', শূন্যপুরাণ বা ধর্ম পূজাবিধানের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতিতে এর আভাস আছে। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা সন্ধান করা বাতুলতা মাত্র—কারণ এতে তা নেই। বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়নের রেশ তখনো ছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতেও শিথিলতা এসেছিল। মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধিদৈবিক শক্তির ওপর একান্ত নির্ভরতা এ যুগের প্রাসাদ ও কুটীরবাসীর চিত্তদৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন আমলের রণনীতির একটু নমুনা :

"তুকতাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রুসৈন্য যদি চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অং হং হালিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিনেহি
মশানেহি খাহি লুঞ্চহি খাহি কিলি কিলি কালি হুংকট স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধূতুরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্রজপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে"ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্য বিজয়ঃ।" (ডক্টর সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী)

দেশের দণ্ডশক্তির যখন এমনি অবস্থা, তখন মুসলিমশক্তি দেশশাসন ব্যাপারে বিশেষ বাধা পেয়েছিল বলে মনে হয় না, কাজেই 'ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার কারণ ঘটে নি। বরং ডক্টর সুকুমার সেনের অপর একটি উক্তি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মত দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্যবিধান বলে মেনে নেওয়া।...তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।" (মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী)। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' সেন আমলের বাঙালীর চরিত্র শৈথিল্যের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

AMARBOI.COM

॥৯॥

তুর্কী অভিযানের সময় বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল। বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেউলদেহারা ও দেশীয় সামন্তশক্তির ওপর হামলা করতে যে বাধ্য হয়েছে তা অস্বীকার করারও কারণ দেখি না। দেশী শাসক-প্রশাসক-ব্যবসায়ীর স্থানে গায়ের জোরে বসল বিদেশী। কাজেই অনেকেরই সর্বনাশ হল ধনে-জনে মানে-মনে। প্রাণ হারাল অনেকেই। বিজেতাগণের উত্তুন্নন্যতা ও বিজিতদের হীনমন্যতার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক যে কিছুকাল অবজ্ঞা ও বিদ্বেষদুষ্ট ছিল তাও সত্য। তুর্কী অভিযান তথা ভারতে মুসলমান বিজয় যে ধর্মসম্পৃক্ত নয়, তা সবাই স্বীকার করেছে। সুতরাং শাসক বিশেষের অত্যাচার উৎপীড়ন জাতীয় কলঙ্করূপে চিত্রিত হওয়াও উচিত নয়। যেমন, গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন যে কয়জন ব্রাহ্মণকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন, তা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল। ইসলাম বা মুসলমানের এর সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজধানীতেও হিন্দু আধিক্য তার প্রমাণ। তুর্কী মুসলমানেরা রাজত্ব করতে এসেছিল, ধর্মপ্রচার করতে নয়। অবশ্য মুসলমান বিজয়ের আনুষঙ্গিক ফল পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় এবং বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোতে হিন্দুর ওপর বিশেষ করে ব্রাহ্মণের ওপর অত্যাচারের যে সব কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায়, এ সব অত্যাচার উৎপীড়ন অহেতুক ছিল বলে বিশ্বাস করা উচিত নয় [পূর্ব অধ্যায়ে জাতিবৈর দ্রষ্টব্য]। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেও স্বদেশী সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতির ওপর দলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থে ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রূঢ় ও কঠোর হতে বাধ্য হয়। বিরোধী দল একে অকারণ অত্যাচার-উৎপীড়ন বলে রটিয়ে থাকে। কে না জানে সকারণ শাস্তি চিরকালই শাস্তিভোগীর দ্বারা অকারণ উৎপীড়ন বলে বর্ণিত হয়! আত্মপক্ষ সমর্থন মানুষের সহজাত বৃত্তি। আবার কোন কোন মুসলমানের কাফেরদের প্রতি অবজ্ঞা, কাফের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন উক্তি ও কার্য পুঁথিপত্রে বিধৃত থেকে গোটা মুসলমান জাতিরও কলঙ্ক ঘোষণা করছে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের মধ্যে যেভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছিল এবং হবার কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে কারণ থাকার কথা নয়। ওটাতে প্রতিবেশীসুলভ বহুকাল পোষিত আক্রোশের রেশ ছিল, এটাতে ছিল না। কেননা, দীক্ষিত মুসলমানের বিরলতার দরুন মুসলমান তখনো হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী হয়ে ওঠেনি। তখন কেবল বিদেশী প্রশাসক মুসলমান ও দেশী হিন্দুই ছিল—অনেকটা ইংরেজ শাসক ও ভারতীয় প্রজার মতো। মুসলিম রচিত রসুলবিজয়, হানিফার দিগ্বিজয়, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতির মধ্যেও দেখি মুসলমানদের কাফেরের প্রতি নয় কুফরীর প্রতিই অশেষ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ, তাই তাদের কাহিনীতে রাজা ও ব্রাহ্মণই ইসলামে দীক্ষাদানের লক্ষ্য –দ্বন্দ্বও সর্বত্র রাজা ও ব্রাহ্মণের সঙ্গেই।

হিন্দু ও শাসক মুসলমানের বিরোধই সত্য ছিল, সম্প্রীতি মিলন কাহিনীই কি মিথ্যা?- "এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সেসব ঐতিহাসিক নজীর দিন দিনই নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতিমোহন সেন)

তুর্কী রাজত্বের প্রথম যুগে রাষ্ট্রশক্তির স্থিরতা ছিল না। রাজা ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ সময় দেশে হিন্দুপীড়নে আগ্রহ না থাকারই কথা। কিন্তু ইলিয়াসশাহী শাসনে দেশে যে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ সময় থেকেই মুসলমান শাসকগণ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে তৎপর হন। এ সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দীক্ষার মাধ্যমে রক্তসম্পর্কও ব্যাপক হতে থাকে। কোন কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত লাম্পট্যে হিন্দু রমণী ধর্ষণ যে চলেনি তা নয় তবে এগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত নয়—কামজ, সুন্দরীর প্রতি পুরুষসম্ভব আকর্ষণজাত। যেমন রাজা গণেশের দরবেশপীড়ন একান্তই রাজনৈতিক কারণপ্রসূত।

শাসকগোষ্ঠী চিরকাল আলাদা একটা জাতি। তাঁদের স্বার্থ ও সুখের প্রেরণাতেই তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টা চালিত। তা জনসাধারণের পক্ষে কখনো কখনো বিপদের কারণ হয়ে ওঠে মাত্র। শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ নরশ্রেষ্ঠ, আবার কেউ বা নরদানব। এসবই হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্রনির্ভর ব্যাপার। কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের সঙ্গে সুশাসন কুশাসনের কার্যকারণ সম্পর্ক সন্ধান নিতান্ত নিরর্থক। বাঙলার তথা ভারতের মুসলমান নৃপতিদের অনেকেই সুশাসক ছিলেন, নরদানবও ছিলেন কেউ কেউ। তাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ স্বজাতি-বিজাতি সমভাবে ভোগ করেছে। আস্তিক মানুষেরা কেবল স্বধর্মকেই সত্য বলে জানে। পরধর্মে আস্থার অভাবহেতু ধার্মিক মাত্রই পর ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাপ্রবণ। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক ও রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধি যে প্রবল ছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ। প্রতাপ-শিবাজীর মুসলমান অনুচর ছিল বহু। আওরঙজীবের হিন্দু সেনা ও সেনাপতির সংখ্যাও কি কম! তারপর যে সব সূত্রে আমরা বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার, হিন্দুর ওপর মুসলমান উৎপীড়নের সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছি, তাতে লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ নিশ্চয়ই রয়েছে। যেমন, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন আছে, তেমনি সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছাও কম নয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে বিরোধের কথা ফলাও করে বলে বেড়ায়, আবার কেউ সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে। অথচ সত্য থাকে এ দুয়ের মাঝখানে। '১২০০ থেকে ১৪৫০ পর্যন্ত আড়াই শ' বছর যাবৎ মুসলমানগণ বাঙলা দেশে অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার ফলেই এ সময়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করবার জন্যেই আমাদের এত কথার অবতারণা করতে হল।

॥১০॥

আমাদের ধারণা, তুর্কী বিজয় ও তারপরের বাঙলার অবস্থা নিম্নরূপই ছিল :

তুর্কীদের বাঙলা অভিযানকালে তারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, ধনরত্ন প্রাপ্তির আশায় এবং পলাতক শত্রুর সন্ধানে দেউলদেহারা আক্রমণ করেছে ও ভেঙেছে। বিজয়ী হয়ে এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে দেউলদেহারা ভাঙবার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বা আক্রোশবশে সামন্তশ্রেণীর কোন কোন হিন্দুর উপর পীড়ন যে করতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তেমন অত্যাচার থেকে মুসলমানও নিষ্কৃতি পায় নি। সাধারণ মুসলমানের উত্তন্মন্যতা ও সাধারণ হিন্দুর হীনমন্যতাজাত পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ তাদেরকে কিছুকাল অনাত্মীয় করে রেখেছিল বলেও অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করতে পারে নি। কারণ :

১. 'রাজ্যশাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমনকি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।' -(ডঃ সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন। ...এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস)

২. সাধারণ মুসলমানরা বিশেষ করে প্রচারক দরবেশরা চাইতেন এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার হোক। কাজেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যও সাধারণ মুসলমানকে সংযত হয়ে চলতে হয়েছে। বিশেষত গৌড়েই হযরত জালালউদ্দীন তাবরেজী ও আলাউল হক তাঁর পুত্র হযরত নূর কুতবে-আলম প্রভৃতি অবস্থান করতেন।

৩. গৌড়ের প্রথম দিককার সুলতান ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও মারামারিতে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে হিন্দু প্রজাদের [যারা ছিল শতকরা প্রায় আটানব্বই জন] তাঁরা উৎপীড়ন দ্বারা উত্তেজিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া তখনো গাঁয়ে গঞ্জে মুসলমান ছিল দুর্লভ বা নগণ্য। ইলিয়াস শাহী শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গৌড়ের সুলতানের অধীনে হিন্দুরাও অন্তত মন্দের ভালো রূপে মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে মনে করত। অন্তত অনুগত ও তুষ্ট প্রজা ছিল। এ জন্যেই মুঘলের বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তারা কখনো উদাসীন ছিল না। ধর্ম ব্যাপারেও পারস্পরিক সহনশীলতার ভাব বিরাজ করত। বৃন্দাবন দাস বলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম ॥

এবং বৈষ্ণবদের হাতে অনেক মুসলমান স্বধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইলিয়াসশাহী আমল থেকেই বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপতি ও কবিচূড়ামণি, মহাচার্য রায়মণি, বৃহস্পতি মিশ্র এ সময়কার পরপর কয়েকজন সুলতানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। হোসেনশাহী আমল বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণযুগ। এ সময়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হল। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। দীনেশচন্দ্র সেন (বৃহৎ বঙ্গ) বলেন—"বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।... এই পাঠান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে, তাহারা গরুড়পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন। তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মপ্রচার–এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্যশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই।" [এ সূত্রে জাতিবৈর পরিচ্ছেদে(পৃ৭৬-৭৭) বঙ্কিমচন্দ্র, সুকুমার সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতও দ্রষ্টব্য।]

মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, নবদ্বীপসম্ভব কোন ব্রাহ্মণ বীর মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে বলে গুজব রটে, ফলে হোসেন শাহ চঞ্চল ও সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হওয়ায়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বপ্নসাধ ধসে গেল। রঘুনন্দন, রামনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংহতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে হোসেন শাহ গোড়ার দিকে চৈতন্যের মত প্রচারে পরোক্ষ সহায়তা দান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥১১॥

ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের বাহন দেবভাষা সাধারণ বাঙালীকে বহুকাল মূক করে রেখেছিল। বাঙালী তার বুকের আশা মুখের ভাষায় বহুকাল প্রকাশ করতে পারে নি। সেন রাজাদের আমলে 'শূদ্রমাত্রেরই উচ্চ শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।... এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল।'(দীনেশ সেন—বৃহৎ বঙ্গ)। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালীর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ নানা ধারায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে আর্যপ্রভাবমুক্ত পৃথক জাতিরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন শুভযুগ বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর আগে পরে কোনদিন আসে নি।

শেখ শুভোদয়ার বা গীতিগোবিন্দের ভাষা তো প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় রীতির তুলনায় নিকৃষ্ট। শেখ শুভোদয়ার ভাষা তো অবিমিশ্রও নয়, তবু এঁরা দেশীয়ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে সাহস পান নি দেবদ্বিজের ভয়ে। সহজ ও নাথপন্থীদের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখযোগ্য নয়— কারণ হিন্দু বাঙালীর সমাজে তাঁদের কোনো প্রভাব ছিল না। সুতরাং একান্তভাবে তুর্কীশাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই, মুসলমানেরা কেবল সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা পাঠক ছিলেন না, সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাত দিয়েছিলেন হিন্দুদের সাথেই। আর এ-ব্যাপারে তাঁদের কোন বাধাও ছিল না। বেশির ভাগ বাঙালী মুসলমান তো হিন্দু থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। কাজেই অনুকূল পরিবেশে তারা যে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহবোধ করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

AMARBOI.COM

॥১২॥

তবু পণ্ডিত ও প্রতিভাবানদের কাছে এ-ভাষা মধ্যযুগে কোনদিন কদর পায় নি। তাঁরা সংস্কৃত ও ফারসীকেই স্ব স্ব অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁরা সেবা করেছেন তাঁদের প্রতিভা খুব উঁচু দরের ছিল না। তাই কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি যতই পাণ্ডিত্যাভিমান দেখান না কেন, আলাউল, দৌলতকাজী, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম যত বড় প্রতিভার পরিচয় দিন না কেন, কেউই সমসাময়িক সংস্কৃত বা ফারসী সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা রেখে যেতে পারেন নি। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের মতো অধিকাংশ লেখকও যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তা অনুমান করা চলে। এ জন্যেই চারশ বছর ধরে অনুশীলিত হয়েও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য আশানুরূপ ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। যদিও এসব রচনা রূপকল্পে না হোক, রসকল্পে তথা মননভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে বাঙলার সংস্কৃতির কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

কোন জাতির মুখের বুলিও যে সাহিত্যসৃষ্টির বাহন হতে পারে, তা অসামান্য প্রতিভা ছাড়া কারুর মনে জাগেও না, তাই বাঙলায় হিন্দুদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, জনগণের মধ্যে লৌকিক দেবতার পূজা প্রচারের আগ্রহ ও গরজই তাঁদেরকে বাঙলা লেখায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এ জন্যেই হিন্দুর হাতে আমরা নিছক সাহিত্যশিল্প পাই নি। গোড়া থেকেই কিন্তু মুসলমানরা এ কাজে হাত দেন। বাঙলার মাধ্যমে ধর্মকথা শোনানোর সাথে সাথে উত্তর ভারতীয় ও ইরানী রসকথাও শোনানোর ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে সম্ভবত বাঙলা ভাষাতেই প্রথম রোমান্স রচিত হয়। এ-কৃতিত্ব 'ইউসুফ জোলেখা' রচয়িতা শাহ্ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীঃ)। কিন্তু এ প্রয়াস দেখা দেয় সেকালের মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে মাত্র। জনসাধারণ তাদের দিকে চেয়ে বসে ছিল না। তাদের সাহিত্যের ভাষা না থাক, মুখের বুলি ছিল। আরো ছিল জৈব-রস পিপাসা ও হৃদয়নিঃসৃত বক্তব্য। তাই শিল্পসৃষ্টির মহৎ আদর্শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই জৈব-প্রয়োজনে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক বুলিতে অঞ্চলবাসীর উদ্দেশ্যে গান, গাথা, ছড়া, বচন, রূপকথা ও রসবার্তা তৈরি করে তারা মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। এগুলোই আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় 'লোকসাহিত্য' বা 'পল্লীসাহিত্য'। বহু মুখের স্পর্শে এগুলোর রূপ ও রস বদলেছে, তাই এ-সব ব্যক্তিক রচনা আর নেই। এ কারণেই এগুলোকে 'গণ রচনা' বলে নির্দেশ করা হচ্ছে আজকাল। দেশের লেখ্যভাষায় রচিত নয় বলে, এ সব রচনা কোন কালেই অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারে নি। আগেই বলেছি 'পল্লীসাহিত্য' সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াসপ্রসূত নয়। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতাই এগুলোকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। আর আজকাল মর্যাদা পাচ্ছে সাহিত্য হিসেবে। আমাদের মঙ্গল কাব্যেও বলেছি দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়াসেরই ফল। তবু আনুষঙ্গিক ভাবে তাতে সাহিত্যরস ও সাহিত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। তাই এগুলোও সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর দেবলীলার অনুধ্যান ও সাধন ভজন কীর্তনের বাহনরূপে রচিত হয়েছে গীতিকবিতা।

অতএব, অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারে মাধ্যমরূপে বা গেঁয়ো লোকের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশের বাহনরূপে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, আমাদের বাঙলা বুলির সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরের ইতিহাসও সেরূপ। এর জন্মতারিখ জানা নেই, তবে এর জন্মপদ্ধতি ও জন্মের ইতিকথা আঁচ করা যায় সহজেই।

॥ ২ ॥

এবার যে-বাঙালী এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তাদের মন-মননের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যাক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বুঝবার জন্যে বাঙালীকে তথা বাঙালীর চরিত্র জানা আবশ্যিক। কেননা, জীবের বিশেষত মানুষের কর্ম ও আচরণে তার আন্তর সত্তার (Innerself) নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। মানুষের কর্ম ও আচরণ তার অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ। আর অভিপ্রায় হচ্ছে মন-মনন প্রসূত। এবং ব্যক্তির বা জাতির মন-মনন গড়ে ওঠে তার Heredity (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি) ও environment-কে (পরিবেশ) ভিত্তি করে। যেহেতু মানুষের কর্ম ও আচরণ তার ভাবচিন্তা ও অনুভূতি উপলব্ধিরই প্রতিমূর্তি, এবং যেহেতু ভাষাসাহিত্যও জাতির কর্ম ও আচরণের অন্তর্গত, সেহেতু ভাষা ও সাহিত্য ব্যক্তির বা জাতির মানস-সন্তান মানস-ফসল। আবার আমরা এ-ও জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ারই কারণ রয়েছে, তেমনি সব কারণেরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। কাজেই ঘটনা বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তার ফলে ব্যক্তির কর্ম ও আচরণের গুরুত্ব-লঘুত্ব ও যাথার্থ্য বিচারেও ভুল হয়। কাজেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি তথা স্বরূপ জানতে হলে বাঙালীর চরিত্রও জানা দরকার। আর চরিত্র জানতে হলে অতীতে ঘটা পৌনঃপুনিক ক্রিয়া ও আচরণের সাধারণ লক্ষণ বিচারেই তা সম্ভব।

আগেই বলেছি, বাঙালী সঙ্কর জাতি। নানা গোত্রের রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয়ে ঘটেছে তাদের জীবন।

এর ফলে বাঙালী চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালী যখন কাঁদে, তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে, তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি—ফলে অভিভূতি-গভীর।

কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়–যেহেতু উচ্ছ্বাস উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালীর গীতি-প্রবণতার উৎস এখানেই।

দুই হাজার বছর ধরে নির্জিত শোষিত বাঙালী কালো পিঁপড়ের মতো অতি চালাক ও নিঃসঙ্গ স্বনির্ভর। তাই সে ধূর্ততা যত জানে বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না, ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। তাই তার সঙ্ঘশক্তি নেই, অভাব পীড়িত বাঙালী ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের অবদান গ্রহণে অক্ষম।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী', গণভাষায় 'জীবনবাদী' এবং নীতিবিদের ভাষায় 'ভোগবাদী'। এ-জন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার ওপর বারবার জয়ী হয়েছে। নৈরাত্ম্য ও নিরীশ্বরবাদী এবং নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালী মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র, সেজন্যেই তার অন্তরের জীবনসাধনা ধর্মের ওপর জয়ী হল, তাই বৌদ্ধচৈত্য হল দেবদেবীর আখড়া। নির্বাণের নয়–জীবনের ও জীবিকার আরাম ও বিলাসের দেবতা রূপে পূজিত হলেন তাঁরা। পারত্রিক নির্বাণ নয়, ঐহিক ভোগই হল কাম্য। যেহেতু বাঙালী কর্মকুণ্ঠ, তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জীবনোপভোগের প্রয়াস তাদের ছিল না। মহাজ্ঞান, তুক্-তাক, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা 'সিস্টম ফাঁক' আয়ত্ত করে খিড়কীদ্বার দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হল। পালদের আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য-উপশিষ্যেরা সেন রাজশক্তির সহায়তায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন, তখন বাঙালী বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করে নিল, কিন্তু হৃদয়ে জিইয়ে রাখল তার জীবন-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা। তাই 'মায়াবাদ', পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্মা-পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। শুধু তা-ই নয়, এতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তার ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে চণ্ডী (অন্নদা, দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এ সব দেবতা তার পারলৌকিক মুক্তি কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না। একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে, বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলা দেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতাকে ও ইসলামের নির্দেশকে ছাড়িয়ে ওঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড়খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি জীবন ও জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতা। অতএব কোনো বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙালীর কোন কালেই ছিল না। সে একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। বঞ্চিত দরিদ্র বাঙালী যেখানেই ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানে তার লুব্ধচিত্ত কাঙাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। দুহাজার বছরের বঞ্চনার ফলে ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা তার মজ্জাগত। তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেবনির্ভর হওয়া তথা অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় খোঁজাই ছিল তার আদর্শ। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরিয়া হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈব ধর্ম বিরোধী নির্জলা অধ্যাত্মচিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করে নি। সে আদর্শবাদের বন্ধনভীরু এবং জীবনসাধনায় ও ভোগে অদম্য।

বাঙলার ও বাঙালীর যা গৌরব-গর্বের অবদান, তা সব সময়েই ছিল ব্যক্তিক অবদান, সামগ্রিক জীবনে তা ক্বচিৎ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই বাঙালীর মহৎ পুরুষদের মহা অবদানের ফলভোগে ধন্য হতে পারে নি তারা। এই বাঙলাদেশেই চিরকাল নতুন চিন্তা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু লালন পেয়েছে সামান্য। তবু যখন আমরা স্মরণ করি এই মাটির বুকেই–এই মানুষের মনোভূমেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নবন্যায়, রবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ কিংবা ব্রাহ্মদর্শন, তখন গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। আবার যখন স্মরণ করি, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, রামনাথ, রঘুনাথ, চৈতন্যদেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, তীতুমীর, শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদেশেরই সন্তান, তখন নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালী সাহিত্যে বাঙালীর এই চারিত্র—এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্ট দেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণপ্রাচুর্যে লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্বধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন ধর্মই সে মনেপ্রাণে বরণ করে নেয় নি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা এ কালে ক্ষেত্রবিশেষে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

৪

বাঙলায় ইসলামের প্রসার

॥১॥

মদিনা থেকে মুলতান অবধি ইসলামের প্রসার বলতে গেলে প্রায় অবাধেই ঘটেছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের সঙ্গে পরিচয়মুহূর্তে স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে ও ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজে নবপরিচয়জাত যে বিচলন দেখা দিল, তাতে স্বশাস্ত্রে বিরাগ ও স্বসমাজে দ্রোহ জাগল বটে, এবং একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটল বটে, যার ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহুলাংশে ভাঙল এবং বৌদ্ধ সমাজ লোপ পেল, কিন্তু ইসলামী মতের অভিঘাতে ভাঙা সমাজ মুসলিম সমাজ গঠনের সহায়ক হল না। দক্ষিণাপথে ও উত্তরাপথে সন্ত-সন্ন্যাসী নামের সনাতন শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহীরা দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী হল বটে এবং চৈত্য ও মন্দির ছাড়ল বটে, কিন্তু মসজিদের আহ্বানে সাড়া দিল না। পথ চলে পথের দিশা খোঁজার নেশায় তারা পথে নামল, দিগন্তহীন উদার আকাশের বিস্তারে মঠে-আখড়ায় আশ্রিত হল এবং চিত্তলোকে সন্ধান করল সৃষ্টির রহস্য, হৃদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করল লীলাময় স্রষ্টাকে, আর স্বেচ্ছায় স্বীকার করল প্রীতি ও ভক্তির বন্ধন। বৈরাগ্য ও ভজন হল সম্বল, ভক্তি হল পাথেয়। এই সন্ত-সন্ন্যাসীর আহ্বানে সাড়া দিল আর আকর্ষণে ঘর ছাড়ল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ। গড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল গুরুবাদী বহু সন্ত বা ভক্ত সম্প্রদায়। ফলে ইসলামের প্রসার উত্তর ভারতে হল মন্থর আর দক্ষিণ ভারতে হল রুদ্ধ।

লক্ষণীয় যে, সিন্ধু-মুলতান-গান্ধারে ইসলামের প্রসার ছিল অবাধ, এসব অঞ্চল এক সময় পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, পরে আলেকজান্দার বৈনাশিক জিঘাংসা নিয়ে যখন পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসাভিয়ানে অগ্রসর হন, তখন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা পাঞ্জাব অবধি তিনি অধিকার করেন। ফলে ইরানী ও গ্রীক অধিকারে তথাকার বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সমাজে হয়তো আচার শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের অন্যান্য এলাকায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ ছিল নৃপতি, শাস্ত্রপতি ও সমাজ-সর্দারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। তাই বোধ হয় এ পার্থক্য। তারপর ছয়-সাতশ বছর ধরে তুর্কী-আফগান-মুঘলরা এদেশ শাসন করেছে। কিন্তু রাজধানীতেও মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। কাজেই রাজ-শক্তি ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয় নি। ইসলাম প্রচার করেছেন সুফী দরবেশরা, খ্রীস্টান মিশনারীদের মতো তাঁদেরও ছিল সেবব্রত ও অধ্যবসায় এবং প্রীতি; করুণা আর কেরামতি। তাঁরা খানকা, সরাই, চিকিৎসালয়, লঙ্গরখানা, প্রভৃতির মাধ্যমে দুস্থ মানবতার সেবা যেমন করতেন, তেমনি ঝাড়-ফুঁক তাবিজ-কবজ দিয়ে তাদের আপদ-বিপদ দূর করতেন। এভাবেই তাঁরা আকৃষ্ট করেছেন গাঁয়ের গঞ্জের দরিদ্র মানুষকে। দরিদ্র-অসহায় মানুষ তাঁদের আশ্রিত হত।

Robert Orme তাঁর Historical Fragments of the Mogul Empire গ্রন্থে বলেছেন : The moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect.....under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of moors comprehends all the descendants of converted Gentoos—a miserable race, as none but the most miserable of the Gentoos. Castes are capable of changing their religion. P.271. edited by J.P.Guha, New 1978.

লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল তাঁদের ইসলাম প্রচারের পুঁজি। যদিও বিদ্যা, বিত্ত ও বর্ণাভিমানী শহুরে মানুষ তাঁদের প্রভাব ক্বচিৎ স্বীকার করেছেন। শহুরে মানুষ সংখ্যায় কম এবং গাঁয়ে বিত্তশালী মানুষের সংখ্যা চিরকালই নগণ্য। কাজেই গাঁয়েই প্রচারকদের সাফল্য ছিল বেশী। খ্রীস্টান প্রচারকরাও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষকেই সহজে দীক্ষিত করেছে। বাঙলাদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে যে-সব দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের কারো কারো নাম, দরগাহ ও কিছু পরিচিতি আজো টিকে আছে এবং তাঁদের পরিচিতিই এখানে দেয়া হল। এতে বাঙলাদেশে ইসলাম প্রসারের কাল ও কারণ সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করা সম্ভব হবে। তুর্কী বিজয়ের আগেই এখানে আরব-ইরানী বেনেদের সঙ্গে দরবেশ-প্রচারকদের আগমন শুরু। তাঁরা গাঁয়ে-গঞ্জে সপার্ষদ ছড়িয়ে পড়েন।

দু'হাজার বছর ধরে বিদেশী বিভাষী শাসিত এদেশের সাধারণ মানুষের উচ্চপদে, স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার ছিল না। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অধিকাংশ বৃত্তিও ছিল কোন রকমে অন্ন সংস্থানেই সীমিত। অবাধে ধনসম্পদ অর্জনের উপায় ছিল না কামার- কুমার - তাঁতী - নাপিত - ধোপা - হাড়ি - ডোম - বাগদী - কৈবর্ত - মুচি-মেথর প্রভৃতি কারো। কাজেই ইসলামী সাম্যের সমাজে-জন্মসূত্রে নয়,-কর্ম ও যোগ্যতা সূত্রে জীবন রচনায় ও ব্যক্তির মানবিক মর্যাদায় প্রলুব্ধ হওয়া এ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। তাই চৈতন্যদেবের ইসলাম-প্রভাবিত নব বৈষ্ণবমত প্রচারিত হওয়ার (১৫০৯ খ্রীঃ) পূর্বাবধি বাঙলায় ইসলামের প্রসার প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রতিরোধ্য ছিল। যেহেতু চৈতন্যদেব তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেই ভিন্নরাজ্যে উড়িষ্যার নীলাচলে চলে যান, সেজন্যে বাঙলায় বৈষ্ণবমত আশানুরূপ বিস্তার পায় নি। তবু ইসলামের প্রসার এই অভিঘাতে মন্থর হয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে কালে মুসলিম সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে।

॥২॥

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে সুফী-দরবেশ এসেছিলেন কি না, ইতিহাস তা বলতে পারে না।[১] তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি[২] ও সোলেমান খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদুদুল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে[৩] স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য ঃ "Periplus in the Erythrean Sea' -এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রীস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে পরবর্তীকালের পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবনযাপন রীতির কথা স্মরণে রাখলে এ সম্পর্কিত অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালী মুসলমানেরা বর্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে ময়নামতীতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কি না, বলা যাবে না। কেননা, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ কেউ ইসলাম প্রচারে আগ্রহী হবেন-এ-ই স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সূফী মতবাদ প্রসার লাভ করে নি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যাঁরা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্য সূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। দরবেশ না হলে, তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতিরক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর মতো সূফীরা এসেও থাকেন, তা হলেও মুসলিম বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না। সূফীমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাহকেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।

কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীর সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাঙলাদেশে তাঁর আগেই বহু সূফীর আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর

---

১. সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০। বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের যুগ : ডক্টর আবদুল করিম, পৃঃ ৯২-১০২।

২. ক. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ৯২।
খ. *Memoirs of the Archaeological Survey of India; K.N. Diksit. P. 87.*
গ. F.A.. Khan : Pakistan Quarterly (মাহেনও, মার্চ ১৯৬৪ সন)।

৩. *History of India etc : Elliot & Dawson, Vol. I, p. 2*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাগরেদ' সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকীর নিকট লিখিত পত্রে আছে :

> God be praised ! What a good land is that Bengal where numerous saints and asceties came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suharwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrawardi order are lying buried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharifuddin Maneri, is lying buried at Sonargoan. And then there were Hazrat Bad Alam and Badr Alam Zabidi. In short, in the country of Bengal, what to speak of the cities, there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrawardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number.[2]

এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে সূফীপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহ্‌র খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদমশহীদ।[৩] বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহীদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবন চরিত[৪] –লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৫] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[৬] বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং 'বদর মোকাম' খ্যাত বদর শাহ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতি কাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে।[৭]

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'সেক শুভোদয়া'-র সঙ্গে জড়িত। 'সেক শুভোদয়া' সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনৌতিতে বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্যমুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁর কীর্তিকথা বর্ণনা করেছেন 'সেক শুভোদয়া'য় (শেখের শুভ উদয়)।

---

১. Akbar-al-Akhyar : p 166
২. Bengal : Past & Present :Vol. LZVII St. No. 180; 1948 p. 35-36.
৩. JASB : 1889, Vol. LVII. P.12ff.
৪. JASB : 1896, (N .N. Basu) pp. 36-37.
৫. Social History of the Muslims in Bengal down to 1528 A.D.:Dr. A. Karim, P. 87.
৬. JASB : 1896, pp. 36-37.
৭. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ১৩২-১৩৩।
খ. Dist. Gazetteers : Chittagong 1908, p. 56, Dinajpur, 1912, p. 20.
গ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ২২-২৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সূফীর দরগাহ্ আছে। ইনি ৪৪৫ হিঃ বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিল সূত্রে দাবি করা হয়।[১]এক কোচরাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহ্জাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহীদের দরগাহ।[৪] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[৫] অতএব, ইনি বারো-তোরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহ রাহী পীরের দরগাহ আছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে।

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হিঃ ১৬৮৫-৮৬) মেলে।[৬] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিম বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[৭] ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় 'মাহি আসোয়ার' (মৎস্যাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা, পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোল শতকে পর্তুগীজরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৮] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মূলক শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে[৯] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[১০] ইনিই সম্ভবত শূন্যপুরাণোক্ত নিরঞ্জনের

---

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব : (১৯৩৫) পৃঃ ১৩৮।
২. District Gazetteer. Mymensingh 1917: p. 152
৩. History of Assam, 1926; E. Gait : p.46ff.
৪. District Gazetteer, Pabna 1923; p. 121-26.
৫. Sufiism and Saints etc. : J.A. Sobhan, p. 236.
৬. ক. District Gazetteer, : Bogra : 1910, pp. 154-5.
   খ. JASB. 1878, pp. 92-93.
৭. বঙ্গে সূফী প্রভাব। পৃ ১৪০-৪১
৮. Ibn Battuta :Gibb.
৯. ক. Hadith literature in India : Dr. M. Ishaq, pp. 53-54
   খ. Islamic Culture : Vol. XXVII. No. January 1953, p. 10. note 9.
   গ. Social History of Muslims in Bengal: Dr. A. Karim, pp. 67-72
১০. ক. Mirat I-Madar by Abdur Rahman Chisti : A. H. 1964. Ms. D U., No. 217. (ডক্টর আবদুল করিমের Social History : পৃঃ ১১৩-এ উদ্ধৃত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুম্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ এবং দরগাহসংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশেতোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সূফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।[১]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দিন সুরকপুশ (Surkpush) নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিলেন। জাহানগস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উছ-এ (Uchh) তাঁর সমাধি আছে।[২]

শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা আলাই। তাঁর পুত্র নুর কুতুব-ই আলমের সাগরেদরা নুরী[৩] এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সূফীরা হোসেনী নামে পরিচিত ছিল।[৪] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। সে জন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর-কুতুব-ই আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ওরফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৫]

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকীর সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানী ইব্রাহিম শরকীকে লিখিত এক পত্রে বদ্ আলম ও বদর আলম যাহিদ নামে দু'জন সূফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukarposh)-এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া ও রুহানিয়া সূফীকে হত্যা করেন।

Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suharwardia and Ruhania saints of the past that in near future that kingdom of Islam will be freed from the hands of the luckless non-believers.[6]

---

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃঃ ১১২-১৩।
২. ক. Memoirs of Gaud and Pandau : p. 92.
   খ. Sufiism and its Saints etc.., J.A.Sobhan (1933)pp. 236-37.
৩. Bengal : Past &Present : Prof. S. Hasan Askari : 1948, p. 36. note 13.
৪. Social History of Bengal : Dr. A. Rahim, p. 77.
৫. Riyad-as-Salatin, p. 115-16.
৬. Bengal Past & Present 1948, pp. 36-37

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ বদরুল ইসলাম নূর-কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস সালাতিন-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ : রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।[১]

এঁরা ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী[২], খান জালাল আলী, শাহ আনোয়ার কলি হালবী[৩], ইসমাইল গাজী[৪], মোল্লা আতা[৫] শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রীঃ)[৬] মোয়াজ্জেম দানিশমন্দ ওরফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)[৭], শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি[৮] প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রীঃ)[৯] মখু জাহানিয়া (১৩৭০-৮৩) ও শাহ জালাল কুনিয়াঈ (মৃঃ ১৩১৬), সোহরাওয়ার্দিয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজদ্দিন (মৃঃ ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃঃ ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নুর কুতুব-ই-আলম (মৃঃ ১৪২৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।[১০]

শাহ্ সফীউদ্দীন (মৃঃ ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন। শাহ্ আল্লাহ মাদারিয়া এবং সেখ হামিদ দানিশমন্দ্ নকশ্‌বন্দিয়া সূফী ছিলেন।[১১] ষোল শতক অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলম, কাতালপীর, শাহ্ মসন্দর বা মোহ্‌সেন আউলিয়া, শাহ্‌পীর, শাহ্ চাঁন প্রমুখ এবং পূর্ব মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহাঁ আবদুল ওহাব ওরফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পীরের নাম মেলে।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ, সিকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্, জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্, হোসেন শাহ্ প্রমুখের দরবেশভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্ জালালুদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নূর কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান জাহান খান প্রমুখ সূফী রাজনীতিক ও সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।

---

১. Riyad-as-Salatin : P. 110-11

২-৩ District Gazetteer: Hooghly, p. 297ff, pp. 302--03

৪. (ক) JASB, 1874, p. 215 ff. (খ) Risalatial-shuhda; (গ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা ১৩৭৬ সন, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার।

৫. JASB : 1872, pp. 106-07, 1783 p. 290

৬. (ক) Akhbar-al-Akhyar : p. 173. (খ) Khazinat-al-Asfiya, Vol.I,p 399

৭. JASB, 1904, No. 2, p. 108ff.

৮. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃঃ ১৪৩-৪৪।

৯. Akhbar-al-Akhyar; pp44-45.

১০. Riyad-al-Salatin : pp. 115-16.

১১. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃঃ ৯৩-১১৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

সাহিত্যের রূপে ও রসে বিবর্তনের ধারা

বর্বরতম যুগে মানুষ আর পশুতে কোন ভেদ ছিল না। পশুর মতো তারও সেদিন কাম্য ছিল ক্ষুণ্নিবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। সেটাও ভোগেচ্ছা। সেদিন সে শুধু ক্ষুণ্নিবৃত্তির প্রয়াসী ছিল, বাস্তব-ব্যবহারিক জীবনে আর কোন ভোগ্যবস্তুর প্রত্যাশী ছিল না সে। সে-বোধই জাগে নি তখনো; কাজেই বঞ্চিত জীবনের হতবাঞ্ছার কোন বিক্ষোভ ছিল না তার মনে। সেজন্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কোন চিন্তাই তাকে বিচলিত করতে পারে নি। তাই বাস্তব জীবনোপলব্ধির কোন গরজ, জীবনকে যাচাই করবার কোন প্রেরণাই সে বোধ করে নি সেদিন। তবু তার 'মন' বলে পশুর থেকে উন্নততর একটি বৃত্তি ছিল; ফলে, তার শুধু পেটে ক্ষুধা নয়, মনেও ছিল পিপাসা। সে তাকিয়েছিল তার চারদিককার অজানা ও রহস্যাবৃত চিরবিস্ময়কর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে। তা-ই তাকে করেছিল চকিত, বিস্মিত, ভীত, ত্রস্ত ও উল্লসিত। সেজন্যেই সে-চাটাইয়ে নয়, ঘাস বা পাতায় শুয়ে স্বপ্ন দেখত পাখির মতো দূর-দূরান্তরে উড়ে যেতে; খুঁজত আকাশের কিনারা— দুনিয়ার শেষ। সে কল্পনা করত মানুষের অগম্য হিমালয়-সাহারা-অলিম্পাসে না জানি কি আছে, কারা আছে! নিশ্চয়ই সেখানে এমন কিছু আছে, এমন কেউ থাকে, যা কাম্য, যা শ্রেয়, যা সুন্দরতর ও মহত্তর এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে, রূপে-গুণে, বলে-ছলে যে বা যারা বিচিত্রতর।

মানুষ যা জানে না, যা বোঝে না, যা রহস্যাবৃত, যা অচেনা, তাকে জানবার, বুঝবার ও আয়ত্ত করবার এক উদ্দাম বাসনা, এক অসহ্য ব্যাকুলতা বোধ করে। মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বুদ্ধির সাহায্যে, বোধির প্রয়োগে, চিন্তার মাধ্যমে তার একটা যুক্তিসহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্বস্তি পায় না। এভাবে সে বাহ্যজগতের সবকিছুর একটি সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবোধ পেয়েছিল, লাভ করেছিল আত্মপ্রসাদ।

এমনি করে মানুষ সেদিন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছিল। তাতে ছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, বিচিত্র হাত-পা-মাথা-মুখ-চোখ-কানওয়ালা দেব-দৈত্য-পরী-জ্বীন-রাক্ষস-ড্রাগন। কল্পলোকের এসব জীবের কল্পিত রোমাঞ্চকর জীবনোপাখ্যানই ছিল সেদিন মানুষের মনের রস-পিপাসা-মনের ক্ষুধা মিটাবার অবলম্বন। এ মনের প্রতিফলন দেখি রূপকথায়। রূপকথা সে যুগের জীবন্তিকা। রূপকথার জন্ম হল এ ভাবেই। কথায় বলে—'অদারু দারু হয় শিলে পিষিলে। অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' ফলে রূপকথাই যুগান্তরে হয়ে দাঁড়াল মানুষের অতিশোনা প্রতিবেশী রাজ্যের সত্য কাহিনী। মাটির গড়া রক্তমাংসের মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিবেশীর প্রভাবের মতো সে প্রভাব পড়ল মানুষের মনে-মানসে আর ব্যবহারিক জীবনে। এসব কল্পলোকবাসী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে কল্পিত হয় দুইরূপে–অরি ও মিত্ররূপে। দেবতারা শক্তিমান অতিমানুষ ও মানুষের সহায়করূপে কীর্তিত; আর সব দেব-মানবের শত্রুরূপে কল্পিত। এদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে দেব-মানব পরস্পরের সহায়। বর্বরতম মানুষের শৈশব অতিক্রান্ত হল এভাবে। মানুষের জীবনবোধের কিছুটা প্রসার হল। হতে থাকল জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বোধির উন্মেষ। পূর্বের কল্পনালব্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে চলল।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা হয়েছে পরিমিত, কাঁচা মন হয়েছে পাকা। সে এখন বিশেষ মানুষ। পূর্বপুরুষের চাইতে জীবনে তার চাহিদা বেশি, সে দেহে শক্তিমান, কৌশলে কুলীন আর মনে উচ্চাভিলাষী। শিশুমানবের-পশুমানুষের মন এভাবে একটু একটু করে ক্রমে জেগে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়বিমূঢ় মনে, শঙ্কাকাতর মনে, কল্পনাপ্রবণ মনে, আত্মপ্রত্যয়হীন মনে, ত্রাসদলিত মনে অঙ্কুরিত হল কামনা— সে-কামনা ভোগের, আত্মপ্রসারের— পরাক্রান্ত মনের। উচ্চাভিলাষী শক্তিবিলাসী মনে সাড়া দিয়ে নড়ে উঠল অজ্ঞাতপূর্ব দুটো লোভ— জমির আর জরুর। যেমন-তেমন জমি নয়— রাজ্য, আর যে-সে কন্যা নয় সুন্দরীতম ডানাকাটাপরী। দুটোই দুর্লভ। তাই শুরু হল অভিযান, বেঁধে গেল সংগ্রাম, দেখা দিল পদে পদে সংঘাত। এ অভিযানে দেবতা হল মানুষের সহায়, আর দেও-জ্বীন-রাক্ষস দাঁড়াল পথ রোধ করে। মানুষের মধ্যে এ উচ্চাভিলাষী সংগ্রামী দলে রয়েছে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান। রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্তুর, সদাগর আর কোটাল। এভাবে কল্পলোকের সঙ্গে যুক্ত হল ইহলোক। কল্পরাজ্যে-মনোরাজ্যে ঘটল মিতালি, স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হল জৈব-কামনা। জীবন পরিব্যাপ্ত হল জীবনেতর লোকে। দেব-মানবে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার রূপকথা নয়, কল্পলোক নয়, আবার তাকে বাদ দিয়েও নয়। এবার প্রলুব্ধ জীবনের জয়যাত্রা—আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার স্পৃহার মূর্ত স্বরূপ। এ-যুগ রোমান্সের যুগ। সভ্যতার ইতিহাসে মহাকাব্যের যুগ। —ইলিয়াড-ওডেসী আর রামায়ণ-মহাভারতে বিধৃত রয়েছে তার স্বরূপ। এ থেকে মনুষ্য সমাজেও সৃষ্টি হল শ্রেণী–তুচ্ছ ও উচ্চ মানবশ্রেণী। উচ্চ মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার দেখে সেদিন তুচ্ছ মানুষ ঈর্ষা করে নি, বরং স্বাজাত্যবোধে সে উল্লসিতই হয়েছিল মানুষের জয়যাত্রায়। নির্বোধ তুচ্ছ মানুষ সেদিন আত্মভোলা হয়ে স্বজাতির প্রগতিতে আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিল, উপভোগ করেছিল পরমানন্দ। এভাবে মনুষ্যজীবনে সার্থক হয়ে উঠল স্বপ্ন ও সত্য, কল্পনা ও মনন, মাটি ও আকাশ, আর জীবন ও জিজ্ঞাসা। বাস্তব জীবনই ব্যাপ্ত হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে। এ ত্রয়ীর পটভূমিকায় সংঘাতে-ঈর্ষায়-বিদ্বেষে ও প্রীতি-অনুকম্পায় দেব-দৈত্য-নর হইল পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে।

এ-যুগটি মানুষের জীবনে তথা ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থায়ী স্তর। মনুষ্যজাতির কোন কোন সম্প্রদায়ে আজো এর পূর্ণ ও প্রবল জের চলছে। এক সমাজেও প্রতিবেশ ও শিক্ষাগত কারণে সব মানুষ একই স্তরে উন্নীত হতে পারে না। তাই আলো ও আঁধারি, কায়া ও ছায়া, কল্পনা ও বাস্তব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বোধি ও প্রজ্ঞা, ভাব ও বুদ্ধি, ভয় ও ভাবনা, চেতনা ও অবচেতনা, শঙ্কা ও কৌতুক, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসামিশ্রিত বহু বিচিত্র ও জীবনলীলার মোহ কোন ছলেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না মানুষ। যতই ভাবে, যতই দেখে, ততই রহস্যের মায়াজালে আত্মসমর্পণ করে আত্মসমাহিত হতে চায়, গদ গদ কণ্ঠে বিমুগ্ধ ও অতৃপ্ত চিত্তের বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটি কথায়—'আহা!' কিংবা একটি উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসে। এ-যুগে মানবজাতি হাতিয়ার ও সাংস্কৃতিক মানানুসারে নানা স্তরে বিভক্ত রয়েছে। আমরা এর সবচেয়ে প্রগতিশীল সম্প্রদায়কেই আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব।

মনুষ্যের জাতীয় জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হয়ে গেল। এ-যুগে আর রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্র, সদাগর ও কোটালে জীবনবোধ, উচ্চাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা সীমাবদ্ধ রইল না। রাজ-রাজড়াদের সান্নিধ্যে, দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ, শিক্ষার প্রসারে জনমনেও ফুটে উঠল প্রসারিত জীবনের মোহময় রূপ। জীবনবোধ হয়ে উঠল সূক্ষ্ম। এবার আর স্বর্গ-পাতাল নয়, শুধু-মর্ত্য, ভাবপ্রবণতা নয়, ভাবনা, পক্ষীরাজের পিঠ নয়, — আকাশের কিনারা নয়, জীবনের শারীর চাহিদা মিটাবার আগ্রহই মানুষকে কল্পনার স্বর্গলোক থেকে কঠিন মাটির সংগ্রামে নিয়োজিত করল। এবার আর আকাশবিহারের সাধ নয়, জমিচাষের গরজবোধই কর্মমুখর করে তুলল মানুষকে। এবার গানে-গাথায় দেও-জ্বীন-রাক্ষসের কথা নয়, পরী-বিদ্যাধরী-অপ্সরীর কামনা নয়, বাঞ্ছাহত জীবনের বিক্ষোভ, 'বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার' আক্ষেপ, তৃপ্ত হৃদয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশান্তি, কৃতার্থ মনের উল্লাস, বিজয়ী বীরের আস্ফালন ও দলিতজনের আর্তনাদই হল সাহিত্যের সামগ্রী। 'কাম আর অর্থ'— এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল এ স্তরে।

এবার দেশকালের প্রতিবেশে প্রয়োজনবোধই নিয়ন্ত্রণ করছিল মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা। তাই এবার আর বৃহৎ বা মহৎ কোনো জিজ্ঞাসা নয়, নিতান্ত বাসনা চরিতার্থ করাই জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। জীবন ও জীবিকার তফাৎ আর রইল না, জীবিকাই জীবন অর্থাৎ জীবিকা দ্বারাই জীবনের স্বরূপ অভিব্যক্তি পেতে শুরু করেছে। আগে মানুষ ছিল কম। পৃথ্বী ছিল বিপুলা, তার ওপর নিতান্ত উদরপূর্তির সামগ্রী ছাড়া অন্য সামগ্রীর প্রয়োজনবোধ তখনো জাগে নি বলে হানাহানির কারণ ছিল না আহার্য নিয়ে। কেননা, সঞ্চয় বুদ্ধি জাগে নি, পশুপাখির মতো দিনভর খুঁজেপেতে আহার করাই ছিল কাজ। তখনো মন অবচেতন স্তর পার হয়ে আসে নি, কাজেই কৃত্রিম হয়ে ওঠে নি যৌনবোধ ও যৌন-উত্তেজনা। তবু আহার্য সংগ্রহ-ঘটিত দ্বন্দ্ব আর যৌনসম্ভোগ-সংক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী সংঘাত যে ঘটে এবং যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এও তেমনি আর ততক্ষণও ততটুকু।

তারপর ক্রমে মানুষ জাগল। মানুষের জীবনবিলাস বহু বিচিত্ররূপ ধরে বিকশিত হয়ে চলল। মানুষ বাড়ল। টান পড়ল ভোগ্য সামগ্রীতে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল শুরু। লাগল কাড়াকড়ি, মারামারি আর হানাহানি। পৃথিবী হয়ে উঠল বসবাসের প্রায় অযোগ্য। নিশ্চিত-নির্বিঘ্ন-নিরুদ্বেগ জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। দুর্বলের সহায়, কল্যাণ ও শান্তিকামী, করুণা বিহ্বল মানুষ এমনি সংকটে উচ্চারণ করেন একাধারে সাবধানধ্বনি ও অভয়বাণী; তাঁদের এক চোখের দৃষ্টিতে থাকে ধমক, আর চোখে থাকে আশ্বাসের দীপ্তি। তাঁরা দোহাই কাড়েন। বাহুবল, ধনবল, জনবল নয়, জ্ঞানবল ও বাক্যবলই তাঁদের মূলধন আর দোহাই-ই তাঁদের অস্ত্র। আল্লাহ্‌র দোহাই ও স্বর্গ-নরকের দোহাই, লাভ-ক্ষতির দোহাই, রোগ-শোক-মৃত্যুর ও আপদবিপদের দোহাই কেড়ে তাঁরা লোকমনে এমন এক ভয়ভাবনা ও আশাআশ্বাসের পার্থিব-অপার্থিব পরিবেশ ও সংস্কার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তার সত্যাসত্য নির্ণয় অসম্ভব। ফলে দুর্বল নির্বোধ হল অদৃষ্টবাদী দাস, শ্রমিকও শোষিত! বুদ্ধিমান দুর্জন দুরাত্মা হল শোষক, শাসক ও প্রভু। এ রহস্যঘন, ত্রাসদুষ্ট, সন্দেহ শঙ্কাপুষ্ট সংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বের হওয়া দুঃসাহসী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে রইল। তাতেই দ্বন্দ্বসংঘাত পরিমিত ও লোভলালসা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মনুষ্য সমাজের আবহ স্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এ-স্তরের মনুষ্যমনের প্রতিচ্ছবি পাই এ-যুগে সৃষ্ট সাহিত্যে। সেই-সাহিত্য রোমাঞ্চময় ও রোমান্টিক। তাতে রয়েছে বাস্তব জীবনে পাওয়া-না পাওয়া হৃদয়ের স্বরূপ। জীবনের সাধআহ্লাদ, দুঃখবেদনা, আশাআকাঙ্ক্ষা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ, তৃপ্ত হৃদয়ের মধুর প্রসাদ ও প্রশান্তি অভিব্যক্তি পায় এ-সাহিত্যে। তাতে অলৌকিক অসম্ভবতা আর রইল না, থাকল জীবনে সম্ভব অথচ অসাধারণ-অস্বাভাবিক পরিবেশে ও উপায়ে কামনা পূর্ণ করবার দিশা। এ-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শের স্বরূপ 'এই জীবনে যে সাধ মিটাতে পারি নি, সে সাধ জেগেছে গানে।' অথবা 'জীবন যাহার অতি দুর্বহ— দীন দুর্বল সবি। রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ, সেইজন বটে কবি।' যেমন গত শতকে রচিত রোমান্সগুলো।

শুধু জীবনবোধের প্রসারেই মানুষের জৈব চাহিদা বাড়ে নি, সভ্যতার দান তথা আবিষ্ক্রিয়াও মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়ে দিচ্ছে। যতই রকমারি ভোগ্য সামগ্রী বাড়ছে, ততই অসংযত হয়ে উঠেছে মানুষের বাসনাও। তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি কিছুতেই হচ্ছে না। চাহিদা মিটাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যে জীবিকার ধান্ধাতেই ছুটোছুটি করে জীবন কাটছে, চোখ তুলে চারদিকে দেখবার, ভাববার বা বিস্মিত হবার আগের মতো অবকাশই বা কোথায়! কারো যদি অবকাশ ঘটেও যায়, তবু জ্ঞানে প্রবীণ পৃথিবীর লোক জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও নিসর্গের, আকাশের আর পাতালের সব সহস্য, সব খবর এমন করে বিশ্লেষণ করে নগ্ন করে তুলে ধরেছে জনসমক্ষে যে, জগতে আর জীবনে নতুন কিছুই রইল না যা মানুষের ভয়-বিশ্বাস, ত্রাস-শঙ্কা বা আনন্দ-উল্লাস-ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। ফলে 'খাও, গাও আর নাচ' এ-ই হয়ে উঠেছে জীবনাদর্শ। কেননা, জানা গেছে, আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। সব ফাঁকি, সব ভাঁওতা। যুগ-যুগান্তর লালিত মানুষের পূর্বার্জিত বিশ্বাস-সংস্কারের ভিত উবে যাচ্ছে চোরাবালির মতো। ধসে পড়ছে ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ও নৈতিক মূল্যমানের সৌধ। ভেঙে যাচ্ছে পারলৌকিক অস্তিত্বের স্বপ্নে গড়া আশা-আশঙ্কার মনোময় ইমারত। কিসের ভরসায়, কার ভয়ে কোন্ মহৎ ও বৃহৎ প্রেরণায় মানুষ ভোগে থাকবে বিরত, বঞ্চিত হৃদয়ে প্রবোধের শান্তিবারি ছিটাবে; আর কেমন করে দিনরজনীর অভাবে ধৈর্য ধারণ করবে? ফলে আজ আস্তিক ও আচারনিষ্ঠ মানুষও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্বীকার ও বিকৃত সত্তায় দুষ্ট।

মহৎ ও বৃহৎ আদর্শবিহীন, জীবাত্মা-পরমাত্মারহস্য পরাঙ্মুখ, পরলোক-বিভ্রান্তিবিমুক্ত জৈন-জীবনসর্বস্ব বস্তুনির্ভর প্রত্যক্ষবাদীরা তাই একান্তভাবে ভোগ্যবস্তুলোলুপ। তাদের ধ্যান জ্ঞান আর কর্ম ভোগেচ্ছা পূরণেই নিয়োজিত। তাদের বুকে বিক্ষোভ, মুখে অভিযোগ, চোখে লোভ।

আজকাল মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত– ভোগী ও ভোগেচ্ছু, ধনী ও গরীব, ভোগী ধনীরা সংখ্যায় কম, কিন্তু বিত্তে বড়। ভোগেচ্ছুরা সংখ্যায় অগুনতি। তারা সব এক জোট হয়েছে। তাদের বক্তব্য এই— পৃথিবী ও পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী প্রকৃতির দান, আমরাও প্রকৃতিসৃষ্ট। কাজেই এতে সবার সমান অধিকার রয়েছে, এ কারো বা কোনো দল বিশেষের একচেটিয়া ভোগ্য হতে পারে না। ধনী, তুমি অট্টালিকায় আছ, রাজা তুমি প্রাসাদে রয়েছ, মধ্যবিত্ত, তুমি ভবনবাসী—আমরা এত গরীব-কাঙাল যখন কুটির আর গাছতলা সার করেছি, আর সবার জন্যে যখন অট্টলিকা ও প্রাসাদের ব্যবস্থা করা যাবে না, তখন তোমরাও প্রাসাদ-অট্টালিকা ভবন থেকে নেমে এস, আমরাও গাছতলা থেকে উঠে যাই। সবার জন্যে বিত্ত ও ভোগের ব্যবস্থা হয়ে যাক। সুখে থাকি আর দুঃখে পড়ি তাতে আর ক্ষোভ বা ঈর্ষা থাকবে না। এ-মনের অভিব্যক্তি যে-সাহিত্যে লাভ করেছে, তার নাম গণসাহিত্য। মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণজীবনে শ্রদ্ধা ও দরদ, প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবজ্ঞা, বিত্তশালী শোষকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এ সব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাস্তব জীবনায়নের গৌরবে, মানবতার বাণী প্রচারের দম্ভে, জীবন ও জীবিকার অভিন্ন স্বরূপ উদঘাটনগর্বে, জগৎ ও জীবনের যথার্থ সূত্র আবিষ্কার ও অকৃত্রিম সংজ্ঞা প্রয়োগ-গৌরবে এ-সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত। এ-সাহিত্যের মহান আদর্শ হচ্ছে—মানুষের জন্যে, জীবন-জীবিকার জন্যে, মানবতাবোধ প্রসারের জন্যে, মানবকল্যাণের জন্যে, সমাজ-উন্নয়নের জন্যেই সাহিত্য। এ সাহিত্য ভূমিনির্ভর, কল্পনাসর্বস্ব নয়— এ-সাহিত্য পীড়ন শোষণ সমস্যাসঙ্কুল বস্তুর জীবনভিত্তিক।

একদিন যখন অভাবমুক্ত সভ্য মানুষের জীবন ছিল সুখের, তখন তারা কামনা করেছে অমৃত। ক্রমে জীবন যখন হল দুঃখাকীর্ণ ও বন্ধন-জটিল, তখন কাম্য হয়েছে মোক্ষ। তারও পরে যখন জীবনে অভাব ও অপ্রাপ্তি বেড়েছে, তখন মর্ত্য জীবনে হতাশ অদৃষ্টবাদী মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঞ্ছিত হয়েছে অভাবমুক্ত স্বর্গসুখ। শোষণ-পীড়নক্লিষ্ট মোহমুক্ত আজকের মানুষের চাহিদা হল প্রাণে বাঁচার জন্যে কেবল অন্ন আর মনে বাঁচার জন্যে নিরাপত্তার স্বস্তি।

মানুষের সাহিত্য দেশকালের পরিবেশে মানুষের প্রয়োজন সঞ্জাত মন-মননেরই প্রতিচ্ছবি– মানুষের আন্তর্জীবনেরই বাকবদ্ধ রূপ। এ-অর্থে সাহিত্য চিরদিনই বাস্তব-জীবন ও বাস্তববোধ-ভিত্তিক। কাজেই কোনকালের সাহিত্যই সমকালে কৃত্রিম অবাস্তব অলৌকিক ছিল না। মানুষের জীবনবোধ যে-যুগে যেমনটি ছিল, সাহিত্যে তেমনটিই বিবৃত হয়েছে। এক কথায় সেকালের সাহিত্য ছিল ভয়, বিস্ময়, কল্পনা, আবেগ ও বিশ্বাসভিত্তিক এবং ব্যক্তির বাস্তব জীবন-জীবিকার সমস্যা সম্পর্কবিহীন, আর আজকের সাহিত্য হচ্ছে রূঢ় বাস্তব জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত চিন্তা-চেতনা ও সম্পদ-সমস্যা সংক্রান্ত যুক্তি, বুদ্ধি, প্রত্যয় ও মননভিত্তিক জীবনায়ন।

৬

বাঙলা সাহিত্যের তথাকথিত আঁধার যুগ

চর্যাগীতিকে সাত বা দশ থেকে বারো শতকের বাঙলা রচনা বলে ধরা হয়। এর পরে তেরো শতক থেকে চৌদ্দশ পঞ্চাশের মধ্যেকার কোন বাঙলা রচনার নিশ্চিত নিদর্শন মেলে না। তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময় বাঙলায় কিছুই রচিত হয় নি এবং তাঁরা তুর্কী বিজয়কেই এজন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, তুর্কী বিজয়ের ফলে বাঙলাদেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলে। দেড়'শ দু'শ কিংবা আড়াইশ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো হয় কাফেরদের ওপর। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর চলে বেপরোয়া ও নির্মম হামলা। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর পরেও মাটি কামড়ে টিকে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন-রজনী গুনে গুনে রইল। কাজেই, ধন, জন ও প্রাণের নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিলাস অসম্ভব। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশের কথাই ওঠে না। এ-ই হল তাঁদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত।

প্রায় সব ইতিহাসকারেরই একই সিদ্ধান্ত। বাঙলাদেশে তুর্কী বিজয় সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মনে একটা বিজাতীয় বিরূপতা সব সময় সক্রিয় থাকে, ফলে তাঁদের সহজ বিচারবুদ্ধি এখানটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নইলে এমন সিদ্ধান্তের অসারতা সহজেই বোধগত হত।

যে তুর্কী বর্বরতার বরাত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগের ইতিকথা তৈরি হয়েছে, সে তুর্কী শাসনের খসড়াচিত্র আগে (পৃঃ ৩৮-৪৭) তুলে ধরেছি।

মধ্যযুগের ইতিহাস সে-যুগের আবহেই যাচাই করতে হবে। সে-যুগে পরমতসহিষ্ণুতার কিংবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্যমূলক শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ছিল। পরাক্রান্ত শক্তি মাত্রেই পরপীড়ক ছিল। তার ওপর ছিল ফৌজী বর্বরতা যা এ-যুগেও বিরল নয়। অশোক, এটিলা, চেঙ্গিজ, হালাকু থেকে তৈমুর-নাদির অবধি এশিয়ার যে-কোনো দিগ্বিজয়ীয় কথা স্মরণ করলেই এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শাসক কিংবা বিজেতার কোনো জাতধর্ম নেই। তাঁদের লোভের কিংবা ক্ষোভের কবলে যে পড়ে, সে-ই উৎপীড়িত হয়। তাই দুনিয়ার রাজবংশাবলীর ইতিহাসে আত্মীয় হত্যার নজিরই বেশি। দুনিয়াতে চিরকাল রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিত– এ দুই শ্রেণীই আছে। সেই রাজা, শাসক বা শোষক স্বদেশী-স্বজাতি হোক কিংবা বিদেশী-বিজাতি হোক তাতে কোনো ইতর-বিশেষ হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসঘাতকতার এবং আত্মীয় ও জ্ঞাতিহত্যার নজির হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান নির্বিশেষে পৃথিবীর রাজবংশের ইতিহাস মাত্রেই বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে মুসলমানরাই প্রধানত পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী। কাজেই তাদের অন্যায়, উৎপীড়ন ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। আসলে সে-যুগের সভ্যজগতের ইতিহাস সর্বত্রই একরূপ। পনেরো শতকের ইটালিতে পোপ পঞ্চম নিকোলা (১৪৪৭-৫৫) পেগান মন্দির, মূর্তি, ইমারত ও শিল্পকৃতি ভেঙে প্রাসাদ ও গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন।[১] ফরাসী বিপ্লবকালে লুই ও রাজবংশীয়দের হত্যা, গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে গ্রীকদের আনাতোলীয়া অঞ্চলে তুর্কী নিধন, হিরোসীমা-নাগাসাকীর হত্যাকাণ্ড, ইন্দোনেশিয়ায় বা চিলিতে স্বদেশী-স্বভাষী হত্যা প্রভৃতি পুরোনো প্রবৃত্তিরই নতুন প্রকাশ। উত্তেজনাবশে ভাল মানুষও যে হিংস্র শ্বাপদ হয়ে উঠতে পারে, তার চাক্ষুস দৃষ্টান্ত রয়েছে পাক-ভারতে সংঘটিত ১৯৪৬-৫০-এর বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজে। সেকালের যুদ্ধনীতি ও শাসনরীতি ছিল ভিন্ন। রাজা-প্রজা তথা শাসক-শাসিতের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং অধিকারবুদ্ধিও ছিল অন্য রকম। জাতি ও বর্ণ-দ্বেষণা আজো সুসভ্য আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে তীব্র সমস্যা হয়েই রয়েছে। সে যুগে যে ছিল— তা এমন আর ক্ষোভের কি! তবু যারা ক্রীতদাসকেও নিজের সমান মর্যাদা দিয়েছে, উচ্চপদে বসিয়েছে, জামাতা করেছে, সিংহাসন দিয়েছে, তাঁরা কি একেবারে অমানুষ হতে পারে? উদারতার ও মানুষের প্রতি নিঃসঙ্কোচ শ্রদ্ধার এমনি দৃষ্টান্ত আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, মুসলমানেরা সব বিজেতাদেরই মতো অমুসলিম দেশ জয় করতে গিয়ে ধনের লোভে ও ফেরারী শত্রুর খোঁজে গির্জা-মন্দির-বিহার আক্রমণ করেছে, মন্দির ও মূর্তি ভেঙেছে, ধন-রত্ন লুট করেছে। আত্যন্তিক স্বধর্মপ্রীতি ও বিধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এমনি অপকর্মে সেনাদলকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করেছে। পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞাটাও ছিল তীব্রতর। কাজেই যুদ্ধকালে বর্বর ফৌজী উত্তেজনার সময় মন্দির মূর্তি ভাঙা ও ধনরত্ন লুট করা সে-যুগের কোন বিজেতা-বাহিনীর পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। বিজাতি বিধর্মী বিজেতারা চিরকালই তা করেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বত্র এর নজির রয়েছে। মুসলমানেরা এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ে খেয়ালের বশে কিংবা বিজাতি-বিদ্বেষের প্রাবল্যে কোন মুসলমান শাসক মন্দির-মূর্তি ভাঙেন নি। বরং কেউ কেউ পাপের ভয় উপেক্ষা করেও মন্দির তৈরিতে অর্থ সাহায্য করেছেন, দেবোত্তর জমি দিয়েছেন। "এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপিয়েছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে সব ঐতিহাসিক নজির দিন দিন নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতিমোহন সেন)। তারপর যখন হিন্দুমুসলমান অধ্যুষিত দেশে রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ হয়েছে, তখন ধর্মস্থানের ওপর হামলা (বিশেষ কারণ না ঘটলে— যেমন মন্দিরে শত্রুর আশ্রয় নেয়া, আত্মগোপন করা ইত্যাদি) হয় নি। তাছাড়া সব সুলতান অবিবেচক অমানুষ ছিলেন না, এবং দেশের সর্বত্র সংঘর্ষ হয় নি। দেশ জয়ের পরে দেশদ্রোহীর খবরও মেলে না। ভারতের কোন মুসলমান বিজেতাই স্বধর্ম-প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে দেশ জয় করেন নি—রাজত্বলোভেই অস্ত্র ধারণ ও প্রয়োগ করেছেন। মুসলমান বিজেতারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেই হিন্দু পাইক (পদাতিক সৈন্য) ও কর্মচারী নিয়োগ করতে থাকেন। "রাজ্য শাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈন্যপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" এবং "গৌড়ের সুলতানেরা মুসলমান হইলেও

১. The Story of Civilization : Will Durant. Vol. V, p. 376.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকার্য প্রধানত হিন্দুর হাতেই ছিল।"(সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।—এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্ত ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস) "পাঠান রাজত্বকালে জায়গীরদারেরা দেশের ভিতরে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। দেশে শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হত। সেই জন্য পাঠান আমলে হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।" (বাঙলার নবজাগৃতি : বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৮। এবং জাতিবৈর পরিচ্ছেদ, পৃ ৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)

কাজেই তখনকার নতুন অভিযানে মন্দির ভাঙার বাস্তব বাধা ছিল। আর ফৌজী বর্বরতার কথা বাদ দিলেও শাসকদের কেউ হয় নরদেবতা আবার কেউ বা নরদানব– এ একান্তভাবে ব্যক্তিক-চরিত্রের কথা। সুশাসন কুশাসন ব্যক্তিক যোগ্যতা ও স্বভাবের ওপরই নির্ভরশীল। এ জন্যে জাত তুলে খোঁটা দিলে বুদ্ধির তারল্যই প্রকাশ পায়।

আমরা জানি, তুর্কী শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেন নি, রাজ্যবিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান, ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না।[১] আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। তখন গ্রামীণ জীবন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নগরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সামান্য। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজাদের প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর ওপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভন্ন অঞ্চলে ছয়মাসে নয় মাসেই পৌঁছত। প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। রাজাবদলে প্রজার ক্ষতি-বৃদ্ধি ক্বচিৎ এবং সামান্যই হত। প্রজার কাছে রাজা ছিলেন তখন ভাড়াটে বাড়ির কিংবা জমির মালিকের মতো। এ-যুগের মতো রাষ্ট্রিক জাতীয়তা বোধ ছিল না প্রজাদের। যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করেছিল? শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এ দেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, ৪৬ ও ৫০-এর রাজনৈতিক-সম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত নেয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রীঃ) বাঙলা বিজিত হল বটে; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তির ও সামন্ত শক্তিতে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। শাহ্জাহানের আমলে বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য; কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না; আবার আওরঙ্গজীবের আমলে বাণিজ্যক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলায় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না, তা

১. এ প্রসঙ্গে `Early Muslim Rulers in Bengal and their Non-Muslim subjects (Down to A.D. 1538) by Dr. Abdul Karim, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dacca. 1957 দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।[১] এ ব্যাপারে বলবনী শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত (পৃঃ ৪৩) মন্তব্য স্মরণীয়।

এবার তুর্কী বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো পেশ করছি :

ক. আক্রমণ ও বিজয় কি কেবল বাঙলা দেশেই ঘটেছিল, ভারতের অন্যত্র ঘটে নি? সেখানকার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছিল?

খ. যুদ্ধকালে জীবন ও সম্পদ নষ্ট অনিবার্য। কিন্তু তাই বলে যারা রাজত্ব করতে আসে, তারা বিজিতদের ওপর নির্বোধের মত চিরকাল বেপরওয়া অত্যাচার চালায় না। এবং চালালে সে রাজ্য ও রাজত্ব টেকে না। রাজনীতি ও শাসননীতিতে এমন নির্বোধ policy থাকতে পারে না। যাঁরা কথায় কথায় বাঙলাদেশে দেড়শ, দু'শ বা আড়াই শ বছর ব্যাপী হিন্দু পীড়নের কথা বলেন, তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি, যে এটা ছয় থেকে দশ পুরুষ প্রক্রমের (generations) ব্যাপার? ইতিমধ্যে শাসক বদল হয়েছে কয়বার; generations ঘুরেছে কয়বার? দেড়শ-আড়াই শ বছর ধরে পুরুষানুক্রমে একই মতাদর্শে আস্থা রাখা, একই পীড়ন-নীতি চালু রাখা কিংবা একই কর্মে সক্রিয় থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি?

গ. জনাব গোপাল হালদার (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড) বলেছেন, বৌদ্ধদেরও ওপর অত্যাচার হয়েছিল। দুর্গভ্রমে মগধের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ ও সৈন্যভ্রমে ভিক্ষু হত্যার ব্যাপারটি যে একান্তই অজ্ঞানকৃত তা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধদের সংখ্যা তখন বাঙলায় নেহাত নগণ্য এবং দণ্ডশক্তি তাদের কারো হাতে ছিল না। তারা তখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিগ্রহপিষ্ট ও অনুকম্পাজীবী। কাজেই তাদেরকে নিপীড়িত করবার কারণ ও সুযোগ দু-ই ছিল অনুপস্থিত। মুসলমান বিজয়ে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-মুক্তির উল্লাসই কি 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' ব্যক্ত হয় নি!

ঘ. ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, উচ্চ বর্ণ ও বিত্তের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। তারপরেও বাঙলাদেশে–বিশেষ করে গৌড়ে-নদীয়ায় উচ্চবর্ণের এত হিন্দু রইল কি করে? বাঙলাদেশে উচ্চবর্ণের লোকের আনুপাতিক সংখ্যা যত, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তত আছে কি? বাঙলার যে অংশ সুলতানদের পদতলে ও পদপ্রান্তে ছিল সেখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশি কেন? 'রক্তে' ও 'আগুনে' এত কিছু ধ্বংস করার পরেও সব রইল কি করে? মন্দির ধ্বংস কিংবা হিন্দু নাগরিক হত্যা না করেও পূর্ববঙ্গ এক শত বছর পরে (১৩০১ খ্রীঃ) জয় করা হয়। [পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে আসলে ১৫০ বছরের বেশী সময় লেগেছিল।] রাঢ় অঞ্চলও তেরো শতকের তৃতীয়পাদ অবধি গঙ্গারাজদের দখলে ছিল। সেখানকার বাঙলা ও সংস্কৃত অবদানের নিদর্শন কি এবং কোথায়?

ঙ. সে-যুগে কি নির্দিষ্ট প্রান্তরে নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ হত না? এবং সেনাপতির নিধনে, দুর্গ দখলে কিংবা তৎখত অধিকার গোটা দেশ জিত হত না? গেরিলা যুদ্ধ তথা গণসংগ্রাম ছিল কি? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়' –কথাটা কি আক্ষরিক অর্থে সত্য ছিল না? আমাদের মধ্যযুগীয় শেষ লড়াই 'পলাশীর যুদ্ধ'ও এরূপ যুদ্ধ নয় কি? জয়ের পরে দুই একদিন নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে, রাজধানী প্রবেশের পথে ও রাজধানীতে লুটতরাজ চলত (এ-ই

১. "হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/ আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম/ আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।" —বৃন্দাবন দাস"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ম)। তাই বলে তা বছরের পর বছর ধরে চলেছে বলে ভাববার কারণ কি? বর্গীর হামলার মতো রাজশক্তির ও রাজার সুপরিকল্পিত cold blooded বর্বরতা, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর আছে কি? তবু বর্গী উপদ্রুত অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, পালা-পার্বণ ও বিবাহ উৎসবাদি কি বন্ধ ছিল? দেড়শ আড়াই শ বছর ধরে নিপীড়ন চললে তা কি গা-সহা বা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে না? সে অবস্থায়-জীবনযাত্রা কি বিকৃতভাবেও স্বাভাবিকতা লাভ করে না? তখন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় খুব বাধা থাকে কি? ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষকালে যখন বাঙলাদেশের প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারালো, তখনো কি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিত এবং বাঙলার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কি ছাপা হয় নি? পলাশীর যুদ্ধের পরে, সিপাহী বিপ্লবকালে, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময়ে কিংবা ১৯৪৬-৫০-এর পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজের সময়ে (সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকের আত্মীয়স্বজনের প্রাণ ও সম্পদহানি হওয়ার পরেও) বাঙলাদেশের অধিকাংশ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে ও মননে বিপর্যয় ঘটার প্রমাণ আছে কি? তখন কি স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, পার্বণ ও বিবাহাদি উৎসব বন্ধ ছিল?

চ. মুসলমান আক্রমণকারীরা না হয় গৌড়-লখনোতিতে চলার পথে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা রাজধানী দখলের সময়ে মন্দির ভেঙেছে, প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করেছে, গ্রাম লুট করেছে কিন্তু তাদের সংখ্যা কয়টি ও কয়জন? দেশব্যাপী হিন্দু যারা বেঁচে রইল তাদের বাড়ির এবং দেশের অন্যান্য মন্দিরের পুথিপত্র নষ্ট হবার কারণ কি? এ তো গৌড়ের কথা। রাঢ়ে-বঙ্গে তো মুসলমানের পা বহুকাল পড়ে নি, যখন পড়েছে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়পরাজয় নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়েছে, মন্দির ভাঙ্গার কিংবা নির্বিচারে লোক হত্যার প্রয়োজন হয় নি। সেখানকার হিন্দুর বাঙলা-সংস্কৃতে কি অবদান আছে? গৌড়-লখনোতিতে কাফেররা কি কেবল নিগৃহীতই হচ্ছিল; রাজনীতি ও কূটনীতির নিয়মানুসারে কেউ কেউ কি অনুগৃহীত হয় নি? তাদের দান কি? তাদের রাজত্বে হিন্দু রইল, তার শাস্ত্র রইল, পূজা-পার্বণ-বিবাহ, গান-বাজনা, সন্তান উৎপাদন উৎসব-অনুষ্ঠান সব সম্ভব হল, জেলে-জোলা-কামার-কুমার-চাষী মজুর সবাই স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত রইল, কেবল ছন্দে ছড়া আর্যা-তর্জা-পদ রচনাতেই পীড়নপ্রসূত ছিল—এ যুক্তি হাস্যকর।

ছ. ভারতের সর্বত্র ইংরেজের শাসনকাল সমান নয়। বাঙলাতেই তো ১৮২ বছর মাত্র। তবু আমরা কি দেখলাম? এর মধ্যেই আমাদের সর্বাত্মক বিবর্তন ও রূপান্তর জন্মান্তরেরই নামান্তর নয় কি? তা হলে মুসলমান রাজত্বের প্রথম আড়াই শ বছরেও (বিজ্ঞান যুগ নয় বলে হয়ত খুব মন্থর গতিতে) দেশের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রূপান্তর ও বিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটেছে, যার ক্রমিক ও পূর্ণ বিকশিত রূপ পাচ্ছি ভাস্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ-কলন্দর-রামানন্দ-কবীর-নানক-একলব্য-রামদাস-দাদু-রজ্জব-চৈতন্যের মতবাদে। ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতের মধ্যযুগে সাধনার ধারা,' 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা,' তারাচাঁদের 'Influence of Islam on Indian Culture', সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'The Hindu view of life', বিনয় ঘোষের 'বাঙলার নবজাগৃতি,' উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারত দর্শন সার' প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের উক্তির সমর্থন রয়েছে।

এ ব্যাপারে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালুগাজী, ওলাদেবী-ওলাবিবি প্রভৃতি উপ ও অপদেবতার উদ্ভব ও পূজা-শিরনীর কথাও স্মরণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বৃহৎ বঙ্গে' দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "বাঙলা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীনতার যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল।" অরবিন্দ পোদ্দারের 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও মানবধর্ম' গ্রন্থেও তুর্কী বিজয়ের সুফলের কথা আছে। এবং বৈষ্ণবমত যে সূফীমতের প্রভাবপ্রসূত তা সুকুমার সেনও কিছুটা স্বীকার করেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পূর্বার্ধ পৃঃ ২৪৫)।

জ. বাঙলাদেশ উজাড় হল বলে বাঙলা সাহিত্য দেড়শ-আড়াই শ বছর ধরে সৃষ্টি হয় নি, এই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্ধাদের চর্যাপদ ছাড়া বাঙলায় [?] আর কিছু সৃষ্টি হয়েছিল কি? উচ্চবিত্তের গৃহী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুসলিম বিজয়ের পূর্বেকার কোন বাঙলা রচনার সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া যায় কি? লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলায় লিখিয়ে কবি ছিলেন কি? শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোন অবহট্টেই কি লিখিত বিশেষ কোন রচনা আছে [ODBL-P. 113]? গৌড়ী অবহট্টে রচনার রেওয়াজ না থাকলে প্রাচীন বাঙলাতেই বা থাকবে কেন? ধ্বংসের মধ্যেও 'মূর্ছাহত' বাঙালী 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলন করবার প্রেরণা ও সংকলনের জন্য কবিতা পেলেন কোথায়? আর প্রাকৃত-অবহট্ঠের মতো বাঙলা কবিতা থাকলেও কি এরূপ সংকলন হত না? এ-সময়ে রচনার অনুকূল পরিবেশ না থাকলে এ-সময়কার কিছু কিছু সংস্কৃত রচনার (টীকা-ভাষ্য পুরাণাদির) সন্ধান মিলল কিরূপে? বাঙলা কি তখন শিক্ষিত লোকের সাহিত্য রচনার বাহন হবার যোগ্য হয়েছিল? সে-যুগের ধর্ম-সম্পৃক্ত সাহিত্য 'ভাষায়' সৃষ্টির বা অনুবাদের পক্ষে বাধা ছিল না কি? চণ্ডীদাস , কৃত্তিবাস ছাড়া কোনো বামুন আদি স্তরে বাঙলায় কিছু লিখতে সাহস বা আগ্রহ দেখিয়েছেন কি? ব্রাহ্মণ্য-শাসনে শাস্ত্রপতিদের পাঁতি উপেক্ষা করে বাঙলা চর্চা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল কি?

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

কিংবা 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুনঘেঁষে এ তিন সর্বনেশে' বুলিটা আঠারো শতক অবধি কথায় ও কাজে অন্তত কিছুটা কি চালু ছিল না? অতএব বাধা ছিল শাস্ত্রিক ও সামাজিক, —তুর্কী বিজয়েই সে বাধা অপসারিত হয়।

ঝ. হিন্দুর বেদ পুরাণাদি রইল, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের গ্রন্থও রইল, মুসলমানেরা কি শুধু বেছে বেছে বাঙলা বই নষ্ট করেছিল যে চর্যাপদ নেপাল দরবারের আশ্রয়ে টিকে রইল আর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) বাঁকুড়ার গোয়ালঘরে আশ্রয় পেল? শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের আর কোন কপি পাওয়া গেল না কেন? 'শেখ শুভোদয়া'[১] কি বলে? বাঙলা দেশে কি আগুন-পানি-উই-কীট সে যুগে ছিল না? জনপ্রিয় না হলে এযুগের ছাপা বইও কি দুর্লভ ও ক্রমে লুপ্ত হয় না? ভাষার পরিবর্তনে ও জনপ্রিয়তার অভাবে (যদি বাঙলায় কিছু রচিত হয়েও থাকে) আলোচ্য যুগের বাঙলা বই কি লুপ্ত হতে পারে না? 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' কি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ নয়?

---

১ 'শেখ শুভোদয়া'র অকৃত্রিমতায় অনেকে সন্দিহান। কিন্তু ষোল শতকের সেই ইতিহাসবিহীন যুগে হলায়ুধ মিশ্রের নাম জানা এবং তাঁর নামে ভণিতা দিয়ে জাল বই রচনা করা কেবল মুসলমানের পক্ষে নয়, অতি বুদ্ধিমান হিন্দু পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথিতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ ও বিকৃতি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেপালেই চর্যাপদের একাধিক পুঁথি পাওয়া গেল না কেন? ষোল-সতেরো শতকে রচিত বহু পুঁথি কি লুপ্ত হয় নি? শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তারিখটি এবং কৃত্তিবাসের 'আত্মকথা' প্রচুর পাওয়া না যায় কেন?

আমাদের ধারণায় তুর্কীবিজয় ও তার পরেরকার গৌড়রাজ্যের চিত্র এরূপ : তুর্কীরা যুদ্ধ করে যখন দেশ জয় করেছে [আসলে বক্তিয়ার খালজী অনায়াসেই দেশ দখল করেন, হত্যাকাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, কারণ রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন]; তখন সাময়িকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলেছিল (যেমনটি চলে থাকে)। তারপর দেশ শাসনে তারা মনোযোগী হয়। গোড়ার দিকে উদ্ধত অসহযোগীদের শায়েস্তা করতে হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ লোকের ওপর অত্যাচার চলে। কিছু কিছু লোকের ধন-জন-প্রাণ হরণ করা হয় (যেমনটি নিয়ম ও প্রয়োজন)। তারপর রাজত্ব স্থায়ী করার গরজেই শাসিতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানে শাসকবর্গ বাধ্য হয়। এবং যেহেতু দেড়শ বছর ধরে গৌড় সিংহাসনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল না, মসনদ নিয়ে নিত্য কাড়াকাড়ির আশঙ্কা থাকত, সেহেতু সিংহাসনাভিলাষীরা সামন্ত, সর্দার ও ভুঁইয়াদের স্বপক্ষে টানবার জন্যে সুশাসন চালাবার চেষ্টা করতেন [যেমন মন্ত্রী হিসেবে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ করেছিলেন।] এবং সে সূত্রে সুশাসনের নামে বেশ কিছুটা অতিরিক্ত উদারতা ও সদাশয়তা দেখাতেন এবং জনপ্রিয়তার জন্যে জনগণকে প্রশ্রয় দিতেন। এ-ও অনুমান করা যায় যে, তাঁরা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবার গরজে প্রজাদের গোড়ার দিকে করভারে পীড়া দিয়েছেন। ইংরেজদের যেমন দেখেছি, তেমনি মুসলমানেরাও উত্তমন্যতা (Superiority complex) নিয়ে চলত, আর শাসিতদের অবজ্ঞা ও অনুকম্পা দেখাত; নির্বোধ ও সাধারণ মুসলমানেরা সে-অবজ্ঞা কথায় ও আচরণে প্রকাশ করত। [কীর্তিলতা[১] ও চৈতন্যমঙ্গলে যেমন দেখা যায়] এজন্যে হিন্দুর মনেও ক্ষোভ ছিল (যেমন মধ্যযুগের হিন্দুরচিত নানা গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতা দেখা যায়; ব্রিটিশ আমলের দেশীয় সাহিত্যে যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকট)। এ জন্যে সময় ও সুযোগমত তারা তিলকে তাল করে রটিয়ে দিত। (কয়েক বছর আগে যেমন পাকিস্তানে হিন্দুনারী হরণের ও হিন্দুর ওপর নানা লঘু-গুরু অত্যাচারের অলীক সংবাদ কলকাতায় শোনা যেত)। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক বিজাতির ও বিদেশীর হলে এমনটিই হয়, না হয়ে পারে না। শাসকের দোষ খোঁজার ও দেখার জন্যে এবং ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগের জন্যে এমনি অবস্থায় মনটি তৈরি হয়েই থাকে। (গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদলের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।) ঐতিহাসিকের কর্তব্য সব কথা আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস না করে সত্য ও সারটুকু ছেঁকে নেয়া। আর অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা এ-যুগেও রটে—সুতরাং সে-যুগে নানা কারণে এর বাহুল্য যে ছিল এবং অজ্ঞতার সুযোগে এবং যাচাই করবার উপায়ের অভাবে সেগুলো যে সহজে বিশ্বাস্য হত তা না বললেও চলে। আজকের

---

১ বিক্ষুব্ধচিত্ত হিন্দুর কাছে নির্যাতন মনে হয়েছে বটে, আসলে কীর্তিলতায় বর্ণিত 'তুর্কীর হিন্দু নির্যাতনের' চিত্রটি অশিক্ষিত নির্বোধ মুসলমানের রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সেকালীন স্থূল রসিকতা ও বিদ্রূপের ধরনই ছিল ঐরূপ। 'ফোট চাট জনউ তোড়। উপ চড়াবএ চাহ ঘোড়া।—এ নির্যাতন নয়—রসিকতার বিকৃত ধরন। এতে কবিজনোচিত অত্যুক্তিও আছে। যেমন :—

গোরা গোমঠ পুরলি মহী।
পদরুহ দেবাক ধাম নহী ॥-

মিথিলার হিন্দু রাজার প্রসাদপুষ্ট বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এ নয়—কল্পিত চিত্র মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই ভালয়-মন্দয় শাসনকার্য চলত, মাঝে মাঝে অমানুষ শাসকের হাতে পড়লে তার ব্যতিক্রম ঘটত—আজও যেমন ঘটে। এজন্যে মানুষে ভাব-চিন্তা কিংবা আনন্দ-উৎসব বন্ধ থাকে নি—থাকে না। তবে অনুকূল-পরিবেশে তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘটে। তাও এসব বাধার যা-কিছু গুরুত্ব সাধারণের কাছেই—প্রতিভাধরের কাছে কখনোই নয়। তার প্রমাণ বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য।

এবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি যে বাঙলা, এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ'তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সর্বজনস্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবিদার। ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালী বিদ্বানেরাও ওদের দাবির আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১] সব সিদ্ধার বাড়ি বাঙলায় নয়, বাঙলা তখনো শালীন ও লেখ্য সাহিত্যের ভাষা নয়, আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যার, মিথিলার কিংবা আসামের লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য (গৌড়ী?) অবহট্‌ঠে মোটামুটি অভিন্ন ছিল। নাথ ও সহজিয়া পন্থের অন্যতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ। কাজেই মানিক চাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদের দেশে (আধুনিক কুমিল্লাদি জেলায়) বহুর চর্চার ফলে [নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানঅতীশাদি পূর্ব বাঙলার লোকেরাই নিয়ে যান] চর্যাগীতিতে বঙ্গ-গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে। এতেই বাঙলার দাবি জোরালো হয়েছে। মুনিদত্তের টীকাযুক্ত চর্যাগীতি নেপালে বঙ্গাক্ষরে [নেওয়ারী হরফে?] লিখিত পুঁথিতেই পাওয়া গেছে। বিদেশে বিভাষীর পক্ষে ভিন্ন ভাষায় অলিখিত শাস্ত্রচর্চা সম্ভব নয়। কাজেই চর্যাগীতি নেপালে স্বাভাবিকভাবেই লিখিত ও টীকা সম্বলিত হয়েছে। কিন্তু আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও তার লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। নাথ-সহজিয়া পন্থ যোগতান্ত্রিক বজ্রযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা। কাজেই উপসম্প্রদায়ের লোক সংখ্যায় বেশি ছিল না এবং তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপন করে নি। অতএব সেকালের বাঙালী-বিহারী-আসামী-উড়িয়াসমাজ-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবি বা যোগ্যতা এদের ছিল না। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। কারণ শাস্ত্র চর্চার ও শাসন পরিচালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহট্‌ঠেরও লেখ্যরূপ মিলে না। গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠেই যদি লেখার রেওয়াজ না থাকে, তা হলে তখনো নিতান্ত অবজ্ঞেয় আঞ্চলিক মুখের

---

১. ক. ইসলামী বাংলা সাহিত্য : পৃঃ ৪; বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আর্যভাষা দশম শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপলাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ ছিল না বলে তা সাহিত্যে সদ্য সদ্য গৃহীত হয় নাই। তবু কথ্যভাষার পদ ও বাক্‌রীতি সমসাময়িক অবহট্ট রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং কালানুক্রম ও বিষয় ধরিয়া নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্ট সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষায় সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাস উপেক্ষিত হয়। বাঃ সাঃ ইং ১/৩ পূর্বার্ধ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৬।
"চর্যাগীতিগুলি" প্রাচীন বাংলায় লেখা হলেও এতে অবহট্টের ছাপ ও ছাঁদ থাকায়... কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বললেও অন্যায় হয় না, পৃঃ ৬০। খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১।২ : পৃঃ ৬৭-৭৭; গ. চর্যাগীতি পদাবলী : পৃঃ ৩৯; ঘ. ভাষার ইতিবৃত্ত : পৃঃ ৯৫ (৪র্থ সং); ঙ. উড়িয়া সাহিত্য : প্রিয়রঞ্জন সেন, পৃঃ ৮; চ. বিজয়চন্দ্র মজুমদার—The History of the Bengali Language.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলি আসামী-বাঙলা-উড়িয়া-বিহারীতেই বা লেখ্য রচনার সম্ভাব্যতা কোথায়? কাজেই এ দেশে চর্যাগীতির কোন লেখ্যরূপ ছিল না এবং এগুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকসাহিত্য বা লোকায়ত শাস্ত্ররূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা। অতএব, আমাদের অনুমান এই যে, চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাংলাও নয়, —শৌরসেনী প্রভাবিত অর্বাচীন পৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং মৌখিক রচনা। ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন, "অসমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেন না ষোড়শ শতাব্দী অবধি (বাঙলা ও অসমীয়া) দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না"[১] এবং উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[২] কাজেই ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিল, অসমীয়ার উদ্ভব। ডক্টর সুকুমার সেন এর নাম দিয়েছেন, প্রত্ন-বাঙ্গালা-অসমীয়া-উড়িয়া।[৩] এই সাধারণ স্তর আমাদের ধারণায় অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ, তনকালীন অবহট্‌ঠ। অতএব, চর্যাগীতি কেবল বাঙলার নয়, উক্ত অপর ভাষাগুলোরও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সব কয়টি ভাষার জননী। ভারতে সর্বত্র প্রচার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত ও পণ্ডিতদের জন্যে যাঁরা সংস্কৃতে তত্ত্বগ্রন্থ ও ভাষ্য রচনা করেছেন এবং সাধারণ সাক্ষর লোকের জন্যে শালীন ও লেখ্য শৌরসেনী অবহট্‌ঠে যাঁরা দোহা রচনা করেছেন, তাঁরাই পূর্বাঞ্চলের বুলিঘেঁষা রীতিতে গণবোধ্য চর্যাগীতি রচনা করেছেন তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে।

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোন বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাববিনিময়ের বাহন। তাই কোন আর্য-ভারতীক আঞ্চলিক বুলিই লেখ্য ভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায় নি। বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্রশাসনের কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগে নি বলে কোন বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায় নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়। তাই ঐ শালীন দরবারী ভাষা শৌরসেনী।

অবহট্‌ঠ প্রাচ্য অঞ্চলে লিখিয়েদেরও আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে একই কারণে উত্তর ভারতীয় ভাষা অনুকৃত হয়ে 'ব্রজবুলি' সৃষ্ট হয়।

এর পরে তুর্কী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজ্জব প্রভৃতি সন্তগণের

---

১. চর্যাগীতি পদাবলী : পৃঃ ৩৯।

২. ভাষার ইতিবৃত্ত : ৪র্থ সং : পৃঃ ৯৫।
১-২ ডঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও এ-মত পোষণ করেন।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড : ৩য় সংস্করণ, পূর্বার্ধ : পৃঃ ১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান মুখ্য ও অপরিমেয়। তুর্কী বিজয়ের ফলে ও তাদের প্রভাবে ব্রিটিশ বিজয়ের মতোই মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উপপ্লব-বিপ্লব-রূপান্তর লঘু-গুরুভাবে নিশ্চয়ই ঘটেছিল। শহুরে দেশীয় লোকদের আচারে-আচরণে, বসনে-ভূষণে, মনে-মতে, চিন্তায়-চেতনায়, আসবাবে-তৈজসে, ভাষায়-সাহিত্যে, চিত্রে-সঙ্গীতে, স্থাপত্যে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইংরেজ আমলের মতোই শাসকগোষ্ঠীর অমোঘ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছিল।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগতন্ত্র ও শৈবমত-প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল বৈষ্ণবমত ও দেব পাঁচালী। পরবর্তীকালে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দু সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানির শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এ সব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে নি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোন দিন জাতীয় ভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায় নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

শিক্ষার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোকের ভাষা। সেকালে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বুলিতেই। এভাবে তারা গান, গাথা, ছড়া, বচন ও রূপকথা-রসবার্তা তৈরি করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। বহু মুখের স্পর্শে ওগুলো রূপ ও রস বদলায়, ফলে ও-গুলোকে ব্যক্তিক রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই আজকাল এ সাহিত্যকে গণরচনা বলে নির্দেশ করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় এগুলোই লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্য। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লীসাহিত্য সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস প্রসূত নয়। তবু মানব মনের কোমল অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ বলেই এগুলো সুন্দর এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পুষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃতজনের রচনা লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই। বাঙলা লোকসাহিত্যের আদি নির্দশন হচ্ছে ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত (অপ্রাপ্য), ময়নামতী-গোপীচাঁদ-মানিকচাঁদ গীত, মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা-কাহ্নি; শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রামপাঁচালী, ভারতকথা প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাহিনীগুলো রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও মঙ্গল কাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ কাহিনী ময়নামতী-গোপীচাঁদ কথা গাথা রূপেই রয়ে গেছে, এবং পালগীতি লোপ পেয়েছে।

অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন বা রাজ্যশাসনের মাধ্যম কিংবা প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে বলে রাখা ভাল, বাঙলার সুলতান-সুবেদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পোষকতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। লেখ্য ভাষা বইপত্র ছাড়া শেখা যায় না, কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেমনটি হয়েছিল। আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অতএব, আলোচ্য দু'শ বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না মেলার আমাদের অনুমিত কারণ এই :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয় নি বলে বাঙলা তুর্কী বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি।

খ. ফলে তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা উচ্চবিত্তের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠে নি। এ সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গাথা ও ছড়া-পাঁচালীই চলত।[১]

গ. সংস্কৃততর কোন ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই প্রাকৃতজনেরা গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত, প্রাকৃত বা শৌরসেনী অবহট্‌ঠই ছিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ভাষায় রচন, পঠন ও শ্রবণ ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃতের মাধ্যমে বৌদ্ধ শাস্ত্রেরও চর্চা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা ও সম্ভাব্যতা কোন উচ্চ শিক্ষিত লোকের মনে জাগে নি। পাল ও সেন আমলে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে এবং তুর্কী বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেককাল গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এতে ভাষা বিকশিত হয়েছে; তার প্রমাণ মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে)। এ গ্রন্থেই দেখা যায়, ইতিমধ্যে এক ডজন ফারসী-তুর্কী শব্দ বাঙলা সাহিত্যের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ঘ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দুশাসিত মিথিলায়, তাই এ সময় বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয় নি; কেবল কিছু কিছু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল। মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চার তথা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তার আগে হয়তো রাজধানী গৌড়েই মিলত প্রখ্যাত পণ্ডিত।

ঙ. তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে, আলোচ্য যুগে বাঙলায় কিছু কিছু পুথিপত্র রচিত হয়েছিল, তা হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজ ও

---

১. ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, দুই-চারিটি ছড়া এবং এক আধটি গান ছাড়া এমন কিছু কালের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বড়গোছের কোন রচনা এ সময়ে লেখা হইয়া থাকিলে তাহার স্মৃতিরেশও বোধ করি থাকিয়া যাইত। তবে পরবর্তী কালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি বিচার করিয়া বলিতে পারি যে এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট বড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে। অধ্যাত্মভাবনাও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকায়তিক (Secular) এমন ছড়া ও গানও এই সময়ে চলিত ছিল, —এই অনুমান করিবার কারণ আছে।"[-বাঃ সাঃ ইং, পৃঃ ১/৩ পূর্বার্ধ। পৃঃ ৭৭-৭৮।]

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও সাহিত্যের একটিমাত্র আদর্শ ছিল। সে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যের আদর্শ। [ঐ পৃঃ ৮০] খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ অবধি যাঁহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র-সংস্কৃতি সম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন, তখন যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি—রাজসভাসদ অথবা সমাজপতি। [ঐ পৃঃ ৭৬।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। যত্ন করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পায়। আগুন-পানি-ইউ-কীট তো রয়েইছে। কিন্তু এ যুগে যে ভাষায় কিছু লিখবার রীতি ছিল না, তার বড় প্রমাণ, পনেরো শতকের শেষাবধি নানা মঙ্গল গীত, রামায়ণ গান, ভারত পাঁচালী এবং বিশ শতকেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়নামতী গানের লিখিত রূপ পাওয়া যায় নি। অথচ এগুলো সুপ্রাচীন।

চ. আবার লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), শেখ শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তা হলে তেরো-চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা। চর্যাগীতি ছাড়াও বারো শতকের বাঙলা-ঘেঁষা রচনার নমুনা মেলে 'শেখ শুভোদয়ার' আর্যায় ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোন কোন পদে। বাঙলা তখন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা বাঙলা কবিও দেখতে পেতাম। এবং পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়ের মত হিন্দুশাসিত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যেত। বাঙলা পদের সংকলন গ্রন্থও মিলত।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না। এবং মুসলিম বিজয়ে বা শাসনে তাদের রচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটে নি। কেবল তাই নয়, বাঙলা লেখ্য ভাষা হলে গৌড় সুলতানের দরবারে রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে গোড়া থেকেই অন্তত বাঙলা ফরমান লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। অথচ গোড়া থেকেই উপদেষ্টা রাজপণ্ডিত ছিল। তাছাড়া আমরা জানি, দেশ জাত ধর্ম উপেক্ষা করে, ব্যক্তিগত স্বার্থে ও আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে কিছু লোক চিরকালই দেশ ও জাতির শত্রুর সঙ্গে—বিদেশী বিজাতি শাসকের সঙ্গে জুটে যায়—সেসব মানুষ থাকে কৃপাপুষ্ট। দেশে বাঙলায় রচনার রেওয়াজ থাকলে তাদের কেউ কেউ তেরো-চৌদ্দ শতকে কিছু রচনা করতেন এবং তার উল্লেখ অন্তত পেতাম। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো কিছু রচনা করতে চায় নি, লৌকিক দেবতার পূজা প্রচার প্রয়াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দু রচনায়।

বিদেশী বিভাষী বিজাতি বিধর্মী ঘাড়ে চেপে বসবে, ভাতে ও ভিটেতে ভাগ বসাবে, আর দেশী লোকেরা তাদের সাদরে আত্মীয় রূপে বরণ করে নেবে, এমন অসম্ভব আশা নিশ্চয়ই কেউ করে না।

কাজেই পরাধীনতার ক্ষোভ ও গ্লানি হিন্দুমনে অবশ্যই ছিল। তেমন ব্যবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চারশ বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয় নি, বাঙলা দরবারী কিংবা জাতীয় ভাষায় মর্যাদা পায় নি বলেই।

অতএব, আমাদের অনুমান এই যে বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি। এটি হচ্ছে বাঙলার সাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোন বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাববিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগে নি বলে আর কোন বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায় নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়।

এরপরে তুর্কী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাববিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতীক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব, শঙ্করদেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন সৃজ্যমান, তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্যপ্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দুসমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানির শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করে নি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোনদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায় নি। আজ অবধি বাঙলা এক রকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

হয়তো দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশী ভাষার অনুশীলনে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ। যেমনটি ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান-সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেককাল অভিজাতরা বাঙলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি" বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনদিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায় নি। তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙলা ভাষায়, লৌকিক সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারে নি। শেক্সপীয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাব হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ।

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়—'পুরাণ পড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'—এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার মাহাত্ম্য কথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং এতে সাহিত্য শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয় মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে, শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেন নি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্মসম্পৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয় নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, মুসলমানরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন। এবং মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব-ধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেন না, সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব-রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা পুরো সম্ভব হয় নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেন নি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দুস্থানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এদুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই (বৈষ্ণবসাহিত্যও) মূলত অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেন নি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসীতে লিখবার যোগ্যতা 'বুলি' মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-যুগে শিক্ষিতজন যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষার ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল। বাঙলার প্রতি ইংরেজী শিক্ষিতজনেরও এমনি অবজ্ঞা ছিল উনিশ শতকে। তাই ঈশ্বরগুপ্ত গভীর ক্ষোভে বলেছেন : 'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ/দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ। অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে/ কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে।'

এ ছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল : ক. সেন রাজারা বাঙলায় উত্তর ভারতীক ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশী সংস্কৃতি সৃজ্যমান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বিকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ. অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবী থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত; ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানদের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা [১৫-১৬ শতকে হিন্দুস্তানী অর্থে এবং পরে হিন্দুর ভাষা অর্থে] বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজাদের সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্মণ্যদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাঙলা চর্চা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে :

কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন-ঘেঁষে
—এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সুরে। এঁদের কেউ কেউ তীব্র প্রতিবাদীও :

শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীস্টাব্দে) বলেন :

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
শুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহা ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

সৈয়দ সুলতান [১৫৮৪খ্রীঃ] বলেছেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী আরবী বচন।
ফলে, আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু, যে সবে আপনা বোল না পারে বুজিতে।
পঞ্চালি-রচিলুঁ করি আছেত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা কহিমু কাহারে।
অবশ্য, মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা দিলু হিন্দুয়ানি করি।
মোহোর মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও [ষোল শতক] নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধা মুক্ত হতে পারেন নি :

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন :

হিন্দুয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর 'পরে 'আল্লি' মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে-আল্লি পীরসবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে ঐ জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ।

নীতিশাস্ত্রবার্তার কবি মুজাম্মিলও (ষোল শতক) বলেন :

১. আরবীর ভাষে লোকে না বুঝে কারণ
দেশী ভাষে কৈলু তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকে করিলুঁ লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না যাএ খণ্ডন।

২. আরবী বচন/ বঙ্গদেশীগণ/ সবে না বুঝে বিশেষ
নিজ দেশ 'বুলি'/ ভনিলুঁ পঞ্চালি/লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রীঃ) ভয় :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রীঃ) রচয়িতা আবদুন্ নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি :

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম কবির মাঝে দেখা যায় না। অন্যদের বিরূপতার নমুনা দেখুন :

'আরবী আঙ্গুলে যদি বাঙ্গলা লিখন-'
বুঝি শুনি কার্য কৈল্লে পাপ বহুতর
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর। — [নামাজ মাহাত্ম্য—মুহম্মদ জান]

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মেলে।

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা'— [দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান], কারুর মতে 'লোক ভাষা' [মাধবাচার্য ১৬ শতক], কেউ বলেন লৌকিক ভাষা [কবি শেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' 'বাঙ্গালা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল গৌড়িয়া।

মধ্যযুগে হিন্দুয়ানী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে-সময়ে কথ্যপ্রাকৃত অবহট্‌ঠ বুলির স্তরে নেমে আসে সে-সময়ে বাংলাদেশেও যে অবহট্‌ঠ এবং তারপরে ক্রমে অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা প্রাচীনতম বাঙলা বুলি চালু হয়েছিল, তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই ভাষাপ্রবাহের সঙ্গত ও স্বাভাবিক বিবর্তন ধারার বিজ্ঞানসম্মত অনুমান থেকে নিঃসংশয়ে মেনে নেয়া চলে। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে বুলিমাত্রই ব্যক্তিক, পারিবারিক ও আঞ্চলিক উচ্চারণে ও অজ্ঞতায় বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রায় প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্টি করে।

বক্তার শারীরিক অসামর্থ্য, অজ্ঞতা, আবহাওয়ায় প্রভাব, সমাজের সংখ্যাগুরুর বুলির প্রভাব প্রভৃতি উচ্চারণ, অভিধা ও বাক্‌রীতির বিকৃতির প্রত্যক্ষ কারণ। কাজেই বাঙলাভাষী অঞ্চলেও যথাকালে ও যথানিয়মে মাগধীপ্রাকৃত তথা পূর্বীপ্রাকৃতের অপভ্রংশে অবহট্‌ঠে বিবর্তন হলেও স্থানিক ও আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল প্রকট। বস্তুত দুনিয়ার তাবৎ লেখ্য বা লিখিত কৃত্রিম ভাষাই বুলি বৈচিত্র্যের বাধা অতিক্রম করে একটা বিরাট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্ব, ভাষিক ঐক্য সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং আচারিক মিল ও দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সংহতি রক্ষা করে। অতএব লিখিত কৃত্রিম ভাষাশৈলী কারুর মুখের বুলি না হয়েও বহু মানুষের মধ্যে জ্ঞাতি-জাতি-সংস্কৃতি, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অভিন্ন সত্তাচেতনার জন্ম দান ও লালন করতে পারে। ভাগলপুর থেকে গৌহাটি, গোয়ালপাড়া কিংবা কুচবিহার থেকে টেকনাফ অবধি বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের মানুষকে ভাষিক বাঙালী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংহত করেছে—তাদের স্ব স্ব বুলি নয়—লেখ্যভাষার প্রতি আনুগত্যই।

অতএব, আমরাও প্রাচীন লিখিত ভাষার নিদর্শন ধরেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগ ও যুগান্তর নিরূপণ করার চেষ্টা করব।

এ তথ্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে, ভাষা-সাহিত্যের রূপান্তর-যুগান্তর যতটা ব্যক্তিক, ততটা সামাজিক, স্থানিক কিংবা গোষ্ঠীগত নয়। ১৮৪৭ সনের বিদ্যাসাগরী ভাষাশৈলী আর ১৮৮০ সনের রাবীন্দ্রিক ভাষাশৈলী অভিন্ন নয়; শব্দচয়নে, বাক্যগঠনরীতিতে, বাক্‌বিন্যাসে ও বাক্‌ভঙ্গিতে এই মৌলিক, গভীর ও ব্যাপক ব্যবধানের উৎস স্থান-কাল নয়—মূলত ব্যক্তিত্ব তথা ব্যক্তি-সত্তার, রুচি-মননের ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তথা অনন্যতা। এ তাৎপর্যেই `Style is the man' —অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই নিদর্শন অথবা ব্যক্তিত্বেরই অন্য নাম। আবার তিনটে স্বতন্ত্র মন মত রুচি আদর্শ নিয়ে ১৮৯১ সন অবধি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশে ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সহাবস্থান করেছেন। কাজেই একই কালে ও স্থানে বিভিন্ন ভাব-চিন্তানীতি-আদর্শ ও রুচি-শৈলী সমান্তরালভাবে চলে,—কোনোটা ক্ষীণভাবে, কোনোটা প্রীতধারায়।

সুতরাং ভাষা-সাহিত্যের জন্মলগ্ন কিংবা বিবর্তন-রূপান্তর দিন-সন দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। সবটাই হবে লাক্ষণিক ও আনুমানিক। তাও আবার কোথাও স্থূল, কোথাও সূক্ষ্ম, কখনো আঙ্গিকগত, কখনো বা মর্মগত। তাছাড়া স্থান-কাল-প্রতিবেশ (শাস্ত্র-সমাজ-সরকার) অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক আর্থিক শৈক্ষিক নৈতিক অবস্থানভেদে মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ বিপরীতমুখী এবং বহু ও বিচিত্র হতে পারে। কাজেই কোনো যুগই একক লক্ষণে-মর্মে আঙ্গিকে-বক্তব্যে চিহ্নিত হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতো কথা বলতে হল এ জন্যে যে কোন সাহিত্যেরই—বাঙলা সাহিত্যেরও দেয়ালতোলা যুগবিভাগ সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়, এমন কি বাঞ্ছিতও নয়।

॥২॥

চর্যাপদাবলীকে বাদ দিলে আমরা পনেরো শতকের পূর্বে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ কোন পূর্ণাঙ্গ লিখিত গ্রন্থ পাইনে বটে, তাবে শব্দে, ছড়ায়, আর্যায়, মীননাথের পদে, চর্যার দুএকটি পদে, হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া'য়, নাড়পাদের সেকোদ্দেশটীকায়, মানসোল্লাসে ও সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে লিখিত বাঙলার নিদর্শন মেলে। কাজেই প্রাচীন বাঙলা বুলির জন্ম আরো অনেক আগে—হয়তো পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকে। সে বুলি নিশ্চয়ই অবহট্‌ঠের মাতৃত্বছাপমুক্ত ছিল না। এই সময়কার লেখ্য অবহট্‌ঠের সন্ধান মেলে দোহায় ও চর্যাগীতিতে। আমরা জানি, লেখ্য ভাষার পরিবর্তন অতি মন্থর। তাই প্রাকৃত পৈঙ্গল, দোহাকোষ কিংবা চর্যাপদের চল বারো-তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি পাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের বুলি শেখ শুভোদয়ার কিংবা শূন্যপুরাণের বাঙলার, অথবা ডাক-খনার বচনের কোন কোন প্রাচীনরূপের কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত প্রাচীনতররূপের বা প্রাচীনরূপে রক্ষিত চলতি আর্যার ভাষার রূপ পেয়েছিল। কেননা, মানুষ ছিল, তার জীবন-জীবিকার ধান্ধা ছিল, আর মন-মানসের অভিব্যক্তি ছিল না,—এমন হতেই পারে না। কাজেই তখনো তার মৌখিক গান-গাথা, রূপকথা, উপকথা-শাস্ত্রকথা এবং ইতিকথাও ছিল। সেগুলোই আমরা বারো-তেরো-চৌদ্দ শতকের কথকতায় গান ও গাথারূপে উৎকর্ষে সুষ্ঠু ও কলেবরে, ীত হয়ে জনপ্রিয় হতে দেখি। এবং পনেরো শতকে লিখিতভাবে পাঁচালী কাব্যে কিংবা গীত ধামালীতে সংহত সাহিত্যরূপে সংকলিত দেখতে পাই।

অতএব, বুলি রূপে বাঙলার উন্মেষ ১৩/১৪শ বছর আগে হলেও লেখ্য বা লিখিত বাঙলার উদ্ভব আটশ বছরের বেশি নয়। এ সূত্রে একটা প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। আমরা বুলির দিক দিয়ে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অবহট্‌ঠের প্রভাবিত অঞ্চলের লোক হলেও, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ দেশের মানুষ শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শাসন ব্যাপারে উত্তর ভারতকেই আদর্শ রূপে জানত ও মানত। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রও শৌরসেনী লেখ্য প্রাকৃতে (তথা পালিতে) লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতও শৌরসেনী লেখ্য প্রাকৃত তথা পালিমিশ্রিত। লিখিত পালি-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ শৌরসেনী প্রাকৃতভিত্তিক। কাজেই কাহ্নপা-সরহ-শান্তির দোহা কিংবা চর্যাগীতি এবং আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লিখিত বাঙলা মাগধী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ বিবর্তিত রূপ নয়, বরং শৌরসেনী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের অনুকৃত রূপ। এ বিষয়ে নিষ্ঠ গবেষণা ফলপ্রসূ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দুবৌদ্ধযুগ-গৌড়ীয়যুগ-চৈতন্যযুগ-সংস্কারযুগ-কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগ নামে বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ দেখিয়েছেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রাক-তুর্কীযুগ-তুর্কী আমল—স্বাধীন মুসলিম বাঙলা—মুঘল আমল—ইংরেজ আমল-পাকিস্তানযুগ নামে কালগত ভাগ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার বিবর্তনভিত্তিক যুগ বিভাগ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন শতকের কাঠামোয় বিষয়ানুগ আলোচনা পছন্দ করেছেন। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দ, পঞ্চদশ শতাব্দ, ষোড়শ শতাব্দ, সপ্তদশ শতাব্দ শিরোনামে বিভিন্ন শাখারও বিষয়ের কবি ও কাব্য আলোচিত হয়েছে। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগবিভাগ : প্রথম পর্ব-আদিযুগ (১০-১২ শতক), দ্বিতীয় পর্ব প্রাকচৈতন্যযুগ (তেরোশতক থেকে ১৪৯৩ খ্রীঃ), চৈতন্যপর্ব (১৪৯৩-১৬০৫ খ্রীঃ) উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্যপর্ব (১৬০৬ থেকে ১৮ শতক : ১৭ শতক, ১৮ শতকের প্রথমার্ধ, ১৮শতকের শেষার্ধ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। এখন স্থূল লক্ষণের ভিত্তিতে অর্থাৎ বিষয় ও লক্ষ্য বিচারে বাঙলা সাহিত্যের একটা কাজ চালানো গোছের যুগ ও যুগান্তর দেখানোর চেষ্টা হতে পারে মাত্র।

প্রথমত রাজনৈতিক পরিবর্তনে তথা শাসকগোষ্ঠী বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী হলে তাদের প্রভাবে যুগান্তর ঘটে। আমরা মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন আমলকে প্রাচীন যুগ, তুর্কী বিজয়োত্তর কালকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ আমলকে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করি। অবশ্য কেবল শাসন পরিবর্তন হলেই যুগান্তর ঘটে না। নতুন জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন মনন ও সংস্কৃতির জন্ম দেয়। নতুন মন-মত-ধর্ম-আচার-মনন-আদর্শ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্যষ্টির চিন্তা-চেতনায় যে অভিঘাত আসে, তারই প্রভাবে বাহ্য জীবন-সমাজে আচারে-আচরণে, এক কথায় মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তা-ই ঘটায় যুগান্তর। বিদেশী তুর্কী-মুঘল-ইংরেজ শাসনে এ কারণেই আমাদের জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে যুগান্তর ঘটে। এ যুগে অবশ্য এ জন্যে আর রাজ্য-রাজত্বের হাতবদল হতে হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর বিকাশের ফলে আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে ভাব-চিন্তা-মত-পথ-বস্তু-বিদ্যা-কৌশল কিংবা গ্রহণে-বরণে জীবন-চেতনায় ও জীবিকা পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে মনন ও জীবনযাত্রায় নব নব যুগ সৃষ্টি করা যায় এবং হয়ও।

১. তুর্কীবিজয়পূর্ব কালকে সাধারণভাবে প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত করলে তেরো-চৌদ্দ শতককে 'আদি মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।
তেরো চৌদ্দ শতকে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, শাসক ও সমাজপতির ভয়মুক্ত হয়ে গণমানব আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কারানুগ চিন্তা-চেতনা মৌখিক রচনার তথা কথকতার মাধ্যমে উৎসবে-পার্বণে জলসায় অভিব্যক্ত করতে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ হিন্দুই দেশজ বৌদ্ধদের বংশধর, সেজন্যে রাজশক্তির প্রশ্রয়ে বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক মত প্রভাবিত সাহিত্যই গোড়ার দিকে বহুল প্রচলিত ছিল। এই কথকতার যুগে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তত্ত্বকথা গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মানিকচাঁদ কাহিনী, —আদিনাথ-মীননাথ-হাড়িফা-কানফা-সম্বাদ, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত, যক্ষের, ব্রতকথা, ধর্মঠাকুর, বাসুলী (বৎসলা) ও তারার মাহাত্ম্য, ডাক-যোগী-ডাকিনী যোগিনীকথা প্রভৃতি যোগতন্ত্র, দেহতত্ত্ব ও দেবতা-মাহাত্ম্য কথাই আসরে আসরে বিশেষভাবে গীত হয়েছে। রাম-কৃষ্ণ-শিব-মনসা-চণ্ডীর লৌকিক মাহাত্ম্য কথাও চালু ছিল। এ কথকতার ভাষা ছিল বুলি ভিত্তিক।

২. **পনেরো শতক** : লিখিত লোকসাহিত্যের ও অনুবাদমূলক পৌরাণিক সাহিত্যের যুগ। পূর্বে বর্ণিত ধারার অতিরিক্ত ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শূন্যপুরাণ, মনসার ভাসান এবং খ. সংস্কৃত থেকে অনুবাদমূলক রামায়ণ ও ভাগবত। এ শতকেই রাজশক্তির আগ্রহে বাঙলায় অনুবাদের শুরু এবং ভাষা তখনো বুলি-দুষ্ট , যদিও ছন্দ-চেতনা ও রাগ-রাগিণীপ্রীতিও লক্ষণীয়।

৩. **ষোল শতক** : ভাববিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ। এ যুগে বাঙলা রচনা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে। এ সাহিত্য লক্ষণে গ্রামীণ, —নগুরে নয়। ভাষাও সংস্কৃত শব্দবহুল পরিশীলিত গ্রামীণ। চৈতন্যদেবের 'নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম' তত্ত্ব এবং সর্ব মানবে প্রেম-প্রীতি ও সাম্যতত্ত্ব বাঙালী জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা অন্তত এক শতক ধরে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর জীবনচর্যার প্রভাবই বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় রেনেসাঁস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনে। এ শতকে পূর্ব ধারার অতিরিক্ত ক. বৈষ্ণব সাহিত্য খ. অনুবাদমূলক প্রণয়োপাখ্যান, গ. মহাভারত ও নবীকাহিনী পাই।

৪. **সতেরো শতক :** লৌকিক পীর-নারায়ণ সত্য' আশ্রয়ী শোষিত বাঙালীর মিলনমুখী সাধনার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের শোষণের পরিণামে নির্জিত গণমানব 'সত্য' পূজায় পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাব-অনটনের অবসান কামনা করেছিল। গীতা-কোরআন্ অনুসারীরা আকস্মিকভাবে কেন আবার বৌদ্ধযুগসুলভ লৌকিক দেবতা-উপদেবতার (সত্য-বড় গাজী দক্ষিণরায়-কালু-বনদেবী ও কাল্পনিক পীরের) পূজায় আসক্ত হয়েছিল, তার কারণ মিলবে সমকালীন বাণিজ্যিক-আর্থিক-প্রশাসনিক বিকাশের মধ্যে। এ কাল ক. পূর্বেকার বিভিন্ন শাখায় সৃষ্টিপ্রবাহে ীতির যুগ—এ সময় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বহু কবির রচনায় ীত হয় বটে, কিন্তু আনুপাতিক উৎকর্ষ দুর্লক্ষ্য। একাল-খ. পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালী ও অন্যান্য উপদেবতা ও পীরের পাঁচালীর প্রসার কাল। এই রচনার ভাষা স্থানে স্থানে দোভাষী (বাঙলা-হিন্দি)। গ. লোকগাথার বিকাশ কাল। ঘ. মুসলিম শাস্ত্রকথা ও নবী-বীর কাহিনী।

৫. **আঠারো শতক :** নওয়াব-ব্রিটিশ শাসন-শোষণজনিত অবক্ষয় যুগ। সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকে মগ-হার্মাদের হামলা ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছিল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙজীবের মৃত্যুর পর দিল্লীর প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে। নওয়াব মুরশিদ কুলি খাঁর রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা নতুন নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম দেয়। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ সন) পর থেকে ১৭৬২ অবধি যুদ্ধ-দ্রোহ-বর্গীর লুণ্ঠন, সামন্ত স্বৈরাচার, বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, দুর্নীতি-দুঃশাসন প্রভৃতি গণমানবের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা আনে। পূর্বেকার গ্রামীণ প্রবাহের অতিরিক্ত ক. শহুরে শায়ের ও কবিওয়ালার উদ্ভব।

নওয়াবী শাসনের অবসান ও কোম্পানি শাসনের আরম্ভকালীন নৈরাজ্য-নৈরাশ্যের প্রসূন হচ্ছে শায়েরদের দোভাষী রচনা এবং কবিওয়ালাদের খেউর আখড়াই-টপ্পা গান ও অশ্লীল কথকতা। এ হচ্ছে প্রায় শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী যুগসন্ধি (১৭৬০-১৮৬০ সন) কাল। মোটামুটিভাবে ১৭৬০ থেকে ১৮২০ অবধি শায়ের-কবিওয়ালার প্রাবল্যের যুগ।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নাগরিক পরিস্রুতি দুর্লক্ষ্য (অবশ্যই পদাবলী এর ব্যতিক্রম)। একটা গ্রামীণ আবহ ও আবরণ প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান। বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী তুর্কী বিজয়ের ফলে শাস্ত্র ও সমাজশাসিত গণমনে সামাজিক শাসনমুক্তির একটা উল্লাস জেগেছিল। সমাজ ক্ষেত্রে স্বাধীন আচরণের সরকারি প্রশ্রয় পেয়ে তারা এতাবৎ অশাস্ত্রীয় বলে অবৈধ-ঘোষিত কিন্তু বুকের কোণে লালিত লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতা-অপদেবতার ভয়-ভরসা স্বাধীনভাবে কথায় ও কাজে প্রকাশ করার সুযোগ পেল। বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ ঐ নির্জিত গণমানবের মানস বাঞ্ছাপূর্তির ও অকুণ্ঠ অভিব্যক্তির বাহন রূপেই।

অতএব, রাজ্য-রাজত্ব হাত বদল হওয়ার ফলে মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা কাল-পরিসরকে আমরা চার যুগে ভাগ করে দেখতে অভ্যস্ত।

যেমন :

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসনকাল—প্রাচীন যুগ।
২. তুর্ক-আফগান-মুঘল শাসনকাল—মধ্যযুগ।
   ক. আদিমধ্যযুগ— তেরো-চৌদ্দ শতক।
   খ. মধ্যযুগ—পনেরো-আঠারো শতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. ব্রিটিশ শাসনকাল—আধুনিক যুগ।
৪. স্বাধীনতা-উত্তরকাল—বর্তমান যুগ।

এখানে আমাদের আলোচ্য কেবল মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য। কাজেই পূর্বে ব্যাখ্যাত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মধ্যযুগের সাহিত্য-প্রবাহের যুগানুগ সংক্ষিপ্ত নাম হবে নিম্নরূপ :

প্রথমযুগ : ১৩-১৪ শতক—সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ।
দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক—লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ।
তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক—ভাববিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ।
চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক— লোকায়ত পীর-দেবতাদের যুগ।
পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক—অবক্ষয় যুগ।

বলেছি, যুগান্তর সম্ভব হয় নতুন চেতনার উন্মেষে। নতুন চেতনার উন্মেষ বিপরীত কিংবা উন্নতমানের চেতনার অভিঘাতেই সম্ভব। আমাদের দেশে সাড়ে সাতশোর্ধ্ব বছর আগে তা সম্ভব হয় তুর্কীবিজয়ের দরুন। শাসক-শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী উপজাত হচ্ছে পরস্পরের ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে-পরিচয় সম্ভব হয়েছে পরস্পরের ভাষা জানাজানির ফলে। নইলে শুধু চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাতে কেউ কারো প্রভাবে পড়ে না। তার প্রমাণ তিনশ বছর ধরে য়ুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করছিল, কিন্তু তবু প্রতীচী আমাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ তার মন-মননের ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত করল আমাদের কাছে। আমাদের জীবনেও যেন অমারজনীতে সূর্যোদয় ঘটল। আমাদের জীবনে ও মননে আকস্মিকভাবে ঘটল কালান্তর। তুর্কীর ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে-নতুন চিন্তা-চেতনার লাবণ্য এদেশে দেখা গেল, তাও ইংরেজ-প্রভাবের মতোই ছিল ব্যাপক ও গভীর ভক্তিবাদ-সন্তধর্ম-প্রেমবাদ তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের তাত্ত্বিকচেতনা ছিল। তাতেও ছিল নতুন জ্ঞানের আলো, —তার অবশ্য ঔজ্জ্বল্য ছিল না তেমন, তবে মানবতার ও সংবেদনশীলতার স্নিগ্ধতা ছিল। সেদিনও নির্জিত-নিপীড়িত-নির্বিত্ত নিম্নবর্ণের মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দ্রোহের সাহস জেগেছিল, সে দিনও শঙ্করীয়-রামমোহনী কায়দার ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা মিলেছিল, —সমাজতত্ত্বে ফাঁকির ফাঁক ধরা পড়েছিল। জন্মসূত্রে নয়—সামর্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় সূত্রেই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত—সম্ভব হয়েছিল সে উপলব্ধিও। ফলে মানুষের জীবনে জীবিকায় উন্মুক্ত হল সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। শাস্ত্রের জন্যে যে জীবন নয়—জীবনের জন্যেই শাস্ত্র তাও বোধগত হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের সাফল্য-সম্ভাবনার দিগন্ত যে অশেষ, তা দেব-দ্বিজ-বেদ জুজুর মিথ্যা ভয়মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। তুর্কীপ্রভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে বিপ্লব এল, তারই প্রসূন সন্তধর্ম-ভক্তিধর্ম প্রেমধর্ম সেদিন ভারতে জীবনজিজ্ঞাসায় ও জগৎভাবনায় যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তা-চেতনার রূপান্তরে সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শাস্ত্রে-সমরে-পোশাকে-প্রশাসনে সর্বাত্মক পরিবর্তন এসেছিল, যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে। এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি এসেছিল নিম্নবর্ণের ও বিত্তের লোকের মধ্যে। এই গণমানবই এ-সময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ও উদ্যোগী হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই। এ সাহিত্যে দৃষ্টি ও সৃষ্টি নতুন হওয়া সত্ত্বেও ভাব-ভাষা-বিষয়-রূপ-রস-নীতি-আদর্শ সবটাই স্থূল, অপরিস্রুত, আবর্তিত ও নিম্নমানের হওয়ার মূলে রয়েছে স্বল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবিত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেঁয়ো মানুষের পরিচর্যা। এখানে দেবতা ও মানুষ হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া রিরংসায় অভিন্ন, ছল-চাতুরী-প্রতারণায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। হর গৌরী দরিদ্রতম গৃহস্থ প্রতীক। বাঙলার শিক্ষিত মনীষার প্রসূন চৈতন্যদেবের জাত-বর্ণ-শ্রেণী দ্রোহী প্রেমধর্ম, আর অশিক্ষিত মনীষার ফসল হচ্ছে পীর-নারায়ণ রূপী 'সত্যের' স্বীকৃতিতে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান নীতির উদ্ভাবন।

আঠারো শতক অবধি বাঙলা সাহিত্যে এই চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিষয়গত আবর্তন-অনুবর্তন সত্ত্বেও মন-মানসের প্রসার ঐ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এমনি করেই ঘটে প্রাচীন যুগের মধ্যযুগে উত্তরণ—প্রাচীনতার সময়োপযোগী কালিক রূপান্তর। যদিও এ সাহিত্যে পরিস্রুত দরবারীজৌলুস ছিল দুর্লভ।

ইংরেজ-প্রভাবে পরিবর্তন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মননে ও আচরণে। কিন্তু তুর্কী-মুঘল প্রভাবে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে সর্বত্র সমভাবেই নড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর সমাজের ভিত। এবং পরিণামে শাস্ত্র আর সমাজও ফাটলে-ভাঙনে হীনবল ও হতগৌরব হয়েছিল। তখনো অবশ্য বসনে-ভূষণে, আচারে-আচরণে বাহ্য প্রভাবটা ব্রিটিশ আমলের মতোই গাঁয়ের চেয়ে শহরে বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট।

৯

বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক উদ্ভবকাল

বাঙলাদেশে জনবসতি কবে শুরু হয়েছিল, ইতিহাস তা বলতে পারে না। আধুনিক সংজ্ঞার জনপদ কবে থেকে গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। আমরা জানি পুণ্ড্রবর্ধন তথা উত্তর বঙ্গ অন্তত মৌর্য শাসনভুক্ত ছিল। আমরা আরো জানি, রাঢ় অঞ্চলে তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর ও জৈন শ্রাবকরা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই অনুপ্রবেশ করে বর্বরপ্রায় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকের পাণিনির কাছে এদেশ অজ্ঞাত ছিল না। ঐতরেয় আরণ্যকে-ব্রাহ্মণে রামায়ণে মহাভারতে এই পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ যখন রয়েছে তখন খ্রীস্টপূর্ব দশ শতকেও বাঙলা দেশের অন্তত রাঢ়-পুণ্ড্র অঞ্চলে যে লোকবসতি ছিল, তা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে। সে-মানুষ কারা? আমাদের মতে অস্ট্রিক। এদের সঙ্গে আর্য-ভারতের পরিচয় ঘটে শাস্ত্র ও শাসনের মাধ্যমে। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত গ্রহণ করেই তারা উত্তরাপথের ভাষা-শাস্ত্র সমাজ-সরকার স্বীকার করে। বাঙালীর আর্যায়ণ সম্ভব হল এভাবেই। মৌর্যরা ও পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ, গুপ্তরা ও সেনেরা ছিলেন বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যবাদী। প্রথমে ধর্মপ্রচার ও পরে দেশ অধিকার কিংবা আগে বাণিজ্য পরে সাম্রাজ্য নীতির বাস্তবায়ন দেখি মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উত্তরাপথের শাস্ত্র সমাজ শাসন সভ্যতা সংস্কৃতির জৌলুস ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশের অনুন্নত অস্ট্রিক মানুষগুলো চিরকালের জন্যে নির্জিত জীবন-জীবিকার শিকার হয়ে রইল। তারাই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বলে পরিচিত ধনে-মনে চিরকাঙাল অস্পৃশ্য দাস এবং দুহাজার আড়াই হাজার বছর ধরে তারাই গৃহপালিত পশুর মতো জীবনযাপনে বাধ্য রয়েছে। এদের কিছু লোক শাসকদের কৃপায় উচ্চবর্ণে ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু হাড়ি, ডোম, চাঁড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, চামার, কুমার, কামার,—এ নাম, এ কাজ এদের কারা দিয়েছিল? সেই শাসক গোষ্ঠীরাই তো? তারা কারা? বিদেশী শাসক ও শোষক। দেশে ছোটলোক কারা—দেশের আদি অকৃত্রিম বাসিন্দা অস্ট্রিক মঙ্গোল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই দাসত্বের ও বঞ্চনার বোঝা বয়ে বেঁচে থাকা গণমানবরা বঞ্চিত ছিল সর্বপ্রকার মানবিক ও মৌলিক অধিকার থেকে। আকাঙ্ক্ষা পোষণের স্বাধীনতা ও মনের আবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না তাদের। তাই হাজার বারোশ বছর ধরে তাদের উচ্চারিত ধ্বনির কোনো নিদর্শন নেই দেশে। তবু তারা ছিল। বাইরে তারা মানবাধিকারহৃত হলেও তাদের অন্তর্লোকে জগৎভাবনা ও জীবনচেতনা ছিল, জাগতিক জীবনে বঞ্চিত ছিল বলেই পারত্রিক জীবনে তারা ভরসা রাখত ঐহিক বাঁচার তাগিদেই। আশা ও প্রত্যাশা ছাড়া তাদের অন্য সম্বল, অন্য পাথেয় ছিল না, —'ভাগ্যই জীবনের নিয়ামক'—এ তত্ত্বে আস্থা না রেখে তাদের উপায় ছিল না। তাই তারা দেব ও দৈব শক্তি নির্ভর। অব্যক্ত সুখ-বাঞ্ছাই তাদের যাদুবিশ্বাসী ও দৈবপ্রতীকে আস্থাবান করেছিল।

বিদেশীর শাস্ত্র-সমাজ ও শাসন-সভ্যতা-সংস্কৃতি বরণ করে সে তার ভাষা হারিয়েছে, হারিয়েছে তার ব্যবহারিক জীনব-পদ্ধতির অনেক কিছুই। কিন্তু ধরে রেখেছিল তার সুপ্রাচীন গোত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার, মনের কোণে জাগিয়ে রেখেছিল তার জন্ম ও জীবনের রহস্য-চেতনার ঐতিহ্য! তাই গুপ্ত শাসনের অবসানে ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্রতা হ্রাস পেল যখন, তখন বৌদ্ধ-পাল শাসনে বৌদ্ধ শাস্ত্রের আবরণে তার সাংখ্য যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র ভিত্তিক সহজযান মত প্রচারে ও আচরণে উৎসাহ পায় সে। সাংখ্য ও যোগ অস্ট্রিক আর মন্ত্র-তন্ত্র মঙ্গোলীয়। এগুলো সুপ্রাচীন ও আর্যপূর্ব কালের। এদের সাধনার ও চর্যার বীজমন্ত্রগুলোর ভাষা ও ধ্বনি দেখেও অনুমান করা চলে এগুলো সুপ্রাচীন। তারা মৌর্যপূর্ব যুগে, মৌর্য-কন্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত ও পাল আমলে সমকালীন ভাষায় প্রকাশ্যে না হোক গোপনে অন্তত তাদের বিশ্বাসানুগ তত্ত্বকথা নিজেদের মধ্যে মুখে মুখে চালু রেখেছিল। পাল আমলে তা রাজকীয় প্রশ্রয়ে আসরে উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করার সুযোগ মেলে তাদের। এমনি করেই সাংখ্যসম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব, যৌগিক দেহতত্ত্ব, তান্ত্রিক দেহচর্যা প্রভৃতি প্রকাশ্যে প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরও প্রভাবিত করে। জগৎ-কারণ অনাদি আদি আদ্যাতত্ত্ব 'মহাযান' নামে, জগৎ-কারণ সূর্য ত্রিশরণের অন্যতম ধর্ম নামে, দেহ-পরিণাম 'শূন্য' বা 'নির্বাণ' নামে, দেহচর্যা হঠযোগ নামে, তেহতত্ত্ব মন-পবনলীলা নামে, দেহাধার 'নীর-ক্ষীর-চন্দ্র-রজঃ-নদী পদ্ম' প্রভৃতি নানা রূপকে অভিব্যক্ত। বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায় প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের প্রতীক। সেন আমলে আবার ব্রাহ্মণ্য হুমকির মুখোমুখি হয়ে এই নির্জিত মানুষেরা পুনরায় আত্মগোপনে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হয়। তখন আবার আদিনাথ-চন্দ্রনাথ-শিবরূপে, আদ্যাশক্তি—তারা মহামায়া কালীরূপে, বৎসলা—বাশুলী রূপে, জাঙ্গুলী—মনসা রূপে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী রূপে, বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায়-শিবা-উমা, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী এমনকি বৈষ্ণবরূপী সহজিয়াদের রাধা-কৃষ্ণ রূপে এবং বৌদ্ধ চতুষ্পদ্ম—ষড়পদ্ম রূপে, কায়—চক্র রূপে নবব্রাহ্মণ্য সমাজেও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে দেশী মুসলিম সমাজেও ঐ যোগ-তন্ত্র সূফী চর্যার আবরণে আরবী-ফারসী পরিভাষা গ্রহণ করে চালু রইল। চতুষ্কায় তখন লতিফু, কশিফু, ফানা ও বাকা নামে, পদ্ম 'লতিফা' নামে, বজ্র বা বীর্য 'শির' নামে, রাকিনী, শাকিনী প্রভৃতি জিব্রাইল, মিকাইল নামে পরিচিত হতে থাকে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাই বলেন :"(আদিবাসীর) এই আদিমতম ধর্ম-কর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা"।

পাল আমলের গোড়ার দিকে এই তত্ত্ব-সাহিত্য বৌদ্ধ সংস্কৃতে প্রাকৃতে অবহট্‌ঠে রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে দেশান্তরেও প্রচারিত হয়। সম্ভবত সেন আমলে স্বদেশে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐসব পাণ্ডুলিপি স্বদেশে লোপ পেলেও নেপালে-তিব্বতে মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ সমাজে মূল ভাষায় ও অনুবাদে ধ্বংসাবশেষেও কিছু রয়ে গেছে। অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত 'চর্যাগীতি' ঐ সাহিত্যের অন্যতম।

তুর্কী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ্য হুকুম ও হুমকিমুক্ত হয়ে নির্জিত বাঙালীরা তাদের জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে প্রকাশ করতে থাকে উপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, ও তত্ত্বকথা রূপে। ধর্মপূজাবিধান, শূন্যপুরাণ, অনিলপুরাণ, এবং ধর্মঠাকুরের, মঙ্গলচণ্ডীর, বাসুলীর, জাঙ্গুলীর, যক্ষে, আদিনাথ-মীননাথ-গোরক্ষনাথের, কানুফা-হাড়িফার কথা আর জীবন-জিজ্ঞাসার রূপক যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল মাহাত্ম্য কথা ও তান্ত্রিক সাধনার কথা আসরে আসরে, পূজামণ্ডপে, পার্বণিক উৎসবে নাচ-গান-বাজনার মাধ্যমে গায়েন কথকরা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করতে থাকে। যারা এ তত্ত্বসাহিত্য রচনা ও প্রচার করত সেই অস্ট্রিক-মঙ্গোলরা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধরূপে এবং বৌদ্ধবিলুপ্তির পরে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রূপে—এমনকি বিভিন্ন নামের বাউল ও সূফী রূপে দেশী মুসলিমরাও তা করত। লক্ষণীয় যে গীতা-স্মৃতি-পুরাণের আদর দেশী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে কমই ছিল। আজো বাঙালী হিন্দুরা দেশজ লৌকিক দেবতার পূজারী, যাঁদের খবর মেলে না গীতা স্মৃতি সংহিতায়। ষোল শতকের কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর সমকালীন রাঢ় অঞ্চলের হিন্দু সমাজের 'ধর্ম-কর্মের' ফিরিস্তি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছেন :

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জন
(দুর্গা) পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহুধন।
বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত।

উত্তর বঙ্গেও তখন অবৈদিক ধর্মের প্রচার প্রবল :

উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য-মাংস মৎস্য মাস মুদ্রাতে সাধন
কামাখ্যার ব্রত মহীপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব
ভোট কম্বল চট পরিধান সব। (নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার)

এ সূত্রে উল্লেখ্য যে বৈদিক কর্মকাণ্ড কিংবা ঔপনিষদিক তত্ত্ব এদেশে কখনো জনপ্রিয় হয়নি। গীতা স্মৃতি সংহিতার প্রভাব ব্রাহ্মণের মধ্যেই ছিল সীমিত; আর বিদেহ-উদ্ভূত উপনিষদের অনেক তত্ত্বে সাংখ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য অনেককাল স্থান ছিল। এখানে আদিনাথ মীননাথ গোরক্ষনাথ হাড়িফা কানুফা ময়নামতী মানিকচাঁদ তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কথা লেখকের জীবনজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাত। নাথযোগী (তাঁতীরা), ধর্মপূজারী, বাউল সহজিয়া ও শৈব গোরক্ষপন্থী বৈরাগীরা আজো এক হিসাবে সনাতন তথা আদিবাসী অস্টিক মঙ্গোলের মৌল ধর্মপন্থী ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ-এগারো শতক থেকে প্রসারমান ব্রাহ্মণ্যমতের প্রভাবে লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী এবং দশ-এগারো শতকে রচিত নানা পুরাণ কথাও বাঙলাদেশে চালু হল—এগুলো আসরে আসরে নাচ-গান-বাজনা সহযোগে গায়েন-কথকরা প্রচার করে বেড়াত। এভাবেই একটা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমশ দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের মধ্যেও প্রাচীন তত্ত্ব প্রকট ও প্রচ্ছন্নভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে—একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। মনসাবিজয় ও পদ্মাপুরাণে তাই আমরা যথাক্রমে ধর্ম-নিরঞ্জন ও কামরূপ কামাখ্যার ডাকিনীযোগিনীর উল্লেখ পাই। সেন আমলে যা ছিল গুপ্ত আচারের ও অন্তরঙ্গ আলাপের বিষয়, তুর্কী আমলে তা প্রকাশ্য চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং পনেরো শতকের গোড়ার দিকে কিংবা চৌদ্দ শতকের অন্তিম পাদে তা লিখিত রূপ পেতে থাকে মুখ্যত গায়েন-কথকের স্মৃতি-সহায় রূপে। রামাই পণ্ডিত, ময়ূর ভট্ট, মানিক দত্ত, কানা হরি দত্ত, মানিক গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম তাই আমরা বিভিন্ন শাখার বিলুপ্ত রচনার আদি কবি হিসেবে উল্লেখিত দেখতে পাই। মৌখিক রচনাও বহু মুখের পরিচর্যারও পুনরাবৃত্তির ফলে রাগে ছন্দে অলঙ্কারে ও কলেবরে স্থানিক ও কালিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে অব্যবহিত পরেরকার বলে স্বীকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসাবিজয়, পদ্মাপুরাণ, গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালীর ভাষিক উৎকর্ষে, ছান্দসিক লাবণ্যে, রাগ বৈচিত্র্যে, কাহিনীর জটিল বিস্তারে ও বিদেশী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং অনুবাদ সৌকর্যে। বাঙলা নিরক্ষর নির্জিত বাঙালীর বুলি বলেই লিখিত বাঙলা সেন আমল অবধি চালু হতে পারেনি। সংস্কৃত প্রাকৃত অবহট্‌ঠ ও অর্বাচীন অবহট্‌ঠই ছিল রচনার বাহন। সংখ্যাগুরু নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষের লোকায়ত ভাব ভাবনারই প্রথম প্রকাশ ঘটে স্বশ্রেণীর নিরক্ষর কিংবা সাক্ষর লোককবি ও গায়েন-কথকের মুখে এবং সংখ্যালঘু কায়স্থ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গণদাবী প্রতিরোধ কিংবা অস্বীকার করতে পারেনি বলেই, ব্রাহ্মণ্য মত ও বর্ণের অভিমান ত্যাগ করে ওদের হয়ে ওদের চিন্তা-চেতনার কথা প্রচার করতে থাকে। আর যেহেতু তারাও দেশজ ব্রাহ্মণ্যবাদী, সেহেতু অবচেতন আনুগত্যে ও বিশ্বাসে তারাও ঐ তত্ত্বে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। রেওয়াজ বা ঐতিহ্য ছিল না বলেই বাঙলাকে লেখ্যরূপ দান চৌদ্দ শতকের আগে সম্ভব হয়নি। এবং লেখা শুরু যখন হল, তখনো দেবাদেশের দোহাই উচ্চারণ করেই দ্বিধা-সংকোচ-নিন্দা এড়াতে হল। স্থানীয় ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ্য কিংবা রাজকীয় প্রশ্রয় অথবা শ্রদ্ধা থাকলে সেনরাজ দরবারে বাঙলা কবি দেখা যেত কিংবা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বা 'সুভাষিত রত্নকোষে'র মতো বাঙলা প্রবাদ প্রবচন ও প্রাচীন কবিতার সংকলন গ্রন্থও মিলত। শেখ শুভোদয়া ধৃত বাঙলা আর্যা লিখিত চর্চার অভাবই নির্দেশ করে।

আমরা জানি মৌখিক রচনা মাত্রই জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে ভাষা বদলায়, কাজেই আজো প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ডাক-খনার বচন মূলত সুপ্রাচীন কালের হলেও ভাষার ভঙ্গিতে অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে। সেই রূপান্তর স্থানিক এবং কালিক। তাই 'খনা ডেকে বলে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান' 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' অথবা 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' বা 'আপন মাংসে হরিণ জগৎ-বৈরী' —ভাষা একালের।

কাজেই হাজার বছর আগেকার মৌখিক বাঙলা রচনার যে-কিছু ভাষায় আজো টিকে রয়েছে সেগুলোর (কয়েকটি শব্দের ব্যতীত) ভাষাতাত্ত্বিক কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু ভাষান্তরেও বর্ণিত বিষয়ধৃত দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি হারিয়ে যায় নি। তাই ভাষা যা-ই হোক, রচনা হিসেবে গোরক্ষনাথ মীননাথ হাড়িফা কানুফা ময়নামতী-মানিকচাঁদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপীচাঁদ কাহিনী, শূন্যপুরাণ-ধর্মপূজাবিধান, পালগীতি প্রভৃতি হাজার বছরের পুরোনো। এগুলো যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ সমাজের তাতে সন্দেহ নেই। নাথসাহিত্য বঙ্গ-সমতটে সৃষ্ট এবং ধর্মসাহিত্য রাঢ় অঞ্চলের দান।

পনেরো ষোল শতকে লিখিত পাঁচালী পাবার আগ পর্যন্ত ধর্মগীতি, চণ্ডীগীতি, মনসাগীতি রাধাকৃষ্ণ কথা, ভারত কথা, রামায়ণ গীতি প্রভৃতি যে আসরে আসরে গীত হত তা আমরা অনুমান করতে পারি। তাছাড়া সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সাহিত্যও লোকমুখে বর্ণিত হয়ে লোকশ্রুত ও পুনরাবৃত্ত ছিল—এ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

অতএব বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক উদ্ভবকাল দশ-এগারো শতক। এ সাহিত্য লোকধর্ম ও জীবনকে অবলম্বন করে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে। এগুলো একাধারে লোক ও লোকায়ত সাহিত্য। জনে জনে স্থানে স্থানে ও কালে কালে এগুলোর ভাষিক রূপান্তর যেমন হয়েছে, কলেবরেও তেমনি শীত হয়েছে। পরবর্তী কালের লিখিত পাঁচালীতেই বিবর্তন রুদ্ধ হয়ে সব কিছু স্থিতি ও স্থায়িত্ব পেয়েছে। এমনি বহু রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, গান, গাথা ও প্রবাদে-প্রবচনে-ছড়ায় বিবৃত জ্ঞানকথা কখনো লিপিবদ্ধ হয় নি এবং কালান্তরে লোপ পেয়েছে। মৌখিক রচনা তথা লোকসাহিত্য কেবল চিত্তবিকাশের অবলম্বন ছিল না, লোকশিক্ষারও বাহন ছিল, জৈবিক নৈতিক জীবনাচরণ, ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনাচরণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীসম্পৃক্ত জ্ঞান দানই ছিল প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া-কিংবদন্তী-রূপকথা প্রভৃতির লক্ষ্য। মানুষ সবাক প্রাণী। অনুভূতি ও চিন্তাশীলতা তাকে অবাধ বাঙ্ময়তা দিয়েছে। কাজেই মানুষ মাত্রেরই জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা ভাষায় অভিব্যক্ত হয়। অতএব দশ থেকে চৌদ্দ শতক—এই পাঁচশ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় লোকায়ত বিষয়ে মৌখিক লোকসাহিত্য সৃষ্টি ও লয়ের মাধ্যমে চালু ছিল। এই মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমেই বাঙলাবুলি লেখ্য ভাষার ও শিল্পসুন্দর সাহিত্যের বাহন হওয়ার মতো উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই প্রথম লিখিত রচনাতেও আমরা রাগে-ছন্দে-অলঙ্কারে সজ্জিত ভঙ্গিসুন্দর প্রাঞ্জল ভাষা প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য, মৌখিক রচনা মূলে ব্যক্তি বিশেষের রচিত হলেও বহু মুখের উচ্চারণে তা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে নির্বিশেষ জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক অবদান হয়ে দাঁড়ায়। তাই এগুলো গণরচনা বা লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। এবং মৌখিক রচনার ভাষা সাধারণত আঞ্চলিক।

১০

বাঙলা ভাষার ও রচনার লিখিত নিদর্শন

পাল আমলে বাঙলা বুলি তথা ভাষা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। কখনো স্থানিক ও আঞ্চলিক বিকৃতিবহুল অর্বাচীন অবহট্‌ঠই লোকমুখে চালু ছিল। এ অর্বাচীন অবহট্‌ঠ মাগধী প্রাকৃতেরই বিকৃত বিবর্তিত রূপ। কিন্তু লিখিত শিষ্ট পালি ও শিষ্ট প্রাকৃত মধ্যদেশীয় (যা শৌরসেনী নামে অভিহিত) ভাষা। সংস্কৃত নাটকে ও অন্যত্র ছোটলোকের বুলি হিসেবে মাগধী প্রাকৃত এবং গানের ও কবিতার বাহনরূপে মারাঠী প্রাকৃত ব্যবহৃত হলেও, শিষ্টজনের ভাষা চিরকাল শৌরসেনী বুলিই ছিল। কোন কোন বিদ্বানের মতে পালিও সংস্কৃত শব্দবহুল শৌরসেনী। বৌদ্ধ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাস্ত্রকথা সুবোধ্য করবার জন্যে বৌদ্ধ শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রবিদরা এই কৃত্রিম শৈলী অবলম্বন করেছিলেন। উল্লেখ্য পালি কেবল হীনযানী (পরে থেরবাদী) বৌদ্ধদেরই শাস্ত্রীয় ভাষা, মহাযানী বিজ্ঞানবাদীদের নয়। মহাযানীরা প্রাকৃত মিশ্রিত সংস্কৃতে এবং শৌরসেনী প্রাকৃতে-অবহট্‌ঠেই শাস্ত্র সংকলন ও আলোচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলেও (বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসামে) লেখ্য শিষ্ট ভাষা হিসেবে প্রথমে শৌরসেনী পালি, পরে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহৃত হত। তাই অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত চর্যাগীতির ভাষাও স্থানিক বিকৃতিবহুল শৌরসেনী অবহট্‌ঠই এবং আমাদের বাঙলার বাকপদ্ধতি তথা বাক্যগঠনরীতিও সেই শৌরসেনী অবহট্‌ঠ ভিত্তিক—আঞ্চলিক তথা মাগধী প্রাকৃতজ গৌড়বঙ্গ মাগধী অবহট্‌ঠ নয়। মাগধী প্রাকৃতে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে স্থিত ব্যঞ্জন ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে বিবর্তন বিকৃতি ও বিলোপতত্ত্বের এবং কারকচিহ্নের আলোকে চর্যাগীতির কিংবা প্রাচীন লিখিত বাঙলার শব্দ, উচ্চারণ ও বাকরীতি যাচাই করা হলে আমাদের ধারণা সমর্থন পাবে। লিখিত বাঙলায়, মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তন ধারার লক্ষণ দুর্লভ দেখেই ডক্টর শহীদুল্লাহ 'গৌড়ী প্রাকৃত ' তত্ত্বচালু করেছিলেন।

বাঙলা বুলির প্রাচীনরূপ প্রকট হয়ে ওঠে দশ শতকে এবং শ্রুতি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে অনন্যতা লাভ করে এগারো শতকে এ অনুমান একান্তই কাল্পনিক নয়। উড়িষ্যা-বাঙলা-মিথিলা-আসামের তথা পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের লেখ্য অর্বাচীন অবহট্‌ঠে লিখিত চর্যাগীতি এর অন্যতম প্রমাণ। গীতিগুলো ঐ চার অঞ্চলের কবি রচিত। এগুলো রচনাকালে উড্ডিয়ানা-নালন্দা-সোমপুরী বিহারের প্রভাব সমাজে ত্ত ান ছিল বলে মনে করি। বাঙলা বুলিরূপ মাগধী অবহট্‌ঠের বিকৃতিপ্রসূত হলেও, লেখ্য বাঙলার আদর্শ ছিল লেখ্য অর্বাচীন অবহট্‌ঠ তথা শৌরসেনী অবহট্‌ঠ যাতে সরহ কানুফা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বানেরা শাস্ত্রিক দার্শনিক গ্রন্থ এবং দোহা ও গান রচনা করেছেন। তাই প্রাচীন বাঙলা রচনার নমুনায় স্থানীয় বুলির প্রভাব সামান্য এবং সংস্কৃত শব্দগ্রহণের আগ্রহ প্রকট।

বিভিন্ন বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাঙলা শব্দের ও ছড়ার বা পদের সাক্ষাৎ মেলে। এ-সব গ্রন্থের রচনা কিংবা সংকলন কাল বা লিপিকাল বারো থেকে চৌদ্দ শতক।

ক. শেখ শুভোদয়া : এটি ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ্যসর্বস্ব নামের স্মৃতি সংকলক হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী নামের দরবেশের মাহাত্ম্যকথা এতে বর্ণিত। কাহিনী বর্ণনা সূত্রে বাঙলার কয়েকটি আর্যা (ছড়া), গান এবং সংলাপাংশ বিধৃত রয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 'সেগুলির ভাবে ও ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার রেশ অনুভূত হয়....(হঙ যুবতী পতিয়ে হীন পদে) নামক্রিয়া পদে প্রাচীনত্ব লক্ষণীয়।'—হঙ, পতিয়ে, কাজ, সিনাইবাক, মুঞি জাঙ, গেইল, (বা. সা. ই. পৃঃ ৩২৭-৮০)। এ গ্রন্থে বিদেশী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে—কাজি, খাতক, জাহাজ, চাবি, নমাজ প্রভৃতি। বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নমুনা

১. হঙ জুবতী পতিএ হীন
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন ॥
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ুর ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ ॥
ছাড়ি দেহ কাজ্জ মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় ॥
হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥
বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ ॥
পুন পুন পাএ পড়িয়া মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।
শ্রীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ আনল ॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রাণ ন জায় গেল বহিঞা ভার ॥
নয়ান বহিঞা পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পালাএ ন ভীতি ॥ —ভাকিনীদ্বয়

২. মকদম সেক সহজলাল তবরেজ তব পাদে করো পরনাম
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম।
বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান ॥
—বণিক

৩. বনের শাক খায় সেক বনের গোনা।
ঝিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা ॥ —ভাট

৪. শ্রীমল লক্ষ্মণ সেন মহাবীর।
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।
শ্রী লক্ষ্মণ কি রাজা বড় বীর।
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর ॥ —ভাট ও মদন

৫. কবে কেন?
যবে যেন।

খ. চর্যাগীতির মুনিদত্তকৃত টীকার উদ্ধৃত চারটি পদাংশও বাঙলা বলে দাবি করা যায়। মুনি দত্তের 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'-র টীকা চৌদ্দ শতকে রচিত বলে অনুমিত হয়। নাড়পাদের সেকোদ্দেশটীকায় ও ভুসুকুর 'চতুরাভরণ'-এ উদ্ধৃত কিছু রচনাংশকে বাঙলা মনে করা হয়। চর্যাপদাবলীর ভাষা যদি অর্বাচীন অবহট্‌ঠ হয়, তাহলে এগুলোও অবহট্‌ঠ, —বাঙলা নয়।

১. কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা। —মীননাথ

২. সে তেতীসেঁ ন বত্তীসেঁ
এতিঅ মণ্ডল নাহি বিশেষে। — অজ্ঞাত

৩. ঘাট ন গুম্মা খড়তড়ি বোহঅ
অক্ষি বুঝিআ মাগ চালী। —ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. নাগপাদ রচিত সেকোদ্দেশটীকায় কাহ্নর একটি, শান্তির চারটি ও শবরের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রাপ্ত টীকার লিপিকাল ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ। পদগুলো বাঙলা ভাষায় রচিত বলে অনুমিত।

১. বামে দাহিনে শুম ঘাট।
ভনই কাহ্ন আন্তরালেঁ বাট ॥ —কাহ্ন

২. অম্বর ফুলিলা মাকাএ অপতিঠাণ গরুআ
ভাবাভাব বিমুক্কা রে সকলই সুদ্ধ সরুআ।
চিন্তা চিন্তনে পোহাই গেলি রাতী
দীবা জালী বাট চাহন্তি শান্তি ॥ —শান্তি

৩. উইঅউ রে ভূসুকু তারা।
শান্তি ভনই পোহান্ত পহারা ॥ —ঐ

৪. কীস কএলেক অবভুআ
চান্দ সুজ্জ বান্ধি জালিলিক দীপা।
হসই শান্তি সঅ আপন করী সখী
আকাস বিআঅল দেখী ॥ —ঐ

৫. অপূর্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরে অম্বর ফলই ফুল্লই।
তোড়িঅ হাথে ন চাহিঅই বিরহেঁ করেই ॥ —শবর

ঘ. 'চতুরাভরণ' ভুসুকু রচিত এক মহাযানী চর্যাগ্রন্থ। নেপাল থেকে পুথিটি সংগৃহীত। কোলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল'-এর পুথিশালায় রক্ষিত, লিপিকাল ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দ।

১. অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অক্ক।
হেটঠ কমর করি শয়ন থক্ক ॥
সুজ চাপ্পি শশি সমরস জাই।
রাউতু কেলে জর-মরণ নাই ॥
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্যাহ।
সুরকায় ছাড়ি ন যাই ॥
সো দূর যোগীএ ন জানিহ খোজ।
গুরু নিন্দা করি যোগ ॥

২. রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ, বেণি বাট বহন্ত
তোড়হ সমন্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগ ন জগফলা খায়॥

ঙ. মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ। এটি চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের আগ্রহে ১১২৯ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত। 'গীতিবিনোদ' নামের সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক অধ্যায়ে উদ্ধৃত কোন কোন পদাংশ বাঙলা বলে অনুমান করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কার্তবীর্যা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিয়া পরশরামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।" (যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বাহুস্পর্শে কার্তবীর্য খণ্ডিত করে জয় করেছিলেন, সেই পরশুরামদেব আমার মঙ্গল করুন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. হেমচন্দ্র কর্তৃক বারো শতকে সংকলিত 'দেশীনামমালা' গ্রন্থের কিছু শব্দে বাঙলার আদল প্রত্যক্ষ করেছিলেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

অলট্টপলট্ট-উল্টাপাল্টা	ঝাড়-ঝাড়
উত্থল্ল-পত্থল্ল-উথাল পাথাল	ঝাড়ী-ঝড়
টিপ্পনী-টিপ	ডালী-ডাল
টুংটো-ঠুটো	ডোলা-ডোলা
ডলো-ডেলা, ঢেলা	ঢংকনী-ঢাকনী
কাট্টারী-কাটারী	ঢংঢল্ল-ঢলঢলে
খড়-খড়	থরহরিয়-থরহরি
খড়ক্কী-খিড়কী	ধন্ধা-ধাঁধা
খলী-খোল	ফগণ্ড-ফাণ্ড
গঢ়-গড়	বল্লা-বোলতা
চট্ট-চাটু	বিহান-বিহান
চাউল-চাউল	রোল-রোল
চিল্লি-চিল	হড্ড-হাড়
চুড়ো-চূড়াঁ	হেলা-হেলা
ছিনাল-ছিনালী/ছিনাল	ছিবই-ছোঁয়া
জড়িত-জড়িত	ঝলঝলিয়া-ঝলমলে
ঝলসিঅ-ঝলসানো	ঝলা-ঝলা

ছ. ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ রচিত 'টীকাসর্বস্বে' প্রায় তিনশোর মতো বাঙলা শব্দ মেলে বলে বিদ্বানদের ধারণা।

উআরী-কাছারি	তেলাবনী-তেলন, হাঁড়ি	জুমাল-জুয়াল
ওসার-ওসার	নেবালী-নবমল্লিকা	ঝম্পান-ঝাঁপান
কিঞ্চোহি-কেঁচো	পরসু-পরশু	শিহড়-শিকড়
খড়কি-খিড়কি	পেড়া-পেটরা	হাথইড়া-হাতুড়ি
খলি-খইল	ফরিঙ্গ-ফড়িং	হেন্ট-হেট
ঘাঘরী-ঘাগরী	ফোড়-ফোড়া	চাল-চাল
বাদিয়া-বেদে	চিড়া-চিড়া	বোন্ট-বোঁটা
তেলাকোচ-তেলাকুচা	বেঙ্গ-ব্যাঙ	

জ. ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'চৈনিক-সংস্কৃত' অভিধানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কিছু বাঙলা শব্দের সন্ধান পেয়েছেন।

আইশ-এসো	খট-খাট
পর্হন-পরা	ভতার-ভাতার
বসন-বসা	মইস-মহিষ
মোট্ট-মোটা	মুগ-মুগ
এহ-এই	হট-হাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ. এ ছাড়া প্রাচীন পট্টোলী-অনুশাসনেও কিছু বাঙলা শব্দ মেলে :

আঢ়া-আড়ি	জঙ্গাল-বাঁধ, আল
খাড়ী-খাড়ী	জোল-নাল
খিল-পতিত জমি	নাল-চাষের জমি

বরজ-বরোজ

১১

বাঙলা ভাষার বিবর্তন ধারার নমুনা

অলিখিত রচনার ভাষা কখনো অবিকৃত থাকে না। স্থানে স্থানে, কালে কালে, মুখে মুখে তা বদলায়। এ জন্যে মূলত ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও তথা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা বা প্রজ্ঞাপ্রসূত হলেও রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, গান, গাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত যা কিছু আজ অবধি চালু রয়েছে, সে সবের কোনটারই ভাষা উদ্ভবের বা রচনার সমকালের নয়। ডাক-খনার বচনরূপে আজো যা চালু রয়েছে সেগুলোর ভাষাও আমাদের সমকালের রূপপ্রাপ্ত। তবু দীনেশচন্দ্র সেন-বিধৃত কয়েকটি প্রাচীন রূপের নমুনা দেবার চেষ্টা করছি। ডক্টর দীনেশ সেনের মতে ডাক-খনার বচনের উদ্ভবকাল আট থেকে বারো শতক।

ক. ডাকের বচন :

১. আদি অন্ত তুঝসি
ইষ্ট দেবতা জেহ পূজসি
মরণের যদি ডর বাসসি
অসম্ভব কভু না খায়সি।

২. বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড
আগল হইলে নিবারিব তুণ্ড

৩. জন্ম মাত্র বলে ডাক
পো এড়িয়া পোয়াতি রাক
ধুইয়া পৌঁছাআ দিহ কোলে
যবে ফুল নাম্বিবেক ভালে
নাড়ি ছেদিয়া দিহ জয়
ডাক বলে এই হয়।

৪. যাহার বহু ঝি দূর জান্তি
তাহার নিকট বসে অসতী
ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে
অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে
ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়
বলে ডাক এ নারী ঘর উজার।

খ. খনার বচন :

১. আষাঢ়ে কাড়ান নামকে
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে
ভাদরে কাড়ান শীষকে
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

২. আঘনে পৌটি পৌষে ছেঁউটি
মাঘে নাড়া ফ্রুনে ফাঁড়া।

৩. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে ভাত
তার ভাগ্যে হাভাত।

গ. রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ

'শূন্যপুরাণ' যে বৌদ্ধ যুগের তথা বৌদ্ধবিলুপ্তির আগেকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যে ষোল-সতেরো শতকের দিকে লিখিত রূপ পেলেও 'শূন্যপুরাণের' ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনতার ছাপ রয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. দুআরিরে ভাই ধর গিআ তুহ্মার দণ্ডর নন্দন।
পশ্চিম দুআরে দানপতি যাঅ।
সোনার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
বসুআ আপুনি আইল সেইত বরণর চনা
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি।
চন্দ কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা।

২. ধর্ম হৈল যবনরূপী মাথাএত কাল টুপী
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিআ এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখের বলে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যে একমন
আনন্দে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদণ্ড হৈল শূলপাণি।
গনেশ হৈল গাজী কার্তিক হৈল কাজী
ফকীর হৈল যত মুনি ॥

AMARBOI.COM

ঘ. শেখ শুভোদয়া

হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ বারো শতকের শেষ দশকে বা তেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত বলে মনে করি। সংস্কৃতে লেখা এ গ্রন্থেও কিছু বাঙলা আর্যা ও কবিতা আছে।

যেমন—

১. (ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে)
হঙ জুবতী পতি এ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন ॥
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ ॥
ছাড়ি দেহ কাজ্জু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় ॥
হাত জোড় করিঞা মাঙো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥

ঙ. প্রাকৃত পৈঙ্গল।

পিঙ্গল রচিত ছন্দশাস্ত্রের এই গ্রন্থ চৌদ্দ শতকের। এতে অপভ্রংশ বলে উদ্ধৃত কিন্তু বাঙলার লক্ষণাক্রান্ত একটি গান মেলে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ তরণি তরই ধরণি
পবণ বহু খরা।
নগ-নগি জল বড় মরু থল
জন-জীবন হরা ॥
দিসই বলই হিঅঅ দুলই
হমি একলি বহু।
ঘর নহি পিঅ সুনহি পহিঅ
মন ইচ্ছই কহু ॥

চ. ময়নামতী মানিকচন্দ্র গোপীচাঁদের গাথা। এ কাহিনী সমতটে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আমলের। কুমিল্লা জেলার লালমতী, ময়নামতী পাহাড় এখানো রয়েছে, শালবনবিহার ও রাজবাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত গোবিন্দচন্দ্রদেবই 'গোপীচাঁদ' রূপে গাথায় পরিচিত। যোগতান্ত্রিক সিদ্ধির মাহাত্ম্য প্রচারই নাথ সাহিত্যের লক্ষ্য। মুখে মুখে নাথ-গাথা আজো চালু রয়েছে। এই শতকে সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিতও হয়েছে। তার আগে অবশ্য 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' লিখিত পাঁচালীর রূপ পেয়েছিল ষোল সতেরো আঠারো উনিশ শতকে। আমরা দীনেশ সেন সংগৃহীত লোকগাথার কিছু অংশ 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত করছি। যদিও এই গাথার উদ্ভব চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্র ও রাজমাতা ময়নামতীর সমকালের অর্থাৎ দশ শতকের। [কেননা ইতিহাস বিহীন সেই যুগে দীর্ঘ সময়ের পরে আধুনিক নাটক উপন্যাসের মতো মুদ্রিত ইতিহাস দেখে পুরা কাহিনী নিয়ে গাথা রচনা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সব বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেত] এবং ভাষা স্থানিক ও কালিক রূপান্তর পেয়েছে, তবু ভাষার মধ্যে (এবং কাহিনীর মধ্যেতো বটেই,) প্রাচীনতার কিছু ছাপ রয়ে গেছে।

তু যে মহাগরু সেবা করিলাহুঁ বাবুঁ।
কর্ণে মন্ত্র পাই খিলে কারণ পাইবু ॥
তারই মারই গুরু বচন প্রমাণ।
গুরু সেব্য কলা লোক লভন্তি কারণ ॥
যার সেবা নাহি গুরু পশু বলি তাকু।
গুরুর আজ্ঞাএ মোক্ষ হুঅই পিণ্ডকু ॥
পিতা-মাতা ঠারু গুরু বড় বলি জান।
মন দৃঢ় করি খট শ্রীগুরু চরণ ॥
শিষ্য পুত্র হোই সেবে গুরুকো আশ্বাসী।
দুই বল লাগি মধ্যে রো ভেলা ভাসী।

ছ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত এবং বাঙলা ভাষায় প্রাপ্ত লিখিত সাহিত্যের প্রাচীনতম ও অকৃত্রিম নিদর্শন বলে স্বীকার করা হয়। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে এ গ্রন্থ রচিত বলে অনুমিত। এটি মূলত গায়েনের মুখ নিঃসৃত গীতিনাট্যের লিখিত রূপায়ণ। তাই বোধ হয়, এর ভাষায় আঞ্চলিক বুলির কিছু ছাপ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুই কুচ লুলে ॥

২. চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দঘোষ মাঅ যসোদা।
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥
সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ।
জুড়িএ আগুন তাপে
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥

জ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর আমলে (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) রচিত বলে নানা প্রমাণে ও অনুমানে আমরা বিশ্বাস করি।

শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য (আনুঃ রচনাকাল ১৩৮৯-১৪১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে)

বনের অন্তরে যাই চলে ভ্রাতৃগণ।
ইছুফক প্রহার করিতে হইল মন ॥
কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেতে মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বুলি কর্ণ মোচরিল ॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপড়।
একে একে কাড়ি লইল গায়ের কাপড় ॥
কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে ॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়ে ফেলে একপাশে।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ ॥
সেহো ভাই নিদয় হৃদয় লইয়া মারে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত বস্ত্র কাড়ে ॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাহি সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি ॥

গদ্যের নমুনা :

১. ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজ (আসামরাজ) চুকামফাস্বর্গদেবকে লিখিত পত্রাংশ : লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমরা এগোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুম সর্দ্দার উদ্ভও চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

২. ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে (১৫৫৩ শকাব্দে) গৌহাটির ফৌজদার নওয়াব আলেয়ার খান কর্তৃক আসাম রাজাকে লিখিত পত্রাংশ :

স্বস্তি বিবিধ গুনগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।

৩. একটি চুক্তিপত্র—১১০৩ সালে বা ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত :

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহদাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর খ রিক্রি সকরাত ২ দুই রূপাইয়া করিয়া আরত দালালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম সন ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান"।

সতেরো শতকে লিখিত বাঙলায় পাট্টা, ব্যক্তিগতপত্র , ভূমিউৎসর্গপত্র, ব্রহ্মোত্তরশাসন, দাসবিক্রয়, ভূমিবিক্রয়, স্মারকপত্র, খারিজপত্র, অঙ্গীকারপত্র প্রভৃতি পঁচিশ খানা পত্র রয়েছে ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সংকলিত 'পুরোনো বাংলা দলিলপত্র' গ্রন্থে (ঢাকা ১৯৯১ সন)।

৪. ১১৮৫ সালে তথা ১৭৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত অভিযোগ বা আবেদন পত্র :

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশতী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মাল গুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুঁচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবী

জগতধির রায়।

৫. **"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'** (১৭৩৫ সনে রচিত ১৭৪৩ সনে লিসবনে মুদ্রিত)

গুরু। অপূর্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরানীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরানীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরানীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন। পৃঃ ৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (১৭ শতকের শেষপাদে রচিত)

"ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমন করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।"

৭. একখানা অবৈষয়িক পত্রাংশ : (১৭৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত)

৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ সকাব্দা ১১৭৫ ॥ তাং ১৭ বৈশাখ ॥

বৈকালিক নিদ্রা হইতে উঠিয়া কৃষ্ণরাম গোবিন্দ স্মরণ করিলাম ২৩ চন্দ্র শর্মা দ্বারে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন তোমার এটা কষ্ট কল্পনা ২ বার কহিলেন এবং হাস্য করিলেন শুনিলাম উত্তর করিলাম না।

১৯ রোজ এক পয়ার চাহিলাম কহ লিখি তাহাতে বড় বেজার হইলেন এবং মুক নামিয়া কহিলেন আমিহ দেখিয়া পুথি বান্ধিলাম ক্ষনেক পরে কহিলেন পাঁচজন একত্রে বসিয়া হাঁসিয়া একারণ মিছে

আর কিছু নহে শুনিলাম উত্তর করিলাম না পরে ২৫ পচিসা রো [কু] সরকারে [র] সহিৎ বৈকালিক গ্রন্থ লৈয়া করিতেছিলেন" (ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃ, ৭০)

৮. সাহিত্যের গদ্য : মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র (আঠারো শতক)

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনবতি সোড়ষ বরিষ্যা সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্যনদ যুগ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিম বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পণ করিয়াছে রাত্রের মধ্যে যে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।....একখাটে কন্যা সোয়ে একখাটে রাজপুত্র সোয়ে। যে রাজপুত্র জেমন ঙ্গানবান হয়, সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠে ঃ রাজপুত্র ঃ ঘরে জায়।

[৭ সংখ্যক ব্যতীত সব উদ্ধৃতি সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে নেয়া।]

১৮-১৯ শতকের য়ুরোপীয়দের লিখিত বাঙলা গদ্যের নমুনা দেয়া এ-ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কেননা, বাঙালীরা ওদের গদ্যকে আদর্শ করেনি।

তবু কৌতূহলী জিজ্ঞাসু পাঠক ১৮-১৯ শতকের বাঙলা গদ্য সম্বন্ধে সবিশ্লেষণ তথ্য পাবেন জহরলাল বসুর, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের, সজনীকান্ত দাসের, সুকুমার সেনের বাঙলা গদ্য বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বিশেষ করে আনিসুজ্জামানের 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (১৯৮৪), গোলাম মুরশিদের 'কালান্তরে বাংলা গদ্য' (কলি ঃ ১৩৯৯ সন) গ্রন্থে। এ সব গ্রন্থে বাঙলা গদ্যের বিবর্তনধারা বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। হাজার বছর ধরে বাঙলা ভাষা শব্দে, বাকে-বাক্যে ও ভঙ্গিতে বিদেশী ভাষার প্রভাবে ঋদ্ধ হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

১

চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা

বৌদ্ধ বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্র, সাহিত্য এবং ঐতিহ্যেরও বিলুপ্তি ও বিস্মৃতি ঘটে। মাত্র শতোর্ধ্ব বছর আগে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা [জার্মান পণ্ডিত ইউজেন বুনফ (১৮৪০ সনে) বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা পথিকৃৎ]এবং তাঁদের অনুসরণে দেশী পণ্ডিতেরা সিংহল, বর্মা, শ্যাম, ইন্দোচীন, নেপাল, তিব্বত ও চীন থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য নতুন করে আবিষ্কার করে আলোচনা শুরু করেন। তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হয়েই মুখ্যত বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মীয় সাহিত্য রক্ষিত হয়েছে। অনেক গ্রন্থেরই মূল গেছে হারিয়ে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত মূলের ক্বচিৎ কোন খণ্ডিত বা অখণ্ড পুথিও মিলেছে নেপালে ও মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু সে পাঁচ-সাতটি মাত্র। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও ধর্মদ্বেষণা আস্তিক মানুষে এত প্রবল যে বিধর্মীর শাস্ত্র নষ্ট করা পুণ্য কর্ম বলেই তারা জানে। তাই ভারতে কেউ কৌতূহলবশেও বৌদ্ধগ্রন্থ রক্ষা করে নি। গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত একটা ধর্মসংস্কৃতির জন্মভূমে এমন নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ও বিস্মৃতি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি একদিন ভারতকে বহির্বিশ্বে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দু'হাজার বছর আগে বহির্বিশ্বে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও অনুকৃতি বৌদ্ধদেরই সাংস্কৃতিক বিশ্ববিজয়ের স্মারক।

এত করেও সবটা লোপ করা যায় নি। প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী ও মুসলিমদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব, সাধনচর্যা এবং নানা পার্বণিক ও আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস-সংস্কার প্রায় অবিকৃতভাবে রয়েই গেছে। এমনকি কোন কোন বৌদ্ধ লৌকিক দেবতাও স্বনামে ও নামান্তরে হিন্দুর বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর পূজ্য ও উপাস্য হয়ে রয়েছেন, যেমন—আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর, ধর্মঠাকুর, তারা, তারিতা, বাসুলী (বৎসলা), ক্ষেত্রপাল, যক্ষ প্রভৃতি। মুসলমানদেরও কদমমোবারক, হযরত বাল, দরগাহপ্রীতি, প্রভৃতি বুদ্ধের নখ-অস্থি-কেশ প্রতীক বৌদ্ধস্তূপের স্মারক। বাঙলার বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল, ও সূফীসাধনা নামান্তরে বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক সাধনাই। ভারতব্যাপী ভাস্কর্যে, মূর্তিশিল্পে, ও চিত্রকলায় বৌদ্ধ অবদান আজো গৌরব-গর্বের। মগ্নচৈতন্যে বৌদ্ধ-সংস্কারের, সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের প্রভাব না থাকলে কেবল মুসলিম তুর্কী প্রভাবেই দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী রামানন্দ, কবির, রামদাস, দাদু, নানক, চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব হত না, বৌদ্ধ-ধর্ম-দর্শন বেদান্ত-দর্শনের থেকেও সূক্ষ্ম, জটিল ও বিচিত্র হয়ে যে উঠেছিল, তা আজকাল আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিভিন্ন মতের বৌদ্ধ দর্শনের আজো সম্যক আলোচনা হতে পারেনি স্বভাষায় মূলগ্রন্থের অভাবে। কিন্তু চীনা তিব্বতী প্রসূত্রে ছিটেফোঁটা যেসব তথ্য ও তত্ত্ব মেলে—তাতে এককালের এদেশী মনীষার বিস্ময়কর প্রকাশ-বিকাশেরই আভাস পাই। জটিলতায়, সূক্ষ্মতায়, চিন্তার উৎকর্ষে ও ঔজ্জ্বল্যে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদের, হেগেলের ডায়লেকটিসের কিংবা নিট্‌সের ও বাগসঁর তত্ত্বের প্রতিস্পর্ধী বৌদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাচার ও মধ্যমক দর্শন। উৎস উপনিষদ হলেও শঙ্করের জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ প্রভাবেরই ফল। তাই এই তত্ত্ব দিয়েই বৌদ্ধ বিলোপ সম্ভব ও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

বিশেষ করে বাঙালীর লোকায়ত বিশ্বাসে, সংস্কারে, আচারে ও লৌকিক দেবকল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব প্রকট। এক কথায় বাঙালীর তত্ত্বচেতনার মূলে রয়েছে বৌদ্ধ যোগতন্ত্রের প্রভাব—যা এক কালে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযানরূপে বাঙালীর জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ন্ত্রণ করত।

কাজেই চর্যাগীতি আলোচনার আগে পটভূমি হিসেবে বৌদ্ধশাস্ত্রের সামান্য পরিচিতি আবশ্যক বলে মনে করি। গৌতম বুদ্ধ মানবের জীবন-যন্ত্রণার আবসান বা উপশম চেয়েছিলেন, এই মানব-দুঃখের কারণ ও প্রতিকার-উপায় আবিষ্কারই তাঁর কীর্তি—মানব সভ্যতায় ও ধর্মদর্শনে তাঁর অবদান। তিনি দুঃখের কারণ স্বরূপ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তার নাম 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা সংশ্লিষ্ট কারণ-পরম্পরা। এরা সংখ্যায় বারোটি—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ইন্দ্রিয় বা ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ। এগুলোই জীবন-যন্ত্রণার উৎস। দৈহিক ইন্দ্রিয় দিয়ে চেতনায় এদের প্রবেশ এবং ধর্ম-(ভাব) ও সংস্কার (ভাবলব্ধ জগৎ চেতনা) রূপে এরাই চিত্ত বা মন বা চেতনাকে চালিত করে। বুদ্ধের চোখে সবটাই দুঃখজনক—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, অলাভ ও পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা ভাব,—এই অষ্ট প্রকার রূপান্তর বা অনুভূতিকে অষ্টস্কন্ধ বলা হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জ ভাব ও জ্ঞান অনিত্য, প্রাতিভাসিক সত্য, মায়া বা মিথ্যা—অবিদ্যাজাত কাম, রূপ ও অরূপ তৃষ্ণা। এর দ্বারা বিভ্রান্ত বা চালিত না হবার মতো অক্লেশ অবৈর অনাসক্ত চিত্ত-স্থিরতারই নাম তথা নির্বেদ আত্মার নাম নির্বাণ বা শূন্যতা। 'সর্বম অনিত্যম সর্বংশূন্যম'—বুদ্ধের উপলব্ধ এই তথ্য ও তত্ত্বই বীজরূপে গ্রহণ করে নির্বাণের স্বরূপ ও উপায় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কালে কালে ও জনে জনে বিচিত্র ও বহুধা হয়ে ওঠে। এভাবে বহু মতের ও তত্ত্বদর্শনের এবং চর্যাপদ্ধতিও গড়ে ওঠে।

গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু—এখনকার নেপালের তরাই অঞ্চল। তিনি মঙ্গোল রক্তসম্ভূত। লিচ্ছবীরা তাঁর মাতৃকুল। পিতৃকুল শাক্য, তারাও আর্য বা অস্ট্রিক নয়। গৌতম গৃহত্যাগ করে নেমে আসেন সমতলে। সাধনা করেন গয়া-বারাণসীতে। তাঁর সাধনালব্ধ সত্য তিনি প্রচার করেন আধুনিক বিহারেরই নানা অঞ্চলে।

মানুষের কোন চিন্তাই নিরবলম্ব নয়। সে কারণে ক্বচিৎ মৌলিক হয়। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভিত্তি হয় সমকালের নানা চিন্তা-চেতনা, তথ্য-তত্ত্ব কিংবা সমস্যা-সম্পদ। তাই গৌতম বুদ্ধও তেমন কোন স্বকীয় মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবক নন,—যা তাঁর সমকালীন শাস্ত্রে-দর্শনে জড় রূপে বর্তমান ছিল না। যেমন—বর্ণাশ্রম, ঈশ্বর, যজ্ঞ, পূজা, বলিদান প্রভৃতির বিরোধী মতবাদী তখনো ছিল। তাঁর শূন্য ও নির্বাণতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্যতুরীয় অবস্থা যা মোক্ষের প্রায় সদৃশও। কিংবা তাঁর চার আর্যসত্য—চিকিৎসাশাস্ত্রের চারতত্ত্বের মতোই—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও উপশম উপায়—রোগ, তার উৎপত্তির কারণ, নিরাময় উপায় ও ওষুধের সঙ্গে মিলে যায়। যোগও সংসার (জন্ম) সংসার হেতু (জন্ম হেতু) মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়-চেতনা ভিত্তিক। আবার নৈরাত্ম্য, নিরীশ্বর সাংখ্য ও যোগ এবং নির্গ্রন্থ মহাবীর তাঁর পূর্ববর্তী। তীর্থিকের মধ্যে সঞ্জয়, কাত্যায়ন, অজিতকেশকম্বলী, পুরান কাশ্যপ, গোসাল, নাস্তিক কপিল, চার্বাক, পতঞ্জল, ও আজীবিকরা জীন-বুদ্ধের পূর্বেও সমকালে দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী ছিলেন। ওঁরা বর্ণাশ্রম সমর্থন করতেন না। বুদ্ধও বলতেন, শুদ্ধ চিত্ত ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানীই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ। জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বুদ্ধও বলেন, সব কিছু অনিত্য ও শূন্য। রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান সবই ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনাপ্রবাহ এবং কাল সব কিছুর অস্তিত্ব বিনষ্ট করে (কালো ঘসতি ভূতানি)। স্বভাব ধর্ম ও সংস্কার যে ইন্দ্রিয়জ অনিত্য ভাবপ্রবাহ মাত্র তাও নতুন নয়, বৈদান্তিক সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ।

বুদ্ধদেবের কোন লিখিত রচনা নেই। স্থানীয় ভাষায় তিনি উপদেশচ্ছলে তাঁর পূর্ব জাতক কাহিনী ও গাথা ভক্ত সমাজে মুখে মুখে বিবৃত করতেন বলে কথিত। তাঁর জীবৎকালে তার মুখের বাণী লিপিবদ্ধ হলে তা হত মাগধী কিংবা অর্ধমাগধী-প্রাকৃতে। দুনিয়ার কোন ধর্মপ্রবর্তক এমনকি ঋষি-সাধু-সন্ত-দরবেশও কখনো লিখিত বাণী প্রচার করেছেন বলে জানা নেই। তাঁরা কেবল উচ্চারণই করেন এবং শ্রুতিধর ভক্তরা সযত্নে স্মরণ করে রাখে—এই হচ্ছে নিয়ম। আমাদের লালন ফকির অবধি তাই চলেছে।

থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক আমরা মাগধীতে নয়, পালি ভাষাতেই লিপিবদ্ধ দেখি। এই পালি শৌরসেনী তথা অবন্তী-মথুরার প্রাচীন প্রাকৃত বলেই ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ধারণা। মুখ্যত থেরবাদী শাস্ত্রেরই বাহন পালি এবং দক্ষিণ এশিয়ার থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যেই প্রচলিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাকৃতেও ধর্মপদ লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সংস্কৃতেও হয়েছিল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধের সমকালে বা নির্বাণের পরেও বহুকাল এই শাস্ত্র সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে পুরো লিখিত রূপ পায়নি। তাই সর্বভারতে প্রচার বাঞ্ছায় শিষ্ট ও লেখ্য জনপ্রিয় প্রাকৃতে এবং সংস্কৃতে ও পরে লেখ্য ও শিষ্ট শৌরসেনী অপভ্রংশে ত্রিপিটকাদি নানা শাখার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য অনূদিত, লিপিবদ্ধ ও রচিত হয়। অনার্য উচ্চারণে বিকৃত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ তাই বোধ হয় পরে ব্যবহৃত হয়নি। গোড়ার দিকে বুদ্ধবাণীর কিছু মাগধীতেও হয়তো লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু জৈন-প্রাকৃত ও মারাঠী ছিল মাগধী ও অর্ধমাগধী প্রাকৃতজ। বৌদ্ধ প্রাকৃতেও সর্বত্র বিশেষ বিশেষ মাগধী বুলি রয়ে গেছে।

অতএব বুদ্ধের বাণীই কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্র নয়। আনন্দ, শারিপুত্র, মৌগ্গল্য-পুত্রতিষ্য, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নাগার্জুন, আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব, কুমারাত, ধর্মপাল, শান্তরক্ষিত, সরোজবজ্র (সরহ) তিল্লোপা, কাহ্নপা প্রমুখ অনেক ভিক্ষু-শ্রাবক-যোগী-সাধক-তাত্ত্বিকের অবদানে গড়ে উঠেছে বহু যান সমন্বিত বৌদ্ধ ধর্ম ও বিপুল কলেবর শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন এবং বহুবিধ চর্যা ও সাধন পন্থ। আর পালিও বৌদ্ধ শাস্ত্রের একমাত্র বাহন নয়। সিংহলে, বার্মায়, শ্যামে, কম্বোজে, ইন্দোচীনে হীনযানী-থেরবাদীদের গ্রন্থ পালিতে বটে, কিন্তু মহাযানী গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে ছিল বলে তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ সূত্রে আভাস মেলে।

মনে হয় গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভের শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজে মতভেদ দেখা দেয়। এবং তা-ই বৌদ্ধদের দুটো স্বতন্ত্র মত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পাঁচশ বৎসরের মধ্যে 'সঙ্গীতি' নামে চারটি সর্ব ভারতীয় মহাসম্মেলন বা মহাসভা আহূত হয় যথাক্রমে—রাজগৃহে, বৈশালীতে, পাটলিপুত্রে ও জালন্ধরে। প্রথম সভা আহবান করেন (খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে) মহারাজ কণিষ্ক। শাস্ত্রীয় মতানৈক্য সম্পর্কে বিতর্ক, আলোচনা এবং মীমাংসাই ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তবু বিভেদ ঘোচেনি। বরং স্থায়ী ও বহুধা হয়েছে। প্রথম দুটো প্রধান ভাগের নাম হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা রক্ষণশীল, শাস্ত্রাচারনিষ্ঠ ও তত্ত্ববিমুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা বাহ্যাচরণনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী। এঁদের একদল কেবল পাপভীরু ও পুণ্যকামী। বোধিসত্ত্ব হওয়া কিংবা বুদ্ধত্ব অর্জন এঁদের লক্ষ্য নয়—এঁরা, শ্রাবকযানী বা অর্হত্ত্ব প্রত্যাশী। অন্যদল ব্যক্তিগত বুদ্ধত্ব অর্জনে যত্নবান। কিন্তু করুণা ও মৈত্রীর মাধ্যমে সর্বমানবের নির্বাণকামী নয়। এঁরা হচ্ছেন প্রত্যেক বুদ্ধযানী। এঁদের মধ্যেও সীমিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ছিল। এই তত্ত্বচিন্তার নাম বৈভাষিক দর্শন। হীনযানীদের মধ্যে ক্রমে থেরবাদ (স্থবিরবাদ) তথা গুরু আনুগত্যে শাস্ত্রসম্মত আনুষ্ঠানিক ধর্মপালন প্রবল ও জনপ্রিয় হয়—অনেকটা রোমান ক্যাথলিকদের মতোই।

আবার বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যেও তথা ভিক্ষুদের মধ্যে নির্বাণ ও শূন্যতত্ত্বের স্বরূপ ও সিদ্ধিপন্থা এবং আচার-আচরণের নানা খুঁটিনাটি নিয়মনীতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বুদ্ধের নির্বাণের দু-আড়াইশ বছরের মধ্যেই আঠারোটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে বৌদ্ধ সমাজ। এদের দশটি ক্রমে প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—স্থবিরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এদের মধ্যেও আবার সর্বাস্তি, মূলসর্বাস্তি, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদী দল প্রভাবে ও প্রসারে প্রবল ও স্থায়ী হয়ে যায়। সর্বাস্তি ও মূল সর্বাস্তিবাদ হীনযান মত ধরে থাকলেও মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদীরা কার্যত মহাযানপন্থী হয়ে ওঠে। উক্ত দশটি মতেরই সমর্থনে শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন রচিত হয়েছিল। এঁদের রচনার বাহন ছিল মুখ্যত সংস্কৃত বা মিশ্র-সংস্কৃত।

মহাযানীরা সর্বমানবের কল্যাণে স্ব স্ব জীবনে বোধিসত্ত্ব ও তথাগতের (তথতা—সেই রকম সত্য নিয়ে আগত বা ভূমিষ্ঠ যিনি তিনিই তথাগত, যেমন গৌতমবুদ্ধ) মতো করুণা ও মৈত্রীর অনুশীলন ও চর্যা গ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব—অর্হত্ত্ব বা বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী। এরা গৌতমবুদ্ধের মতো সর্বমানবের সুখ, শান্তি ও কল্যাণকামী।—সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, সুখী অত্তারং হরিহরন্তু। সব্বেসত্তা দুকখাপমুঞ্চন্তু। সব্বেসত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।—সকল জীব সুখী হোক, বৈর মুক্ত হোক, সুখে কালযাপন করুক, সব জীব দুঃখমুক্ত থাকুক, সর্বজীব যথালব্ধ সম্পত্তিচ্যুত না হোক।—গৌতম বাঞ্ছিত এই 'হিতবাদ'ই তাদের অনুসরণীয়। ঐ করুণা ও মৈত্রী চর্যার সূত্র বা নীতির নাম পারমিতা। এ-ভাবে প্রজ্ঞাপারমিতা, মৈত্রী প্রভৃতি বহুধরনের পারমিতা ও ধারণী (যা ধারণ বা আচরণ করা হয়) উদ্ভাবিত হয়। ক্রমে মহাযান মতেও তাত্ত্বিক ও আচারিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। সে মতভেদের বা পন্থাভেদের ফলে মহাযানীরা প্রথমে দুটো প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়—মাধ্যমিক ও যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী। নাগার্জুন মধ্যমক তথা বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিকের মধ্যপন্থা নামের তত্ত্ব ও চর্যাদর্শনের প্রবর্তক। এতে প্রজ্ঞা ও উপায় সমন্বয়ে অদ্বয় সত্তার নির্বেদ নির্বাণ লভ্য।

আর যোগাচার চর্যা ও বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তক হলেন অসঙ্গ ও তাঁর ভাই বসুবন্ধু। এই সঙ্গে আরো একজনের নাম উল্লেখ্য, তিনি মৈত্রেয়। এ সূত্রে বুদ্ধচরিত প্রণেতা মহাযানী কবি অশ্বঘোষের নামও স্মর্তব্য। বুদ্ধ-উক্ত সূত্রভিত্তিক যে তত্ত্ব তার নাম সৌত্রান্ত্রিক—এর প্রবর্তক ছিলেন কুমারাত ও হরিবর্মণ। ইন্দ্রিয় ধর্ম ও সংস্কারের বাহ্যাবলম্বন বস্তুকে গুরুত্ব দেন বৈভাষিকেরা। সৌত্রান্ত্রিকরা বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁরা চেতনাপ্রবাহে বা বিজ্ঞানেই সব কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে মানেন, অর্থাৎ মনে আছেত আছেই—যা মনে নেই তা বাইরেও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যাগীতিতে পরিব্যক্ত সাধনতত্ত্ব

মহাযানীদের বাঙলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল ও তিব্বতে প্রবল শাখা হচ্ছে মন্ত্রযান। এর উপশাখা হচ্ছে বজ্র, কালচক্র ও সহজযানগুলো। এদের তত্ত্ব ও সাধনগ্রন্থ লিখিত হয়েছিল সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে। নেপালে তিব্বতে এসব জনপ্রিয় ছিল। কাজেই বৌদ্ধধর্ম মূল ত্রিপিটক-সূত্র-বিনয়-অভিধর্মকে ছাড়িয়ে অনেক গভীর, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব-দর্শনভিত্তিক হয়েছিল এবং চর্যা (আচরণ) আর লক্ষ্যও হয়েছিল বিচিত্র।

সাংখ্য থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি—অর্থাৎ সাংখ্যের 'পুরুষ-প্রকৃতি' তত্ত্বই শিব-শক্তি (ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত) রূপে মৈথুনাত্মক তন্ত্রমত ও সাধন পদ্ধতির উদ্ভব। আদি সাংখ্যতত্ত্বেও চর্যা-পদ্ধতির নাম ছিল যোগ। পরে যোগ স্বতন্ত্র দর্শনরূপে বিকাশ পায়। মূল সাংখ্য-যোগই যোগতন্ত্ররূপে অধ্যাত্ম ও গুহ্য সাধনার অবলম্বন হয়। এ সাধনা দেহভিত্তিক ও নিরীশ্বর।

দেহ পঞ্চভূতে গঠিত। এই ভূতজ দেহ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ রূপে ওগুলো ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিরই প্রসূন। চিত্ত ইন্দ্রিয়জ ও ইন্দ্রিয় চালিত; তাই স্কন্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ। ইন্দ্রিয় ধর্ম তথা ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব সংস্কারের জন্ম দেয়। ঐ সংস্কারই সমন্বিত চেতনা বা মন বা চিত্তরূপে হেতু পরম্পরায় অনিত্য চেতনা বা বিজ্ঞান প্রবাহে আবর্তিত হয়। অতএব পঞ্চভূতের রাসায়নিক সমন্বয়ে মন বা চিত্ত নামে যে চেতনাপ্রবাহ জীব দেহে সঞ্চারিত, তাকে অন্যেরা জীবাত্মা বলে বটে, কিন্তু বৌদ্ধেরা তাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্যধর্ম ও সংস্কার বলে জানে। এই অস্তিত্ব তাই প্রাতিভাসিক বা মায়া তথা মিথ্যা।

জীব দেহগত এই চেতনাই সর্ব দুঃখানুভূতির আকর ও কারণ। দেহ নিরপেক্ষ যখন চেতনা নেই তখন এই চেতনার রূপ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করতে হবে দেহ নিরীক্ষা করেই। দেহাধারে কর্তৃত্ব আসলে ঐ চৈতন্যের তথা মন কিংবা চিত্তের নিয়ন্ত্রণ, নিরোধ এবং বিনাশও সম্ভব। তাই কায়াসাধনই সাধনার লক্ষ্য। চেতনার বীজ হচ্ছে বজ্র বা শুক্র। বজ্র দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের প্রতীক। বজ্রসত্ত্ব দৃঢ়, সার, অচ্ছিদ্র, অভেদ্য ও অবিনাশী। বজ্রসত্ত্ব শূন্যতা সত্ত্বেরই নামান্তর। বজ্রে নিয়ন্ত্রাধিকার জন্মালে জীবন জীবের ইচ্ছাশক্তির বশে আসে। তাই বজ্রেই বোধিচিত্তের স্থিতি—বজ্রই বোধিচিত্ত। ফলে বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব আর বোধিচিত্ত তথা বুদ্ধও অভিন্ন। বজ্র নিয়ন্ত্রণের জন্যেই দেহ নিয়ন্ত্রণ দরকার। এর নাম কায়াসাধন। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সাধনা চলে। দেহের তিনটি প্রধান নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মাধ্যমে লিঙ্গমূল থেকে শুক্রধারার (মূলাধারের কুণ্ডলিনী শক্তির) উর্ধ্বায়ন ঘটিয়ে ক্রমে তাকে ললাটদেশে মৌজুত করে রাখাই এ-দেহ চর্যার লক্ষ্য। বজ্রযানী ও সহজযানীরা এ সাধনাই করে। এ সিদ্ধির নাম অদ্বয় করুণা-শূন্য, প্রজ্ঞা-উপায় মিলন প্রসূত শূন্যাবস্থা বা সহজানন্দ অবস্থা কিংবা মহাসুখাবস্থা—হিন্দুর সচ্চিদানন্দ বা তুরীয় অবস্থা বা নির্বেদ সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় 'ঘুমই ন চেবই সপরিবিভাগা।' এবং 'চেঅন ন বেঅন ভর নিদ গেলা। সঅল মুকল করি সুহে সুতেলা।' এই সহজ দ্বারাই 'চিঅ সহজে শূন সংপুন্ন' হয় এবং তখন 'অদ্বয় চিত্ততুরু অবহু গউ তিহুআণঁঃ বিথার। করুণা ফুল্লী ফল ধরই ণাউ পরও উগার।'— (সরহ।) তখন 'কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা। সহজ নলিনীবন, পইসি নিবিতা'—। সরহও বলেন, 'দেহ সরসিঅ তিথ মইঁসুহ অণ্ণ ন দিটঠঅ। আই ণ অন্ত ণ মজঝ ণউ ণউ ভব ণউ নিব্বাণ। এহু সো পরম মহাসুহ ণউ পর ণউ অপ্পাণ। ইন্দিঅ জথু বিলঅ গউ ণ ঠিউ অপ্পসহাবা। সো হলে সহজ তণু ফুড়।" (সরহ)। তখন 'কমল কুলিস বেরি মজঝঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস। কোন ন রমই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তহ তিহু অণেহি কস্স ন পুরই আস (সরহ)।"—এটিই বৈষ্ণবের অদ্বৈততত্ত্ব, অভেদতত্ত্ব ও সূফীর বাকাতত্ত্বের সদৃশ। বজ্রতত্ত্ব হচ্ছে ওদের 'যুগলতত্ত্ব' ও 'ফানাতত্ত্বের' সদৃশ। শূন্য-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায় (হিন্দুর মায়া-ব্রহ্ম, শিব-শক্তি) ও বজ্রসত্ত্ব-বজ্রতারা পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্ন অবস্থা মাত্র। সহজিয়া ও বাউল গানে এই সব তত্ত্বের সবটাই মেলে। তবে আস্তিকতা ও অজ্ঞতা-আক্রান্ত সহজিয়া বাউলে আত্মা ও ঈশ্বর অতিরিক্ত এসেছে আস্তিক ধর্মগুলোর প্রভাবেই।

গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এ সাধনা চলে এবং এ সাধনা গুহ্য সাধনাও বটে। তাই নিয়ম-নির্দেশ সবটাই প্রহেলিকার মতো গূঢ় ইঙ্গিতময়। চর্যাগীতি সেই সাধনতত্ত্ব সম্বলিত প্রহেলিকাপদ। এ সূত্রে একালের সহজিয়া—বাউল পদও স্মর্তব্য। এই সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়-"খড়গাঙ্গন পাদলেপান্তর্ধান রসরসায়নখেচর-ভুচর-পাতালসিদ্ধিপ্রৈমুখাং সিদ্ধিং সাধয়ে (সাধন মালা)।" অর্থাৎ, হটযোগ সাধনায় শত্রুবিনাশী খড়্গ লাভ হয়। চোখের এমন অঞ্জন মেলে যাতে দৃষ্টি সর্বত্রগামী হয়। এমন পাদুকা মেলে যাতে দেহ জরামুক্ত থাকে, পাখির মতো বিমানে উড়বার ক্ষমতা জন্মে, সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘনের সামর্থ্য থাকে এবং পাতালে প্রবেশও সম্ভব। সহজ সিদ্ধির ফলে উক্ত সব শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব। যারা সিদ্ধি লাভ করে তারাই সিদ্ধ বা সিদ্ধা।

হয়তো জন্ম ও জীবন কালনিয়ন্ত্রিত বলেই কালানুসারী চর্যাই কালচক্রযানে নির্দিষ্ট। কালচক্রযানে সাধনা গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি-লগ্ন ক্ষণ ও রাশিনির্ভর। গুরু-মন্ত্র, চর্যা ও তিথির গুরুত্ব মন্ত্র ও কালচক্রযানে অশেষ। মন্ত্রযানে সাধনভিত্তি তন্ত্র ও যোগ এবং তন্ত্র গুহ্যসাধন পদ্ধতি, আর তা বজ্র, কালচক্র এবং সহজসাধনারও আবশ্যিক অঙ্গ। এ-সব সাধনার অধিকারী ভেদ আছে এবং সেই ভেদানুসারে সাধকরা পাঁচকুলে বিভক্ত। এদের নাম বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত ও রত্ন এবং এদের সাধন-সঙ্গিনীরও নাম যথাক্রমে ডোমনী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী। প্রমূর্ত স্কন্ধই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগত।[১] সাংখ্যের পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ-প্রতীক রূপ-বৈরোচন, বেদনা-রত্নসম্ভব, সংজ্ঞা-অমিতাভ, সংস্কার-অমোঘসিদ্ধি এবং বিজ্ঞান-অক্ষোভ্য বুদ্ধরূপে কল্পিত। এ সাধনায় যারা সিদ্ধ হয় তারাও যথাক্রমে বৈরোচনবুদ্ধ, রত্নসম্ভববুদ্ধ, অমিতাভবুদ্ধ, অমোঘসিদ্ধিবুদ্ধ ও অক্ষোভ্যবুদ্ধ হয়। কাজেই বজ্র-সহজযানে সাধকের প্রথমত কাল নিরূপণ করতে হয়। সেজন্যেই কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামের তন্ত্রে তথা গুহ্য চর্যায় প্রবর্তকালে অনুশীলন আবশ্যিক। অতএব মূল মন্ত্রযানই সাধনলক্ষ্য এবং স্তর ভেদে তা-ই কালচক্র, বজ্র ও সহজযান নামে পরিচিত। আর যোগ ও তন্ত্র চর্যা ও পদ্ধতি হিসেবে উক্ত চার মতেরই ভিত্তি ও বাহন। সুচন্দ রচিত টীকা 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা বা 'বিমল প্রভা' এবং অভয়াকর গুপ্ত রচিত 'কালচক্রাবতার' ও 'বুদ্ধকপালতন্ত্রটীকা'-ই কালচক্রযান সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞানের উৎস। 'সেকোদ্দেশটীকা'ও এই সূত্রে স্মর্তব্য। কালচক্র শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় প্রতীক ও আধার এবং মহাসুখ স্বরূপ নির্বেদ ও নিত্য প্রজ্ঞাবস্থাই সিদ্ধি।

পঞ্চভৌতিক দেহটা প্রাকৃতিক প্রতিবেশে লালিত। তাই প্রকৃতি তথা সেই আদি যাদুশক্তির চর্চাও তান্ত্রিক বজ্র-সহজযানীদের অবলম্বন হয়েছে—মন্ত্র-মুদ্রা ও মণ্ডলের মাধ্যমে। সেজন্যে নেপালী বজ্রযানীরা নানা প্রতীক দেবতার পূজারী। আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগে তা নিশ্চয়ই

---

১. রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান এবচ পঞ্চবুদ্ধস্বভাবাং তু স্কন্ধোৎপত্তি বিনিশ্চিতম-(বজ্র-বরাহীকল্প-মহাতন্ত্র) শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃঃ ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল—যাদুঘরে তেমন মূর্তি দুর্লভ নয়। দেব পূজারীরা গৃহী বজ্রযানী। আর গুহ্যসাধক তান্ত্রিক বজ্রযানীরাই হয়তো সহজযানী রূপে পরিচিত। 'বজ্রতন্ত্র' ও 'হেরুকতন্ত্র' এ মতের আকর গ্রন্থ। অতএব চর্যাগীতিতে মূল বৌদ্ধ অঙ্গীকারগুলো ছাড়াও আমরা মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী, বজ্রযানী ও সহজযানী তান্ত্রিক চর্যার নানা তাৎপর্য-প্রতীক পরিভাষা দেখতে পাই। উক্ত যানগুলোর বিভিন্নতা সাধনস্তর ও লক্ষ্য জ্ঞাপক—স্বাতন্ত্র্যসূচক নয়। কাজেই চর্যাগীতির তত্ত্ব দেহতত্ত্বই তথা শুক্র-নিয়ন্ত্রী কায়াসাধনাই, যার আধুনিক রূপ সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল চর্যায় লভ্য।

বজ্র, শূন্য,সহজ, জিনবুদ্ধ, তথতা, তথাগত, সহজানন্দ, মহাসুখ, নির্বাণ, পঞ্চ স্কন্ধ, পঞ্চ ডাল, সূর্য, চন্দ্র, ধমন, চমন, নৈরামণি, ডোম্বী, মাতঙ্গী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, পদ্মখাল, করুণা, ত্রিধাতু, মন্ত্র, তন্ত্র, মন, পবন, রবি, শশী, নাদ-বিন্দু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ত্রিশরণ, ব্রাহ্মণ, কাপালিক, প্রভৃতি বার বার আবৃত্ত হয়েছে এ সাহিত্যে। দেহের দক্ষিণাংশে উপায় বা পিঙ্গলার পরিভাষা—রসনা, সূর্য, রবি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, যমুনা, গ্রাহ্য। দেহের বামাংশে প্রজ্ঞা বা ইডার পরিভাষা—ললনা, চন্দ্র, শশী, অপান, ধমন, আলি, নাদ, গঙ্গা, গ্রাহক, সুষুম্না-অবধূতী, শুণ্ডিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী, শবরী, যোগিনী। বজ্র-সহজযানী সাধকরা সিদ্ধা তথা সিদ্ধপুরুষ বলে পরিচিত। চৌরাশি আঙুল পরিমিত দেহসাধনায় সিদ্ধ বলে তারা চৌরাশিসিদ্ধা নামেও আখ্যাত। ৩, ৯, ১৯, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩ সংখ্যক চর্যাপদগুলোতে সাধন ও সিদ্ধিতত্ত্ব প্রকট এবং স্পষ্টই বলা হয়েছে 'কিন্তো মন্তে, কিন্তো তন্তে, কিন্তোরে ঝাণে বখানে' (দারিক)। আট শতকের বঙ্গ-মগধ শাসক পালেরা এবং সমকালের ইন্দোনেশিয়ার (যবদ্বীপের) শৈলেন্দ্ররাজারা বজ্রযানী ও তন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। বজ্রধর, বজ্রতারা ও মঞ্জুশ্রী শ্যামতারার [কালীর] পূজা জনপ্রিয় ছিল। যাভা-সুমাত্রায় বজ্রধর ও তারা সেকালের জনপ্রিয় দেবতা (হিমাংশুভূষণ সরকার, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৮৫)।

চর্যাগীতি ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের 'গোপীচাঁদ ময়নামতী'র গানে, নাথ সাহিত্যে, গোরক্ষবিজয়ে, আগম-জ্ঞানসাগরে, সূফী সাহিত্যে, যোগ-তান্ত্রিক হাড়মালায়, সাধনমালায় 'হঠযোগ প্রদীপিকা' প্রভৃতি যোগগ্রন্থে, বৈষ্ণব সহজিয়া শাস্ত্রে ও সঙ্গীতে এবং বাউল চর্যায় ও গীতিতে বৌদ্ধ যোগতন্ত্র ও বজ্রসহজযানী তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে। আজো সেই মণ্ডলচক্র ও যোগিনীচক্রের মতো বাউলদের মধ্যে নৈশচক্র গোপীচক্র প্রভৃতি রয়েছে। এতে যৌনসাধনার ব্যবস্থাও থাকে। বজ্রগীতি, চর্যাগীতি, সহজিয়া-বাউল গীতি গেয়ে কামভাব জাগরুক করা হয় এবং নাদ-বিন্দু-ক্ষীর, চারিচন্দ্র, বজ্র-রজ প্রভৃতির বাস্তব অনুশীলনও নাকি হয়। এগুলোর সঙ্গে হিন্দুর তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র কিংবা বৈষ্ণব রাসচক্রের তত্ত্বগত মিল কম নয়। বস্তুত বাঙলার ও বাঙালীর অন্তরঙ্গ পরিচয় এতেই নিহিত। এ সাহিত্যে অনিত্যতা ও শূন্যতাবাদী গৌতমবুদ্ধ উচ্চারিত জীবনাদর্শ—বৈর-ক্লেশ-আসক্তিহীন আনন্দিত জীবনবাঞ্ছাই প্রতিফলিত। শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষু-যোগী-সন্ন্যাসী-সাধু-দরবেশ রূপে আজো অনেকে সেই জীবনই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বৌদ্ধমতে আত্মা অস্বীকৃত। কেবল পঞ্চ স্কন্ধই স্বীকৃত। এই পঞ্চস্কন্ধ 'নাম' রূপে ও 'বস্তু' রূপে প্রতীয়মান থাকে। রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কোন 'হেতুপ্রত্যয়' বা হেতুপরম্পরা নেই অর্থাৎ কারণ-ক্রিয়া সম্বন্ধ নেই। রূপ বা বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক কিংবা সহস্থিতি বা সমস্থিতিজ্ঞাপক। এটিই বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্ব। এর নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) বা অস্তিত্বপ্রত্যয়তা [ইদপ্পচ্চয়তা]। সবটাই অবিদ্যা বা মায়া প্রপঞ্চ প্রসূত—'আইএ অনু-অনা এজগ রে ভাংতিএ সো পড়িহাই (৪১ নং) ইত্যাদি, অদভুঅ ভব মোহা রে দিসই পর অপ্পণা। এজগ জলবিম্বাকারে সহজে সূন আপনা (৩৯ সং)। যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিদ্যা থেকে সংস্কার, তার থেকে বিজ্ঞান, তার থেকে নামরূপ, তার থেকে ষড়ায়তন (ষড় ইন্দ্রিয়), তার থেকে স্পর্শ, তার থেকে বেদনা, তার থেকে তৃষ্ণা, তার থেকে উপাদান, তার থেকে ভব, তার থেকে জাতি (জন্ম), তার থেকে জরা-মরণ-দুঃখ-শোক ইত্যাদির জন্ম। এরই নাম ভবচক্র। এ কিন্তু হেতু পরম্পরা নয়, —আধুনিক চলচ্চিত্রের চিত্রপ্রবাহের বা জলস্রোতের মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন (কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ও পরম্পরাগত বলে প্রতীয়মান) চেতনাপ্রবাহের সামষ্টিক রূপ মাত্র। তাই শূন্যতা বা নির্বাণ সৎ (অস্তিত্ব) নয়, অসৎ নয়, সৎ-অসৎ-এর অদ্বয় রূপও নয়, আবার সৎ-অসৎ কোনটাই নয়—তাও বলা চলে না। [ভব নই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী ইত্যাদি (৫নং পদ) [অবাঙমনসগোচর বা অজ্ঞেয় বলেই এমনি বোধের নাম 'চতুষ্কোটিবিমুক্ততা' তথা ভব-নির্বাণ-অস্তি-নাস্তিবোধহীন অবস্থা। 'জাহের বাণ চিহ্ন...ণ মিচ্ছা (২৯ নং) ইত্যাদি।

পঞ্চস্কন্ধ থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভূতি রূপ রূপান্তরে চেতনাপ্রবাহকে বিভিন্ন খাতে আকৃষ্ট করে। এরই নাম তৃষ্ণা বা বন্ধন। এই ভবতৃষ্ণা বা বন্ধনই জন্মান্তর বা রূপান্তর ঘটায়, এই তৃষ্ণা বা বন্ধনই নামান্তরে ধর্ম বা কর্ম। এখানেও হেতুপরম্পরা নেই। তবে এ তৃষ্ণা বীজ-বৃক্ষ-ফল-বীজ-এর মতো আবর্তনধর্মী। জন্মপ্রবাহের (ভবচক্রের) উৎস অনির্ণীত :

জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম। (২২নং)

গৌতম বুদ্ধ ঐ স্কন্ধজ তৃষ্ণা বা বন্ধনকে দেহরূপ গৃহনির্মাণ (তথা জন্মান্তরের জন্যে দায়ী) বলে জেনেছেন। 'অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা। মিছে লোঅ বন্ধা-বএ আপনা' (২২নং)। অতএব তৃষ্ণা বা সংস্কারবিমুক্তিই কর্ম ও জন্মবিমুক্তির উপায়। জন্মবিমুক্তিই নির্বাণ। বুদ্ধ বলেছেন : গহকারকং দিট্‌ঠোসি গেহং ন কাসসি। বিসংখারগতং চিত্তং তণহানং খয়মজঝগা।—'দেহরূপ গৃহনির্মাতাকে দেখেছি, সে আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। আমার চিত্তে সংস্কার ও তৃষ্ণা লয় পেয়েছে।' চার আর্যসত্যের ভিত্তিতে 'অষ্টাঙ্গিক'[১] মার্গের ষড় বা দশ পারমিতা অঙ্গীকার[২] করে অথবা পঞ্চপ্রতিবন্ধক (কাম-দ্বেষ-তন্দ্রা-গর্ব-মোহ) পঞ্চ কুশলজ ধর্ম (শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি) অবলম্বনে সাধনা করে বোধিসত্ত্ব বা অর্হত্ত্ব কিংবা নির্গুণ নির্বেদ একটা অবস্থা লাভ সম্ভব। এরই নাম শূন্যতা বা নির্বাণ। তখন ভবচক্র থেকে অব্যাহতি মেলে। মোহ বিমুক্তা জই মাণা। তবে তুঁটই অবণাগমনা (৪৬ নং)। পঞ্চকুশলধর্ম বিশেষ করে ভিক্ষুদের জন্যেই। একটা অদ্বয় বা অব্যয় তত্ত্বই তাদের পরমতত্ত্ব। আবার শূন্যতা বা নির্বাণের অপর নাম বোধিচিত্ততা। যেমন অদ্বয়বোধি চিত্ত অর্জন সম্ভব হয় শূন্যতা-করুণার বা প্রজ্ঞা-উপায়ের বা নাদ-বিন্দুর বা নিবৃত্তির (হিন্দুর শিব-শক্তির, মায়া-ব্রহ্মের) সামরস্যে বা অদ্বয় অবস্থায়-মহাসুখাবস্থায়, সহজানন্দাবস্থায় (হিন্দুর সাচ্চিদানন্দ বা তুরীয় অবস্থায়)।

---

১. অষ্টাঙ্গিক মার্গ
শীল সম্পর্কিত ১. সম্যক বাক ২. সম্যক কর্মান্ত ৩. সম্যক আজীব। চিত্ত সম্পর্কিত ৪. সম্যক ব্যায়াম ৫. সম্যক স্মৃতি ৬. সম্যক সমাধি, প্রজ্ঞা সম্পর্কিত ৭. সম্যক সঙ্কল্প ৮. সম্যক দৃষ্টি। এ সূত্রে দশ শিক্ষাপদ স্মর্তব্য।

২. ষড়পারমিতা : দানশীল, ক্ষান্তি. বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা+অন্য চারটি—উপায় কৌশল্য, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান—দশ পারমিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্নের জবানীতে 'ঘুমই ণ চেবই সপরিবিভাগা। সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা। চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা। সঅল মুকল করি সুহে সুতেলা।

স্বপনে মই দেখিল ভিহুবণ সুণ
ঘোরিঅ অবণা গবণ বিহুণ। (কাহ্ন ৩৬ নং)

-সহজাবস্থা এরূপ শান্ত ঘুমন্তরূপ।

মূলাধার থেকে শুক্রকে ঊর্ধ্বগামী করতে করতে মস্তকে নিয়ে রাখলেই সহজ অবস্থা লাভ হয়।

[গোটা দেহকে মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানীরা দেখেছে একটা যন্ত্র স্বরূপ]

১	২		৩	৪	৫	৬	৭
দেহস্থান	চক্র বা কায়		পদ্ম	মুদ্রা	আনন্দ	দেবী	ক্ষণ
নাভি	নির্বাণ চক্র বা কায়		নাভিপদ্ম চৌষট্টি দল	কর্মমুদ্রা	আনন্দ	লোচনা	বিচিত্র
হৃদয়	ধর্মচক্র	,,	হৃৎপদ্ম বত্রিশ দল	ধর্মমুদ্রা	পরমানন্দ	মামকী	বিপাক
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র	,,	কণ্ঠপদ্ম ষোড়শ দল	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	পাণ্ডুরা	বিমর্দ
মস্তক	সহজচক্র	,,	উষ্ণীষ পদ্মচতুর্দল	সময়মুদ্রা	মহানন্দ	তারা	বিলক্ষণ

এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ—সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা।

স্পষ্টত হিন্দু ষড়পদ্ম ও ষটচক্র এরই বিকাশ।

মহাযান পন্থীর 'মন্ত্র নয়' থেকে তন্ত্রযান তজ্জাত বজ্রযান তজ্জাত কালচক্রযান ও সহজযান বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সবাই শূন্যতা, আনন্দাবস্থা ও নির্বাণ লক্ষ্যে সাধনা করেন। সবাই কায়াসাধক। সবাই যোগী ও তান্ত্রিক—কেউ বামাচারী কাপালিক যোগী, কেউবা বামাবর্জিত সাধক, যেমন বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে হিন্দু-নামে পরিচিত গোরক্ষপন্থী, নাথপন্থী-শৈব-নাগা-অবধূত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা শেষোক্ত মার্গী। আর সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল ও সূফী নামে পরিচিত কিছু সাঁইবাদী (গুরুবাদী) সাধকরা বামাচারী। কিন্তু নাদ-বিন্দু, চারিচন্দ্র, নীর-ক্ষীর, রজ-বীর্য নিয়ন্ত্রণ সব সাধনারই কমবেশি লক্ষ্য। কায়াসাধনাই সিদ্ধির ঋজু বা সহজ পন্থা—

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক
নিয়ড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।"

তারা জানে কায়া বা মন হচ্ছে তরু, পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার শাখা, (১, ৪৬), চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হয়—'কাল ঘসতি ভুতানি'। কাজেই কালপ্রভাবকে প্রতিহত করতে হবে।

কালে আর্য ধর্মশাস্ত্র বরণ করেও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র—এই তিন আদি অনার্য দর্শন, দেহতত্ত্ব ও সাধনা যে বাঙালী কোনদিন পরিহার করেনি, সে তথ্য আজ আর অস্বীকৃত নয়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী মত ঐ তত্ত্বদর্শনের সঙ্গে আপোস করে এবং সমন্বিত হয়েই টিকে রয়েছে গণমনে। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্ম বা চক্র হিন্দু যোগতন্ত্রে ষড়পদ্ম ও ষটচক্র হয়েছে। এতেই বোঝা যায়—হিন্দু যোগতন্ত্রের বিকাশ বৌদ্ধ পরবর্তী। এমন কি শূন্যতত্ত্বও অবিরল-অবিকৃত রয়েছে নামান্তরে। নিরাকার আল্লাহও শূন্য, তাদের কাছে দুই-ই অভিন্ন।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, 'নাথপন্থী-গোরখপন্থী সাধকেরাও চর্যাসাধনার ঐতিহ্য অনুসারী।' 'চর্যাকারদের সাধনা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমান ছিল। সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগ বৈষ্ণব ও মরমীয়া সহজ সাধকেরা। (চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ৪৭, ৪৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শৈব যোগীদের বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির পরবর্তী কালের শিবসঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। (ঐ পৃঃ ৪০)" "চর্যামতের এ ধারাটি বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে" (ঐ পৃঃ ৪২)। অনিল পুরাণে ধর্মঠাকুরের গাজনের ছড়াতেও চর্যাগানের ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে। সুফী, সহজিয়া ও বাউল সাহিত্যে মৌলতত্ত্ব ও লক্ষ্য অভিন্ন। ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান (১৬৮২-৮৪ খ্রীঃ) বলেন :

১. দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।

তুল : জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জানি (লুই: ২৯নং চর্যাপদ)

২. আপনে শূন্যকার আছে সৃষ্টিকর্তা
অজর অমর হএ চিন্তি নিরঞ্জন।

৩. বিন্দু বিন্দু নাথ (নাদ)বিন্দু নহে ভিন্নাভিন
শিব শক্তি দোহ এক ভিন্নমাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তি লিঙ্গেত বিশ্রাম।

তুল : সরহ (৩২নং নাদ ণ বিন্দু ণ রবি ণ শশি মণ্ডল)

৪. বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।

তুল : মার রে জোইআ মুলা পবনা জেঁন তুটঅ অবগাগবণা (২১ সং ভুসুকু)

৫. ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার। (–সৈয়দ সুলতান)

তুল : ১. অসরিরি কোই সরিরহি লুক্কো
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।

২. ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়িবেশী পুচ্ছই।

৩. দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই।

৪. আমার মনের মানুষ আছে মনে।
আমি তাই হেরি তাই সকল খানে।

সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি শেখ চাঁদ বলেন :

১. শূন্যময় করতার শূন্যে বাঁধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যের আয়ু, শূন্যে বায় শূন্যে মোর মন
আকলি ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম, শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জিউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা।—তালিবনামা

২. তনের গুরু মন, মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য, শূন্যের গুরু নির্গুণ।

৩. আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধর কাণ্ডারী।
বাসত্তর দেব সঙ্গে মন ইচ্ছার পাড়ি।—হরগৌরীসম্বাদ

তুল : গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাও—(১৪নং ডোম্বী)

৪. উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা।— (তালিবনামা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুল : পঞ্চতথাগত কিঅ কেডুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআ জাল। (১৩নং)

৫. চন্দ্র সূর্য কাম বিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস
এ ঘরের দশ দুয়ার করিল প্রকাশ।— (শেখ চাঁদ)

তুল : (এদেহে) এথু সে চাঁদ দিবাকর
দেহ সরিসঅ তিখ মহঁ
সুহ অণ্ণ ণ দীটঠও।— (সরহ)

তুল : (শুক্র) টলে জীব, অটলে ঈশ্বর
তার মধ্যে (শুক্রমধ্যে) খেলা করে রসিক শেখর। —বাউল গান।

আঠারো শতকের প্রথম পাদের কবি মনসুরের মতে :

১. ঈশ্বর পুরান (অনাদি) জ্ঞান সেই এক দম
সে দমতু হইয়াছে এ দুই আলম।

তুল : বায়ুতে করহ নর আয়ুর উদ্দেশ (সৈয়দ সুলতান)

২. (দেহে) অনাহত শব্দ উঠে করি হুলুস্থুল
কাসা করতাল শব্দ আনন্দ বহুল।

তুল : অনহা ডমরু বাজএ বীর নাদে।— (কাহ্ন ১১নং)

আলি রজার মতে :

১. শূন্য রূপে এক আল্লা সতত উজ্জ্বল
সংসারে ফকির শূন্য রূপে শূন্য নাম
শূন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্য যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
যে সবে এ তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।

২. শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যত বনিজার।
শূন্য সিন্ধু হস্তে ব্যক্ত রূপের সাগর।

উল্টা সাধনা :

৩ পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জিএ সংসারে।
সম্মুখ বিমুখ হএ বিমুখ সম্মুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুল : দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে চতুর দলে বারাম খানা। (বাউল গান)

কায়া প্রতীক-

৪. কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।

পরকীয়া সাধনা :

৫. স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেম রস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস (জ্ঞান-সাগর)

তুল : (১) জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি (-গুঞ্জরীপা ৪নং)
(২) তু লো ডোম্বী... (কাহ্নপা ১০নং)

সাধন তত্ত্ব-

৬. শব্দ স্থির হয় যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন। —আলি রাজা

তুল : মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্ধ থির।
বলে গোরখদেব সকল থির।—হঠযোগপ্রদীপিকা

১. পাগল করিল গোর্খ দিয়া শূন্যজ্ঞান।—গোরক্ষবিজয় (আঃ করিম পৃঃ ১৬২)
২. শূন্যমন্ত্র শুনাইয়া পাগল করিব। (পৃঃ ১১৬)
৩. মন হয় পবন পবন হএ সাঞি
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।

তুল : ১. মাররে জোইআ মুসা পবণা/ জেণঁ তুটঅ অবণা গবণা/... তবে বান্ধন ফিটঅ (২১নং)
২. কাআ ণবড়ি ঘান্টি মণ কেড়ুআল। (সরহ ৩৮ নং)

বাউলেরাও দেহকে 'মন-পবনের নাও' বলে জানে। গোরখবাণী, যোগীকাচ প্রভৃতি সর্বত্র যোগতন্ত্র ও বামাচারী সাধনার কথা মেলে। এমনি করে বাঙলার সূফী তত্ত্বে ও সাহিত্যে, বাউলগানে ও তত্ত্বে, সহজিয়া সাধনায় ও গানে আমরা চর্যাপদাবলীতে বর্ণিত সব তত্ত্ব ও রূপক ভাষান্তরে পাই। গোরক্ষবিজয়ে চর্যাপদের মতো হেয়ালী বা সন্ধাভাষায় ব্যক্ত তত্ত্বও মেলে :

১. পুকুরে পানি নাই পাড় কেন ডুবে
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।
২. গুরু মীননাথর উল্টা উল্টা ধারা
পুকুর মুড়ে ধান শুকাইয়া উগার তলে বাড়া—
৩. মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে।

তুল : পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল পাষাণ বিঁধিল ঘুণে।—অনিল পুরাণ, সহদেব চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং মাদলের ধ্বনি দিয়ে মীননাথের চৈতন্যসম্পাদনও এ সূত্রে স্মর্তব্য। সহজিয়া গানে :

১. সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি,
২. মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে ইত্যাদি
৩. জলেতে নামিবি নীর না ছুঁইবি
৪. তোরা না হইবি সতী/ না হবি অসতী।
৫. মৃত্তিকার উপর জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।

বাউল গানে :

১. আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
তথা এক পরশী বসত করে।
২. আমার জন্মের ষোল বছর পরে
পিতার জন্ম হল।
৩. উঠন ঠন ঠন করে রে ভাই ঘরে জলের ঢেউ
নৈরামণি নিরঞ্জনে পায় না খুঁজে কেউ।

এমনি উদাহরণ বাউল গানে অসংখ্য মেলে।

সন্ত কবীরের পদেও চর্যাগীতির অনুসৃতি মেলে :

১. বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ।
বছরা দুহে তীন্যুঁ সাঁঝ।
মাস পসারী চীহল রখবারী।
মূসা খেবট নাব বিলইয়া
মীড়ক সৌবৈ পহরইয়া।
২. দেখত সিংহ চরাবত গাঈ
জলকি মুছলি তরুবর ব্যাঈ। ইত্যাদি।

নাথ সাহিত্যে :

১. মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি।
২. সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই
ডুবিল দেউল চূড়া।

সর্বপ্রধান কথাটাই সর্বশেষে বলছি : জিন বর্ধমানমহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ ছিলেন শাসন-শোষণ-পেষণ ক্লিষ্ট অনার্য মানবতার দ্রোহী নেতা। মহাবীর বলেছেন তাঁর আগে আরো তেইশ জন তীর্থঙ্কর তাঁর অনুরূপ বাণী প্রচার করেছেন; গৌতম বলেন তাঁর আগে বহু বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছেন। এতে বোঝা যায় আর্যপীড়নের বিরুদ্ধে অনার্য অসন্তোষ-দ্রোহ ছিলই; তবে তা সুফলপ্রসূ হয়নি। আমরা জানি স্পার্টাকাসের মতো কোন কোন দ্রোহী (দৈত্য-যক্ষ-রাক্ষস-কুকুর গোত্র প্রধান অসুররূপে) নিহত-লাঞ্ছিত হয়েছে। যে দেব-দ্বিজ-বেদের দোহাই দিয়ে এ পীড়ন চলত সেই দেব-দ্বিজ-বেদের অস্বীকৃতিই এ দ্রোহের বীজমন্ত্র। এর ফলে বিজাতি ও

পুনঃপাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজেতা আর্যের কাছে ঘৃণ্য নির্জিত অনার্য গণমানব ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সমাজ-শাসন-শোষণ-লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পেল। অনার্য অধ্যুষিত মগধ-গৌড়-বঙ্গ-বরেন্দ্র উৎকলেই তাই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক প্রচার ও প্রসার এবং ভারতের সর্বত্র নিম্নবর্ণের ও নির্বিত্তের লোকেরাই আত্মকল্যাণে ও ব্যবহারিক জীবনে মুক্তিবাঞ্ছায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোক নব ধর্ম বরণ করেছে কম। একালে শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের বিরুদ্ধে বলা ও দল-করা সহজ। সেকালে শাস্ত্রে-সমাজে সরকারে পরিবর্তন আনবার জন্যে অপৌরুষেয় শক্তির ও নির্দেশের দোহাই দিতে হত। তাই আজকাল যা রাজনীতি সেকালে তা-ই ছিল ধর্মনীতি। কিন্তু কারণ-করণ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। কেবল উপায় ছিল ভিন্ন। তাই সেকালের রাজনীতিক, আর্থনীতিক কিংবা সমাজনীতিককে হতে হত শাস্ত্রকার, ধর্মসংস্কারক কিংবা নবধর্মের প্রবর্তক। যা কিছু হত সবটাই ঐ পারত্রিক জীবনের, শাস্ত্রের ও ধর্মতত্ত্বের আবরণেই সম্ভব হত। ফলে একালে আমরা সেকালের সমাজ কিংবা ধর্ম-বিবর্তন ও বিপ্লবকে একালের মতো ঠিক আর্থিক সামাজিক কারণ-কার্যের তত্ত্ব প্রয়োগে ব্যাখ্যা করবার উপায় উপকরণ পাইনে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ ভাঙবার জন্যেই যে মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ নবলব্ধ অধ্যাত্ম সত্যের অজুহাতে দ্রোহ-বিপ্লবের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার অস্বীকৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মত মানুষের পীড়ন-মুক্তির দিশারী ও নব চিন্তাচেতনার প্রবর্তক। এ সূত্রে নব শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং দর্শনও গড়ে উঠল। বৌদ্ধমত প্রচারের মাধ্যমেই গোটা এশিয়ার তথা বহির্বিশ্বে ভারতের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেল। সে কারণে বৌদ্ধমত আমাদের গৌরবের ও গর্বের স্মারক। চার আর্যসত্য ভিত্তিক বৌদ্ধদর্শন পার্থিব ও শারীর জীবনের যন্ত্রণা, অসারতা ও পরিণাম-ভয়াবহতাকে একান্ত ভাবনা ও আলোচনার বিষয় করেছিল। ফলে অবিদ্যা, স্কন্ধ, তৃষ্ণা প্রভৃতি বৌদ্ধমনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এবং তা-ই জাগিয়েছিল বিষয়-বিরাগ, ভোগ-ভীতি এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যে মাধুর্যে ও আনন্দে বীতরাগ। কাজেই চতুষ্কোটিবিমুক্ততা, শূন্যতা ও নির্বাণ ব্যতীত তাদের বাঞ্ছিত ও সাধ্য আর কিছুই ছিল না। প্রাণ-মন সমন্বিত জৈবজীবনের পক্ষে এ তত্ত্ব ও শিক্ষার বাস্তবে সনিষ্ঠ আচরণ ও রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। তাই এতো সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তাপ্রসূত মুক্তির আশ্বাসও ভোগকামী মর্ত্যমায়ামুগ্ধ সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। ফলে বৌদ্ধমতাদর্শের উদ্ভব ক্ষেত্রেই বৌদ্ধমতের ও সমাজের বিকৃতি ও বিলুপ্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

২

চৌরাশীসিদ্ধা তত্ত্ব

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ধর্মসাহিত্যে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি গভীর তাৎপর্যবহ। তত্ত্ব সাহিত্যে ঐ সংখ্যাটি এতো বহুল ব্যবহৃত যে পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়েই পারে না। সংস্কৃতে প্রাকৃতে অবহট্‌ঠে ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধন সম্পর্কিত মরমীয়া সাহিত্যের প্রায় অপরিহার্য অংশ ঐ চৌরাশী সংখ্যাটি। এ ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক ও অনার্য সংস্কার প্রসূত। এ অনেকটা আরবী ঐতিহ্যের ও ইসলামী ঐতিহ্যের 'সত্তর' সংখ্যার মতো। অসংখ্য নির্দেশক এই 'সত্তর' আরবী ভাষার বাগ্বিধির অঙ্গ এবং প্রাত্যহিক ও সর্বজনীন ব্যবহারে সুপরিচিত। চৌরাশীও 'অসংখ্য'-'অগণিত' অর্থে প্রযুক্ত হত। প্রাচীন সংস্কারের ও তাৎপর্যের বিস্তৃতি ঘটলেও আজো তিন-পাঁচ-সাত-নয় প্রভৃতি সংখ্যা যেমন দূর-অতীতের যাদু-বিশ্বাসের অবোধ্য ইঙ্গিতবহ, 'চৌরাশী'ও তেমনি এক বিস্মৃত সাংকেতিক সংখ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে, অন্তত চৌদ্দ শতক থেকে 'চৌরাশী' সংখ্যার তাৎপর্য-নিরূপণ প্রয়াস বিকৃত ভাবে শুরু হয়। ঐ শতকের প্রথম পাদে মিথিলার কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর তাঁর 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে 'অথ চৌরাশীসিদ্ধা বর্ণনা' শীর্ষক অধ্যায়ে মাত্র আটাত্তর জন সিদ্ধার নামে তালিকা সংকলন করেছিলেন। তিব্বতী সূত্রে প্রাপ্ত চৌরাশীজন মহাসিদ্ধের নাম ও পরিচয় সংকলন করেছেন Albert gruenwedel, কিন্তু জ্যোতিরীশ্বরের ও gruenwedel-এর তালিকায় অভিন্ন নাম বেশি নেই। যদিও চর্যাগীতি ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত অধিকাংশ নাম উভয় তালিকায় মেলে। যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, চামারী (চর্মারু), তন্তি পা, কমারী (কর্মার), কপাল, মেদিনী, দারি পা (দারিক), ধোবী, কামারী, (কমলাম্বর) পাসল (পাচল), কাহ্ন, জালন্ধরী, মবহ (সরহ), বিরূপ, টেঙ্গি, নাগার্জুন, চেণ্টস (ঢেণ্টন), চর্পটি, ভাদে (ভদ্র), ধর্ম (ধাম), শবর-শান্তি, চাটিল (চাটিল), কমল (শীল)। তিব্বতী তালিকায় আমাদের পরিচিত আরো কয়েকটি নাম মেলে, যথা—লুই, ডোম্বী, হেরুক, ভীনাপা, সরহ, রাহুল ভদ্র, রত্নাকর শান্তি, আর্যদেব, নাড়োপাদ, তৈলিক পা, কঙ্কণ, কম্বল, কুক্কুরীপাদ, মহী, ইন্দ্রভূতি, বজ্রঘণ্ট, জয়ানন্ত (জয়নন্দী) প্রভৃতি।

বৌদ্ধ চৌরাশীসিদ্ধা বা নাথ মহাসিদ্ধার যে সব নাম উভয় তালিকায় বিধৃত, তাঁদের আবির্ভাব কাল মোটামুটি খ্রীস্টীয় পাঁচ শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে। চৌদ্দ শতক থেকে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি নাথ বা বজ্র সহজযানী সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যাবাচক ও জ্ঞাপক রূপে 'যোগরূঢ়' হয়ে গেছে। অথচ চৌরাশীর তেমন নিশ্চিত সংজ্ঞা তথ্যবিরোধী।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় চৌরাশীর বহুল ও ব্যাপক ব্যবহার ও তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন :

ক. বৌদ্ধ পূর্ব যুগের আজীবিকদের বিশ্বাস ছিল যে চৌরাশী লক্ষ স্তর বা অবস্থা (জন্মান্তর) অতিক্রম করে আত্মা মনুষ্য দেহে স্থিতি পায়।

খ. মৈত্রায়নী উপনিষদে চৌরাশী হাজার বার জন্মের বা জন্মান্তরের উল্লেখ রয়েছে।

গ. কোন কোন তন্ত্রে ও পুরাণে বিভিন্ন অবস্থায় চৌরাশী লক্ষ যোনী ও জন্মের কথা আছে।

ঘ. বৌদ্ধদের 'ধর্মস্কন্ধ' (ধর্মস্কন্ধ)-এর সংখ্যা চৌরাশী হাজার।

পালি ভাষায় রচিত 'গন্ধবংশ'-এ বলা হয়েছে, যে-সব পণ্ডিত চৌরাশী হাজার সংখ্যক ধর্মস্কন্ধের টীকাভাষ্য রচনা করবেন, কিংবা টীকাভাষ্য রচনায় অন্যদের প্রবর্তনা দেবেন, তাঁরা চৌরাশী হাজার চৈত্যনির্মাণের, চৌরাশী হাজার বুদ্ধমূর্তি গঠনের এবং চৌরাশী হাজার বিহার প্রতিষ্ঠার পুণ্য অর্জন করবেন ও করাবেন। আর যাঁরা সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন, লিপিবদ্ধ করবেন বা করাবেন এবং যাঁরা বুদ্ধবাণীর পুথি সংরক্ষণ করবেন ও করাবেন তাঁরা ঐরূপ পুণ্য পাবেন।

ঙ. পালি গ্রন্থ 'অনাগত বংশ'-এ ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্যবরণ কালে চৌরাশী হাজার বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজপুত্র ও চৌরাশী হাজার বেদজ্ঞব্রাহ্মণ তাঁকে অনুসরণ করবে।

চ. যোগ ও তন্ত্রের যোগাসনের ব্যায়াম চর্যাপদ্ধতিও চৌরাশী প্রকার, এমনি কোন কোন গ্রন্থে চৌরাশী হাজার বলেও উল্লিখিত হয়েছে। জীববিবর্তন স্তরও হচ্ছে চৌরাশী হাজার।

ছ. কান ফাটা যোগীদের জপমালায় রয়েছে চৌরাশী বিটি বা দান।

জ. স্কন্দপুরাণেও রয়েছে চৌরাশী প্রকার শিবলিঙ্গের বর্ণনা।[১]

---

১. Obscure Religious Cult as Background of Bengali Literature. C.U.pp. 234-36

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই বজ্র-সহজযানী কিংবা নাথপন্থী সিদ্ধাদের চৌরাশীও নিতান্ত সিদ্ধা সংখ্যাজ্ঞাপক না হওয়ারই কথা। এর অন্য গূঢ় সাংকেতিক তাৎপর্য থাকাই সম্ভব। মনে হয় চৌরাশীর সাংকেতিক ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক হলেও মহাযানী বৌদ্ধমতের উন্মেষ, প্রচার ও প্রসার কালেই পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তা লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করে তাই আমরা পূর্ব-ভারতে, নেপালে ও তিব্বতে চৌরাশীর গুরুত্ব দেখতে পাই। এমন কি দাক্ষিণাত্যে ও জাভায়[১] কোন কোন সিদ্ধানাম অজ্ঞাত নয়। বার্মায় চীনে ইন্দোচীনে ও জাপানে তথা বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র এই চৌরাশীর সংস্কার কোন না কোন অর্থে মিলবে বলেই আমাদের ধারণা।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য মানস প্রসূত তত্ত্ব ও মত তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না। এই যোগতান্ত্রিক সাধনপন্থায় যারা কায়াসাধন করে দেহ ও দেহজ চেতনা নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করে, তারাই সিদ্ধাপুরুষ বা সিদ্ধা। স্মরণাতীত কাল থেকে আজীবিক, কাপালিক, লোকায়তিক, চার্বাকপন্থী , মন্ত্রী, তন্ত্রী, কালচক্রী, বজ্রী-সহজী, সন্তশৈব-নাথপন্থী, বাউল-বৈষ্ণব-সহজী-সূফীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে যৌগিক এবং (কমবেশি) তান্ত্রিক সাধনাকেই লক্ষ্য ও সিদ্ধির অবলম্বন করেছে। অজরত্ব, অমরত্ব ও অলৌকিক শক্তি অর্জনই এ কায়সাধনার সাধারণ লক্ষ্য। এ সূত্রে যোগী শিবতত্ত্বও স্মর্তব্য। মন্ত্র-তন-যোগ-কায় সাধন সবই শিবপ্রোক্ত বলে কথিত। পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে স্বধর্মরক্ষণপ্রয়াসী নির্জিত বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হয়। তাঁতী সম্প্রদায়ের নাথযোগী, ধর্মপূজক, নাথ-গোরক্ষপন্থী, সহজিয়া বৈষ্ণব ও নানা নামের হিন্দুমুসলিম বাউলরা সেই বৌদ্ধ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'নাথপন্থ যে বৌদ্ধ তন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'[২] সুকুমার সেনও স্বীকার করেন, "মহাযান উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক উপাসনায় স্থান পাইল এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। (বাঃ সাঃ ইঃ পৃ-৭৭।[৩]

"চর্যামতের এই ধারাটি (বামাচারী ধারা) বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়াছে এবং নাথপন্থী ও গোরখপন্থী সাধকেরাও চর্যাসাধনার ঐতিহ্যের অনুসারী।" আবার অন্যত্র ডোমনী-কাপালিকের প্রসঙ্গে শিব-শক্তির লৌকিক ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর সূত্রে তিনি বলেছেন : "এখানে শৈবযোগীদের সঙ্গে বৌদ্ধযোগীদের এবং চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তী কালের শিব-সঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।"[৪] "হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি একটি অদ্বয়তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব।"[৫] কাজেই কেবল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ প্রচারণায় নয়, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রাবল্যেই ভারতব্যাপী সন্ত-যোগী-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর প্রাদুর্ভাব সম্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে এমনি করেই আদিনাথ গোরক্ষনাথ মীননাথ ময়নামতী মানিকচন্দ্র-যোগীপালতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য নাথ-শৈব-শক্তি ও ইসলামী সূফী আবরণ ধারণ করে। নাদ-বিন্দু বামাচারে কিংবা ব্রহ্মচর্যে সবারই সাধ্য।[৬] তাই মীননাথ গোরক্ষনাথ কানুফা হাড়িফা—সিদ্ধা কাহিনীও বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিমের স্মরেণ্য ও আলোচ্য।

---

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ সন।
২. বাংলা সাহিত্যের কথা (ন, সং ১৯৬৩ সন), পৃ ১০-২০ এবং চর্যাগীতি পদাবলী (তয় সং ১৯৭৩ সন), পৃঃ ৪০,৪২-৪৭।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৭৭ এবং চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৪৭,৪০-৪২।
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৭৭ এবং চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৪৭,৪০-৪২।
৫. বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি : শশিভূষণ দাশগুপ্ত (৩য় মুদ্রণ), পৃ ৯৫।
৬. বাঙলার সূফী সাহিত্য ও বাউলতত্ত্ব গ্রন্থদ্বয়—আহমদ শরীফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকস্মিকভাবে চৌরাশীর একটা ব্যাখ্যা মিলছে ষোল শতকের কবি 'নবীবংশ' প্রণেতা মীর সৈয়দ সুলতান রচিত 'জ্ঞান প্রদীপে'। এ গ্রন্থে সূফীদের যোগ ও দেহতত্ত্ব ভিত্তিক অধ্যাত্ম সাধনার শাস্ত্র ও পদ্ধতি বিবৃত।

সৈয়দ সুলতানের বর্ণনায় দেখা যায় মানুষের দেহ স্ব স্ব আঙুলের পরিমাপে চৌরাশী আঙুল পরিমিতি, যেমন স্ব স্ব হাতের মাপে প্রত্যেকের শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত। অতএব চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহ ও দেহজ মন নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধ যে সাধক, সেই চৌরাশী সিদ্ধ বা সিদ্ধা। অর্থাৎ কায়াসাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ বা নারীই সিদ্ধা। সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহের রূপকার্থক পরিভাষা হচ্ছে 'আউটি'। 'আউটি' মধ্যযুগের সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত (অর্ধচতুর্থী>আউটি?)। তেমনি এই চৌরাশীও। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মতো চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সাংকেতিক সংখ্যা মাত্র।"[১]

'চৌরাশী' সংখ্যা সম্বন্ধে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের আবিষ্কৃত তথ্য, চৌরাশী সিদ্ধার বিভিন্ন অপূর্ণ তালিকা এবং তালিকায় নাম বৈসাদৃশ্য আর নাথ ও সহজপন্থীদের পরস্পর বিরোধী দাবির আলোকে বিচার করলে সৈয়দ সুলতানের এ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও অসত্য বলে মনে হবে না।

সৈয়দ সুলতানের মতে যোগাসনে শরীর চৌরাশী আঙুল পরিমিত হয়, যেমন—

পা থেকে গুহ্যদ্বার	১/২	আঙুল
গুহ্যদ্বার থেকে লিঙ্গ	১/২	,,
নিতম্ব থেকে চিতি	৪	,,
চিতি ,, হাঁটু	৪	,,
হাঁটু ,, উরু	১/২	,,
উরু ,, শ্রীহাট	৮	,,
শ্রীহাট ,, দেহকেন্দ্র	৮	,,
দেহকেন্দ্র ,, মেরুদণ্ড	৩/২	,,
মেরুদণ্ড ,, নাভি	৮	,,
নাভি ,, হৃৎ	১৪	,,
হৃৎ ,, কণ্ঠ	৬	,,
কণ্ঠ ,, জিহ্বা	৪	,,
জিহ্বা ,, নাসা	৪	,,
নাসা ,, আঁখি	১/২	,,
আঁখি ,, ভ্রূ	১/২	,,
ভ্রূ ,, ললাট	২	,,
ললাট ,, উষ্ণীষ	৩	,,
	৮৪	আঙুল

১. ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়'-এর ভূমিকা ১খ (৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু যোগাসনে নয় দাঁড়ানো অবস্থায়ও শরীর স্ব স্ব মাপে ৮৪ আঙুল পরিমিত। তালুর সংলগ্ন আঙুলমূল দিয়েই মাপা বিধেয়। জ্ঞানপ্রদীপ থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহের পরিমাপ :

শরীরে কহিমু তত্ত্ব অদ্ভুত আকার।
পদাঙ্গুলি আদি করি মস্তকের স্থল
শরীর আধার মূল চুয়াল্লিশ আঙ্গুল।
শরীরের পাদপদ্ম দ্বাদশ আঙ্গুল
দ্বাদশ আঙ্গুল হএ তার আদি মূল।
সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষে।
পায়ের আঙ্গুল দেহ নহে ভিন্ন মান
পাও হন্তে অর্ধ আঙ্গুল হএ কুলূপের স্থান।
গুহ্য হন্তে লিঙ্গ হএ অর্ধ আঙ্গুল
জঙ্ঘা হন্তে এগার আঙ্গুল চিতি মূল।
চিতি হন্তে অষ্ট আঙ্গুল হএ জানু দুই
জানু উরু মধ্যে হএ আঙ্গুল আড়াই
উরু হন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
তাহা হন্তে দেহমধ্যে অষ্টম আঙ্গুল।
সেই হন্তে মেরু জান আউট প্রমাণ
মেরু হন্তে অষ্ট আঙ্গুল নাভি স্থান।
নাভি হন্তে চৌদ্দ আঙ্গুল হৃদয়
হৃদ হন্তে কণ্ঠ হএ আঙ্গুল ছয়।
কণ্ঠ হন্তে চারি আঙ্গুল জিহ্বা মূল
জিহ্বা হন্তে নাসা হএ এ চারি আঙ্গুল।
নাসা হন্তে অর্ধ আঙ্গুল চক্ষু স্থান
তার মধ্যে ভাত জ্যোতি দেখিবা সুঠাম।
চক্ষু হন্তে ভুরু মধ্যে অর্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জান যোগের আদিমূল।
নাভিস্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবারাত্রি নীর বিন্দু বহে।
ভুরু হন্তে দুই আঙ্গুল কপাল বসতি
কপাল হন্তে তিন আঙ্গুল চুল সিতি।
এহি কর্ম হন্তে জান স্থির হএ মতি
ইহা হন্তে জান অক্ষয় সুগতি।
এহি দ্বাদশ স্থানে বায়ু আরোপিয়া
স্থান হন্তে স্থান বায়ু তুলিবা চাপিয়া।
কহিল অপূর্ব কথা প্রসন্ন হৃদএ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল করিয়া দেখ হএ কি না হএ।
গুরু শাহ হোসেন পদে করিএ ভকতি
সৈয়দ সুলতানে কহে পরস্তাব স্থিতি।[১]

ষোল শতকের শেষ পদের কবি সৈয়দ সুলতান (নবীবংশ রচনাকাল ১৫৮২-৮৪ খ্রীঃ) নিশ্চয়ই তাঁর সমকালে লোকশ্রুতি কিংবা গ্রন্থসূত্রে এই তথ্য পেয়েছিলেন। নইলে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে 'চৌরাশী' আঙুলের পরিমাপ বর্ণনা করতে পারতেন না।

সহজে শরীর মধ্যে আঙুল চৌরাশী
চৌরাশী আঙুল হেন সর্বলোকে ঘোষে।

'সর্বলোকে ঘোষে'-এ উক্তিতে আমাদের অনুমানের সমর্থন মেলে।

৩

সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা

চর্যাগীতির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যাভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।"[২]

মুনিদত্ত তাঁর টীকায় সন্ধ্যাভাষ, সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাসংকেত, সন্ধ্যা ও ব্যাজ প্রভৃতি চর্যার রূপকাশ্রিত দুর্বোধ্য অংশের বা প্রতীকী শব্দের ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বারবার প্রয়োগ করেছেন।

অদ্বয়বজ্র ও তাঁর 'দোহাকোষপঞ্জিকা' নামের টীকাগ্রন্থে 'সন্ধাভাষ'-এর উল্লেখ করেছেন। এমনকি বেদেও রূপকার্থে দ্ব্যর্থবাচক সন্ধ্যাভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্বয়বজ্রসূত্রে এ তথ্যও জানা যায়।[৩]

হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যাভাষাকে মন্ত্রভাষা সময়সংকেত (Conventional signs) ও যোগিনীদের ব্যবহৃত গুহ্যভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪]

প্রহেলিকা হেঁয়ালি ধাঁধার ও তত্ত্বসংকেতের এবং কাব্যের ভাষা চিরকালই দ্ব্যর্থবোধক, সাংকেতিক ও রূপকাশ্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ অভিসন্ধি বশে ব্যবহৃত ভাষার নাম সন্ধ্যাভাষা অথবা বাগর্থের আড়ালে ব্যঙ্গ্যার্থ সন্ধান করতে হয় বলেই এ ভাষা সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই এর অপর নাম দিয়েছিলন আলো-আধাঁরি ভাষা। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে[৫] এই ভাষার নাম সন্ধা—সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা লিপিকরপ্রমাদপ্রসূত। সম্-ধা অর্থাৎ একটি

---

১. New Light on Chadurasi Siddha : Ahmed Sharif. *Abdul Karim Sahitya Visharad Commemorial vol,* Asiatic society of Bangladesh, 1972, pp 345-51.

২. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, ভূমিকা।

৩. সুকুমার সেন : চর্যাগীতি পদাবলীতে উদ্ধৃত (পৃঃ ৩২)-তয়াশ্বেতচ্ছাগণিপাত নয়া নরকাদি দুঃখমনুভবন্তি। সন্ধাভাষমজানানত্বাৎ চ।"

৪. Indian Historical quarterly 1928..... Studies in the tantras 1939-P.P. 27-33

৫. সন্ধ্যাভাষম মহাভাষম্ সময়সংকেতবিস্তরম্। যোগিনীনাম মহাসময়ম। (হেবজতন্ত্র) ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক The Old Bengali Language & Text এ উদ্ধৃত পাদটীকা : পৃঃ ১২-১৩। বিস্তৃত তথ্যের জন্য তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'International language in the Tantras' by a Bharati, Journal of the American Oriental Society Vol. 81, 1961, pp 261-70. প্রবন্ধের প্রতি জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় লইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ভাষা। প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এ মত সমর্থন করেছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে অনেক সময় 'আভিপ্রায়িক ভাষাও' বলা হইয়াছে। পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটির এই অর্থে (বাচ্যার্থে ও ব্যঙ্গার্থে) বহু প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[১]

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে সন্ধা বা সন্ধ্যা 'শব্দটিতে ধ্যৈ' (বা ধা) ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম+ধৈ) অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম+ধা) তাহাই সন্ধ্যা (অথবা সন্ধা) ভাষা। একটি চর্যায় (১২ সংখ্যক) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে।

—পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্য পাদা।"[২]

অতএব সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত মিলল না। আলো-আঁধারি, অভিসন্ধি, অনুধ্যান, ব্যঙ্গ্যার্থ, গূঢ় অর্থ, সাংকেতিক অর্থ প্রভৃতি ব্যঞ্জক ও বাচক গুপ্ত মহাভাষার নাম সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা—এটুকু মাত্র জানা গেল। তবে সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা যে দ্ব্যর্থক ও রূপকাত্মক সে বিষয়ে মতানৈক্য নেই। এ সূত্রে এ-ও স্মর্তব্য যে সব গুপ্ত ও গুহ্য কর্মের ও আচরণের জন্যে একটা সাংকেতিক ভাষা প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনে কোড ওয়ার্ডের বা কোড ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার চোর-ডাকাত গুণ্ডা—চোরাকারবারীর সমাজেই বহু শুধু, বিপ্লবী-বিদ্রোহী-সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও দেখা যায়।

বহু বহু প্রতীকী শব্দ ছাড়াও চর্যাগীতিতে কয়েকটি প্রখ্যাত চরণ রয়েছে। এগুলো সন্ধা বা সন্ধ্য ভাষার ও গূঢ় সংকেতের প্রকৃষ্ট নমুনা:

১. রুখের তেন্তরি কুম্ভীরে খাই।
২. বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
৩. বেঙ্গস সাপ বঢ়িল জাঅ।
৪. জো সো চোরা সোই সাধু।
৫. নিতিনিতি সিয়াল সিহ সম জুঝে।
৬. পিটা দুহিএ এ তিন সাঝে।

এ ধরনের রূপক সাংকেতিক বচন তথা ধাঁধা বা প্রহেলিকা নানা সূফি-সহজিয়া-বাউলদের মধ্যে আজো চালু রয়েছে।

৪

চর্যাগীতির দেশ-কাল ভাষা

এবার আমরা বহু ও বিবিধ বিতর্কের আধার চর্যাগীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। বিতর্কিত সমস্যার সমাধান দেয়ার মতো প্রয়োজনীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, গবেষণা আমাদের নেই। ভাষাবিদ, লিপিবিদ, তত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ জ্ঞানী মনীষী বিদ্বান, গবেষকরা তা নানা ভাবে গত ষাট বছর ধরে করেছেন, করছেন এবং কোনো পাথুরে প্রমাণ না মিললে ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন।

---

১. ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বর্ণিত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (৩ সং), পৃঃ ১৩২।
২. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৩১।
৩. অপরাধ জগতের ভাষা—ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে কারো কোন মত বা যুক্তি কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগে গ্রহণ-বর্জন-সমর্থনের অধিকার যে-কোন আগ্রহী পাঠকের যেমন থাকে তেমনি রয়েছে আমাদেরও। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল সেই অধিকারই প্রয়োগ করব নিরপেক্ষভাবে।

বিতর্কিত বিষয়গুলো এই :

১) চর্যাগীতির নাম কি?—চর্যাচর্যচয়; চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়, আশ্চর্যচর্যাচয়, চর্যাগীতিকোষ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়?

মুনিদত্ত যে প্রাপ্ত সটীক চর্যাগীতি সংগ্রহের টীকাকার তা তিব্বতী সূত্রে আবিষ্কার করেছিলেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান জানতেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর সেই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

মুনিদত্তের চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ছাড়াও অন্যান্য চর্যাগীতি সংকলনের আরো চারটি টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল :

ক. চর্যা মেলায়ন প্রদীপ—আর্যদেব।

খ. চর্যাগীতিবৃত্তি—দীপঙ্কর পণ্ডিত

গ. চর্যামেলায়ন প্রদীপ নামটীকা—শাক্য মিত্র।

ঘ. চর্যামেলায়ন প্রদীপ—শ্রদ্ধাকর বর্মণ।

কাজেই এরূপ শত শত চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল হয়তো। আমাদের প্রাপ্ত চর্যাগীতিসমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করি এবং তাই একই ব্যক্তির রচিত বিভিন্ন চর্যাগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মতো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাবানুসারে বিন্যস্ত হয়েছে।

এক কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্রকীর্তি মুনিদত্তের সমূল টীকা গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। শীলচারী নামে এক ব্যক্তিও চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ করেছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও চর্যাগীতির সংকলক বলে কথিত। টীকা গ্রন্থে উদ্ধৃত চর্যাগীতির মূলপাঠের টীকায় প্রাপ্ত পাঠান্তর দৃষ্টে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন মুনিদত্তের সমূল টীকার প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকর মূল ও টীকা স্বতন্ত্র পুঁথি থেকে নকল করেছিলেন। কারণ টীকার পুঁথিতে মূল ছিল না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি দুটো :

১. টীকাকার এক চর্যার টীকা শেষ করে অপর চর্যার টীকার শুরুতে "তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি" ইত্যাদি লিখেছেন এবং

২. একক পুথির নকলকার এগারো সংখ্যক চর্যার পরে 'মূনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি' লিখতেন না। এ অনুমান যথার্থ বলে মনে হয়।[১] তারাপদ মুখোপাধ্যায়ও এ মত সমর্থন করেন। পাঠান্তর সাধারণভাবে বহুল প্রচলন ও প্রাচীনত্বের দ্যোতক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেয়া নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। মুনিদত্তের টীকার প্রারম্ভ শ্লোকের আলোকে কেউ কেউ 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামের পক্ষপাতী। 'বিনিশ্চয়' টীকা জ্ঞাপক এক্ষেত্রে মুনিদত্তের টীকাগ্রন্থের পুরো নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বলে অনুমান করা চলে। মুনিদত্তের শ্লোকে উক্ত 'নিমলগিরামটীকাম' থেকে তার টীকার উপযুক্ত নাম 'নির্মলগিরাটীকা' বলে অনুমান করেন ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রদত্ত নাম চালু রাখার পক্ষপাতী।[২] বস্তন হগ্যর গ্রন্থে সমূল টীকার সমূল অনুবাদগ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।

---

১. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং), প্রস্তাবনা ও পৃঃ ১। চর্যাগীতি পৃঃ ১৪-১৫।

২. The old Bengali language and Text, p. 4.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনিদত্তের টীকার কীর্তিচন্দ্র অনূদিত গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। কাজেই মূল সংকলন গ্রন্থের নাম চর্যাগীতিকোষ হওয়ারই কথা। 'কোষ' যুক্ত গ্রন্থনাম সেকালে বহুল প্রচলিত ছিল।

অতএব বাঙলায় 'চর্যাগীতি' নামে আখ্যাত করাই সঙ্গত। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে 'চর্যাপদাবলী'ও বলা চলে। 'অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইল। ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝই'। কাজেই 'চর্যাগীত' নামও রাখা যেতে পারে।

২) চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল কোন্ শতক? লিপি বাঙলা না নেওয়ারী?

প্রাপ্ত সটীক চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল বারো বা চৌদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে বলে অনুমিত। এই পুথি বঙ্গাক্ষরে লিপীকৃত বলে বাঙালী বিদ্বানদের ধারণা এবং এই ধারণা নিঃসন্দেহে যথার্থ। কিন্তু লিপিকাল বারোশতক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত 'পঞ্জিকার' নামের পুথির লিপির সঙ্গে চর্যার লিপির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।[১]

৩) চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত কোন্ শতকের লোক?

তত্ত্বগ্রন্থের টীকা ভাষার জটিলতার জন্যে রচিত হয় না, তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যেই রচিত হয়। কাজেই চর্যাগীতির রচনাকাল ও টীকাকারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আবশ্যিক নয়। তবে মুনিদত্তের টীকার রচনাকাল ও প্রাপ্ত পুথির লিপিকালের মধ্যে ব্যবধান যে সামান্য ছিল না তার প্রমাণ মূল ও টীকার পাঠে পার্থক্য। মুনিদত্তের সময়ে চর্যার গীতিসংগ্রহটি বহুল প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাজেই মুনিদত্তের এই টীকা নেপালীদের জন্যে রচিত হলে অবশ্য ভিন্ন কথা, কিন্তু বাঙালীর জন্যে রচিত হলে তা বৌদ্ধ বিলুপ্তির আগেই রচিত হয়েছিল বলে মানতে হবে। সেক্ষেত্রে টীকা রচনার কাল এগারো বারো শতকের পরে যায় না।

৪) চর্যাগীতি কোন্ ভাষায় রচিত?—উড়িয়া, মৈথিল, বাঙলা, অসমীয়া?

এ প্রশ্ন আলোচনার পূর্বশর্ত হচ্ছে : ক. চৌদ্দ শতকের পূর্বে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শিষ্ট লেখ্য সাহিত্য রচনার রেওয়াজ ছিল কিনা প্রমাণ করা এবং খ. উড়িষ্যা বিহার বাঙলা আসামের তথা গোটা পূর্বভারতের কবিগণ একই ভাষায় পদ রচনা করার মতো রাষ্ট্রিক, ভাষিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের যথার্থ কারণ ও প্রমাণ দেখানো।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাঁচজন চর্যাকারের রচনা বাঙলা নয় বলে স্বীকার করেন,—শান্তির ভাষা মৈথিলী, আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, কঙ্কণের অপভ্রংশ ঘেঁষা, মহীধরের মৈথিলী, জয়নন্দীর ভাষা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা প্রত্ন উড়িয়া-মৈথিলী-বাঙলা-আসামী আর কাহ্ন-সরহ-ভুসুকুর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী বলে মানেন। এবং চর্যাগীতির ভাষাকে তিনি 'বঙ্গ-কামরূপী' বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।[২] ডক্টর সুকুমার সেন বিভিন্ন সময়ে চর্যাগীতির ভাষা সম্পর্কে যেসব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেগুলো এখানে তুলে দিচ্ছি।—"উড়িয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বাল্যাবস্থায় তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই। কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না।'[৩] (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতের ব্যাখ্যাসূত্রে) চর্যাগীতির ভাষা 'বাংলার প্রত্নমূর্তি–অবহট্‌ঠের সদ্যোনির্মোকমুক্তরূপ'[৪]। চর্যাগীতির রচনাকালে

---

১. Ibid, pp. 63-64,96

২. বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), ১৯৬৩ সন, পৃঃ ৮৭-৮৮।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,১/পৃ/৩, পৃঃ ৬০।

৪-৭. চর্যাগীতি পদাবলী ৩য় সং—প্রস্তাবনা, পৃঃ ৮,৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবহট্‌ঠের প্রভাব সর্বদা উদ্যত ছিল'।[৫] চর্যাগীতির "ভাষায় একাধিক উপভাষার (পরে বা স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইয়াছে) মিশ্রণ আছে।"[৬] নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথমস্তরে সর্বত্র মোটামুটি একটি মিল ছিল।'[৭] অসমীয়া ভাষীদের দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাংলা ও অসমীয়া দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না।'[১] 'উড়িয়া আসামীদের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ'।[২] 'চর্যার ভাষায়' অবশ্যই একাধিক উপভাষার মিশ্রণ রয়েছে।[৩]

তেরো শতকের পরে উড়িয়া এবং ষোল শতকের পরে আসামী যে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়— সে সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন অভিন্নমত। উক্ত তিন পণ্ডিত এবং ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীও স্বীকার করেন যে চর্যাগীতি বারো শতকের মধ্যেকার রচনা। তা-ই যদি হয় তা হলে চর্যাগীতির উপর কোন এক অঞ্চলের বা এক ভাষার দাবি স্বীকার করা চলে না। সে ক্ষেত্রে চর্যার ভাষা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা লেখ্য প্রত্ন বাঙলা-উড়িয়া-মৈথিল-আসামীর অভিন্ন জননী-স্বরূপা বলে মানতে হয়। এ ভাষার ভিত্তি মাগধী বা গৌড়ী অবহট্‌ঠ নয়—শৌরসেনী। চর্যার মূল পাঠে ও পাঠান্তরে উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তা এবং বিভিন্ন চর্যায় একই পুরুষে ও কারকে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের প্রয়োগও রচনার দীর্ঘ কালপরিসর ও স্থান-বিস্তৃতির সাক্ষ্য।

৫) চর্যাগীতির সবকয়টি পদের ভাষা কি সমকালীন ও অভিন্ন?

মুখে মুখে জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে ভাষা যে প্রতি মুহূর্তে বিকৃত বা বিবর্তিত হয়—এ তথ্য অস্বীকৃত নয়। তাছাড়া শ্রোতার উদ্দেশ্যেই গায়েন গানের আসর করেন, লিপিকরও সমকালীন পাঠক লক্ষ্যে তৈরি করেন পুথি। উভয়েরই লক্ষ্য সমকালীন শ্রোতা ও পাঠক। তাঁরা যে সমকালোপযোগী করে শব্দ ও উচ্চারণ বদলান, এমন কি পাঠও ইচ্ছামতো বর্জন, সংশোধন ও সংযোজন করেন, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া লিপিকরপ্রমাদ তো থাকেই। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপ, ডাক, খনার বচন এবং মালাধর বসু কিংবা কৃত্তিবাসের প্রচলিত কাব্যের ভাষা দেখেই তা বিশ্বাস করতে হয়। অতএব বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় রচনা মাত্রেরই ভাষা পরিবর্তিত হয়। কাজেই প্রাপ্ত চর্যাগীতির ভাষার চর্যাকারদের ভাষা অবিকৃত নেই। এ ভাষা মুনিদত্তের সমকালীন। এমন কি লিপিকরের সমকালীনও হতে পারে। কারণ মূলপাঠ ও টীকা-বিধৃত পাঠ অভিন্ন নয়। যেটিতে প্রাচীনতার লক্ষণ বেশি সেটিই প্রাচীনতর পাঠ। বিভিন্ন কালে ও স্থানে বিভিন্ন কবি রচিত চর্যাগীতির ভাষা ও ব্যাকরণ গোড়ায় অভিন্ন ছিল না। আজো বিভিন্ন চর্যায় উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত পার্থক্য কিছুটা অবিলুপ্ত।

৬) বিভিন্ন চর্যাকারের জীবৎকাল ও জন্মভূম নিরূপণ।

সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে চর্যাকারের জীবৎকাল ও জন্মস্থান নিরূপণ। এ দুটোর সমাধান সম্ভব হলে, চর্যায় ভাষা, কাল ও স্থান সহজেই নিরূপিত হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৭) চর্যাপদগুলো কোন্ যানীর রচিত ও কোন্ যানের চর্যা বা সাধনতত্ত্ব নির্দেশক?

মন্ত্র, তন্ত্র, বজ্র, কালচক্র ও সহজযানে বাহ্য পার্থক্য অস্পষ্ট। চর্যাপদগুলো কি কোন বিশেষ যানের রচিত অথবা সব যানেরই গুহ্য সাধন পন্থ ও প্রতীক? বা চর্যা কি মূলত অভিন্ন

১. ভাষার ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং), পৃঃ ১৫।
২. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং) পৃঃ ৩৯।
৩. চর্যাগীতি (১৯৬৫ সন)–তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা পদগুলো বিভিন্ন যানীর সাধারণ তত্ত্বচেতনার স্বাক্ষর? যেমন মরমীয়া পদে একটা সর্বমানবিক ও সর্বাঞ্চলিক সাধারণ মানব আকুতির জিজ্ঞাসা রূপ পায়, এগুলো কি মত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৌদ্ধ মরমীয়া পদ? এ সব প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন।

বৌদ্ধ মহাযানের উপযান মন্ত্র ও তন্ত্র যানের প্রশাখা হচ্ছে বজ্র, কালচক্র ও সহজযান। সবটাই যোগ-তন্ত্র ভিত্তিক সাধনাসাপেক্ষ। নাদবিন্দু তত্ত্ব সবারই স্বীকৃত। কেউ বামাচারী কেউবা ব্রহ্মচারী—এ-ই যা তফাৎ। চর্যারও পার্থক্য সামান্য। শূন্য, নির্বাণ, সহজও প্রায় সমার্থক। সামরস্য, অদ্বয়তা, চতুষ্কোটিবিমুক্ত নির্বেদ অবস্থা ও ইচ্ছাশক্তি সবারই কাম্য এবং সাধনলক্ষ্য। সবাই মন-পবনের নৌকা এই কায়ার সাধক। শৈব, শাক্ত, নাথ, গোরখপন্থী, সহজিয়া, বৈষ্ণব, বাউল ও সূফীরা আজো এই সাধনার ধারক ও বাহক।

৮) এই ধর্মমত কি প্রাচ্য ভারতের সামাজিক ও গৃহস্থ বৌদ্ধদের মধ্যে চালু ছিল? না অন্তেবাসী নির্গ্রন্থ শ্রমণ-যোগী-তান্ত্রিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল? অথবা নির্জিত, নির্বিত্ত, অবজ্ঞেয় সমাজ-প্রান্তিক তথা নিম্নস্তরের আধা বুনো বর্বর মানুষের মধ্যে চালু ছিল?

৯) অঞ্চল বিশেষে বহুল উচ্চারণে তথা চর্চার ফলে লিখিত ভাষাও স্থানীয় বুলির প্রভাবে বিকৃত হয়—উচ্চারণে, ব্যাকরণে, বানানে ও বিভক্তিচিহ্নে। বিতর্কের অবসানের জন্যে, স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্যে এবং বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আবশ্যিক।

কয়েকটি তথ্য অস্বীকার করে আলোচনা করলে কিছু জটিলতা এড়ানো হয়তো সম্ভব বলে মনে হয় :

ক. উচাঁ উচাঁ পাবত বা টিলার ঘর—বাঙলার নয়, বাঙলা বিহার উড়িষ্যার প্রান্তিক অঞ্চলের এবং আসামের।

খ. শবর-শবরী অরণ্য-পর্বতবাসী—সমতলের নয়।

গ. নেড়ে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্যবাদী দ্বিজ নয়, মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ। বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—বৈর ক্লেশ আসক্তিহীন শুদ্ধচিত্ত সদাচারীই ব্রাহ্মণ, —জন্মসূত্রে নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম স্বীকার করে না, তবে চালু ব্রাহ্মণ্য পরিভাষা অর্থান্তরে ব্যবহৃত মাত্র। প্রমাণ তিব্বতী অনুবাদে সরহকে 'মহাব্রাহ্মণ ও মহাশবর' বলা হয়েছে (সুকুমার সেন—চর্যাগীতি পদাবলী ভূমিকা, পৃঃ ১৯)

ঘ. হরিণ বুনো প্রাণী এবং হাতী আসামে ত্রিপুরায় ও পার্বত্য-চট্টগ্রামে লভ্য—বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে নয়।

ঙ. পঁউয়া খাল পদ্মা নদী নয়—খাল এবং তা চতুষ্পদ্মরূপ সাধনস্তরে বা থানায় পৌঁছবার জন্যে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ খাল তথা নাড়ী নির্দেশক।-'পদ্ম গামী খাল'। সে খালে 'বজ্রনৌকা বেয়ে চলে ভুসুকু।'

চ. গঙ্গা-যমুনা—গঙ্গা (ভাগীরথী শাখা) ও যমুনা বাঙলা দেশে আছে বটে, কিন্তু এ নদীদ্বয় সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের ও উল্লেখের উত্তরভারতীয় নদী, চর্যাপদে ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহৃত।

ছ. বাঙ্গালী-ভইলী কিংবা বঙ্গালদেশ লোড়িউ—অবাঙালীর বাঙালী হওয়া ও বাঙলাদেশ লুঠ করা বোঝায়, ভুসুকু বাঙালী ছিলেন বলে নির্দেশ করে না। তা ছাড়া অদ্বয় বঙ্গালদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গ কামরূপ প্রভৃতির রূপকার্থ রয়েছে।

জ. ময়ূর, তুলাধূনা, নৌকা, নদী, কুমীর একান্তভাবে কোন অঞ্চলের নয়, বরং বধূর কামরূপ যাওয়া যোগতন্ত্রের বিকাশক্ষেত্রে (অমৃতকুণ্ড স্মর্তব্য)'কামরূপ কামাখ্যা' ঐতিহ্য স্মরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়ে দেয়। বঙ্গ বঙ্গাল-এর উল্লেখ যদি চর্যার বাঙলার দাবি সাব্যস্ত করে, তাহলে কামরূপের দাবিও কম নয়।

ঋ. পাল রাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই। গোটা বাঙলাদেশ কখনো পাল শাসনে ছিল না। আরাকান সম্ভূত সমতটের চন্দ্ররা এবং আরাকান রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। নাথ সাহিত্যের সূত্রে বোঝা যায়—এ অঞ্চলে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ গুহ্য সাধনার প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ রাজত্ব ও বৌদ্ধ সাধনার জের তেরো শতক অবধি চলার কথা। তন্ত্রভিত্তিক মন্ত্রযান প্রসূত কালচক্র-বজ্র সহজযান—পূর্বভারতে, নেপালে, তিব্বতে ও ইন্দোনেশিয়ায় (যবদ্বীপ সুমাত্রায়) জনপ্রিয় ছিল। পূর্ব ভারতের পাল রাজারা ও জাভা সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজারা বজ্রযানী ছিলেন। বজ্রযানী গৃহী সমাজে (পূর্ব-ভারতে নেপালে-তিব্বতে-জাভায়-সুমাত্রায়) বজ্রধর-বজ্রতারা-মঞ্জুশ্রী মূর্তি পূজিত হত। মন্ত্রযানীর একটি উপসম্প্রদায়ে দারু-টোনা-উচাটন-মারণ-বশীকরণ প্রভৃতিও প্রবল হয়—যা আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে, কামরূপে-কামাখ্যায়-নেপালে-তিব্বতে সুলভ। চর্যাগীতি নেপালে আজো চালু রয়েছে, যেমন সহজিয়া বাউল গান চলছে আমাদের দেশে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' ১৯১৬ সনে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ষাট বছর ধরে চর্যাগীতির ভাষা নিয়ে বিতর্ক চলছে বটে, কিন্তু ভাষাটা একটা উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য বা নিদর্শনের প্রাচীনত্ব দেখিয়ে আঞ্চলিক গৌরব বৃদ্ধি করা। এ সব উদ্দেশ্যমূলক আলোচনায় সত্য উদঘাটনের প্রয়াস আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের উকিলের যুক্তির মতো। তাই এই বিতর্কের এ অবস্থায় অবসানের আশা নেই।

গোটা প্রাচ্য ভারতে তথা উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা, আসামে ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য এই চর্যাগীতি। এবং উক্ত প্রদেশগুলোতে চর্যাগীতি স্ব স্ব ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ ও নিদর্শন হিসেবেই পড়া-পড়ানো হয়। কেউ দাবি ছাড়ে না— কেউ এ দাবি ছিনিয়ে নিতে পারে না। অবস্থাটা 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বই হিসেবে কাটতি আছে বলে এযাবৎ বিভিন্ন অধ্যাপক সম্পাদিত প্রায় দশ-বারোটি বিভিন্ন চর্যাগীতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আরো আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে ভবিষ্যতে আরো যে বেরুবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। হয়তো আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায়ও এমনি ডজন খানেক করে সম্পাদিত 'চর্যাগীতি' মিলবে। বিনা যুদ্ধে তো নয়ই, রণক্লান্ত হয়েও কেউ সূচ্যগ্র পরিমাণ দাবিও ছাড়বার আভাস দিচ্ছেন না। বরং বাঙালী পণ্ডিত সুকুমার সেনই এক্ষেত্রে কিছুটা উদারতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত মীমাংসার ইঙ্গিতও তাঁর কাছ থেকেই মিলেছে। তাঁর মতে চর্যাগীতি প্রত্ন বাঙলা-উড়িয়া-আসামী-মৈথিল ভাষায় রচিত। অতএব এটিকে একটি অর্বাচীন বা সর্বশেষ স্তরের অবহট্‌ঠে তথা বাঙলা-উড়িয়া-আসামী-মৈথিল বুলি স্বাতন্ত্র্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব সময় পরিসরে রচিত। কাজেই চর্যাপদ মুমূর্ষু অর্বাচীন প্রাচ্য বুলি প্রভাবিত শৌরসেনী অবহট্‌ঠে রচিত। তাই এতে প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং স্বাধিকারের লাভ ও লোভ কেউ ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না। বাঙালীর মুখপাত্র ভাষাবিদ দাবি প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু 'সর্বনাশ' ঐ পণ্ডিতযুগল ঠেকাতে পারেন নি, বরং বাঙালীর একক দাবি তাঁদের ঐ স্বীকৃতির ফলেই অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। উভয়েই স্বীকার করেছেন যে তেরো শতক অবধি উড়িয়া বাঙলা-অসমিয়া ভাষা অভিন্ন ছিল : এবং ষোল শতক অবধি আসামী-বাঙলায় কোন তফাৎ ছিল না। তা ছাড়া কোন কোন চর্যাকার অবাঙালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। অতএব বারো শতকের মধ্যে রচিত চর্যাগীতিতে উড়িয়া-বাঙালী-আসামীদের এজমায়েলী বা যৌথ অধিকার স্বীকৃতই হল। এ তথ্য অঙ্গীকার করার পরে বাঙালীরা চর্যাগীতিকে প্রাচীন বাঙলা বলে দাবি করতে পারে না। কেননা এ ভাষা কোনো একক আঞ্চলিক ভাষার পূর্বরূপ নয়। বাঙালীর গৌরব দুই প্রখ্যাত ভাষাবিদ এ তথ্য অঙ্গীকার করেও কেন চর্যাপদের ভাষাকে বাঙলা বলে দাবি করেন (শহীদুল্লাহ—বঙ্গ-কামরূপী), তা বাঙালী পাঠকের কাছে ব্যাখা করা বাহুল্য মাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ বের হবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাপদ ও দোহার ভাষা বাঙলা নয় বলে মত প্রকাশ করেন History of Bengali language গ্রন্থে ১৯২১ সনে। ১৯২৬ সনে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali language গ্রন্থে চর্যাপদকে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে বাঙলা রচনা বলে শাস্ত্রীর মত সমর্থন করেন। ১৯২৭ সনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত কাহ্ন ও সরহের গান ও দোহা পুস্তকে এবং পরবর্তী অনেক প্রবন্ধে ও গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা বাঙলা বলে প্রমাণ করেন। এমনি প্রমাণ অন্যত্রও মেলে।

বিহারের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক প্রবন্ধ লিখে চর্যার ভাষা মৈথিল বলে দাবি করেন এবং তিনিও ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থিত করেন। তারপর ডক্টর জয়কান্ত মিশ্র রচিত History of Maithli literature এবং বিহার সরকার প্রকাশিত Behar through Ages নামের গ্রন্থে চর্যাগীতি মৈথিল ভাষায় রচিত বলে দাবি করা হয়। এখন উড়িয়া আসামীরাও একই রকমের ভাষিক ও অন্যান্য তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে চর্যাগীতিতে স্ব স্ব ভাষার আদিরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ভাষা যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের সে দাবিও উঠেছে এবং প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যাগীতি থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরও রূপ এবং বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেনও চর্যাগীতির ভাষার ব্যাকরণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের বাঙলাপ্রীতি লক্ষণীয়ভাবে প্রকট।

আবহাওয়ার প্রভাবে, শারীরিক অসামর্থ্যে এবং ব্যক্তির অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে শব্দের উচ্চারণে, প্রয়োগে, পদান্বয়ে ও বিভক্তি প্রয়োগে নানা ত্রুটি প্রায় প্রতি উচ্চারণেই কিছু না কিছু হয়ই—এ তথ্য ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। কোন মানুষই একই শব্দ একই ভাবে বারবার উচ্চারণ করতে পারে না, কারণ মানুষ নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়। এ কারণেই একই মূলভাষা শত সহস্র বুলিতে বিকৃত হয়। কালান্তরে ও স্থানান্তরে আমাদের বাঙলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলের বুলির ব্যাকরণ, পদান্বয়, বিভক্তি প্রয়োগ ও উচ্চারণ বিকৃতির ফলে শব্দের রূপান্তর এতো পৃথক ও বিচিত্র হয়ে গেছে যে এ সবগুলো যে মাত্র হাজার বছর আগেকার একটি প্রাকৃতেরই উত্তররূপ তা আনাড়িরা কল্পনাও করতে পারে না। মালদহ-কোচবিহার-সিলেট-চট্টগ্রামের মানুষের বুলি বলতে গেলে একেবারে আলাদা, একের বুলি অন্যের কাছে অবোধ্য, কেবল কৃত্রিম লেখ্যভাষাই আমাদের ভাষিক সংহতি রক্ষা করে।

চর্যার বাঙলা বাঙলাদেশের কোন্ অঞ্চলের বুলির আদিরূপ—এ প্রশ্ন তাই সঙ্গত কারণেই ওঠে। পশ্চিমবঙ্গীয়রা এ প্রশ্নের জবাব স্বরূপ তাঁদের আঞ্চলিক বুলির দাবি পেশ করেছেন। মৌর্য আমল থেকেই গৌড়-পুণ্ড্রই কেবল প্রাচীন প্রশাসন ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। রাঢ় সুহ্মের এ খ্যাতির খবর আমাদের জানা নেই; অবশ্য তাম্রলিপ্ত পরে সপ্তগ্রাম ও বন্দররূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত। কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি কি বন্দরের না রাজধানীর লালনে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়? চর্যাগীতিধৃত পদান্বয় ও বিভক্তি (কারকে ও ক্রিয়ার) কি পশ্চিমবঙ্গের বুলির পূর্বরূপ?

চর্যাগীতি সেকালের শিষ্ট বা লেখ্য কৃত্রিম ভাষায় যে রচিত নয়,—তার প্রমাণ কি? বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের পদকার রাঢ়ী ভাষা শিখে সে ভাষায় পদ রচনার গরজ বোধ করলেন কোন্ প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে? ঐ ভাষা কি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তথা দরবারী ভাষা ছিল? গোটা প্রাচ্য ভারত কি ব্রিটিশপূর্ব যুগে কোন কালে একচ্ছত্র শাসনে ছিল? আমরা জানি শৌরসেনী প্রাকৃত দরবারী তথা প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা পেয়ে শিষ্ট ও লেখ্য ভাষারূপে আড়াই হাজার বছর আগেই প্রতিষ্ঠা পায়। আমরা এ-ও জানি লিখিত ভাষা মাত্রই কৃত্রিম ও রক্ষণশীলতাপুষ্ট। প্রাচ্য অঞ্চলের তাবৎ রচনা—প্রাকৃতপৈঙ্গল, দোহা প্রভৃতি সেই লেখ্য কৃত্রিম শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশে অবহট্‌ঠে নাটকের শিষ্ট প্রাকৃতে যে রচিত, তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। এমনকি পনেরো শতকের বিদ্যাপতির কাব্য কীর্তিলতাও মাগধী অবহট্‌ঠে রচিত নয়। চর্যাগীতিও লেখ্য শৌরসেনী অবহট্‌ঠের স্থানিক বিকৃতিদুষ্ট অর্বাচীন শৈলীতে রচিত। চৌদ্দ শতক অবধি কোন নব্য ভারতীয় ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। বিদ্যাপতির কীর্তিলতা, চৌদ্দ শতকে সংকলিত প্রাকৃতপৈঙ্গল, সরহ তিলোপা-কাহ্নপার দোহাকোষ, ডাকার্ণব, লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলা কবির অনুপস্থিতি, শেখ শুভোদয়ার মতো গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হওয়া এবং বাঙলা প্রকীর্ণ কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থের অভাব প্রভৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে চৌদ্দ শতক অবধি উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা-আসামী ভাষায় লিখিত সাহিত্য রচনার রেওয়াজ চালু হয় নি। বহুল চর্চায় সাধনসঙ্গীত হিসেবে নিত্য ব্যবহারের ফলেই তথা স্থানিক লোকব্যবহারে চর্যার ভাষা শিথিলগ্রন্থী ও সরল হয়েছে। তার প্রমাণ প্রাকৃতপৈঙ্গলের কোন কোন পদের এবং কোন কোন দোহার ভাষা কোন কোন চর্যাপদের ভাষার প্রায় অনুরূপ। এ কারণেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দোহাগুলো বাঙলায় রচিত বলে মনে করেছিলেন। 'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'। 'কহন্ত গুরু' বললে এ ভাষা পাঁচশ বছর এগিয়ে আসে। এমনি দৃষ্টান্ত আরো বহু দেয়া যায়। আজ ভুসুকু বাঙালী হইলি/নিজ ঘরণী চণ্ডালী লইলি ইত্যাদি।

সরহ-তিলোপা-কাহ্নপা একাধারে দোহা ও চর্যাগীতি রচয়িতা। চর্যাগীতি যদি বাঙালীর জন্যে রচিত হয়, তবে দোহা কাদের জন্যে রচিত হল?

অন্য যুক্তিও আছে। সমকালীন লেখকদেরও শব্দচয়ন, বাকরীতি, পদবিন্যাসকৌশল তথা রচনাশৈলীর মধ্যে এতো পার্থক্য থাকে যে তাঁরা যে একই সময়ে লিখেছেন, তা বোঝা যায় না। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা ১৮৪৭-৬৫ সনের মধ্যেই পাই, আরো বিশ বছর এগুলে চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথকেও পাই—এঁদের বাকরীতির পার্থক্য এতই প্রকট যে এঁদেরকে দু'শ বছর আগের পরের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়। তাছাড়া কোন প্রাচীন লেখকের ভাষা লোকের বহু চর্চার ফলে কালোপযোগী সংস্কার লাভ করে—গুণরাজখানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, পদসংগ্রহে বিধৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ, সর্বোপরি বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপান্তর প্রভৃতিই এ বিবর্তনের রূপান্তরের প্রকট উদাহরণ। প্রাকৃত মিশ্রিত ভ্রষ্ট-ব্যাকরণ বৌদ্ধসংস্কৃতের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কাজেই চর্যাসঙ্গীত রূপে সাধারণের নিত্য উচ্চারণের জন্যে রচিত পদের ভাষা বহুজনের বহুকাল ধরে বহু ব্যবহারের ফলে স্থানিক ও কালিক বিকৃতি পাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। সুতরাং ভাষার রূপ দেখে চর্যাগীতিকে দশ থেকে বারো শতকের রচনা বলে ডক্টর সুনীতিকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে রায় দিয়েছেন, তা যথার্থ হয় নি। বর্তমান রূপে চর্যা হয়তো ঐ সময়কার সম্ভাব্য ভাষার রূপই ধারণ করে, কিন্তু বিভিন্ন পদকারের জীবৎকালানুসারেই পদেরও রচনাকাল মানতে হবে। বিশেষ করে এখন এ তথ্য কেউ অস্বীকার করে না যে, চর্যাগীতির প্রাপ্ত পুথিটি বাঙালীর লেখা এবং বাঙলা হরফে লেখা, এটি এ অঞ্চলে বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য। কাজেই বাঙলা বুলির প্রভাবপ্রসূত বিকৃতিও এতে বেশি থাকার কথা। কে না স্বীকার করবে যে লিপিকর পরম্পরায় আনুপাতিক ও কালিক হারে বিকৃতি বাড়তে থাকে।

চর্যাগীতির বাঙালি আলোচক-গবেষকগণ চর্যাগীতিতে বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্বিত্ত ও নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ বাঙালির জীবন ও জীবিকা-চিত্র আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু বাঙলা-উড়িষ্যা-আসামের মানুষের জীবন ও জীবিকা পদ্ধতিতে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তেমন পার্থক্য লক্ষণীয় কি? মাংস-ভাত-ডোম-চাঁড়াল-শবর-নদী-শিয়াল-সিংহ ময়ূর-হাতী-হরিণ-কুমীর-কু'ড়ে-নলবন-নেড়েভিক্ষু, দাবা বড়ে, নৌকা, কেড়ুয়াল, বিয়ের বাজনা, দস্যুবৃত্তি, টিলা, উঁচু পর্বত, তেঁতুল, গঙ্গা-যমুনা-ত্রিবেণী-বাসন্তী শোভা, দুষ্ট বলদ, গাভী, হাড়ের মালা, দিগম্বর, শ্রাবক, জিন, অবৈধ প্রেম, তুক-তাক-উচাটন-কামরূপ কামাখ্যার সাধনা, ডাকিনী-যোগিনী, নারীহরণ, লাম্পট্য, নারীর কণ্ঠে কবরীতে ফুল, কর্ণকুণ্ডল, তাম্বুল, তুলা, ধুনন, কার্পাস ফুল, যৌতুক, সাঙ্গা, নানা অলঙ্কার, হাড়ি-পিঠা-গাড়ু প্রাচ্য ভারতের কোথায় দুর্লভ ছিল বা কার অজানা ছিল যে চর্যাগীতি-ধৃত জীবন-জীবিকার চিত্র একান্তই বাঙলার এবং বাঙালীর বলে নিঃসংশয়ে বলা যাবে। বরং পর্বত, টিলা, হাতী, হরিণ, শবর, চাণ্ডারী আসামেই সুলভ। হাড়িয়া মদ (আসব) ও দিগম্বর জৈন, কাপালিক সুলভ ছিল বিহার উড়িষ্যাতেই।

দোহাকোষের ও চর্যার তাত্ত্বিক বক্তব্য অভিন্ন। এগুলো যে বৌদ্ধ মন্ত্রযানের উপশাখা তান্ত্রিক কালচক্র-বজ্র-সহজযানীর মার্গ-চর্যা সঙ্গীত সে সম্বন্ধেও সবাই মোটামুটি একমত। এগুলোর তত্ত্ব এবং সে সঙ্গে উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষাদি অর্থালঙ্কার মাধ্যমে সমকালীন জীবন-জীবিকার ও সমাজ-সংস্কৃতির যে প্রতিবেশ চিত্রিত হয়েছে, তাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন অনেকেই। চর্যাপদের ছন্দ, সাহিত্যিক মূল্য এবং পরবর্তী সাহিত্যে এগুলোর প্রভাব সম্বন্ধেও সঙ্গত-অসঙ্গত, প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা আলোচনা রয়েছে। চর্যাগীতি এখন পূর্ব ভারতে ভাষা-সাহিত্যের পাঠ্যসূচীভুক্ত। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব আলোচনা বিস্তৃত হওয়া আবশ্যিক নয়।

কবির স্বনামে সম্মানজ্ঞাপক পা (পাদ) যুক্ত দেখে ঐ সব পদ গুরুর নামে শিষ্যের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কৃত্তিবাসকেও 'পণ্ডিত কৃত্তিবাস' ভণিতা দিতে দেখি। 'সরস্বতী আমার কণ্ঠে স্ফুরে' এই দম্ভোক্তি তাঁর। একালে ফোনে স্বনামে 'বাবু' 'সাহেব' ব্যবহার করেন অনেকেই।

পদকাররা নিশ্চয়ই এ রকম আরো শত শত পদ রচনা করেছিলেন। আরো বহু অজ্ঞাতনাম কবির পদ কদরের অভাবে নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে গেছে। দীপঙ্কর, আর্যদেব, শাক্যমিত্র, অজ প্রভৃতিও চর্যা সংকলন করেছিলেন বলে তিব্বতী সূত্রে জানা যায়। মুনিদত্ত নিশ্চয়ই বেছে বেছে তাঁর মতে গুরুত্বপূর্ণ ৫১ টি পদ সংকলন করে টীকাভাষ্য রচনা করতে থাকেন। এগুলোর মধ্যে তিনি লাড়ীডোম্বীপাদের রচিত একটি পদের [১১সং পদ] টীকা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। রইল সটীক পঞ্চাশটি পদ। তার মধ্যে পুথির চারটি [৩৫–৩৮] পত্র বিনষ্টির ফলে ২৩-এর শেষাংশ এবং ২৪, ২৫, ৪৮ সংখ্যক পদের পাঠ বিলুপ্ত। অতএব সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলেছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী চন্দ্রকীর্তি বা কীর্তিচন্দ্রের তিব্বতী অনুবাদ থেকে সেগুলোর বক্তব্য উদ্ধার করেছেন এবং ডক্টর সুকুমার সেন চর্যার ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সেগুলোকে পদকারের রচনার অনুমিত রূপ দিয়েছেন। নেপালে-তিব্বতে পদগুলোর নয়, গুরুত্ব ছিল মুনিদত্তের টীকার। তাই তিব্বতী অনুবাদেও টীকাহীন পদটি বাদ পড়েছে। মুনিদত্ত কোন্ শতকের লোক তা জানা নেই, তবে সটীক নেপালী পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গাক্ষরে চৌদ্দ পনেরো শতকের বলে বিদ্বানেরা অনুমান করেন। অতএব পদের সংখ্যা ৫০। পদকার ২৩ জন। কাহ্নর ১৩টি, ভুসুকুর ৮টি, সরহের ৪টি, কুক্কুরীর ৩ এবং লুই, শান্তি ও সবরের ২টি করে, বাকি প্রত্যেকের একটি করে পদ সংকলিত হয়েছে।

কাহ্ন, ভুসুকু, সরহ তাহলে সমকালের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পদকার ছিলেন। লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিআ, বাণী, তান্তি, শবর, সরহ, আজদেব, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম-এই তেইশজন পদকার। কোন কোনটি ছদ্ম নাম বা বিরুদ্দও হতে পারে। এবং কাহ্নও একাধিক থাকতে পারেন। মুনিদত্ত কর্তৃক শ্রীলূয়ী (লুই) আদি সিদ্ধার পাদ বন্দনা দিয়ে টীকার শুরু হওয়ায় লুইকে সর্ব প্রাচীন পদকার মনে করার কারণ নেই, লুই তখন জীবিত এবং শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাও হতে পারেন। অন্তত লুইর পদের ভাষা সহজতর ও অর্বাচীন বলেও ধরে নেয়া যায়। লুই যে আদি সিদ্ধা নন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রেষ্ঠ বা প্রখ্যাত সিদ্ধা হিসেবেও লুইর নাম স্মরেণ্য হতে পারে।

অধিকাংশ চর্যাগীতি দশ চরণে সমাপ্ত। ১টি বারো চরণে (৪৩সং) ১টি আট চরণে (২১ নং) বিশিষ্ট পদও আছে। এবং সবপদেই পদান্ত মিল দেয়া রয়েছে। প্রতি চর্যাগানের শীর্ষে গেয় রাগের নির্দেশ রয়েছে আর আছে একটি অভিনব রীতির উদ্ভাবন—সেটি হচ্ছে পদে রচয়িতার নাম সংযোজন [ভণিতা]। তা ছাড়া চরণগুলো অন্ত্যানুপ্রাস তথা পদান্ত মিলযুক্ত। রাগের মধ্যে রয়েছে পটমঞ্জরী, গবড়া (গউড়া), অরু, গুজ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী (ধানশ্রী), রামক্রী, বড়ারী, বলাড্ডী, শবরী, মল্লারী, মালশী, মালশী-গবড়া, বঙ্গাল, কাহ্ন-গুজ্জরী। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে পটমঞ্জরী [১২] তারপর মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, গুজ্জরী, বড়ারী। দেশাখ ও রামক্রী রয়েছে দুইবার করে। চর্যাগীতিকে গানের বাণী বা পদ হিসেবে রচিত স্বীকার করেও এ-গুলোকে কবিতা রূপেও যাচাই করার প্রবণতা রয়েছে বিদ্বানদের । তাই চর্যাগীতির ছন্দ ও কবিত্ব এবং সেই সূত্রে এগুলোর শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখা যায়।

চর্যাপদের ছন্দের মধ্যে কেউ চার মাত্রার চাল-ভিত্তিক ষোল মাত্রাযুক্ত পাদাকুলক, কেউ পজ্ঝটিকা ছন্দের আদল ও প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, কেউবা অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুসরণ-অনুকরণের নিদর্শন পেয়েছেন। আবার কেউবা এতে পয়ার ত্রিপদীর অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব কেউ অক্ষরপ্রাধান্য, কেউবা মাত্রাপ্রাধান্য অনুমান করেই চর্যাপদের ছন্দকে মোটামুটি ষোলমাত্রায়, কিংবা অসম অক্ষরের ত্রুটি স্বীকার করেই পয়ার-ত্রিপদী প্রবণ অক্ষরবৃত্তে ছন্দ পাঠ (Scan) করতে প্রয়াসী। আসলে সুরলক্ষ্যে রচিত পদকে কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এরকম গোঁজামিলে ত্রুটির ফাঁক পূরণ করতেই হয়। চর্যাগীতি মাত্রার হিসেবে কিংবা অক্ষরের হিসেবে ত্রুটিবহুল, আবেগমুক্ত চিত্তে এ তথ্য স্বীকার করাই ভাল। তা ছাড়া কথাগুলো যখন গীত হবার জন্যই বাঁধা—আমরা জানি, তখন গায়ের জোরে কবিতা বানাবার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করাই শোভন এবং শ্রেয়ও। কারণ তাতেই পাঠককুল বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য আমরা জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীতরূপেই সাহিত্যশিল্পের গুরু এবং ভারতের বৈদিক রচনা থেকে সব ভাষার সব রচনার মতো বাঙলা কাব্যমাত্রই চিরকালই রাগতাল যোগে গেয় ছিল। কিন্তু সেগুলো মূলত প্রচলিত ছন্দে পাঠযোগ্য করেই রচিত। কিন্তু এগুলো রচিত গেয় করেই।

তবু আমরা যদি শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' (১২১০-৪০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত) গ্রন্থে এই চর্যাপদাবলীকেই নির্দেশ করা হয়েছে বলে স্বীকার করি, তাহলে চর্যা মুখ্যত 'পদ্ধড়ী' প্রভৃতি ছন্দে পদান্তপ্রাস যোগ্য করেই রচিত বলে মানতে হবে। শার্ঙ্গদেবের শ্লোকটি এই :

পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাস শোভিতাঃ
অধ্যাত্মগোচরা চর্যাস্যাদ দ্বিতীয়াদি তালতঃ
(রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার সঙ্গীত'-এ উদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪৫)

–'পদ্ধড়ী' সংস্কৃত ছন্দ পজঝটিকা নামের প্রাকৃত রূপান্তর। 'প্রভৃতি' পদে যদি আমরা গুরুত্ব দিই, তাহলে চর্যায় অন্য ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য শার্ঙ্গদেব সুরবিদ—ছান্দসিক নন। তবু চর্যার ছন্দের অপূর্ণতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামের প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পাদাকুলক ছন্দের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন :

লঘু গুরু এক্ক নিঅম ণহি জেহা
পঅ পখ লেক্খই উত্তম বেহা।
সুকই ফনিন্দহ কংঠ বলঅং
সোলহ মত্তং পোআউলঅং। ১৭৪

ডক্টর শহীদুল্লাহর পদ্যানুবাদ :

লঘু গুরু এক নিয়ম নাহিক যেথা
পদে পদে লেখা উত্তম রেখা।
সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়
ষোলমাত্রায় পাদাকুলক হয়। (বাঃ সাঃ কথা, পৃঃ ১৭৪ প্রথম খণ্ড)

॥ ৬ ॥

চর্যাগীতিতে 'সমাজচিত্র' সন্ধানের একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। ৮-১২ শতকের পূর্ব ভারতীয়রা বা বাঙালীরা বুনো ছিল না। তাদের রাজা ছিল, সেকালের উচ্চতর সভ্যতার সবটাই তাদের ছিল—ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দারু-চারু-কারু সবটাই। ৪৬টা পদে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে কয়টি বিষয় এসেছে, তা দিয়েই বাঙালীর এমনকি অন্ত্যজ বাঙালীরও সবটা মিলবে না। মানুষের উচ্চারিত বুলি মাত্রই জগৎ, জীবন, জীবিকা ও পরিবেষ্টনী সম্পর্কে কিছু না কিছু নির্দেশ করেই। তা সমকালীন চিন্তাচেতনার অঙ্গ বটে কিন্তু তা-ই একমাত্র নয়। চর্যাগীতি বিধৃত সমাজ একান্তভাবে বাঙলার বা বাঙালীর নয়, গোটা পূর্ব ভারতেরই। চর্যাকারেরা বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগী সিদ্ধপুরুষ। তাঁরা ছিলেন যোগীসন্ত-সামাজিক-গৃহস্থ-বিত্তবান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট বৌদ্ধসমাজ থেকে বিচ্যুত। হীনযানী-থেরবাদী-মহাযানী আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারীদের সঙ্গে তাঁদের যে কেবল সম্পর্ক ছিল না তা নয়, তাঁদের চর্যাও ছিল অবজ্ঞেয়। ঐ ধারার সাধক সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের আজো কোন সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই। পূর্ব ভারত ও প্রান্তিক আরণ্য পার্বত্য অঞ্চলই ছিল ঐ গুহ্য সাধনতত্ত্বের ও চর্যার বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। কাজেই চর্যাপদে বিধৃত জীবন-জীবিকা ও প্রতিবেশ উড়িষ্যা-বিহার-বাঙলা-আসামের প্রতিনিধিস্থানীয় বৃহত্তর সমাজের চিত্র দান করে না, কেবল বহির্গ্রামবাসী অন্ত্যজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর—যারা সাধারণত নির্বিত্ত নিরক্ষর-নিঃশাস্ত্র নিঃস্ব মানুষ—পারিবারিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডচিত্র কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে—অর্থাৎ রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপে বিধৃত দেখতে পাই।

একালের সহজিয়াবৈষ্ণব, বাউল, হাড়ি-ডোম বাগদী-চাঁড়াল, মালো, মুচি, মেথর, বেদে প্রভৃতির পূর্ব পুরুষরাই ছিল কায়াসাধক-দেহাত্মবাদী। ভূমিহীন অস্পৃশ্য বলেই তাদের কৃষিকর্মে অধিকার ছিল না। বিভিন্ন তুচ্ছ বৃত্তি ও সেবাজীবী ছিল বলেই নগরে বন্দরে হাটে-বাজারে-গঞ্জে তাদের যাতায়াত ছিল। সেজন্যেই তাদের রচিত চর্যাগীতিতে গ্রামীণ বা কৃষি-কৃষকের-কর্ম আহরণের জীবনাচারের উপমাদি অলংকার ব্যবহৃত হয়নি। যদিওবা নগরের বাইরে কৃষিক্ষেত্র বেষ্টিত স্থানেই নদী, খাল ও রাস্তার ধারেই ছিল তাদের নিবাস। পল্লীপ্রান্তের অরণ্যে ও টিলায় ছিল শবরদের বাস। এখনো নগর প্রান্তে ধাঙ্গরাদির এবং গ্রামপ্রান্তে সাঁওতাল হাড়ি ডোম বাগদী চাঁড়াল মুচি পাড়া বিদ্যমান।

দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেও ধন, বর্ণ ও বৃত্তি বৈষম্য প্রসূত ঘৃণা-অবজ্ঞা-অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের লোকগুলো। ধন-বিদ্যা-পেশা-পদ ঘরে বাইরে সর্বত্র বৈষম্যের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর আজো খাড়া করে রেখেছে। তাই 'নগর বাহিরেই ডোম্বীর কুঁড়ে ঘরে' বাস। এবং নেড়ে (মুণ্ডিত মস্তক) বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েও ব্রাহ্মণ পরিচয় ঘোচেনি। তাই শবরেরা চিরকাল অরণ্যে পর্বতে বাস করে। টিলাবাসিনী শবরীর প্রতিবেশী থাকে না। সেদিন ফুল্লরাদের হাড়িতে ভাত থাকত না। তাঁত-চাঙারী মাছ-মাংস বিক্রি করে কিংবা তুলা ধুনে অথবা নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে হাড়ি ডোম মুচি মেথর বাগদী ব্যাধ কৈবর্ত কাপ্তারীর [ধড়ে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার মতো] জীবিকা অর্জন করতে হত। তার বাড়া কিছুতে তাদের চির অনধিকার। উচ্চকোটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কেবল বেচাকেনার বা দাসপ্রভুর। সব দেয়া-নেয়াই ছিল বাহ্য, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক—মনের-মানসের যোগ ঘটেনি কখনো।

সভ্যতার আনুষঙ্গিক অভিশাপের শিকার হয়েছে গণমানব সভ্যতার সেই প্রথম প্রভাত থেকেই। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীর, পীড়ক-পীড়িতের, শোষক-শোষিতের, শাসক-শাসিতের, পেষক-পিষ্টের, প্রভু-ভৃত্যের, মনিব-গোলামের। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শুরু তাই সভ্যতার উষালগ্নেই। অভাব-অনটন-অনশন ও খরা-বন্যা-ঝড়-মারীর চির শিকার গণমানবের দুঃখ-দুর্দশায়ও তাই একাল সেকাল নেই। সেকালেও শাহ-সামন্ত সহযোগী ছিল শাস্ত্র সমাজ-সরকারের ধারক ও বাহক শাস্ত্রী-সরদার-প্রশাসক-নায়েব গোমস্তা মুৎসুদ্দিরা। ওরা ছিল সেকালের মধ্যবিত্ত। 'দুর্জনেরে রক্ষা করে দুর্বলেরে হানার' স্বেচ্ছালব্ধ দায়িত্ব ও অধিকার ছিল তাদেরই। এ কেবল সেকালের চিত্র নয়—একালেরও। এ লোকায়ত জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, জগৎভাবনা ও জীবনচেতনা ও দুঃখদুর্দশা অবিকৃতভাবে বা রূপান্তরে তেমনিই আছে। কারণ শাস্ত্রিক-সামাজিক-আর্থিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলে চিন্তাচেতনার পরিবর্তন স্বাভাবিক নয়।

নদীবহুল অঞ্চলে ভেলা, বেনি, নৌকা, গুণ, কেড়ুয়াল, মাঙ্গ, চকা, পতবাল, দুখোল, কাছি, ঘুন্টি, পাল, জলসেচ ও মাঝি-মাল্লা রূপক-উপমা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী করে এসেছে। একই কারণে মাছ ও জালের কথা উঠেছে। চণ্ডাল-শবর সূত্রে জাল পাতার ও ডাক হেঁকে হরিণাদি শিকারের ইঙ্গিতও রয়েছে। ধেনো, তেলো, খেজুরে মদ, কাঁজি ও হাড়িয়া পান এক সময় এদেশে এ যুগের পান-তামাকের মতোই সর্বজনীন ও সামাজিক অভ্যাস ছিল। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুণ্ডিণী ও মদচোয়ানোর উল্লেখও মেলে। হাড়ি-ডোম বাগদীরা পেশাধারী গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে ছিল। প্রস্ফুটিত পদ্মদলের ওপর নৃত্যরতা নারীর উপমা নৃত্যকলার উৎকর্ষের সাক্ষ্য।

চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ. পেশা, প্রতিবেশ, তৈজস, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব নির্জিত মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। এগুলো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা সম্পৃক্ত শব্দ, ভাব ও বস্তু। তাদের আপ্ত বচন-বাক্যও তাই আলাদা ও ঘরোয়া। এখানে অর্জিত জ্ঞান অনুপস্থিত, অভিজ্ঞতাই চিন্তাচেতনার সম্বল। তাই 'দুহিল দুধ কি বেন্টে সামায়, বলদ বিআল গাবিআ বাঁঝে, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, রুক্ষের তেন্তরী কুম্ভীরে খাই, দুলি দুহি পিটা ধরণ ণ জাই। কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল, জিম জিম করিনা করিনীরে রিসই।'—এমনি কথা পাই। এখানে ময়ূরপুচ্ছ, হাড়ের ও শুঞ্জার মালাই সৌন্দর্যের ও প্রসাধনের উপকরণ; মোইনি, মৎস্য, কার্পাস ফুল, পাকাধানই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস। এমনি অভাবদুষ্ট সমাজে অন্নাভাব নয় শুধু নৈতিক চরিত্রও শিথিল হয় এবং শাসন, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব ঘটে। তাই সাধুবেশী চোরই বেশী। কারো সোনারূপা থাকে না, যদি বা কিছু থাকে, স্বভাবদোষে নয়, অভাব বশে চোরডাকাত-হওয়া মানুষেরা [রাতে সামান্য কানেটও (কর্ণফুল)] চুরি করে, বাটে খাণ্ডারের (লুঠেরা) ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পথ চলতে হয়। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষের কেউ কেউ অন্নাভাবে তখনো স্ত্রী ও সন্তান হত্যা করত। বাস্তব অর্থে 'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী' ঐ সাক্ষ্যই দেয়, নইলে ঐ রূপক অবাস্তব হত। আর এটি-'বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ'। তবু জীবনের দাবী মেটাতে হয়, তাই অসতী বধূ রাত হলে অভিসারে কামরূপ যায়, কানে পরে কুণ্ডল, গলায় পরে গুঞ্জের মালা, ময়ূরপুচ্ছে বাড়ায় কবরীর শোভা। বাসন্তী প্রতিবেশ ও পাখির ডাক মনে জাগায় অজানা পুলক। তাম্বুল কিংবা মদও সেবন করে তারা। বঞ্চিত বুকের বেদনা ভুলবার প্রয়াসে নাচগান খেলাধুলাও করতে হয়। বিয়ের উৎসবে নির্বিশেষ মানুষের অধিকার, তাই উৎসব উপকরণ-পটহ, বাদল, ঢোল, কাঁসা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য ওরা নিজেরাই বাজায়। পার্থিব জীবনে যাদের আকৃষ্ট হবার মতো, আনন্দিত থাকবার মতো কোন অবলম্বন বা আশ্বাস নেই, সে সব বঞ্চিত পরাস্ত পর্যুদস্ত মানুষ পারত্রিক সুখের প্রত্যাশায় আত্মপ্রবোধ পাওয়ার প্রয়াসী না হয়েই পারে না, এভাবেই তারা শাসনে শোষণে, পীড়নে পেষণে ক্লিষ্ট-পিষ্ট হয়েও বেঁচে থাকার বলভরসা পায়। ঐরূপ মিথ্যা ভরসা ও হিম্মত না পেলে আত্মহত্যাই হতো ওদের আশ্রয়, কিংবা পীড়নপিষ্ট প্রজাও হরিণ-হরিণীর মতো আত্মরক্ষায় অনন্যোপায় হয়ে 'এদেশ ছাড়ি হোহু ভান্তো' সিদ্ধান্তই গ্রহণ করত, অথবা পীড়ক রাজার খল-দুষ্ট অধ্যুষিত রাজ্যে টিকে থাকার জন্যে দুর্বল শিয়ালরা মরিয়া হয়েই সিংহের সঙ্গে অথবা প্রশ্রয় পেয়ে সিংহবিক্রমে যুঝবার হিম্মত পায়—তবু বিড়ম্বনা থেকেই যায়, কেননা 'জো সো চোর সোহি সাধী'। তাই 'নিতি নিতি সিআলা সিহ সম যুঝই'।

৫

চর্যাগীতিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র

কাহ্ন ও সরহের দোহাকোষ মিলেছে। অন্য চর্যাকারেরাও হয়তো দোহা রচনা করেছিলেন। কেননা দোহা রচনা সুপ্রাচীনকালের রীতি। উত্তর ভারতে দোহা আজো জনপ্রিয়। শ্লোকই গাথা, আর্যা, ছড়া ও দোহারূপে তত্ত্বকথার ও নীতিকথার আধার হয়েছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বা 'সুভাষিতরত্নকোষ' রুবাই এবং চোপাইও এ সূত্রে স্মর্তব্য। যারা চর্যাগীতি রচনা করেছেন, তারা দোহাও রচনা করবেন, এ-ই ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। দুজনের দোহাকোষ মিলেছে.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই অন্যদেরও অনুরূপ রচনা ছিল বলে অনুমান করছি। অভিন্ন ব্যক্তির বলেই চর্যাগীতিকার রচিত দোহায় প্রাপ্ত উপকরণও আমরা সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় গ্রহণ করব।

কাহ্ন পা বা সরহের দোহা ও চর্যাপদের ভাষা অভিন্ন নয়। অথচ একই ব্যক্তি তাঁর উদ্দিষ্ট অভিন্ন পাঠকের জন্যে এক ভাষায় দোহা ও অন্য ভাষায় গীতি রচনা করেছেন—এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই উভয় শ্রেণীর রচনা শৌরসেনী অপভ্রংশে বা অবহট্‌ঠে লিখিত হয়েছিল বলেই মানতে হয়। দোহাগুলোর শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ রূপ অবিকৃতভাবে স্মরণ করা সহজ ছিল। তাই ভাষায় লক্ষণীয় বিকৃতি ঘটতে পারেনি। চর্যাগীতি জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে বহু বহু লোকের ব্যবহারে মৌখিক বিকৃতি পেয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে গায়েন-লিপিকরেরা প্রাচীন শব্দ ও উচ্চারণ পালটিয়ে সমকালোপযোগী করে তথা সমকালে ও স্থানের লোকবোধ্য করে নতুন শব্দ ও উচ্চারণ গ্রহণ করে। প্রমাণ বাঙলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী এবং ডাক ও খনার বচন। কাজেই দোহা ও চর্যাগীতির ভাষায় যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, তা হয়তো দোহাকার গীতিকারদের স্বহস্তে লিখিত পুঁথিতে ছিল না। মানতেই হবে সবটাই ছিল লেখ্য সাহিত্যিক ভাষা এবং তা ছিল শিষ্ট শৌরসেনী প্রাকৃতজ অপভ্রংশভিত্তিক। আমরা চর্যাগীতিতে বহু মুখের বহু উচ্চারণে বিকৃত ও কালোপযোগী অর্বাচীন ও ঈষৎ বিকৃত শৌরসেনী অবহট্‌ঠই দেখতে পাই। প্রত্যাশিত মাগধী-প্রাকৃত-অপভ্রংশ যে নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মাগধীপ্রাকৃত-অপভ্রংশের শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তঃস্থিত বর্ণের বিবর্তনধারা ও বিভক্তিরূপ স্মরণ করলেই তবে উৎসাহ মিলবে না। কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত এখানে একাধিক—যেমন মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিল মিশ্রিত ব্রজবুলি কিংবা আধুনিক বাঙলা ভাষায় যেমন তু, হউ, নই, বা এ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আবার তুমি, আমি, নদী, বাজায় প্রভৃতিতে উন্নীত হয়েছে। পূর্ব-ভারত (বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম) চিরকাল অনার্য অস্ট্রিক মঙ্গোলের দেশ। কোল-মুণ্ডা-সাঁওতাল-গারো আমাদের নিকট জ্ঞাতি। এ অঞ্চলে বিশেষ করে বাঙলায় উড়িষ্যায় ও আসামে বৈদিক ধর্ম কিংবা গীতা-স্মৃতি-সংহিতা শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বরূপে কখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। সেনদের প্রয়াসও পুরো সফল হয়নি। তার প্রমাণ লৌকিক দেবতাপূজক পঞ্চোপাসক আজকের বাঙালী হিন্দুর সমাজ। রাজকীয় উদ্যোগে আগত উত্তরাপথের শাস্ত্রীদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য আচার উচ্চবিত্তের দেশী ও বিদেশী লোক নিশ্চয়ই গুপ্ত আমল থেকেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য থাকারই কথা। তবু বিজাতি বিজিত এদেশে বিজিত জাতির দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্য থেকে দেশের মাটির সন্তানেরা রেহাই পায়নি। স্বভূমে তারাই স্বাধিকারবঞ্চিত ঘৃণ্য হাড়ি ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-শবর রূপে নির্বিত্ত নিঃস্ব নিরক্ষরের অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল দু'হাজার বছর ধরে। আজো সে-দুর্ভাগ্যের অবসান হয়নি। সে যুগে যন্ত্রের উৎকর্ষের অভাবে জীবিকাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন ছিল না, তাছাড়া শাহ-সামন্ত যুগে একবার নিচে পড়ে গেলে—বিশেষ করে বর্ণাশ্রিত সমাজে, আর উঠবার বাস্তব ও মানস উপায় থাকত না।

চর্যাগীতিতে আমরা ভারতের পূর্বপ্রান্তিক একটা বিরাট অঞ্চলের (বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম) আদিবাসীর মন-মত, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি, রেওয়াজ, জীবন-জীবিকা ও সমাজ-সংস্কৃতির কিছু রূপরেখা পাই।

চর্যাকারেরাও শিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রবিৎ। কিন্তু তাঁরা বৈরাগ্যবাদী বলেই হয়তো ঠিক সমাজবাসী ছিলেন না। সংস্কৃত অনুবাদ তাঁদের নাম, পাদযোগে সসম্মানে উল্লিখিত হলেও, তাঁরা ছিলেন বিশেষ গূঢ় ও গুহ্য সাধনার গুরু। এখনো যেমন বাউল সহজিয়া গুরুগণ সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে প্রতিষ্ঠা পান না, অথচ স্বমতবাদী সমাজে তাঁরা গুরু ও জ্ঞানী রূপে বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র, মনে হয় তেমনি অবস্থা ছিল আমাদের চর্যাকারদেরও। এঁদের নামগুলোই প্রমাণ করে যে, এঁরা অনার্য ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধ সমাজের লোক। যদিও সিদ্ধপূর্ব জীবনে এঁদের অনেকেই রাজা, রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তিব্বতী সূত্রে মেলে—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। [মহান্ত মহারাজ স্মর্তব্য] ব্রাহ্মণ এখানে ব্রহ্মজ্ঞানী, অন্য চর্যাকারেরা হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য, সৎশূদ্র বা নমঃশূদ্র। অবশ্য চর্যাকারেরা যে বৌদ্ধ তাতে কণামাত্র সংশয় নেই। কুলীন-অকুলীন, ব্রাহ্মণ, ডোমনী, শবর প্রভৃতি রূপকার্থক প্রয়োগও বটে। এঁরা স্ব স্ব সমাজে অর্থাৎ মহাযানের উপশাখা সাংখ্য তত্ত্ব ভিত্তিক মন্ত্র-তন্ত্র বজ্র-কালচক্র ও সহজপন্থীদের অতিমান্য গুরু ছিলেন। তাঁরাও তাঁদের শিষ্যসমাজের গৃহগত ও সমাজগত প্রতিবেশ থেকেই তাঁদের অধ্যাত্মতত্ত্বের ও সাধনচর্যার রূপক গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্রেই পাই জীবন-জীবিকার ও সমাজের চিত্র। বৃত্তিজীবী মানুষের উৎপ্রেক্ষাই চর্যায় ব্যবহৃত। তাই নগুরে কিংবা কৃষিজীবী মানুষের কথা নেই। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবমুক্ত এবং প্রধানত সমাজবহির্ভূত নির্বিত্ত বৈরাগ্যপ্রবণ মানুষের জীবন মনন চিত্রই পাই চর্যাপদে। সে কারণে বলতে গেলে চর্যাগীতিতে আর্য সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবমুক্ত পূর্ব ভারতে (কেবল বাঙলার নয়) গণমানবের একটা অকৃত্রিম ছবি মেলে। সেই জীবন, মন ও মনন ধারা আজো গাঁয়ের অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞেয় বাউল, সহজিয়া, মুচি-মেথর, ডোম-বেদে-বাগদীর মধ্যে দুর্লভ নয়। সরহের বিভিন্ন দোহাতে আমরা আচারিক ধর্ম ও অন্যমতবাদী চর্যার নিন্দা দেখতে পাই। যথা—ব্রহ্মণে হি না জানন্ত হি ভেদ... ব্রাহ্মণেরা ভেদ (তাৎপর্য) না বুঝে চতুর্বেদ পড়ে। মাটি কুশ জল নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেয়, নিষ্ফল অগ্নি হোমের কুটধুমে তাদের চোখ পীড়িত হয় মাত্র (আর কোনো লাভ হয় না)।

সন্ন্যাসীদের প্রতিও সরহ অবজ্ঞাপরায়ণ—"এক দণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসে...।"—এক দণ্ডী ত্রিদণ্ডীরা ভগবদবেশে ঘুরে বেড়ায় (পরম) হংসের উপদেশ পেয়ে (নিজেদের) জ্ঞানী (মনে করে)। কিন্তু তারা ভ্রান্ত। ধর্মাধর্ম কোনটাই তাদের জানা নেই।

জৈন দিগম্বরদের প্রতিও সরহের বিদ্রূপবাণ তীক্ষ্ণ

দীহ নকখ জই মলিনেঁ বেসেঁ.....
জই ণগগা বিও হোই মুত্তি সুণহ সিআলহ...

ভাবার্থ—দীর্ঘনখা নগ্ন ও মলিনবেশী যোগী মাথার কেশ উৎপাটন করে। ক্ষপণকরা মোক্ষের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই ঘুরে বেড়ায়। নগ্ন হলেই যদি মোক্ষ মেলে তাহলে শিয়াল কুকুরের মুক্তি হত। লোমোৎপাটনে মুক্তি সম্ভব হলে যুবতীর নিতম্বও মুক্ত। পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ মেলে, তাহলে পুচ্ছও মুক্ত, উচ্ছিষ্ট ভোজনে জ্ঞান লাভ হলে হাতী-ঘোড়াও জ্ঞানী।

আচারসর্বস্ব ভিক্ষুদের এবং মহাযানী সাধকদেরও তিনি নিন্দা করেছেন। বলেছেন আগম, ন্যায়, মণ্ডলচক্র ও তত্ত্বোপদেশে তারা সিদ্ধি খোঁজে :

চেল্ল ভিকখু জে স্থবির উএসেঁ।
অণ্ণ তহি মহাজাণ হি ধাবই.....
অইরি এহিঁ উদ্দুলিঅচ্ছরেঁ...."

—আর্যযোগীরা গায়ে ছাই মেখে, মাথায় জটা রেখে, আর ঘরে দ্বীপ জেলে, ঘণ্টা বাজিয়ে চোখ বুজে (ভান করে) লোক ধাধাঁয় (ঠকায়)।—এর থেকে আমরা সেকালের বিচ্ছিন্ন মতবাদী গুরু পুরোহিতদের ভেক ও জ্ঞানের কথা জানতে পাই। চিরকালই ধর্মধ্বজী ছদ্মধার্মিকরা লোক ঠকানো শাস্ত্রব্যবসায় করে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যাকারেরা স্বভাবতই বামাচারী কাপালিক সাধনায় আস্থাবান। সাধনসঙ্গিনী হিসেবে (গুহ্য অর্থে) এবং সাধারণভাবে নীচ জাতীয় নারীই ছিল যোগ্য। এসব নারীর নাচেগানে ছিল আসক্তি ও কামচর্চায় সতীত্ববোধ ছিল শিথিল। অবশ্য নাচগান এরা পেশা হিসেবেও গ্রহণ করত। চর্যায় নীচ জাতীয়া তথা ডোমনী বিধবার সাঙ্গা প্রথা, নৃত্যনৈপুণ্য, কামচর্চার কথা পাই। ডোমনীরা তন্ত্রী বীণা চাঙারী তৈরি করে বিক্রি করত, খেয়ানৌকার পাটনীর কাজও করত। অন্তেবাসী ডোমেরা কুঁড়েঘরে বাস করত, গানবাজনা ছাড়াও জাল পেতে ও মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত, কাপালিকরা কণ্ঠে হাড়ের মালাধারী নগ্ন (নাগা) বামাচারী যোগী ছিল। (১৩সং) তাদের চরণে ঘন্টা, নূপুর, কর্ণে কুণ্ডল, গায়ে ভস্ম ও কণ্ঠে হাড়ের মাল্য থাকত, হাতে ডম্বরু ও খর্পর বা নরকপাল রাখত। অতএব তারা গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে ছিল। (১১সং)

আরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র পাই শবরের দুটো পদে। দরিদ্রের সংসার। নাগরিক জীবন থেকে বিচ্যুত মানুষ। শবর বধূর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা, কর্ণে কুণ্ডল, পরিবেশ আরণ্য প্রকৃতির, তাম্বুল-কর্পূরই ব্যসন, তীরধনুই জীবিকা উপকরণ। কার্পাস ও কঙ্গুচিনার (কাগনিধানের) চাষ হয়। শকুন-শিয়ালের উৎপাত থেকে ক্ষেত রক্ষা করার জন্যে বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া হত। এখানেই কৃষির (কার্পাস ও কাগনিধানের চাষ) কথা একটু মিলেছে। তাঁতী, ব্যাধ, সুতার, জেলে, শুঁড়ী প্রভৃতি বৃত্তিজীবীর নামও পাই।

ঢেণ্ঢণের পদেও (৩৩ সং) টিলাবাসী প্রান্তিক মানুষের দৈন্য ও দুঃখ-করুণ জীবনের পরিচয় রয়েছে। প্রতিবেশীহীন নিঃসঙ্গ নিঃসহায় জীবন, হাড়িতে প্রায়ই ভাত থাকে না— উপোস করতে হয়, এদিকে পোষ্যের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তার উপর অতিথি আসে অথবা অন্ন জুটাবার জন্যেই নিত্য রাতে দেহব্যবসায় করতে হয়। গৃহপালিত গরু দোহন, সাধুবেশী চোরের দাপট, অবস্থা বৈগুণ্যে সিংহের কাছে শিয়ালের আস্ফালন প্রভৃতির ইঙ্গিত রয়েছে।

আরণ্যজীবনে অভ্যস্ত মানুষের হরিণ শিকারের সময় হরিণ ঘেরাও করা ও তাড়িয়ে নেয়ার চিত্র, ভিত হরিণের ছুটোছুটির চিত্র, হরিণ-হরিণীর ও করী-করিণীর কামচেতনার চিত্র, ব্যাধের নিত্য উপদ্রবে হরিণের বনান্তরে বা দূরে পলায়ন, [সামন্ত-পীড়নে প্রজার দেশত্যাগ] উদ্বিগ্ন-শঙ্কিত হরিণের তৃণ ভক্ষণে ও জলপানে অনীহা বাস্তবের প্রতিরূপ। (৬ সং ২৩ সং)

সেকালে রাস্তা ছিল কম, তখনো বাঙলার নিম্নভূমি ছিল রাস্তা বিরল, রাজপথ ও বাট দুচারটা ছিল— নভুলহ রাজপথ কন্ধারা (১৫ সং)। কাজেই জলপথে [খাল-বিল] নৌকাই ছিল যানবাহন। বড় বড় নৌকাও ছিল পাঁচ দাড়ের ও কর্ণের। সেকালে খুঁটির সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধা হত। পতবাল বা কর্ণ ধরার জন্য কাণ্ডারীও থাকত। জাল দিয়ে মাছ ধরার রেওয়াজ ছিল। মাঝিকে কামলিও বলা হয়েছে (৮নং)। মজুর অর্থে 'কামলা' আজো ব্যবহৃত। নৌকার গুণ টানা (৩৮ সং), নৌকার তলার পানি সিউঁতী দিয়ে সেচনের কথাও আছে (১৪ সং)। রাস্তায় থাকত সাঁকো, সে সাঁকো বড়ো গাছের ফালি জোড়া দিয়ে এবং টাঙ্গি টানা দিয়ে মজবুত করা হত। (৫ সং)

সেকালের তন্ত্রী বা তার যুক্ত বীণা, ডম্বুর, বাঁশী, মাদল, লাউ বা বাঁশের তৈরী বাদ্যযন্ত্র, কাঁসা, করতাল প্রভৃতি আজকেও টিকে আছে। কামোদ্দীপক গানও (কামচণ্ডালী-গীতি) ছিল, নাটকও ছিল (বুদ্ধ নাটক), এ নাটক নৃত্যনাট্যই হওয়ার কথা। কাজেই নটনটীও ছিল। বিনিময় মুদ্রা হিসেবে কড়ি-বুড়ির যুগ আমাদের দেশে অবসিত হয়েছে মাত্র শতেক বছরের মধ্যে। বাঙলাদেশে বিশ কর্পদকে হত এক বুড়ি (মৃচ্ছকটিক নাটক)। যৌতুক নামে বিয়েতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিনও বরপণ ছিল। বিবাহে বরযাত্রী যেত—পটহ মাদল, কর্ণগুকশালা দুন্দুভি, কাঁসা, করতাল, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য-সহযোগে বিবাহ অনুষ্ঠান হত (১৯ সং)। বঙ্গ-বঙ্গাল ও বঙ্গালী অবজ্ঞার্থে উচ্চারিত হয়েছে, দেখতে পাই। 'বঙ্গাল' রাগও ছিল। বঙ্গ-বঙ্গাল ছিল নদীবহুল জনাকীর্ণ নিম্নভূমি। হিউএনৎ সাং এখানে শতক্রোশ বিস্তৃত বহু হাউর দেখেছিলেন — আজো সব হাউর বিলুপ্ত হয়নি। এসব অঞ্চলে সাধারণত ভাগ্য বিতাড়িত নিঃস্ব লোক এসে বাস করে। তাদের স্বভাবে সংস্কৃতিতে থাকে রুক্ষতা ও স্থূলতা। চরুয়ার (চরবাসীর) প্রতি অবজ্ঞা আজো বর্তমান। তেমনি অবজ্ঞা বর্তমান গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ের লোকের প্রতি। আজো চট্টগ্রামে বাঙাল বলতে ঐতিহ্য আভিজাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিহীন লোক ও পরিবার বুঝায়। ভুসুক বা সরহ যে অন্তত বঙ্গদেশী ছিলেন না, এও তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ। অবশ্য বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালীর ব্যঙ্গার্থও রয়েছে এবং পউয়া খাল দেহের দুই পদ্মের সংযোগ নাড়ী— পদ্মানদী নয়। বড় হোক, ছোট হোক, নদী কখনো খাল নামে অভিহিত হয়নি, হয় না।

১. বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণানা (৩৯ সং)
২. অদ্বয় বঙ্গালে দেশ লুড়িও (৪৯ সং)
৩. আজি ভুসুকু বঙ্গালি ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ (চণ্ডালী) লেলী (৪৯ সং)

বাগর্থে এর মধ্যে নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং কোন বাঙালী কবি এই সব পদ রচনা করতে পারেন না। এখানে নৌকা যাত্রা, দস্যুর উপদ্রব, নারীহরণ বা অসবর্ণে বিয়ের ফলে পতিত হওয়ার কথাই রয়েছে। খাণ্ডার জলদস্যুর কথা আছে সরহের পদেও—'বাট অভঅ খান্টা বি বলআ (৩৮সং)

ডোম, তাঁতী, ধুনুরী, সুতার, জেলে (কৈবর্ত) কাঠুরে [জো তরু ছো ভেবউ ন জাণই],—লক্ষণীয় যে এরা আজো সমাজে বৃত্তিজীবী, ছোটলোক। এখানে আজকের মতো ঘরে চুরি, (২ সং) রাহাজানি এবং জলদস্যুর উপদ্রব ছিল, গঞ্জে নগরে নৌকাযোগে পণ্য বিনিময় হত। সোনারূপার সাধারণ্যে ব্যবহার কমই ছিল, যদিও কম্বলাম্বর সোনায় ভরা নৌকায় রূপা রাখবার ঠাঁই নেই বলে উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদে যে শ্রেণীর লোকের উপমা দেয়া হয়েছে, সোনা আজো সে শ্রেণীর লোকের মধ্যে কৃচিৎ মেলে। অবশ্য চুরি হবার মতো দামী কানেটও (কানপাশা) কারো কারো ছিল। চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালেও ঘরে প্রহরী (সুণ বাহ তথতা পহারী) (৩৬সং), জই পবন গমন দুআরে দিঢ়তালা বিদিজ্জই (দোহা : সরহ) ও দুয়ারে তালা দিতে হত। চোর ধরবার জন্যে, চুরি নিবারণের জন্যে দুসাধী (রাজচর) থাকত।

যোগতান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব ও প্রসারক্ষেত্র কামরূপ-কামাখ্যার ডাক-ডাকিনীর, যোগী-যোগিনীর খ্যাতির রেশ আজো বিদ্যমান, 'অমৃতকুণ্ড' এ অঞ্চলেই রচিত। সেযুগে ডাকিনী-যোগিনীরা ছদ্মবেশে বউ-ঝি রূপে ঘরে ঘরে বাস করত। আত্মপরিচয় গোপন রাখার গরজে তারা কপটাচরণের আশ্রয় নিত। তাই রাত্রে শ্বশুর ঘুমায়, কিন্তু বধূ জেগে থাকে। দিনের বেলায় গৃহস্থ বউ কাক দেখলেও ভয় পায়, রাত্রে আবার সে-ই কামরূপ যায়। উল্লেখ্য যে ভূতসিদ্ধি, খেচরসিদ্ধি প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধন বলে যে-কোনো জীবে রূপান্তরিত হওয়া, আকাশে উড়া, সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করা প্রভৃতি অসাধ্য সাধন সম্ভব ছিল (মানিকচন্দ্র রাজার গান স্মর্তব্য)।

ডাইনীর ভয় আজো বিদ্যমান। তুকতাক-দারু-টোনা-উচাটন-বশীকরণ-তাবিজ-কবজ প্রভৃতির প্রতি আমাদের আস্থা সেই ডাকিনী-যোগিনীর প্রভাব-প্রাবল্যেরই স্মারক। ডাকিনী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগিনীর ব্যভিচার-প্রবণতার নিন্দাও ছিল—আসলে বামাচারী সাধনার সঙ্গিনী হিসেবে ডাকিনী যোগিনী-ডোমনী রজকী চণ্ডালী প্রভৃতির সম্বন্ধে লোকপ্রচলিত ধারণার থেকেই তাদেরকে সাধারণভাবে ব্যভিচারিণী মনে করা হত। আজো হাড়ি-ডোম মেথরপাড়া ব্যভিচারদুষ্ট বলে ভদ্রলোকদের ধারণা। গণিকা লম্পট বিহীন ছিল না সমাজ (১৮,২৮)।

ডোমনী-শবরীদের তথা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ নারী পুরুষার্জিত অন্নজীবিনী ছিল না, তারা এখনকার মতোই বহির্দ্বারেও স্বামী সন্তানের সহকর্মিণী ছিল। তবু পুরুষপ্রাধান্যের দরুন তাদেরও গুরুজনরূপ স্বামীর শাসন মানতে হত। (যেমন 'নিঅ ঘরে ঘরিনী জাবঅ ন মজ্জই'। কিংবা ঘররই খজ্জই ঘরিনি এহি জহি অবিআর—সরহ, দোহা)

দাবা খেলার চৌষট্টি ঘর বা কৌঠা। দাবা বড়ে-ঘুঁটি, ঠাকুর) রাজা), গজ, মন্ত্রী, চালার দিশাও রয়েছে। প্রথমে বড়ে তারপর গজ, পরে মন্ত্রীর চাল বিধেয়। দাবা খেলার নাম 'নয় বল'। ঠাকুর তুর্কী শব্দ। খেলাটি মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত বলে মনে হয়। মদের দোকান থাকত। শুঁড়ি-নয়, শুঁড়ি বউ বেচত মদ। সেকালেও কি মদ ঘৃণ্য ছিল? নইলে বেশ্যাবাড়ির মতো চিহ্ন দেখে সন্তর্পণে দোকান সন্ধান করবে কেন লোক? দোকান নেশারুদের জন্যে চব্বিশ ঘন্টাই যেন খোলা থাকত, বারুণী মদ সরু নল দিয়ে ঘড়ায় চালা হত। চিকন বাকলে বাঁধা হত মদ। একি বাঁশের চোঙা? খেদায় বুনো হাতী ধরা হত। গানে মুগ্ধ করে হাতী বশ করবার উপায় জানা ছিল তাদের (১৭ সং বীণা পা)। পোষা হাতী মদমত্ত হলে স্তম্ভ (খুঁটি ৯ সং মহীধর) লগ্ন শিকল দড়ি দড়া ছিঁড়ে নিকটস্থ পদ্মবনে প্রবেশ করে সব পয়মাল করত (১৬ সং)। পদ্মবনে (৯ সং) মত্তহস্তীর উপমা আজো ব্যবহৃত হয়। দারুবদ্ধ বুনোহাতী পার্বত্য নদীতে জলপান করতে নামত, আজো নামে। (গঅন গিরি নই জল পিএউ—সরহ, দোহা) মূষিকের অপ্রতিরোধ্য উপদ্রবের কথাও বর্ণিত হয়েছে (২১ সং)। ইঁদুর সেদিন ঘরে সংসারে সমস্যা হয়েই ছিল। ইঁদুর কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সিঁধুদয়, তাছাড়া গর্ত খোঁড়ে ও আমন ধান খেয়ে গৃহস্থের অন্ন নষ্ট করে। সিংহ-শিয়াল-কুকুর-হরিণ-হাতী-বলদ-কাক-ময়ূর প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে নানা প্রসঙ্গে।

একটি চর্যায় (৪৭ সং) গৃহদাহ প্রসঙ্গে শাসন [পট্টোলী] পুড়ার কথা আছে। এটি ভূমি বা চৈত্য সম্পর্কিত শাসন পট্টোলী হতে পারে। চাঁচড়ি দিয়ে চারবাঁশের খাট তৈরি করে তাতে তুলে শব দাহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হত আজকের মতোই (৫০ সাং)। পিণ্ড [বলিও] দেওয়া হত। প্রসূতির জন্যে সেদিনও থাকত আলাদা আঁতুড় ঘর।

অলঙ্কারের মধ্যে ঘণ্টা, নূপুর, কঙ্কণ, মুক্তার হার, কুণ্ডল, কানেট প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। খাদ্যবস্তুর মধ্যে পাই ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, তেঁতুল, লাউ প্রভৃতি।

তাম্বুল, কর্পূর, শয্যাপাতা খাট, বারুনী (মদ), দর্পণ প্রভৃতি ছিল গরীবের বিলাস ও ব্যসন সামগ্রী।

আসবাব তৈজসের মধ্যে পিঁড়ি, হাড়ি, পিঠা (দোহন পাত্র), বাকল নির্মিত মদ রাখার চোঙ্গা, ঘড়া, গাড়ু, কুঠা, খন্তা (নখলি) বাখোর, খুঁটি, কাছি, তালা, চাবি, টাঙ্গি প্রভৃতি। নৌকার বর্ণনায় পাই তৎসম্পর্কিত কাছি, পতবাল (বার), কেড়ুয়াল, দুখোল, পুলিন্দা (মাস্তুল), সেঁউতী মাঙ্গ (গলুই, গুণ ১৩, ১৪) নৌকার মধ্যে নাব, নাবরি, নাবি, ভেলা প্রভৃতি।

আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, শালী, বধূ, কুটম্ব প্রভৃতি এবং দুষ্ট কুটম্বের উপদ্রব সম্বন্ধে (৩৯ সং) আজকের আমাদের মতোই ক্ষোভ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানের মধ্যে বঙ্গ, বঙ্গাল, কামরূপ ও লঙ্কার (৩২ সং) নাম পাই। ঘর-বাড়ির মধ্যে উয়ারি (কাছারি বা থানা) কুঁড়ে বাড়ি মেলে। শহর, সমাজ ও শাসন সম্পর্কে পাই নগর, নয়বর, বর (সৈন্য ৪৮ সং) কড়ি, বুড়ি, রথ, দোসাধি (রাজার চর বা পুলিশ)

কৃষিজ ফসলের মধ্যে কমলি দানা, কঙ্গুচিনা, ধান ও কার্পাসের নাম মেলে।

নদী পর্বতের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা খাল, ডোবা (৩২ সং (সরোবর (১০ সং) নলিনী বন, ঘাট ও অনির্দেশ্য সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, টিলা ও গিরি শিখর, সন্ধি পাই। তরুলতার কোন বিশেষ নাম নেই। গুঞ্জা ফুল, তেঁতুল, মুকুলিত বৃক্ষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে বটে।

চর্যার গুহ্য সাধনার অনেক পরিভাষা রূপক উৎপ্রেক্ষা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি পদে দেহের রূপক হিসেবে নৌকা ব্যবহৃত। আজো তাত্ত্বিকদের কাছে মানবদেহ মন-পবনের নৌকা। চর্যাপদে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা এইরূপ—

পাঁচ (স্কন্ধ), ধানী বুদ্ধ, তথতা, তথাগত, ইন্দ্রিয়, ষড় (ইন্দ্রিয়), আট (অষ্টসিদ্ধি, আট প্রকার নিবৃত্তি জাত সিদ্ধি), দশ (ইন্দ্রিয় দ্বার), গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী (ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না), পদ্ম (চতুষ্পদ্ম), পউআ খাল (দুই পদ্মের সংযোগ নাড়ী), অনাহতধ্বনি (কায়াতত্ত্ব সম্পর্কিত), পাখুড়ি (দেহস্থ পদ্মের বিভিন্ন সংখ্যক পাপড়ি), বিমুকখা (চতুষ্কোটি বিমুক্ততা), ধমন-চমন (চন্দ্র-সূর্য হঠযোগ) রবিশশী (হঠযোগ), সহজ (সহজানন্দাবস্থা), শূন্য (নির্বাণ বা নির্বেদাবস্থা), সমাধি (ধ্যান) ইত্যাদি। বিবিধ: আগম, বেদ, পুঁথি, গুরু, শিষ্য, নাথ, ক্ষপণক, মন্ত্র, তন্ত্র, ব্রহ্মা, নবগুণ, [পৈতা] হরি, হর, ঘন্টামালা।

৬

চর্যাগীতির সাহিত্যমূল্য

চর্যাপদ গান হিসেবে রচিত। গানের মাধুর্য বাণীর উৎকর্ষে নয়—সুরলালিত্যে। কথা সেখানে গৌণ, সুরই মুখ্য। তবু এগুলো বাণীপ্রধান গান। চর্যাগীতিতে গুহ্য সাধনতত্ত্বের প্রহেলিকামূলক অভিব্যক্তির বাহন হয়েছে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। কাজেই রূপক-উপমা-উৎপেক্ষার প্রয়োগ ছাড়া এইসব পদ রচনার হয়তো অন্য উপায় ছিল না। তাই অনবরত নির্জিত মানুষের জীবন-জীবিকা ও প্রতিবেশজাত অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত হয়েছে উপমাদি। চর্যাপদে এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সর্বত্র দৃশ্যমান। এ কারণেই চর্যাপদ এক কথায় চিত্রধর্মী বা চিত্রকল্প সমন্বিত রচনা। চিত্র যেমন পুরো বক্তব্যটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে, তেমনি উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাও অভিব্যক্তিকে মানসচক্ষুর গোচরীভূত করে।

বক্তার উদ্দিষ্ট বক্তব্য দৃষ্টান্তযোগে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা উদ্দীপ্ত ও অনুভূতি গভীর করে। রচনার সার্থকতা এখানেই। কাজেই সমকালে ব্যঙ্গার্থ না বুঝেও পাঠক বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউল গানের মতো এর আপাত অর্থের আনন্দ পেত। আজ কালান্তরে ঐসব পদ থেকে সাহিত্যরস আহরণ করা আমাদের পক্ষে হয়তো দুঃসাধ্য। স্বাভাবিক অতীত মোহের আবেশ আমাদের চিত্তবীণার তারে যে আবেগ কম্পন জাগায়, তারই বশে আমরাও সুদূর অতীতের সেই জীবনের সঙ্গে ক্ষণিক একাত্মবোধে অভিভূত হই। পুরোনো সাহিত্যমাত্রই আমাদের এ কারণে আকৃষ্ট করে। আগেই বলেছি চর্যাগীতিতে সাহিত্যিক লাবণ্য এসেছে বাকপ্রতিমার সুষম ও দেদার ব্যবহার থেকে। এই বাকপ্রতিমাও কবির সৌন্দর্যবোধ, শিল্প-চেতনা ও মনীষার সাক্ষ্য। রসভোক্তা হৃদয়, পরিবেষ্টনী সচেতন দৃষ্টি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন না হলে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানুভূতির সাদৃশ্য কিংবা বৈপরীত্য সহজে অনুভূত হয় না। অনেক পদকারের এসব গুণ ছিল বলেই ফাঁকে ফাঁকে আপ্তবাক্য ও জীবনসত্য বিদ্যুল্লতার মতো চমক লাগিয়ে দেয়।

ইন্দ্রিয়শাসিত দেহের বর্ণনা কবি পাঁচটি শব্দেই শেষ করেন, তাতেই সব বলা হয়ে যায়—'মন তরু পঞ্চ ইন্দি তসু সাহা। আসাবহল পাত ফল বাহা, কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল'। কিংবা প্রহেলিকার অবতারণা করে পাঠককে ভাবিয়ে তোলেন কবি, 'রুখের তেন্তুরি কুম্ভীরে খাই। অথবা 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। বলদ বিআল গাবিআ বাঁঝে'—বলে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দেন। যে কোন কামুক প্রেমিকের আবেগপ্রসূত চিরন্তন উক্তি :

জোইনি তই বিনু খনহিঁন জীবমি
তো মুহুচুম্বি কমল রস পিবমি।

যে কোন চর্যার নদী 'ভব নই গহণ গম্ভীর বেগে বাহি' অথবা 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ণ দীসই। ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই। সোনে ভরিতী করুণা নাবী, রূপা থোই নাহিক ঠাবী। খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ'—সবকথা বলা হয়ে গেল। 'কাঅ নাবড়ি খান্টি মন কেড়ুয়াল। এক সো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী। নিসি অন্ধারী মুসা অচারা' তুলা-ধুনি ধুনি আসুঁরে আঁসু। উচাঁ উচাঁ পাবত তঁহি বসই শবরী বালী। মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।' বসন্তে 'নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী। উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা গঅণহ জিম উজোলি চান্দো' ইত্যাদি চোখের সামনে যেন চিত্রপট তুলে ধরে। চর্যাপদে এমনি করে রয়েছে জীবনরহস্য জানবার বুঝবার প্রয়াস। মনে হয় সেদিনকার দারিদ্র্যক্লিষ্ট অস্পৃশ্য লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন প্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তির ও শক্তির প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব জীবনে পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী চিন্তার মাহাত্ম্যপ্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে সেই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ—খুঁজছে জীবনের সার্থকতা। তাই তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখদীর্ণ, দ্বন্দ্ব ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয় হয়তো বা পিছিয়েপড়া মানুষের প্রতিহত কাম্যজীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

আপ্তবাক্য : আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। দুহিল দুধ কি বান্টে সামায়। কাঅ নাবড়ি খান্টি মন কেড়ুয়াল। বর সূন গোহার কি মো দুঠ্ঠ বলন্দে। দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই। জলে পানিআ টালিআ ভেড় ন জাঅ রাজসাপ। দেখি জো চমকই সাঁচে কি তা বোড়ে খাই। ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর ইত্যাদি চর্যাগীতি সাধনার ও সিদ্ধির পন্থা ও সাধ্য বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করবার জন্যে রচিত।

বহু পদ থেকে বেছে সংকলিত মাত্র ৫০ টি পদ সাধনপন্থ ও সাধ্য লক্ষ্য সম্পর্কে সঙ্গীতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসুকে স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব জানিয়ে দেয়ার জন্যই—এ আমরা অনুমান করতে পারি। আমাদের এ অনুমান সঙ্গত, কারণ আমরা দেখতে পাই সাধারণ সংকলনের মতো এতে এক চর্যাকারের পদ এক সাথে সংকলিত হয়নি—যেমন কাহ্ন, ভুসুকু, সরহ, কুক্কুরী প্রভৃতির পদ নানা স্থানে বিন্যস্ত হয়েছে; আমাদের মনে হয় ভাব, বক্তব্য ও সাধনস্তরের ক্রমানুসারে পদগুলো পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর মতো সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। যদিও বিভিন্ন জনের স্বাধীনভাবে রচিত পদের সমগ্রভাব সংকলকের উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধির পুরো সহায়ক হয়নি। তবু 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল' দিয়ে মুনিদত্তের টীকার শুরু আর 'মহাসুহে বিলসন্তি সবরো লইআ সূণ মেহেলী'-'মারিল ভবমত্তা দহদিকে দিধলী বলী' এবং 'হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটলি সবরালী' — বলে শেষ করা একেবারে নির্লক্ষ্য আকস্মিক বলে বিশ্বাস হয় না।

চর্যার ভাষার টীকাকার প্রদত্ত নাম সন্ধ্যা বা সন্ধা। চর্যাগীতি দ্ব্যর্থবোধক রচনা। বাগর্থ ও ব্যঙ্গার্থ বক্তব্যকে দুর্বোধ্য ও অবোধ্য করেছে বলেই সন্ধ্যাকালীন আলো-আঁধারির অস্পষ্টতার মতো তাৎপর্যের অস্পষ্টতারক্ষক ভাষার নাম সন্ধ্যা ভাষা, অথবা বিশেষ মানস সন্ধান করে বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে হয় বলে ভাষার নাম সন্ধা। তাহলে সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা অর্থে আমরা সাংকেতিক ভাষা বা রূপকের ভাষা বুঝব। এ ভাষা অর্থাৎ রচনার এ ভঙ্গি নতুন নয়, বরং সুপ্রাচীন। এত প্রাচীন যে তা মনুষ্য মানস-সংস্কৃতির উদ্ভবের সমকালীন। মানুষের রহস্যচেতনা, পর্যবেক্ষণপ্রসূত বিস্ময়, কল্পনা, অনুভূতি ও বোধ-বুদ্ধির অভিব্যক্তির আদি বাহন হচ্ছে ধাঁধা বা প্রহেলিকা। তুচ্ছকে উচ্চ করে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে, সামান্যকে অসামান্য করে, সরলকে জটিল করে, ঋজুকে বক্র করে, কৌৎসিত্যে লাবণ্য দিয়ে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে স্বপ্নকে বাস্তবরূপে প্রতীয়মান করা, বাস্তবকে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে অপরূপ করা প্রভৃতিই সাহিত্য-শিল্পকর্ম। তাই শাস্ত্রে-সাহিত্যে-ধাঁধায়-ছড়ায়-বচনে-আপ্তবাক্যে বক্তব্য শব্দে-অলঙ্কারে-ভঙ্গিতে প্যাঁচিয়ে-রসিয়ে জটিল ও বর্ণালী রূপে ব্যক্ত করাই মানুষের স্বভাব। বাকবৈচিত্র্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্প। ঘরোয়া জীবনে আটপৌরে কথায়ও আমরা অসংখ্য idiom ও বাক্‌প্রতিমা ব্যবহার করে থাকি। প্রাত্যহিকতায় তা মলিন ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে বলেই আমরা তা লক্ষ্য করিনে, তা আমাদের চমকে দেয় না। কাজেই সন্ধ্যা ভাষা বৌদ্ধ চর্যাকারদের সৃষ্টি নয়, তা চিরকাল ছিল এদেশে, তার প্রমাণ মুনিদত্তের টীকাতেই রয়েছে—সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যা, সংকেত, ব্যাজ প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যাভাষাকে মহাভাষা ও সময় সংকেত (conventional sign) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

চর্যাকারেরা শিক্ষিত ছিলেন। সেকালে শিক্ষা মানেই ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ শেখা এবং বিদ্যা বলতে মুখ্যত ব্যাকরণ-অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ, গণিত, ন্যায়-দর্শন বিদ্যাই বোঝাত। আর জ্ঞান বলতে চরম ও পরম জ্ঞান ছিল অধ্যাত্ম বা পরমার্থ জ্ঞান। এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, সে অধিকারই তাঁদের ছিল না। এঁরা বৌদ্ধ বিহারে বা টোলে শিক্ষিত। নানা সূত্রে জানা যায় নালন্দা প্রভৃতি বিহারে আটশতক থেকে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ও তৎসম্পর্কিত যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজ তত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা বৃদ্ধি পায়। এসব মতবাদীদের যারা বিষয়ী গৃহী-সমাজভুক্ত তাদের আচারিক আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্বণ ছিল। দেব-প্রতিমা পূজাও ছিল আর যারা বিরাগী শ্রমণ তাদের অধ্যাত্ম সাধনা চলত গুহ্য পন্থায়। চর্যাগীতিতে সেই বিরাগী ব্রজী-সহজিয়ারই সাধনপন্থ ও সাধ্যবস্তু বিধৃত। এ সাধনার ভিত্তিই হচ্ছে যোগতান্ত্রিক পদ্ধতি। চর্যাকারেরা সিদ্ধপুরুষ—তাই বলে তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের সবাই পণ্ডিত ছিল, তেমন ধারণা করার কোন কারণ নেই। সব সহজিয়া বাউল যেমন শিক্ষিত কিংবা তত্ত্ববিদ নয়—ওরা অনুকারী অনুসারীমাত্র।

১. Dr. Tarapada Mukherjee : Old Bengali Language and Text, pp.12-13.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

চর্যাগীতিকার পরিচিতি

আজ অবধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তিব্বতী ভাষায় নানা গ্রন্থ অবলম্বনে চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল ও পরিচয় নিরূপণের চেষ্ট করেছেন। আর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা বিশ্লেষণ করে ভাষা ও রচনাকাল নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ সাধারণভাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতই গ্রহণ করেছেন—অবশ্য যুক্তিসঙ্গত বলে নয়, মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং ভাষাবিদ শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশে।

চর্যাগীতিকারদের কাল ও পরিচয় নির্ধারণের জন্যে আজ অবধি যে-সব অনূদিত ও মূল তিব্বতী গ্রন্থ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : ১. Sum-pa mkhan-Po রচিত dPag-bSam-Ijon b Zan (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রীঃ), ২. তারনাথ রচিত rgya-gar-Chos byun (বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, রচনাকাল ১৬০৮ খ্রীঃ) Gnub-thob brgyad-Cu-gya-bzhi-rnam-thar (চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাস), ৩. চক্রসম্বরতন্ত্র, ৪, Sa-Skya-bka'-Bum, ৫. Debther-sNon বা Blue Annals (রচনাকাল ১৪৭৬-৭৮ খ্রীঃ), ৬. Bu-sTom-Rin-Po-Che-র (সংক্ষেপে Bu ston, রচনাকাল ১৩২২ খ্রীঃ) লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে (পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী) কয়েকজন চর্যাকারের সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল এরূপ :

১.	আর্যদেব	আট শতকের মধ্যভাগ	সরহের প্রশিষ্য
২.	কম্বলাম্বর পা	নয় শতকের মধ্যভাগ	বজ্রঘন্টের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য
৩.	গুঞ্জরী পা	নয় শতকের প্রথমার্ধ	সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য
৪.	তন্ত্রী পা	নয় শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ ভাগ	জালন্ধরী পার শিষ্য
৫.	মহী পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	কাহ্ন পার শিষ্য
৬.	কঙ্কণ পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	দারিকের শিষ্য
৭.	বীণা পা	দশ শতকের শেষ ভাগ	ভদ্র পার শিষ্য

(মুখময় সুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত)

এবং তাঁর সংকলিত 'হিন্দি কাব্যধারা' নামের গ্রন্থেও চর্যাকারদের পরিচয় রয়েছে। সেগুলোও যথাস্থানে উল্লিখিত হচ্ছে।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় (প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় গ্রন্থে, পৃঃ ১-১২) তিনটে তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে মহাযান সিদ্ধাচার্যদের গুরু-শিষ্য পরম্পরার একটা পীঠিকা তৈরি করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন চর্যাকারও রয়েছেন। এর থেকে চর্যা রচনার কালপরিসরও মোটামুটিভাবে জানা যাবে। এঁদের আবির্ভাব কালও অনুমান করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে চর্যাগীতিগুলোর আট শতকের প্রথমদিক থেকে শুরু করে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় পরিসরে রচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্রসম্বরতন্ত্র মতে
গুরু পরম্পরা

সরহ পা (রাহুল ভদ্র) (আট শতকের গোড়ার দিকে,
৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি)
শবর পা (আট শতকের প্রথমার্ধ)
|
লূই পা (চর্যাপদ সূত্রেও দারিক পার গুরু, সং ৩৪
আট শতকের মধ্যভাগ)
|
দারিক পা (জীবৎকাল আট শতকের শেষ ভাগ)
|
বজ্রঘন্ট পা|
|
কূর্ম পা
|
জালন্ধরী পা (চর্যাসূত্রেও কাহ্ন পার গুরু, সং ৪৬)
|
কাহ্ন পা (কৃষ্ণাচার্য, নয় শতকের মধ্য ও শেষ ভাগ)
|
গুহ্য পা (ভদ্র পা ওর্ফে ভাদে, নয় শতকের শেষ
ভাগ এবং বিজয় পা দশ শতকের প্রথম ভাগ)
|
বিজয় পা
|
তিল্লি পা

শবর
|
লূই
|
বজ্রঘন্ট
|
কচ্ছ পা (কূর্ম পা)
|
জালন্ধরী পা
|
কাহ্ন পা
|
গুহ্য পা (ভদ্র পা)
|
তিলো পা
|
নারো পা

নারো পা (২য় কাহ্ন পা, দশ শতকের মধ্যভাগ অথবা ১০৩৯ সনে মৃত্যু।)
শান্তি পা (রত্নাকর শান্তি, দশ শতকের শেষভাগ ও এগারো শতকের প্রথম ভাগ)
|
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ—৯৮০-৮২ খ্রীঃ জন্ম)

দীপঙ্কর ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে গৌড়রাজ নয়পাল ও কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিবাদে মধ্যস্থতা করে আপোস করান এবং সম্ভবত ১০৪২ সনে বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে তিব্বতে যান, সেখানে ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদান করে ১০৫০ সনের কিছু পরে মৃত্যু বরণ করেন।

॥২॥

এবার আমরা বিভিন্ন চর্যাকারের আবির্ভাবকাল ও পরিচিতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত উদ্ধৃত করছি। এক্ষেত্রে প্রথমে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র পরে রাহুল সাংকৃত্যায়নের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য বিদ্বানের মত সংকলন করে দিচ্ছি।

সংক্ষেপে শহীদুল্লাহ্-'শ', রাহুল সাংকৃত্যায়ন-'রা', সুখময় মুখোপাধ্যায়-'সু' এবং সুকুমার সেন-'সু-কু'। এঁদের গ্রন্থগুলো যথাক্রমে বাঙলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), হিন্দি কাব্যধারা, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় এবং চর্যাগীতি পদাবলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. শবরী বা শবর পা

শ- শবরী পা বাঙালী। তাঁর গুরুর নাম এক মতে আর্য অবলোকিতেশ্বর, অন্যমতে নাগার্জুন। শবর ব্যাধ ছিলেন। কমলশীলকে তিনি দুটো গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থ দুটোর নাম 'ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি' ও 'মর্মোপদেশ'। কমলশীল তিব্বত রাজ শ্রী গ্রোঙ-লদেউ বচনের নিমন্ত্রণে তাঁর দরবারে যান ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে। অতএব শবরী পা ৬৮০-৭৬২ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

রা শবরী পা বিক্রমশীলা নিবাসী, কুলে ক্ষত্রিয়, এবং অন্যতম সিদ্ধা। ইনি ৮৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, যথা—ক. চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থক গীতি, খ. মহামুদ্রাবজ্রগীতি, গ. শূন্যতা দৃষ্টি, ঘ. সহজ সম্বরস্বাধিষ্ঠান, ঙ. সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান।

সু লুই পার গুরু শবর পার জীবৎকাল আট শতকের প্রথমার্ধ। এবং শবর পার গুরু সরহের জীবৎকাল আট শতকের একেবারে গোড়ার দিক- ৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি।

২ লুই পা

শ তারনাথের মতে লুই বাঙলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। তিনি প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ (লেখক) ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সামন্ত শুভ। তিনি উড়িষ্যার রাজার ও মন্ত্রীর গুরু ছিলেন। শবর (জীবৎকাল-অনু ৬৮০-৭৬০ খ্রীঃ) লুই পার গুরু ছিলেন। কাজেই লুই পার জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ। লুইও বাঙালী ছিলেন। এবং লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নয়, মৎস্যেন্দ্রনাথ পৃথক ব্যক্তি। দারিক পা ছিলেন লুই পার শিষ্য; লুই-এর একখানি গ্রন্থের নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ'। শান্তরক্ষিত 'অভিসময় মঞ্জরী'তে লুই পার উল্লেখ করেছেন।

রা লুই পা কায়স্থ এবং চৌরাশী সিদ্ধার একজন। তাঁর গ্রন্থাবলী 'অভিসময়বিভঙ্গ' 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষ', 'বুদ্ধোদয়', 'ভগবৎ অভিসময়' ও 'গীতিকা'। তাঁর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ খ্রীস্টাব্দ। বাস করতেন মগধে/অথবা আবির্ভাবকাল ৮০০ খ্রীস্টাব্দ [হিন্দি কাব্যধারা]

সু লুই পা আট শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। লুই পা ধর্মপালের রাজত্বের (৭৭০-৮০৬ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে 'কায়স্থ' (লেখক) ছিলেন, এ তথ্যের উৎস-Sa-Bum ও পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী। লুই পা শান্ত রক্ষিতের অভিসময়মঞ্জরীতে উল্লিখিত হয়েছেন। ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের কয়েক বছর পরে শান্তরক্ষিতের মৃত্যু হয়। লুই পা তাহলে আট শতকের শেষ পাদের আগেই বর্তমান ছিলেন।

সু-কু লুই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ তিনখানি— শ্রীভগবদভিসময়, অভিসময়বিভঙ্গ, এবং 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষ গীতিকা দৃষ্টি নাম'। মনে হয় শেষোক্ত গ্রন্থটি লুইয়ের দোহা ও চর্যাগীতির সংগ্রহ।

৩. বিরূপ পা

শ বিরূপ দুইজন। একজন নালন্দের জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য, কাজেই সাত শতকের লোক। অন্যজন জালন্ধরী পার শিষ্য। তিনি বাঙালী। তাঁর জন্মস্থান দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। এবং তাঁর শিষ্য ডোম্বী পা। বিরূপ আট শতকে বর্তমান ছিলেন। 'বজ্রযোগিনী' সূত্রে জানা যায় বিরূপের গুরু লক্ষ্মীংকরা (ইন্দ্রভূতির ভগ্নী। ইন্দ্রভূতি জালন্ধরী পার অন্যতম গুরু)। লক্ষ্মীংকরার গুরু ইন্দ্রভূতি, তাঁর গুরু কুক্কুরী পা, তাঁর গুরু লুই পা।

রা বিরুআ পা (বিরূপপাদ) ভিক্ষুরূপে সোমপুরী বিহারে (পাহাড়পুরে) বাস করতেন। বিরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে, জন্মস্থান ত্রিউর। তিনি ভিক্ষু ও চুরাশি সিদ্ধার একজন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, যথা-'অমৃতসিদ্ধি', 'দোহাকোষ', 'কামচণ্ডালিকাদোহাকোষ', 'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপবজ্রগীতিকা', 'বিরূপচতুরশীতি', 'মার্গফলান্বিতা ববাদক' ও 'সুনিস্প্রপঞ্চতত্ত্বোপোদেশ'।

সু বিরূপ নয় শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। উৎস 'বজ্রযোগিনী' গ্রন্থোক্ত শিষ্য পরম্পরা লুই-কুক্কুরী-ইন্দ্রভূতি-লক্ষ্মীংকরা-বিরূপা।

সু-কু তারনাথের অনুসরণে সুকুমার সেন মনে করেন কাহ্ন (কৃষ্ণপাদ) নামধারী একজন সিদ্ধাচার্যের নামান্তর ছিল বিরূপা। ১৮ ও ৩৬ সংখ্যক চর্যাপদের বরাত দিয়ে তিনি কাহ্ন পা ও 'কামচণ্ডালিকাগীতি' প্রণেতা বিরূপা অভিন্ন বলে মনে করেন। ভনিতায় গৌরবসূচক 'ভনন্তি' থাকায় তিনি মনে করেন চর্যাটি বিরূআর কোন শিষ্যের রচনা। তিব্বতী অনুবাদ সূত্রে বিরূপা মহাযোগী, যোগীশ্বর আচার্য 'কর্মচণ্ডালিকাদোহাকোষগীতি', দোহাকোষ এবং 'বিরূপ পদ চতুরাশীতি'-র রচয়িতা।

৪. ডোম্বী পা

শ ইনি ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরূপ বা বিরুআ। গুরু পরম্পরার সূত্রে ডোম্বী পার সময় নিরূপণ সম্ভব। যথা—শবর-লুই-ডোম্বী-তেল্লি-নাড়ো-ছোটডোম্বী-কুশলী ভদ্র। শবর কমলশীলের সমসাময়িক। শবর কমলশীলের জন্য 'বজ্রগীতি' ও 'মর্মোপদেশ' নামে দুখানি বই লেখেন। কমলশীলের গুরু শান্ত রক্ষিত (জীবৎকাল ৭০৫-৬৫ খ্রীঃ)। কমলশীল তিব্বতরাজ খ্রী-গ্রোঙ-লদেউ-এর আহ্বানে (রাজত্বকাল ৭৪১-৮৬) ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত রাজদরবারে গিয়েছিলেন এবং ৭৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে চীনা পণ্ডিত হো সাঙ্গের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেন। অতএব ডোম্বী পার জীবৎকাল ৭৯০-৮৯০ খ্রীস্টাব্দ।

রা ডোম্বী পা জীবৎকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯খ্রীঃ) ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ইনি বর্ণে ক্ষত্রিয়, নিবাস মগধ এবং চুরাশি সিদ্ধার একজন। তাঁর রচিত গ্রন্থ-'অক্ষরদ্ধিদেশ', 'গীতিকা' ও নাড়ী বিন্দুদ্বারে যোগচর্যা'।

সু জীবৎকাল আট শতকের মধ্য ও শেষভাগ। এ তথ্যের উৎস তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস। 'পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী'তেও ডোম্বী লুইপার শিষ্য।

সু-কু ডোম্বী জাতিবাচক নাম হতে পারে। তিব্বতী ঐতিহ্যে ডোম্বী দুজন। একজন ডোম্বী হেরুক। অন্যজন লাড়ী ডোম্বী। হেরুক ত্রিপুরার রাজা (তারনাথের মতে)। ইনি কান্ত বিরূআর শিষ্য। টীকায় মুনিদত্তের মতে লাড়ী ডোম্বী চর্যাপদকার ও রাঢ়দেশে অনেককাল বাস করেন। চর্যাকার ডোম্বী যোগী ছিলেন।

৫. দারিক পা

শ ইনি লুই পার শিষ্য। অন্যসূত্রে জানা যায় শালীপুত্রের রাজা ইন্দ্রপালই দারিক পা। ইন্দ্র পালের রাজ্য প্রাপ্তির সন ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ। ইনি রত্ন পালের পরবর্তী রাজা। ইন্দ্রপাল বাঙলাদেশের রাজা বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। এ যদি সত্য হয় তবে ইনি লুই পার প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কিনা সন্দেহ। লুই পার শিষ্য হলে দারিক আট শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও নয় শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান থাকার কথা। এঁর চর্যাগীতির ভাষা প্রাচীন বাঙলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রা দারিক পার জন্মস্থান উড়িষ্যার শালীপুত্র। ইনি শালীপুত্রের রাজা এবং পরে সিদ্ধা হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মহাগুহ্যতন্ত্রোপদেশ, তথতাদৃষ্টি' ও 'সপ্তম সিদ্ধান্ত'।

সু দারিক পার জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ। Blue Annals গ্রন্থের মতে ইনি রাজা ছিলেন। গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন (পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী) বলেন ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন।

সু-কু দারিক লুই-এর শিষ্য। তাঁর মতে লুই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী। কাজেই দারিকও ঐ শতাব্দীর লোক হবার সম্ভাবনা।

৬. ভুসুকু

শ আটটি চর্যাপদের রচয়িতা। বৌদ্ধচর্যাকার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও সূত্রসমুচ্চয়—এই তিনখানি গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন শান্তিদেব। তাঁর ডাক নাম ভুসুকু। তারনাথের ও Bu-ston-এর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসদ্বয়ে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। শান্তিদেব সৌরাষ্ট্র দেশের রাজপুত্র। নালন্দায় এসে তিনি জয়দেবের শিষ্য হন। তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। তাই ভুক্তি'র-ভু, সুপ্তির-সু এবং কুটিরের-কু এই তিন আদ্যক্ষর যোগে তাঁকে পরিহাস ছলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই শান্তিদেব ভুসুকু সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু পদকার ভুসুকুও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের শিষ্য ছিলেন। কাজেই তিনি একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গের (বঙ্গালদেশের) লোক [চর্যা সং ৩৯] এবং 'চতুরাভরণে'র লেখক। ভুসুকুর দুটো চর্যায় 'রাউতু ভুসুকু' ভণিতা রয়েছে। ভুসুকু প্রাচীন বাঙলা ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। অবশ্য সেকালের বাঙলা, আসামী ও উড়িয়াতে পার্থক্য ছিল সামান্যই।

রা ভুসুকুর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮০০ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮০৬ খ্রীঃ) ভুসুকু বর্তমান ছিলেন। এঁর জন্মস্থান নালন্দা। ইনি রাউত বা অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। এবং পরে ভিক্ষু এবং সিদ্ধা হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সহজগীতি'। রাজপুত্ররূপে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শান্তিদেব।

সু একাধিক ভুসুকু ছিলেন। শান্তিদেব ভুসুকু সৌরাষ্ট্রের লোক। দেবপালের সমসাময়িক। সুতরাং নয় শতকের লোক। তারনাথ-উক্ত দ্বিতীয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য। দ্বিতীয় ভুসুকু এগারো শতকের মধ্যভাগের লোক। এই দ্বিতীয় ভুসুকু সম্ভবত বাঙালী ছিলেন।

সু-কু ভুসুকু বোধ করি রাজপুত্র ছিলেন। অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশের সন্তান বলেই 'রাউত' নামে অভিহিত। ভুসুকু 'ভূসৃষ্ম্ব' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে তিনি অনুমান করেন। ভুসুকু নিজেকে এবং শিষ্যদের যোগী বলে অভিহিত করেছেন (চর্যাপদ সংখ্যা ২১, ৩০, ৪১) এবং ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সম্ভাব্য সীমা ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দ। ঐ সনে নকল করা গ্রন্থ চতুরাভরণ এই ভুসুকুরই রচনা। [১. রাউত অন্যমতে গ্রাম-প্রধান। রাউত-অশ্বারোহী সৈন্য-'আইসন্ত রাউত সবে অশ্বে আরোহণ/ধবল অশ্বেতে চড়ি খর্গ চর্ম ধরি/ নীলবাস পরি আইসে হাতে শূল ধরি'। [রসুল চরিত, পৃঃ ১৫৮, সৈয়দ সুলতান]

৭. কুক্কুরী পা

শ কুক্কুরী পা বাঙলাদেশের লোক। অন্য মতে তাঁর জন্মস্থান কপিলসক্রু। ইনি ইন্দ্রভূতির অন্যতম গুরু। অতএব ইনি আট শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন।

রা কুক্কুরী পা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উচ্চতম সীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান কপিলবাস্তু। জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে এবং ইনি অন্যতম সিদ্ধা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'যোগভাবানুপদেশ' ও 'স্রবপরিচ্ছেদন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ কুক্কুরী পা আট শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

সূ-কু সুকুমার সেন মনে করেন ভনিতার কুক্কুরী পা কোন ভক্তের বা শিষ্যের রচনার নির্দেশক। অবশ্য মহামায়া সাধন নামে কুক্কুরী পার রচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। ঐ গ্রন্থে সংকলিত একটি বজ্রগীতির সঙ্গে কুক্কুরী পার নামাঙ্কিত চর্যাপদ দুটোর এই মিলটুকু মেলে যে তিনটিই নারীভাষিত এবং তিনটিতে মেয়েলী সংকোচহীনতা প্রকটিত। অবশ্য তারনাথের মতে একটি কুক্কুরী সর্বদা সঙ্গে রাখতেন বলেই এই সিদ্ধা কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

৮. কম্বলাম্বর পা

শ কম্বলাম্বর বা কম্বল ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরী পার গুরু। তিনি কনকারামের বা কঙ্করের রাজপুত্র বলে কথিত। অন্য এক মতে তাঁর জন্মস্থান উদ্যান বা উড়িষ্যায়। কম্বলাম্বর লুই পার একখানা-গ্রন্থের টীকাকার। ইনি কাহ্ন পার পূর্ববর্তী ও কুক্কুরী পার সমকালীন। অতএব কম্বলাম্বর আট শতকের প্রথম পাদের লোক।

রা কমরী পার জীবৎকাল ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ অবধি। অতএব তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জন্মস্থান উড়িষ্যা, তিনি ছিলেন রাজকুমার, ভিক্ষু এবং সিদ্ধ। 'অসম্বন্ধদৃষ্টি' 'অসম্বন্ধস্বর্গদৃষ্টি' ও 'গীতিকা' তাঁর রচিত গ্রন্থ। তিনি নয় শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য।

সূ-কু কামলী বা কম্বলপাদের সংস্কৃত রচনা আছে। সেখানে তাঁর নামান্তর কম্বলাচার্য। সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রটীকায় তাঁর পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

৯. আর্যদেব

শ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বিখ্যাত আর্যদেব ভিন্ন ব্যক্তি। পদকার আর্যদেব কম্বলাম্বরের সমকালীন। তারনাথের মতে ইনি মেবারের রাজা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। এঁর পদের ভাষা উড়িয়া। অতএব ইনিও আট শতকের প্রথম পাদের লোক।

সূ-কু তিব্বতী ঐতিহ্যে আজদেব (আর্যদেব) মহাচার্য এবং 'কানেরীগীতিকা' ও 'চর্যামেলায়নপ্রদীপ' রচয়িতা।

১০. কঙ্কণ

শ ... কর্দিয়ে-র মতে কঙ্কণ কমলাম্বরের বংশজ। ইনি প্রথম জীবনে বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন। সম্ভবত কঙ্কণ কমলাম্বরের শিষ্য ছিলেন। এঁর চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের ছাপ রয়েছে।

রা কঙ্কণ পার জীবৎকাল নয় শতকের শেষভাগ এবং ইনি দারিকের শিষ্য।

সূ-কু তিব্বতী ঐতিহ্যে সিদ্ধা কঙ্কণ কম্বলচার্যের বংশধর। কঙ্কণ নামটি ছদ্মনাম অথবা উপাধি সূচক। কঙ্কণ যে বৌদ্ধযোগী ছিলেন, তা তাঁর পদে ব্যবহৃত 'সুণ' 'সত্তবহি' 'বিন্দুনাগ' ও 'তথতা' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ থেকে বোঝা যায়।

১১. মহীধর পা

শ মহীধর বা মহিল কাহ্ন পার শিষ্য। তিনি গুরুর সঙ্গে চট্টগ্রামেও গিয়েছিলেন। পদের ভণিতায় 'মহিত্তা' নাম মেলে। পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী।

রা মহীধরের জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ। ইনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন (৮৫৯-৫৪/৯০৮ খ্রীস্টাব্দ), জন্মস্থান মগধ। বর্ণে শূদ্র। 'বায়ুতত্ত্ব' ও 'দোহাকোষগীতিকা' এঁর রচিত গ্রন্থ। মহীধর দারিকের শিষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সু-কু মনে হয় মহীধরের আসল নাম মহীণ্ডা এবং তারনাথের মহিলা। রচিত গ্রন্থ 'বায়ুতত্ত্ব', 'দোহাগীতিকা'। 'ভনন্তি' ভনিতা দৃষ্টে মনে হয় চর্যাটি তাঁর শিষ্য বা ভক্তের রচনা। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি আচার্য কৃষ্ণের বংশধর।

১২. ধাম বা ধর্মপাদ

শ ধাম বা ধর্মপাদ কাহ্ন পার শিষ্য। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। পদের ভাষা বাঙলা।

রা ধর্ম বা ধর্মপাদ বিগ্রহ-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ, জন্মস্থান বিক্রমশীলা (ভাগলপুর), বর্ণে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু এবং সিদ্ধা। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কালভাবনামার্গ', 'সুদৃষ্টিগীতিকা', 'হুঙ্কারচিতবিন্দুভাবনাত্রাস'।

সু-কু চাটিল নামযুক্ত চর্যাটি ধামের বলে মনে হয়। ধামের নামাঙ্কিত চর্যায় যোগের প্রক্রিয়া বর্ণিত। তারনাথ জালন্ধরীর শিষ্যদের মধ্যে এক ধামের উল্লেখ করেছেন। জালন্ধরী কিছুকাল চট্টগ্রামে ছিলেন। তারনাথের মতে তিলপাও চট্টগ্রামবাসী। কাজেই চাটিগাঁবাসী অর্থে চাটিল ও তিলপা অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন।

১৩. ভদ্রপাদ বা ভাদে পা

শ ভদ্রপাদ বা ভাদে পা কাহ্ন পার শিষ্য। তাঁর জন্মস্থল মহিভদ্র, পদের ভাষা বাঙলা।

রা ভদ্রপাদ বা ভাদেপার আবির্ভাবকাল বিগ্রহ ও নারায়ণ পালের রাজত্বকাল, নিম্নসীমা ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ, জন্মস্থান শ্রাবস্তী, পেশায় চিত্রকর এবং সিদ্ধা।

সু-কু তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি আচার্য নামান্তরে ভাণ্ডারী। তিব্বতী ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত ও ভদ্রাবীধীর নাম আছে। এঁদের কেউ ভাদে হওয়া সম্ভব। ভাদের 'সহজানন্দদৃষ্টি গীতিকা'র তিব্বতী অনুবাদও আছে। সম্ভবত এটি চর্যাগীতি কিংবা চর্যাগীতিকোষ। তারনাথ ভাদেকে জালন্ধরী ও কৃষ্ণাচার্য—দুই জনেরই শিষ্য বলেছেন। ভাদের চর্যাটিতে তান্ত্রিকতার ছাপ নেই।

১৪. জয়নন্দী বা জয়ানন্দ

শ জয়নন্দী বা জয়ানন্দ বাঙলাদেশের এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর পদের ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ তথা—প্রত্ন-মৈথিলী-উড়িয়া-বাঙলা-আসামী।

১৫. শান্তি পাদ

শ শান্তি পাদ বা রত্নাকর শান্তি ও শান্তিদেব অভিন্ন ব্যক্তি নন। চর্যাকার শান্তি পাদ বিক্রমশিলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁর শিষ্য। এগারো শতকের প্রথমে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর চর্যার ভাষা প্রাচীন মৈথিলী।

সু সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে শান্তিপাদ রত্নাকর শান্তির সংক্ষিপ্ত নাম। দশ শতকের শেষ ভাগে ও এগারো শতকের প্রথম ভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন।

সু-কু শান্তি দেবের সঙ্গে ভুসুকুর যোগ টানা চলে না। তবে চর্যাকর্তা শান্তির সঙ্গে হয়তো চলতে পারে। শান্তির চর্যা দুটোতে (১৫ ও ২৬) সহজসাধনার উল্লেখ নেই এবং পারিভাষিক শব্দও খুব কম। এ দিক থেকে শান্তিকে প্রাচীনতর পদকর্তা বলতে হয়। নাড় পাদের উদ্ধৃত একটি চর্যাপদে শান্তির ভনিতা ও ভুসুকুর উল্লেখ রয়েছে। এই শান্তি নিশ্চয়ই ভুসুকুর শিষ্য অথবা ভক্ত। নাড় পাদের গ্রন্থের লিপিকাল ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ। এটিই শান্তির জীবৎকালে নিম্নতম সীমা। চর্যাগীতি ও চর্যাপদের শান্তি অভিন্ন কিনা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে না। চর্যা দুটির ভণিতা দৃষ্টে মনে হয় (থে ও থি বিভক্তি অন্তি থেকে উৎপন্ন সুতরাং গৌরবসূচক) চর্যা দুটি শান্তির কোন ভক্ত শিষ্যের রচনা! তিব্বতী অনুবাদে শান্তি দেবের সহজগীতি এবং শান্তির 'সুখদুঃখ-পরিত্যাগ অদ্বয় দৃষ্টি' পাওয়া গেছে।

১৬. বীণা পাদ

শ বীণা পাদের জন্মস্থান গহুর। তিনি ক্ষত্রিয় এবং তাঁর গুরুর নাম বুদ্ধবাদ। তিনি নয় শতকের লোক। তাঁর পদের ভাষা বাঙলা।

রা বীণা পা দশ শতকের শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভাদে বা ভদ্র পার শিষ্য।

সু-কু ভণিতা হিসেবে নির্দেশ করা যায় এমন কোন বীণা নাম চর্যাতে নেই। একটি সমাসবদ্ধ শব্দ আছে—'হেরুঅ বীণা'। তিব্বতী ঐতিহ্যে বীণা পাদ ছিলেন বীরয়ার বংশধর। এঁর রচিত গ্রন্থ 'বজ্রডাকিনী নিষ্পন্নক্রম'। তারনাথের বর্ণনা থেকে মনে হয় বীণা পাদ আর ডোম্বী হেরুক একই ব্যক্তি।

১৭. সরহ

শ রাহুল ভদ্র সরহ ভিন্ন ব্যক্তি। চর্যাকার সরহ ব্রাহ্মণ। এঁর জন্মস্থান রাঙ্গীদেশ। কামরূপের রাজা রত্নপাল (১০০০-৩০ খ্রীঃ) এঁর শিষ্য। অপভ্রংশ ভাষায় 'দোহাকোষ'ও ইনিই রচনা করেন। এঁর জন্মস্থান রাঙ্গীদেশ সম্ভবত উত্তরবঙ্গ কামরূপ। ইনি এগারো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। এঁর পদাবলীর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী। সরহের 'দোহাকোষে'র তিনটে সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন তিন বিদ্বান্—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৮), ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৩৫) এবং ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৫৭)।

রা গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নিম্নতম জীবৎকাল ৭৬০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান মগধের নালন্দা। তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও সিদ্ধ তিনি বহু গ্রন্থেরও প্রণেতা, তাঁর 'কায়কোষ অমৃত', 'বজ্রগীতি', 'চিত্তকোষ', 'অজবজ্রগীতি', 'ডাকিনীগুহ্য বজ্রগীতি', 'দোহাকোষোপদেশ গীতি দোহাকোষ', 'তত্ত্বোপদেশশিখর দোহাকোষ', 'ভাবনা-ফলদৃষ্টিচর্যাদোহাকোষ', 'বসন্ততিলক দোহাকোষ', 'চর্যাগীতিদোহাকোষ', 'মহামুদ্রোপদেশদোহাকোষ' ও 'সরহপাদগীতিকা'।

সু আট শতকের গোড়ার দিকে ৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরহ বর্তমান ছিলেন। সরহ শবর পা-র গুরু ছিলেন। সরহ পা ও রাহুলচন্দ্র সরহ অভিন্ন ব্যক্তি। ১১০১ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত সরহের দোহাকোষের পুথিতে প্রাপ্ত তথ্যের উৎস সরহের দোহাকোষ সংগ্রাহক দিবাকর চন্দ্রের উক্তি। সরহ কমলশীলের পূর্ববর্তী লোক। শান্ত রক্ষিতের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে কমলশীল লাসায় যান এবং ৭৯২-৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় চীনা পণ্ডিত হো সাঙ্গের সঙ্গে তাঁর মহাযানমত সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

সু-কু সরহের চর্যাপদে যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত নেই। সরহ অনেকগুলি দোহা লিখেছিলেন অবহট্‌ঠে। সেগুলো তিনটে কোষে সংকলিত ছিল। তাঁর দোহাকোষের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১০১ খ্রীস্টাব্দ। সে সময়ে সরহের দোহা 'লোপোন্মুখ' হয়েছিল। দিবাকর চন্দ্র লুপ্তপ্রায় দোহাগুলো সংকলন করে রক্ষা করেছিলেন। দিবাকর লিখেছেন,

জোহি বিনটঠ পণটঠপউ সোহিঅ অথ বুত্ত।
সরপাঅ-কিঅ দোহ-তিউ সো সংহিত এথ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবাকর চন্দ্র ১১০১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী অবশ্যই। অতএব সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সরহ মহাযোগী, যোগীশ্বর, মহাশবর, মহাব্রাহ্মণ ও মহাচার্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'দোহাকোষ' (মহামুদ্রোপদেশক, উপদেশগীতি, দ্বাদশোপদেশ, মর্মোপদেশ, তত্ত্বোপদেশ-শিখর) 'চর্যাগীতি' (ভাবনাদৃষ্টিগীতিকা), 'কায়বাকচিতমনসিকায়'। সরহের সংস্কৃত রচনাও আছে এবং এতে প্রবীণতর পরিচয় প্রকট। তারনাথের মতে এক সরহ ছিলেন সবরী পার সঙ্গে অভিন্ন, আর এক সরহ ছিলেন আচার্য সররুহ। সরহ পণ্ডিত এবং রাজ পুরোহিত। এঁর গুরু ছিলেন অনঙ্গবজ্র। 'দোহাকোষ' রচয়িতা তিল পা ও সরহ অভিন্ন হতে পারেন।

১৮. শুণ্ডরী পা

শ কর্দিয়ে-এর ক্যাটালগে মাত্র এঁর নাম মেলে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। ভাষা বাঙলা।

রা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯) ইনি বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান ডীণ্ডনগর। বর্ণে লোহার (কর্মকার) এবং সিদ্ধ। ইনি সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য।

সু-কু শুণ্ডরীর নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে নেই। চর্যাগীতিতে যৌনতান্ত্রিক ক্রিয়ার ইঙ্গিত আছে। মনে হয় চর্যাকর্তা প্রাচীনদের মধ্যে পড়েন না। নামটিও ছদ্ম বলে বোধ হয়। শুণ্ড করিক বা শুড় করিক থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

১৯. চাটিল বা চাটিল্ল পা

শ চৌদ্দ শতকের জ্যোতিরেশ্বর ঠাকুর রচিত বর্ণরত্নাকরে চাটিলরূপে এঁর নাম মেলে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। এঁর চর্যার ভাষা বাঙলা।

সু-কু চাটিল নামটি হয়তো চট্টগ্রামবাসী অর্থে ব্যবহৃত। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই'—এই ধাম হয়তো চাটিলের শিষ্য—'ধর্মকর্ম' নয়।

২০. ঢেণ্টণ

শ জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'ঢেণ্টণ' রূপে এঁর নাম আছে। এঁর গীতির ভাষা বাঙলা।

রা ঢেণ্টণ পা ও তন্তি পা সম্ভবত অভিন্ন। দেবপাল-বিগ্রহ পালের সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের ঊর্ধ্বসীমা ৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান অবন্তিনগর-উজ্জয়িনী, বর্ণে তাঁতী এবং সিদ্ধ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চতুর্যোগ ভাবনা'।

সু-কু ঢেণ্টণ পা নামীয় চর্যাটি কোন শিষ্য ভক্তের রচনা নিশ্চয়ই। এটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা। এতে কোন পারিভাষিক শব্দ নেই। চর্যাটির একটি আধুনিক রূপান্তর কবীরের ভণিতায় মিলেছে—

বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওএ দিন তিস সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে॥

২১. তাড়ক

শ তাড়কের পরিচয় অজ্ঞাত, তাঁর চর্যার ভাষা বাঙলা।

সু-কু তাড়কের সম্বন্ধে তিব্বতী ঐতিহ্যে কোন উল্লেখ নেই। তাড়ক ছদ্মনাম কিংবা উপাধি হওয়াই সম্ভব। তাড়ক শব্দের অর্থ-খুনী, ফাঁসুড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২. কাহ্ন পা

শ কাহ্ন পার জন্মস্থান উড়িষ্যা। থাকতেন পাহাড়পুরস্থ সোমপুরী বিহারে। কাহ্নপা-'দোহাকোষ' ও তেরোটি চর্যাপদ ছাড়াও 'শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকাযোগ রত্নমালা'-র রচয়িতা। এই গ্রন্থের লিপিকাল ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। লিপিকর কায়স্থ গয়াকর। লিপিকাল গোবিন্দ পাল দেবের রাজত্বের উনচল্লিশতম বছরের চৌদ্দই ভাদ্র। কাহ্ন পার গুরু জালন্ধরী পা। জালন্ধরীর গুরু ইন্দ্রভূতি। কাহ্ন পা গোপীচাঁদের (৭ শতকের শেষে) সমসাময়িক এবং ধর্মপালের (৭৭০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ) নির্মিত সোমপুরী বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। কাজেই কাহ্ন পা আট শতকে বর্তমান ছিলেন।

রা কাহ্ন পা বা কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্য পাদ বা কৃষ্ণবজ্রপাদ অভিন্ন ব্যক্তি। দেব পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উর্ধ্বতম সীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান কর্ণাট। বাস করেছেন বিহারে এবং বঙ্গদেশে (সোমপুরী বিহারে)। বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষু ও সিদ্ধ। রচিত গ্রন্থ—'গীতিকা', 'মহাটুঢন', 'বসন্ততিলক', 'অসম্বন্ধদৃষ্টি', 'বজ্রগীতি' ও 'দোহাকোষ'।

সু কাহ্ন পার ওর্ফে কৃষ্ণাচার্যের জীবৎকাল নয় শতকের মধ্য ও শেষভাগ। Saskya-bka-Bum গ্রন্থানুসারে ইনি দেব পালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯ খ্রীঃ) পণ্ডিত ভিক্ষু নামে খ্যাত ছিলেন এবং ঐ সময়ে সোমপুরী পাহাড়ে বাস করতেন। দেবপাল নয় শতকের তৃতীয় পাদ অবধি রাজত্ব করেন।

সু-কু কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিলা নামে চর্যাগীতিতে এঁর ভণিতা মেলে। একটিতে কাহ্নর নামান্তর পাই 'বিরুআ'। একটিতে গুরু জালন্ধরী পার উল্লেখ আছে। কাহ্ন কাপালিক, যোগী, নাঙ্গা বলে ভণিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। নাথসাধনার ঐতিহ্যে কাহ্ন পা জালন্ধরী বা হাড়ি পার শিষ্য। তিব্বতী ঐতিহ্যে কৃষ্ণপাদ যোগীশ্বর আচার্য ও মণ্ডলাচার্য। কৃষ্ণপাদের নামে যে সব রচনা আছে সেগুলো একজনের রচনা নয়—অন্তত দুইজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। একজন কাহ্ন জালন্ধরী পার শিষ্য, যার নামান্তর ছিল 'বিরুআ'। তিনি নাঙ্গা, কাপালিক যোগী এবং ডোমনী প্রেম বর্ণিত। এঁর রচনা ছয়টি—১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ও ৪২। অপর কাহ্নের রচনায় জ্ঞানোপদেশই প্রবল। তাঁর রচনা সাতটি- ৭, ১৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০ ও ৪৫। ভণিতায় কিন্তু দুই কবির কোন পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। এক কাহ্ন হেবজ্রতন্ত্রের টীকা 'যোগরত্নমালা' লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিপীকৃত একটি পুথি পাওয়া গেছে। অতএব লিপিকাল ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। এই কৃষ্ণাচার্যই যদি চর্যাকার হন, তা হলে তাঁর জীবৎকালের নিম্নতর সীমা বারো শতকের শেষার্ধে। তারনাথ এক কৃষ্ণাচার্যকে ডোম্বী হেরুকের এবং অন্য এক কৃষ্ণাচার্যকে অর্বাচীন ইন্দ্রভূতির শিষ্য বলেছেন। জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন বিরূপ কৃষ্ণাচার্য।

চর্যাকারদের পরিচিতি বিষয়ে আমরা গবেষক-বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তগুলোই সঙ্কলিত করে দিলাম। আমাদের কোন মতামত নেই। কারণ আমাদের নিজেদের কোন মৌলিক গবেষণা নেই। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের[১] মতে কেবল লুই, কুক্কুরী, গুণ্ডরী, ভুসুকু, কাহ্ন, সরহ, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধামের ভণিতাই অকৃত্রিম বলে গ্রহণ করা চলে। অন্য ২৩টি পদের ভণিতার পদকারেরা তাদের গুরুর নাম বসিয়েছেন বলেই তাঁর ধারণা। ডক্টর সুকুমার

১. The old Bengali Language and text, pp.10-11.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনও কোন কোন চর্যাকারের ভণিতা সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। গুরুর নামে ভণিতা দেওয়া ছাড়াও কোন কোনো চর্যাকার ছদ্মনামে ভণিতা দিয়েছেন বলে তাঁর বিশ্বাস।[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে মোটামুটিভাবে চর্যাগীতিগুলো আট শতকের মধ্যভাগ থেকে এগারো শতকের মধ্যে রচিত।

চর্যাগীতি রচয়িতাদের সবার বাড়ি বাঙলাদেশে ছিল না, সৌরাষ্ট্র-কর্ণাট-উড়িষ্যা মগধেও ছিল কারুর কারুর জন্মস্থান। কেউ কেউ বাঙলাদেশে এসেছিলেন, কিছুদিন বাসও করেছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে অন্তত ছয়জনের রচনা বাঙলা নয়—ক. আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, খ. কঙ্কণের ভাষা অপভ্রংশের চাপযুক্ত, গ. মহীধরের ভাষা মৈথিলী, ঘ. জয়নন্দীর ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনরূপ (এই ভাষা মৈথিলী, উড়িয়া, বাঙলা ও আসামীতে একরূপ)। ঙ. শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলী, চ. সরহের ভাষা বঙ্গ-কামরূপী, সরহের সময়ে প্রাচীন আসামী ও প্রাচীন বাঙলা একইরূপ ছিল। মোটামুটিভাবে চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল সাত থেকে এগারো শতক। তা হলে চর্যাগীতিগুলোও এ সময়কার রচনা। ভাষায় অবশ্যই কালিক প্রভাব পড়েছিল।

AMARBOI.COM

১. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং পৃঃ -২৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়
আদি কবি ও কাব্য [পনেরো শতক অবধি]

১

রাজকীয় প্রতিপোষণতত্ত্ব

যা আছে তা নয়, যা থাকা প্রত্যাশিত, যা শ্রেয় বা প্রেয়, যা প্রয়োজনীয়—তার স্বপ্ন দেখা, অন্যের মনে সে-স্বপ্ন জাগিয়ে দেয়াই শিল্পীর কাজ। এই তাৎপর্যে সাহিত্যাদি কলা একাধারে জীবনস্বপ্নের উৎস, আধার, ফল ও প্রতিচ্ছবি। সুতরাং শিল্পকলা মাত্রই জীবনের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসার রূপায়ণ, জীবনের প্রয়োজনেরই প্রতিরূপ। সে স্বপ্ন, জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজন অবশ্য বহু ও বিচিত্র। তাই সাহিত্য-শিল্পের অবলম্বন ও বক্তব্য সশ্রেষ।

প্রাণী মাত্রই জীবিকাসন্ধানী। এবং সে সন্ধানে অল্পবিস্তর শ্রম আছেই। প্রাণিজগতে মানুষই কেবল জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত কায়িক শক্তিকে মনন প্রয়োগে সুকৌশলে বৃদ্ধি করেছে, মানুষের এই বর্ধিত শক্তির নাম হাতিয়ার। তাই হাতিয়ার প্রয়োগের নিপুণতাতেই প্রাণিজগতে মানুষের অনন্যতা। জীবিকাসন্ধানী সহাতিয়ার মানুষই সব ভাব-কর্ম-আচরণের কর্তা, জীবিকানির্ভর জীবনে তাই সব চিন্তাচেতনার উৎস জীবিকাভাবনা ও জীবিকাঅর্জন পদ্ধতি। কলার উদ্ভবতত্ত্বেও পাই এ তথ্য। গান থেকেই সাহিত্যের বিকাশ, শ্রমসাধ্য যৌথ কর্মের অনুষঙ্গ হিসেবেই গানের উৎপত্তি। তেমনি যাদু ও সর্বপ্রাণতত্ত্বে আস্থাবান মানুষের বাঞ্ছাসিদ্ধির অবলম্বন হিসেবে উদ্ভূত নৃত্য ও চিত্রকলা। এ ভাবে প্রয়োজনের কর্মের সঙ্গে আনন্দের ও সৌন্দর্যের যোগসাধন করে মানুষ শ্রমকে করেছে সুবহ এবং কর্মে পেয়েছে উৎসাহ। নৃত্য গীতবাদ্য ও চিত্র বা মূর্তি আজো তাই অনেক জাতির উপাসনার বা ধর্মাচারের অঙ্গ। আদিতে art and ritual ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের। আজো আরণ্য মানবে এবং মূর্তিপূজকে তা সুলভ।

সভ্যতার তথা জীবকাপদ্ধতির উন্নয়নে শ্রমবিভাগে সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে নাচ গান-চিত্র প্রতিমা আজ আর সভ্য মানুষের যাদুযোগে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন নয়। যাদের উপাসনার ও জীবকাপদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, তারাও অভ্যাস ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি বশে নাচ-গান-বাজনা-চিত্র ও ভাস্কর্যে আকর্ষণ হারায় নি। ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ বলেই তাদের কাছে এ সব এখন নিতান্তই নান্দনিক বিলাস, একান্তই সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রূপচেতনার প্রসূন ও আনন্দের অবলম্বন। যা ছিল বৈষয়িক প্রয়োজনজাত,তা-ই এখন মানস চাহিদায় উন্নীত। তাই সম্পর্ক হয়েছে দূরান্বিত, সম্বন্ধসূত্র হয়েছে অদৃশ্য। কিন্তু এ ধারণাও পুরো সত্য নয়। কেননা, আদি রূপকথা থেকে আজকের সাহিত্যশিল্প অবধি সর্বত্রই দেখি ভাল-মন্দর দ্বন্দ্ব—সর্বত্রই ন্যায়নীতিবোধ জাগানোর মাধ্যমে সুন্দর জীবনের চেতনা দানের প্রয়াস লক্ষণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতার একটা বিশেষ স্তরে শ্রমজীবী ও অবসরভোগী ধনী সমাজের সৃষ্টি হল, তখন থেকেই নাচ-গান-বাজনা-চিত্র-মূর্তি-সাহিত্যাদি কলা ব্যবহারিক জীবননিরপেক্ষ খেয়ালী মনের রূপ ও রস বিলাস বলে বিবেচিত। এই স্তরেই সাহিত্যশিল্পাদি এবং চারু-কারু-দারু প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুকুমার বা ললিতকলার চর্চা শাহ-সামন্তের সুখ ও আনন্দের উপকরণ হিসেবেই রচিত ও অনুশীলিত হত। গরীব শিল্পীরা তাদের অনুগ্রহ ও প্রতিপোষণ নির্ভর হলেন। শাহ-সামন্ত-শসকরাই ছিল পোষক। তাই শিল্পীর তোয়াজ-স্তুতি-আনুগত্য ছিল তাদের প্রতি। মধ্যযুগ অবধি য়ুরোপেও তথা শিল্প বিপ্লবের পূর্বাবধি দুনিয়ার সর্বত্রই সব সুকুমার কলার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহী সমঝদার ও কৃতী-কর্মীর প্রতিপোষক ছিল শাহ-সামন্ত ও শাসকরা। তারপর সামন্ত সমাজের সমাধির উপর যখন পুঁজিবাদী-বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠল, তখনই শাহ-সামন্ত প্রতিপোষণ-অনপেক্ষ শিল্প সাহিত্য তথা ললিতকলা হল গণমুখী। আগে সামন্তগোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ছিল বলে রাজা-উজির-সদাগর নিয়েই রচিত হত রূপকথা-উপকথা-গান-গাথা-কাব্য। সামন্ত ছিল লক্ষ-কোটিতে একজন, বুর্জোয়া হল লক্ষ লক্ষ। তাই সাহিত্যে এবার এল ধনী মানী পদস্থ মানুষ। ক্রমশ বিদ্যা, বিত্ত ও বেসাত ক্ষেত্রে গণমানবও ঠাঁই পেল, তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ল। তাই এবার গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে আঁকিয়েরা গণমানবের জীবনকথার রূপায়ণে হল উৎসাহী। কেননা, এ যুগে শিল্পী সাহিত্যিকের খোরপোষ আসে গণমানবের পকেট থেকে।

আগে ললিত বা সুকুমার কলার চর্চা ছিল দরবারী বিলাসের ও শোভার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই বুঝে না বুঝে, শোভাবর্ধনের জন্যে ঐশ্বর্যের দর্প ও দাপট দেখানোর জন্যে দরবারে গাইয়ে-আঁকিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে পুষতেন শাহ-সামন্তরা। তা আর কয়জনের ভাগ্যে জুটত। দেশভরে অন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদর-অবহেলার মধ্যেও নিজেদের স্বল্প অবসর নিজেদের আন্তরিক ও স্পর্শপ্রবণ আবেগকে মুক্তি দেয়ার কাজে লাগিয়ে স্বস্তি ও আনন্দ পেত। সেকালে গণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—আজো নেই পৃথিবীর অনেক দেশেই—তাই শিল্পী-সাহিত্যিকের সংখ্যা ছিল নেহাত নগণ্য। তাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাবলে জনবন্দিত ও প্রখ্যাত হতেন, অন্যেরা বুনো ফুলের মতো অস্থানে বৃথা রূপ-রস-গন্ধ ছড়িয়ে বিস্মৃতির গর্ভে লোপ পেতেন।

আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকেই সম্রাট-সামন্ত সভায় কবি ও পণ্ডিত থাকতেন। রাজকীয় প্রতিপোষণে তাঁদের অনেকেই প্রতিভাবান না হয়েও প্রখ্যাত। বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের সভা আমরা কবি-পণ্ডিতে জমজমাট দেখি, পালদেরও সভাকবি-পণ্ডিতের সন্ধান মেলে।

তুর্কী আমলের শুরুতেই উমাপতি ধরকে রাজপ্রশস্তি রচনা করতে দেখি, 'শেখ শুভোদয়া'ও এক রকম নব বিজেতাদের পরোক্ষ তোয়াজ বলে ধরে নেয়া যায়। ইলিয়াসশাহী আমলের আগে বাঙলা ভাষায় লিখিত রচনা শুরু হয়নি বলে পনেরো শতকের আগে বাঙলা লিখিয়ে কোন সভা-কবির সন্ধান মেলে না। এ সময়ে দেশী সভা-পণ্ডিত বা দরবারে-সম্মানিত পণ্ডিতের নামও মেলে—যেমন, রূপসনাতন গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ, রায়মুকুট প্রভৃতি আটটি উপাধি প্রাপ্ত বৃহস্পতি মিশ্র, বারবক শাহর সভা-পণ্ডিত মুকুন্দ ও নরহরি বিশারদ (বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা) এবং সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর (ওর্ফে হোসেন শাহ্‌র) সভাপণ্ডিত এবং চৈতন্যপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রও 'রাজপণ্ডিত' ছিলেন বলে চৈতন্য চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্‌র (১৩৮৮-১৪০৯ খ্রীস্টাব্দে) আগে সভাকবি বা রাজপণ্ডিতের নাম হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিকের ঔদাসীন্যে কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা তখনো বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী শাসক দেশী কবি-পণ্ডিতের কদর দানের গরজ বোধ করেননি। যদিও হিন্দুর শাস্ত্রীয় ও বৈষয়িক আইনের আকর স্মৃতির বিধিনিষেধ জানিয়ে দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই পণ্ডিতের সাহায্য আবশ্যিক ছিল। এতে বাঙলায় লেখা তখনো যে রেওয়াজে পরিণত হয় নি—আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। তবে রাজপণ্ডিত প্রশাসনিক কারণে তুর্কী শাসনের গোড়া থেকেই নিশ্চয়ই দরবারে ঠাঁই পেয়েছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে যেমন আলিম-পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি প্রয়োজনেই। কিন্তু প্রশাসনিক চাকুরে বলেই পণ্ডিতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নি, অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে তাঁদের নাম কোথাও লিপিবদ্ধ থাকলে, তা গবেষণা সূত্রে ভবিষ্যতে মিলতেও পারে।

যা হোক আমরা কয়েকজন রাজপণ্ডিতের নাম যেমন নানা সূত্রে পাচ্ছি, তেমনি দেশী মায়ের সন্তান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্‌র আমল থেকে কবির নামও পাচ্ছি। কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সুলতানের 'আজ্ঞাক অধীন' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—এতে অনুমান করি তিনি নিতান্ত প্রজা ছিলেন না, হয় তো চাকুরেই ছিলেন। তারপর পাচ্ছি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬) প্রতিপোষণ প্রাপ্ত কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুকে, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্‌র (১৪৭৪-৮১) সময়ে জয়েনুদ্দীনকে, জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্ ওর্ফে হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৮১-৮৭) বিজয় গুপ্তকে, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) বিপ্রদাস পিপিলাই, যশোরাজ খান, কবি দামোদর (যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী।—রামগোপাল দাস-সুখময়) কবিচন্দ্র মিশ্র (গৌরীমঙ্গল প্রণেতা), শ্রীখণ্ডের কবিশেখর বিদ্যাপতিকে—নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহর আমলেও (১৫১৯-৩১) এঁরা জীবিত থেকে 'নাসিরা শাহের' নামোল্লেখ করেছেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌র (১৫৩১-৩২) প্রতিপোষণ পান শ্রীধর কবিরাজ ও পদকার সৈয়দ আফজল। চট্টগ্রামের প্রশাসক লস্কর পরাগল ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁর প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী। আকবরের আমলে মাধবাচার্য, শাহজাহানের আমলে গদাধরদাস (১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে, জগন্নাথমাহাত্ম্য) আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৫-১৭০৭) কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬) প্রমুখ অনেকেই রাজভক্ত ছিলেন বা প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। এমনি করে দৌলত উজির বাহরাম খান, দৌলত কাজি, আলাউল, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, মুহম্মদ মুকিম অবধি অনেকেই সুলতান-সামন্ত-শাসক-জমিদারের নাম করেছেন। এঁরা যে সবাই প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন তা নয়, গায়েনের দিক্ বন্দনার মতো সমকালের সুলতান-সম্রাটের নাম করাও কারো কারো কাছে একটা সৌজন্যমূলক রীতিমাত্র ছিল। যেমন, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবি চন্দ্রমিশ্র, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণরাম দাস, দৌলত কাজী, আলাউল, ফকির গরীবুল্লাহ স্বাধীনভাবে কাব্যচর্চা করেছেন, আর মুকুন্দরাম ছিলেন জমিদারের অনুগৃহীত, দৌলত কাজী-আলাউল-মর্দন পেয়েছিলেন রোসাঙ্গের বাঙালি মন্ত্রীর প্রতিপোষণ, বর্মীভাষী আরাকান রাজের নয়।

বিদেশী-বিভাষী সুলতান বাঙলা ভাষা কিংবা সাহিত্যপ্রীতি বশে কবির প্রতিপোষণ করেছিলেন বলে ভাববার কারণ নেই। কিন্তু তুর্কীশাসন পরোক্ষে বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চার সহায়ক হয়েছিল। কর্ণাট-দেশীয় (দ্রাবিড়) সেন রাজারা উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন, পালরাজত্ব ও বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্মৃতি-শাসিত পুরো হিন্দু করার জন্যে তাঁরা নতুন করে প্রজাদের বর্ণে বিন্যস্ত করেন, উত্তর ভারত থেকে ব্রাহ্মণ এনে ব্রাহ্মণ্য পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠান অত্যুৎসাহে চালু করেন। ফলে কায়স্থ-বৈদ্য ব্যতীত সংখ্যাগুরু শূদ্রাদি প্রজার লেখাপড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকারও হরণ করেন, সে-সঙ্গে প্রাকৃত-অবহট্‌ঠকেও পরিহার করে শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতকেই বিদ্যাচর্চা ও শাসনের বাহন করেন। অনুমান করা সম্ভব বৌদ্ধজ হিন্দুদের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান নিঃশেষে বিলোপ করার জন্যে রাজশক্তির সচেতন প্রয়াস ছিল, তাই বোধ হয় অহিন্দু অর্থাৎ গীতাস্মৃতি বহির্ভূত কোন লৌকিক দেবতার—যাঁরা বৌদ্ধযুগেও তারা-মনসা-যক্ষ-চণ্ডী-ধর্মঠাকুর-ওলা-শীতলা-বাসুলী রূপে পূজিতা হতেন,—প্রকাশ্যে পূজা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধপীড়নও ছিল, পরবর্তীকালে রচিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় তা সুপ্রকট। উড়িয়া-বাঙালি-মৈথিলী তান্ত্রিক মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী বৌদ্ধগ্রন্থের বাঙলাদেশে বিলুপ্তি এবং নেপালে-তিব্বতে তাঁদের সুলভতা থেকেও বোঝা যায় তুর্কীবিজয়ের ফলে নির্জিত গণমানব এ ক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল বইকি! ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী-সমাজ ও সরকারের রোষদৃষ্টি ও শাসনমুক্ত হয়ে এখন থেকে তারা তাদের চিরলালিত প্রাচীন দেশী ও বৌদ্ধসংস্কার এবং লোকায়ত বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীনভাবে দেবতার পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠান করবার, মনের কথা মুখের বুলিতে প্রকাশ করবার, নিজেদের রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলবার—বিদেশী-বিধর্মী রাজার ঔদাসীন্যের সুযোগে—পূর্ণ অধিকার ফিরে পেল, এমনকি সেন আমলে সমাজপতি-শাস্ত্রকারেরাও রাজশক্তির সমর্থন হারিয়ে এখন অসহায় অবস্থায় শূদ্রাদি নির্জিত কিন্তু সংখ্যাগুরু দলের মন যুগিয়ে তাদের সব অশাস্ত্রীয় কাজের সহযোগী হল। ধর্মঠাকুরের ব্রাহ্মণপূজারী, মাহাত্ম্য কথার ব্রাহ্মণ কবি, আদিনাথ চন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে শিবরূপে গ্রহণ, চণ্ডী-মনসা-শীতলা প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ্য দেবতা রূপে বরণ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাধকের নাথ-শৈব-বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলরূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি অনেক কিছুই এর প্রমাণ। চৈতন্যের আবির্ভাব পূর্ব-কালেও বাঙালীর শাস্ত্রে বিগর্হিত অহিন্দু-আচরণের ও অনুষ্ঠানের বর্ণনায় তা-ই বৃন্দাবন দাস সক্ষোভে বলেন :

ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধন।
বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
এই সকল শুনিতে লোক আনন্দিত।
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। (চৈঃ ভাঃ)

বিদেশী-বিধর্মী শাসন প্রবর্তিত না হলে ভারতের কোথাও ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজবিপ্লব তথা নির্জিত গণমানবের শাস্ত্র-সমাজের শাসন-পীড়ন-মুক্তির আন্দোলন সম্ভব হত না। নির্বিঘ্নে যে রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদু-একলব্য-চৈতন্য দেবদ্বিজ বেদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন তা এ বিদেশী-বিধর্মী শাসকের হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ঔদাসীন্যেরই ফল। নতুন ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে একটা ভাববিপ্লব ঘটেই। তা কোথাও মৃদু কোথাওবা প্রচণ্ড হয় মাত্র। কাজেই তুর্কী বিজয় কেবল সদ্ধর্মীদেরই মুক্তির আশ্বাস ছিল না, নির্জিত বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এই তাৎপর্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, 'পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল... এই দুই শতাব্দীতে (১৫-১৬ শতক) বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস)। এবং দীনেশচন্দ্র সেনের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।' তাঁর একথা যথার্থ। এভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কৃত্রিম প্রয়াস সেন রাজত্বের অবসানের সাথে সাথেই ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্বত্র লোকায়ত ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি প্রীতি ও চর্চা প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠল। তারই ফল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র। তুর্কীরা ছিল বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী। শাসকগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। দেশী মানুষের সহযোগিতায় রাজ্যশাসন করতে হয়—এই বুদ্ধি সব শাসকেরই থাকে। তাই তুর্কীরা গোড়া থেকেই দেশী পাইক (পদাতিক) ও দেশী রাজস্ব-কর্মচারী রাখত। সে রেওয়াজ মীরজাফরের আমলের দেওয়ান রায়-রায়ান মহারাজ নন্দকুমার অবধি চালু ছিল। আবার ঐ সহযোগিতার জন্যে সম্প্রীতির প্রয়োজন, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূত্রেই সেই প্রীতির উদ্ভব হয়। পরস্পরের ধর্মমত, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ বিধি, ও রীতি-নীতি-রুচি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও গুরুত্বচেতনা না থাকলে অজ্ঞাত-অসতর্কতা প্রসূত উক্তিতে ও আচরণে আঘাত হানা হয়—সদ্ভাব নষ্ট হয়। বামুনের উপবীত ও টিকি নিয়ে কৌতুকবশে তুর্কী-সোয়ারদের মস্করা হিন্দুমনে কি প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগিয়েছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে কীর্তিলতায় ও চৈতন্যচরিত প্রভৃতিতে। এ কারণেই হিন্দুকে জানবার-বুঝবার জন্যে হিন্দুর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনার প্রতীক দুই অবতার কাহিনী—রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করান গৌড়সুলতান ও তাঁর প্রশাসকরা। লক্ষণীয় যে, গোড়ার দিকে রীতিবিরুদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলে কোন হিন্দুই অনুবাদ কার্যে এগিয়ে আসেনি, প্রায় আড়াইশ বছর পরে চাকুরে কায়স্থ মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে পাওয়া গেল। একজন দুঃসাহসী ব্রাহ্মণও জুটলেন, তিনি কৃত্তিবাস। অতএব, ইংরেজরা যে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৭৭০-এর পর থেকে হিন্দু ও মুসলিম আইনের অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধিকৃত অঞ্চলের ভাষাগুলো শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল, অবিকল সে প্রয়োজন তুর্কী-শাসকদেরও ছিল। পণ্ডিতেরা হয়তো মৌখিক পাঁতিই দিতেন—পাপ ভয়ে বাঙলায় লিপিবদ্ধ করতেন না।

এ সূত্রে আর একটি তথ্যও উল্লেখ্য, সব শাসক-সাম্রাজ্যলিপ্সুর মতো তুর্কী-মুঘলেরাও শাসন-শোষণেই উৎসাহী ও নিষ্ঠ ছিল, স্বধর্ম প্রচারের কোন চেষ্টাই রাজশক্তি করেনি, যদিও মনে মনে নিশ্চয়ই স্বধর্মের প্রসার ও স্বধর্মীর বৃদ্ধি কামনা করত স্বধর্মীর সমর্থন ও সহযোগিতার আশায়। ইংরেজরাও ঔপনিবেশিক স্বার্থেই গুরুত্ব দিয়েছিল, তাই প্রজার অসন্তোষ ভয়ে মিশনারীদের প্রকাশ্য প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সূফী-দরবেশ-আলিমের ব্যক্তিত্ব ও সদাচারের প্রভাবে। সরকার অর্থবিত্ত দিয়ে তাঁদের পরোক্ষে সাহায্য করেছে বটে, তবে প্রকাশ্যে ফরমান যোগে কোথাও প্রচারে সহায়তার আশ্বাস দেয়নি। রাজনীতিতে স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়া অন্য বিবেচনা ঠাঁই পায় না।

বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচারে ও তার প্রসারে যাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা হচ্ছেন গৌড়ের জালালউদ্দীন তাবরেজী, চট্টগ্রাম বর্ধমান কালনার বদরউদ্দীন বদর-ই আলম, বিক্রমপুরের বাবা আদম বদর, আলম মাহিদী, মদনপুরের শাহ সুলতান রুমী, সোনারগাঁয়ের শেখ শরাফুদ্দীন তাওয়ামাহ, পাবনার শা দৌলা, সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গলকোটের শাহ মাহমুদ ওর্ফে শাহ রাহী, বগুড়ার সুলতান মাহী আসোয়ার, গৌড়ের আলাউল হক, তাঁর পুত্র নুরকুতবে আলম। এঁরা ছাড়াও পীর সফীউদ্দীন, জাফর খাঁ গাজী, জাহান খাঁ গাজী, আনোয়ার কুলি হালবী, ইসমাইল গাজী, রাজশাহীর মখদুম শাহ দোলা, ঢাকার শাহ আলী বাগদাদী প্রমুখ অনেক চাকুরে-পীর-দরবেশ রয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যসমাজে হৃত-অধিকার বৌদ্ধজ নিম্নবর্ণের ও বিত্তের নির্জিত জনগণই রাজশক্তির রক্ষণ-পোষণ প্রত্যাশায় ও মানবিক সাম্যের সমাজে স্বস্তিলোভে ইসলামের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয় বলেই বিদ্বানদের অনুমান।

অতএব, তুর্কী বিজয়ের ফলেই জনগণ মাতৃভাষায় তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের, তাদের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যন্ত্রণার, সমস্যা-সম্পদের ও প্রাণের কথার অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে দিতে পারল। এর আগে বাঙলায় লেখ্য রচনা চালু ছিল না বলে তাদের গান, গাথা, ধামালী, পাঁচালী, রূপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, দেবকথা গায়েনের মুখে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসবে-পার্বণে-মেলায়-বৈঠকে মৌখিক রচনা হিসেবে কথকতায় চালু করেছিল, —লিখিত পাঁচালীর শুরু সম্ভবত পনেরো শতক থেকেই। চৌদ্দ শতকে কিছু লিখিত হলেও তা হাতে আসেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক দেখে মনে হয়, ওটিরও জড় ও কাঠামো ছিল কথকতায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপকরণ ও বক্তব্য দশ শতকেরও আগেকার। এগুলো ঘরে সংসারে মুখে মুখে চালু ছিল। ষোল শতক থেকে কিছু কিছু লিখিতরূপ পায়, আবার ময়নামতী-মানিকচাঁদ গাথা অলিখিত থেকে যায় আঠারো শতক অবধি। অবৌদ্ধদের অবহেলায় 'পালগীতি' লোপ পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাঙলা রচনার শুরু লোকায়ত ধর্মকথা দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাথ সাহিত্য, দেবমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি তার প্রমাণ।

AMARBOI.COM

২

অনন্ত বড়ু, চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস সমস্যা

১৯১৬ সনে প্রকাশিত হবার পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে আখ্যাত ও সুপরিচিত কাব্যটি বাঙলা সাহিত্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে সমাদর ও গুরুত্ব লাভ করেছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের এটি পুরো বা আংশিক অবশ্য পাঠ্য। পণ্ডিত গবেষক বা সমালোচকেরা ছাড়াও পঠন-পাঠন সূত্রে অধ্যাপকরাও এ গ্রন্থ বিষয়ে নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে সমস্যায় পড়েন।

গোড়ার দিকে আলোচকদের নজর ছিল ভাষার দিকে আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাল ও পরিচয় নিরূপণের দিকে। বিতর্ক মোটামুটি এ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। তারপর ক্রমে তা সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। এখন গ্রন্থনাম, কবি, লিপিকাল, রচনাকাল ও রচনার স্থান, রচিত বিষয়, রচনার অকৃত্রিমতা, আঙ্গিক প্রভৃতি কোনটাই প্রশ্নাতীত নয়, কোন বিষয়েই বিদ্বানরা আর একমত নন। গত ষাট বছর ধরে বহু বিদ্বান নানা দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সবগুলোর উল্লেখ ও আলোচনা পাঁচশ পৃষ্ঠার বইয়েও ধরবে না। তাই আমরা সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও আবিষ্কারগুলোকেই এখানে আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব।

১৯০৯ সনে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বিষ্ণুপুরের এক গাঁয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরে অযত্নে রক্ষিত এ পুথি উদ্ধার করেন। পুথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। গোড়ার দুটো পাতা এবং শেষ পাতাটি নেই। অবশ্য মধ্যে মধ্যেও কিছু পাতা নেই। শেষ পাতার পরেও অলিখিত কিছু পত্র ছিল। প্রথম দুই পাতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবস্তুতি, কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থনাম প্রত্যাশিত ছিল এবং শেষ পত্রে সাধারণত রচনার পুষ্পিকা তথা সমাপ্তি কাল ও লিপিকাল থাকে। বিদ্বানদের বোধবুদ্ধির ও জ্ঞান অনুশীলনের সুবিধে হবে বলেই যেন ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় পত্র লোপ পেয়েছে।

গ্রন্থনাম-প্রসঙ্গ

আবিষ্কারক-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ গ্রন্থের বিষয়ানুগ নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ নাম এতকাল মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দ্রোহ দেখা দিয়েছে।

রূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে কীর্তনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ—নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনং। নাম রূপ ও গুণাদি সরবে উচ্চারণ করাই কীর্তন। ব্যক্তির সঙ্গে নাম, গুণ ও লীলা কীর্তনই বৈষ্ণবচর্যা। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের উদ্দেশ্য সভক্তি কীর্তন নয়। বড়ু চণ্ডীদাস যেভাবে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তাতে মনে হয় কৃষ্ণকে লোকচক্ষে হেয় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি শাক্ত ছিলেন, যুগপ্রভাবে হয়তো বৈষ্ণব বিদ্বেষীও। কৃষ্ণের প্রতি সীমাহীন অশ্রদ্ধা নিয়ে যে এ গ্রন্থ রচিত তা গ্রন্থের সর্বত্র প্রকট। তাই ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন—"কীর্তন শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কীর্তি, খ্যাতি বা যশবিষয়ক স্তুতিজ্ঞান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের চরিত্র যতদূর সম্ভব, মসীলিপ্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধই নাই; সে শুধু আত্মতৃপ্তি চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারী মোকর্দমার আসামীর মত সে মায়ের বকুনি খাইয়া নায়িকার নামে দুরপনেয় কুৎসা ঘোষণা করে, তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই, সে বহুবার নায়িকাকে উপভোগ করিয়াও শুধু তাহার দোষত্রুটিই শেষপর্যন্ত মনে রাখে এবং সেই জন্যে তাহাকে পরিত্যাগ করে।... বসন্তরঞ্জন বাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।" তাঁর গণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারো বার ধামালীর উল্লেখও রয়েছে— [প্রথম সংস্করণে পৃঃ ৩৫, ৫১, ৫২, ৮৯, ৯৬, ১০৮, ১১১, ১২৯, ১৫২, ২৮৩ ও ৩৫৭।] এই ধামালী নিছক রঙ্গ পরিহাস নয়—সঙ্গমকামনা, নষ্টামী,নাগরালী।[১]'

কবি কালিদাস রায়ও বলেন, "বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ [গালি], বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে [শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে] রসাভাস ঘটিয়াছে"।[২] গোপাল হালদারও বলেছেন—"কিন্তু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়।.... একটু স্থূল হলেও তারা [রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই] রক্তমাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা-পরামাত্মার রূপক নয়।"[৩] কাজেই বর্তমান নামে আপত্তি অসঙ্গত নয়। বিমানবিহারী মজুমদার এ গ্রন্থের নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি পাওয়া গিয়েছিল শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। পুথির সঙ্গে একটি টুকরো কাগজে একটি রসিদ ছিল। তাতে লেখা ছিল :

---

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৩৩-৩৫।
২. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড ১ম সং, পৃঃ ১১২।
৩. বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড, বাঙলাদেশ সং), পৃঃ ৫২-৫৩।
৪. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৩৪/ ২৮২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীনারায়ণায় নমঃ (?) শ্রীশ্রীআচার্য প্রভু। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানব্বই পত্র হইতে এক শত দশ পত্র পর্যন্ত-একুনে ১৬ ষোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজা-হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন- সন ১০৮৯ (?) তাং আশ্বী (?) ন সন ১০৮৯ (?) তাং অগ্রহায়নে শুংকৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণ সন্দর্ব। ১৬ পত্র দাখিল হইল।"

[ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পাঠ]

এটি মল্লাব্দ হলে ১০৮৯+৬৯৫=১৭৮৪ খ্রীঃ।

আর বঙ্গাব্দ হলে ১০৮৯+৫৯৩=১৬৮২ খ্রীঃ।

পড়বার জন্যে, পাঠ মেলাবার জন্যে কিংবা প্রতিলিপি তৈরির জন্যে রাজগ্রন্থাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামের পুথি নেয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে।

এ রসিদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি সম্পর্কিত নয়। এ বিষয়ে ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীনিবাস আচার্য, ইন বিষ্ণুপুর রাজ হাম্বীর ও তাঁর পুত্র ধাড়ি হাম্বীরের গুরু ছিলেন। আচার্য শ্রীনিবাস বৈষ্ণবীয় বিধিমার্গের প্রচারক এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারক। রসিদোক্ত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ জীব গোস্বামী রচিত ষড়সন্দর্ভের অন্যতম।[১] কাজেই রসিদসূত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলে যে অনুমান করেছিলেন[২] তা যথার্থ হয়নি।

তবে বিষয়ানুসারে যদি কাব্যের নতুন নাম রাখতেই হয়, তা হলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র চেয়ে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'[৩] বা 'রাধা-কৃষ্ণের ধামালী' নামই হবে বাঞ্ছনীয়। কেবল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নন, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ গ্রন্থকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামে আখ্যাত করতে আগ্রহী।[৪]

AMARBOI.COM

কবির নাম

কবির নাম নিয়েও নানা বিতর্ক চলেছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৪০৩টি ভণিতা মেলে। এর মধ্যে ২৮৯টিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস', ১০৭টিতে শুধু 'চণ্ডীদাস' এবং সাতটিতে 'অনন্ত' বা 'আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' রয়েছে। বড়ু ও বাসুলীর কোনটাই নেই তেমন ভণিতা রয়েছে পাঁচটি মাত্র। ১ম সংস্করণের 'তুতি কৈল চণ্ডীদাস গাএ' (পৃ. ২৩৬), 'তোলহ রাধাকে বড়িয়ে গাইল চণ্ডীদাসে (৩৮৭) 'জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে (৮৬, 'তথাঁ কাহ্নাঞি (বসে) গাইল চণ্ডীদাসে (৩০৭), 'আনি দেহ এসে কাহ্নাঞি গাইল চণ্ডীদাসে' (৩৭৪)। ছন্দের প্রয়োজনেই বড়ু বা বাসলী যোগ করা যায়নি। যেমন—ছন্দের প্রয়োজনেই কবি স্বনাম 'অনন্ত' বসিয়েছেন অন্য সাতটি ভণিতায়।[৫] ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এসব পদের প্রাসঙ্গিকতা ও পূর্ববর্তী

---

১. (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ১৩৬-৩৯।
(খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩সং, পূর্বার্ধ পৃঃ ৪৩২-৩৩।

২. (ক) বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ), পৃঃ ৪০।
(খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬০সন, পৃঃ ৩৩।

৩. আমরা আগেই এ নাম অন্যত্র স্বীকার করেছি, বিচিত্র চিন্তা, বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র।

৪. (ক) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; ডক্টর অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।
(খ) বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড ৩য় সং), ২৮৭ পৃ. ১২৬।

৫. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ২৩৫-৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিও ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই সুকুমার সেন প্রমুখের মতো এ পদগুলোকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার কারণ নেই।

৭টি অনন্ত ও আনন্ত ভণিতা এরূপ :

১. আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ (পৃ. ৫৬)
২. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (পৃ. ৬১)
৩. গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (পৃ. ৬২)
৪. অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল (পৃ. ২১৩)
৫. আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে। (পৃ. ৩২৪)
৬. গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে। (পৃ. ৩৪১)
৭. অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে। (পৃ. ৩৪১)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে "কবির প্রকৃত নাম 'অনন্ত'। তাঁহার কৌলিক উপাধি বড়ু। চণ্ডীদাস তাঁহার দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুদত্ত নাম। তাঁহার কি জাতি ছিল—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।"[১] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সম্পাদকও বলেন পশ্চিম রাঢ়ে গোয়ালা, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়ু পদবী প্রচলিত। সুকুমার সেনেরও এই মত।[২] তিনি এমনও অনুমান করেন যে নীচ জাতির নারীর সঙ্গে প্রেম করে সমাজে পতিত হয়ে কবি বটু বা বড়ু হয়েছেন।[৩] তাঁর সর্বশেষ মত—'বটু' 'দেউলে'র সেবাপূজার কোনো ভারপ্রাপ্ত সেবক।[৪]

চণ্ডীদাস সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থই কেবল সংস্কৃত জানত। চণ্ডীদাস বাসলীর 'গণ' বা সেবক। কাজেই ব্রাহ্মণ হওয়ারই কথা। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন 'কায়স্থ মনে করাই অধিকতর সঙ্গত। কেননা তাঁহকার কোন স্থানে নিজেকে দ্বিজ বলেন নাই।[৫] অবশ্য শ্লোকগুলো পরবর্তী কোন পণ্ডিত পাঠকের সংযোজনও হতে পারে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও বলেন, "কবির প্রকৃত নাম অনন্ত–'চণ্ডীদাস' তাঁর উপাধি মাত্র।"[৬] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে "বাসুলীর গণ (সমূহ, পরিচয় সমূহ) ছিল কবি সে গণের এক বড়ু ছিলেন।[৭] ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, "সংস্কৃত বটু হইতে বড়ু শব্দের উৎপত্তি ... ভাগবতে (১২/৩/৩৩) আছে যে কলিতে 'অব্রতাবটবোহ শৌচাঃ' অর্থাৎ বটুরা, ব্রহ্মচারীরা ব্রতবিহীন ও শৌচবিহীন হইবেন।"[৮] অতএব 'বটু' মানে ব্রহ্মচারী।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন কবি 'বড়ু শ্রোত্রীয়' ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে নিজেকে বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন।[৯] আমরা বাসলী মন্দিরের 'সেবক' অর্থেই পদ-পরিচায়ক 'বড়ু' ব্যবহৃত বলে ধরে নিলাম।

---

১. বাংলা সাহিত্যের কথা (১৩৭৪ সন সং), পৃ. ২৬, ৪৭।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ৩য় সং), পৃ. ১৩৪।
৩. ঐ, পৃ. ১৩৬।
৪. প্রবন্ধ বিচিত্রা (৪র্থ সং)।
৫. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ. ২৭।
৬. বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃ. ৫৬
৭. পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪২ খণ্ড ১ম সংখ্যা পৃ. ২৫।
৮. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ২৬৩।
৯. বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও সময়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫৬ উদ্ধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসলী

কবির ভণিতায় 'বাসলী বন্দী', 'বাসলীগণ', 'বাসলী গতি', 'বাসলী আয়ী', 'বাসলী বরে', 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ' প্রভৃতির মাধ্যমে বাসলী ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বাসলী, বাশলী, বাশুলী কে? সম্প্রতি সবাই বাশলী বা বাশুলী চণ্ডীর অপর নাম বলেই মেনে নিয়েছেন। কেননা—পদ্মলোচনের বাসলী-মাহাত্ম্যে, কিংবা বাসলীমঙ্গলে চণ্ডীমাহাত্ম্যই বর্ণিত। এমনকি ছাতনার বাসুলী মূর্তিও দ্বিভুজা চণ্ডীই। ধর্মপূজা বিধানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রাপ্ত বাশুলীর ধ্যানমন্ত্রটিও মূলত চণ্ডীর। তবে তন্ত্রযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তারা ব্রজেশ্বরী, বিশালাক্ষী বৎসলা বা বাসলী যে বৌদ্ধজ দেবতা ব্রাহ্মণ্য সমাজে চণ্ডীনামের আবরণে আত্মরক্ষা করেননি তা নিশ্চিত রূপে বলা যাবে না। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তই নেপালে বৎসলা দেবীর সন্ধান পেয়েছিলেন। বজ্রেশ্বরী কিংবা বৎসলা ঐতিহ্য-বিস্মৃতির ও উচ্চারণবিকৃতির ফলে বাসলী এবং পরে বাশুলী হতে বাধা নেই। আর বিশালাক্ষীই যে বাসলী তা তো স্বীকৃত।[১] আঠারো শতক থেকেই 'বিশালাক্ষী' সম্ভবত 'বিষাল আঁখি-র সংস্কৃত রূপে বৌদ্ধ যুগের তারা-মনসাই হয়তো চণ্ডী বা সরস্বতীর আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করেছেন। ধর্মপূজারীদের মতে বাসলী কখনো চামুণ্ডা, কখনো মনসা সহচরী, কখনো বা যোগিনী।[২] সুতরাং চণ্ডীদাস সেবিত বাসলী যে তখন চণ্ডীরূপিণী তাতে সংশয় নেই, তাই ভণিতায় মূর্তির ডাকনাম বাসলী হলেও, মূলত চণ্ডীদেবী বলেই তিনি চণ্ডীদাস। বিশেষত বড়াই রাধাকে চণ্ডীপূজার কথা বলেওছে, অবশ্য যোগের ও যৌগিক ধ্যানের কথাও আছে, হরগৌরীও আছেন। নিদ্রালি মন্ত্রেরও প্রয়োগ আছে। যেমন-'বড় যত্ন করিআ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ/তবেঁ তার পাইবে দরশনে (পৃ. ৩৪১)। রাধার বচন শুনি মহামুনি/বাসলী বন্দিলা যোগ ধ্যান/(পৃ.৩৭৬) বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে। (পৃ. ৩১৪) নিন্দাউলী মন্ত্রে তোক নিন্দাইব আহ্মি (পৃ. ৩১০) যোগিনী রূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ (পৃ. ৩১৮)। এতে মনে হয় চণ্ডীদাস যোগতন্ত্রে আস্থাবান শাক্তই ছিলেন। তবে ভক্ত বৎসলা দেবী হিসেবেই বৌদ্ধ বৎসলা দেবী চণ্ডীদেবীতে পরিণত হয়েছেন—এ সন্দেহ নেপালী সূত্রে নয় শুধু, চণ্ডীদাসের তান্ত্রিক সহজ সাধনার তত্ত্বজ্ঞান থেকেও দৃঢ় হয়।

কাহিনী মূল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীমূল যে লোকায়ত ও লৌকিক তাতে সন্দেহ নেই। তাই অপৌরাণিক উৎস প্রথমেই দেখতে পাই। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে' নারায়ণের এক গাছি চুল থেকে কংসাসুরের বিনাশের জন্যে কৃষ্ণ অংশ অবতার রূপে নরজন্ম গ্রহণ করেন। বলরামের উদ্ভব সাদা চুল থেকে। এখানে কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্যে রাধা লক্ষ্মীর অবতার। পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা। কাহ্নাঞির সম্ভোগের কারণে/লক্ষ্মীকে বুলিলোঁ দেবগণে/আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতারে/তে কারণে পদুমা উদরে উপজিলা সাগরের ঘরে (পৃ. ৬)। রাধা কৃষ্ণের মামী-ভাগনে সম্পর্কও লৌকিক সূত্রে পাওয়া। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আইহণ যশোদার সহোদর বলে উল্লিখিত।

রাধা কৃষ্ণলীলায়ও কবি হর-গৌরী, যোগ, ধ্যান ও তান্ত্রিক সহজসিদ্ধির মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসাহী। এখানে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী/অহোনিশি যোগ ধেআই/মন পবন গগনে বহাই/

১. পুথি পরিচয়, পঞ্চানন মণ্ডল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

২. পুথি পরিচয়, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা পাদটীকা পৃ. ১৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল কমলে কয়িলে মধু পান/এবে পাইএগ্রা আহ্ম ব্রহ্ম জ্ঞান/ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সন্ধি/মন পবন ভাও কৈল বন্দী/দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট/এঁবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।—কাজেই কাহিনীমূল ও কাহিনী নিতান্ত কাব্যবস্তু হিসেবেই পাচ্ছি; বৈষ্ণবভক্তি-প্রসূত লীলা স্মরণ নয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছেন যে, বাঁকুড়া জেলার কাঁঠালিপাড়া গাঁয়ে এখনো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ঢঙে 'কৃষ্ণ যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয় এবং তার প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।[১]

কবি পরিচিতি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অতি মূল্যবান কয়েকটি অনন্যতা আবিষ্কার করেছেন :[২]

১. ক. বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় কোনও স্থানে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস নেই।

খ. সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও ভণে, 'কহে' (বাসলী আদেশে ভণে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নেই।

গ. ভণিতা কখনো উপান্ত চরণে হয় না।

২. রাধার পিতা-মাতার নাম সাগর ও পদুমা।

৩. রাধার কোন শাশুড়ী, ননদ বা সখীর নাম নেই।

৪. বড়ায়ি ভিন্ন কোন সখীকে সম্বোধনও করেন নি।

৫. এখানে 'চন্দ্রাবলী' রাধার নামান্তর, প্রতিনায়িকা নন।

৬. বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা নেহা' ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চার স্থলে 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ।

৭. 'বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতি রাধিকার বিশেষণ বিনোদিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই।'

৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নন'।

৯. 'বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত।'

১০. 'বড়ু চণ্ডীদাসে সখীকে সম্বোধন করে কোন পদ রচিত নাই।' [এ সঙ্গে দান, নৌকা ও যমুনা খণ্ডে ১৯ বার রাধাকৃষ্ণের মামী-ভাগনে সম্পর্কের দোহাইও উল্লেখ্য]

১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাইরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নেই। বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসেবে পদাবলী রচনা করেন নি।[৩]

১২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার ব্যাকরণে এমন কতকগুলি প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যাহা মধ্যযুগের কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবচন ও বহু বচনের দুই পৃথক রূপ, যেমন একবচনে মোএঁ (মোঞঁ মোঞেঁ), চলোঁ, চলিলোঁ, চলিবেঁ, চলিতোঁ। বহুবচনে আহ্মে (আহ্মি), চলি (চলিএ), চলিল, চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'ইউ' প্রত্যয়, যথা করিউ। স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার অকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয়,

---

১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়,পৃ ৮৯

২. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ)

৩. ক. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ ও ১৩৬০ সন।
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ : পৃ. ৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন রাহী, গেলী, বাড়ায়ি চলিলী। ইহাতে দের, দিগকে, দিগের এবং করণ কারকে 'তো' বিভক্তির প্রয়োগ নাই।'

১৩. 'বাঙলী আদেশে কহে' এরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাস ব্যবহার করেন নাই।'[১]

১৪. 'বৃষভানু সুতা' ব্যবহারও বড়ুর নয়।

এ ভাষার সঙ্গে উড়িয়ার কিছু [২] এবং আসামী ভাষার সাদৃশ্য[৩] আছে। ডক্টর সুকুমার সেন সম্প্রতি এ ভাষা বাঁকুড়া-ধলভূম-মানভূমের বুলির প্রভাবজ বলে এবং বাঙলা প্রত্যয় যোগে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার দেখে এ ভাষার প্রাচীনত্বে গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁর মতে :

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দ আছে.... এমন দুইটি শব্দ আছে (মজুরী ও মজুরিয়া) যাহা ফারসি শব্দে বাঙলা প্রত্যয় যোগে গঠিত।

২. 'এই গ্রন্থের অনেক পদের শেষ অক্ষরে অল্পপ্রাণ ও 'ই'-কার মিলিয়া মহাপ্রাণে পরিণত হইয়াছে। যেমন লইবেহে.> লইভেঁ, তোহ্মাকোহো> তোহ্মাখো। এই ব্যবহার (?) আধুনিক কালে বাঁকুড়া-মালভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষায় লক্ষণীয়, উড়িয়া ভাষাতেও আছে।'

৩. 'মহাপ্রাণ নাসিক্যের ব্যবহার সর্বত্র প্রাচীন প্রয়োগ অনুযায়ী নয়... অস্থানে নাসিক্য স্বরধ্বনির অযথা প্রাচুর্য প্রাচীনত্বের চিহ্ন মোটেও নয়। বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূমের ভাষার ইহা একটি প্রধান গুণ।'

৪. 'রহিলছে' ('ফুটিলছে'ও) প্রাচীনতার দ্যোতক, তবে এর মতো "মানভূম অঞ্চলের উপভাষায় 'রলছে, গেলছে, হলছে রীতিমত পাওয়া যায়।"[৪]

৫. এই ভাষায় "সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে স্বরসঙ্গতিময় এখুনি, চুরিনী ইত্যাদি।"[৪]

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারেরও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' প্রাচীনতা সম্বন্ধে তিনটি আপত্তি : ক. যমুনার পরিবর্তে ভাগীরথীর উল্লেখ, 'আছে' ক্রিয়া পদের ব্যবহার এবং খ. বিরহ খণ্ডের 'ভাবগত অসংলগ্নতা, আর গ. 'বিরহ' অংশ বিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধ বয়সে রচিত[৫] বলেই তাঁর ধারণা। অন্যেরাও কৃষ্ণের 'শ্রীনিবাস' নামের বহু ব্যবহার, বিষ্ণুলোককে বিষ্ণুপুর বলা, নন্দ বা যশোদানন্দনকে রঘুনন্দন বলার মধ্যে চৈতনোত্তর যুগের প্রভাব ও নিদর্শন দেখেন।

ডক্টর সুকুমার সেন সম্প্রতি যা বলেছেন, আপাতত তাতে যুক্তি আছে মনে হলেও বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষার 'পাঁচশ' বছর আগের লিখিত রূপের সঙ্গে যদি বুলির ঐক্য থেকেই থাকে তা হলে বুলিতেই প্রাচীন রহিলছে> রলছে, গয়িলছে> গেলছে, হইলছে> হলছে হয়েছে বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত। তেরো শতকে তুর্কীর দখলে এল যে-দেশ, সে দেশে শাসকের দরবারী, প্রশাসনিক কিংবা ব্যবহারিক কিছু শব্দ দেড়শ-দুশ বছরের আমাদের হাটে-ঘাটে, মাঠে-বাটে নিত্য ব্যবহারের মধ্যে আসা আশ্চর্য কি? কেবল বাণিজ্য করতে এসেই পর্তুগীজরা কত য়ুরোপীয় শব্দই আমাদের ভাষায় রেখে গেছে, এই বাঙলাদেশেই ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে রাজত্ব করেছে ১৭৭০ সনের পরে। উনিশ শতকের গোড়াতেই অর্থাৎ পঞ্চাশ

---

১. ক. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০সন।
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) পৃ. ৪৩।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১) পূর্বার্ধ ৩য় সং সুকুমার সেন, পৃ. ১৩১।
৩. বাণীকান্ত কাকতি, সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়।
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১/পূর্বার্ধ/৪সং), পৃ. ১৩৫-৩৭।
৫. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের মধ্যেই অসংখ্য ইংরেজী শব্দ লোক ব্যবহারে এসেছে। কাজেই 'মজুরী' ও 'মজুরিয়া'র বাঙলা প্রত্যয়যুক্ত ব্যবহার দেখেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে অর্বাচীন বলা চলে না।

ভাষার বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ বাক্‌যন্ত্রের গঠনানুযায়ী সন্ধি-সমাসে যেমন পরিবর্তিত হয়, শারীরিক অসামর্থ্য, অজ্ঞতা ও আবহাওয়ার প্রভাবেও তেমনি স্থানে ও কালে উচ্চারণ বিকৃত বা বিবর্তিত হয়। বৈদিকভাষার বিভিন্ন স্থানিক ও কালিক বিবর্তন ধারায় তা স্পষ্ট। কাজেই কোথাও যদি বুলির প্রভাবে কিংবা বিভিন্ন স্থানের ও কালের লিপিকর পরম্পরায় তাই একই গ্রন্থে প্রাচীন ও অর্বাচীন বিভক্তিযুক্ত পদ মেলে -দেন্ত> দেউ, গেলান্ত> গেলা, করিবাক> করিতে, জায়িবাক> জায়িতেঁ প্রভৃতি। আবার একই শব্দের বানানেও বিভিন্ন রূপ মেলে। কাজেই এ কালের এখুনি, আগুয়ার, গাঁথুনি, বাগুলী, আদুরী প্রভৃতি স্বরসঙ্গতিমূলক বিবর্তন উচ্চারণসৌকর্যের জন্যে অজ্ঞ মানুষের বুলিতে হয়তো প্রাচীন কালে ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা লিখিত রূপে পাচ্ছি এ-ই যা। একই কারণে নাসিক্য উচ্চারণের গ্রহণ-বর্জন হতে পারে। পূর্ববঙ্গের ভাষায় নাসিক্য প্রায় থাকেই না। পূর্ববঙ্গে মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ শব্দের নানা স্থানে অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ হয়ে গেছে। কুমিল্লা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে খায় নাই, করে নাই প্রভৃতি খাইছে না, করছে না রূপে ব্যবহৃত। এগুলো হচ্ছে প্রাচীন রূপের বিকৃত অনুবর্তন।

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার নিজেই ভণিতাদি পরীক্ষা করে বলেছেন যে 'রাধা বিরহ'-ও বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচনা, খণ্ডের উল্লেখ নেই বলে এটিকে বিচ্ছিন্ন বলা হয়নি। কারণ রাধাকৃষ্ণ প্রেম বা কাম, বিরহ বা বিচ্ছেদ ছাড়া সমাপ্ত হতে পারে না। সদ্য অনুরাগিনী রাধাকে ছেড়ে বীতরাগ কৃষ্ণ যদি দূরে সরে থাকে, তাহলে বিচ্ছেদের কান্না ছাড়া রাধার আর কি থাকে! তাই 'বিরহ' বর্ণনায় কাব্য বা গীতিনাট্য সমাপ্ত। এটি পরবর্তী রচনা নয়। ভাগীরথী, আছে, শ্রীনিবাস, বিষ্ণুপুর, রঘুনন্দন প্রভৃতি লিপিকর প্রমাদপ্রসূত বলেই আমাদের বিশ্বাস।

AMARBOI.COM

কাব্যের স্বরূপ

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তাতে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনী, ভাব ও ভাষা কোনটাই চৈতন্যোত্তর যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনার মতো নয়। এতে বৈষ্ণব তত্ত্ব নেই, প্রেম নেই, চৈতন্যোত্তর যুগের ভাষাও নেই—'অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আসে' (পৃ. ৭৪, ১০৩, ১২৭, ১৮৫, ১৯১)। এটি লোকগীতি-নাট্য ভিত্তিক রচনা-বড় জোর 'রতি সম্ভোগ কাব্য'। কথকতাভিত্তিক কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত। মহাকাব্যের আঙ্গিক থাকলেও এতে কাহিনীগত বিস্তৃতি নেই। কথকতাভিত্তিক রচনা বলেই এ কাব্যে কালগত ও স্থানগত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। কবি সম্ভবত নিজেও গায়ক ছিলেন। তাই সর্বত্র 'গায়' 'গাইল' আছে, কোথাও 'কহে' বা 'ভণে' নেই। অজ্ঞ অসতর্ক গায়েন না হলে, লিখিত রচনায় কবির হাতে অকুস্থানগত মারাত্মক অসঙ্গতি থাকত না। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'তাম্বুল' থেকে 'ছত্র' খণ্ডে এবং শেষার্ধে এ অসঙ্গতি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এ কাহিনী কথকতারই অবলম্বন ছিল। বহুল চর্চার ফলে বহু মন মুখের পরিচর্যায় এর গীতিনাট্যরূপ সুষ্ঠু ও রসঘন হয়ে উঠেছিল। ছত্রখণ্ড অবধি রাধা বারো বয়স্ক বালিকা, স্থানে কালেও কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। মনে হয় এগারো থেকে চৌদ্দ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে রাধা তিন বছরের কাল পরিসরে যুমনা খণ্ডে যুবতী। কিন্তু এ তিন বছরে ঋতু আছে মুখ্যত বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। অথচ কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েক দিনের মাত্র। প্রতিভাবান শাক্ত কবি বড়ু চণ্ডীদাস এ বিভ্রান্তি সত্ত্বেও ভাবে ভাষায় ও রসে মাধুরীমণ্ডিত করে লিখিত রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন গাথাটিকে। এবং সাধারণ পাঠকেরও কাছে এ নাট্য সুবিন্যস্ত বলেই মনে হয়। এটি যে গায়েনের কথনভিত্তিক রচনা তার বড় প্রমাণ রয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বাঙ্গে : ঘটনার ও উক্তির পৌনঃপুনিকতা, অশ্লীল গ্রাম্য ঝগড়া ও গালাগাল, অনবধানতা জাত তথ্যগত অসঙ্গতি, রাধার, বড়াইর কিংবা কৃষ্ণের পূর্ব ঘটনার ও উক্তির ঘনঘন বিস্মৃতি কিংবা নিঃসংকোচ মিথ্যা ভাষণ, রাধার বয়সগত অসঙ্গতি, রাধার দৈ বেচা, রাধার কৃষ্ণের সঙ্গে নন্দের ঘরে লালিত হওয়া (পৃ. ৫০), অথচ সে সঙ্গে বড়াইর মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের নব পরিচয় প্রভৃতি মৌখিক রচনার সাক্ষ্য। বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কিনা, শ্লোকগুলো তাঁর রচনা কিনা বলা যাবে না। বলেছি, শ্লোকগুলো পরবর্তী যোজনা বা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবে চণ্ডীদাস যে সৃজনশীল কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তাঁর রুচি ও রসবোধ গায়েনসুলভ এতো স্থূল ও কামসর্বস্ব হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল না—লোকরঞ্জক যৌনতাসর্বস্ব লোকগীতি ভিত্তিক বলেই এবং নিজেও গায়েন ছিলেন বলেই কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত রসবিন্যাস তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যৌনতাদুষ্ট উক্তির পৌনঃপুনিকতার মূলে রয়েছে গ্রাম্য লোকের মনোরঞ্জন প্রয়াস। তাম্বুল খণ্ডে (১ম সং পৃ. ২৮) এ কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয়সার বা সূচীও রয়েছে। প্রেম নয়–লম্পট সুলভ ছলাকলার আশ্রয়ে রাধাসম্ভোগই কৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কাব্যে কোন নীতি আদর্শ বা প্রতিপাদ্য বিষয় নেই। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্যে আমাদের ধারণার পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে "কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার জন্যে, কৃষ্ণ বা রাধা তাহার উপাস্য নহে। দ্বিতীয়ত কবি বৈষ্ণব নহেন... সে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল, কবি অনন্ত বড়ু এ ভেদ বুদ্ধি প্রসূত কৃষ্ণের চরিত্র বিকৃত করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ।[১]

অসঙ্গতির নমুনা

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ছত্রখণ্ড অবধি রাধা বারো বছর বয়স্কা বালিকা। স্থান কালেও রয়েছে অসঙ্গতি। কাব্যে রাধার বয়স এগারো থেকে স্থানে স্থানে চৌদ্দ। তিন বছরের সময় পরিসরে রাধা যুবতী। তিন বছরের কাল পরিসরে ঋতু আছে মুখ্যত তিনটি - বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা। রাধার বয়সের হিসেবে ঘটনা তিন বছরের হলেও কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েকদিনের মাত্র। স্থানের কালের এবং রাধার, কৃষ্ণের ও বড়াইর উক্তির মধ্যেও অসামঞ্জস্য-অসঙ্গতি প্রচুর। যেমন –

বয়সে অসঙ্গতি

১. এগার বরিসে কাহ্নাঞি বার নাহি পুরে (পৃ. ৩৫, ৪৫, ৫৮)
এগার বরষি মোর তের নাহি পুরে। (পৃ. ৭০)
২. দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর (পৃ. ৬৯)
এহি মথুরা নগরে যাঁও বারহ বৎসর (পৃ. ১২৬)

কথার অঙ্গতি

১. হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে
দধি দুধ বিকিনিআঁ রাধা আইসে ঘরে (পৃ. ২৯)
২. ঘরত বাহির নহুঁ বড়ায়ি গো
স্বামীর বঢ়ই দুলালী। (পৃ. ৬২)

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ২৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যগত অসঙ্গতি

এক ঠাঁই বাড়িআহোঁ নান্দের ঘরে।
চণ্ডাল কানাঞি এঁবে বল করে।

ক. দান দেয় (পৃ. ৫৩), খ. দান দিতে হয় না (পৃ. ৩৬, ৫৯) দান গ্রহণ করলে কংস শাস্তি দেবে–এ কথা রাধা আঠারো বার বলেছে (পৃ. ৩৯, ৪২, ১২৫, ১২৬), গ. রাধা বালিকা বলে সম্ভোগের অযোগ্য -এ কথা রয়েছে তেরো বার (পৃ. ৬, ৪৫, ৪৬... ১৫৯, ২৮১) ঘ. অথচ দান, নৌকা, বৃন্দাবন, যমুনা ও বাণখণ্ডে রতিভোগের কথা রয়েছে (পৃ. ৩৮, ৯৪, ১০৫, ১১২) এবং স্পষ্টত আছে পাঁচ বার (পৃ. ১৩৩-৩৫, ১৬২, ২২৯-৩০, ২৫৫, ২২৯,) কিন্তু সম্ভোগের মুহূর্তে প্রতিবারই বলছে তার কৌমার্য এখনো রয়েছে, কেউ লঙ্ঘন করেনি, চ. রূপ যৌবনের কথা বলেছে চারবার (পৃ. ৫২, ৭৮, ৮৮, ১০০), ছ. মুখ-চোখ-নাক-স্তন-নিতম্ব ও জংঘার বর্ণনা একই ভাষায় পুনঃ পুনঃ মেলে (পৃ. ৩৪, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ১৩২) জ. ঝগড়া ও অশ্লীল গালাগাল মেলে অন্তত দশ বার (পৃ. ৫১, ৮৩, ৯০, ১০২, ১৫০, ১৮৩, ৩১৯, ৩২২, ৩৭১,) এবং 'অবতার কৈল আক্ষে তোর রতি আশে' -কৃষ্ণ স্পষ্টত ঘোষণা করেছে। ট. রাধাকৃষ্ণের এ লীলা রাধার এগারো বছর বয়সে শুরু এবং চৌদ্দ বছর বয়সে শেষ (পৃ. ২৭৭) ।

নন্দনশাস্ত্রীয় ত্রুটি

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নন্দনতত্ত্ব যে লঙ্ঘিত হয়েছে কালিদাস রায়ও তা স্বীকার করেছেন: "সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এইরূপভাবে কামের চরিতার্থতায় রসসৃষ্টি হয় না। প্রকৃত রতিভাবকেই রসে উত্তীর্ণ করা চলে, এই ভাবের মধ্যে একজনের এইরূপ আন্তরিক বিরাগ বা বিমুখতা থাকিলে আদি রসের কাব্যও হয় না।"[১] তাই এ কাব্য মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য নয়–এ নিছক ধামালীর পরিশীলিত রূপ। রাধাসম্ভোগই এর একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন নীতি আদর্শ বা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নেই এ কাব্যে। অতএব নির্লক্ষ্য কামচর্চার এই কাব্য কোন মতেই চৈতন্য-আস্বাদিত কাব্য হতে পারে না, তা যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ অনেকেই স্বীকার করেছেন। এজন্যেই এর জনপ্রিয়তাজাত প্রচারও চৈতন্যোত্তর যুগে বন্ধ হয়ে যায়। এটি স্পষ্টত রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ববিরোধী রচনা। তবে কাব্যকলা বোঝানোর জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে (১৫৫৪-৫৫ খ্রীঃ) "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্চজ্ঞেয়া,"—উক্তিতে এই বড়ু চণ্ডীদাসকেই যে উল্লেখ করেছেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা অসঙ্গত। এজন্যে 'সাহিত্যদর্পণ' রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজের খুল্লপিতামহ ও দান-নৌকাখণ্ড প্রণেতা চৌদ্দ শতকের চণ্ডীদাসের সন্ধান আপাত যৌক্তিক হলেও নিরর্থক।[২]

পুথির লিপিকাল

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই বলেন, পুথিতে তিনজন লিপিকরের হস্তাক্ষর রয়েছে :

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন ছাঁদের লিপির কাল ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল।[৩]

---

১. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।
২. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ২৮৩।
৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে –"পুথিটি ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লিখিত, বরং পরে, পূর্বে নয়।'[১]

৩. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত এক বিষ্ণুপুরাণের পুঁথির লিপির তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি প্রাচীনতর বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ১৪৬৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।[২]

৪. রাধাগোবিন্দ বসাক ১৪৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ বলে বিশ্বাস করেন।[৩]

৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপি সম্ভবত ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের।[৪]

৬. ড. সুকুমার সেন আগে মনে করতেন, পুথিটি ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লিখিত। সম্প্রতি বলেন : "কালি অত্যন্ত জলো এবং কাগজ অত্যন্ত অর্বাচীন; পাতলা এবং প্রায় যেন কলে তৈরি। আমার সুনিশ্চিত অভিমত যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল।"[৫] "পুথির কালি ও কাগজ দেখিয়া বোঝা যায় যে, পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।[৬] ... "কাগজ পাতলা মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ। এরকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতকের আগে দেখি নাই। উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। কালিতেও প্রাচীন পুথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্ন মাত্র নাই।

... আমার নিশ্চিত অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ।-শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পুরোনো ছাঁদের মতো অক্ষর অষ্টাদশ শতাব্দের পুথিতে অনেক দেখিয়াছি।[৭]" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের প্রথম প্রকাশক সম্পাদক রাধিকানাথ দত্ত ১৪০৫ শকে বা ১৪৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত পুথি মণ্ডের তুলট কাগজে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই মণ্ডের হলেই অর্বাচীন হয় না।

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন : "পুথির ২১৭ ও ২২২ পত্রে দুই ধাঁচেরই লিপি আছে। আর এ পুঁথির সমস্ত পাতাই এক রকমের ও এক সময়ের।—পুথি অত প্রাচীন নয়।[৮]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির মধ্যে যে রশিদ মিলেছে, তার সন ১০৮৯, তারিখ যথাক্রমে ২৬ আশ্বিন ও ২১ অগ্রহায়ণ। এ যদি বঙ্গাব্দ হয় তা হলে ১৬৮২ এবং মল্লাব্দ হলে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ হয়। সুকুমার সেন মল্লাব্দ বলেন, কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গাব্দ বলে দাবি করেন।

তুলোট কাগজের গুণগত রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও কালগত রূপ দুর্লক্ষ্য। বহু ব্যবহৃত পুথির পাতার রঙ এবং স্বল্প বা অব্যবহৃত বাঁধা পুথির রঙে পার্থক্য ঘটে। স্থানিক আবহাওয়ার গুণেও আয়ু ও রঙের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আর লিপিকাল সম্বন্ধে বিচারও কখনো নির্ভুল হয় না, হবে না। কারণ, ছাপাখানা চালু হওয়ার আগে কোন লিপির কোন নির্দিষ্ট আকার ছিল না। আদর্শ লিপির

---

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৪২ সন।
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়-এ উদ্ধৃত।
৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৪২ সন।
৪. বাংলা সাহিত্যের কথা : ১ম খণ্ড, মধ্যযুগ পৃ. ৪৯।
৫. বাংলা সাহিত্যের কথা : ১ম খণ্ড, মধ্যযুগ পৃ. ৪৯।
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৫ম সং, পৃ. ২১।
৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃ. ১২৯-৩০।
৮. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃ. ৫৮, ৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবে স্থান-কাল ও ব্যক্তিভেদে লিপির আকৃতি ভিন্ন হত। শিক্ষক ভেদে ছাত্র ভেদে লিপির আকার ভেদ অবশ্যই হত। এ যুগে আমরা ছাপা আদর্শ হরফ দেখে শিখি, কিন্তু আমাদের অসামর্থ্য, ঔদাসীন্য কিংবা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা অথবা দ্রুত লিখন প্রয়াস, অপদর্শন প্রভৃতির জন্যে কোন দুজন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের লেখা তথা হরফের আকৃতি অভিন্ন নয়। এ কালেই যদি এমন অবস্থা, তা হলে আদর্শ লিপিবিহীন শিক্ষক ও ছাত্র নির্ভর লিপি একই স্থানে ও কালে বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক। স্থান ও কাল ভেদে তো হতই। কালিও উপকরণ ভেদে ও মাত্রা ভেদে পানসে ও গাঢ় হত। আমাদের অভিজ্ঞতায় সতেরো শতকের পুথিতেও সহজ পাঠ্য হরফ মেলে আবার উনিশ শতকের পুথির লিপিও জটিল ও দুস্পাঠ্য হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম খোন্দকারের 'দুল্লামজলিস' ও জায়েনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' -এর এবং কালিদাস নন্দী নামের পেশাদার লিপিকরের লেখা অত্যন্ত জটিল। 'দুল্লামজলিস-এর কাগজ মাড় দেওয়া শক্ত; লিপি আপাত সুন্দর কিন্তু গঠনে যুগদুর্লভ, তাই প্রাচীন বলে মনে হয়। অথচ গ্রন্থের রচনাকাল আঠারো শতকের প্রথম পাদ, কালিদাস নন্দী উনিশ শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন।

রচনাকাল

প্রাপ্ত রশিদই সতেরো বা আঠারো শতকের। পুথি এর আগের। লিপিকরের বানান ও নামঘটিত প্রমাদের সাক্ষ্যে বোঝা যায়, বহু অনুলিপি পরম্পরায় প্রসূন এ লিপি। মণীন্দ্রমোহন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুখানি 'তালের' পুথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ১০টি পদ দেখতে পান, তার একটি পুথির লিপিকাল ১২২৭ সাল বা ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ, অপরটি প্রাচীনতর বলে কথিত। তাতে পদের ভাষারূপ অনেক পরিবর্তিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বক্তব্য বিষয়ও অপৌরাণিক ও লোকায়ত এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী। কাজেই রচনা চৈতন্যোত্তর যুগের হতেই পারে না। বৈষ্ণবমত প্রচারের সমকালেও একই কারণে হওয়া সম্ভব নয়। খোল-করতাল যোগে চৈতন্যদেব কৃষ্ণকীর্তন শুরু করেন বটে, চৈতন্যভাগবতে সেই তাৎপর্যেই চৈতন্য নিত্যানন্দকে 'সংকীর্তনৈকপিতরৌ' বলা হয়েছে। এতে খোল-করতাল কিংবা কীর্তন তাঁর উদ্ভাবিত বোঝায় না। ইরানের সাধক জালাল উদ্‌দীন রুমী তেরো শতকে 'সামা' (নৃত্য যোগে কীর্তন), হালকা, দারা (আসর করে যিকর্ ও অঙ্গ দোলান) প্রবর্তন করেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর পরেরকার কবি মুকুন্দরাম ইতিহাসবিরল সে যুগে যদি বলেই থাকেন, যে চৈতন্যদেব 'কীর্তন সিজ্জন কৈল খোল-করতাল'–তাতে নিঃসংশয় হওয়া সঙ্গত হয় না। বিশেষত ঐ চরণ যদি এভাবে পাওয়া যায় 'কীর্তন সিজ্জন কৈল খোল করতালে'–তাহলে কেবল কীর্তন প্রবর্তনের কৃতিত্বই চৈতন্যদেবের প্রাপ্য হয়–বাদ্যযন্ত্র নয়। তা ছাড়া দু'টো বাদ্য কি চৈতন্যদেবের নির্দেশে তৈরি হয়েছিল। কে বা কারা তৈরি করেছিলেন? করতালে সৃষ্ট ধ্বনিরই উৎপাদক যন্ত্র করতাল তৈরি হয়। হাততালিসৃষ্ট ধ্বনি নিশ্চয়ই সুপ্রাচীন। মৃদঙ্গই বা অর্বাচীন কেন? কাজেই এসব তথ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার উড়িয়া ভাষায় খুব মিল বলে ডক্টর সুকুমার সেন স্বীকারই করেছেন,[২] আর বাণীকান্ত কাকতি অসমীয়া ভাষার প্রাচীনরূপ বিধৃত বলে দাবি করেছেন।[৩] তেরো শতক অবধি উড়িয়া-বাঙলা-আসামী এবং ষোল শতক অবধি আসামী-

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ১/৩ সং, পৃ. ২৯০, ৩০৪।
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : পূর্বার্ধ ৩সং, পৃ. ১৩১।
৩. প্রাক ক. প. স : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা অভিন্ন ভাষা ছিল বলে ডক্টর সুনীতিকুমার ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বীকার করেন। যোগেশ বিদ্যানিধিও ভাষায় প্রাচীনতার ছাপ স্বীকার করেছেন এবং ভাষার প্রাচীন ও অর্বাচীন রূপের মধ্যে দুশো আড়াইশ বছরের ব্যবধানও মেনে নিয়েছেন। আর তা ২০০, ২৫০ বছর ধরে লিপিকর পরম্পরায় শোধিত বা গীত হওয়ারই যে ফল তাও অনুমান করেছেন। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরাতন শব্দ ও বিভিন্ন প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খ্রী. অপেক্ষা) আরো পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল অসম্ভব হয় না।"[১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো ডক্টর শহীদুল্লাহও বলেন : "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুথি ছিল।"[২] ডক্টর সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ-তালের সূত্রে প্রাপ্ত গীত অভিনয় সংকেতের নির্দেশক দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, প্রকীর্ন্নক লগনী, বিচিত্র, লগনী দণ্ডক, প্রকীর্ন্নক চিত্রক লগনী, বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা, লগনী প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে চৌদ্দ শতকে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' নামের অভিনয় শাস্ত্রগ্রন্থের পরিভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ঐ পরিভাষা বাঙলার অন্য গ্রন্থে মেলেনি, গ্রন্থটি প্রাচীন না হলে অভিনয় কলার নিদর্শন ধৃত থাকত না। 'বড়াই' চরিত্রেও সুকুমার সেন 'বর্ণরত্নাকরে' বর্ণিত 'কুট্টিনী' চরিত্রের অনুস্মৃতি আবিষ্কার করেছেন।[৩]

ডক্টর শহীদুল্লাহ ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের "গীতগোবিন্দে'র পদের অনুবাদ আবিষ্কার করেছেন। শহীদুল্লাহর মতে এর সংখ্যা পাঁচ:

গীতগোবিন্দ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ক. বহতি মলয় সমীরে	এবে মলয় পবন ধীরে বহে
খ. রতি সুখ সারে	তোর রতি আশোআশেঁ
গ. বদসি কিঞ্চিদপি	যদি কিছু বোল
ঘ. স্তন বিনিহিতমপিহারং	তনের উপর হারে
ঙ. নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণম	নিন্দএ চান্দ-চন্দন।

বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন তিনটি পুরো পদ (১ম সং ১১৯, ২০২, ২৩৫)। উক্ত (ক, খ) এবং 'চড়িলা কালীয় নাগশীরে/ গরুড় বাহন মহাবীরে' (পৃ. ২৩৫)-পদ তিনটে এবং বারোটি পদাংশ (১ম সং পৃ. ৪৮, ৫৫, ৬২, ৭২, ১৫৪, ২১৮, ২২৫, ২৩৩, ৩৪৮, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯)-তনের উপর হারে/ক্ষেণে সজল নয়নে/দেখি পল্লব শয়নে/ইত্যাদি জয়দেব থেকে নেয়া।

বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বিদ্যাপতির গভীর প্রভাব এবং তার পদের ব্যাপক অনুকৃতি আবিষ্কার করেছেন। এমনকি 'জনি' শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত।[৪] কিন্তু এখানে আমাদের বক্তব্য এই –প্রাচীন সংস্কৃত উপমাদি অলঙ্কার প্রায়ই বাঁধা নিয়মে আবর্তিত হত। প্রাকৃত -অবহট্‌ঠ হয়ে তা লোকসাহিত্যে এবং মধ্য ভারতীয় সাহিত্যেও সংক্রমিত ও অনুকৃত হয়েছে, ফলে যে-কোন রচনায় অধিকাংশ উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদিতে ঐক্য ও অভিন্নতা দেখা

১. সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৪২ সন।
২. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ. ৫২।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩য় সং, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩০-৩১।
৪. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. : ২৭০-৭৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। বিক্ষুব্ধ মানুষ মাত্রই কোন কোন সময়ে বলে –'ধরণী দ্বিধা হও' 'মেদিনী বিদার হও পশিআঁ লুকাঁও'–এটি বলতে লিখতে কেউ কারো অনুকরণ করে না–এগুলো যেমন আমাদের ঘরোয়া বাগধারার অঙ্গ, তেমনি চোখ-কান-নাক-নখ-নাভি-ঠোঁট-কপাল-কপোল-কবরী-বাহু-স্তন-আঙুল-নিতম্ব প্রভৃতির উপমান উপমেয় সম্পর্কিত কিছু প্রাণী-পদার্থ রয়েছে, সেগুলো সর্বত্র মেলে, যেমন –চোখের সঙ্গে পদ্ম, পলাশ, কাজল, কিংবা হরিণ বা মাছের চোখের তুলনা (এ যুগে পটলের সঙ্গে) চিরকালীন, চুলের সঙ্গে মেঘের, নিশির তুলনা প্রসিদ্ধ। অধরের তুলনা বান্ধুলী ফুল, কানের তুলনা গৃধকর্ণ, নাকের তুলনা বাজের চঞ্চু, বেণীর তুলনা ভুজঙ্গ প্রভৃতি কোনটাই কোন বিশেষ কালের বা এলাকার ছিল না। কাজেই সবটাই বিদ্যাপতির অনুকৃতি নয়, অনেকটাই রীতির আনুগত্যজাত আকস্মিক সাদৃশ্য। প্রায় অভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবেশে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-প্রজ্ঞা উপমা-রূপক-প্রবচনাদি আপ্তবাক্য ও বাকধারা অভিন্ন হয়, যেমন–'ভুখিত জনে কিয়ে দুই করে খায়।' 'অধর নব পল্লব (কোমল) মনোহর দশন দালিম জ্যোতি।' কিংবা, 'সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু' 'সামর চিকুর ভার' অথবা' পীন পয়োধর অপরূপসুন্দর বা বসন্তে' 'সাহর মজর ভ্রমর গুজর, কোকিল পঞ্চম গাব'—এগুলো কি বিদ্যাপতির উদ্ভাবন? এগুলো চিরকালীন ও সর্বজনীন দৃষ্টির ও অনুভূতির প্রসূন এবং সর্বত্র ব্যবহৃত। বাগভঙ্গিতে বিদ্যাপতির পদাবলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছিলেন। তা-ই যদি হয়, তবে বিদ্যাপতির মতো রাধাকৃষ্ণকে প্রেমিক প্রেমিকারূপে দাঁড় না করিয়ে রাধাকৃষ্ণকে কেবলই লাম্পট্যদুষ্ট কামুক-কাহিনী রূপে চিত্রিত করলেন কেন, তারও সদুত্তর পাওয়া দরকার। নইলে এ প্রভাব ও অনুকৃতি-তত্ত্ব গ্রহণীয় হতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরবি-ফার্সি জাত অন্তত আটটি শব্দ আছে—কামান, খরমুজা, বাকী, মজুর, মজুরিয়া, গুলাল, লেমু ও অফার।

ডক্টর শহীদুল্লাহ বড়ু চণ্ডীদাসের জীবৎকাল–১৩৭৫ থেকে ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মনে করেন।[১] এবং তাঁর 'বিদ্যাপতি শতকে' বড়ু চণ্ডীদাসের আনুমানিক কাল ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ নিরূপণ করেছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন', প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাঠামো প্রাচীন, বস্তুও পুরাতন এবং উড়িয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার খুব মিল আছে'[২] স্বীকার করে বলেছেন ১৬০০ শতকই রচনাকাল। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে "ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বা তাহার কিছু পরে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ ধামালী রচিত হয়।'[৩] সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, চৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেননি, করলে, এই 'কাব্যকে ভক্ত বৈষ্ণবরা মাথায় করে রাখতেন... শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমনভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না'।[৪] তাঁর মতে 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন।[৫]

১. বা. সা. ক. (মধ্যযুগ), পৃ. ৩৮।
২. বা. সা. ই. ১। পাত সন, পৃ. ১৩০-১৩২।
৩. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৮২।
৪. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, ৬৭।
৫. ঐ, পৃ. ৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সাম্প্রতিক সব মত যথাসম্ভব তুলে ধরলাম। কিন্তু আমাদের ধারণা দৃষ্টিভেদে ও তথ্যের গুরুত্বচেতনা ভেদে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয়েছে। এ জটিল তর্ক শেষ হবার নয়। তবু নিশ্চিত প্রমাণে পনেরো শতকের কবি কৃত্তিবাস-মালাধর বসু-শাহ্ মুহম্মদ সগীর-বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস-কবি চন্দ্র মিশ্র প্রভৃতির ভাষা থেকে প্রাচীনতর ভাষার নিদর্শন, জয়দেবের বিশেষ প্রভাব (আঙ্গিক ও বাণীগত), বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত লোকায়ত অপৌরাণিক কাহিনী, স্থূলতা আদিরসসর্বস্বতা, উক্তি ও ঘটনার পৌনঃপুনিকতা, স্থানে স্থানে উক্তির ও ঘটনার উল্লেখে পূর্বাপর অসামঞ্জস্য, নায়ক চরিত্রের গুণাভাব, কথকতা সুলভ ঘটনা ও পদবিন্যাস, লোক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক এবং পদাবলী সংকলন গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের অভাব, একাধিক পুথির অপ্রাপ্যতা প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী এ-গ্রন্থ নিশ্চিতই চৈতন্য-পূর্বকালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সনের আগে রচিত—জয়দেবের পরে, কৃত্তিবাস-মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর আগে, এবং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে। শহীদুল্লাহও পুথির লিপিকাল ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ অনুমান করে কাব্য রচনাকাল ১৪০০ খ্রীস্টাব্দ বলে ধারণা করেন।

বিষয়বিন্যাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' আদলে বিন্যস্ত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' আঙ্গিক সংজ্ঞায় মহাকাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও সে সংজ্ঞায় মহাকাব্য। তেরো খণ্ডে এই গ্রন্থ বিন্যস্ত। 'গীতগোবিন্দ' সর্গে বিভক্ত, প্রতি সর্গে শিরোনাম ও সমাপ্তিসূচক কথা আছে। যেমন প্রথম সর্গের শিরোনাম-'সামোদদামোদর' এবং সমাপ্তি 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথম সর্গঃ'। তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' শিরোনাম 'জন্ম খণ্ড' এবং শেষে 'ইতি জন্ম খণ্ডং সমাপ্তং' রয়েছে। জন্ম, তাম্বুল,দান নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয়দমন, বস্ত্র, হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ—এই কয়টি খণ্ডে কাব্যটি বিন্যস্ত। কাব্যে চরিত্র মাত্র তিনটি—বড়াই, রাধা ও কৃষ্ণ। সমগ্র রচনা ৪১৫ টি পদে (কবিতায়) বিভক্ত। প্রতি পদশীর্ষে রাগতাল এবং কোথাও কোথাও অভিনয় পদ্ধতির সংকেতও রয়েছে, যেমন-মালবরাগঃ। রূপকং। বিচিত্র লগন দণ্ডকঃ।[১] সর্গশীর্ষে রয়েছে ১২৩টি শ্লোক।

কাব্যরূপ

প্রাকৃত জন মনোরঞ্জক শৃঙ্গার রসের ও গ্রাম্য পরিবেশে গ্রাম্য ধামালীর আধিক্য এ-কাব্যকে প্রাকৃত জনের বিশেষ উপভোগ্য করেছিল। তিনটি চরিত্রই জীবন্ত ও স্বাভাবিক। তার মধ্যে রাধা চরিত্র অনন্য। যৌন চেতনাহীন এগারো বছরের বালিকার উদ্ভিন্নযৌবনা কামিনী হওয়ার ইতিকথা বহু ত্রুটি সত্ত্বেও কবি সুকৌশলে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। রাধার মন-মেজাজের ক্রম-বিকাশ চিত্রিত করাই যেন কবির মৌল উদ্দেশ্য ছিল। তিন বছরের সময়ের পরিসরে নাবালিকা 'বড়র বহুরী বড়র ঝিয়ারী' স্বামীগর্বিতা, দর্পিতা নারী রাধিকা ক্রমে ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-বিরাগ ত্যাগ করে পূর্ণযৌবনা সম্ভোগলিপ্সু নারী হয়ে উঠল এবং দয়িতের অবহেলায় কামতৃষ্ণাকাতরা নারীর যন্ত্রণার করুণ দীর্ঘ কান্না দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত। এই রাধা কামাসক্তা ও সম্ভোগলিপ্সু; এই কৃষ্ণ লম্পট, কপট, নির্মম, দায়িত্বহীন, নির্লজ্জ, সপ্রতিভ কিশোর। এখানে

১. ১ম সং, পৃ. ২০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ও আচরণ স্থূল ও অশ্লীল। মিথ্যা বলতে তিন চরিত্রই পটু ও নিঃসংকোচ। ধূর্ততায় কৃষ্ণ যদিও অতুল্য, বড়াই বা রাধাও কম নয়। পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের অপরিস্রুত জড় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। দান, নৌকা ও বংশী খণ্ডই রসে ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠ; প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য ঈষৎ পালটে বলা চলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-কৃষ্ণের যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের সেখানে আরম্ভ।' পদাবলীর রাধা গোড়া থেকেই কৃষ্ণানুরাগিনী উপযাচিকা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথমে বীতরাগ পরে ব্যাকুলা-অনুরাগিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বুনো ফুল, তার বুনো রূপ, বুনো গন্ধ, রস গ্রাম্য যৌনতাদুষ্ট, সে ভোগ্য। আর পদাবলীর রাধা সযত্নে লালিতা ফুল, তার রূপ রস-গন্ধ নগুরে ও সূক্ষ্ম এবং পরিস্রুত; সে প্রেম উপভোগ্য, তাতে তত্ত্ব আছে, চেতনার মাধুর্য আছে, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার চমক আছে, পৌরাণিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে। এ কাব্যে গীতিরস, কাব্যিক লাবণ্য, নাট্যগুণ, সংলাপে সৌন্দর্য রয়েছে, নৃত্যনাট্য হিসেবেও রসোত্তীর্ণ তো নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পেয়েছে, বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কুম্ভারের পণী তেলী-তেলিনীর ঘরে ঘরে করুআ (সরিষার) তেল ফেরী, কাকের রব, তিথি-নক্ষত্র, শূন্য কলসী, শিয়াল, নারীদের বাজারে বেচাকেনায় অংশগ্রহণ, শুভাশুভর সংস্কার, হাঁচি, ঝিঁজি, উঝট, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নানপ্রথা, বাজার কর, ঘাট কর, ভিক্ষাজীবী যোগী-যোগিনীর খর্পর, চণ্ডীপূজা, তীর্থস্থান, মন্ত্রতন্ত্র, সহজিয়া কায়সাধন, মা-বাপ তুলে গালাগাল প্রভৃতি, তাম্বুল-কর্পুর যোগে প্রণয়প্রস্তাব, গাঁয়ের কুটনীর মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন, ধনগর্ব, বংশগৌরব ইত্যাদি সব কিছুই মেলে। গ্রামে গ্রামে সবাদ্য নাচগান কথকতাই ছিল চিত্তবিনোদনের ও লোকশিক্ষার অবলম্বন। এ কাব্যে কবির কোন বিশেষ প্রতিপাদ্য নৈতিক তত্ত্ব ছিল না বটে, কিন্তু আজকের সমাজসচেতন পাঠক এর মধ্যে একটা ফলিতার্থ পেতে পারে। রাধারা হচ্ছে সেই অভাবগ্রস্ত সরল সমমানব, দরিদ্র বলে যাদেরকে লাভ-লোভের মরীচিকার ফাঁদে ফেলা সহজ হয়। কুটনীরা হচ্ছে কনের ঘরে মাসী আর বরের ঘরে পিসী। এই কুটনীরূপ টাউটরাই শোষক-শাসকের হয়ে গণমানুষের হিতকামীর ভূমিকা গ্রহণ করে, আর এদের মাধ্যমেই কৃষ্ণরূপী শঠ-কপট শাসক-শোষক গণদরদী লোকসেবকের ছদ্ম আবরণে শাসন-শোষণের নামে দুর্বল মানুষের যথাসর্বস্ব লুটে। অসহায় বলেই রাধারা কৃষ্ণনির্ভর, কৃষ্ণের কাছেই শোষণের জন্য ধর্না দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রকৃতির সন্তান— বুনো ফুল, তার বুনো ও স্বভাব-সুন্দর রূপ, তার রস আদি ও অকৃত্রিম, তার স্বভাব তার লাবণ্য অপরিস্রুত ও অবিকৃত। পদাবলীর রাধা সংস্কৃতি ও মানসোৎকর্ষের প্রসূন।

চণ্ডীদাশ নামের কবি পাঁচজন।

১. বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কোন বিক্ষিপ্ত পদ রচনা করেন নি তা আমরা মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ফলে নিঃসংশয়ে জানতে পাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর কন্যা, আর বাসুলী আদেশে যে দ্বিজ চণ্ডীদাস পদরচনা করেছেন, তাতে আমরা কহে, ভণে. বিনোদিনী রাধা, বৃষভানু রাজনন্দিনী, উপান্ত চরণে ভণিতা প্রভৃতি পাই, যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়নি, বড়ু কখনো দ্বিজ বলে কিংবা উপান্ত চরণে ভণিতা দেননি, কাজেই পদাবলীর বাশুলী আদিষ্ট 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস ভিন্ন ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি আকস্মিকভাবে তো তার মত, রীতি ও পরিচয় বদলাতে পারেন না বিক্ষিপ্ত পদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব এ ধরনের পদে কিংবা সহজিয়া পদে কোথাও 'বড়ু' ব্যবহৃত হলেও বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলে গ্রাহ্য হওয়া অযৌক্তিক। এগুলি স্পষ্টত জাল রচনা।[১] বড়ু চণ্ডীদাস ছাতনার কবি। কেননা ছাতনার বাসুলী চণ্ডী। আর নান্নুরের বাসুলী সরস্বতী।

২. চণ্ডীদাস

'চৈতন্যচরিতামৃত' সূত্রে জানতে পাই চৈতন্যদেব জয়দেবের 'গীতিগোবিন্দ', বিদ্যাপতির পদ, রামানন্দের নাট্যগীতি ও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শুনতেন, আস্বাদন করতেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' চারবার এ কথার উল্লেখ আছে :

১. বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত। (১/৩)

২. চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে (২/২)
গায় শুনে পরম আনন্দ।

৩. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ।

৪. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
ভাবানুরূপে শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ। (৩/১৭)

কৃষ্ণলীলার কবি হিসেবে জয়ানন্দও চণ্ডীদাসের বন্দনা করেছেন :

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ।

লক্ষণীয় ইনি সর্বত্র শুধু 'চণ্ডীদাস'-দ্বিজ, দীন, বড়ু, বা আদি নন। এই বিশেষণবিহীন চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। তিনি নিশ্চয়ই জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ পদসমূহের রচয়িতা। বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, "বিশেষণহীন একজন 'চণ্ডীদাস' ছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস প্রভৃতি চণ্ডীদাসকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা এই বিশেষণহীন চণ্ডীদাসকে আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার ভণিতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এবং ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে ১১২টি পদ নির্বাচন করিয়াছি।"[২] চণ্ডীদাসের রচিত অকৃত্রিম পদগুলো বেছে নেওয়া সহজ নয়। চৈতন্যচরিতামৃতধৃত পদাংশ 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোর' (২/৩) কিংবা 'নীল অতসী' ফুলের উল্লেখ সম্বলিত পদ চণ্ডীদাসের বলে মেনে নেওয়া যায় বলে কারো কারো বিশ্বাস।[৩] এঁর আনুমানিক জীবৎকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ। এঁর বন্দনা করেছেন জয়ানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর (পদামৃতসমুদ্র), নরহরি চক্রবর্তী ও বৈষ্ণব দাস।

১. জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ। —জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল

---

১. বাংলা সাহিত্যের কথা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃঃ ৪১-৪৭।
২. যো. শ. প. সা. পঃ ২৩১-৩২।
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃ : ৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. চণ্ডীদাস চরণ/চিন্তামণি গণ/শিরে করি ভূষণ
—গোবিন্দদাস কবিরাজ, পদ,

৩. বিদ্যাপতিঃ চণ্ডিদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
—রাধামোহন, ঠাকুর, পদামৃতসমুদ্র

৪. জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গণে
—নরহরি, চক্রবর্তী,-পদ,-ভক্তিরত্নাকর।

৫. জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।
— বৈষ্ণবদাস, পদকল্পতরু।

৩. দীন চণ্ডীদাস

দীন চণ্ডীদাসের একখানা আখ্যান কাব্য এবং তার খণ্ডাংশ 'কপালী মিলন পালা'র পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এখন দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' দীর্ঘ ভূমিকা যোগে প্রকাশিত করেছেন। সবাই মোটামুটি স্বীকার করেছেন যে, দীন চণ্ডীদাসের রচনা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাঁর আখ্যান কাব্যে মাত্র সাতটি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে,—আর 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ৮৮টি। এতে মনে হয় লিপিকর প্রমাদে 'দীন' ঐ সাতটি ভণিতায় 'দ্বিজ' হয়েছে। অনবধানতা বশে 'দীন'কে 'দ্বিজ' লেখা স্বাভাবিক। কাজেই 'দীন চণ্ডীদাস' এক স্বতন্ত্র কবি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন : "এখন হইতে কম বেশী দুই শত বৎসরের মধ্যেই দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিতে হয়।"[১] সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এ মত সমর্থন করেন। তাঁর যুক্তিগুলো এই :

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাকুঁড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত 'কপালী-মিলন' পুথিতে এক জায়গায় 'সন ১০৯৫ সাল' দেখেছিলেন। এটিকে ঐ অঞ্চলের মল্লাব্দ ধরে (১৭৮৯-৯০খ্রীস্টাব্দ) এবং ঐটিকে লিপিকালের পরিবর্তে রচনাকাল ধরে ঐ তারিখকেই তিনি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কালের নিম্নতম সীমা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

২. "সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সব পদ সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাসে'র বহুপদ থাকলেও একটি পদেও দীন ভণিতা মেলে না।

৩. "দীন চণ্ডীদাসের আখ্যান কাব্যের এবং পদসমষ্টির বহু পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাস' সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ পদগুলির একটিও পাওয়া যায়নি।[২] অতএব দীন চণ্ডীদাস আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি। বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখ হয়তো পুথি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এঁরই 'কৃষ্ণলীলা' গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা শুনতেন।

৪. দ্বিজ চণ্ডীদাস

এই দ্বিজ চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক। হয়তো নান্নুনের সরস্বতী দেবী বাশুলীরই সেবক। এই বাশুলী বিশালাক্ষি[৩]। তাই তিনি বাসলীর আদেশে, কৃপায়, সহায়, 'কহে, ভণে' ক্রিয়াপদ যোগে এবং 'বৃষভানুনন্দিনী', 'বিনোদিনী' রাধার পদ রচনা করেছেন। সতেরো শতকে রচিত মুকুন্দরাম গোস্বামীর সহজিয়াগ্রন্থ 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' এই দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই উল্লেখ রয়েছে :

---

১. ভারতবর্ষ ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৮৪।
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৭৩-৭৫।
৩. পুথি পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭১, বিশ্বভারতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরাখ্যরজকী-সঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তমঃ' এই সাধনসঙ্গিনী রজকী তারার কানুদাসের পদে পুরো নাম 'রামতারা'। তার থেকে চণ্ডীদাস-রজকিনী রামী তত্ত্বের ও পদের উদ্ভব। এ কবি নিশ্চয়ই সহজিয়া বৈষ্ণব। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে বহু আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার রয়েছে, যথা কারিগর (১৫৩, ৯৯২,) বনালো, খুশি (১৯৮), দাগ (৩৯৪), দোকান (৬৪০), মহল (৬৩৭, ৬৪১, ৬৪৩), তকল্লবী (৬৪৪), বানাইয়া, দরিয়া (৮৮১), বিদায় (৯৩৩), বালিস, বদল (১৫১২)।[১] ইনি উপান্ত চরণে ভণিতা দেন। এঁর বন্দনা করেছেন সহজিয়া পদকার প্রসাদ দাস, কানু দাস, নরহরি দাস (?) প্রভৃতি।

এই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে আদৌ কোন কবি ছিলেন কি-না বলা যাবে না। বৌদ্ধ বিলুপ্ত কালে অনেক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁদের বৌদ্ধমত লালনে যত্নবান ছিলেন। বাঙলার বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীর একটি অংশ চৈতন্যের বৈষ্ণবমত নামত স্বীকার করে। এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সহজিয়া সম্প্রদায়ের যারা বৈষ্ণবমত গ্রহণ করে, তারাই 'বৈষ্ণব সহজিয়া' বা রাগাত্মিক সাধক নামে সাধারণ্যে পরিচিত। এরা যোগতান্ত্রিক বজ্র-সহজযানী সাধক। এরা কায়াসাধক, দেহাত্মবাদী, বামাচারী ও গুহ্য সাধক। এদেরই অবৈষ্ণব দল 'বাউল' নামে আখ্যাত। এরা পরকীয়া প্রেম ও মিথুনাচারের মাধ্যমে নাদ-বিন্দু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি গুহ্য সাধক ও সিদ্ধির চর্যা পালন করে।

এই সহজিয়া বৈষ্ণবেরা নিজেদের মতের মর্যাদা, প্রচার ও প্রসার কামনায় তত্ত্বের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত তিনশ বছর ধরে বহু অপকর্ম করেছে। জাল করতে তাদের জুড়ি নেই। এরাই চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য-বীরভদ্র-আউল চাঁদ-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের সাধন সঙ্গিনীর নাম ধাম উদ্ভাবন করেছে, প্রেমবিলাস চারটে বিলাস (পরিচ্ছেদ) যোগ করেছে এবং বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ-সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রায় শেখর প্রভৃতিকে তাদের মতের নব রসিক বানিয়েছে, লোকগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় করবার জন্যে বড়ু, দ্বিজ, দীন, আদি প্রভৃতি যোগ কিংবা শুধু চণ্ডীদাসের নামে সহজিয়া পদ রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনতত্ত্বও রটিয়েছে পদ রচনা করে। এদের উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হয়েছে, কেননা বিদ্বানেরা সত্য-সত্যই বিভ্রান্ত। এসব জেনে বুঝেই হয়তো সতীশচন্দ্র রায় ও মণীন্দ্রমোহন বসু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ছাড়া কোন তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। মনে হয় নির্বর্ণ ও জনপ্রিয় করবার জন্যেই অনেকের উৎকৃষ্ট অসহজিয়া পদও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালু করা হয়েছিল। তাই অনেক উচুঁ মানের পদে আমরা শুধু 'চণ্ডীদাস' কিংবা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা দেখি।

আঠারো শতকে (১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ, রবিবার অষ্টমী) ও উনিশ শতকে (১২১২ বঙ্গাব্দ-১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ) লিপীকৃত দুখানি পুঁথিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের কিছু পরিচয় মিলেছে। শিবরতন মিত্র আবিষ্কৃত ১২১২ বঙ্গাব্দে লিপীকৃত ও সদানন্দ সিদ্ধু অনূদিত 'ভগবদগীতায়' অনুবাদক সদানন্দ সিদ্ধু আত্মপরিচয় সূত্রে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বার বার উল্লেখ করেছেন। –"আছিল প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাস"[২] ইত্যাদি। বিশ্বভারতীর একটি পুথির পাতড়ায় কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের বন্দনা রয়েছে :

---

১. 'পদকল্পতরু' থেকে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক উদ্বৃত, বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ, পৃ: ৬১-৬২

২. প্রবাসী ঃ ১৩৪২, মাঘ, পৃঃ ৪৫৭-৫৮ ; উদ্ধৃত সুখময় মুখোপাধ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস
করিস্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জ্জাস।
তাহার পূজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি
সেই পাদ পদপদ্ম মোই করি থক্কি (থাকি)।[১]

[লিপিকাল ১১৮২ সাল]

এই পাতড়া মতে দ্বিজ চণ্ডীদাস বিশালাক্ষির পূজক, 'রমণী'র কৃপাপ্রাপ্ত পয়ার গ্রন্থ রচক এবং করিন্নাহার গ্রামে 'নির্যাস [মৃত্যু] প্রাপ্ত।[২]

ডক্টর সুকুমার সেন-প্রাপ্ত 'চৈতন্যবন্দনা'র একটি পদে আছে :

জন্মিবেন আপনি হরি/শ্রীচৈতন্য নাম ধরি/
সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস/সে চরণে মোর আশ/
সব ছাড়ি পশিল চরণে।'[৩]

–প্রথম উদ্ধৃতিতে কেবল কুল পরিচয় সূত্রেই প্রপিতামহের নাম এসেছে। ইনি প্রসিদ্ধ লোক কিংবা কবি ছিলেন কিনা বলার উপায় নেই। হয়তো স্থানীয়ভাবে তিনি খ্যাত ছিলেন। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের এইরূপ এক কুলপুরুষের নাম 'চণ্ডীদাস' দেখে সুকুমার সেন তাঁকেই বড়ু চণ্ডীদাস বলে দাবী করেন।[৪] দ্বিতীয় উদ্ধৃতি সূত্রে বোঝা যাচ্ছে আঠারো শতকেও কবিখ্যাতি সম্পন্ন একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন, কীর্নাহারে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিশালাক্ষির (বাশুলীর) পূজক ছিলেন। অতএব আমরা মেনেই নিই যে সতেরো শতকের শেষ পাদে ও আঠারো শতকের গোড়ার দিকে একজন সহজিয়া বৈষ্ণব কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন। অথবা সহজিয়ারা নাম-ধাম ঠিক করে ঐ নামে এক কবি দাঁড় করিয়েছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এমনি ধারণা পোষণ করেন : 'সহজিয়ারা যেমন প্রাচীন কালের বিখ্যাত সাধক ও কবিদের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছে, তেমনি নিজেরাই 'সহজিয়া' পদ ও 'নিবন্ধ' রচনা করে তা প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নামে চালিয়েছে। 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি আসলে এই রকম সহজিয়া সম্প্রদায়ে বিভিন্ন লোকদেরই রচনা। ঠিক এই ভাবে সহজিয়ারা বিদ্যাপতি, নরোত্তম দাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, রায় শেখর ভণিতা দিয়ে বহুপদ রচনা করেছে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তম দাসের নামে অসংখ্য সহজিয়া নিবন্ধ রচনা করেছে—যেগুলি কিছুতেই ঐ নামের মূল গ্রন্থকারদের লেখা হতে পারে না।[৪]

তরণীরমণ বা তরুণীরমণ নামের এক কবি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'সহজ সাধনাতত্ত্ব' নামে একটি ছোট গ্রন্থ আছে। তাতে চণ্ডীদাস-রামীর প্রেম কাহিনীও রয়েছে। তাঁর ভণিতার একটি পদ যখন 'পদকল্পতরু'তে আছে, তখন তাঁকে আঠারো শতকের কবি বলে স্বীকার করতে হয়, (অবশ্য পদটি যদি পরবর্তী প্রক্ষেপ না হয়, অথবা গায়েনের অনবধানতায় ভণিতায় তাঁর নাম যুক্ত না হয়ে থাকে।) এঁরও উপাধি বা কবিনাম ছিল 'চণ্ডীদাস'। 'রত্নাসার' নামের এক সহজিয়া পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংখ্যা

---

১. (ক) পুথিপরিচয় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১। (খ) পুথিপরিচয় ৩য় খণ্ড, পাদটীকা পৃঃ ১৫
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় থেকে উদ্ধৃত।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩ পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৭৪।
৪. 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়', পৃঃ ৮০-৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১১১, পত্র ১৮৭) মণীন্দ্রমোহন বসু এই চরণদ্বয় পেয়েছেন :

'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণী রমণ
গীত ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন'–

এবং এর পরে–'পিরীত বলিয়া/তিনটি আখর/বিদিত ভুবন মাঝে'–পদের ভণিতায় দেখেছেন– তরণীরমণ/করে নিবেদন/মরিলে না যায় ছাড়া।' এই পদ এবং 'তিনটি আখরে না জানি কি আছে' — পদটি ঈষৎ রূপান্তরে চণ্ডীদাসের নামেও চলে। সহজিয়া গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' তরণীরমণের ৪৫টি পদ সংকলিত রয়েছে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন— "চণ্ডীদাস নামটি শুধু যে বহুলোকে ধারণ করতেন তাহা নহে, উহা অনেকটা উপাধির মতন ব্যবহৃত হইত, যেমন হয় ... প্রধান মহান্তের 'শঙ্করাচার্য' নাম। ....সহজিয়ারা তাঁহাকে (চণ্ডীদাসকে) নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া 'আদি চণ্ডীদাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন .... চণ্ডীদাস নামটি যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে, নবদ্বীপের বনচারির ডাঙ্গায় এক চণ্ডীদাস ও রজকিনী দেখিতে পাইতাম। .... ঐ চণ্ডীদাস পদ রচনাও করিতেন। আমরা চারি আনা দিয়া তাহার পদের বইও কিনিয়াছিলাম। এখন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে এই চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১]

অতএব আমাদের বাশুলী পূজক দ্বিজ চণ্ডীদাস সহজিয়াদের বানানো দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে আমাদের যে সন্দেহ তা দৃঢ়তর হল।

AMARBOI.COM

৫. চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্ডীদাস

এক দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'কলঙ্কভঞ্জন' নামের এক পুথি চট্টগ্রামে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কার করেছিলেন। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এই পুথির অনুলিপি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৪০ সনে) প্রকাশিতও করেছেন। এই পুথির লিপিকাল ১১৮২ মঘীসন বা ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ। ইনি মনে হয় আঠারো শতকের শেষার্ধের চট্টগ্রামবাসী কবি। পুথির দুটো ভণিতা এরূপ :

১. 'চণ্ডীদাস বোলে সার কৃষ্ণগতি সভাকার।'

২. 'রাধাকৃষ্ণ পানে চাহি চণ্ডীদাস বোলে।'

এই দীর্ঘ ও জটিল আলোচনার পর আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছি যে, লোকায়ত কৃষ্ণযাত্রার তথা গীতিনাট্যের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রচনা করেন। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসই সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস।

দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পূর্ব কালের বা তাঁর জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। এই শুধু 'চণ্ডীদাসের' পদই চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। এঁর আনুমানিক জীবনকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ।

---

১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র ভূমিকা (পৃঃ ৩৩-৩৫) থেকে উদ্ধৃত।
'ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও 'চণ্ডীদাস' নামে কবি-বৈরাগী দেখেছেন, গোপাল হালদারকে লিখিত পত্র ৪/১২/৩২, 'সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা, পরিচয়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সন পৃঃ ৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীন চণ্ডীদাসই তৃতীয় চণ্ডীদাস। ইনি কৃষ্ণলীলার আখ্যান কাব্য তথা পালাগান প্রণেতা। ইনি আঠারো শতকের শেষার্ধের বা শেষ পাদের কবি।

পদকার 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' সহজিয়াদের জাল কবি। এঁর কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না।

রাধার 'কলঙ্কভঞ্জন' প্রণেতা চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্ডীদাসও আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি, তবে তিনি পদকার বা প্রসিদ্ধ কবি নন।

শেষোক্ত জনকে বাদ দিলে আমরা তিনজন চণ্ডীদাস পাই—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। এঁরা তিনজনই রাঢ় অঞ্চলের লোক। খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরও এই মত ছিল।[১] কোন কোন নামের স্থানিক ও কালিক জনপ্রিয়তা থাকে—দুনিয়ার সব সমাজেই তা দেখা যায়। চণ্ডীদেবীর প্রসারক্ষেত্র রাঢ় অঞ্চলেও তাই মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামের আধিক্য ছিল। আর ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের পরিবেশিত তথ্যানুসারে সহজিয়া সাধকদের মধ্যেও একই নামের একাধিক পদকার পাই। যেমন—অনন্ত, কৃষ্ণ, গোকুল, গোপাল, গোবিন্দ, নরহরি, মুরারি, মাধব, রঘু, শ্যাম, হরি, হরে প্রভৃতি।

চণ্ডীদাস-পদাবলী আস্বাদনে আমরা চণ্ডীদাস-সমস্যার কথা মনে রাখব না, আমরা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া পদকার ছদ্ম চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত লোকপ্রিয় ও প্রখ্যাত পদাবলীর ভিত্তিতে আমাদের আনন্দিত আবেগ প্রকাশ করব।

জনপ্রিয় পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাণের কথা আবেগ-সুন্দর সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা নিরাবরণ, নিরাভরণ ও অনাড়ম্বর। উপমাদি অলঙ্কারের ছটা নেই, শব্দাড়ম্বরের ঘটা নেই, অনুভবের আন্তরিকতা, গভীরতা ও ব্যাপকতাই তাঁর পদকে ললিতমধুর করে তুলেছে, করেছে চিরমানবের অভিব্যক্ত অনুভবের আকর। চণ্ডীদাস অনুরাগের ও বিরহেরও কবি-'কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা! এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' পাওয়ার আকুলতা, না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর আশঙ্কা ও বিচ্ছেদের ক্রন্দন রাধা নামের তরুণীকে সারাটা জীবন কি যন্ত্রণা-মধুর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশ্বাস-নৈরাশ্যের মধ্যে রেখেছিল, তারই স্বতোসিদ্ধ ও সর্বজনীন চিত্র মেলে চণ্ডীদাসের পদে। তাঁর এক একটি পদ যেন প্রমূর্ত অনুরাগ ও উৎকণ্ঠা, ক্রন্দন ও শঙ্কা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং অনন্ত বিরহ। নিম্নের সব পদ যে একজনের এবং যে কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। তবে যে সব পদ চণ্ডীদাসকে লোকপ্রিয় করেছে, সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হয়। চণ্ডীদাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ :

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
না যাইও যমুনার জলে
সখা হে ও ধনি কে কহ বাটে
কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনি
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
আলো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
সই কেমনে ধরিব হিয়া
হেদে রে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস
ছুঁওনা ছুঁওনা বধু ঐখানে থাক
আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
সখিক বচন শুনি রাই বিনোদিনী,

১. (ক) বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা, মদনমোহন কুমার, ৪র্থ সং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে কুলবতী ধনি
মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
সই কে বলে পিরীতি ভাল
একে কাল হৈল মোর
কানড় কুসুম করে
যখন নাগর পিরীতি করিলা
তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
সখি কহবি কানুর পা-য়
তুমি কহিও নিঠুর আগে
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
সই জানি কুদিন সুদিন ভেল
বঁধু কি আর বলিব আমি
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
শুন শুন হে রসিক রায়
শুনেই চিকন কালা

৩

ক. বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চা

॥ ১ ॥

সাত শতকের আরবে ইসলামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকর ঘটনা। এক অসামান্য পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁর মুখনিঃসৃত ঐশ্বরিক বাণীর সম্মোহনে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-বিক্ষত যাযাবর ও অর্ধ যাযাবর জনগোষ্ঠী আকস্মিকভাবে আষাঢ়ের প্রকৃতির মতো উষর ভূমে দুর্মর প্রাণশক্তি পেয়ে জেগে উঠল। চরম অবজ্ঞায় যে-উষর ভূমে মিশর-বেবিলোন-পারস্য-গ্রীস-রোমের সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো পদার্পণ করেনি, যে জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতি সভ্যজগতের স্বীকৃতি পায়নি; যাদের দারিদ্র্য ছিল চিরন্তন, সেদেশের মানুষ নিরক্ষর এক পুরুষের নেতৃত্বে সংহত হয়ে, বাহুবলে, মনোবলে, ও নৈতিক চেতনাবলে ঋদ্ধ হয়ে জগজ্জয়ী শক্তিরূপে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের সুমহান দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ইসলামের বাণী প্রচারে, বাণিজ্য প্রসারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ছিল তাদের সমান আগ্রহ। এই আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠছিল তাদের জ্ঞানস্পৃহা ও সৃজনোদ্যম। উত্তর আফ্রিকা থেকে গোবি-ককেসাস এবং স্পেন থেকে উত্তর-ইন্দোনেশিয়া অবধি তাদের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক আত্মবিস্তার তাদের ধনলিপ্সা ও জ্ঞানতৃষ্ণা দুই-ই মিটিয়ে ছিল। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার সামান্য অংশই ইসলামের উদ্ভবক্ষেত্র আরবের। অবশিষ্ট সবটাই ইরানী মিশরী ও মধ্য-এশীয় মনীষার ফসল। আরবী ধর্মমতের অঙ্গীকার, আরবী হরফ ও আরবী ভাষার মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত বলেই, সাধারণের চোখে সবটাই ইসলামী ও আরবী। আরবী ভাষা ও বর্ণমালা যে আরব বহির্ভূত অঞ্চলে চালু হল তা ইসলাম প্রীতির প্রসূন নয়, আব্বাসীয় আমল অবধি অবিচ্ছিন্ন আরব শাসনের ফল। বিজিত জাতির উপর বিজেতার ধর্ম-বর্ণ-ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার রীতি সাম্রাজ্যবাদের যমজ। কাজেই এ নতুন কিছু নয়।

আদি মধ্যযুগের সেই অশিক্ষা ও নিরক্ষতার জগতে কার্ডোভায় কায়রোয় বাগদাদে সমরখন্দে বোখারায় বসে ভাবুক জ্ঞানী মনীষীরা বিভিন্ন বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিকাংশ কালে নষ্ট হওয়ার পরেও আজো যে-সব আরবি-ফারসি পুথি অবিলুপ্ত ও বিলুপ্ত পুথির যে-সব নাম জানা যায়, তাদের সংখ্যাও বিপুল। কাগজবিরল ছাপাখানা বিহীন যুগে মানুষের এই প্রয়াসই সাক্ষ্য দেয় তাদের জ্ঞানপিপাসা ও সৃষ্টিশীলতা ছিল কত প্রবল! ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীত, স্থাপত্য, জোতির্বিদ্যা, রাজনীতি বিষয়ে তাদের অধ্যবসায়, সাধনানিষ্ঠা এবং কোন কোন শাখায় উৎকর্ষ বিস্ময়কর। শোনা যায়, নয় শতকের ঐতিহাসিক তাবারী সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখে একশ পঞ্চাশ খণ্ডে বিরাটকায় ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বারো শতকের লেখক দামাস্কবাসী এবনে আসাকি আশি খণ্ডে এবং বাগদাদবাসী অপর একজন একশ খণ্ডে সাহিত্যামোদীদের বিবরণ রচনার মতো নিষ্ফল কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আদি মধ্যযুগের দামাস্কে বাগদাদে সাধারণের সাহিত্যপ্রীতি প্রাবচনিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কিন্তু ভারতের মাটিতে এমন অধ্যবসায়ী জ্ঞানী-মনীষী কবি-লিখিয়ে মুসলিমের জন্ম ক্বচিৎ হয়েছে। আমীর খুসরু থেকে গালিব কবির কিংবা ফিরিস্তা থেকে সিহাবুদ্দিন তালিস অবধি ঐতিহাসিকের কেউ দেশজ মুসলিম সন্তান নন। অন্যক্ষেত্রেও তা-ই মাহমুদ গাওয়ান প্রভৃতি দু'চারজন ব্যতীত ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তথা রাজপদে বা আমীর পদে কোন দেশজ মুসলিমকে সুদীর্ঘ আটশ বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। এর কয়েকটি কারণ অনুমান করা চলে। এক, ভারতে ইসলাম প্রচারক দরবেশরা অতিমাত্রায় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন বলে কোরআন-সুন্নার যে-সব বাণী আরবদের পার্থিব জীবনে ও কর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেসব বাণী এদেশে গুরুত্বসহকারে উচ্চারিত হয়নি; দুই, তুর্কী-মুঘল বিজেতারা এখানে পরাক্রান্ত রাজশক্তি হিসেবে এসেছে, আরবদের মতো নবলব্ধ বিশ্বাস-চেতনায় দৃপ্ত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী মুযাহিদ বেশে আসেনি, তাই তুর্কী-মুঘলেরা দেশজ মুসলিমের সংখ্যা ও সমর্থন কাজে লাগালেও, তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি মুঘল আমলের শেষদিন অবধি, যেমন দেয়নি ইংরেজেরা দেশী খ্রীস্টানদের। ইরান ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান এসেছে এবং আনা হয়েছে ভাড়াটে সৈনিক ও কর্মচারী হিসেবে—এবং দেশী মুসলিম সিপাই উঁচু পদে নিয়োগ পায়নি। অবস্থা অবিকল ইংরেজ আমলের মতো ছিল বলে মনে হয়। খ্রীস্টানসংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহ থাকলেও ইংরেজরা দেশী খ্রীস্টানকে স্বজাতি বা স্বসমাজী বলে স্বীকার করেনি। রাজনীতির নিয়মে হিন্দু ও মুসলিমরা উঁচুপদ পেয়েছিল ; কিন্তু খ্রীস্টান বলে কেউ উঁচুপদ পায়নি, শাসকের অংশ বিলেতী লোকেই পেয়েছে। তিন, এমনও হতে পারে যে দেশজ মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ বিত্তের মানুষ বিরল ছিল। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে হাজার বছরের অবজ্ঞেয় জীবন জীবিকা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষদের উচ্চাভিলাষ, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও শক্তি বিলুপ্ত করেছিল। তাদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে তাদের কোন উল্লেখ্য কৃতি নেই। এদের কেউ কেউ মুন্সী-মোল্লা-কাজী-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-গোমস্তা-উকিল হয়েই কৃতার্থ হয়েছে। তাই গোটা ভারতে দেশী মুসলিমরা ইসলামী প্রেরণার প্রসাদ কিংবা সাম্রাজ্যিক শোষণজাত সম্পদ অথবা স্বাধীনতার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকেছে চিরকাল।

মুসলিমরা ইতিহাসপ্রিয় বলে সুনাম আছে। কিন্তু বাঙলাদেশের দুর্ভাগ্য তেরো শতক থেকে ষোল শতক অবধি বাঙলায় বসে কেউ বাঙলাদেশের রাজনীতিক ইতিহাস রচনা করেনি। মুঘল আমলেই কেবল বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হতে দেখি। তাও সর্বশেষ ইতিহাসে (রিয়াজুসসালাতিন ১৭৮৮ খ্রী.) ছাড়া কোনটাতেই বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না। আশ্চর্য স্বাধীন সুলতানী আমলের দুশ বছরের মধ্যে ইলিয়াসশাহী ও মাহমুদশাহী রাজত্বের স্বর্ণ যুগেও কোন একটি ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি। মুঘল-পূর্ব যুগের বলে কথিত অধুনালুপ্ত (তওয়ারীখ-ই বাঙ্গালা) ও পাণ্ডুয়ার পাণ্ডুলিপির (হ্যামিলটন-বুকানন উল্লিখিত) খবর জানা আছে বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বর্ণিত কালপরিসর কিংবা রচনাকাল অজ্ঞাত। এর কারণ হয়তো এই নদী-হাওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকীর্ণ বৃষ্টিবহুল ও আর্দ্র আবহাওয়ার এই বাঙলাদেশে—অবজ্ঞায় যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দোজখপুর আজ নিয়ামতপুর', রোজগারের লোভে যারা এসেছে, তারা কেউ এখানে দীর্ঘদিন বাস করেনি। ধনলিপ্সা ও অস্বস্তি তাদের মনমেজাজ হয়তো আচ্ছন্ন করে রাখত। তুর্কী আমলে এদেশে যে বিদেশী আসেনি, তার পরোক্ষ প্রমাণ মেলে রাজকার্যে-ব্যবসায়িক কর্মে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ও হিন্দু 'পাইক' বাহিনীর অস্তিত্বে। মুঘল আমলের মতো হয়তো উচ্চ শিক্ষিত ও বিদ্বান রাজপুরুষেরও অভাব ছিল এখানে। তাই এখানে বিদ্যাচর্চার তেমন কোন দরবারী ও নাগরিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রশাসনিক ভাষা ফারসিও ছিল শাসক-শাসিতের পক্ষে ও বিদেশী বিভাষা। আত্মপ্রকাশের পক্ষে ভাষাগত বাধা তুচ্ছ নয়। নইলে সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যোৎসাহী যে ছিলেন না তা নয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনেও বিদ্যানুরাগ বশে তাঁরাও দরবারে হিন্দু কবি-পণ্ডিত পুষতেন, মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞও রাখতেন। কাজেই ফারসিভাষী কবি-মনীষী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-লিখিয়ে থাকলে তাঁদেরও সমাদৃত ঠাঁই হত দরবারে। আর দেশজ মুসলিমের অধিকাংশই যে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধের সন্তান তা আজকাল কেউ অস্বীকার করে না। তাদের মধ্যে কখনো লেখাপড়ার ঐতিহ্য ও রেওয়াজ যে ছিল না তার প্রমাণ সে শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানে এখনো বিদ্যমান। আর বিদেশীর প্রবাসী-মনে স্থানীয় মাটি ও মানুষের মায়া কখনো জাগেনি বলে তারা ইরান মধ্য এশিয়ার অনুকৃত সংস্কৃতি নিয়েই ছিল তুষ্ট ও গর্বিত। উর্দু ভাষার উদ্ভবের পূর্ব-মুহূর্ত অবধি এদের মন ছিল অস্বস্থ ও অস্থির, চেতনা ছিল বহির্মুখী। আব্দুর রহমান, মালিক মুহম্মদ জায়সী, কুতবন, উসমান, মিয়া সাধন দেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু ভাবচিন্তা পুরোনো অধ্যাত্মবাদীর। দেশজ মুসলিমদের সমস্যাও তাই। দেশের ঐতিহ্য অস্বীকার করতে হচ্ছে, আদর্শিক ঐতিহ্যও অনায়ত্ত। একটি পরিত্যজ্য ; অপরটা অপ্রাপ্য। কাজেই তারা নিঃস্ব ও নিষ্ক্রিয়। বহির্মুখী দৃষ্টির উদ্ভবের অন্য কোন গভীর কারণও ছিল।

আমরা দেখেছি মদিনা থেকে সুলতান অবধি ইসলামের প্রসার ছিল অবাধ, জনগণ ইসলামে দীক্ষিত ; অমুসলিম প্রতিবেশীর অভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল হতে পারেনি। ফলে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিহার বা অস্বীকার করার গরজ বোধ করেনি তারা । কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের ইসলাম আর অবাধ গতিতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে প্রসার লাভ করেনি। ইসলাম বাধা পেল পাঞ্জাবে। ভারতে ইসলামের মোকাবেলায় ও প্রভাবে স্বাধিকারবঞ্চিত অস্পৃশ্যদের মনে যে চেতনা ও দ্রোহ জাগে, তার ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভক্তিবাদ ও সন্তধর্মের উদ্ভব হয়। এতে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ভাঙল বটে, কিন্তু ইসলামের প্রসারও রুদ্ধ হল। অতএব ভারতে দেশজ মুসলিমরা ও শাসকগোষ্ঠীরা ছিল নগণ্য সংখ্যালঘু। Minority Complex আত্মরক্ষণ বৃত্তির প্রেরণায় সংকীর্ণতা, বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির জন্ম দেয়। বহিরাগত ও দীক্ষিত মুসলিমের সংখ্যাল্পতাও এদেশের মাটি ও মানুষকে ভাবার প্রেরণা দিয়েছে, এক্ষেত্রে স্বধর্মী পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উপায়।

কাজেই ঐতিহ্যবিরহী দেশজ মুসলিমরা রইল দরবারী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর এদের মধ্যে যারা সাক্ষর মুন্সী-মোল্লা-কাজী-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী-উকিল তারাই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও মানস প্রভাবে 'সূফী' নামের দেশী যোগ-তন্ত্র-ভিত্তিক কায়াসাধন ও দেহাত্মবাদে আশ্বস্ত বোধ করে। এদের মধ্যে সৃজনশীলতা ছিল না কখনো, তাই মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অনুবাদ কিংবা অনুকরণ মাত্র। এবং এদের রচনায় লোকায়ত বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। তাই গ্রামবাসীই এ সাহিত্যের শ্রোতা, সাক্ষর গ্রামবাসী এর পড়ুয়া ও গাইয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশজ মুসলমানেরা বাঙলা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেছে প্রায় হিন্দুদের সমকালেই। তার কারণ তারা বাঙালী এবং ঐ ভাষা ব্যতীত তাদের অন্য কোন ভাষা জানা ছিল না। দীক্ষিত দেশজ সংখ্যালঘু মুসলমানরা নববৃত বিদেশী শাস্ত্র ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করে স্বাতন্ত্র্যলাভের আত্যন্তিক আগ্রহে সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর জ্ঞাতিত্ব ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য যে পরিমাণে সচেতনভাবে পরিহারে সচেষ্ট হয়, ঠিক সেই অনুপাতেই নিজেদেরকে আরব-ইরানী-তুর্কী-মুঘলদের জ্ঞাতি বলে ভাবতে আগ্রহী হয়। এতে তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীরও প্রয়োজনবুদ্ধি প্রসূত প্রশ্রয় এবং উস্কানি ছিল। স্বধর্মীর জাতীয়তাবোধের নিশ্চিত আশ্রয় ও প্রচ্ছায়া সংখ্যালঘুর স্বতন্ত্রসত্তার নিরাপত্তার জন্যেই তেমন অবস্থায় একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে। বাঙালী মুসলমানের এ প্রয়োজনবুদ্ধি এখনো প্রবল। দীক্ষা গ্রহণের মুহূর্তে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল ইসলামী আচারে আচরণে, রীতি-রেওয়াজে যথাসাধ্য নিষ্ঠ হওয়া এবং পূর্ব পুরুষদের তথা প্রতিবেশী 'কাফেরে'র সব কিছু ভোলার ও বর্জন করার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা করা। নইলে গোড়ার দিকের নগণ্য সংখ্যক দীক্ষিত মুসলিমের স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হত। আমরা আঠারো-উনিশ শতকে দেশী খ্রীস্টানদের এমনি প্রয়াস প্রত্যক্ষ করেছি। তারও আগে পর্তুগীজদের হাতে দীক্ষিত বাঙালীদের তেমনি উগ্র স্বাতন্ত্র্যচেতনার সাক্ষ্য দুর্লভ নয়। কোন শাস্ত্র অঙ্গীকার করলে প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, পোশাকে পার্বণে তা প্রকটিত হয়-ই। কাজেই নিরক্ষর নির্বিত্ত ও অপঙক্তেয় শ্রেণীর হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যচেতনা দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছিল,এবং অক্ষমের স্বাতন্ত্র্যচেতনা–আত্মোন্নয়নে নয়–বর্জনশীলতায় থাকে সীমিত। বাঙলা সাহিত্যচর্চায় এদের সেই বর্জনশীল মনই কাজ করেছে। আগেই বলেছি এরা সৃজনশীল ছিল না, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি Red Corss-কে Red Crescent বানিয়েছে। তুর্কী বিজয়ে আশ্বস্ত ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রপতির হুমকিমুক্ত সংখ্যাগুরু হিন্দু-জনগণ তাদের লোকায়ত বিশ্বাস ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য কথা উৎসবে-পার্বণে-আসরে, নাচ-গান-বাজনা সহযোগে অত্যুৎসাহে প্রচার করতে থাকে।

নবদীক্ষিত মুসলমানরা মানবিক রসতৃষ্ণা ছাড়াও একটা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াল। যে দেবতায় আস্থা হারিয়ে তারা ইসলাম বরণ করেছে, সে দেবকাহিনী শোনাতে নৈতিক শাস্ত্রিক বাধার অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিও ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্মমতও রাজনৈতিক মতের মতো দলীয় আনুগত্য, পরদল বিদ্বেষ ও পরনীতিতে অনাস্থা দাবি করে। বিদলীয় লোকমাত্রই পর, শত্রু ও আত্মসম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ রসপিপাসা তারও আছে। এদিকে আবার ধর্মকথার যথেচ্ছ প্রয়োগ ও ব্যবহার পাপজনক। শাস্ত্রকারেরা জীবিকাসম্পৃক্ত শ্রেণীস্বার্থেই এক্ষেত্রে অধিকারভেদ ও ব্যবহারভেদ সীমিত করে দিয়েছেন। শাস্ত্রের লিখিত তর্জমা করা পাপ, অন্যায়। যদিও মৌখিক তর্জমা চিরকাল চালু ছিল। কাজেই হিন্দুর মতো ধর্মকথার আসর করতে সাহস পেলনা তারা (যদিও কৃষ্ণ কথকতার আদলে মিলাদের-মহফিলের উদ্ভব হয়েছে পরে, —হরির লুটের অনুকরণে মিষ্টি বিতরণও মিলাদের অপরিহার্য অঙ্গ)। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হিন্দুর জলসা বর্জনের এবং নৃত্য-গীতি-বাদ্যের মানবিক চাহিদা পূরণের উপায়স্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষ মানবরসাশ্রিত বিষয় নিয়ে আনন্দের আয়োজন করল তারা। সে বিষয় হল রূপকথা-প্রণয় কথা। অবশ্য পরে 'রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্রে'র কাহিনীর আদলে আলেফ লায়লা, শাহনামা ও ইসলামের উন্মেষ-যুগের নামসার বীরদের কাল্পনিক প্রেম ও বীরত্বগাথা অবলম্বন করে তারাও আসর জমিয়েছে। আগেই বলেছি, এতে মৌলিকতা সামান্যই ছিল। এমনকি আঠারো শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে চৈতন্য-অপহরণের অনুকরণে ইমাম চুরির কাহিনীও রচিত হয়েছে (হাসান-হোসেন অপহরণ), জন্মাষ্টমী কাহিনীর অনুকরণে জন্ম মুহূর্তে মুহম্মদ হত্যার ষড়যন্ত্রও কল্পিত হয়েছে।

তবু নবদীক্ষিতের সতর্কতা ও সচেতনতা যখন কালপ্রবাহে বিলুপ্ত হয়, তাদের সংখ্যাও গাঁয়ে গাঁয়ে বৃদ্ধি পেল এবং minority complex-ও তীব্রতা হারাল, তখন মুসলিমরা হিন্দুর আসরে দেব-ধর্ম-কথা, পুরাণ প্রসঙ্গ, রামায়ণ কথা ও মহাভারত কাহিনী প্রভৃতি শুনেছে এবং পড়েওছে :

"কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু-মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ ন সোঙরে।
গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল।"

— (নবীবংশ। সৈয়দ সুলতান)

তারই নিদর্শন মেলে মুসলিম রচিত সাহিত্যে, প্রযুক্ত উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় ও প্রাসঙ্গিক বর্ণনায়। মধ্য যুগের মুসলিম রচিত সাহিত্যের অধিকাংশ মিলেছে চট্টগ্রামে। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় শতক থেকে চট্টগ্রাম প্রায়ই হরিকেল কিংবা আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। ফলে বাঙলাদেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল স্বভাষী ও স্বধর্মীর বৃহত্তর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। বিদেশী বিভাষী বিধর্মী আরাকানী শাসনে তাদের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার গরজেই তাদের ভাষাসাহিত্য ও শাস্ত্রসংস্কৃতির পরিচর্যার ও অনুশীলনের দায়িত্ব তারা সচেতন ভাবেই গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ পরিবেশে যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা সমাজের মধ্যে আমরা এমনি স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও তজ্জাত রক্ষণশীলতা, ঐতিহ্যানুসরণের প্রবণতা ও স্বভাষা-সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অনুশীলনে প্রযত্ন দেখতে পাই। একই সময়ে ভারতের অন্যত্র মুসলিমরা ফারসিতে এবং বিশেষ করে ফারসির মিশ্রণে গড়ে তোলা ও ফারসি হরফে লেখা দাখিনী ও উত্তর ভারতীয় উর্দুভাষায় সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চা করে। কিন্তু বিধর্মী শাসনে চট্টগ্রামবাসীর কিংবা ত্রিপুরারাজ্যভুক্ত কুমিল্লা-নোয়াখালীবাসীর সে-সুযোগ ছিল না। তাই তারা স্ব স্ব দেশীভাষার মাধ্যমে আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। এইজন্যে চট্টগ্রাম বিভাগ ও রোসাঙ্গে রচিত বাঙলা সাহিত্যের বহুল চর্চা দেখতে পাই।

॥ ২ ॥

খ. বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস

মুসলমানেরাই যে এদেশে মানবিক-রসাশ্রিত সাহিত্যধারা প্রবর্তন করেন, এ তথ্য এখন আর কারুর কাছেই নতুন নয়। পূর্বোক্ত কারণ ছাড়াও এটি হচ্ছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের পরিচয় একই সূত্রে ও একই সময়ে ঘটলেও প্রভাবের তারতম্যও ঘটেছে বিস্তর। অপেক্ষাকৃত সংস্কারভারমুক্ত একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি স্বীকরণে সহায়তা করেছে প্রচুর, কিন্তু সংস্কার-পঙ্গু হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাই মুসলমানেরা যখন আধুনিক সংজ্ঞার 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' সৃষ্টি করেছিল, তখনও হিন্দুরা দেবতা ও অতিমানব-জগতের মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। চর্যাকার থেকে কবিওয়ালা অবধি হিন্দুর হাতে দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মীয় প্রচার সাহিত্যই পেয়েছি। ধর্মভাব জাগানো এর লক্ষ্য—সাহিত্যশিল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আনুষঙ্গিক রূপ এবং সাহিত্যরস এর আকস্মিক ফল। অপর দিকে মুসলমানদের হাতে বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হতে থাকে।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক রস বা মানবতা। একালে 'মানবতা' বলতে যা বোঝায়, এ কিন্তু তা নয়। এ মানবতা 'মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা'ই নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিস্ময়-চঞ্চল কল্পচারী মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানসসৃষ্ট দেবদানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতূহল চোখে-দেখা মানবমুখী হয়ে ওঠে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল, মানুষকেও জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ন ও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোন সীমারেখা স্বীকৃত নয় এ লোকে। নদী-নগরী, গিরি-মরু-কান্তার, আকাশ-মাটি-সাগর ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দেব-দানব রক্ষঃ-যক্ষের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ। বাহুবল, মনোবল আর বিলাসবাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে প্রকটিত।

সংস্কৃতেতর ভারতিক ভাষায় প্রথম বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শালীন রচনা হচ্ছে আবদুর রহমানের 'সংনেহয়-রাসয়' বা 'সন্দেশ রাসক'। এটি হচ্ছে একটি দূতকাব্য এবং বারো শতকে অপভ্রংশে বা অবহট্‌ঠে রচিত। মুলতানবাসী কবি আবদুর রহমান তাঁতী মীর হোসেনের সন্তান।[১] অতএব দেশজ মুসলমান।

অপভ্রষ্টে বা অবহট্‌ঠে রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'পৃথিরিয়ার রাসউ' বা 'পৃথ্বীরাজ রাসক'। এর রচয়িতা চন্দ বলিদ্দ বা চন্দ বরদাই। জনপ্রিয়তার ফলে ভাষা ক্রমে আধা-হিন্দিতে রূপান্তরিত হওয়ায়, এটি কালে আদি হিন্দি কাব্যরূপে প্রখ্যাত হয়।[২] এই দুটোই 'দিওয়ান' জাতের কাব্য। আনন্দ ধর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মিশ্রিত কাব্য 'মাধবানল-কামকন্দলা'ও এখানে উল্লেখ্য।

এদিকে দাক্ষিণাত্যে তেলেগু ভাষাতে দণ্ডীর সংস্কৃত 'দশকুমার চরিত'-এর তেরো শতকে কৃত একটি পদ্যানুবাদ পাওয়া গেছে।[৩] পাঞ্জাবী লৌকিক ভাষায় রচিত গানের আদি নিদর্শন মিলেছে শিখ গুরু অর্জুনের আদিগ্রন্থে। এ অধ্যাত্ম সঙ্গীত রচনা করেছেন নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মুর্শিদ সাধক কবি শেখ ফরীদুদ্দীন শক্করগঞ্জ (মৃঃ ১২৬৭ খ্রীঃ)।[৪] হিন্দি ভাষায় প্রথম কবি লোদী-দরবারের আমীর খুসরু (১২৫৪-১৩২৫ খ্রীঃ)। ইনি হিন্দিতে কবিতা, গান ও প্রহেলিকা রচনা করেছেন।

কবি দামোর 'লক্ষণ সেন পদ্মাবতী কথা' রচনার কাল নিয়ে মতভেদ আছে। রচনা গুরুর কাল কারুর মতে ১৫২৬ সংবৎ তথা ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ, আবার কেউ কেউ মনে করেছেন ১৫৭০ সংবৎ বা ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দ।[৫] এটি উপাখ্যান। শাহ ফিরোজ তুঘলকের আমলে মালিক্ নাসিরের আদেশে লোককথা ভিত্তি করে হিন্দি মস্‌নবী 'চান্দাইন' রচনা করেন কবি মোল্লা দাউদ। রচনা সন ৭৮১ হিজরী বা ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ।

---

১. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : পৃ. ১।
খ. ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃঃ ২।

২. ক. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : পৃঃ ১।
খ. ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃঃ ২।

৩. ক. বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী, পৃঃ ১।

৪. History and Culture of the Indian people : Vol v,p 377.

৫. ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য : পৃঃ ৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি সূফী কবির তত্ত্বরসাত্মক মরমী গাথা।[৬] কিন্তু মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ'ও হয়তো দাউদের মস্‌নবীর পরেরকার রচনা নয়। এ অনুমানের সমর্থন মিলেছে ৯১১ হিজরী বা ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে লেখা মানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তিতে।[৭]

অনুলিপিই যখন ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের, তখন মূল রচনার তারিখ নিঃসংশয়ে অনুমানে বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়। পনেরো শতকের প্রথমার্ধের সিদ্ধি মরমী কবি সাধন আর 'মৈনাসৎ'-এর কবি মিয়া সাধন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করবার কারণ নেই। সাধন পূর্ব-উত্তর ভারতের কবি, এবং ভাষা ঠেঠ-হিন্দি (ভোজপুরী-অবধী?)। সাধন ভগৎ যদি এ কাব্যের রচয়িতা হতেন, তাহলে সিদ্ধি কবির হিন্দি বিশুদ্ধতার হত। অবশ্য 'মৈনাসৎ'ও অধ্যাত্মরূপক কাব্য। লোর চান্দাইনের অপর কবি সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (১৫২৫ খ্রী.) ও তুতিনামা (১৬৪০) রচয়িতা গাওয়াসি, ইনি গোলকুণ্ডার সুলতান আব্দুল্লাহ কুতুব শাহর দরবারে ছিলেন।

লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যানের পরে রচিত হয় অধ্যাত্ম রূপকাশ্রিত আখ্যায়িকা 'মৃগাবতী'। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আশ্রিত জৌনপুরের শর্কী সুলতান হোসেন শাহর সভাকবি কুতবন ৯০৯ হিজরী বা ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এটি রচনা করেন :

নউ সউ নব জব সংবত অহী।
[জব] মোহর্‌রম চান্দ উজিয়ারী
য়হ কবি কহী পূরী সংয়ারী
গাহা দোহা অবেল অরজ
সোরঠা চৌপছ কই সরজ
সান্তর অখির বহুতই অনিয়ে
অউ দেসী চুনি চুনি কহিলায়ে।

[সুকুমার সেনের পাঠ : ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য]

অএতব, এটিও লোককাহিনী ভিত্তিক। আঠারো-বিশ শতকের কোন কোন বাঙলা উপাখ্যানে মৃগাবতীর অনুসরণ আছে। উনিশ শতকের কবি মহম্মদ মুকিম মৃগাবতী বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু এ কাব্য আজও পাওয়া যায়নি।

এর পরে লোকসাহিত্যের জনপ্রিয় পুরোনো উপাখ্যান নিয়ে রূপাকাশ্রিত 'মাধবানল-কামকন্দলা' কাব্য রচনা করেন গণপতি (১৫২৭ খ্রী.)। কুতবন প্রভাবিত জায়সীর 'পদুমাবৎ' রচিত হয় ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে। 'পদুমাবৎ' রূপকাশ্রিত হলেও অতি উৎকৃষ্ট কাব্য।

অতএব, সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশেতর ভারতিক আর্য ভাষায় পনেরো শতকের আগে রচিত ধর্মনিরপেক্ষ উপাখ্যান একটিও নেই। পনেরো শতকের শেষার্ধের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় মাত্র একটি। সেটি মোল্লা দাউদের মরমী গাথা চান্দাইন (১৪৮০ খ্রী.) ; এবং এ-সময়কার বলে অনুমান করা যায় আরো দুটো : দামোর 'লক্ষণ সেন-পদ্মাবতী কথা'/(১৫৪৯ খ্রী.?) এবং মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' (১৫৭০-৮০ খ্রী.) আর সাধারণভাবে তেরো শতকের আগেকার রচনার কোন নিদর্শনই বাঙলায় ছাড়া [শেখ শুভোদয়ায়] অপর কোন আধুনিক ভারতিক আর্য ভাষায় মেলেনি। সেদিক দিয়ে দেখলে চর্যাগীতি যেমন দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে

---

৬ বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দি অবধী পটভূমি : মমতাজুর তরফদার : বাংলা একাডেমী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা : পৃঃ ৭-১৫।

৭. বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী অবধী পটভূমি : পৃঃ ১৪-১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্বাচীনতম অবহট্‌ঠ ভাষার আদি নমুনা, তেমনি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী.) ইউসুফ জোলায়খাই আদি প্রণয়োপাখ্যান। কেন না, কবি দাউদের 'চান্দাইন' অধ্যাত্ম তত্ত্বরসাশ্রিত মসনবী কাব্য আর দামো ও সাধনের কাব্যের রচনা কাল অনিশ্চিত। নতুন নতুন তথ্যপ্রমাণ না মেলা অবধি আমাদের এ মতই পোষণ করতে হবে। চর্যাগীত যেমন ভারতিক ভাষাজগতে সন্ধিযুগের স্মারকস্তম্ভ, তেমনি 'ইউসুফ জোলায়খা'ও রোমান্টিক সাহিত্যের গৌরব মিনার।

ভারতের তুর্কী-মুঘল অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এবং ঐ দু'টোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

বাঙালী মুসলমান রচিত সাহিত্য মূলত অনুবাদ সাহিত্য। ফারসি-হিন্দি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে রোমান্টিক সাহিত্য এবং আরবি-ফারসি থেকে অনূদিত হয়েছে ধর্ম ও যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ। অনুবাদ ছিল তিন প্রকারের : কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অর্থাৎ আক্ষরিক, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবালম্বন।

ফারসী প্রণয়োপাখ্যানগুলো (কোন কোন হিন্দি আখ্যায়িকাও) প্রধানত সূফীতত্ত্বের রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানরূপেই। তত্ত্বকথাকে এভাবে রসকথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে জীবনবাদী বাঙালী মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে। চর্যা-বাউল-বৈষ্ণব-মুর্শিদী প্রভৃতি অধ্যাত্মগীতির উর্বরক্ষেত্র বাঙলায় এ মানবিক রসপ্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ অর্থপূর্ণ।

সে-যুগের হিসেবে বাঙলা রোমান্টিক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্য বিচিত্র নয়। চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ অবধি তার ইতি ঘটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ, আর ভাবে ও ভঙ্গীতেও বৈশিষ্ট্যহীন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ওসব রচনার আর কোন সাহিত্যিক মূল্যই নেই এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো শতক অবধি রচিত ও জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি।

চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলায়খা'। ষোল শতকে পাচ্ছি দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহবারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে : দোনা গাজীর 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল', 'সপ্তপয়কর', 'রতন-কলিকা-আনন্দ-বর্মা', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আব্দুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুলমুলুক', 'ইউসুফ জোলেখা', নওয়াজিশ খানের 'গুলে বকাউলী' পরাওলের 'শাহপরীর কেচ্ছা', মঙ্গল চাঁদের 'শাহজালাল-মধুমালা' (এতে মঙ্গল-কাব্যের মর্মগত অনুকৃতি আছে), সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মুলুক-সামারোখ', শরীফ শাহর 'লালমতী সয়ফুল মুলুক' আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে খলিলের 'চন্দ্রমুখী', মুহম্মদ আব্দুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', রফিউদ্দিনের 'জেবল মুলুক সামারোখ', শাকের মাহমুদের 'মধুমালা-মনোহর', নুর মুহম্মদের 'মধুমালা', রামজয়ের 'শশিচন্দ্রের পুঁথি', দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী', গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ-জোলেখা',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সোনাভান', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রজার 'তমিমগোলাল চৈতুন্ন সিলাল', 'মিশরী জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ পরী-মালিক জাদা', 'হাসান বানু', আব্দুর রজ্জাকের 'সয়ফুল মুলুক লালবানু', শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ', মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহরাম গোর', 'কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি।

৪

শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীরকে [সগিরী ভণিতাও মেলে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে] আমরা আজ অবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাঙলা কাব্যের কবি বলে বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয়। একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাজপ্রশস্তির নিম্নলিখিত অংশটুকু পেয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। যে-কেউ এখনো দেখতে পারেন, পাণ্ডুলিপি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে।

পয়ার ছন্দ

তিরতিএ পরনাম করোঁ রাজ্যখ ইশ্বর
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।
রাজরাজ্যেশ্বর মৈদ্ধে ধার্ম্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত।
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার
মহা নরপতি গেছ পিরিথিবীর সার।
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ
পুত্র সিস্য হন্তে তিঁহ মাগে পরাজএ।
মোহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ।
করুনা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ততর
সবগুনে অসীম অতুল্য মনুহর।
পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর।
রমনী বল্লভ নির্পরসে অনুপমা
কনে বা কহিতে পারে সেগুন মহিমা।
জিনিলা নৃপতি সব করিআ সমর
জএ বাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর।
ভক্ত বৎসল নির্প বিপক্ষ বিনাস
পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস।
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম
তাত ভক্তি বিনা 'ধিক নাহি আর ধাম।
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. একটি সংস্কৃত আপ্তবাক্যের অনুবাদ আছে এখানে 'সর্বত্র জয়ম ইচ্ছতে, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম'। আমরা জানি, গৌড় সুলতান সিকান্দর শাহর বিদ্রোহী পুত্র ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী.)। সোনারগাঁয়ে পিতা-পুত্রের যুদ্ধে পিতা নিহত হন। ফলে সোনারগাঁও কেন্দ্রী বঙ্গালের (বঙ্গ) এবং গৌড়ের অধীশ্বর হন আজম শাহ। কবি জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের সাহায্যে বিদ্রোহী ও পিতৃহন্তা পুত্রের কলঙ্ক তোয়াজের ভাষায় যোগ্যপুত্রের সুকৃতি রূপে বর্ণনা করেছেন। শেখ এ. টি.এম. রুহুল আমিন (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃ: ৬৫৪-৫৭) মনে করেন এই 'গেছ' আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ ১৫৫৬-৬০ খ্রী.। এঁর পিতা শামসুদীন মুহম্মদ গাজী আদিল শাহ শুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তিনিই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে হৃতরাজ্য ও হৃতগৌরব পিতার যোগ্য কীর্তিমান পুত্ররূপে কীর্তিত হয়েছেন। হতরাজ্য পিতার পরাজয়ের গ্লানি ও লজ্জা স্মরণ করিয়ে পুত্রকে কি খুশি করা যায়, না অপমান করা ও লজ্জা দেয়া হয়? কবি বোকা বর্বর না হলে এমন তুলনায় তোয়াজ করবেন না। কিন্তু নানা কারণে এ মত গ্রহণীয় নয়।

২. সব শাহ-সামন্তই চিরকাল নারীবিলাসী। রমণীবল্লভ বলে উল্লেখের বিশেষ কারণ হচ্ছে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সরব, গুল ও লালা নামের তিন প্রিয় বেগম ছিলেন যাঁরা তাঁর পূর্ব নির্দেশমতো মৃত্যুর পর তাঁর শব স্নান করিয়ে কাফন পরিয়েছিলেন।

৩. 'বঙ্গাল' ও 'গৌড়'—শাসনকেন্দ্র হিসেবে পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করার মধ্যেও ১৩২২ খ্রীস্টাব্দ পরবর্তী এবং ১৪১০ খ্রীস্টাব্দ পূর্বকাল অনন্ত আফগান (১৫৩৮ খ্রীঃ) বা মুঘল বিজয় (১৫৭৫ খ্রীঃ) পূর্বকালই নির্দেশ করেছে। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর মৃত্যুও ঘটে সোনারগাঁয়।

৪. 'আল্লাহ' অর্থে ধর্ম শব্দের কাব্যে বহুল ব্যবহার প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচায়ক, পরে মুসলিম রচনায় নিরঞ্জন এবং আরো পরে (কর্তার) 'করতার' ব্যবহৃত হয়েছে। ষোল শতকে কেবল দৌলত উজির 'ধর্ম' ব্যবহার করেছেন।

৫. নবী বা শাস্ত্র-সম্পৃক্ত মুসলিম-ইতিকথার বাঙলা ভাষায় রূপায়ণে-পাপভীতি ষোল শতক অবধিই মুসলিম কবির মনে প্রবল ছিল (পূর্ব অধ্যায়ে ভাষাবিদ্বেষ দ্রষ্টব্য)

৬. এ কাব্য যে জামীর 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যের অনুবাদ নয়—কিংবা ছায়া অবলম্বনে অথবা অনুকরণে রচিত নয়, তা কাহিনীর শেষাংশে ভারতীয় রাজকন্যার সঙ্গে ইবনে আমিনের বিবাহ বর্ণনায় নয় কেবল, গোটা কাব্যেই নানা প্রসঙ্গে দেশী পরিবেশ বর্ণনা ও মৌলিক উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেই সুপ্রকট। কবি কিতাব-কোরআন দেখে কাব্য রচনা করেছেন বলে যখন স্বীকারই করেছেন, তখন জামীর কাব্যই আদর্শ হলে জামীর নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। জোসেফের কাহিনী Old Testament-এ বিস্তৃতভাবে (১৪ অধ্যায়ে) বর্ণিত রয়েছে, বাইবেল ও কোরানের মৌল কাহিনীতে তুচ্ছ কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। বাইবেলেও জোলেখার নাম নেই, প্যাটিফারার স্ত্রী বলেই উল্লিখিত। কোরআনেও জোলায়খার নাম নেই এবং 'আজিজের স্ত্রী 'সেই নারী' বলে ঘৃণার সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে মোট ৯৭টি আয়াতে কাহিনীর মূল কাঠামো মেলে, কিন্তু এ কাহিনী মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে অন্যূন তিন হাজার সাতশ বছর ধরে উত্তর আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে আবাল্যশ্রুত লোকপ্রিয় ঘরোয়া কিস্‌সায় পরিণতি পায়। ইসলামের প্রসারে, সূফীমতের জনপ্রিয়তায় ও দরবারী ভাষা হিসেবে ফারসীর বহুল প্রসারে লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ ও 'ইউসুফ-জোলেখা' কাহিনী সূফীর জীবাত্মা-পরমাত্মার তথা আল্লাহ্-বান্দার সম্পর্কের রূপক ও প্রতীক কাহিনী হিসেবে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই মুখে মুখে স্ফীত কলেবর ও চালু কিস্‌সা অবলম্বনে কাব্য রচনা এমন দুরূহ কর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, উল্লেখ্য যে এ শতকেও জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান 'জোসেফ এ্যাণ্ড হিস ব্রাদারস' নামে বিপুলকায় উপন্যাস রচনা করেছেন—যা এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিশেষত কিস্সার কয়েকটি মূল-ঘটনা সর্বত্র অবিকৃত রয়েছে—যেমন জ্যাকোব-নবীর দুই পত্নীর গর্ভজাত (এগারো আর দুই) তেরো সন্তানের মধ্যে জোসেফের প্রতি পিতার আত্যন্তিক স্নেহ, ঈর্ষ্যা বৈমাত্রেয় ভাইদের তাকে হত্যার চেষ্টা, পরে কূপে পাতন, রক্তমাখা জামা নিয়ে পিতাকে প্রদর্শন, সওদাগর কর্তৃক কূপ থেকে ইউসুফের উদ্ধার, মিসরে চড়া দামে তাঁর বিক্রয়, আজিজ মিসির পত্নীর রূপতৃষ্ণা ও অসম্মত ইউসুফের নির্যাতন, পৃষ্ঠাংশে ছিন্ন জামাই সত্য ঘটনার নির্দেশক, ইউসুফের অতুল্য কায়াকান্তি ও নরনারীদের অভিভূতি, লেবু কাটতে আঙ্গুল কর্তন, রাজার স্বপ্নদর্শন ও ইউসুফ কর্তৃক স্বপ্ন ব্যাখ্যা, ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্যে খাদ্য মৌজুদকরণ প্রভৃতি সর্বত্র অভিন্ন। কাজেই গল্পের মূল কাঠামো জানার জন্য কোন কাব্য-কেতাব দেখার প্রয়োজন ছিল না। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ কোরআনে ও ফেরদৌসীর রচনায় মেলে। এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সৈয়দ সুলতানও বলেন :

শুনিছ এ সব পরস্তাব সর্বজনে
পদবন্ধে মুঞি না কহিলুঁ তেকারণে।' (নবীবংশ)

কবি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়েছেন ও তাঁর অবলম্বিত আকর গ্রন্থের উল্লেখও করেছেন—কিতাব কোরান মধ্যে দেখিনুঁ বিশেষ/ইছুফ জুলিখা কথা অমিয় অশেষ/কহিব কিতাব চাহি সুধারস পূরি।–এখানে 'কিতাব' কোরান মাঝে দেখিনুঁ এবং 'কিতাব চাহি'-ও লক্ষণীয় অর্থাৎ ভাব বা ছায়াবলম্বন–অনুবাদ নয়।

৭. শাহ মুহম্মদ সগীর যে রাজকর্মচারী ছিলেন এবং রাজদরবারের আদব-কায়দা সম্বন্ধে যে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল তাও কাব্যসূত্রে প্রমাণিত [রাজদর্শনের কায়দা দ্রষ্টব্য]।

৮. কাব্যের ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীন রূপ মেলে। উদ্ধৃতাংশেও কিছু মিলবে।

৯. সতেরো শতকের কবি রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিম জামীর অনুসরণে ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেছেন, আঠারো শতকে করেছেন মঙ্গল কাব্যের আদলে ফকির গরীবুল্লাহ। এঁদের তিন কাব্যে পার্থক্য সুপ্রকট। এ সব নানা কারণে আমরা শাহ মুহম্মদ সগীরকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম কাব্যের রচয়িতা বলে বিশ্বাস করি।

১০. ১০৯৪ মঘী বা ১৭৩২ সনে লিপীকৃত পুথির কোন কোন ভণিতায় সগিরি মেলে। শাহ মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ ভণিতাও রয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর-এর মূল নাম হয়তো মোহাম্মদ, কোন 'সগীর' পীরের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে হয়তো নামের সঙ্গে রিযবী, নকবী, ওসমানী, খালেদী, সোহরওয়ার্দী, চিস্তি, নিযামী প্রভৃতির মতো 'সগিরী' যুক্ত করেছেন। অথবা উক্ত পাণ্ডুলিপিতে সগীর লিপিকার প্রমাদে 'সগিরী' হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত কোন পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর শাহ উপাধি থেকে মনে হয় তিনি পীর-পরিবারে জন্মেছিলেন এবং হয়তো নিজেও পীর' ছিলেন। সগীরের কাব্যে বর্ণিত বিষয়সূচী নিম্নরূপ–

কাব্যে বর্ণিত বিষয়সূচী : ১. আল্লাহ ও রসুল স্তুতি ২. মাতাপিতা ও গুরু বন্দনা ৩. রাজ বন্দনা ৪. গ্রন্থোৎপত্তি ৫. তৈমুস রাজার কন্যা জোলেখার জন্মবৃত্তান্ত ৬. জোলেখার রূপ ৭. জোলেখার আভরণ ৮. জোলেখার প্রথম স্বপ্ন ৯. জোলেখার প্রেমোন্মেষ ১০. জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন ১১. জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি ১২. জোলেখার স্বপ্নাবির্ভূত পুরুষের অনুধ্যান ১৩. জোলেখার বিরহবিকার ১৪. জোলেখার তৃতীয় স্বপ্ন ১৫. জোলেখার স্বপ্নের বাস্তবায়ন মানসে স্বয়ম্বরের আয়োজন ১৬. তৈমুসরাজ কর্তৃক মিশরে দূত প্রেরণ ১৭. জোলেখা ও আজিজ মিসিরের সাক্ষাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. জোলেখার বিড়ম্বিত জীবনের শুরু ১৯. জোলেখার আক্ষেপ ২০. জোলেখার প্রার্থনা ২১. জোলেখার বিলাপ ২২. জোলেখার আকাশবাণী শ্রবণ ২৩. জোলেখা ও আজিজ মিসিরের বিবাহ ২৪. বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা ২৫. জোলেখার নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা ২৬. জোলেখার যন্ত্রণাক্লিষ্ট বারবাসী ২৭. ইউসুফের জন্ম ২৮. আষা প্রাপ্তি ২৯. ইউসুফের স্বপ্ন দর্শন ৩০. ভাইদের সঙ্গে বনে গমন ৩১. ভাইদের দ্বারা নির্যাতিত ও কূপে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ ৩২. ইয়াকুব নবীর পুত্রশোক ৩৩. মনিরু সাধুর হাতে ইউসুফের উদ্ধার ৩৪. আজিজ মিসিরের কাছে ইউসুফকে বিক্রয়ের আয়োজন ৩৫. জোলেখার মূর্ছা ৩৬. ধাত্রীর প্রতি জোলেখার নিবেদন ৩৭. ইউসুফকে জোলেখা কর্তৃক ক্রয় ৩৮. ইউসুফ দর্শনে বারেহা সাধু কন্যার তত্ত্বজ্ঞান লাভ ৩৯. জোলেখা কর্তৃক ইউসুফকে বশ করবার ব্যর্থ প্রয়াস ৪০. ইউসুফে কামভাব দানে ধাত্রীর প্রয়াস ৪১. ইউসুফে কাম উদ্রিক্ত করাবার জন্যে জোলেখার টঙ্গীসজ্জা ৪২. সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে ইউসুফকে আনয়ন ৪৩. সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে জোলেখার আর্তি প্রকাশ ৪৪. ইউসুফের নিকট জোলেখার যৌবন নিবেদন ও সম্ভোগে আহবান ৪৫. প্রত্যাখ্যাতা জোলেখার প্রতিহিংসা ৪৬. তিন মাসের শিশুর সাক্ষ্যে জোলেখার কলঙ্ক প্রচার ৪৭. কলঙ্ক স্খালনে জোলেখার ব্যর্থ প্রয়াস ৪৮. জোলেখা কর্তৃক কারারুদ্ধ ইউসুফের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ৪৯. জোলেখার অনুশোচনা ৫০. ইউসুফ সন্দর্শনে জোলেখার কারাগারে গমন ৫১. ইউসুফ কর্তৃক রাজার স্বপ্ন ব্যাখ্যা ৫২. ইউসুফের কারামুক্তি ৫৩. ইউসুফের আজিজ মিসির পদ লাভ ৫৪. ইউসুফের রাজত্বকালে জোলেখার যৌবনাবসান, বার্ধক্য ও অন্ধত্ব ৫৫. জোলেখার যৌবন প্রাপ্তি, ইউসুফের সঙ্গে বিবাহ ও বাস ৫৬. জোলেখার দুইপুত্র লাভ ৫৭. মিসরে দুর্ভিক্ষ ৫৮. ধান ক্রয়ের জন্যে কেনান থেকে ইউসুফের ভাইদের মিসরে আগমন ৫৯. স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও ইবনে আমীনকে নিয়ে পুনরাগমন ৬০. সহোদর ইবনে আমীনের সঙ্গে ইউসুফের পুনর্মিলন ও অতীত কাহিনী শ্রবণ ৬১. চুরির অপবাদে ইবনে আমীনকে মিসরে ধরে রাখা ৬২. পিতা ইয়াকুবের মিসর আগমন ও পিতা-পুত্রের মিলন ৬৩. ইউসুফের পুত্রদ্বয়ের বিবাহ ও রাজ্যভোগ ৬৪. ইউসুফের দিগ্বিজয় ও রাজস্বের পদ লাভ ৬৫. ইউসুফের মৃগয়া যাত্রা এবং মধুপুররাজ শাহবাল-কন্য বিধুপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৬. গন্ধর্বরাজ শাহবাল প্রসাদে ইবনে আমীন কর্তৃক বিধুপ্রভা দর্শন ৬৭. বিধুপ্রভার সঙ্গে ইবনে আমীনের বিবাহ ৬৮. ইউসুফের মিশরাগমন ৬৯. মধুপুরে ইবনে আমীন ও আত্মীয়দর্শনে সস্ত্রীক মিশর গমন ৭০. মধুপুরে ইবনে আমীনের রাজা হয়ে স্থায়ীভাবে বাস।

ধর্মপ্রচারই নবীর প্রধান দায়িত্ব—এ চেতনাবশেই সগীর স্বধর্মপ্রচারার্থ ইউসুফের দিগ্বিজয় কাহিনী যোজনা করেছেন, আবার কালোপযোগী রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি একটি রূপকথা দিয়ে কাব্য সমাপ্ত করেছেন। এ রূপকথার উপক্রম হিসেবে কবি অবতারণা করেছেন দিগ্বিজয়ী রাজা ইউসুফের মৃগয়া বিলাসের। মৃগয়া কালে ইউসুফ দেখলেন এক দ্রুতগামী আশ্চর্য পশুকে। তারই পিছু নিয়ে পৌঁছিলেন গভীর অরণ্যে এক সরোবর তীরে। সেখানে মন্দিরে পূজো দিতে এসেছিল মধুপুরের গন্ধর্ব রাজ শাহবালের কন্যা বিধুপ্রভা। তার কণ্ঠের সঙ্গীতসুরে আকৃষ্ট হয়ে ইউসুফ গেলেন তার সন্ধানে। পরিচয় হল উভয়ের। বিধুপ্রভা জানাল যে স্বপ্নে সে এক নবীপুত্রের প্রতি আসক্তা হয়েছে। ইউসুফ তাকে ইবনে আমীনের কথা বলে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বিধুপ্রভার পোষা শুকের দৌত্যে ও ইউসুফের আহবানে ইবনে আমীন এল শাহবাল প্রাসাদে। সেও জানাল যে স্বপ্নে গন্ধর্ব রাজকন্যা প্রেমবাণে তার হৃদয় বিদ্ধ করেছে অনেক আগেই। কাজেই মহাড়ম্বরে স্বয়ংবরা হল বিধুপ্রভা। আমীন এমনি করে পেল রাজকন্যা ও রাজ্য। কেননা শাহবাল ছিলেন অপুত্রক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউসুফের অনন্য সততা, সংযম, তিতিক্ষা ও ক্ষমা এবং রূপবহ্নির শিকার প্রবৃত্তিপরবশ জোলেখার প্রথমে সম্ভোগস্পৃহা ও পরে কৃচ্ছসাধনা এবং পরিণামে প্রেমিক নারীর কষিত কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যে ও অকৃত্রিমতায়, পদ্মের পবিত্রতায় এবং গোলাপের রূপে গন্ধে উদ্ভাসন এ কাব্যকে শাস্ত্রগ্রন্থের মহিমা দান করেছে। কবির লক্ষ্যও ছিল তাই। সেজন্যে কবি গোড়াতেই বলেছেন—

কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি
শুনহ ভক্তজন শ্রুতিঘট ভরি।
একচিত্তে শুনে যে এসব পরস্তাব
পুণ্য বাড়ে দুঃখ হরে যশ কৃতি লাভ।

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ ফিরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্যে কাহিনীগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন।[১]

১. শৈশবাবস্থায় ইউসুফ ফুফুর গৃহে পালিত হন—এ ঘটনা ফিরদৌসী ও জামীর কাব্যে আছে, সগীরের কাব্যে নেই।

২. ইউসুফ সম্পর্কে ইয়াকুব নবীর স্বপ্নের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে, জামী ও সগীরের কাব্যে নেই।

৩. ফিরদৌসী লিখেছেন ইউসুফ পরপর তিন বছর তিনবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জামী ও সগীর তার একবার স্বপ্নের কথা বলেছেন।

৪. মায়ের কবর দেখে ইউসুফের ক্রন্দন, বণিকের তিরস্কার, কাফেলার ব্যাতাহতের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে, জামী ও সগীরের কাব্যে নেই।

৫. জোলেখার জন্মবৃত্তান্ত, স্বপ্নবৃত্তান্ত, আজিজের সহিত তাঁর বিবাহবৃত্তান্ত ইত্যাদির বর্ণনা জামী ও সগীরের কাব্যে আছে, ফিরদৌসী এর কিছুই উল্লেখ করেন নি।

৬. ইউসুফের দাসরূপে নিলামে বিক্রয় স্থলে এক তকলি সুতা নিয়ে খরিদের আশায় এক বৃদ্ধার উপস্থিত হওয়ার কথা জামী ও সগীরের কাব্যে আছে, ফিরদৌসীর কাব্যে নেই।

৭. এক শ্রেষ্ঠী কন্যার প্রণয়াসক্তি এবং ইউসুফের উপদেশে বিরত হওয়া ও তত্ত্বধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কথা জামী ও সগীর বর্ণনা করেছেন। ফিরদৌসীর কাব্যে এরূপ ঘটনা নেই।

৮. জনৈক বেদুঈনের সাহায্যে পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে। কিন্তু জামী ও সগীর তা উল্লেখ করেন নি।

৯. জোলেখার গর্ভে ইউসুফের দুই পুত্র লাভের কথা কেবল সগীরের কাব্যে আছে।

ইবনে আমিন এবং বিধুপ্রভার প্রণয়-পরিণয় বৃত্তান্ত সগীরের নিজস্ব কল্পনা, ফারসি কাব্যে তা নেই।

॥ কাব্য পরিচিতি ॥

ধর্মোপদেশ দানই ছিল এ কাব্য রচনার মূলে :

'কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি,
শুনহ ভকতজন শ্রুতিঘট ভরি।...
পোথার বৃত্তান্ত যেবা চিত্ত দিয়া শুনে।

১. বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃঃ ১৭৪-৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাক কৃপা বরে বহু প্রভু নিরঞ্জনে।....
একচিত্তে শুনে যে এই সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুঃখ হরে যশ কৃতি লাভ।....

এতৎসত্ত্বেও কবি শুধু ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, তাঁর মধ্যে একটি অতি কোমল কবি প্রাণও ছিল—এ বিরাট কাব্যের নানাস্থানে তার সাক্ষ্য মিলে। করুণরস সৃষ্টিতে কবি সিদ্ধহস্ত।

স্বামীরূপে আজিজ মিসিরের প্রাসাদে দুঃখিনী জোলেখার উদভ্রান্ত অবস্থা বর্ণনায় কবি কিরূপ কারুণ্য সৃষ্টি করেছেন দেখুন :

গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সংগে কাহিনী কহয় সর্বক্ষণ ॥
তুমি সব ভ্রমিতে আছহ রাত্রদিন।
তোমা অবিদিত নাহি ভুবন এ তিন॥
দুস্কের কাহিনী কহি গোঞায় রজনী।
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি ॥
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদয় হৈলে হয় আনমন ॥
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি উষাকালে ॥

ইউসুফের ভাইরা বনের মধ্যে ইউসুফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রহার করছে, এই বর্ণনাটিও হৃদয়বিদারক :

কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেতে মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বলি কর্ণ মোচড়িল ॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপর।
একে একে কাড়ি লৈল গায়ের কাপড় ॥
কেহো ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে ॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে এক পাশ।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ ॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদয় হৈয়া মারে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত বস্ত্র আড়ে ॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাই সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি ॥

উত্তেজনা বিরহিত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার এমন জীবন্ত ছবি ক্বচিৎ মেলে।

ইউসুফের মৃত্যু সংবাদে এয়াকুব নবী শোকাকুল হয়ে যে বিলাপ করেছেন তাও কারুণ্যের নির্ঝর :

ইউসুফ একসর প্রাণের দোসর
চন্দ্রমুখ অবতার।
হেন পুত্রমুখ ন দেখি মন দুখ
ত্রিভুবন রূপসার ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনে পুত্র পিয়া বিদরয় হিয়া
কাতে কৈমু এহি কথা।
সর্বপ্রাণ মোর পুত্র গেল দূর
হৃদয় অন্তরে ব্যথা ॥
নয়ন পোতলি গেলেক নিকলি
আঁখি থাকি হৈলুঁ অন্ধ
গেল মোর বুদ্ধি নাহি কোন সুদ্ধি।
মোকে দিয়া গেল বন্ধ ॥...
মোর কর্মদোষ বিধি কৈল রোষ
কোন পাপ মোর বাধা।
যাই ভিন্ন দেশ ব্রহ্মচারী বেশ
পূরিতে মনের সাধা ॥
ঘরে ঘরে যাই পুত্র যথা পাই
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ।
কোন ধর্ম শিক্ষা পুত্র দিব ভিক্ষা
তান পদগত লাগোঁ ॥

বুদ্ধদেব যে পুত্রশোকে উন্মত্ত লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর কথা স্মর্তব্য। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে শোকপ্রকাশক অনেক কবিতা আছে কিন্তু অল্প কথায় এমন মর্মভেদী বিলাপ বিরল।

কোমলহৃদয় কবি নায়িকা জোলেখার ব্যথায় এতই অভিভূত যে জোলেখার অন্যায় প্রার্থনাও তাঁর তুলিতে করুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

মুই শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল না হৈবেক উণ ॥
যাচক তুলনা আমি তুমি দাতাজন।
ভক্ষ্যদান দিলে কভু ন টুটিব ধন ॥
তুমি সুধাকর আমি তৃষ্ণায় বিকল।
আমা অল্প দিলে তোমা ন টুটিব জল ॥
তুমি মহা কল্পতরু ফলিত নির্মল।
আমা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল ॥

চিরদুঃখিনী বিরহিণী জোলেখার আর একটি বেদনার অভিব্যক্তি :

নিশি উজাগর আঁখি ঝামর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ ॥
শুনরে পবন মোর দুঃখের কাহিনী।
দণ্ডেক বরিখ মোর দীঘল যামিনী ॥
মোর পিয় স্থানে গিয়া কহরে সম্বাদ।
কেমন সহাস্য তান দাসী সঙ্গে বাদ ॥
মলয়া সমীর মোর শমন সমান।
এ চান্দ দেহ দহএ নিদান ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঘন গহন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত।
কুসুম সুগন্ধি যত আগর চন্দন।
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন ॥

রূপবর্ণনায়ও আমাদের প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কারো চেয়ে কম রূপজ্ঞতার ও রসজ্ঞতার পরিচয় দেননি :

নানা কুসুমিত জ্যোতি দেখি চমকিত মতি
ঘন মধ্যে নক্ষত্র প্রকাশ ॥
নয়ন খঞ্জন তুল অঞ্জনে রঞ্জিত মূল
চঞ্চল চকোর সমুদিত
নিসিখে নির্মল বাণ কটাক্ষেতে সুসন্ধান
বিরহিণী পানা সচকিত।
শিষেত সিন্দুর ভাসে যেন রবি পরকাশে
মুখচন্দ্র জ্যোতি সমূদিত
শ্রবণে গুম্বিত মূর্তি রতন কুণ্ডল জ্যোতি
তারা প্রভা জিনিয়া বিদিত।

অথবা–

ভুরু কাস চাপ জিনি লোচন কুরঙ্গ।
টাক্ষ বিষিখ বিখ নিমেখ তরঙ্গ ॥
কাজলে উঝল জুতি সর্বগুণজিৎ।
চমক ফরকে যেন চঞ্চল চরিত ॥
যুগল নয়ন জুতি চন্দ্র খর্বরূপ।
জগত জিনিয়া আঁখি তাহান আনোপ ॥
আঁখি জুতি বিভূতি সরিল রূপসিন্ধু।
তার মর্ম মধ্যেত মজিল শত ইন্দু ॥
কিবা চারু সচকিত চঞ্চল চকোর ।
কিবা মধ্যে মধুকর সুধা রসে ভোর।
শ্রবণ গৃধিনী জিনি অতি সুললিত।
রত্নমণি কুন্তল দুলিত সুশোভিত ॥
উঞ্চল নাসিকা দণ্ড তিল ফুল জিত।
পরিমল পারিজাত গন্ধ আমোদিত ॥
পারিজাত কুসুম কোমল দেহকান্তি।
বিমল উঝল মুখ চন্দ্রে করে ভ্রান্তি।
বিদ্যুত উঝল দন্ত মুকুতা সঞ্চার।
কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোর ॥
মধ্য দেশ সরু অতি সিংহজিৎ।
করীকুম্ভ নিতম্ব গুরুয়া গরবিত ॥ ইত্যাদি

প্রকৃতি বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কবির বর্ণিত জোলেখার বারমাসীতে বাঙলা ষড়ঋতুর আবর্তনে যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঘটে তার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে : মাঘ থেকে শুরু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভছিরি পঞ্চমী প্রকাশ।
মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন
তা দেখিয়া মোর মনোদাস ॥
বিকলিত আমজাম ভ্রমর ভ্রময় কাম
সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিস।
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে পীড়
বিরহিণীজন অহর্নিশ ॥
ফাগুনে চৌগুণ রিত নানা পুষ্প বিকশিত
যুবজন ফাগু বিভূষিত।
পূরিত সকল অঙ্গ আগর চন্দন রঙ্গ
খেলএ আনন্দ হই চিত ॥
নবীন পরব শেষ সুরঙ্গ দুর্লভ দেশ
তরুলতা নবরঙ্গ হাস।
যুবক যুবতীগণ নানা বস্ত্র বিভূষণ
আভরণ বিচিত্র বিলাস ॥
চৈত্র হৈল সুললিত নানা পুষ্প বিকশিত
চম্পক চামেলি জুতি জাতি।
ভ্রমর ভ্রমরি জোর কেলি কলা রসে ভোর
গুঞ্জরে মঞ্জরী পরি রঙ্গে।
তা হেরি চঞ্চল মতি কাম বিহারিত গতি
কামিনী ব্যাকুল মন সঙ্গে ॥
বৈশাখ সময় দেশ রবির কিরণ বেশ
নিদাঘ দহএ নিরন্তরে।
আম জাম সুফলিত তরু সব সুনমিত
দুলিত নমিত ফল ভরে ॥
অলিকুল কলরব কেলি কলারস ভব
পক্ষি সব রবএ মধুর।
দক্ষিণ মলয়া বাত হৃদএ অনঙ্গ ঘাত
তা হেরি ধাবএ মন দূর ॥...
আষাঢ় আইল ঘন সঘন তিমির বন
নিশিদিন নাহিক প্রকাশ
বরিখয় অনিবার ধরণী পূরিত ধার
জীবজন্তু অধিক উল্লাস ॥
বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছটা চৌদিকে অম্বর ঘটা
মোর মন ভয় চমকিত।
নানা পক্ষি করে রব মঙ্গল পঞ্চমি সব
সুললিত মধুর সংগীত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণ আইল রিত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভর বরিষে জলধার।
নির্মল শীতল জল সতত বিরহানল
বিশেষ দহএ দেহা মোর ॥
চাতক পিয়ার পিউ পক্ষিরবে দহে জিউ
শিখি সুখে গিরিগর্ভে নাদ ॥
দাদুরির রোল ঘোর ভাবেতে হৈলুঁ ভোর
শুনিতে শুনিতে পরমাদ ॥.....
আশ্বিন যে পরবেশ বরিষা হইল শেষ
ক্ষেপে ঘোর ক্ষেণেকে বিদ্যুৎ।
কেতকী বকুল ফুল তাহাতে ভ্রমরা রোল
তা দেখি ধরাইতে নাহি চিত।
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ শশোদর সনে রণ
ডুবকি উঠএ ঘনজিত।
তাহার নির্মল নিশি সুধা বিস্তারিত হাসি
তা দেখিয়া মন বিচলিত ॥.....
আঘ্রাণ আইল রিত নব শালি সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ যায় দূরে।
সারি শুক করে রোল নানা বর্ণ ধান্য ফুল
বিকশিত সব ক্ষিতিপুর ॥
ঘরে ঘরে ধান্যরাশি নরপুশগণ হাসি
গগন রঞ্চিত পরকাশ ॥
রাজা প্রজা উল্লাসিত প্রবাস বঞ্চিত রিত
মোর লক্ষ্যে যেন বনবাস ॥ ... .
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হৃদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখি অবশ্য হইবা সুখী
নিশি শেষে রবির উদয়।

লক্ষণীয় এই যে, কবি মিশরদেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙলা দেশের চিত্রই অঙ্কিত করেছেন। রাজ্ঞী জোলেখা আর মিশর দেশ দু-ই কবির ধ্যানের চক্ষে বাঙলার বিরহিণী বধূ আর বাঙলাদেশ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের কবি শুধু বেদনার কবি নন। হৃদয়ের ব্যথা শুধু তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেননি, বহির্চক্ষু দিয়ে দুনিয়ার রূপও দেখেছেন, নারীর রূপ-ঐশ্বর্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ভাষা প্রাচীন, কিন্তু মার্জিত। বর্ণনার একটা স্বচ্ছন্দগতি আছে। তাঁর বিরাট কাব্যে কোথাও কষ্ট কল্পনা বা জড়তার আভাস নেই। তিনি মহাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল গীতিপ্রবণ, তাই গ্রন্থের সর্বত্র আন্তরিকতার মাধুর্য ফুটে উঠেছে।

কবি শাহ্ সগীরের নিবাস কোথায় ছিল আমরা জানি না। গ্রন্থে কবির জন্মভূমির কোন উল্লেখ নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কোন সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হলে তার সন্ধান মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত আমরা দেখছি গ্রন্থের তিনখানা প্রতিলিপি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত এবং একখানা ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে অনুবাদের কোন ছাপ নেই। তার কাব্যে সর্বত্র দেশী রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার বসন-ভূষণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎসব পার্বণ-অনুষ্ঠানাদি বর্ণিত ও চিত্রিত। তাঁর কাব্যে আল্লাহ বা স্রষ্টা অর্থে 'ধর্ম' বহুল ব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধ প্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শন। কাব্যখানির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

বন্দনা : ১ করিম সত্তার পরবাদিগর দেবতা মনুষ্যরূপ সৃজিল জগত/আপনার ইচ্ছাহে যেই
করে ধর্ম/ব্রহ্মজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে যথ।

অন্যত্র : ব্রহ্ম/নিরঞ্জন/ঈশ্বর/ধর্ম/পুরুষ পুরান এমন কি 'ধর্মরাজ'ও (১২) ব্যবহৃত :

২ দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে।
৩ ধর্মরূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল।
৪ ধর্মকে স্মরিয়া কন্যা হৈলা দণ্ডবৎ।
৫ কুম্ভ 'পরে বলিলেন্ত ধর্ম অনুমতি।
৬ ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক
ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুহ্মি রাজ্য অধিকারী।
৭ ধর্মপদ স্মরি করে সত্বরে গমন।
৮ ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।
৯ ধর্মপদে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর।
১০ মনে মনে ধর্ম আরাধন।
১১ ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
১২ বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।
১৩ তোহ্মা পুত্রকর্মে যে লিখিছে ধর্মে।
১৪ ধর্ম ভাবি রহ মন।
১৫ ধর্ম নাম লই কিরা করিল শপথ।
১৬ ধর্মের প্রসাদ আছে পূরিলেক আশ।
১৭ জালিয়ার বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন!
১৮ কহিলেন দেবধর্মপদে আরাধন
ধর্ম স্মরি ইউসুফে মাগিলা এক বর।

সূফীতত্ত্ব :

১। নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা
এহি লক্ষ্যে যথ জীব সৃজন করিলা।

মাতাপিতা :

দ্বিতীএ প্রণাম কঁরো মা ও বাপ পাএ।
যা'ন দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধাএ।
পিপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত
কোল দিলা বুক দিয়া জগতে বিদিত।...
ন খাই খাওয়াএ পিতা ন পরি পরাএ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্তাদ :

ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড়
দ্বিতীয় জনম দিলা জিহঁ সে আস্কার।

বাঙলা রচনায় পাপভীতি :

ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দূষির সকল তাক ইহ ন জুয়াএ।
শুনিয়া দেখিলুঁ আম্মি ইহ ভয় মিছা
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।

উপমা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদ্ম, ডমরু, রামকদলী, শরৎচন্দ্র, সফরী, চাতক, দাদুরী ইত্যাদি।

আসবাব : পালঙ্ক, কনক জড়িত পাট, কটোরা, সন্দুক, উয়ারী, উচ্চবন্ত টঙ্গী, মন্দির (গৃহ), থালাবাটি ইত্যাদি।

: টোন হতে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ।

সংস্কৃতি : তাম্বুর যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে।

: কেহো নৃত্য করে, কেহো বাহে কপিনাস

বসন : বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীবাস/চারিদিক অঙ্গ সুরচিত/

অলঙ্কার : হীরার হার, শ্রবণে রতনমণি, অঙ্গুরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ (মুক্তা ও কনকনির্মিত), তাড়, কিঙ্কিণী, নেউর (নূপুর) বলয়া, সিন্দুর, মেহেন্দী, নেতপাট শয্যা, চন্দন, কুঙ্কুম, আগর, রত্নাভরণ।

: পাট পাটাম্বর নেত কনকমণ্ডিত।

আদি মানব সমাজ পৌত্তলিক :

: কেহ বোলে এহি (ইউসুফ) ব্রহ্মারূপ প্রজাপতি
তান পূজা কৈলে হৈব মুক্তি পদ গতি।

দাসী : সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙ্কার পুর।
[দাসী কেবল কাজের জন্যে নয়–কামচর্চার জন্যেও]

তৈজসপত্র যৌতুক :

কনকের বাটাবাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি
সুবিচিত্র ঝাড় গাড়ু বর্গ
রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র নক্ষত্র জিতি ...
যেহেন উঝল মণি স্বর্গ।
ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পুরি
মণিময় আভরণ সাজ
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ।

রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা :

দশ সহস্র রথ সজ্জা তাহার উপরে ধ্বজ
রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরি মাঝে অন্তস্পট সুবর্ণ নির্মাণ ঘট
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর। (পর্দা)

আজিজ মিশির :

: কনক অম্বারী 'পরে চড়ি রঙময়/সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শিরের উপর।
: চারিদিক চামর দোলায় চমকিত।

বাদ্য :

১ দুন্দুভির শব্দে পূরিল দিগন্তর
ঢাক ঢোল দণ্ডি কাসি বাজত সুস্বর
২ সানাই বিগুল বাজে বাঁশি করতাল।
৩ কবিলাস বিপঞ্চিক মন্দিরা মৃদঙ্গ তবলা বাজে দুন্দুভি-নিশান।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান।

শিবির :

১ তাম্বু তাঙ্গি আজিজ রহিলা সেই স্থান
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।
২ নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে।
৩ এ ঝাম ঝাঝঁরি ধ্বনি বাজে ঝণৎকারে।
৪ নাচএ গাবএ ছন্দ মেলা।

পারিতোষিক [আজিজ মিশির] :

সভান প্রসাদ দিলা পিরীতি বচনে।

সমাজনীতি :

তুহ্মি অকুমারী বালা জগত বিদিত।
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত।

বরের বাহন :

চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি।

জোলেখার বিয়েতে আনুষ্ঠানিক আচার :

ব্রাহ্মণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি
কবিত্ব পড়এ ভাট পিঙ্গল বিচারি।
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস।

জন্মান্তর, অদৃষ্ট, নিয়তি :

১ তোর কর্মে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ।
২ কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।
৩ না জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত লিখিত।
৪ বিবিধ নিবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
৫ দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত।
৬ মোর শুভদশা আছে কর্মের লিখন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যর্থনা পদ্ধতি :

১ আজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন।
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান।
দোহান উপরে কৈলা পুষ্প বরিষণ।
গুলাল চামেলী চম্পা সুবর্ণ গঠন।
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধান।

২ **নারীরা :** কেহ সিঞ্চে নানা পুষ্প সুবাসিত গন্ধ
কার হাতে দূর্বাধান্য নানান প্রবন্ধ।
নৃত্যগীত আনন্দিত স্তুতি পড়ে ভাট।

ফুল ও ফল :

আম, জাম নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুলাল,
চম্পা, যুথী চামেলী গুলাল।

বালক ইউসুফের সজ্জা :

মাথেত পাগড়ী দিলা অঙ্গেতে ভূষণ (তুল : কৃষ্ণ)

অবতার : মনুষ্যমূরতি এহি দৈব অবতার।

রাহাজানি :

পন্থে বাটোয়ার সব আছে দুষ্টজন।

মুদ্রা :

১ তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার (ইউসুফের)।

২ বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল
হীরা নীলা মাণিক্য মুকতা কসা লাল।
রত্ন মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন।

বৈরাগী বেশ :

মগুন করিলা শয্যা তরল বিরলে
পাটাম্বর তেজি মৃগ-চর্ম পরিধান
পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমি করিল শয়ান।
ঘৃত মধু এড়িয়া বনের শাক ভক্ষ ....
নীলগঙ্গা তীরের ঘোফের মধ্যে বাস
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মন উদাস।

দেবপূজা : যেন ইষ্ট দেবতা পূজয়ে নিতি নিতি।

নীতিশাস্ত্র : মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান।

পক্ষী– কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী
চকোয়া চাতক বর্ণ রাজহংস পাখী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান সুপারী :

কাহাক খাওয়ায় কেহো কর্পূর তাম্বুল।

মিষ্ট খাদ্য : কনক কটোরা ভরি মধুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইউসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পুরিত সন্দেশ নানাবিধি।

খোঁপা : বন্ধ এ কানড়ী খোপা লাস।

সজ্জা ও প্রসাধন :

শীষেত সিন্দুর, শ্রবণে গুম্বিত মোতি রতন কুন্তল,
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত গজমোতি পাঁতি
কুস্তুরী কুঙ্কুম বিন্দ, কপালে তিলক চন্দ,
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, কেশর সুগন্ধি সঙ্গ।
কাঁচুলি মণ্ডিত হার, করেত কঙ্কণবর,
কনক মাণিক্য জ্যোতি সার।
বাহু দণ্ডে তাড় তারি, চুনিমণি বিচিত্র নির্মাণ
অঙ্গুরী মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি, কটিত কিঙ্কিণী বাজে,
চরণে নূপুর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস
আগর চন্দর ফাগু সুবাসিত রঙ্গে।

নারী ও পুরুষ : অগ্নি ও তূলা, ঘৃত ও বহ্নি সদৃশ্য।
লোহা ও অগ্নি জতু ও অগ্নি (লোহা যেন অগ্নি পাই জতুক আকৃতি)

চুলনী : তার এক শিশু তিন মাসের সুন্দর
শয়ন করিয়া ছিল চুলনী উপর।

শয্যা : ইউসুফক দিলা যথ খাট, পাট পাটি
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি।

যৌগিক সাধনা–ইউসুফ :

১ আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ
সর্বক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ।
জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি
ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি।

২ সর্বলোকে বলে এহি দেব অবতার।
মহাসাধু সিদ্ধারূপ প্রকৃতি তাহার।

ছড়িদার : এ যুগের অগ্রগামী Surgeant :—
আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি।
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি।

হিন্দুয়ানী দাম্পত্য ধারণা :

শুন হে ইসুফ তুমি হঅত তৎপর
জলিখা তোহ্মাক পত্নী জন্ম-জন্মান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুল নাচ :

পোতলা নাচায় যেহ্ন সূতের সাতার
বাদিয়া আলোপে জেহ্ন সূত রাখি কর।

বাদ্যযন্ত্র :

১ বিয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিতে ...
২ যথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্বরাজ্য দেশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে পুরিয়া বিশেষ।
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান
মন্দির মাদল ভাল তবল বিষাণ।
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল
শঙ্খনাদ শিঙ্গা ভৈরী বাজএ তাম্বুল।
জয়তুর স্বরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পুর
নৃত্যগীতে নৃত্যকে নাচএ সেইপুর।
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার
বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজন অনিবার।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কর্ণাল
করতাল মন্দিরা বাজায়ে সুমঙ্গল।
বিপঞ্চী পিনাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিলাস রুদ্র বাজায়ে নিরন্তর।

অলঙ্কার :

কাঞ্চন দৌছড়ি মল,

বাহন : শিবিকা ও চৌদোল আরোহণ

বাদ্য ও বিবাহ মঙ্গল :

দুই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙ্খধ্বনি
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবের রমণী।

উৎসবে মঙ্গল গান :

১ সুরচিত মঙ্গলা গাহেন্ত
২ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে
৩ এহিমতে মন্দুলা করিলা মহোচ্ছব।
৪ সুরূপী সুন্দরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ঘন
যেহ্ন মোতি ভূমি বিস্তারিত।

বাসরে :

পুষ্পক পালঙ্গী 'পরে দুহ প্রেম রস ভরে
সুখ শয্যা বাস নিরন্তর।

টঙ্গী :

রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তঃপুর থান
উঞ্চ দেবপুরী সম ফটিক নির্মাণ।
চন্দন আগর পাট শয্যা সুবলিত
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত।
চিত্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত।
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড়
অতি মনেরম ভাতি মুকুতা সঞ্চার।
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি
দেবের বৈকুণ্ঠ কিবা অপরূপ ভাতি।

অন্য টঙ্গী —

একঘর আজিজে নির্মিছে মনোহর।
মণিরত্ন কাঞ্চন মন্দির পূর সাজ
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার।
রক্তবর্ণ পাষাণ পুরিত বররাজ।

গর্ভকাল :

দশমাস দশ দিনে পুত্র উতপতি।

দুর্ভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা :

ভক্ষ্য দিয়া আক্ষা পুত্র-পরিজন
দাস-দাসী করিয়া রাখহ প্রাণ-ধন।
মিশ্রির সকল লোক হৈল দাস-দাসী।

রাজদর্শনের কায়দা :

নবী বোলে দ্বারেত রহিবা আগুয়ান
অন্তঃপুরে প্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ।
নৃপতির মুখ দেখি করিবা প্রণাম
সচকিত ন হেরিবা নতু ডান বাম।
আশীর্বাদ করিয়া রহিবা ধৈর্যমান
আজ্ঞা হৈলে বসিবা আজিজ বিদ্যমান।
পুছিলে সে কহিবা বচন রত্নবান
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান।
ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোচর
সময় বুঝিয়া যাইবা নিজ বাসা ঘর।
নৃপতিক প্রকৃতি বচন তত্ত্ব জানি
কার সঙ্গে ন কহিবা বেকত কাহিনী।

আসন :

বিচিত্র বসন আনি বিছাইয়া সত্বর।
রাজ আজ্ঞাএ বসিলেন্ত দশ সহোদর।

আপ্যায়ন :

ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে যোগাএ
চামর সমীর কেহো করে তান গাএ।
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্য :

ক্ষেত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত
ধনুর্বাণ খর্গ চর্ম সন্ধান পুরিত।....
দশ সহস্র ছড়িদার সচেতন রাজে..
মণিময় কৃপাণ করেত সুশোভিত
চৌদ্দ অক্ষোহিণী সৈন্য করহ সাজন।

পিতা :

বাপবাক্য যেহ্ন মহাদেব।
পিতৃপদে সেবা কৈলে স্বর্গলোক গতি।

বেশ্যা নর্তকী –

যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠান
সুললিত নৃত্যগীত কর সমাধান।

মুসলিম মানস :

আল্লাহর বাণী : কাফের সকল মারি করহ অধীন।
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে যেই জন
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ।
—কাফের মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী।

নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ :

কার হাতে দুর্বাধান নানা পুষ্প পাতা...
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান...
সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকিয়া আঁখিমুখ।

(ভৃঙ্গারের জলে)

বাপ পদ আপনে পাখালে নৃপমণি
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা।

যোদ্ধৃবেশে রাজা :

সুসজ্জ করহ সৈন্য যথ অশ্ববর
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ...
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত।

মঙ্গলাচরণ : ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দুই কর
স্বামী বরদাতা শিব
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ
ইবন আমিনের ভাবীপত্নী বিধুপ্রভা
অতিথি আইল জানি করিলা গমন।...

দৈববাণী :

এহিস্তান তোল টঙ্গী ঘর সুরুচির
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি
তবে সে পাইবা জান তুহ্মি নিজপতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদমবুচি :

চরণ বন্দিল তান শির 'পরে ধরি।

বিধুপ্রভার স্বয়ংবর :

কনে সাজ : চিকুর কুচিত বেণী সিঁথি পাঁতি শোভা
অর্ধচন্দ্র আকৃতি মোহন তুল খোপা।
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ
নক্ষত্র নিকর যেহ্ন শোভে দ্বিজরাজ।
তিলফুল জিনি নাসা মুকুতা মণ্ডিত।

কাব্যটি প্রকাশিত হলেও রচনাকাল বিতর্কিত। কাব্যটি যে অনূদিত নয়—দেশী উপাদানে রচিত তা প্রমাণের জন্যেই এই দীর্ঘ ও বিবিধ উদ্ধৃতি।

৫

অনুবাদ সাহিত্য

কোন জাতির বা অঞ্চলের বুলি লেখ্যভাষার ও সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হতে হলে, তার ভিত্তি তৈরীর জন্যে উন্নতভাষা ও সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। নিরক্ষর গৃহস্থ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রকার ভাব ও বস্তু বিনিময়ের জন্যে মাত্র কয়েকশ শব্দই প্রয়োজন, ওগুলোও সব সময় ব্যবহৃত হয় না। নিস্তরঙ্গ দৈনিক জীবনে নিত্যকর্ম ও কথায় আরো কম শব্দ, হয়তো শতেক শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন অনুভব, চিন্তা তত্ত্ব বা নতুন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করতে গেলে ঐ আটপৌরে শব্দাবলীর সীমিত অভিধায় তা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তাই বহু ব্যঞ্জনাময় নতুন শব্দ তৈরি বা ধার করতে হয়। ভাব বা বস্তু অনপেক্ষ শব্দ তৈরী করা যায় না, আবার স্থান-কাল-পাত্রের প্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাব ও বস্তুর চেতনাও চিত্তলোকে জাগে না, তাছাড়া বুলিতে নতুন নতুন শব্দ তৈরির বীজও মেলে না। অনুভব ও চিন্তাচেতনাই নতুন শব্দ তৈরির প্রয়োজন ও প্রেরণা যোগায়। অকারণে এ প্রেরণা আসে না।

এক একটা নতুন শব্দ এক একটা গাঢ়-আবেগে সৃষ্ট কবিতার মতোই গভীর ব্যঞ্জনাময় সৃষ্টি—এক একটি বাক্‌প্রতিমা। চাঁদকে যেমন হিমাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, কিংবা হিতাংশু বলি তখন ঐ দৃশ্যবস্তু চাঁদ আমাদের অনুভবে অন্য গুণে-রূপে ও লাবণ্যে প্রতিভাত হয়। এই চাঁদ এক বিশেষ মানসসম্ভূত। বুলিতে এই মানসসৃষ্টি দুর্লভ। তাই বুলিকে লেখ্য ভাষার তথা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করার সহজ উপায় হচ্ছে অনুবাদ। অন্যভাষা থেকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-মননের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করতে হলে সে বিষয়ক ভাব-চিন্তা-বস্তুর প্রতিশব্দ তৈরি করা অনেক সময় সহজ হয়, তৈরি সম্ভব না হলে মূল ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে হয়, এভাবেই সভ্য জাতির ভাষা-সাহিত্য মাত্রই গ্রহণে-সৃজনে ঋদ্ধ হয়েছে। এ ঋণে লজ্জা নেই। একই প্রয়োজনে আমরা আমাদের বুলির রূপ পরিহার করে আবার নতুন করে শব্দ গ্রহণ করেছি। যেমন 'তু লো ডোম্বী, হঁউ কপালী' অথবা, 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'– বুলির এ ভাষা পরিহার করে তুমি, ডোমনী, আমি, বাজায়, কালিন্দী, নদী প্রভৃতি পুনঃগ্রহণ করেছি। প্রাত্যহিক জীবনে চিরকাল 'মা ভাত দাও' পুনরাবৃত্ত হবে, কিন্তু উচ্চ ও বিচিত্র তাৎপর্যে কখনো জননী, কখনো প্রসবিনী বলতে হয়। আবার অরুণ, তপন , মার্তণ্ড, রবি, সূর্য একই তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা বহন করে না। তাই সাহিত্যে দর্শনে ভাব বা বস্তুবাচক শব্দের বহু প্রতিশব্দের প্রয়োজন। অনুবাদ কার্যে হাত দিলে গরজে পড়ে চিন্তাভাবনা করে ব্যঞ্জনাজ্ঞাপক শব্দ তৈরি করা যায়, অথবা ঋণও গ্রহণ করা যায় প্রতিবেশী ভাষা থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি উচ্চ, মহৎ ও নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা-তত্ত্ব প্রভৃতি নিজের ভাষা-সাহিত্যে না থাকলে অন্য ভাষার সাহিত্য-দর্শন-তত্ত্ব ও লিপিবদ্ধ জ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে নিজের ভাষায় গ্রহণ করলে উক্ত ভাব-চিন্তা-তত্ত্ব-জ্ঞানের একটা ভিত্তি, কাঠামো বা বুনিয়াদ তৈরী করা যায়। যে জ্ঞান বা অনুভব আমাদের দেশে পাঁচশ বছর পরেও হয়তো লভ্য হত না, তা আমরা অনুবাদের মাধ্যমে এখনই পেতে পারি, যেমন—বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাগুলো, বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো, সমাজতত্ত্বগুলো—মানবচিন্তার শ্রেষ্ঠ-অতুল্য-অমূল্য সম্পদগুলো এভাবে আয়ত্তে আসে। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে গঠন যুগে উন্নত ভাষা থেকে সাহিত্য অনুবাদ করলে ভাব, ভাষা, ছন্দ-আঙ্গিক-অলঙ্কার প্রভৃতির একটি বুনিয়াদ তৈরি সহজ হয়, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আঙ্গিক ও ভাবচিন্তার বুনিয়াদ যেমন প্রতীচ্য সাহিত্যের ঋণে তৈরী হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করছে ঐ আদলেই।

চৌদ্দ পনেরো শতকে আমাদের লেখ্য সাহিত্যও তেমনি সংস্কৃত-অবহট্‌ঠ থেকে ভাব, ভাষা ও ছন্দ গ্রহণ করেছে, পুরাণাদি থেকে নিয়েছে বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-প্রণয়োপাখ্যান-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত-ফারসি-আরবি-হিন্দি-আওধী থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ভাষায়। এভাবেই আমাদের লিখিত বা শিষ্ট বাঙলা ভাষাসাহিত্যের বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছিল।

আদর্শ অনুবাদের একটা বিশেষ যোগ্যতা অপরিহার্য। ভাষান্তর করতে হলে উভয় ভাষার গতিপ্রকৃতি, বাকভঙ্গি ও বাক্‌বিধির বিষয়ে অনুবাদককে বিশেষ ব্যুৎপত্তির দরকার, তাহলেই ভাষান্তর নিখুঁত ও শিল্পগুণান্বিত হয়। তাই ভাষাবিদ কবি ছাড়া অন্য কেউ কাব্যের সুষ্ঠু অনুবাদে সমর্থ হয় না। তেমনি দার্শনিক ব্যতীত দর্শন, বিজ্ঞানী ব্যতীত বিজ্ঞান, স্থপতি ব্যতীত স্থাপত্য বিষয় অনুবাদ করলে তা কখনো যথার্থ হয় না। মধ্যযুগে অনেক অ-কবিও অনুবাদ কর্মে উৎসাহী ছিলেন। তাই অনুবাদ কখনো মূলানুগ হয়নি, বিষয়ে হলে ব্যঞ্জনায় হয়নি, ব্যঞ্জনায় হলে ছন্দে হয়নি—এমন নানা ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া এঁরা নিজেদের সামর্থ্য রুচিবুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মূলের পাঠ গ্রহণ-বর্জনের ও সংক্ষেপণের এবং ইচ্ছেমত সংযোজনের স্বাধীনতা নিজেদের হাতেই রাখতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবশ্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু দর্শন ইতিহাস চিকিৎসা-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞান তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক পন্থা। মধ্যযুগের অনুবাদ তাও হয়েছে। এজন্যে মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় কোন তথাকথিত অনুবাদই নির্ভরযোগ্য নয়। সবগুলোই কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক, কিছু ভাবিক অনুবাদ এবং কিছু স্বাধীন রচনা—তা কবির, গায়কের, পাঠকের কিংবা লিপিকরেরও হতে পারে। কাব্য সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হতেই পারে না।

সংস্কৃত থেকে যা অনূদিত হয়েছে, তা মুখ্যত বিভিন্ন পুরাণবর্ণিত কাহিনী। রামায়ণ-মহাভারত দুটোই দুই অবতারের কাহিনী, রাম ও কৃষ্ণ দুজনেই দুই কাব্যের নায়ক। পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে দেবতা, ঋষি, এবং তাদের সম্পৃক্ত দৈত্য-দানো-অসুর-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-মানুষ-পশু-পাখি প্রভৃতির নানা অলৌকিক, অসম্ভব, অবাস্তব কিন্তু নীতিশিক্ষা ও তত্ত্বতাৎপর্যপূর্ণ নানা কাহিনী। স্বীকৃত পুরাণ আঠারোটি—অর্ধ-স্বীকৃত অর্বাচীন উপপুরাণও আঠারোটি। সবগুলোর মূল্য-মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান নয়, আবার ইষ্ট দেবতাভেদেও পুরাণগুলোর সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব-লঘুত্ব রয়েছে।

পুরাণগুলোর নাম—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু (শ্রীমৎ ও দেবী) ভাগবত, নারদীয়, লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপপুরাণ হচ্ছে, —আদি, নরসিংহ, বায়ু, শিব, ধর্ম, দুর্বাসা, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেব, পরাশর, মারীচি ও ভাস্করপুরাণ।

পুরাণে-উপপুরাণে কয়েকটি নামসাদৃশ্যও লক্ষণীয়, এবং আঠারো নামের তালিকায়ও পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়।

ভারততত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ঋকবেদের কিছু অংশ যখন রচিত হয়েছে আর্যেরা তখনই ভারতে প্রবেশ করেন ইরান এলাকা থেকে। এবং ঋকবেদের বাকি অংশ এ দেশেই রচিত। এই ঋকই গানে-মন্ত্রে-বিধানে বিন্যস্ত হয়ে তিন নামে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে–ঋক, সাম ও যজু। পরাক্রান্ত আর্যেরা শাসকরূপেই উত্তর ভারতে সিন্ধু-গঙ্গার তীরাঞ্চলে আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি এলাকায় বাস করে। দেশী জনসংখ্যার তুলনায় তারা ছিল নগণ্য।

সে জন্যেই শাসক হয়েও সংখ্যাগুরু দেশী মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, জীবিকা, আচার-পদ্ধতি উৎসব-পার্বণ বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির প্রভাব বাঁচিয়ে বেশি দিন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি তারা। কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই পারে না, পরবর্তী কালের শক-হূন-কুষাণ-স্কিথিয়ান-তুর্কী-মুঘল কেউ পারেনি, এমন কি মাতৃভাষাও তাদের ভুলতে হয়েছিল। শাসকেরা কোন কোন বিষয়ে উন্নত ও সভ্যতর থাকে, অধিকন্তু শাসকের ধন-দর্প-দাপটের ঔজ্জ্বল্যও থাকে। শাসিতেরা হীনমন্যতা বশে এমনিতেই শাসকশ্রেণীর অনুকরণ করে নির্বিচারে। কাজেই শাসিতরা শাসকদের কিছুটা প্রভাবে পড়ে। যদি শাসিতরা সংস্কৃতি-সভ্যতায় উন্নততর হয়, তাহলে গ্রীস-শাসক রোমানদের মতো ইরান-শাসক আরবদের মতো, শাসকের উপর শাসিতের প্রভাব কেবল সংখ্যাগুরু বলে নয়, উৎকর্ষের জন্যেও বিশেষভাবে পড়ে। ভারতেও উভয় কারণেই আর্যদের উপর দেশী প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল, আর্যেরা কেবল ভাষাটাই দেশী লোকের উপর চাপাতে পেরেছিল আর রাখতে পেরেছিল যজ্ঞাদি দুচারটি বৈদিক আচার মাত্র। অন্যসব ক্ষেত্রে তারা অচিরে দেশী ধর্ম-দর্শন-জীবিকাপদ্ধতি ও সে সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান সব গ্রহণ করে, এভাবে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, মন্দির উপাসনা, ধ্যান, নারী,পশু-পাখি, বৃক্ষ ও প্রতিমা পূজা, অবতারবাদে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা প্রভৃতি গ্রহণ করে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, বৈদিক পূষণ, নাসত্য, মরুৎ, বরুণ, রুদ্র, উষা, পর্জন্য প্রভৃতি দেশী দেবতার চাপে বিস্মৃতির আড়ালে অবহেলিত হলেন, এবং দেশী দেবতা শিব-উমা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি বহু নারী-পুরুষ—প্রবাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আসর জেঁকে বসলেন, কূর্ম-বরাহ-মৎস্য থেকে রাম-কৃষ্ণ অবধি সবাই দেশী অবতার। তাই রাম নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ নবঘনশ্যাম, আদ্য প্রকৃতি বা শক্তি ও শ্যামা, শিব, উমা, বসুদেব, চণ্ডী প্রভৃতি নামও দেশী ভাষায়। এঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বৈদিক আর্যধর্মের এক সমন্বিত দেব-দ্বিজ-বেদ প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। পুরাণ-কাহিনী এই ব্রাহ্মণ্যবাদীর শাস্ত্র ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার প্রসূন। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্থিতি, বিকাশ ও প্রসার ঐ পুরাণ তত্ত্ব ভিত্তিক। তাদের ঐহিক পারত্রিক জীবনচিন্তা ও জগৎচিন্তা ও জগৎভাবনা এই পুরাণ চেতনারই নামান্তর। ও সব পুরাণে সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব (সর্গ) প্রলয়তন্ত্র ও পুনঃসৃষ্টি (প্রতিসর্গ), দেবজন্ম, মন্ত্র [সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি] ও রাজকাহিনী বর্ণিত থাকে—অসংখ্য গল্পের, তত্ত্বের ও নীতিকথার সমষ্টি এগুলো। এ সব পুরাণ জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার যুগে (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক থেকে) রচিত হতে থাকে। তখন থেকেই পুরাণের কলেবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনিভাবে সতেরো-আঠারো শতক অবধি পুরাণে বর্ণিত বিষয় পল্লবিত ও সংযোজিত হতে থাকে। ফলে কোন্ পুরাণের কোন্ অংশ প্রাচীন, কোন্ অংশ অর্বাচীন, কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তা নিরূপণ করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ও গবেষণাসাধ্য কর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিষৎ বা বেদান্ত নিয়েও এই একই সমস্যা, বেদান্তও আড়াই হাজার বছর ধরে (সতেরো শতক অবধি) রচিত ও সংযোজিত হয়ে এসেছে। এগারটি উপনিষৎ প্রাচীন বলে স্বীকৃত। অন্যগুলো অর্বাচীন প্রক্ষিপ্ত রচনা সম্বলিত বলে অবহেলিত। ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার পর এবং য়ুরোপীয় বিদ্বানদের আলোচনাভুক্ত হওয়ার পর এসব গ্রন্থে প্রক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্কৃতে রচিত বলে এগুলো সর্বভারতীয় প্রচার লাভ করেছিল এবং এগুলো জাতীয়-শাস্ত্র-সম্পদ-মনীষার নিদর্শন রূপে মান্য হয়ে রয়েছে।

বলেছি জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার যুগে পুরাণ ও উপনিষৎ রচনার শুরু। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শাস্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করা এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজকে সংহত ও অখণ্ড রাখার জন্যে নানা কাহিনী ও উপকাহিনীর মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্ব, মহিমা ও মাহাত্ম্য লোকমনে বদ্ধমূল করাই ছিল উদ্দেশ্য। বস্তুত সে উদ্দেশ্য অষ্টম দশম শতকের মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ মত বিলুপ্ত হল এবং জৈন মতও নগণ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল।

জৈন-বৌদ্ধমতের প্রচার-প্রসার কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যেমন সংকট দেখা দিয়েছিল তুর্কীবিজয়ের পরে বাঙলাদেশেও সংখ্যাগুরু বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠানের প্রবণতায় তেমনি লোকায়ত দেবতা ও শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি-গীতা শাসিত সমাজমন আচ্ছন্ন ও বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা তখন আত্মরক্ষা করল ঐ প্রাচীন উপায়েই অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী ও ঔপনিষদিক তত্ত্বের আওতাভুক্ত করে নিল ঐ লোকায়ত দেবতা ও শাস্ত্রকে। পৌরাণিক দেবতার আভিজাত্যপ্রাপ্ত লৌকিক দেবতা ও ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বমিশ্রিত লোকায়ত বিশ্বাস—দুটোই স্বাতন্ত্র্য হারাল, ফলে গণমানবের দেব-দ্বিজ দ্রোহী থাকার সব কারণও অপসৃত হল। এবারও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের জয় হল। তাই আমরা মধ্যযুগের লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-পাঁচালীতে পৌরাণিক দেবখণ্ড অপরিহার্য রূপে পাই। মনসা শীতলা ষষ্ঠী চণ্ডী মীননাথ গোরক্ষনাথ বাসুলী সবাই এখন পৌরাণিক দেবতা। অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতও এমনি করে ব্রাত্য বাঙালী হিন্দুকে ধীরে ধীরে শ্রুতি স্মৃতি-গীতা নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, আচার ও সমাজনিষ্ঠ করে তুলল এবং ষোল শতকের চৈতন্য-বিপ্লবকেও সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ এভাবে প্রতিহত করে স্বধর্মে সুস্থির থাকতে পেরেছিল। ইসলামের প্রসারও আবার পরোক্ষে রোধ করল চৈতন্যের প্রেমধর্মই। তাতেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন বন্ধ হল। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এভাবে রামমোহনী ও খ্রীস্টানী হামলা প্রতিহত করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ কালে কালে বিপজ্জয় ও মৃত্যুঞ্জয় রূপে প্রমাণ করে সগৌরবে টিকে রয়েছে। সংখ্যাগুরুর লোকধর্মের সঙ্গে আপোসের ফলেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বাঙলায় মিশ্র বা সমন্বিত রূপ নিল এবং গড়ে উঠল পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ।

৬

জাতীয় মহাকাব্য

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর জাতীয় মহাকাব্য (National Epic)। দুটোই মুখ্যত অবতার কাহিনী। রামায়ণের নায়ক অবতার রাম এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ। এঁরা চন্দ্রসূর্যের মতোই হিন্দু মাত্রেরই সামষ্টিক ও ব্যক্তিক সম্পদ—প্রত্যেকেরই আত্মীয়। প্রত্যেকেরই মর্মমূলে এদের স্থিতি। হিন্দুর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনাও রাম-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে অভিব্যক্ত। হিন্দুর জীবনদর্শনের সর্বাত্মক প্রতিফলন ঘটেছে রামায়ণে ও মহাভারতে। তাই এই দুটো মহাকাব্য একাধারে হিন্দুর জীবনচেতনার প্রসূন ও উৎস। এই যুগে জাতীয় পতাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন জাতির সত্তা, স্বাধীনতা, গৌরবগর্ব, ঐতিহ্য, আশাআশ্বাস, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, নীতিআদর্শ, সংহতি ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও নিরাপত্তাবোধের প্রতীক, জাতীয় সঙ্গীত যেমন যৌথজীবনে ঐক্য ও ঐকতানের প্রতিভূ, জাতীয় মহাকাব্য তেমনি জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের মতো সংহতি ও একাত্মতার প্রতীক। চন্দ্রসূর্যের মতোই সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনযাত্রার প্রসাদদাতা। অতএব, যে কাব্যে জাতির সর্বজনীন অনুভূতির প্রকাশ অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা ও সম্পদ, আনন্দ ও বেদনা, নীতি ও আদর্শ, বীরত্ব ও মহত্ত্ব, বৈষয়িক আত্মিক জীবনভাবনা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিধি ও ব্যবস্থা প্রভৃতি নায়কের চরিত্রে ও কর্মে অভিব্যক্ত হয় এবং নায়কের সুখদুঃখ, আনন্দযন্ত্রণা, আশানিরাশা মান-যশ-প্রত্যাশা, জয়পরাজয় শ্রেয়প্রেয় প্রভৃতি সবকিছু পারিবারিক লাভক্ষতির মতো জাতিভুক্ত সবারই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের অঙ্গীভূত বলে অনুভূত হয়—সে কাব্যই জাতীয় মহাকাব্য। রামায়ণ-মহাভারত হিন্দুর তেমন জাতীয় মহাকাব্য—তাদের চিন্তা চেতনার ও প্রেরণার-প্রয়োজনবুদ্ধির উৎস। তাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অদৃশ্য নিয়ন্তা।

জাতীয় মহাকাব্য একদিনে এক হাতে সৃষ্ট হয় না। জাতীয় জীবনের বিবর্তন ধারায় তা বহুকালের অযত্ন লালনে ক্রমে ক্রমে বহু মনের স্পর্শে, বহু অনুভবের বৈচিত্র্যে, বহুজনের আবেগের লাবণ্যে, বহুজনের ভাব-চিন্তা-কল্পনার প্রসাদে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, বহুজনের জ্ঞানের সম্পদে ও প্রজ্ঞার আলোকে, বহু দ্বেষ অসূয়া-রিরংসা জাত ক্ষয়ক্ষতির আঘাতে, শাসন-শোষণ পেষণ-পীড়নের যন্ত্রণায়, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মৈত্রী-করুণা-দান-দয়া প্রভৃতির ঐশ্বর্যে একটি জাতীয় মহাকাব্য গড়ে ওঠে। এ কাব্য কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়— গোটা জাতির মানসসম্ভূত (Epic of Growth)। যিনি একত্রিত করে গ্রথিত করলেন তিনি স্রষ্টা নন, সংকলক মাত্র। বাল্মীকি-ব্যাসের কৃতিত্ব ও গৌরব ঐ সংকলক রূপেই।

জাতীয় মহাকাব্য মাত্রই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। জাতীয় মহাকাব্যই জাতির অতীত ভাব-চিন্তা-কর্ম-জ্ঞান-মনীষা-আচরণের স্মারক ও সাক্ষ্য। কাজেই, জাতীয় মহাকাব্য পাঠে, সেই জাতির বর্তমান মন-মনন-স্বভাব সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে সম্ভব। যুগান্তরে জীবন-জীবিকা পদ্ধতির রূপান্তর ও উৎকর্ষের ফলে জাতীয় মনমেজাজেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। এভাবে নীতিবোধে ও আদর্শচেতনায় এবং জীবনবাসনায়ও পরিবর্তন ঘটে। তাই রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীতেও স্থানিক কালিক রূপান্তর ঘটেছে অনেক। রামায়ণই আবার অধ্যাত্ম বা বাশিষ্ঠ রামায়ণে রূপ নিয়েছে, মহাভারতও জৈমিনিভারতে, ভাগবতে ও পুরাণে প্রসারিত হয়েছে। মধ্যযুগের নব্যভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বা অনূদিত রামায়ণ-মহাভারতেও গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজনের অবাধ আগ্রহ দেখেছি, আধুনিক কালে বাঙলায় মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতে-ঘটনায় ও চরিত্রে যুযোপযোগী নতুন তাৎপর্য দান করেছেন। দুনিয়ার সব সাহিত্যেই পুরাণ উপাদান এমনি নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন সাহিত্য এ-ভাবেই টিকে থাকে ও যুগোপযোগী অর্থবহ হয়ে সার্থক হয়। রামায়ণে-মহাভারতে বিধৃত জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা কিংবা ন্যায়বোধ ও নীতিজ্ঞানের সবটা যৌক্তিক বলে মনে হবে না। কালান্তরে ও স্থানান্তরে ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ বদলায়।

বাল্মীকির রামায়ণে যে কাহিনী মেলে, তার সবটা বাল্মীকির রচিত আদি গ্রন্থে ছিল না, পরে গায়েন-পাঠক-লিপিকরেরা কাহিনী পল্লবিত ও কাব্যের কলেবর স্ফীত করেছে। সে-যুগে ছাপাখানা ছিল না বলে কোন ভাল গ্রন্থের প্রচারও দ্রুত হতে পারত না। অনুলিপি ও প্রতিলিপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরায় গ্রন্থ চালু থাকত। শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল, বিপুলায়তন গ্রন্থের প্রতিলিপিকরণ সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ছিল, তাই রচকের অঞ্চলের সীমা পার হতে গ্রন্থের সময় লাগত। কারো পুথি অন্যের দেখার এবং রচকের স্বহস্তে লিখিত পুঁথির সঙ্গে মেলানোর কোন উপায় ছিল না বলে গায়েন-লিপিকর কিংবা পুথির বিদ্বান মালিক নিজের খেয়াল-খুশী-রুচি ও গরজ মতো পুথির পাঠ ও ঘটনা ইচ্ছে মতো গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজন অবাধে করতে পারত। তাই প্রাচীন রচনামাত্রই প্রক্ষেপ, বিকৃতি, রূপান্তর ও পল্লবায়ন দোষে দুষ্ট। রচয়িতার মূল রচনার অকৃত্রিম ভাষা, ভঙ্গি, ভাব ও কাহিনী কোথায় কতটুকু আছে তা আজ আর জানবার উপায় নেই।

বাল্মীকির রামায়ণ নাকি পঞ্চকাণ্ডে রচিত, প্রথম (আদি) ও শেষ কাণ্ড (উত্তর) স্থানকালের প্রয়োজনে পরে অন্যের দ্বারা রচিত ও সংযোজিত। তাই মূলাংশের বক্তব্য ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ঐ দুই কাণ্ডের মিল নেই। কিন্তু বাল্মীকির রচনা বলে স্বীকৃত পাঁচ কাণ্ডের সবটা যে ভাবে ভাষায় ও ঘটনায় বাল্মীকির রচনা তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না। এখানেও মনুষ্য স্বভাবজ বিকৃতি-রূপান্তর নিশ্চয়ই ঘটেছে।

ভারতবর্ষে রামকথা প্রাগৈতিহাসিক। এ কাহিনীর জড় কোন গোত্র বা গোষ্ঠী জীবনের সমস্যাউদ্ভূত। সভ্যতার উন্মেষ যুগে গোত্র বা গোষ্ঠীপতির শাসনে-নিয়ন্ত্রণে চলত এক একটি গোত্র বা গোষ্ঠী। সে কওম-সমাজে বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে যৌথ জীবিকাকর্মের তাগিদে দলভুক্ত জনগণের মধ্যে ঐক্য-সদ্ভাব-সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে কতগুলো অলঙ্ঘ্য নিয়ম-নীতি-রীতি-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ বিধি মেনে চলা ছিল আবশ্যিক। গোত্র বা গোষ্ঠীপতি কিংবা দলের সরদারের উপর ছিল সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন রাখার দায়িত্ব। অন্যেরা ছিল স্বতন্ত্রসত্তাহীন পুতুল বা যন্ত্রবৎ হুকুম-হুমকির পাত্র। ব্যক্তিসত্তার বিকাশের তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোন সুযোগ ঘটত না। জীবনযাত্রা তাদের ছিল অনেকটা গড্ডালিকার মতো। নিরুপদ্রব প্রাত্যহিক জীবন এ-ভাবেই কাটত। ব্যক্তিসত্তার সামর্থ্যের, শৌর্যের, বুদ্ধির, কৌশলের পরিচয় দেবার ও পাবার সুযোগ ঘটত কেবল দুর্যোগ-দুর্দিনে যখন কোন প্রাকৃতিক বিপদ ঘটত কিংবা ভিন্ন গোষ্ঠী-গোত্রের আক্রমণে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলত। তখন দলের সাহসী-শক্তিমান রণনিপুণ কিংবা কূট-কুশল-প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি স্ব স্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে দলের শ্রদ্ধা অর্জন করত। গোষ্ঠীর বিপদে উদ্ধারকর্তা রূপে তাদের কৃতি পরিকীর্তিত হত এবং তা ক্রমে কীর্তি ও ঐতিহ্যরূপে শ্রুতি-বিস্মৃতির মাধ্যমে চালু থাকত।

ঐ বাস্তব ঘটনার কাল যতই দূর-সুদূর অতীতে সরে যেত কাহিনীও বহু মনের স্পর্শে বহু মুখের উচ্চারণে রূপে-রসে-কল্পনায়-ভাবে-ভঙ্গিতে ও ঘটনার প্রসারে পল্লবিত ও অসামান্য হয়ে উঠত। এবং কৃতী পুরুষেরা কীর্তিমান অনন্য পুরুষ রূপে-গান-গাথা-ইতিকথার নায়ক হয়ে উঠত। আজো রাজস্থানী গোষ্ঠীপতির এমনি বীরত্ব-মহত্ত্ব কথা উৎসবে-পার্বণে-আসরে-অনুষ্ঠানে সগৌরবে ও সগর্বে গীত হয়, প্রাচীন আরবেও এমনি গোত্রবীরদের প্রশস্তিগান রচিত ও গীত হত উৎসবে-মেলায় ও রণাঙ্গনে, শাহ্-সামন্ত-সভায়ও এমনি কীর্তিগাথা রচনার ও গাইবার জন্যে কবি, ভাট, রায়বার (দূত) ও কথক রাখা হত। এমনি দুএকটি গাথা প্রতিভাবান কবির মানসের ও আবেগের লালন পেয়ে সার্থক কাব্য-নাট্য-নাটক রূপে গোটা জাতির সম্পদে ও ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ইলিয়াড-ওডিসি-আলেফ লায়লা-শাহনামা-রামায়ণ-মহাভারত এমনিভাবে অবিনশ্বর মানব-উত্তরাধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। হাতিয়ারবিরল আদিম যুগে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বাহুবল ও সাহসই ছিল নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন। ঐ সাহস ও বীরত্বের উৎস ছিল স্বজনরক্ষার প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ। তাই আদি কাব্য-নাটকে শৌর্য-বীর্য-পরার্থপরতায় দানই ছিল মুখ্য এবং নীতি-আদর্শ নিষ্ঠাই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামায়ণ-মহাভারতও আদিতে কোন গোষ্ঠীর রূপকথা রূপে চালু হয়েছিল, পরে তা ব্যাস-বাল্মীকির প্রতিভার পরিচর্যা পেয়ে সর্বভারতীয় জাতীয় মহাকাব্যের অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আদি-চেতনার রেশ রয়ে গেছে—দুটো কাব্যই যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজকীর্তির ধারক।

আড়াই হাজার বছর আগেই 'রামকথা' তিনটে ভিন্ন ধরনের কাহিনীরূপে ভারতবর্ষে চালু ছিল। একটি বাল্মীকির কাব্যে বিধৃত ধারা, একটি বৌদ্ধ 'দশরথ' জাতকের ধারা এবং অপরটি দাক্ষিণ্যত্যে প্রচলিত কাহিনীর ধারা। এতেই বোঝা যায় এ কাহিনী অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে উদ্ভূত।

দরশথ জাতক (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতকে রচিত) মতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা একই মায়ের সন্তান, ভরত অন্য মায়ের পুত্র। বারাণসীরাজ দশরথের কাছে ছয় বছর বয়স্ক পুত্র ভরতকে রাজা করার জন্যে ভরতনামা বরানুযায়ী আবদার করলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার জীবননাশের আশঙ্কা করে দশরথ তাঁদের হিমালয় প্রান্তে বার বছর বনে বাস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে দশ বছর অতিক্রান্ত হলে দশরথের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বর্তমানে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে অমাত্যরা অস্বীকৃত হলে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বনে গমন করেন। রাম পিতৃ আদেশ অনুযায়ী আরো দু বছর বনে বাস করতে চাইলেন, তাই রামের পাদুকা ও লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে 'পাদুকা'কে প্রতীক করে ভরত রামের পক্ষ হয়ে দুবছর শাসন করেন। তারপর রাম ফিরে এসে ভগ্নী সীতাকে বিয়ে করে রাজত্ব করতে থাকেন। এখানে কিষ্কিন্ধ্যা বা লঙ্কাকাণ্ড নেই।

দাক্ষিণাত্যে চালু রাম-রাবণ কাহিনীতে রাবণই নায়ক। ইনি পরম ধার্মিক। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গভীর আলোচনা হয়, তিনি ধার্মিক বৌদ্ধ। হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণেও (১২ শতকে রচিত) রাবণই নায়ক। দাক্ষিণাত্যের কাহিনীতে রাবণ লঙ্কাবতার। গ্রন্থনামও লঙ্কাবতারসূত্র। এটি সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ। সম্ভবত খ্রীস্টীয় ১ম-২য় শতকে রচিত।

দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী বৌদ্ধ 'দশরথ জাতক' কাহিনী বৌদ্ধ সমাজে কোনো গুরুত্ব পায়নি, তাই পল্লবিত হয়ে কাব্য-কাহিনীরূপে গড়ে ওঠেনি। দাক্ষিণাত্যে অনার্য সমাজে উত্তরাপথের আর্যবীর রাম অন্তত কাব্যে প্রতিষ্ঠা পাননি, সেখানে রাবণই তাই জাতীয় বীর ও আদর্শ মানুষ। রামভক্ত বানরেরা জ্ঞাতিদ্রোহী হলেও কাহিনীতেও প্রাধান্য পেয়েছে।

উত্তর ভারতে 'রাম আদর্শ আর্যপুরুষের প্রতীক। বাল্মীকি সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রাচীন গল্পভিত্তিক একটি জীবনদর্শন, সমাজনীতি ও ধর্মদর্শন রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যে তাই আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ভাই, আদর্শ শাসক ও শাসনপ্রণালী, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ বীর, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ অনুচর-সহচর ও আদর্শ শত্রুর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়াস প্রকট।

এক কথায় রামায়ণে আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বাত্মক বিকাশ-প্রকাশের রূপ বিধৃত রয়েছে। কাব্যের উপক্রমে কবির এই উদ্দেশ্যও সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। নারদের কাছে বাল্মীকি সর্বগুণসম্পন্ন কোন জীবিত আদর্শ মানুষের সন্ধান চাইলেন "অধুনা পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান, বীর্যবান, ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র? কে সর্বপ্রাণীর হিতসাধন করেন? কে বিদ্বান এবং কে সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যে পটু এবং প্রিয়দর্শন? যুদ্ধকালে কাকে ক্রুদ্ধ দেখলে দেবতা ভীত হন?' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নারদের উত্তর ছিল—"এরই সর্বগুণাধার অযোধ্যার রঘুপতি রাম।" এমন উদ্দেশ্যমূলক অবতার না হলে চলে না, তাই রামই নায়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শ আর্যজীবন-প্রতীক এই নায়ক কিন্তু গৌরাঙ্গ আর্য নন, ইনি আর্যপূর্বকালের নবদূর্বাদলশ্যাম মানুষ। ইনি বাহুবলে হরধনু 'ভঙ্গ' করেন অর্থাৎ কিরাতীয় নিষাদীয় মৃগয়া ও পশুজীবীর যাযাবর জীবন পরিহার করেন ও 'সীতা' আবিষ্কার করে কৃষিজীবীর স্থায়ী আবাসিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলেন, কৃষিজীবী রামের পাদস্পর্শে দাক্ষিণাত্যে 'অহল্যা' বসুমতী প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে ফুলে ফলে ফসলে। কাজেই আদি স্তরে জীবিকা বিবর্তনে জীবনের রূপান্তর ও উৎকর্ষের ইঙ্গিতও বহন করে এই কাহিনী। যদিও আর্যায়ণের ফলে ঐ কাহিনী তাৎপর্যভ্রষ্ট ও তুচ্ছ হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র রূপেই কেবল গৃহীত হয়েছে। এই আর্যীকৃত রামায়ণ কাহিনী আদর্শ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ নায়কের গৌরবগাথা রূপে পরিকল্পিত হলেও এতে তিনটে পৃথক কাহিনীতে তিনটে চিরন্তন জীবন সত্য উদঘাটিত হয়েছে। রামায়ণে তিনটি শিথিলগ্রন্থি ঘরোয়া কাহিনী রয়েছে, তিনটের মধ্যে যোগসূত্র কেবল নায়ক রাম। প্রত্যেকটিই উপন্যাসের আদলে বিন্যস্ত। এ যুগেও টমাস মানের Joseph and his brothers এর মতো রামায়ণ কাহিনী দিয়ে যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করা সম্ভব।

ঈর্ষা ও অসূয়াবহ্নি সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের সংসার কিভাবে মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, বৈর ঋ া কিভাবে নিস্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবন তীব্র তরঙ্গসংকুল করে তুলতে পারে—তার যন্ত্রণাবিধুর চিত্র অযোধ্যা কাণ্ডে।

আবার গৃহবিবাদ বা প্রাসাদষড়যন্ত্র কালে বিজাতির সাহায্য নিয়ে আপাত সাফল্য অর্জন করলেও পরিণামে পরাধীনতার শিকলই যে বরণ করতে হয়, ধন-জন, জান-মাল দিয়েও সেই কৃতজ্ঞতা-ঋণ ও আনুগত্যের দায় যে ঘোচে না, তা সুগ্রীব ও বানরগোষ্ঠীর কাহিনীতে স্বতোস্ফূর্ত। রামায়ণ বানর ও রাক্ষসরূপী দক্ষিণ ভারতীয় অনার্যদের উপর নররূপী উত্তর ভারতীয় আর্যদের প্রভুত্ব-বিস্তারের কাহিনীকাব্যও বটে।

আর 'পাপ যে বাপকেও ছাড়ে না'—সভ্য জগতে নারীর মর্যাদাহানি যে যে-কোন অন্যায় কর্মের চাইতেও গুরুতর এবং সমাজ-স্বাস্থ্যের পক্ষে এইটে যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ—আত্মবিশ্বাসই কেবল প্রায়শ্চিত্ত এবং জ্ঞাতিদ্রোহিতায় ও পরানুগ্রহে প্রাপ্তির পরিণাম যে অনুগ্রহজীবিতা তা লঙ্কাকাণ্ডে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য আর্যকীর্তির সগর্ব বিঘোষক আর্যকবি বাল্মীকি আধুনিক মার্কিনীদের মতোই এ দিকে দৃষ্টি দেননি, কেবল নির্বাসিত নায়ক কূটকৌশলে ব্রিটিশের মতো বিনা ক্ষতিতে দুটো রাজ্য জয় করে যে জাতিকে কৃতার্থ করেছেন, তাতেই তিনি উল্লসিত। কিন্তু সুগ্রীব ও বিভীষণ দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে অনুগত সামন্তের নিরাপত্তাই কেবল পেল। তার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে খোয়াতে হয়েছে কত। রামায়ণ-জানা ভারতীয় রাজন্যবর্গ এ-তত্ত্ব কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি, কোন লিপ্সুই পারে না।

৭

কৃত্তিবাস

প্রায় শতেক বছর ধরে কৃত্তিবাস-সমস্যার মীমাংসা-প্রয়াস কেবল বিতর্কই বাড়িয়েছে। এতে তথ্যতত্ত্বে জটিলতা যত তা না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল আলোচক-গবেষকের মানস-প্রবণতার প্রভাব। তাই প্রমাণের চাইতে কখনো কখনো অনুমান গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। ১৮৯৬ সন থেকে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আবিষ্কৃত ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বিধৃত কৃত্তিবাসের 'আত্মবিবরণী'ই ছিল এই বিতর্কের ভিত্তি। পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে) 'ভারতবর্ষ'-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগৃহীত আত্মবিবরণীটি প্রকাশিত করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। বাঙলার সব প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের ও তাঁকে দর্শনদাতা 'গৌড়েশ্বর'কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কারো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। তাই আজো সমাধানপ্রয়াস ও বিতর্ক চলছে—নতুন কোন পাথুরে প্রমাণ না মিললে—প্রয়াস ও বিতর্ক চলতে থাকবে।

উভয় আত্মবিবরণীর পাঠ যথাক্রমে ১৫২ ও ১৮২ ছত্র সম্বলিত। কৃত্তিবাস অনেক কথাই বলেছেন, কেবল আমাদের প্রয়োজনীয় সন-তারিখটাই উল্লেখ করেননি! মধ্যযুগের আলাউল প্রভৃতি অনেক কবিই আমাদের জন্যে ধাঁধা সৃষ্টি করে গেছেন। এই একটি কথা থাকলে আর কিছু না জানা গেলেও চলত; আর ঐ তথ্য নেই বলে যা আছে তা বিতর্কের উৎস হওয়া ছাড়া সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য বিশেষ সিদ্ধ করে না।

আমরা এখানে ডক্টর ভট্টশালী প্রকাশিত আত্মবিবরণীটি উদ্ধৃত করছি :

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভূঞ্জিলেক সংসারের সার ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥
শুভ ভোগ কর্য়া বিহরয় গঙ্গাকূলে।
বসত করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দিগে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই ॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
ব্রাহ্মণের মুখে মুনি কুঃকুরের ধ্বনি ॥
কুঃকুরের ধ্বনি শুনি ওঝা চারিদিকে চাহে।
আকাশ বাণী হয়্যা তত্তা গোসাঞি যে রহে ॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চতে খানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিমে চাপ্যা বহেন গঙ্গা সোনি ॥
ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ায় সন্ততি।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হইল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরাল ধর্ম্মচর্চিত গুণে মহাজ্ঞানী ॥
মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
কুলে-শীলে ঠাকুরালে গোসাঞির প্রসাদে।
মুরারির পুত্র সব বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতায় যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥
সংসার আনন্দ লয়া হৈল কৃত্তিবাস ॥
ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘুসি।
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভূজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হইল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসার গুণশালী ॥
আপনার জন্মরস কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আর কহিতে আছে ॥
সূর্য পণ্ডিতের পুত্র নামে বিভাকর।
সর্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক রয় যাহার দুয়ার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বড়ই সুন্দর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘুষএ সংসার ॥
মুখটি বংশের পদা শাস্ত্র অনুসার।
ব্রাহ্মণে সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মস্বজ্য গুণে।
মুখটি বংশের কথা কত কব জনে জনে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িলাম ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা মাতা আমা কৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে নাম রাখিল কৃত্তিবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃত্তিবাস বলিয়া নাম করিল প্রকাশ ॥
এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তরদেশ ॥
বৃহস্পতি বারের উষা পোহাইলে শুক্রবার।
বারান্ত উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গাপার ॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষা বিদ্যার প্রসার ॥
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারতী ॥
বিদ্যা সাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরেক গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু মহা উর্ম্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি হইল বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর ॥
সপ্তঘটী বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাঠি।
শ্রীঘ্র ধ্যায়া আইল দূত হাথে সুবর্ণ লাঠি ॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ করহ রহইল সম্ভাষ ॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনা রূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিহোঁ গৌরব আপার ॥
তিনপাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরুণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজা সত্যখান যেন দেব অবতার।
তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দণ্ডায়্যাছে রাজার সমুখে ॥
চারিদিকে নাটগীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওয়াসে ॥
আঙ্গিনায় পাতিয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
পথির উপর পাতিয়াছে পাট নেত তুলি ॥
পাটের চান্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দণ্ডাইলাম গিয়া আমি রাজার বিদ্যমান।
নিকট যাইতে রাজা মোরে দিলা হাথ সান ॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বর।
রাজার নিকট আমি চলিলাম সত্বর ॥
রাজার ঠাঞি দণ্ডাইলাম হাথ চারি আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক স্বরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়
শ্লোক শুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িয়া রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজা দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছাড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান ॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়ে গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্রমিত্র সভে বলে শুনে দ্বিজরাজে।
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে ॥
যথা যথা যাই আমি গৌরব মাত্র সার।
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার ॥
আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি।
পাট পাছাড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূসিতি ॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব যে চাহী ॥
যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কৃতিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ার।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধ্যায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
লোকে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিত মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বোঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
মহারাজার আজ্ঞায় বাল্মীকি মহামুনি
রামায়ণ কবিত্ব তিহোঁ করিলা আপুনি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর্য্যা যত দেবগণ।
বাল্মীকির মুখে সবে শুনেন রামায়ণ ॥
পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে ॥
কোন রাজা জিএ ষাটী হাজার বৎসর
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধে কলেবর ॥
রঘু বংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকি মুনির বরে ॥
চতুর্দ্দিকে ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গাসুরেশ্বরী ॥
মুখটী বংশ ওঝা সংসারবিদিত।
তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বনমালী ওঝা মানিকী উদরে।
জনম লইল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
সরস সুন্দর হইল বাণী বিলাস।
ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
মুনি মধ্যে বন্দিব বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে তিহোঁ ত্রিভুবন জিনি ॥
তাহার কবিত্ব শুন রামায়ণ কথা।
ভারতী বন্দিয়া তবে গায়্যা দিল পোথা ॥
সরস ভাষে গায় হাতে তাল ধরি।
ভারতীর প্রসাদে কেহো দোষ দিতে নারি ॥
মুনির বাক্য শুনিতে কেহ না করিহ হেলা।
ইহাতে অমৃত আছে কত রসকলা ॥
পোথার ভিতর কবিত্ব ছিল কেহো নাঞি বুঝে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃত্তিবাসের কবিত্ব সর্ব্বলোক পূজে ॥
আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত্র।
লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

এবার এ যাবৎ যে সব যুক্তি ও প্রমাণ গুরুত্ব পেয়েছে বা গ্রাহ্য হয়েছে অথবা গুরুত্ব পাবার যোগ্য, সেগুলো তুলে ধরছি :

১. রাজা গণেশ (১৪১৭-১৮) থেকে সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) অবধি গণেশ, মহেন্দ্র, জালালউদ্দিন (যদু), নাসিরুদ্দীন, মাহমুদ শাহ, কিংবা রুকনউদ্দীন বারবক শাহ কৃত্তিবাস-উক্ত গৌড়েশ্বর হবেন। কৃত্তিবাস দেশী হিন্দু কবি, হিন্দুর জন্যেই লিখেছেন কাব্য। আত্মপরিচিতির লক্ষ্য সমকালের স্থানীয় হিন্দু সমাজ। কাজেই দেশী হিন্দু অমাত্যের নামগুলোই তিনি পাঠক-শ্রোতার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য মনে করেছেন; সে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই তেমন বিধর্মী বিদেশী অমাত্যের নাম করা অনর্থক হত, ঐ সব মুসলিম নাম তিনি মনেও রাখতে পারতেন না, যাঁদের তিনি নাম করেছেন, তাঁদের হয়তো তিনি চিনতেন বা পরে দরবারে কারো কাছ থেকে কৌতূহল বশে শুনে নিয়েছিলেন। সমকালের স্ব-শ্রেণীর ও স্ব-সমাজের মানুষকে জানাচেনার আগ্রহই স্বাভাবিক। কাজেই এক্ষেত্রে হিন্দু রাজা খোঁজার দরকার নেই। এঁদের আগের বা পরের কোন গৌড়েশ্বর এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নন।

২. কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের দরবার হিন্দু অমাত্যে পূর্ণ, কাজেই এই গৌড়েশ্বর সম্ভবত হিন্দু। সমকালীন রাজার নামোল্লেখ বাহুল্যবোধে কৃত্তিবাস করেননি। শাসক-প্রশাসকের ব্যক্তিগত নাম আমরাও করি না।

৩. কৃত্তিবাস-উল্লিখিত কেদার রায় নারায়ণ, মুকুন্দ জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজনের দরবার সংশ্লিষ্ট থাকার ও পনেরো শতকের শেষার্ধে জীবিত থাকার পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। যেমন মৈথিলস্মার্ত বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দত্তবিবেক' গ্রন্থ ও মুল্লা তাকিয়ার বয়াজ সূত্রে কেদার রায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র মিথিলাস্থ প্রতিনিধি বা নায়েব বলে শনাক্ত করা সম্ভব। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' সূত্রে জানা যায় হোসেন শাহর অন্তরঙ্গ (বৈদ্য) মুকুন্দ ও তাঁর পিতা নারায়ণ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন–

'রাজবৈদ্য নারায়ণ দাস মোর বাপ'।

এবং কুলজী গ্রন্থ সূত্রে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিং-মুরারি বংশীয় অনেকের উল্লেখ মেলে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সুষেণ পণ্ডিত ও কৃত্তিবাসের নাম মেলে।

৪. কৃত্তিবাসের দীর্ঘ আত্মপরিচয় আসরে গায়েন ও শ্রোতার পক্ষে অবান্তর ছিল বলে গায়েন বা লিপিকর ৮-১০ ছত্রে কৃত্তিবাসের পিতামাতার নাম, গ্রাম ও তাঁর কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও ভাই-বোনের সংখ্যা নির্দেশ করেই 'কবি পরিচয়' সেরেছেন। এ-ই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মানুষ কবিতে নয়, কাব্যরসেই আগ্রহী। কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে মোটামুটি ঐক্য রয়েছে। কাজেই আত্মবিবরণী বহুলাংশে অর্থাৎ শেষের কিছু সন্দেহজনক চরণ ব্যতীত অকৃত্রিম।—'সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত'—থেকে শেষ চরণ অবধি অংশটির সঙ্গে পূর্বাংশের রচনাগত, ভাবগত এবং প্রসঙ্গগত সঙ্গতি কম, এটি জনগণের নামে কোন আদি গায়েনের সংযোজন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে জনগণের জবানীতে কৃত্তিবাসের আত্মপ্রশস্তি।

৫. কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ (নরসিংহ, নৃসিংহ) বেদানুজ মহারাজের পুত্র নন, কেননা কুলজীসূত্রে নারসিংহের পিতার নাম শিয়ো বা শিব। বেদানুজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজা (স্বাধীন যদি হন) বলে কারো নাম খড়্গ বা চন্দ্র আমলে পূর্ববঙ্গে মেলে না। যদি ইনি সামন্ত বা ভূস্বামী হন, তা হলে অবশ্য অন্য কথা। আর বেদানুজকে দনুজ করলেও কোন দিশা মিলবে না। ১২৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকের দনুজমাধব, চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন কিংবা দনুজমর্দনদেব গণেশকে নারসিংহের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। কারণ সব সূত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে নারসিংহ-গর্ভেশ্বর-মুরারি-বনমালী-কৃত্তিবাস—এই বংশ লতিকা যথার্থ। এবং মুরারি সাত পুত্রের কেউ কেউ এবং তাঁদের কোন কোন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র নানা ক্ষেত্রে কৃতী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে কুলজী ও অন্যান্য গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়। এমনকি আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও ঐ ফুলিয়ার নৃসিংহের বংশধর। এঁদের বংশানুক্রম ধরে হিসেব করলে উক্ত সামন্ত দনুজ-ত্রয়কে নারসিংহের সমকালের মহারাজা বলা যাবে না।

৬. অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই একটিমাত্র যুক্তি দিয়ে বলা যায়, রামায়ণ বাঙলায় তর্জমার মতো অশাস্ত্রীয় কর্মে পনেরো শতকে কোন হিন্দুই কৃত্তিবাসকে প্রকাশ্যে প্রবর্তনা দিতে পারেন না। মুখে তর্জমা করা কিংবা গাওয়া এক কথা আর লিপিবদ্ধ করে আচণ্ডালের আয়ত্তে দেওয়া ভিন্ন কথা। শাস্ত্রের লিখিত তর্জমার ব্যাপারে দুনিয়ার সব শাস্ত্রীই চিরকাল বাধা দিয়েছেন। ভারতে তো কথাই নাই—যেখানে নগণ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের পুরুষ ছাড়া কারো শুনবারই অধিকার ছিল না। কাজেই দনুজ মুসলিম মর্দনে ব্রতী রাজা গণেশ কৃত্তিবাসকে এমন পাপকর্মে প্রবর্তনা দিতে পারেন না, যদি দেন, তাহলে রৌরব নরকে সেই পাঁতির মূল্য কি?

৭. ষোল শতকের কবি জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের উপক্রমে প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ করেছেন : "রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি/পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি। অবৈষ্ণববদ্বেষী জয়ানন্দ (খুড়াজ্যেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি) যখন অবৈষ্ণব কৃত্তিবাসের নাম করেছেন, তখন বুঝতে হবে কৃত্তিবাস দূর অতীতের মৃতব্যক্তি।

৮. ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী তাঁর 'শফরনামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান বারবক শাহ ঘোড়া উপহার দানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী সুশাসকও ছিলেন। ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী, মালাধর বসু ও রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রকে, তিনি প্রতিপোষণ ও খেতাব দান করেছিলেন। 'পদচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে, তিনি বারবক শাহ থেকে রায়মুকুট উপাধি ও ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন।

৯. কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর শেষ গুরু দিবাকরের কাছেই পাঠ সমাপন করেন। তবে এক গুরু সম্বন্ধে বলেছেন যে, — 'ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন/হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার প্রসন'। দিবাকর ছাড়াও তিনি হয়তো 'ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি চ্যবন' সম বৃহস্পতি মিশ্রের কাছেও পড়েছেন। জন্মস্থান রাঢ়ে হলেও দরবারাশ্রিত বৃহস্পতি মিশ্র গৌড়ে থাকতেন। তাঁর উদ্দেশেই হয়তো গায়েন বন্দনা করেছেন—"রাঢ়া মধ্যে বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি/যাঁর ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি।"

১০. কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন, গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হবার আগেই তিনি কবিতা রচনা করতেন, তাই তিনি বলেছেন—'যথা যাই আমি গৌরব যে চাহি/যত যত মহাপণ্ডিত আছএ সংসারে/আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।' কিন্তু গৌড়েশ্বরের কাছে তিনি স্বরচিত নানা রসের যে সপ্তশ্লোক নানাছন্দে উচ্চারণ করে কবিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন—সে শ্লোকগুলি কি সংস্কৃত না বাঙলায় রচিত? শ্লোক বললেই কি সংস্কৃত বুঝতে হবে? তা-ই যদি হয়, সংস্কৃত ভাষায় কবিত্বের পরিচয় দিয়ে বাঙলায় পয়ার ও লাচাড়ি লিখবার প্রবর্তনা পাবেন কেন? তাছাড়া "বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ/বাল্মীকির প্রসাদে রচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামায়ণ গান।" এতে গুরুর আজ্ঞা আবিষ্কার রচনা করেছেন—কিন্তু এ অর্থ কষ্টকল্পনা জাত, বরং সহজ মানে এই পিতামাতার আশীর্বাদ ও গুরুর শুভেচ্ছার বলে বাল্মীকির প্রসাদে রামায়ণ গান রচনা করেন কৃত্তিবাস। তাছাড়া ঐটি প্রশংসাকারী লোকদের জবানীতে উক্ত। সেই কারণেও এটিতে কারো আদেশ-নির্দেশ আবিষ্কার করা চলে না। আগেই বলেছি পনেরো শতকের কোন নিষ্ঠশাস্ত্রী বা হিন্দুর পক্ষে রামায়ণ রচনায় উৎসাহ দেওয়া অসম্ভব। অতএব—

বাপ মা এর আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান।

(হারাধন দত্তের পুথির পাঠ)

কিংবা

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
(ক-ধ পদান্ত মিল নেই) এই পাঠ গায়েন-লিপিকরের সংযোজন।

কাজেই আমাদের ধারণা কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর প্রথমাংশ ১৫০ চরণ অবধি অকৃত্রিম। তবে গায়েন-লিপিকরের হাতে কিছু শব্দের রূপান্তর হতে পারে। এখানে তাঁর যেসব জ্ঞাতি পরিজনের উল্লেখ রয়েছে তাঁদের অনেকেই নানাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের অনেকের নাম ও ব্যক্তিত্ব মহাবংশাবলী ও অন্যান্য কুলজী গ্রন্থে সমর্থিত। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর বিবৃতির সঙ্গেও কৃত্তিবাসের উক্তির সাদৃশ্য রয়েছে। গায়েন প্রদত্ত কবি পরিচিতিতেও রয়েছে কবির মা-বাপ-ভাই-বোনের নাম। কৃত্তিবাস যে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন, তাও গায়েন প্রদত্ত কবির সংক্ষিপ্ততম পরিচিতির মধ্যেও উল্লিখিত রয়েছে।[১]

অবতার কাহিনী রামায়ণের মতো পবিত্র গ্রন্থ বাঙলায় তর্জমা করার মতো অশাস্ত্রীয় পাপকর্মে কোন হিন্দুই পনেরো শতকে প্রবর্তনা দিতে পারে না। কাজেই কৃত্তিবাস কোন সুলতানের দরবারে সংবর্ধিত হয়েছিলেন—হিন্দু রাজার সভায় নয়। তাছাড়া 'নয় বৃহন্দের মালিক কখনো সামন্ত হতে পারে না। এবং সামন্তও শাহ-সুলতান রাজা-মহারাজা হতে পারেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর হতে পারেন না। এই সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ বলেই মনে হয়। দেশী হিন্দু কবি কৃত্তিবাস হিন্দুর জন্যই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর আত্মপরিচিতির লক্ষ্যও সমকালের ও স্বস্থানের হিন্দুসমাজ। কাজেই দম্ভপ্রবণ সম্মানগর্বিত কবি তাঁদের জ্ঞাতার্থেই দেশী হিন্দু অমাত্যদের নামোল্লেখ করেছেন — যাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই সেই বিদেশী বিধর্মী অমাত্যদের সম্বন্ধে দেশী হিন্দুর কৌতূহল থাকার কথা নয়, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কবি তাই কেবল হিন্দু অমাত্যদের নামোল্লেখ করেছেন। অহিন্দুর বা বিদেশী হিন্দুর নামও কৃত্তিবাস হয়তো মনেও রাখতে পারতেন না, পূর্বে দেখা বা শোনা না থাকলে ঐসব হিন্দু অমাত্যের নাম ও পরিচয় জানা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হয় তিনি দরবারের কোন কর্মচারীর কাছ থেকে পরে উপস্থিত অমাত্যদের নাম জেনে নিয়েছিলেন, তাঁর কাব্যের উপক্রম রচনার সময়ে তাঁর রাজসংবর্ধনা প্রাপ্তির সাক্ষী স্বরূপ ঐসব অমাত্যদের নামোল্লেখ করে তিনি পাঠক শ্রোতার কাছে তাঁর মর্যাদাবৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কবি কৃত্তিবাসের দম্ভোক্তি ও আত্মশ্লাঘা কাব্যে লক্ষণীয়। লোকের জবানীতে আত্মপ্রশস্তি রচনার মতো অশোভন কাজেও তিনি

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২৫-৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জাবোধ করেন নি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী এত দীর্ঘ যে তা শুনাবার-শুনবার ধৈর্য গায়েন বা শ্রোতা কারো থাকার কথা নয়, গায়েন-পাঠক-শ্রোতা কবিতে নয়, কাব্যরস বা গীতিরসেই আগ্রহী। তাই গায়েনরা ৮/১০ ছত্রে (অন্যান্য পুথিতে যেমন পাওয়া যায়) কবির মা-বাপ ও নাম-নিবাসের পরিচয় দিয়ে পালা শুরু করত। এরূপে চার শতাব্দের অবহেলায় কৃত্তিবাসের 'আত্মপরিচয়' অংশ বিরল ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসই প্রথম ব্রাহ্মণ যিনি পাপভয় পরিহার করে বাঙলায় রামায়ণ গান রচনে-কথনে অগ্রসর হয়েছিলেন। হয়তো লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির আশঙ্কা দূর করার জন্যে তিনি রাজসম্মানের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন :

গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।
যত যত মহাপণ্ডিত আছ এ সংসারে
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।

কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন গৌড়দরবারে উপস্থিত হবার আগেই। তাঁর উক্তি মতে তিনি কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন— যত যত মহাপণ্ডিত আছ এ সংসারে/আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে!' কবিত্ব গৌরব ছাড়া তিনি অন্য 'ইনাম' চান না বলেই দরবারে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ রাজা থেকে তিনি পুষ্পমালা, পাটের পাছড়া (রেশমী চাদর) এবং মাথায় চন্দন প্রলিপ্তি পেয়েই তুষ্ট। কোন দান গ্রহণে তাঁর অনীহা। কৃত্তিবাসের স্বমুখে দম্ভোক্তি অশোভন হলেও তিনি যে মেধাবী, বহু বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন উচ্চাভিলাষী এবং কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পাঠে আগ্রহ না থাকলে এগারো বছরের বালক নির্বান্ধব বিদেশ বরেন্দ্রে স্বেচ্ছায় যেত না। আর জোর করে মা-বাপ এতো ছোট বালককে যানবাহনবিরল সে-যুগে কিছুতেই পাঠাতে পারতেন না। বরেন্দ্রেও এই জিজ্ঞাসু নিষ্ঠ বিদ্যার্থী নানা স্থানে, নানা গুরুর কাছে স্বেচ্ছায় নানা বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কৃত্তিবাস মুক্তবুদ্ধি ও দুঃসাহসী যুবক ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণপণ্ডিত হয়েও রামায়ণ রচনার মতো দেশাচারবিরুদ্ধ অশাস্ত্রীয় অপকর্মে সগর্বে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাজদরবারে অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের এই আগ্রহ তাঁর উচ্চাভিলাষ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, ও সপ্রতিভ স্বভাবের পরিচায়ক। লক্ষণীয় যে লৌকিক দেবতার প্রভাব ও প্রসার রোধ করে গণমানবকে সনাতন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুগত রাখার একটা সচেতন চেষ্টাও ছিল দরবারঘেঁষা শিক্ষিত উচ্চবিত্তের কায়স্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

তিনি কারো আদেশে-নির্দেশে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি-এ বিষয়ে প্রশংসামুখর লোকের জবানীতে তাঁর নিজের উক্তি এই —

বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।

এর সহজ ও একমাত্র অর্থ এই—বাপ মায়ের আশীর্বাদে ও গুরুর শুভেচ্ছা বলে আদি কবি বাল্মীকির প্রসাদে কৃত্তিবাস রামায়ণ গান রচনা করেন। এখানে 'রচে' ক্রিয়াপদে গুরুত্ব দিয়ে গৌড় দরবারে উপস্থিতির পূর্ব থেকেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছেন—ধারণা করা অসঙ্গত। কারণ গোটা আত্মপরিচয়টি রচিত হয়েছে কাব্যের উপক্রম হিসেবে এবং গৌড়দরবারের সেই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির কথা স্মৃতি থেকেই রচনাকালে বিধৃত। এ ক্রিয়াপদে 'ঐতিহাসিক বর্তমান' কাল ব্যবহৃত মাত্র। কবির 'আত্মকথা' অংশ পাঠে মনে হয়, কবি শিক্ষাপর্ব সমাপনের অনতিকাল পরেই গৌড়েশ্বরের দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, এমনো হতে পারে যে শেষ গুরুর কাছে মঙ্গলবারে বিদায় নিয়েই হয়তো তিনি রাজধানী গৌড় যাত্রা করেছিলেন এবং গৌড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বাড়ি ফিরে রামায়ণ রচনা শুরু করেন—তাঁর আদর্শ কবি বাল্মীকি যেমন বেদনা ও করুণাসঞ্জাত শ্লোক উচ্চারণ করেই—সুপ্ত শক্তির সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে লাগানোর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ব্যাকুল বাসনার প্রসূন ঐ অমর কাব্য, তেমনি রাজদরবারে প্রশংসিত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ে ঋদ্ধ কৃত্তিবাসও আপন প্রতিভা চিরকালের জন্য প্রমূর্ত করে রাখবার বাসনায় অচিরে লেখনি ধারণ করেছিলেন। কৃত্তিবাস রামায়ণের শুধু প্রথম কবি নন, সর্বপ্রধান কবিও। গত পাঁচশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কৃত্তিবাসের মতো এমন সর্বজনশ্রুত সর্বজনপ্রিয় কবি বাঙলাদেশে কেউ আবির্ভূত হননি। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী পড়েই তাঁর 'পুরস্কার' কবিতা রচনা করেছিলেন। আত্মবিবরণীর দরবার দৃশ্য ও কবির বক্তব্য পুরস্কার কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরস্কার কবিতায় রাজার নাম মহেন্দ্র।

আত্মপরিচয় সূত্রে কৃত্তিবাস তাঁর জন্মতারিখ উল্লেখ করেছেন : "আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস"-এ তাঁর জন্ম হয়, অর্থাৎ মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু দিন মাসের উল্লেখ থাকলেও কোন্ বছরে তাঁর জন্ম তার উল্লেখ নেই; তাই সমস্যা।

সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মাঘমাসের রোববারে শ্রীপঞ্চমীতিথি পনেরো শতকের কোন্ কোন্ বছরে ছিল, তা কানুপিল্লাই-এর গণনারীতি অবলম্বনে নির্ণয় করে কৃত্তিবাসের জন্ম সন বের করেছেন। আমরা তাঁর নিরূপিত সন তারিখ সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। তাই তাঁর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি :

"কৃত্তিবাসের জীবনের একাদশ বর্ষের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং দ্বাদশ বর্ষের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার :

এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ
হেন বেলা পড়িলুঁ গেল্যাম উত্তর দেশ।
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার।

কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী (অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমী) তিথিতে রবিবারে—ধরা যাক 'ক' সালে। তা হলে বাংলা রীতি অনুযায়ী 'ক'+১১ সালের মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি এগার বছর পূর্ণ করে (এগার নীবড়ে) বার বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন এবং ঐ সালের ('ক'+১১) ঐ তিথি পড়েছিল শুক্রবার। এই যোগাযোগ খুব সচরাচর ঘটে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গেলে, যে সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম গ্রহণ করার কথা) এই যোগাযোগ সত্যই ঘটেছিল ১৪৪৩ ও ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দের ক্ষেত্রে। স্বামী কানুপিল্লাইয়ের Indian Ephemeries (Vol. V, p.৪৪ এবং p.110) থেকে দেখছি যে ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী (শুক্লাপঞ্চমী) তিথি পড়েছিল রবিবারে-৬ই জানুয়ারী তারিখে এবং তার এগার বছর পরে ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি পড়েছিল শুক্রবারে — ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উত্তরবঙ্গের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫ থেকে ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।" [প্রাঃ কঃ পঃ সময় পৃ: ১৬৭-৬৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৭০ সনের পরে যদি কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে থাকেন এবং তার পরেই যদি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন তা হলে গুণরাজ খান মালাধর বসু ও কৃত্তিবাস প্রায় সমসময়েই গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন এবং মালাধর বসু ১৪৮০-৮১ সনে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কৃত্তিবাসের বিপুলায়তন গ্রন্থ ১৪৮০ সনের আগে কিংবা পরে সমাপ্ত হয়েছিল কিনা তা জানবার উপায় নেই। তবে মালাধর বসু রাজকর্মচারী (ছত্রী) ছিলেন, তাঁর অবসর কম থাকার কথা। কৃত্তিবাস হয়তো চাকুরীজীবী ছিলেন না—কাজেই তাঁর কাব্য রচনায় দীর্ঘকাল নাও লাগতে পারে—অবশ্য এ ধরনের অনুমানের কোন সার্থকতা নেই। এ গ্রন্থেও কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণ বাঙলায় তর্জমা করে দেওয়ার কারণস্বরূপ গায়েন বলেছেন :

"সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত
লোক বুঝাইতে হৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।"

কিংবা

"আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম রচিত
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।"

কৃত্তিবাসের কবিত্ব-পাণ্ডিত্য ও কাব্যগুণ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এরূপ :

কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে। 'গুণশালী' কথাটির যদি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে কোন সার্থকতা থাকে তবে বুঝিব তিনিও রামায়ণ গাহিতেন। রামায়ণ রচনা ও গান বরাবর ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল ও আছে।

"কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত করিয়াছেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালীও করিয়াছেন। কিন্তু কেহই মূলে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কাব্যের জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন মূল্য। গায়কের পর গায়ক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাঠ বদলাইয়া চলিয়াছিলেন। সেই অনুসারে পুথিও বদলাইতেছিল। সে পুথি অনেক কবি-গায়কের রচনায় স্ফীত। কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুঁথিতেও দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ দাস ইত্যাদি অনেকের ভণিতা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অদ্ভুতাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী রামায়ণ-কাব্য লেখকের রচনাও ঢুকিয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কৃত্তিবাসের কাব্যের যে-সব পুথি আমরা পাইয়াছি তাহাতে ভণিতা ছাড়া আর কিছু খাঁটি (অর্থাৎ মূল রচনা) অব্যাপন্ন রহিয়া যায় নাই।" (বাঃ সাঃ ইঃ ১ম/পূর্বার্ধ/৩সং পৃঃ১১৭)

এই মন্তব্য মুদ্রণযন্ত্রপূর্বযুগের জনপ্রিয় গ্রন্থ মাত্রেরই ক্ষেত্রে কম বেশি প্রযোজ্য।

৮

মালাধর বসু

লোক বোঝানোর জন্য, কিংবা শিক্ষার্থীকে শেখানোর জন্যে দুনিয়ার সব শাস্ত্রকথারই মৌখিক ব্যাখ্যা, অনুবাদ, তথা ভাষান্তর প্রয়োজন ছিল, এবং তা করাও হত। কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করা পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত। সেই যে আপ্তবাক্যে আছে–'বদং শত মা লিখ।' এও হচ্ছে সে বৃত্তান্ত। 'শাস্ত্র' কিংবা 'মন্ত্র' অনুবাদ করলে তার মরতবা থাকে না। শাস্ত্র যত দুর্বোধ্য ও অবোধ্য থাকে, তার প্রতি অনুগতদের শ্রদ্ধাও সে পরিমাণে বেশি জন্মায়। স্বদেশে অনেক প্রবর্তিত ধর্ম যে পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে টেকেনি তা হয়তো ঐ শাস্ত্র সুবোধ্য ছিল বলেই। কথার মূল্য কি বলা হয়েছে তার উপর নয়—কে বলছে— কার মুখনিঃসৃত তার উপরই নির্ভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। কেউ যখন কোন নতুন মত প্রচার করেন, তখন সে মতটা নিখুঁত বলে নয়, যিনি প্রচার করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই মানুষ তাঁর মত গ্রহণ করেন—ঐ অসামান্য ব্যক্তিত্ব ভাষাভঙ্গি, যুক্তি-বুদ্ধি-সাহস-ধৈর্য প্রভৃতির আকারে অভিব্যক্ত হয়, আর দেখা শোনা ও প্রচার-প্রশস্তির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্ব ও মত চারদিকে প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রকথাকে যে মানুষ অলঙ্ঘ্য মনে করেন, তা ভাল বা যুক্তিসঙ্গত কথা বলে নয়, —বক্তায় ও বক্তব্যে যে মহিমা-মাহাত্ম্য আরোপিত রয়েছে তার মতবাদও তাৎপর্য হারিয়ে তুচ্ছ হয়ে যায়। এজন্যেই লৌকিক-অলৌকিক মহিমা-মাহাত্ম্যের আবরণে প্রবর্তক বা নেতাকে দেবকল্প অনন্য-অতুল্য মহামানব করে দেশ-কাল-সমাজের উর্ধ্বে রাখতে হয়। যতদিন এবং যতজনের মধ্যে ঐ ভাবমূর্তি জিইয়ে রাখা যায়, মাত্র ততদিন এবং ততজনের মধ্যেই ঐ প্রবর্তক ও প্রবর্তিত মত টিকে থাকে। বিগত নেতা বা প্রবর্তক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব হলে তাঁর বাণীও তাৎপর্য হারায়। এজন্যেই দুনিয়ার শাস্ত্রপতিরা শাস্ত্র ও শাস্ত্রকর্তাকে সযত্নে গণমানবের নাগালের ও বিচারের বাইরে রাখতে চান এবং কানের ভেতর দিয়ে আবেগপুষ্ট মর্মে সঞ্চার করতে চান বাণী ও বাণীদাতার ভাব ও মূর্তি। দৃষ্টিগ্রাহ্য লিপিযোগে তা মননের যুক্তিবুদ্ধির ও আবেগনিরপেক্ষ বিচারের বস্তু হয়ে পড়লে ঐ মহিমা-মাহাত্ম্য হয়তো ধোপে টিকবে না—এ আশঙ্কা বশেই গণরোধ্য ভাষায় শাস্ত্রকথা লিপিবদ্ধ করা ছিল দুনিয়ার সর্বত্র অবৈধ। এ-দেশেও নারী, শূদ্র প্রভৃতি অনেকেরই শাস্ত্র শুনবারও অধিকার ছিল না। বিধর্মী বিভাষী বিজাতির শাসন যখন প্রবর্তিত হল তখন শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের হুকুম ও হুমকি রাজকীয় সমর্থনের অভাবে আগের মতো অনধিকারীদের প্রতি কার্যকর রইল না। তখন ঐ অসহায় শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের পাঁতি উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকতে হল। সে পাঁতি সবারই জানা :

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

লাভের লোভের মুখে শিথিল চরিতের মানুষ শাস্ত্রের দোহাই, পাপের ভয়, বিপদের শঙ্কা কিছুই গ্রাহ্য করে না। সেদিনও তেমন মানুষেরা আপাতত লাভকেই শ্রেয় মনে করেছে। রাজশক্তির অনুগ্রহলোভী কিছু কায়স্থ ও অন্তত একজন ব্রাহ্মণ পাপভয় ও সমাজনিন্দা উপেক্ষা করে তথাকথিত অপকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সমাজ সেদিন শাস্তিদানের শক্তি হারালেও প্রতিরোধ মানসে তাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল—এবং সেই নিন্দা আঠারো শতক অবধি লঘু-গুরুভাবে চালু ছিল :

'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে
এ তিন সর্বনেশে।'

—এমনিই হয়। মানুষ আপাত স্বার্থের বশ। যেখানে নিশ্চিত প্রলোভন প্রবল সেখানে শরম-সংকোচ ও পাপ-নিন্দা-ভয়ের বাধা স্রোতে তৃণের মতো ভেসে যায়, উনিশ শতকে যাঁরাই বিলেত যাবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা যেমন কালাপানি অতিক্রমণের পাপ এবং সমাজচ্যুতির ক্ষতি হাসিমুখে বহন করেছেন।

উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল লেখাপড়া। তাদের রক্ষণশীলতা ও অসহযোগের ফলে দুশ বছর হয়তো কিছুই লিখিত হয় নি। সবটাই হয়তো কথকতার মাধ্যমে চালু ছিল। অবশেষে যখন ফারসী ও বাঙলা বৈষয়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সংস্কৃতের কদর ইংরেজ আমলের ফারসীর মতো কমে গেল, তখন উচ্চ বর্ণের লোকগুলো বাঙলায় লিখবার প্রেরণা ও গরজ অনুভব করল। এভাবে মন স্থির করতে ও পরিবেশ সৃষ্টি হতে তাদের দুশ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেগে গেল। যদিও গণমানব দেবকথা-ব্রতকথার চর্চা তেরো শতকের গোড়া থেকেই মৌখিকভাবে তথা কথকতার আসরের মাধ্যমে শুরু করে দিয়েছিল।

পনেরো শতকের মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ওঝা প্রমুখ উচ্চাভিলাষী রাজকৃপাধন্য পুরুষ। পাপ ও নিন্দা মুক্তি লক্ষ্যে মালাধর বসু আত্মপক্ষ সমর্থনে চারটি যুক্তি দিয়েছেন:

ক. পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার
অতএব, পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার।

খ. ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ...।
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার
শুনিয়া নিষ্পাব হবে সকল সংসার।।

গ. ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিক মতে।

ঘ. এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ :
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।
তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

এঁদের ধন-মান-যশ লিপ্সা যতই থাকুক, তবু এ তথ্যও অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁরা সাহসী, যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ তাঁদের চিত্তলোক নতুন চেতনায় ও যুগসম্ভাবনায় উদ্ভাসিত করেছিল। তাই তাঁরা শাস্ত্র, সমাজ ও গোঁড়ামী উপেক্ষায় ছিলেন পথিকৃৎ—বলা চলে এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ছোটখাট রামমোহন-বিদ্যাসাগর। কেননা সেদিন তাঁরা ছিলেন শ্রেয়োবাদী, সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তার প্রতিভূ ও দ্রোহী—কালান্তরের আভাস তাঁরাই অনুভব করেছিলেন বলেই যুগান্তরের উদ্‌গাতা হলেন তাঁরাই। সবচেয়ে বড় কথা লোকায়ত ধর্ম-চেতনার প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা অনুবাদ ও অনুসৃতির মাধ্যমে পৌরাণিক তথা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রচেতনা ও শাস্ত্রানুরক্তি লোকায়ত করে জনমনে সঞ্চারিত করে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করে দিলেন। এমনও হতে পারে যে, স্বধর্ম রক্ষার ঐ মহৎ উদ্দেশ্যেই তাঁরা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন, যেমন—পরবর্তীকালে সৈয়দ সুলতান প্রভৃতিও হয়েছিলেন।

মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেন—ভণিতায় তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থকে তিন নামে অভিহিত করেছেন—গোবিন্দমঙ্গল, গোবিন্দবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শেষোক্ত নামটি ছাপা গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। হারাধন ভক্তিনিধি-সংগৃহীত ও চৌদ্দশ পাঁচ শতাব্দে (১৪৮৩-৮৪খ্রীঃ) লিপীকৃত অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার তিন বছরের মধ্যে অনুলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি আদর্শ করে আঠারো শ একাশি খ্রীস্টাব্দে রাধিকানাথ দত্ত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে মালাধর বসুর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুথিতে রচনাকালও মিলেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই জীর্ণ পুথিটির কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এর পরে নানা স্থানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু পুথি সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু রচনাকালটি আর কোন অখণ্ড পুথিতেও নেই। যে পুথিটি রাধিকানাথের আদর্শ ছিল তা চৌদ্দশ পাঁচ শকাব্দেও তথা মূল গ্রন্থ রচিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে লিপীকৃত। অতএব মূল পুথির মতই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ভাষা সর্বত্র এই তারিখ সমর্থন করে না। তাছাড়া এমন অমূল্য দুর্লভ পুথিটিও অযত্নে হারিয়ে গেল। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বানদের মনে নানা জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ। কেউ কেউ প্রাপ্ত রচনাকালটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রচনাকালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি রাধিকানাথ দত্তের আদর্শ পুথিতে ছিল, তার অকৃত্রিমতার কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে। কাজেই ঐ রচনাকাল সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অসঙ্গত। রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি এই :

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন
চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন।'

১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ রচনার শুরু আর ১৪০২ শকে বা ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর সময় লেগেছে ন্যূনাধিক আট বছর। ইতিমধ্যে গৌড়ে সুলতান পাই চারজন। ১৪৭৬ অবধি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ ১৪৭৪-৮০ অবধি শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্, ১৪৮০ সনে কিছুদিনের জন্যে সিকান্দর শাহ্ এবং ১৪৮১-৮৬ অবধি জালালউদ্দীন ফতে শাহ্ ওরফে হোসেন শাহ্। মালাধর বসু গৌড় দরবারে পদস্থ কর্মচারী (ছত্রী) ছিলেন। কর্মদক্ষতার জন্যে বা অন্যগুণে তিনি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্র প্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং তারই নিদর্শন হচ্ছে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ। এটি যে কবি হিসেবে কাব্য রচনার জন্যে পাননি, তা বোঝা যায় যখন কবি বলেন :

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।

লক্ষণীয় এতে কাব্য-কবিত্বের কোন ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া কাব্য রচনা শুরু হয় রুকনউদ্দীনের জীবনের তথা রাজত্বের অবসানকালে। রাজাদেশে সভাকবি হিসেবে কাব্য রচনা করলে পরবর্তী রাজাদেরও প্রতিপোষকরূপে নামোল্লেখ থাকত। অতএব এটি দরবারের কর্মচারীর স্বাধীন কবিকৃতি। তবে শাস্ত্র ও সমাজবিরোধী এ-কর্মে সুলতানের প্রশ্রয় ও উৎসাহ নিশ্চয়ই ছিল, —'আদেশ' যে অবশ্য ছিল না, তা কবির নিজের কথাতেই বোঝা যায়। কাব্য রচনার জন্যে তিনি ব্যাসের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন।

এবার রচনার কালজ্ঞাপক শ্লোকটির যাথার্থ্য যাচাই করা যাক :

১. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত তার প্রমাণ চৈতন্যদেব স্বয়ং এই গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গ্রন্থোক্ত 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' চরণটি মালাধর বসুর পুত্রের কাছে আবৃত্তি করে উচ্ছ্বসিত ভাষায় মালাধর বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই বৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

চৈতন্যদেব– "কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট, ডুরি লইয়া
গুণরাজ খান কৈলা শ্রীকৃষ্ণবিজয়
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।
তোহ্মার কা কথা তোহ্মার গ্রামের কুক্কুর
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রুহ্ দূর।
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।" (মধ্য অধ্যায়-১৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্যদেব এই কথা গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খানের (রামানন্দের) কাছে বলেছিলেন ১৫১৩-১৭ খ্রীস্টাব্দের কোন সময়ে নীলাচলে। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে রামানন্দ ও সত্যরাজকে গুণরাজ ছত্রীর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুথিতে পূর্বোক্ত চরণটির পাঠ—"বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" অতএব 'নন্দের নন্দন' বৈষ্ণব তত্ত্বানুগ পরিবর্তন।

২. রাধিকানাথ প্রকাশিত সংস্করণে দুটো মূল্যবান ছত্র মেলে :

সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন
তারে আর্শীবাদ কর যত সাধুজন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যমঙ্গল' সূত্রে আমরা জানি সত্যরাজ খান রামানন্দ বসু গুণরাজ খানের পুত্র :

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খান (চৈতন্যচরিতামৃত)

কুলীন গ্রামে চৈতন্যদেব উপস্থিত হলে

গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয় নানা মহোৎসব করি— (চৈতন্যমঙ্গল)

অভ্যর্থনা করেছিলেন, এতে মনে হয় সত্যরাজ খানের নামই রামানন্দ বসু। কবিও একপুত্রের জন্যেই আর্শীবাদ কামনা করেছেন।

৩.কুলীন গ্রামের মন্দিরে বৃষমূর্তির গলদেশে উৎকীর্ণ শ্লোকে ঐ মূর্তি সত্যরাজ খান ১৪০৪ শকে বা ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ রয়েছে :

শাকে বিশতি বেদে যে মণৌহি শিব সন্নিধৌ
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং ময়া বৃষঃ।

[নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভূমিকা পৃঃ ৯ সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক : প্রা. ক. প. স. পৃঃ ১৫৯ উদ্ধৃত]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রামানন্দকে 'গুণরাজ ছত্রীতনয়' এবং রামগোপাল দাস তাঁর চৈতন্যতত্ত্বসার নিবন্ধে 'রামানন্দ সত্যরাজ হয় দুই ভ্রাতা'— বলে উল্লেখ করেছেন (প্রা. ক. প. স. পৃ ১৬০)। অতএব প্রাপ্ত রচনাকালটি অকৃত্রিম। তবে 'রামানন্দ আর সত্যরাজ খান' (চৈঃ চ) —এতে মনে হয় রামানন্দ ও সত্যরাজ দুই ভাই। কেউ কেউ রামানন্দকে গুণরাজ খানের পৌত্র বলেও মানেন। সত্যরাজ ও রামানন্দ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ সূত্রে অভিন্ন ব্যক্তি (একছত্র ছাড়া)। আবার বৈষ্ণব সমাজে ওঁরা যথাক্রমে মালাধরের পুত্র ও পৌত্র। এই রামানন্দ বসুই যদি পদকার হন তাহলে পিতা বা পিতামহের মতো তিনি সত্যরাজ খান ভণিতা ব্যবহার করেন নি। কুলজী গ্রন্থ সূত্রেও সত্যরাজ ও রামানন্দের সম্পর্ক কোথাও ভাইয়ের আবার কোথাও বা পিতাপুত্রের। কাজেই মীমাংসা অসম্ভব।

কাব্যোক্ত আত্মকথা ও অন্যান্য সূত্রে মালাধর বসুর পুরো পরিচয় নিম্নরূপ :

মালাধর বসু রাজকর্মচারী ছিলেন। পদের নাম 'ছত্রী'। রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ তাঁর কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি গুণে প্রীত হয়ে তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতা ইন্দুমতী। আর পুত্র রামানন্দ বসু 'সত্যরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত। তিনি জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কাটোয়ার। নিকটবর্তী কুলীনগ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামানন্দ ও সত্যরাজ হয় তাঁর দুই সন্তানের নাম, অথবা সত্যরাজ ও রামানন্দ অভিন্ন ব্যক্তির নাম ও উপাধি, কিংবা এঁরা পরস্পর পিতাপুত্র অথবা ও ভ্রাতুষ্পুত্র— তা নিশ্চয় করে বলা দুঃসাধ্য।

গুণরাজ খানের ভণিতায় 'ধর্ম-ইতিহাস' নামে এক পুথি পাওয়া গেছে। এটি বিষয়ে রামপাঁচালী । 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'ও রামায়ণকথা রয়েছে। এই অংশটি কোন গায়েন হয়তো কথকতার প্রয়োজনে কিছুটা পল্লবিত করেছিল এবং এভাবে হয়তো স্বতন্ত্র রচনার মর্যাদায় চালু হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' সনতারিখ যুক্ত আদিগ্রন্থ। এতে কৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব অবধি বর্ণিত রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ মুখ্যত ষড়ৈশ্বর্যবান। 'পয়ার-প্রবন্ধে' রচিত হলেও এটি সেকালের রেওয়াজ মতো গাইয়ের সবাদ্য গেয় কাব্য। তাই ছন্দ ও রাগরাগিণী নির্দেশিত হয়েছে। এ কাব্য ভাগবতের অনুবাদ বলে পরিচিত বটে, কিন্তু আসলে আক্ষরিক অনুবাদাংশ সামান্য ও সংক্ষিপ্ত। কবি নিজেও একে অনুবাদ বলেন নি :

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।

কাজেই বর্ণিত বিষয় সর্বত্র ভাগবতঅনুগ নয়, —বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশের প্রভাবও আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মালাধর বসু চৈতন্যপূর্ব কালের কবি। এ কাব্যে অরিন্দম অসুরবিনাশী কৃষ্ণের কাহিনীই বর্ণিত বিষয়। কাজেই তাঁর এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ-গোপীলীলার বর্ণনা থাকার কথা নয়। রাধার নামই তো নেই ভাগবতে, দান-নৌকালীলাও ভাগবতে-বিষ্ণুপুরাণে-হরিবংশে নেই। কাজেই মানতেই হবে চৈতন্য সমকালে যখন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও গীতগোবিন্দাদির মতো বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধেয় পবিত্র গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত হল, তখন বৈষ্ণব-পাঠক-কথক-গায়কেরা বৈষ্ণব-তত্ত্বরসের অংশগুলো সংযোজিত করেছে; তাই প্রচলিত সব পুথিতে ঐ সব অংশ নেই। কবি ষড়ৈশ্বর্যময় বিষ্ণুভক্ত, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতো লীলারসিক কৃষ্ণভক্ত নন—তাই এখানে আবেগের প্রবলতা নেই। ফলে কবিতাতেও তেমন লাবণ্য নেই। অবশ্য রাজসভাসদ কবি যখন ১২ স্কন্ধে রচিত ভাগবতের কেবল ১০ম-১১শ স্কন্ধই অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাঁর অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির প্রভাবপুষ্ট কবিমনে শক্তি ও পৌরুষানুরাগও যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না, বিশেষ করে প্রভু সুলতানদেরও ঐ অংশেই আগ্রহ থাকার কথা। বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে বাঙলাদেশে শৈব-শাক্ত মতই প্রবল ছিল, ভাগবতের পুরাণের এই অনুবাদ বিষ্ণুভক্তির সাহিত্যিক অনুপ্রবেশও সূচনা করল। উল্লেখ্য যে, হরিবংশ ষোল শতকের আগে বাঙলায় ছিল প্রায় অজ্ঞাত, অন্তত অনালোচিত। এদিক দিয়েও মালাধর বসু পথিকৃৎ। মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ পনেরো শতক থেকে এখানে বিষ্ণু ভক্তিবাদ প্রচারে নিরত ছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, কাব্যের তথা সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হত না, কবিগণ গ্রহণে-বর্জনে ও সংযোজনে স্বাধীন পথ অবলম্বন করতেন, কাজেই অনুবাদ মাত্রই ছিল কোথাও কায়িক, কোথাও ভাবিক, কোথাও ছায়িক তথা আক্ষরিক, ভাবানুসরণ ও ছায়ানুকরণ,–এক কথায় অনুকরণ-অনুসরণের সাথে থাকত সংযোজন-বর্জন ও রূপান্তরের স্বাধীনতা, তাই মালাধর বসুর রচনায়ও বাঙলার প্রতিবেশ ও বাঙালীর জীবনযাত্রার পরোক্ষ চিত্র মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

ব্রতকথা, মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালী

॥ ১ ॥

লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা মঙ্গল গান নামে আখ্যাত এবং লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা সম্বলিত পাঁচালীগুলো মঙ্গল নামে পরিচিত। পরে অবশ্য মঙ্গল ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল এমনকি আধুনিক গীতিকাব্যের সারদামঙ্গল নামকরণও হয়েছে। লৌকিক দেবতাকাহিনী সম্বলিত পাঁচালী আবার 'বিজয়' রূপেও আখ্যাত হয়েছে। এই 'বিজয়'-ও পরে ব্যাপক অর্থে দেবতা ও মহাপুরুষের মাহাত্ম্য পাঁচালী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রসুলবিজয় প্রভৃতি। 'মঙ্গল' ও 'বিজয়' গোড়া থেকেই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—বিপ্রদাসের পাঁচালীতে বিজয় ও মঙ্গল একই তাৎপর্যে ব্যবহৃত। ভণিতায় ইনি নয় বার 'বিজয়' ও তেরো বার 'মঙ্গল' ব্যবহার করেছেন। কবিচন্দ্র মিশ্র সাধারণভাবে গৌরীমঙ্গল ব্যবহার করেছেন। অন্যেরাও কখনো মঙ্গল, কখনো বা বিজয় বলেছেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা উৎসবে-পার্বণে-অনুষ্ঠানে 'মঙ্গল' গাওয়ার উল্লেখ পাই। মঙ্গল গান যাগযজ্ঞেরও অঙ্গ ছিল। মধ্যযুগের মঙ্গল গান বাদ্য ও নৃত্যযোগে হত। তেল-সিন্দুর-কর্পূর-তাম্বুল দিয়ে সমবেত জনদের আপ্যায়িতও করা হত। এ-শুধু হরগৌরীর বাড়িতেই নয়, মুহম্মদ কবিরের 'মধুমালতী' কাব্যেও মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান দেখি এবং ফাতেমার বিয়ের সময়েও 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহমঙ্গল'। বিপ্রদাসে পাই—"বিধানে মঙ্গলে গীত গায় দিব্যাঙ্গনা।" বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পাই—'আইয়ো আসিবে মঙ্গল গাইতে/তারা চাবে পান খাইতে/তৈল সিন্দুর পাইব কোথা'। তাই মনে হয় উৎসবে-পার্বণে কল্যাণে-কামনা লক্ষ্যে বাদ্য-নৃত্য-সহযোগে যে আনন্দ-গানের অনুষ্ঠান হত, আদিকালে তার সাধারণ নাম ছিল মঙ্গল। মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা, আর মঙ্গল গীতের অনুষ্ঠান—এ দুটোর লক্ষ্য একই। পরে যে-কোন আনুষ্ঠানিক গানই হয়তো 'মঙ্গল' নামে অভিহিত হচ্ছিল এবং আরো পরে কথকতার জন্যে রচিত গায়েনদের গাওয়া দেবমাহাত্ম্য পাঁচালীগুলোও মঙ্গল নামে পরিচিত হয়। ক্রমে পুণ্যার্জন লক্ষ্যে আনন্দ-উৎসব-পার্বণের আপাত প্রয়োজনে যে-কোন দেবতা বিষয়ক গানবাজনা অনুষ্ঠানই 'মঙ্গল' নামে আখ্যাত হয় এবং তখন 'মঙ্গল' অভিধার প্রসারে এই 'মঙ্গলের' সংজ্ঞা পাই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী'তে : "যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয় তা-ই মঙ্গল গান।" বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসামঙ্গল' গীতকে মনসার 'ব্রতকথা' বলেও উল্লেখ করেছেন–'যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়' তাহলে ব্রতকথাও মঙ্গলগান, এবং পাঞ্চালী বা পাঁচালী ছন্দে ও সুরে লেখা ও গাওয়া হয় বলে এই ব্রতকথা-মঙ্গলগান আবার পাঁচালী নামেও পরিচিত হয়। এ পাঞ্চালী বা পাঁচালী পঞ্চালিকা-পুত্তলিকা-পুতুল নাট্যনৃত্য থেকে উদ্ভূত বলে ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা (পৃঃ ১০৩, ১৩৮ বা. সা. ই, পূর্বার্ধ)। কিন্তু ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস দলিল যোগে প্রমাণ করেছেন যে, 'পাঁচালী'-'পঞ্চালক' শব্দজাত। অর্থ মূল গায়েনের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী-ভূমিকা, পৃঃ XVI) অতএব কল্যাণ কামনায় যে ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় যে দেবপ্রশস্তি কথা তা-ই ব্রতকথা এবং মঙ্গল লক্ষ্যে এই ব্রতকথা গীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় বলে এর অন্য নাম মঙ্গলগীতি, এবং পুত্তলিকা বা পঞ্চালিকার অভিনয় মাধ্যমে মঙ্গলগীতি বা প্রশস্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হত বলে অথবা দোহার যোগে গীত হত বলে এর অন্য নাম পাঞ্চালী—পাঁচালী। আর সগীতি পুতুল নাচের বা সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তির একটা বিশেষ ছন্দ, সুর, তান, লয় আছে বলেই পাঁচালী ছন্দ বা পাঁচালী সুর নামে তা পরিচিত হল।

আবার সুকুমার সেনের মতে 'বিজয়' মানে জয়যাত্রা বা জয়কাহিনী। "কল্যাণের দিক দিয়ে দেখিলে 'মঙ্গল' ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয় (পৃঃ ১০৩, বা. সা. ই.)। তবে বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং যথার্থ 'যুদ্ধ জয়'—এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। জায়নুদ্দীনের 'রসুলবিজয়'. কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়' প্রভৃতি যুদ্ধজয়মূলক কাব্য। আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসাবিজয়, গোরক্ষবিজয়, শেখ চাঁদের রসুলবিজয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বা মহিমা-মাহাত্ম্য স্বীকৃতিমূলক কাব্য। কাজেই দুটোতেই জয় বা সাফল্য রয়েইছে।

যাত্রা বা গমন অর্থে 'বিজয়'-এর ব্যবহার সুপ্রাচীন। যেমন-দুর্গার কৈলাস 'বিজয়'। 'বিজয় করিলা যেন নন্দ ঘোষের বালা', 'বন বিজই রামকানু', 'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়'। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পার্বণেও আসর করে নৃত্যবাদ্য-গীতি-অভিনয় সহযোগে দেববিষয়ক মঙ্গল গান গীত হত বলে এগুলো [লোকায়ত নামে] যাত্রা বা মেলার গান রূপেও অভিধা লাভ করে। ক্রম বিকাশের ধারায় কথকতা, নৃত্য-বাদ্য-গীতি-অভিনয় ও আসর বিন্যাসের পার্থক্য অনুযায়ী ব্রতকথা, মঙ্গলগান, যাত্রা, পাঞ্চালী প্রভৃতি বচনাভঙ্গিতে, আঙ্গিকে, নামে ও পরিবেশন রীতিতে পৃথক হয়ে যায়।

অতএব আদি গদ্যে ও ছড়ায় বর্ণিতব্য ব্রতকথা ক্রমে মঙ্গলগীতি, পাঞ্চালী ও যাত্রা নামে পৃথক পরিণতি লাভ করে। চরিতাখ্যান বা মাহাত্ম্যকথার লিখিত রূপ পাঁচালী বা মঙ্গলগীতি কখনো মঙ্গল নামে, কখনো পাঁচালী নামে এবং কখনো বা বিজয় নামে পরিচিত। তবে 'বিজয়' ও 'মঙ্গল' শেষাবধি দেবতা বা মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য গীতিরূপে যোগরূঢ় হতে থাকে। আর যে-কোন কাহিনীকাব্য সাধারণভাবে 'পাঁচালী' নামে নির্দেশিত হতে থাকে। মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালীর সঙ্গে 'কাব্য' যোগ করে মঙ্গল কাব্য, বিজয় কাব্য, পাঁচালী কাব্য বলার রীতি আধুনিক এবং অধ্যাপক-লিখিয়েরা এ রীতির প্রবর্তক ও প্রচারক। 'মঙ্গল' বা কল্যাণ কামনায় গান বা অনুষ্ঠান করাও মঙ্গল। শাহ মুহম্মদ সগীরে পাই—'এহি মতে মঙ্গলা করিয়া মহোচ্ছব'।

আবার তাৎপর্য-বিস্মৃত লোকের কাছে মঙ্গলগান মঙ্গলবার সম্পৃক্ত। অনেকটা 'ধামা ধরা', 'ধামা চাপা' গোছের ব্যাপার। তাদের কাছে এক মঙ্গলবারে পালা শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবার অবধি—আট দিন বা রাত্রিব্যাপী গীত হয় বলে ঐ-সব পাঁচালীর অন্য নাম অষ্টমঙ্গলা পালা বা পাঁচালী। মঙ্গল করেন বলে চণ্ডীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলোদ্দেশ্যে বসান ঘটের নাম মঙ্গলঘট। রাত জেগে গান করা হয় বলে মঙ্গল গানের আর এক নাম রয়নী [রজনী] বা 'জাগরণ'ও।

এক বিদ্বান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন—"হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা বৌদ্ধ বাতিক ছিল, সব কিছুর মধ্যেই তিনি বৌদ্ধ প্রভাব দেখতেন।" আমরা তাঁর এমত সমর্থন করিনে। বাঙলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে লালিত। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে বৌদ্ধজ হিন্দুমুসলিম বাঙালী আজো সে-প্রভাব মনের গভীরে মগ্নচৈতন্যে লালন করে। তার লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারে, তার ঘরোয়া আচারে-আচরণে, তার লোকায়ত দেবতার পূজাপার্বণে আজো বৌদ্ধ শাস্ত্র-সমাজের অনেক কিছুই রয়ে গেছে প্রচ্ছন্নভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলো আজো আমাদের সংস্কারদুষ্ট জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালী হিন্দু যে ভারতীয় অন্য হিন্দুর মতো একক দেবতার উপাসক হতে পারল না—পঞ্চ উপাসক বলে খ্যাত হল, —বহু লৌকিক ও স্থানিক দেবতার পূজারী হল, —যোগে-তন্ত্রে আসক্ত রইল, তুক-তাক-দারু-টোনা-উচাটন-বশীকরণে ও ডাকিনী-যোগিনী কামরূপ-কামাখ্যায় আস্থা রাখে, —সে তো এক কালে বৌদ্ধ ছিল বলেই। এগুলো সবই ছিল বৌদ্ধ যুগে। বৌদ্ধ আচার-সংস্কার বিমোচন মানসে গৌড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠান-পার্বণ-পদ্ধতি আক্ষরিকভাবে প্রয়োগের সুকঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গণমানব অনেককাল রুদ্ধবাক ও প্রকাশ্যে নিষ্ক্রিয় ছিল। বিধর্মী তুর্কী শাসনকালে, হিন্দুর ধর্মের ক্ষেত্রে সরকারের ঔদাসীন্যরূপ প্রশ্রয়ে নির্জিত কিন্তু সংখ্যাগুরু গণমানব শাস্ত্রপতি ও সমাজ-সরদারকে উপেক্ষা করার সাহস ও স্বাধীনতা পেল। তখন বৌদ্ধ যুগের যোগতান্ত্রিক ধারা, নিজেদের অবরুদ্ধ বিশ্বাস-সংস্কার আচার তথা জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা নতুন করে উজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল তারা। এর দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রসূন হচ্ছে সিদ্ধাদের ধারায় নতুন করে আদিনাথ তত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, তন্ত্র, গৃহী বজ্রযানীর দেবতা পূজা, ধর্ম পূজা, পরকীয়া কায়সাধন ও বামাচার বর্জিত দেহসাধন চর্যার প্রাবল্য। ত্রি-শরণের অন্যতম 'ধর্ম' প্রমূর্ত রূপে, অবলৌকিতেশ্বর বিষ্ণু রূপে, আদিনাথ শিবরূপে, প্রজ্ঞা-উপায় এবং ব্রজসত্ত্ব-ব্রজতারা শিব-শিবানী রূপে, সিদ্ধারা যোগী-সন্ন্যাসী রূপে, শ্যামতারা চণ্ডী-কালিকা রূপে এবং যজ্ঞ, মনসা (বিষহরী ও বিষালাক্ষী) রূপে গৃহীত হয়ে আর যোগ, ভোগ ও জড়বাদ প্রতীক যোগীপাল-ভোগীপাল মহিপাল গীত দিয়েই আমাদের বাঙালী জীবনের তেরো শতকের শুরু। ষোল শতকে যে এগুলো প্রবলতর হয়েছিল, তার সাক্ষ্য বৃন্দাবন দাসের উক্তি :

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধন।
বাশুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে-।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত। (চৈঃ ভাঃ)

তর্কের খাতিরে চর্যাগীতিকে বাঙলায় রচিত বলে ধরলে তারপর 'দুশ' বছর ধরে যে তার প্রবাহমানতার লিখিত নিদর্শন মেলে না, তার জন্যে দায়ী নিশ্চয়ই সংস্কৃতপ্রিয় উগ্রব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের বৌদ্ধ ঐতিহ্যদ্বেষণা ও দেশী ভাষাবিদ্বেষ। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভাষাবিদ্বেষী হওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিলুপ্তিতে বৌদ্ধদের অভাবে বাঙলা রচনা বন্ধ হয়ে যায় বলে স্বীকার করতে হবে। বৌদ্ধজ হিন্দু সমাজে এ বাধাজাত সমস্যা ছিল বলেই ওরা সুযোগ পেয়ে গান-গাথা-ব্রতকথা-ইতিকথা-দেবকথা শ্রুতি-স্মৃতি মাধ্যমে চালু রেখে স্বস্থ হতে চেয়েছে, অবসর বিনোদনের জন্যে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়নি। তাদের এ প্রয়াস অব্যাহত ভাবে সতেরো শতক অধিক চলেছে, —এ শতকেই তাদের প্রয়াস পূর্ণতা পায় এবং সংগ্রাম সফল হয়। মধ্যযুগের অমুসলিমের লিখিত ও অলিখিত রচনা মাত্রই লোকায়ত দেবসাহিত্য বা ধর্মসাহিত্য। এই সব রচনায় বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব, বেদতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রায় সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। জয়দেব বুদ্ধকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অবতার বলে স্তুতি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও তাই মন-পবন-দশদ্বার যোগ-কায়সাধন, বাণ প্রভৃতি পাই। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস পিপিলাই ও ক্ষেমানন্দ ধর্ম-নিরঞ্জনের বন্দনা করেছেন, বিজয়গুপ্ত কামরূপ-কামাখ্যার মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীকে মনসার মন্ত্র প্রয়োগের সহায়ক করেছেন। শাহ্ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান দেবধর্মের আরাধনার কথা বলেন; শেখ ফয়জুল্লাহ্, পীর মীর সৈয়দ সুলতান, হাজী মোহাম্মদ, শেখ চাঁদ, আলী রজা প্রভৃতি অধ্যাত্ম সাধনার নামে বৌদ্ধ বজ্রসহজযান স্বীকার করেন। যোগ ও যোগী, তন্ত্র ও তান্ত্রিকের মহিমা বাঙলা সাহিত্যের কোথাও কীর্তিত হয়নি। বৌদ্ধ প্রভাব স্বীকার করেই, বিকৃতি ও বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজতত্ত্ব অঙ্গীকার করেই আমাদের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনার শুরু ও বিকাশ। নাথপন্থী সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল তাই আজো সুলভ। এই সব জীবনে ছিল বলেই সাহিত্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। কাজেই আমাদের বাঙালী মানসের, বহির্জীবনের এবং তত্ত্বচিন্তার ও সংস্কৃতির সন্ধান পেতে হলে বৌদ্ধ বাতিক বরং একটু বেশি করেই দরকার। আমাদের অকৃত্রিম পরিচয়, আমাদের মানসরূপ ঐ তত্ত্বভাবনায় নিহিত।

উল্লেখ্য যে, মৌল বৌদ্ধতত্ত্ব আমাদের দেশে অবহেলিত, বৌদ্ধনামের আবরণে অস্ট্রিক-মঙ্গোল চিন্তা-চেতনা-চর্যা ও তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজযান বা তত্ত্ব বাঙলাদেশে স্বতো বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে। আমাদের অধ্যাত্ম ও বিষয়ী চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য বা স্বাজাত্য মেলে নেপালী-তিব্বতী চিন্তা-চেতনায়। কোল-ভিল-সাঁওতাল-মুণ্ডা যেমন আমাদের নিকট জ্ঞাতি, তেমনি আমরা নেপালী-তিব্বতী-মঙ্গলের রক্তসম্পৃক্ত। তাই এই সম ও সহ ভাবাপন্নতা। সাংখ্য ও যোগ অস্ট্রিকের দান, আর তন্ত্র বা মন্ত্র মঙ্গলভাবনার প্রসূন। অমৃতকুণ্ড, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, চর্যাগীতি তাই হাজার বছর আগেকার বাঙালীর শাস্ত্র ও চর্যাগ্রন্থ। ডাক-ডাকিনী, যোগী-যোগিনীই আমাদের মুনি-ঋষি, সিদ্ধাই আমাদের গুরু। কায়াই আমাদের সাধ্য, সহজানন্দ বা বিরমানন্দই আমাদের লভ্য। আমাদের বিকাশপ্রসূন, বোধিচিত্ত, আমাদের উপলব্ধি তত্ত্ব শূন্যতা। নাদ-বিন্দু আমাদের জ্ঞেয়, করুণাই আমাদের পন্থা, প্রজ্ঞা আমাদের পাথেয়।

আমাদের আদি মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য লোকায়ত। ধর্মপূজাবিধান, ধর্মঠাকুর মাহাত্ম্য কথা, শূন্যপুরাণ, সিদ্ধাকাহিনী, গোরক্ষবিজয়, নাথগীতিকা প্রভৃতি অলিখিত বৌদ্ধ লোকরচনার সঙ্গে পাই মনসা-শিব-চণ্ডী-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি স্থানিক ও লৌকিক দেবতাকেন্দ্রী গণসাহিত্য।

আস্তিক মানুষ মাত্রই অপৌরুষেয় শক্তিনির্ভর। তাছাড়া ধন-জন প্রাণের নিরাপত্তাকামী অজ্ঞ অসহায় অশিক্ষিত মানুষ দৈবনির্ভর না হয়েই পারে না। ইষ্টদেবতা বা উপাস্যের অসন্তোষভয়ে আস্তিক মানুষ আজো কৃতিগৌরব এককভাবে দাবি করতে অন্তরে ভয় পায়, 'অহম'কে সে নিমিত্ত মাত্র মনে করে, —আরো অগ্রসর হয়ে বলে—মানুষ যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র, লীলাময়ের হাতের পুত্তলিকা মাত্র। কাজেই দৈবনির্ভরতা তার মর্মমূলে। এই দেবকল্পনা আপেক্ষিক—তার জীবন-জীবিকার সহায়ক শক্তি হল মিত্র দেবতা আর প্রতিকূল শক্তির নাম অরি দেবতা, সে মিত্রকে শ্রদ্ধাভক্তি করে আর অপ্রতিরোধ্য প্রবল অরিকে করে তোয়াজ। কাজেই বাহ্যত অরিমিত্র নির্বিশেষে শক্তিকেই তোয়াজ-স্তুতি-পূজা-মানতে বশ রাখবার নীতিই নির্বিঘ্নে জীবন-জীবিকার পক্ষে উত্তম পন্থা বলে মেনে নিয়েছে সে। এই লাভ ও ভীরুতাজাত আনুগত্য তথা দাসত্ব মানুষের মন-আত্মার স্বাধীন বিকাশের তথা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা। বাঙলী সে বাধার শিকার। অথচ সে জীবনকে ভালোবাসে। মর্ত্যপ্রীতি তার মজ্জায়। নির্বিঘ্নে বাঁচার জন্যে সে কখনো আত্মশক্তির কিংবা আত্মিক শক্তির চর্চা করতে চায়নি। জীবনকে ভালোবাসে অথচ জীবনকে যথেচ্ছ উপভোগ করবার মতো আত্মপ্রত্যয় বা সামর্থ্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বল নেই, তেমন মানুষ পরজীবী না হয়ে পারে না। এমন মানুষের বেঁচে থাকার পন্থা দুটো—হয় ভিক্ষা, নয়তো চুরি। ভিক্ষাপ্রবৃত্তি বশে সে দেবতার কাছে বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্তির জন্যে ধর্না দেয়, আর শ্রমকুণ্ঠ বলেই সে কর্মবিমুখ—খিড়কীদোর দিয়ে অনায়াসে পাবার বাসনায় সে ঝাড়-ফুঁক-দারু-টোনা-বাণ-উচাটন-তাবিজ-কবজ-মাদুলির আশ্রয় নেয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে। গুপ্তপথে কার্যসিদ্ধির এই প্রবৃত্তি চৌর্যবৃত্তির নামান্তর।

দুটোর কোনটাই যাদের পছন্দ হয়নি, তারা এ জগৎকে মায়া ও জীবনকে যন্ত্রণা বলে প্রচার করে আর্তনাদকে আত্মপ্রবোধে চাপা দিতে চেয়েছে—তারাই দেহবাদী বৈরাগ্যবিলাসী। লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা এই দৈবনির্ভরতা পাইনে, তার কারণ তাঁরা গীতা-স্মৃতি-সংহিতা শাসিত সমাজগঠনে নিরত ছিলেন। তাই তাঁদের সাহিত্য ছিল রোমান্টিক ষড় বা নব রসের ভিয়ান দেয়া। তুর্কীমুঘল আমলে শাস্ত্রসমাজের শিথিল শাসনের সুযোগে আদি বাঙালী মনমেজাজ পাথর চাপা দূর্বার মতো দুর্বার হয়ে উঠল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য তারই ফল। এই সাহিত্যে পরজীবীর তোয়াজস্তুতি যেমন দেখি, তেমনি পরস্বাপহারীর ছল-চাতুরী-প্রতারণা-প্রবঞ্চনাও পাই, আর পাই বাউলে-বৈষ্ণবে সেই বৈরাগ্য— যা আত্মোন্নয়নের নামে আত্মহনন মাত্র। এই চরিত্রের মানুষ কখনো বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না, —তাই বাঙালীর রাজনীতিক-ব্যবসায়িক অতীত লজ্জাকর—কলঙ্কজনক। আত্মপ্রত্যয় ও স্বনির্ভরতা ছিল না বলে আমাদের মধ্যে উদ্ভাবন-আবিষ্ক্রিয়া সুলভ নয়। আবিষ্কার-উদ্ভাবনের পূর্বশর্ত হচ্ছে পুরাতনে অস্বস্তি, প্রয়োজনবোধ, স্বীকৃত তত্ত্বে ও তথ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা। আমাদের মনে এসব ক্ষেত্রে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা ছিল না, —তাই আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারের জগতে আবর্তন-অনুবর্তন ছিল, বিবর্তন ছিল না, লাটিমের মতো ঘুরেছি, এগোইনি। আমাদের মানসফসল তাই কেবল মৌসুমে-মৌসুমে আবর্তিত হয়েছে—হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করেছে, কিন্তু নতুন কিছু দেয়নি। য়ুরোপের আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও লোকগ্রাহ্য বলেই তা নির্বিচারে মেনে নেয়নি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসার মন ও দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করেছে, —ফলে আমরা যা কিছু যোগ ও যাদু দিয়ে পেতে চাই, তার সবটাই ওরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শ্রম দিয়ে পেয়ে গেল। মন্ত্রযোগে আমরা ত্রিভুবনে ভোগের ও উপভোগের শক্তি ও সামগ্রী চেয়েছি—পাইনি।

য়ুরোপ আত্মবলে সব কব্জার মধ্যে আনতে চেয়েছে—সফল হয়েছে। যোগ-যাদু দিয়ে আমাদের দেশের মানুষ অমৃত ও আনন্দ চেয়েছে, পায়নি। মৃত্যু এড়ানো গেল না দেখে, বাঞ্ছা ছোট করে মোক্ষ চেয়েছে—পায়নি। তারপরে যন্ত্রণাভীতি বশে স্বর্গ চেয়েছে—পায়নি, তারপরে মর্ত্যে ধন-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছে—তাও পায়নি। তবু যাগ-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র ছাড়ে না।

এই বৈচিত্র্যবিহীন আবর্তিত জীবনেও কিন্তু বিদ্যুতের মতো, স্ফুলিঙ্গের মতো একবার একটি মনে একটি গল্পে এককালে ও একস্থানে প্রত্যয়ী-আত্মা জেগেছিল, সকল বাঁধন তুচ্ছ করে, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে প্রাণের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, এমন আকাঙ্ক্ষা বিরলতায় অনন্য, এমন দ্রোহ অনুপম, এমন সাহস অতুল্য। এই একবার মাত্র, তার আগে বা পরে আর কখনো বাঙালী চরিত্রে তো নয়ই, বাঙালী চিত্তেও সাধ বা স্বপ্ন হিসেবেও আভাসিত হয়নি। আমি চাঁদ-বেহুলার কথা বলছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগত বাঙালীর সন্তান চাঁদ বলে—আমি শিবের উপাসক, ঐ একজনকে ছাড়া অন্য কাউকে—নারী দেবতাকে পুজো করব না—'যেই হাতে পূজি আমি দেব শুলপাণি। সেই হাতে পূজব আমি চেঙমুড়ি কানি?'—কখনো না, কোনো অবস্থাতেই না, বরং মরব তবু ঐ দেবীর পুজো করব না। যেই কথা সেই কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার মাঠে-বাটে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে, নিতান্ত নিরক্ষর গেঁয়ো গেরস্থের মেয়ে—বিয়ে কি তা-ই বুঝবার বয়স ছিল না তার, সেই বালিকা সন্ধ্যায় বধূ হয়ে ঢুকল বাসরে, আর সকালে পাকা গিন্নির মতো যেন বলে—আমি মানিনা, আমার জীবন-যৌবন-দাম্পত্য, ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই, সৃষ্টিরও নেই, স্রষ্টারও নেই। আমি এ মৃত্যু স্বীকার করিনে। এ সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ্বাস নয়, এ বিদ্রোহিণী অবুঝ বালিকার জেদের কথা নয়, এ এক সংকল্পে দৃঢ় দৃপ্তা নারীর বিশ্বজগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। তার পর লোভের ফাঁদ, বিপদের জাল অতি ধৈর্য, অধ্যবসায়, সাহস ও সঙ্কল্পের সঙ্গে অবিচলিত নিষ্ঠায় অতিক্রম করে সে জয়ী হল। মনসামঙ্গলের কাহিনী দেবমানবের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগ্য পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি। দেবতার মান-মর্যাদাও বজায় রয়েছে, আবার মনুষ্যত্বও হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ আত্মসমর্পণ করেনি—সে হার মেনেছে এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছ্রসাধনা ও সিদ্ধির কাছে, প্রণাম জানিয়েছে ঐ বালিকার ধৈর্য-অধ্যবসায়-জেদ ও জয়কে—'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহার।' এ কাহিনী, এ পরিণাম, এ দ্রোহ, এ চরিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে চাঁদ-বেহুলার অনন্য চরিত্র অবহেলিত—তবু এ মুহূর্তে মনে পড়ে কালিদাস রায়ের 'চন্দ্রধর' এবং মমতা ঘোষের 'বেহুলা' কবিতা। আর বিপিনবিহারী নন্দীর 'চন্দ্রধর' কাব্যটি। দাক্ষিণাত্যের অম্ববরুর কাহিনীও ঐ স্ত্রী-দেবতা অস্বীকৃতির ইতিকথা। সেখানে এ দ্রোহ দেখা দেয় লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরে চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সওদাগরেও এ দ্রোহ উপ্ত হয়েছিল কিন্তু তা বাড়েনি, অঙ্কুরেই হয়েছিল বিনষ্ট। মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গের কাব্য, পূর্ববঙ্গের চাঁদ সর্বপ্রকার ক্ষতি-নির্যাতন বু াপীড়িত মহীরুহের মতো সহ্য করে উন্নতশির, আর পশ্চিমবঙ্গের ধনপতি অনুতপ্ত হৃদয়ে আনুগত্যে স্বস্তিকামী।

হুমায়ুন কবির তাঁর 'বাঙলার কাব্য'; গ্রন্থে অনুমান করেছেন— এ দ্রোহ ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রভাবজ। এ অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয়। নইলে বহু দেবতার উপাসক একজন হিন্দু একটা দেবতাকে ঠাঁই দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে কেন? তবে ধনপতির তুলনায় চাঁদের এই অনমনীয় দৃঢ়তার মূলে প্রতিবেশের আনুকূল্যও রয়েছে, নদীবহুল পূর্ববঙ্গে বর্ষার জলের ওপরই তাদের জীবন— নদী শুধু কূল ভাঙ্গে না, ক্ষণে ক্ষণে নৌকাও ডোবায়—তা ছাড়া ঝড়-বন্যা-খরা ও শ্বাপদ-সরীসৃপের সঙ্গে মোকাবিলা করেই তাদের বাঁচতে হয়। ঐ সংগ্রামকঠিন অভ্যস্ত জীবনে নতুন চিন্তাচেতনার বীজ উপ্ত হবার অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছিল—যা উষর রাঙামাটির জীবনে ছিল না।

বিদেশীর চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তে লালিত চিন্তাচেতনার নিস্তরঙ্গ প্রবাহে এমনি ঊর্মি জাগে—আকস্মিকতার অভিভূতি কেটে গেলে তা মন-সহা গা-সহাও হয়ে ওঠে, কিন্তু ঐ মৌহূর্তিক সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনোকে ভস্মীভূত করে নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্র উর্বর করে তোলে। এমনি নজির এদেশের ইতিহাসেও মেলে, আরবদের সিন্ধুবিজয়জাত ভাবসংঘাতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও ভাস্কর-মাধব-নিম্বার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদের উন্মেষ-বিকাশ, তুর্কি বিজয়ের ফলে ইসলামী-সংস্কৃতিও এদেশের চিন্তাচেতনার জগতে বাসন্তী হাওয়া বয়ে আনে, সে হাওয়া জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঢেউ জাগায়, মর্মমূলে নাড়া দেয়, মাতিয়ে তোলে—এর নাম ভাববিপ্লব—তাও চৈতন্যজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে কিংবা জীবনযাত্রায় যুগান্তর আসে এভাবেই। বলেছি শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা শাসিত সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের লোকগুলো তুর্কী আমলে গণচাপে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও লাভের লোভে লোকায়ত দেবতাদের উপেক্ষা করতে পারেনি বেশি দিন। কারণ ছিল দুটো—একটা হচ্ছে তারা সমাজে সংখ্যালঘু, রাজশক্তির সমর্থন নেই বলে এখন আর সেন আমলের মতো সমাজ স্বায়ত্তে রাখা সম্ভব ছিল না, গণমতে তাদেরও সায় দিতে হচ্ছিল; অন্যটা হচ্ছে তখন নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোক রাজধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। কাজেই গণমন যুগিয়ে বা গণমানবকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বধর্মীর সংহতি সাধন করে স্বধর্ম ও স্বসমাজ রক্ষা করা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। তাই একদিকে যেমন নব্য ন্যায়-স্মৃতি-মেলবিন্যাস ও শাস্ত্রশোধন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি গণবিশ্বাস ও সংস্কারকে শ্রদ্ধা ও বরণ করে গণমানবকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছিল। তাই ব্রাহ্মণেও লোকায়ত দেবতার স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠল—পুরাণগুলোতেও লোকদেবতার মাহাত্ম্য মহিমার বর্ণনা ঠাঁই পেল। তবু গোড়ার দিকে স্বশ্রেণীর কাছে একটা শরম-সংকোচ ও নিন্দা-ভয় ছিল। তা কাটিয়ে উঠবার জন্যেই দেবতার 'স্বপ্নাদেশ' তত্ত্বের উদ্ভাবন। পরে তা প্রথায় পরিণতি পায়। মঙ্গলকাব্যের কবি মাত্রই কীর্তিত দেবতার স্বপ্নাদিষ্ট। কাজেই নিরুপায় কবিকে স্তুতি রচনা করতেই হল, আবার নিন্দুকদের সর্বনাশের আশ্বাসও মিলে গেল দেবতার কাছ থেকেই। এমনি আটঘাট বেঁধেই কবিগণ লৌকিক দেবতাদের বৈদিক-পৌরাণিক আভিজাত্যের মর্যাদা দিয়ে লোকবন্দ্য ও সর্বজনীন দেবতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

আমাদের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন পাঁচালী অরিদেবতার মাহাত্ম্যকথা। এই অরিদেবতা হলেন মনসা। মনসা যে বৌদ্ধপূজিত দেবতাও, তার আভাস আছে অন্যতম প্রাচীন পাঁচালী বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসামঙ্গলে' বা মনসাবিজয়ে। এ গ্রন্থে শিব স্বয়ং ধর্ম (ঠাকুরের)-এর উপাসক। বল্লুকা নদীর তীরে অনাদিনাথ রূপে ধর্মের সাক্ষাৎ কামনায় বারো বছর কঠোর তপস্যা করেন শিব (অর্থাৎ আদিনাথ)। শিবের স্তবে তুষ্ট হয়ে ধর্ম যখন শিবকে দেখা দিতে তাঁর গৃহদ্বারে এলেন, তখন শিব ঘরে ছিলেন না, তাই শিবপত্নী গঙ্গাই ধর্মের দর্শন পেলেন, ধর্ম এসেছিলেন, —"ধবল ছত্র ধরি শিরে/দণ্ড কমণ্ডলু করে/উলুকে করিয়া আরোহণ।"

ধর্মের ক্ষণিক দৃষ্টিতে গঙ্গার দেহবর্ণ ধবল হয়ে গেল। গঙ্গা—'বসিল ধবল ঘাটে হৈয়া শ্বেতকায়।' এই ধর্মই পরম ব্রহ্ম। 'গঙ্গারে পরমব্রহ্ম দিল দরশন।' উল্লেখ্য ধর্মঠাকুর (মূলে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সূর্যদেবতা হিসেবে) কুষ্ঠরোগেরও দেবতা। এখানে গঙ্গার সূর্যের শ্বেতবর্ণ প্রাপ্তির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ধর্মের অনুগৃহীত শিব ধর্মের নির্দেশে কালীদহে প্রত্যহ পদ্ম তুলতে যান, এখানেই একদিন মদনপীড়িত শিবের বীর্য স্খলিত হয় 'পদ্মপাতায়'—তার থেকেই অবশেষে মনসার উৎপত্তি। শিবপত্নী গৌরীর ডোমনীর ছদ্মবেশ ধারণও ধর্মপূজারীদের ঐতিহ্যের ইঙ্গিত বহন করে। সোমাই পণ্ডিতও মৃত দুর্লভকে জীবন্ত দেখে ভয়ে বিস্ময়ে 'ধর্ম ধর্ম' ডাক ছেড়েছিল। মনোজ বলেই সম্ভবত এই অযোনিসম্ভার নাম 'মনসা'। এই 'মনসা' মহাযানী দেবতা জাঙ্গুলী তারাও।

বিপ্রদাসও বলেন ঃ "জাঁগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।" এখানেও বজ্র-সহজযানী কায়াসাধান (বিন্দু ধারণ ও উর্ধ্বায়নের) তত্ত্বের বজ্র-কমল-সহস্রার ইঙ্গিত রয়েছে :

কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিস্মর
মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর।...
অহর্নিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে।
কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুঁটে।
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসুক পরম হংস চরুক নিবাট।
পুনরপি নিবর্তিয়া যাউক স্বস্থান
যথায় কমলে হংস করে মধুপান।

যে বিষ পান করে শিব মুমূর্ষু, তা কাম-বিষের প্রতীক। বাইবেল-উক্ত সাপও কামের প্রতীক। কাম-বিষকে, অমৃতে পরিণত করাই বজ্র-সহজযানীদের গুহ্য-সাধনার লক্ষ্য। ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন, "ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য আর মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এক মূল হইতে উদ্ভূত। সে মূল হইতে নাথপন্থীদের ঐতিহ্যও অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।" (বা. সা. ই/৩/১পৃঃ পৃঃ ২১০)

সত্যযুগ মধেযুগ এক রচিলা বিষধর এক নিপায়া
গ্যান-বিহুনা গণ গন্ধ্রপ অবধূ সবহি ডসি ডসি খায়া।

(গোরখবাণী—পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, উদ্ধৃত বা. সা. ই. পৃঃ ২১০)

"সত্যযুগ মধ্যে প্রথম যুগ রচিত হইল। এক বিষধর নিষ্পন্ন হইল। হে অবধূত, জ্ঞানহীন দেখিয়া সব গন্ধর্বকে সে দংশন করিয়া করিয়া খাইল।" ডক্টর সুকুমার সেন আরো বলেন : 'মূলে মনসার কাহিনীও ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিল। আদ্যদেব ধর্মঠাকুরের 'মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ' — তাহা হইতেই আদ্যা দেবীর উদ্ভব। এই আদ্যাদেবীর নাম 'কেতকা'। মনসামঙ্গল কাহিনীতেও মনসার নামান্তর 'কেতকা'। নাথপন্থী যোগীরা তাঁহাদের পুরাতন ছড়ায় এই কাহিনীর জের টানিয়া আসিয়াছেন : 'মাতা হামারী মনসা বোলিয়ে। পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার।' (বা. সা. ই ৩ সং ১ পৃঃ ২১৪)।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ 'সাপ'কে অবহেলা করতে পারেনি। সাপের দ্রুত সর্পিল গতি, জলে-স্থলে-ভূগর্ভে তার সহজ সঞ্চরণ, তার জীবনবিনাশী বিষ, তার বর্ণালী রূপ, তার ফণার সৌন্দর্য, তার দৈহিক শক্তি, তার আত্মগোপনের কৌশল, তার ত্বক বদলানো, তার প্রজনন সামর্থ্য প্রভৃতি আদি মনুষ্য সমাজের সভয়-সশ্রদ্ধ সকৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই সামীয় জগতে (Semetic world) সাপ ও সাপচরিত্র সম্বন্ধে পুরাণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাইবেলে এই সাপই কাম ও প্রজনন প্রতীক। শয়তান এই সাপের ছদ্মবেশ ধরেই স্বর্গে প্রবেশ করেছিল এবং বিভ্রান্ত করেছিল ইভকে। নবী কাহিনীতেও দেখা যায় যাদুকরেরা লাঠিকে সাপ বানাতে পারত, মুসা আল্লাহ্‌র অভিজ্ঞান পান লাঠির সাপে রূপান্তর প্রতীকে। প্রাচীন মিসরে, 'সাপ' ছিল রাজকীয় লাঞ্ছনা, আর্যরা সাপকে (নাগকে) দৈত্য-দানোর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। টোটেম নামে 'নাগ' গোত্র ও 'নাগ পঞ্চমী' স্মর্তব্য। আমাদের দেশেও যোগতান্ত্রিক গুহ্যতত্ত্বে সাপ হচ্ছে কাম-বিষের প্রতীক—কুণ্ডলীকৃত সাপ কুণ্ডলিনী শক্তি—কোন কোন বৈরাগী-দরবেশ-সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই সাপ প্রতীক বাঁকা লতার লাঠি ধারণ করেন। এ দেশী পুরাণে সহস্রফণা সাপই (অনন্ত নাগ) পৃথিবী ধারণ করে রয়েছে—এর তাৎপর্য প্রজনন মাধ্যমেই পৃথিবীর সৃষ্টি বহমান রয়েছে। লিঙ্গপ্রতীকে প্রজননের তথা সৃষ্টির উৎস শিব তাই অহিভূষণ। দাক্ষিণাত্যে জীবন্ত সাপের পূজা হয়। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সমাজে তথা ভাষায় হিংসা-ক্রোধ, প্রতিশোধ, বিশ্বাসঘাতকতা, ছদ্মবেশ, কৃতঘ্নতা, পীড়ন-পেষণ, আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন প্রভৃতির উপমা রয়েছে সাপ। অমোঘ মৃত্যুর প্রতীক সাপকে কেউ অস্বীকার অবহেলা করতে পারেনি। কেউ মন্ত্রে, কেউ পূজায়, কেউবা বাহু বলে, কেউ ভেষজে, সাপকে বশ করতে চেয়েছে প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। উষ্ণদেশে 'সাপ' সর্বক্ষণের শঙ্কার কারণ, তাই ওঝা (উপাধ্যায়) ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাপুড়ে বৃত্তির লোকও সব অঞ্চলেই মেলে। দুঃসাহসী বিক্রমবিলাসী মানুষ বাঘ-সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ ধরে ও পোষে যে আনন্দে, সাপও ধরে-পোষে সেই একই বিক্রম-প্রকাশানন্দে। প্রতিহিংসা বশে ও নিরাপত্তার উপায় হিসেবে কোন কোন আরণ্য মানব সাপ খায়, সাপ তাই তাদের ভয় পায়। শুনেছি সাপের বিষ তাদের দেহে ক্রিয়া করে না।

আমরা যেহেতু আত্মপ্রত্যয়হীন ও শক্তের ভক্ত, সেহেতু আমাদের দেশে স্তুতিতে-তোয়াজে-পূজায় সাপকে বশ করে প্রাণের নিরাপত্তা কামনা করা হয়েছে। এই নিষ্ক্রিয়–ভীরুতা বশেই এ দেশের মানুষ জীবন ও জীবিকার অরিশক্তিকে প্রমূর্ত করে মাবাপ ডেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে—গণেশ মনসা শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। এখানেই শেষ নয়, বিপজ্জনক বুনো পশু পাখি এবং জলজ জন্তুও মা-বাবা-মামা সম্বোধনে পূজ্য হয়ে রয়েছে।

কাজেই মনসাকে অন্যদেশে ও ভিন্ন সমাজে সন্ধান করা নিরর্থক। জীবন-প্রতিবেশ থেকেই প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্বদেশেই মনসার উদ্ভব। এর অনার্য নাম জাঙ্গুলী ব্যাজোক্তিমূলক সাধারণ নাম বিষহরি, শীতলা গণেশ কিংবা বাড়ন্ত প্রভৃতির তাৎপর্য স্মর্তব্য। আবার 'বিশাল অক্ষি' বা 'বিষাল অক্ষি' অর্থে বিশালাক্ষী বা বিষালাক্ষীও বটে। পৌরাণিক মর্যাদা দানের জন্যেই শিবের মনোজ [তথা কামজ তুলঃ স্মর] 'মনসা' এবং এ স্তরে বানানো কাহিনী অনুসারে শিবের পদ্মে স্খলিত শুক্র থেকে জন্ম বলে তার অন্য নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী।

কালীদহে কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনেও হয়তো আমাদের প্রাচীন দেহতাত্ত্বিক সাধারণ কামবিষ বিনাশতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। কালীদহের কমল বনেই অহিভূষণ কামুক শিবের বিচরণ, এ সূত্রে বজ্রকমল বা দেহের চতুঃ বা ষড়পদ্ম স্মরণীয়।

অতএব 'মনসা' পূজার উৎস আর্য নাগ, দ্রাবিড় মঞ্চ অম্মা প্রভৃতির পূজাতত্ত্বে সন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। তবে নৌকায় পূজার আয়োজন থেকে মনে হয় জলের তথা গঙ্গার সঙ্গেও সাপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, বিশেষত মনসার জলপদ্মে জন্ম। এটি আদি জলজ সৃষ্টির স্মারক।

রক্তহীন সাপ শীতে কাবু থাকে। বৈশাখের উষ্ণতা পেয়ে শীতাবাস গর্ত থেকে সাপ বের হতে থাকে। লোকবসতি অঞ্চলে তখন থেকেই তার উপদ্রব শুরু হয়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি মনসা পূজার কাল। তারপর শ্রাবণ মাস অবধি প্রবল বর্ষণের তোড়ে আরণ্য-পার্বত্য অঞ্চলে বন্যার স্রোতে পড়ে সাপ সমতল লোকালয়ে আশ্রয় নেয়। তাই এই সময়েই সর্পভয় সার্বক্ষণিক শঙ্কায় পরিণত হয়। সব সাপকে স্তুতিপূজা করবার জন্যে পাওয়া যাবে না, তাই সাপের মতো দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের অসূয়াপরায়ণা কোপনস্বভাবা নারীপ্রতীক কল্পনা করা হয়েছে। আষ্টিক মানুষ সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্বে আসক্ত, তা ছাড়া মাতৃতান্ত্রিক সংস্কারের প্রভাবেও তারা নারী দেবতা প্রবণ। ঘট দিয়ে মনসা পূজার শুরু এবং কালে সমূর্ত পূজায় পরিণতি। বাঙলা-আসাম-বিহার ও উড়িষ্যায় মনসা পূজা হয়। তবে আসাম ও পূর্ব বাঙলার মতো কোথাও এমন গুরুত্বসহকারে ঘরে ঘরে হয় না। তার কারণ বোধ হয় বাঙলা-আসামের নিম্নাঞ্চলেই ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-মেঘনা, বাহিত আরণ্য-পার্বত্য সাপ বর্ষাকালে আশ্রয় নেয়, জল প্লাবিত বর্ষাকালে এখানকার বিচ্ছিন্ন ভিটেগুলো মাত্র শুষ্ক থাকে। তাই বাড়িঘরে ঝোপেঝাড়ে সাপ আশ্রিত হয়। সেজন্যে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি মনসা পূজার বিধান থাকলেও এ অঞ্চলে শ্রাবণ মাসেই গীতবাদ্য সহযোগে রজনী জাগরণে মহাড়ম্বরে মনসার পূজা ও স্তুতি গান হয়। চাঁদ-বেহুলার কাহিনীও বিশেষ করে আসাম ও পূর্ব বাঙলার। তুর্কী বিজয়ের পরেই যে এ কাহিনীর বিশেষ বিকাশ তা চাঁদ-চরিত্রে নয় শুধু ঐ 'সদাগর' নামেতেও প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসা পাঁচালীর উদ্ভব এবং বিকাশও পূর্ব বাঙলায়—কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও দ্বিজবংশীদাসের কাব্য উল্লেখ্য। রাঢ় অঞ্চলে আঠারো শতকের শেষ পাদের কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদের আগে মনসা পাঁচালী রচিত হয় নি। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' নামে মনসার পূজাপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।[১] এটি সংস্কৃতে রচিত এবং স্মৃতিবিষয়ক সংকলনগ্রন্থ। মনসারই অপর নাম ব্যাড়ী, বিষহরী ও সুরসা। পদ্মা নামটি নেই। ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীই প্রাপ্ত প্রাচীনতম মনসার পূজাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ। খণ্ডিত ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীই দুটো অংশ–'ক প্রমাণ তরঙ্গ ও খ. প্রয়োগ তরঙ্গ। প্রমাণ খণ্ডে তিনি বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের সমর্থন ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন; যথা—কাশী খণ্ড, জৈমিনি গৃহসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, অমরকোষ, ব্রহ্মপুরাণ, গরুড়, পুরাণ, ব্রহায়মাল, পঞ্চরাত্র, কালিহৃদয়, প্রপঞ্চসার, অগ্নিপুরাণ, নারদ স্মৃতি, বিষ্ণুধর্মতত্ত্ব, ভট্টভাষ্য, হেমাদ্রি, শুদ্ধদীপিকা, গৌড়মিথিল প্রাচ্যাদি কৃত্যসার, বিশারদ, ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট, শ্রীপতি, মহাকপিল পঞ্চরাত্র, গোভিলসূত্র, নির্ণয়ামৃত, দ্বৈত নির্ণয়, সারদাতিলক, কৃত্যাচিন্তামণি, রাঘবভট্ট, গৌড়াদি সংগ্রহ, যজ্ঞপার্শ্ব, মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ, হরি শর্মা ও শান্তিদীপিকা।

আর প্রয়োগ অংশে সামান্য মাত্র আছে। লিপিকরই অসমাপ্ত রেখেছেন, হয়তো তাঁর আদর্শ পুথি খণ্ডিত ছিল, অথবা কোন কারণে তিনি পুরো পুথি নকল করার সময় ও সুযোগ পাননি।

ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীতে বাঙলা পাঁচালীর আদল পাওয়া যায়। যেমন পাত্রপাত্রীর মধ্যে চন্দ্রধর (চাঁদ সদাগর), স্বর্ণরেখা (সনকা, সোনকা), লক্ষ্মীধর (লখীন্দর), বিপুলা (বেহুলা), জ্যোতিষী যশোধর (যশাই), শ্রীধর (পুরোহিত), কর্ণধার দুর্লভ (দুলাই), রজকী (নেতা ধোপানী), সুগন্ধা প্রভৃতি ছাড়াও জরৎকারু, আস্তীক, অষ্টনাগ প্রভৃতিও আছে। অন্যসব দেবতা ও মনসার সঙ্গে এদেরও পূজা করতে হবে।

গ্রন্থে মধুকর ডিঙ্গা ও শিব সমীপে বেহুলার নৃত্যের উল্লেখও রয়েছে। ঋদ্ধি এবং নৈরুজ্য প্রাপ্তির জন্যে, সর্পভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং ঐহিক বিবিধ ভোগ ও পারত্রিক স্বর্গলাভের জন্যে শান্তিকামী হয়ে মনসা দেবীর প্রীতি উৎপাদন উদ্দেশ্যে পূজা করা হবে।

নৌকায় পূজা করাই উত্তম। সেকালে নৌকার নিম্নতম দৈর্ঘ্য ছিল চৌদ্দ হাত আর উচ্চতম দৈর্ঘ্য ছিল একশ হাত। বিদ্যাপতি বলেছেন—বিশহাতি নৌকা নিকৃষ্ট, চল্লিশ হাতি নৌকা মাঝারি, ষাটহাতি উত্তম আর শতহাতিই শ্রেষ্ঠ নৌকা।

পূজাপার্বণ সম্পদসাপেক্ষ বলেই মনসাপূজা কেবল ঘট বসিয়ে করার বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘটা করে মহোৎসব করার বিধানও। চৌদ্দ থেকে শতহাত লম্বা নৌকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয় নাগ, অষ্ট নাগ, জরৎকারু, আস্তীক, অষ্টপদাতিক, ভাণ্ডারী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার সবাহন মূর্তি এবং চাঁদ থেকে নেতা ধোপানী অবধি সব সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতিমা গড়ে মহাড়ম্বর সবলি মনসাপূজা করাই বিত্তবানদের কর্তব্য। এ পূজা বৈশাখে, আষাঢ়ে ও শ্রাবণে করা বিধেয়। প্রতিমা হত পটে, মণ্ডণে ও ঘটে, বিচিত্রাও সম্ভবত বিচিত্র পট। মূর্তি হত সোনার, রূপার, তামার কিংবা মাটির। নির্বলি পূজার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি রয়েছে ছাগাদি পশুবলির বিধানও। দ্বিজে-দরিদ্রে দানও করতে হয় সাধ্যমত।

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত। ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত এবং ইতিহাস (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা : ভদ্র-আগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ সন) পত্রিকায় প্রকাশিত, ঢাকা পৃঃ ১৫৫-৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যাচ্ছে, পনেরো শতকের প্রথমার্ধে চাঁদ-বেহুলার কাহিনী পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছিল, কাজেই তেরো শতকের শেষার্ধে অন্তত এটি জনপ্রিয় কথকতার অবলম্বন ছিল। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের গায়েনবর্ণিত পালাকে 'রয়ানী' বলে। রজনীতে হয় বলেই কি রয়ানী বা রয়হানি? 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'তে পাই—"অথ রয়হানিঃ', দর্শনাপায়তে যস্যায়হানিস্তু অখিলা। রায়হানিরিতি প্রোক্তা প্রতিমা ভব্যদায়িনী।—শুদ্ধ দীপিকায়াং।' আভীরদের রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর মতো চাঁদ-বেহুলা-লখীন্দর কাহিনীরও হয়তো কোন গ্রামের সর্পহন্তা সাপুড়ে চন্দ্রধরের সর্পদংশনে মৃতকল্প অবস্থা এবং পরিণামে পুনর্জীবিত হওয়ার রোমাঞ্চকর ঘটনাই ভিত্তি।[১] অথবা দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজনে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর মতো চাঁদ-বেহুলার কাহিনীও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাই বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যার সর্বত্র নেতার ঘাট, চাঁদের ভিটে, লখীন্দরের বাসর দেখা যায়। এগুলো আসলে মনসাপূজা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত স্থান, যেমন–ঈদ-পড়া ময়দান ঈদগাহ, বারোয়ারী অনুষ্ঠানের স্থান বারোয়ারী তলা, ইট পোড়ানো স্থান ইটখোলা হয়, এ-ও তেমনি নামসার। আবার ময়মনসিংহ গীতিকার 'আয়নাবিবি' গাথার নায়ক সূর্য-উজ্জ্বল চাঁদ সদাগরের বংশধর বলে আখ্যাত। 'অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' দুনিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নায়ক-নায়িকারা যেমন বাস্তব মানুষের চেয়েও বাস্তব এবং প্রখ্যাত হয়, চাঁদ, বেহুলা, লখীন্দর, চম্পা, উজানিনগরও তেমনি বাস্তব এবং প্রসিদ্ধ। কাজেই ঐতিহাসিকতা সন্ধান করা নিরর্থক।

মনসামঙ্গলের দেবখণ্ড সবার জানা না থাকলেও 'সিনেমা' প্রভৃতির মাধ্যমে মনসা-চাঁদ-বেহুলা-লখীন্দর খণ্ড মোটামুটি সবারই জানা। কাজেই এখানে আমরা পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর ইঙ্গিতবহ কাঠামোটি তথা বিষয়সূচীটাই দিচ্ছি : কামুক শিবের শুক্র পদ্মপত্রে স্খলিত হলে তা থেকে মনসার জন্ম ও যুবতীরূপ ধারণ, অচেনা কন্যার রতিকামনা, পিতা-কন্যার পরিচয়, চণ্ডীর ভয়ে সসঙ্কোচে কন্যা পদ্মাবতীকে (মনসাকে) গৃহে আনয়ন, চণ্ডীর রোষ ও পদ্মাকে প্রহার, চণ্ডীর হাতে পদ্মার চক্ষু নষ্ট, রুষ্ট পদ্মার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীর মূর্ছা, শিবের অনুরোধে মনসা কর্তৃক চণ্ডীকে চেতনা দান, জরুৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ, দাম্পত্য কলহে স্বামীবিচ্ছেদ, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষপানে মহাদেবের চৈতন্যলুপ্তি, মনসা কর্তৃক চৈতন্যদান, সৎমা চণ্ডীর প্রতিকূলতায় পদ্মার নির্বাসন ও পুরী নির্মাণ। কন্যা বিচ্ছেদে কাতর শিবের অশ্রু থেকে নেতার জন্ম, পদ্মার সহচরী হিসেবে তার স্থিতি। দেবী খণ্ড এখানেই শেষ।

মর্তে মনসার পূজা প্রচার বাঞ্ছা দিয়ে মর্ত্যখণ্ডের শুরু। রাখালদের প্রথমে অস্বীকৃতি পরে পূজা দান, হাসান-হোসেনের মনসা নিন্দা ও পরে স্বীকৃতি ও আনুগত্য, চাঁদের অস্বীকৃতি—চাঁদের উদ্যান-বিনষ্টি, ধন্বন্তরী (গারুড়ী) বধ, চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণনাশ, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও পণ্য বিনিময়, চৌদ্দ ডিঙ্গা নিমজ্জন, লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের ঘরে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগ, লোহার বাসর নির্মাণ, বিয়ে, বাসরে সর্প দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু, ভেলায় মৃত স্বামী নিয়ে বেহুলার যাত্রা, ঘাটে ঘাটে নানা বিপজ্জাল, অবশেষে স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্য গীতে কামুক শিবকে তুষ্ট করে তাঁর সুপারিশে পদ্মাকে বশ করে স্বামীর জীবন নয় শুধু,

---

১. ত্রিশ বছর আগে চট্টগ্রামের ধলঘাট গাঁয়ে এক বালক সর্পদংশনে মারা যায়। এক সাধু ঐ বালককে বাঁচিয়ে তোলার ভরসা দিয়ে প্রায় একমাস রুদ্ধদ্বার তাঁবুতে মৃতদেহ নিয়ে বাস করে। তখনো গুজব রটেছিল যে বালকটির দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, পুরো সুস্থ হতে সময় লাগবে, চট্টগ্রাম দোহাজারী ট্রেনের প্রতিটি কক্ষে এ নিয়ে খুব আলোচনা হত। অবিশ্বাসীর চেয়ে আস্থাবানের সংখ্যাই ছিল বেশি ; তারপর বোধ হয় একদিন ঐ সাধু পালিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয় ভাশুর ও সপণ্য চৌদ্দ ডিঙ্গাও পুনঃপ্রাপ্তি। চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে—এই অঙ্গীকার করে বেহুলা-লখীন্দরের দেশে প্রত্যাবর্তন। ডোমের ছদ্মবেশে বেহুলা-লখীন্দরের বাড়ি প্রবেশ, চাঁদকে বুঝিয়ে মনসার পূজায় রাজি করানো এবং পূজা শেষে মনসার মন্দির নির্মাণ ও মনসার পূজা প্রচার শেষে বেহুলা-লখীন্দর রূপী দেবতা ঊষা-অনিরুদ্ধের সশরীর স্বর্গারোহণে পাঁচালী সমাপ্ত। তবে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় সংক্ষেপণ-বিস্তৃতি, গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন প্রভৃতি রয়েছে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে। কাহিনীর ঋজুতা ও পারম্পর্য বোধ হয় বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'ই বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে। হিন্দু পুরাণানুগ করে রচনার চেষ্টা থাকলেও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ও ক্ষেমানন্দের পাঁচালীতে সৃষ্টিপত্তন ও ধর্মঠাকুরসম্পৃক্ত উক্তিতে বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট। বিজয় গুপ্তে কেবল ডাকিনী-যোগিনী-কামরূপ-কামাখ্যার মন্ত্রশক্তির প্রভাব মাত্র স্বীকৃত। চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেলেও ছয় বধূর 'সহমরণের' ব্যবস্থা নেই। বিজয় গুপ্ত-বিপ্রদাস-নায়ায়ণদেবের কাহিনীতে স্থূল ঐক্য মেলে, কিন্তু ক্ষেমানন্দের পাঁচালীতে বিভিন্ন কাহিনীর লঘুত্ব গুরুত্ব চেতনা স্বতন্ত্র। যেমন তাঁর 'উষাহরণ' পালা, এটি কোন কোন পাঁচালীতে নেই, তার জায়গায় রয়েছে 'যম-মনসার যুদ্ধ'। চৌদ্দ ডিঙ্গার নামেও-মধুকর প্রভৃতি দুই একটা ছাড়া—পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন পাঁচালীতে। এবং রসপ্রাধান্য ও সমাপ্তিচিত্র প্রায়ই ভিন্ন। রূপ-প্রকৃতি-সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতির স্থূল অভিন্নতার মধ্যে রূপগত, বর্ণনাগত ও রসগত পার্থক্য স্পষ্ট। অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য না থাকলে একই বিষয়ে একাধিক কবির পাঁচালী রচনা নিরর্থক হত।

আর একটি কথা, সেকালে সাধারণ লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। দেশ-দুনিয়ার কিছু নাম তারা রূপকথার মতোই শুনত। তাই কবিরাও ভৌগোলিক জ্ঞানের কিংবা পণ্য-দ্রব্যের বাস্তব পরিচয় দিতে পারেননি। কেউ কেউ পুরোনো বাণিজ্য বন্দরের ও রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত পথের কিছুটা সন্ধান জানতেন, তাই কয়েকটি গঞ্জ ও নৌকাঘাটের নাম উল্লেখ করতে পেরেছেন।

AMARBOI.COM

১০

কানাহরি দত্ত

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল রচয়িতা হিসেবে কানাহরি দত্তের নাম প্রথম শোনা যায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, যখন বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে এবং জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত 'কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে' (ক. বি. ১৯৬২ স)

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাফ ফাল
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।

(প্যারিমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ১৩০৮ সাল)

জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত বিধৃত পাঠ :

সর্বলোকে গীত না বোঝে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরি দত্তের গীত লোপ পাইল এই কালে
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে।
গীতে মতি না দেয় কেহ ভাবে বোলে চাল
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল।

সামান্য পাঠান্তরে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের আদ্যে অখণ্ডিত সব পুথিতে মূল বক্তব্যে অভিন্নতা মেলে। তা এই, বিজয় গুপ্তের কালে কানাহরি দত্তের পাঁচালীর বা গীতির লিখিত পাঠ লুপ্ত হয়ে গেছে। শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ভর অজ্ঞ গায়েনেরা হরি দত্তের বিলুপ্ত-বিস্মৃত পাঠ সাধ্যমত বানিয়ে বানিয়ে গায়, তাতে সাধারণত সঙ্গতি, পারম্পর্য ও ছন্দ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে হরি দত্তের বাঁধা গীত আর শুনতে চায় না, অথবা অজ্ঞ কানাহরি দত্ত গীত রচনায় পটু ছিলেন না, ফলে তাঁর রচনায় কাহিনীগত সঙ্গতি-পারম্পর্য এবং নির্ভুল ছন্দবিন্যাস ছিল না। তাই অনাদরে কালে সে গান লোপ পেয়েছে, [আসলে লুপ্তপ্রায়]। বিজয় গুপ্তের কালেও যে একেবারে লোপ পায়নি তার প্রমাণ বিজয় গুপ্ত তাঁর রচনার কৈফিয়ত স্বরূপ কানাহরি দত্তের ত্রুটি দেখাচ্ছেন। তিনি নিজে না দেখলে বা না শুনলে রচনার ত্রুটির কথা বলতে পারতেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের (১০৯১ সংখ্যক) পুথিতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের ৬৫৩৭ সংখ্যক পুথিতে হরি দত্তের ভণিতায় পদ্মার সর্পপূজা অংশ পেয়েছিলেন :

১. ক. দুই হস্তে শঙ্ক হইল গরল শঙ্কিনী(বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পৃঃ ১০-১১)
খ. ক্ষীরোদ জলে চান্দ লখায়রে ভাসাইয়া
বিস্তর করিছে বিষাদ। (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ১৭৪-৭৫)
গ. ওলা শনি আদ্যের কাহিনী
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম গো
ঘ. বিচিত্র নাগে করে দেবী গলাই সুতলী
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী
(গ ও ঘ বাইশ কবির মনসামঙ্গল—আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৪ সন। পৃ-০১)
২. কানাহরি দত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়, (ঢা. বি.)
৩. পদ্মার চরণে গতি হরি দত্তে কয়
মনসা পুজিয়ে সভে ধন পুত্র পায়। (ক.বি.)

এতটুকু নিঃসন্দেহে জানা গেল যে কানা (এক চক্ষু বিহীন) হরি দত্ত নামের এক কবি বা গায়েন বিজয় গুপ্তের এক পুরুষ আগে (হয়তো পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে কেননা বিজয় গুপ্তের পাঁচালী রচনার কালে হরি দত্তের রচনা লুপ্তপ্রায়) পাঁচালী বা গীত রচনা করেছিলেন, এবং গায়েনেরা তা সর্বত্র গেয়ে বেড়াত। নিরক্ষর মূর্খ জ্ঞানহীন গায়েনেরা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে সে গীতে বিকৃতি ঘটায়।

অতএব আজ অবধি জানা মনসাগীতির রচকদের মধ্যে কানা হরি দত্তই প্রাচীনতম। আমরা জানি বিজয় গুপ্ত ১৮৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে (সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহর আমলে) তাঁর পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। অতএব কানাহরি দত্ত পনেরো শতকের প্রথম পাদে বা প্রথমার্ধে পদ্মাপুরাণ বা মনসা গীতি রচনা করেছিলেন এবং তিনি বিজয় গুপ্তের এলাকার তথা চন্দ্রদ্বীপ বা বরিশালের অধিবাসী ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁয়ে গাঁয়ে শ্রাবণ মাসে মনসার 'ঘট' বসিয়ে রাত জেগে মনসার পাঁচালী পড়ার বা গাওয়ার রেওয়াজ ছিল, এখনো আছে। সে প্রয়োজনে বিভিন্ন কবি রচিত পাঁচালী থেকে উৎকৃষ্ট অংশ সংকলিত করে পাঠ করা হত, এমনি করে শেষে বাইশ কবির 'মনসামঙ্গল'ও তৈরি হল অর্থাৎ ২২ জন কবির রচনা থেকে সংকলিত গ্রন্থের নাম হল 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল'। মনে হয় সংকলন পেশাদারী গায়েন-কথকেরাও করত, আবার বার্ষিক প্রয়োজনে গাঁয়ের উদ্যোগী গায়কও করত। এ বোধ হয় প্রাচীন নিয়ম, তাই বিজয় গুপ্ত নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীবদন প্রভৃতির রচিত পুথিতে অন্য কবির ভণিতা সম্বলিত অংশও মেলে। এ ভাবে হয়তো কালে আদি রচয়িতা হরি দত্তের পাঁচালী অনুলিপির অভাবে-অনাদরে হারিয়ে গেছে, এবং কিছু কিছু পাঠ হয়তো স্বনামে-বেনামে অন্যের রচনায় আজো আত্মরক্ষা করছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য দিয়ে আলোচনা শেষ করছি : 'মনসা মঙ্গল' বাঙ্গালীর রামায়ণ। বেহুলা ইহার সীতা, চাঁদ সদাগর ইহার রাবণ, সে জন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের যিনি আদি কবি কেবল মাত্র ইতিহাসের মধ্যেই তাঁহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির হৃদয়-পদ্মের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান—তাহা লক্ষ্যগোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে" (বাইশ কবির 'মনসা মঙ্গল' পৃঃ ১দ./।)

১১

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয় সূত্রে প্রকাশ তিনি বর্তমান বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় (পাঠান্তরে হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়)। বর্ণে বৈদ্য। পিতামাতার নাম নেই, তবে গাঁয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও সমাজ পরিচিতি রয়েছে।

মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গোড়া তকসিম [পাঠান্তর-তমসিক]
পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।

কবি আলাউল সূত্রে আমরা জানি সতেরো শতকে ফরিদপুরে ছিল এই মুলুক ফতেহাবাদের শাসনকেন্দ্র। এই পরগনার পশ্চিমে ঘাগর নদী, পূর্বে ঘণ্টেশ্বর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে (?) বাঙ্গোড়াতকসিম (প্রশাসনিক উপবিভাগ) অবধি বিস্তৃত।

সে গাঁয়ে চর্তুবেদীব্রাহ্মণ, চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল বৈদ্য, লিখনপটু কায়স্থ এবং বৃত্তিনিপুণ অন্যান্য নানা জাতির বাস। কারণ—'স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।' কবির কাব্যে সমকালীন গৌড়-সুলতানের নাম আছে এবং সেই সঙ্গে রচনাকালও—

১. ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক—১৪০৬শক = ১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

রচনাকালের দুটো পাঠান্তর মেলে কোন কোন পুথিতে, তা নিম্নরূপ :

২. ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। ...১৪১৬ শক = ১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ
৩. ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। -১৪০০ শক = ১৪৭৮ খ্রীঃ
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

প্রথমোক্ত পাঠই বেশি পাওয়া গেছে, ঐটিই যথার্থ। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠেই বিদ্বানদের আগ্রহ বেশি, কারণ তাঁদের লক্ষ্য সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালের নাগাল পাওয়া। আর তৃতীয়টি বোধ হয় কোন চতুর লিপিকর আদর্শপুথিতে প্রথম পদের অভাব কিংবা পদটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষ্টপাঠ্য দেখে নিজে বুদ্ধি করে 'ছায়া' লিখেছেন। এখানে আমরা 'ছায়া' বাদ দিলে পরবর্তী অংশ ১ ও ৩ সংখ্যক ভণিতায় অভিন্ন পাই। কাজেই প্রথম পাঠই বিশুদ্ধ বলে মনে করি, অর্থাৎ ১৪০৬ শকে বা ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' রচনা শুরু করেন। এটি সমাপ্তিজ্ঞাপক নয়। কারণ কালজ্ঞাপক চরণটি গ্রন্থের গোড়ার দিকে পাওয়া যাচ্ছে। এ সময়েও একজন হোসেন শাহ গৌড় সুলতান ছিলেন, তিনি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র ভাই এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র অন্যতম পুত্র।

রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র পরে ইউসুফ শাহ্‌র পুত্র সিকান্দর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি গৌড় সুলতান হন এবং হাবসী প্রধানদের হাতে 'তখত' হারান। এঁর জনপ্রিয় ও লোকপ্রচলিত নাম ছিল হোসেন শাহ, যদিও সুলতান হিসেবে ইনি জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ নাম সাধারণ্যে চালু ছিল না হয়তো, বিজয় গুপ্ত এই হোসেন শাহ ওরফে জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮৪-৮৭ খ্রীঃ) নামই উল্লেখ করেছেন। আর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র নাম উল্লিখিত হয়েছে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা বিজয়ে'।

জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহর প্রশংসা রয়েছে :

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হুসন রাজা পৃথিবী পালক।
সমরে দুর্জয় রাজা বিপক্ষের যম
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কাম সম।
যাহার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে' ধিক
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোর সিক।

শেষ পাঁচ চরণের পাঠান্তর —

সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে ধিক (অপর পাঠান্তর 'নিত')
মুলক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া সিম।

'তকসিম' 'তক সীম'ও হতে পারে, [তক-পর্যন্ত, সীম-সীমা।] অর্থাৎ মুলুকের একদিকের (উত্তর দিকের) সীমা বাঙ্গরোড়া অবধি, এটিই বোধ হয় সঙ্গত পাঠ। কিন্তু পূর্ব চরণের শেষ পদ 'ধিক' বা 'নিত' হলে অন্ত্যানুপ্রাসের খাতিরে 'শিক' বা অন্য 'ত' প্রান্তিক শব্দ দরকার, কারণ অমিল পয়ার অসম্ভব।

পদ্মাপুরাণের সর্বশেষ সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সনে। সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত। তাঁর সম্বল ছিল পাঁচটা পুথি, সবগুলোই উনিশ শতকের এবং ১৮৩৭ থেকে ১৮৯৫ সনের মধ্যে অনুলিখিত। সারা পাঁচালীর পাঠ বিকৃত পাঠান্তর-কণ্টকিত। এতেও বোঝা যায় বিজয় গুপ্ত প্রাচীন কবি। দীর্ঘ কালপরিসরে গায়েন-কথক-লিপিকর পরম্পরায় এই জনপ্রিয় পাঁচালীর পাঠের বিকৃতি ও বিভিন্নতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল পাঠ, কোন্ অংশই বা প্রক্ষিপ্ত—বুঝবার সাধ্য নেই। ফুল্লশ্রী গাঁয়ে প্রাপ্ত ও ঐ গাঁয়েই লিখিত প্রতিলিপি (না তৈরি পাণ্ডুলিপি?) পুথিকেও সম্পাদক আদর্শ করেননি, সম্পাদক তাঁর আদর্শ পুথির পাঠই গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন প্রায় নির্বিচারে এবং সম্পাদনাকালে শিক্ষিত কবির লিখিত রচনার ভাষাকে ফুলশ্রী গাঁয়ের লোকের বর্তমান উচ্চারণানুগ করে বিকৃত করার দুর্বুদ্ধির কথাও তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই 'বিজয় গুপ্ত' ও 'বিজয়ে গোপ্ত' হয়েছে, বিজয় গুপ্ত কি নিজের নামটাও শুদ্ধ করে লেখেননি?

স্পষ্টত সম্পাদক 'বিজএ'-এর 'এ'-র উচ্চারণ 'য়ে' ধরেছেন। অথচ প্রাচীন পুথিতে 'এ' ও 'য়' উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন, যথা–ছএ=ছয়, কএ=কয়, ভএ=ভয় ইত্যাদি। আবার চাহে (চাহএ)-ভয়ে (ভএ) মিলও দেখা যায়, এমনকি ভারতচন্দ্রেও। গীত হিসেবে সুর করে পড়া হত বলে সুরানুগ করে লেখা হত। যেমন-কর্এ (করে), ধর্এ(ধরে), চল্এ (চলে)। আধুনিক বিদ্বানেরা এ তথ্য স্মরণে রাখেন না বলেই তাঁদের পড়ার সুবিধের জন্যে-করয়, ধরয়, চলয়—লেখেন। ফলে সম্পাদিত গ্রন্থে বিজয় গুপ্ত কতখানি আছেন নিশ্চয় করে বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিগুলো ব্যবহৃত হলে পাঠ সম্বন্ধে সংশয় অনেক কমত। তবু আমরা জয়ন্তকুমার দাসগুপ্তের সম্পাদিত পাঠই অনুসরণ করব।

বলেছি সেকালে রক্ষণশীল শাস্ত্রপন্থীর নিন্দাভয়ে কোন উচ্চবর্ণের কবিরই 'স্বপ্নাদিষ্ট' না হয়ে লোকায়ত দেবতার মাহাত্ম্যকথা রচনার উপায় ছিল না। তাই বিজয় গুপ্তও স্বপ্নাদিষ্ট। তপ্ত কাঞ্চনজ্যোতি গৌরবর্ণা ব্রাহ্মণনারী বেশে মনসা স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে কবির পিঠে হাত দিয়ে বললেন—'হরি দত্তের গীত লুপ্ত পাইল কালে'। অতএব 'নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত।'

কাব্যের বর্ণিত বিষয়সূচী হচ্ছে : বন্দনা, স্বপ্নাধ্যায়, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সঙ্গে শিবের বিবাদ, মনসাকে চণ্ডী কর্তৃক প্রহার, পদ্মার বিবাহ, স্বামীর সঙ্গে মনসার কোন্দল ও বিচ্ছেদ, সমুদ্রমন্থন, পদ্মার বনবাস, রাখাল বাড়ির পূজা, কাজির সঙ্গে যুদ্ধ, গুয়াবাড়ি কাটা, মহাজ্ঞান হরণ, শঙ্কুর গাড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ, ঝালবাড়ি পূজা, বর বর্ণন, অনিরুদ্ধ-উষাহরণ ও যমযুদ্ধ, চাঁদের দক্ষিণ পাটন গমন, পণ্যবদল, ডিঙ্গাডুবি, লখীন্দরের জন্ম, লখীন্দরের বিবাহ ব্যবস্থা, লোহার বাসর, লখীন্দরের বিবাহ ও দংশন-ভাসান-জিয়ান। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের মূল কারণ : লোভে পূজা খাইতে গেলাম চাঁদের গোচরে। দুই হস্ত পাতিয়া মাগিলাম ফুলপানি/হেলায় না দিল দান আর ডাকে কানি/অধিকন্তু—পুষ্পজল মাগিতে চাহে সুরতি দান। কাজেই চাঁদের গুরুতর অপরাধ ছিল—'আমায় না পূজিয়া চাঁদ সর্বদেব পূজে।' বিজয় গুপ্ত গ্রামবাসী কবি। নিম্নবিত্তের নির্জিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যেই তাঁর বাস। তাই নিঃস্ব লোকের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার খবর তাঁর জানা ছিল, ছদ্ম পরিহাসের আবরণে সেই ব্যর্থ-সাধের বেদনাকরুণ অভিব্যক্তি মেলে নিঃস্ব বাঙালী গৃহস্থ প্রতীক হরগৌরীর পদ্মার বিবাহোৎসব সংক্রান্ত সংলাপে :

গৌরী বোলে কর কাজ তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
আইয়(এয়ো) আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দূর পাইব কোথায়।
হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাঁড়াইতে জানি
লেংটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ
লজ্জা পাইয়া যাবে পলাইয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই পান-গুয়া-তেল-সিন্দুর লাগবে না–অথচ মঙ্গলগানের উৎসব বিনে পয়সার হয়ে যাবে। কত দরিদ্র হলে মানুষ কন্যার বিয়েতেও এমন ছলনা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়।

কামুক স্বামী ভ্রমরের মতো নানা নারী-পুষ্পের খোঁজে বেড়ায়, স্ত্রীর মনে স্বস্তি থাকে না, সতর্ক পাহারায় রাখতে হয় স্বামীকে। তাই—

'শিবের চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্বতী
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবা কোন্ ঠাঁই?
কপট করিয়া কথা কহ নানা ছলে
তাই গৌরী দৃঢ় মুষ্টে ধরিলেক শিবের আঁচলে।
তথাচ রাখিতে নারে পাগল শিবাই।'

কিন্তু লম্পটদেরও ছলনার অভাব হয় না। এদিকে 'পুষ্পবনে জন্মিল কন্যা বাপে নাহি জানে', তাই পদ্মাকে 'কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত'। একেত ভিখারী, তার উপর লম্পট, এমন লোকের ঘরনীর নিত্য জ্বালা— তাই অকথ্য ভাষায় গালি পাড়ে আর শাপ-শাপান্ত করে স্বামীকে এবং দুষে নিজের অদৃষ্টকে— 'পাপ কপালের ফলে পতি পাইলাম ভাল। চণ্ডী বোলে সখী মোর দুখের নাহি ওর। বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।'[১] এমন স্ত্রীও ধৈর্য ধরে বেশিদিন ভাল থাকতে পারে না, তাই গৌরীও ডোমনী-জেলেনী-পাটনী হয়ে ছলনায়-বেহায়াপনায় স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দেন—'ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী হইল উলঙ্গ'। গৌরীও 'কপট করিয়া' 'সাঁচা মিছা কথা কইয়া, 'সই পাতিয়া' কাজ হাসিল করতে জানেন। শিব প্রায় সব সময়েই—'ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান কামে অচেতন' থাকেন এবং কখনো কখনো 'বলে ধরিতে চাহে অতি মনত্রাসে।' এমন স্বামীর স্ত্রীরা ঘরে কপাট দিয়ে বসে থাকে 'কোপ করি মন।'

সৎমা-সৎসন্তানের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কোন্দল চিরকালের ও প্রায় সর্বজনীন, তাই দেবতাও মুক্ত নয় এ দোষ থেকে। পদ্মাবতীকে ভালবেসে নয়, —স্বামীর 'বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মহামায়া।' তাই পদ্মার সন্তান হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন চণ্ডী।

পদ্মার বিয়েতে : তারযন্ত্রে গাহে গীত গাহে নাচে সুললিত
পরম সুন্দর দিব্য নারী।

চারদিকে পঞ্চ স্বরে বাদ্য বাজে। এয়ো নারীরা 'বরণের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি।' তিল-তৈল-আমলকী-হরিদ্রা-পিঠালি গায়ে লেপে স্নান করায়, অগুরু চন্দন-চুয়া দিয়ে প্রসাধন করে। দেব-স্বামীরাও স্ত্রীকে বাপ তুলে গালি দেয়–'ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান! কুলীন বাপের মেয়েও দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, —'বাপুর প্রসাদে আমি রাজভোগে ভোগী। বনপুষ্প দূর্বা আমি কভু নাহি তুলি'—এমন দাম্পত্য টেকে না। তাই পদ্মার স্বামী জরৎকারু পালায়। বলে—'পদ্মা হেন স্ত্রীতে আমার নাহি কিছু কাম।' বনবাস যাত্রাকালে সঙ্গী বাপ সৎমার ঘরের কন্যার কাঁদনে কাঁদে–'পদ্মার কাঁদনে কাঁদে দেব ত্রিলোচন।'—এ অশ্রু থেকেই 'নেতা'র জন্ম।

---

১. জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম ফলে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আছে— —বৈষ্ণবপদ
যে ডাল করোঁ মো ভরে শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
সে ডাল ভায়ঙ্গি পড়ে। ভানুর কিরণ পেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যুগে কবিরা পরিবেশসচেতন ছিলেন। মধ্যযুগে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এক জাতের লোক দেবতাবিদ্বেষী কিংবা দেবতার প্রতি উদাসীন থাকলে চলে না। ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে গাঁয়ে গাঁয়ে পরস্পরের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব নিয়ে সহাবস্থান করলেই স্বস্তি, শান্তি ও কল্যাণ। তাই আদি পাঁচালী 'মনসামঙ্গলে' 'হাসান-হুসেন পালার ব্যবস্থা, তই চণ্ডীমঙ্গলে মুসলিম বসতির ব্যবস্থা। হাসান হুসেন পালায় প্রথমে নিন্দা-অবজ্ঞা-দ্বন্দ্ব, পরে স্বীকৃতি ও শান্তি এবং সহাবস্থান। এ সূত্রে ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ খণ্ড'ও স্মর্তব্য।

এখানেও 'হাসান-হুসেন' দুই কাজির নন্দন।
ধর্ম কর্ম দেব-নিন্দা করে ঠাঁই ঠাঁই।
তুলসীর পত্র পায় যাহার মাথাত
চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাৎ।
সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভা কিল
ঝড়ে যেন আকাশ হতে পড়ে দারুণ শিল।
পরের মারিতে পরের নাহি ব্যথা
চোপড় চাপর মারে আর ঘাড় গাতা।
ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে
প্যাদা সকলে তারা হাতে পায়ে বান্ধে।
তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে
ইজার পৈরনে তার কাল্লা তক্যা মাথে।
কাজির প্রতাপে বেটা বড়ই দুরন্ত।

এ অংশের পাঠান্তর কিংবা প্রক্ষিপ্ত পাঠও রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, এগুলো সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রখ্যাসিদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু রাখালেরাও কম যায় না, তারাও তুর্কী শাসকের স্বজাতি মোল্লাকে—

'দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘাড় গাতা
ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা।
মাথার তক্যা কেহ ঘষে দুই পায়ে
বলি দেয়া— ছাগলের রক্ত তার দিল সর্বগায়ে।'

বলা বাহুল্য, এগুলো হচ্ছে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের অতিশায়িত চিত্র, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ সাধারণত সহিষ্ণু ও প্রীতিপরায়ণ, বিধর্মী-বিধর্ম বিদ্বেষ তাদের বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে তেমন প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সম্প্রদায়গত মননে-আচরণে বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বিদ্বেষ কারণে-অকারণে প্রকাশ পায়। এখানে যে চিত্র মিলছে, সেরূপ চিত্র চৈতন্যচরিতে, মুসলিমবিরল মিথিলার হিন্দু রাজার সভাপণ্ডিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়', অন্নদামঙ্গলে, ও অন্য মনসামঙ্গলেও মেলে। শাসকের স্বধর্মী বলে যদি এরূপ দৌরাত্ম্য ওরা সত্যই করত, তাহলে তুর্কীমুঘল আমলে রচিত গ্রন্থে এসব চিত্রই থাকত না। বরং চৈতন্যদের কর্তৃক কাজীর উপর হামলা কিংবা পদ্মাপুরাণে মোল্লার উপর হামলা সম্ভবই হত না। কীর্তিলতা ছাড়া অন্যত্র এ-সব দ্বন্দ্বপীড়নের পরিণাম আপোসে ও সদ্ভাবে অবসিত দেখতে পাই। যবনের চৈতন্যভক্তি ও পীরপাঁচালী এ সূত্রে স্মর্তব্য।

এখানেও শেখ-সৈয়দ-পাঠান-কাজি-মোল্লা-জোলা-কারিগর-সব দাড়ি-গোঁফওয়ালা সাদা পাগড়ী-কুর্তা-ইজার পরে ছুটল-গায়ের জোরে গরুর 'গোস্ত খিলাইয়া হিন্দুর জাতি নাশ' করবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে। পরিণামে কিন্তু মনসাকে স্বীকার করে, তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাজীর দল ঘরে ফিরেছে। এখানে কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হয়েছে দেশী জোলা ও বহুপত্নীক কাজীর প্রতি। কাজীর 'ছোট বিবি লড় পাড়ে। মাঝিয়া বিবি গড়ি পড়ে। বড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাঁই—এরূপে 'কাজীহাটি জোলাহাটি মরিল সকল।' পর্যুদস্ত কাজী 'নিত্য নিত্য পূজার সজ্জা দেয় পাঠাইয়া।' বিনিময়ে সব মানুষ বেঁচে উঠল। লক্ষণীয়, পনেরো শতকে জোলাদি নিম্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এ সব ধর্মত্যাগীদের হিন্দুরা সুনজরে দেখছে না—ঘৃণা-বিদ্বেষ-বিদ্রূপ তাই একটু তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠান্তরে দেখা যায়—হুসেনের মাও 'আছিল হিন্দুর বেটি' এবং 'তুরুকের ঘরেও হিন্দুয়ানী মানে।' আচারিক জীবনের সব ঘটনাই মনসামঙ্গলে সুলভ।

বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগে-আয়োজনে ও বিয়ের আসরে ঘরোয়া ও সামাজিক আচার সংস্কার ও নিয়মনীতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিজয় গুপ্ত সর্বত্র ঘরোয়া ও গ্রামীণ পরিবেশে কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেবতার হিংসা-ঘৃণা, পতিনিন্দা, ঝগড়া-বিবাদ, কাপট্য-ষড়যন্ত্র, প্রতারণা প্রভৃতিও গ্রাম্য। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ আচরণও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এগুলোকে তিনি সাহিত্যের সামগ্রী করে নিয়েছেন। যেমন—'প্রভাত সময়ে কাক ডাকে চারি ভিতে' কিংবা বলদের 'গলায় বান্ধিল ঘন্টা করে ঠন্ ঠন্', অথবা গোদা বলে 'বরশি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাশ' এমনি আরো নানা কথায় ও বর্ণনায় বিজয় গুপ্তের পরিপার্শ্ব-চেতনা সুস্পষ্ট—

পরেরে মারিতে পরের নাহি ব্যথা।
কর্পূরে তাম্বুলে মুখ শুদ্ধ করি করিল শয়ন।
সোনাকা কাঁদে তবে ভূমিতে পড়িয়া
আর পুরুষ চাঁদ সওদাগর কাঁদে বিলাপ করিয়া।
আম ফলে থোক্ থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
কালু বলে মালু দাদা আসিতে পড়িল বাধা
আজুকার জালে ভাস্য নাই।
সুত খেও উঠা-উঠি মৎস নাহি এক বুটি
জাল লইয়া চলো ঘরে যাই।

শিব বেহুলার রতি চাইলে সে বলে,

'আমি নারি পতিব্রতা অন্য লোক বাপের সমান।
শুভাশুভ : আচম্বিতে আসিল কাক নহে দেখি ভাল।
জাতে কৈবর্ত বেটা দীঘল মাথার চুল
সর্বগায়ে চাঁদ যেন শিমূলের কাঁটা।'

পণ্য বিনিময়ে বিক্রয়-কৌশল, বস্তুর গুণ বর্ণন প্রভৃতিও একাধারে ধূর্ততা ও রসিকতার পরিচায়ক।

স্বামী আলিঙ্গন চাইলে সাড়ে বারো বছর বয়স্কা বেহুলা কিন্তু পাকা গিন্নির মতোই বলে—'অখণ্ড কলিকা প্রভু নহেত প্রকাশ/বিকশিত কমলে ভ্রমরে করে আশ' এবং যদিও 'শিশুমতি বেউলা সুরতি নাহি জানে', তবু ভরসা দেয়—'পরশু ভুঞ্জিয় রতি পালঙ্কে বসিয়া।' পৌরাণিক আবরণ দিতে চেয়েও কবি 'বৌদ্ধ সংস্কার' থেকে মুক্ত হতে পারেননি। পদ্মাপুরাণে বৌদ্ধ যুগের ডাকিনী যোগিনী, মন্ত্র-তন্ত্র ও কামরূপ-কামাখ্যা ছাড়া স্বয়ং মনসাও মারতে-বাঁচাতে পারে না। ধন-পুত্র ফিরে পেয়ে বেহুলার ও পরিজন-হিতৈষীদের অনুরোধে চাঁদ অনিচ্ছায় রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল মনসাকে পূজা করতে। তাই বলল 'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহনে'। কিন্তু চণ্ডী যখন দেবতাদের অদ্বয় সত্তা ও অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দিলেন, চাঁদ তখন চণ্ডী ও মনসার অভিন্নরূপ দেখতে পেল, তাই 'ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার।'

সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত বলেন, 'দ্বিজ বিপ্রদাসের রচনা পাণ্ডিত্যের আলোকে ভরপুর। বিভিন্ন সামগ্রীর বর্ণনা এবং রচনা-কৌশলের ভিতরে কবির শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপরিসীম পাণ্ডিত্যের— ছন্দের বাঁধনি এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের ভিতরেও সর্বত্র পণ্ডিতজনোচিত বিবৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। ছন্দের বাঁধন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রাপ্ত।... কিন্তু পূর্বাপর বিচার করিলে গল্পাংশের স্বাভাবিকতায় এবং রচনার সরলতায় ও পারিপাট্যে, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের রচনা অতুলনীয়।" (পৃঃ ৪./০/৩।০,)

১২

কবি বিপ্রদাস পিপিলাই

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের পাঁচালীর তিনখানি খণ্ডিত ও একখানি সম্পূর্ণ পুথি মিলেছে। তিনখানি খণ্ডিত পুথির দুখানি এশিয়াটিক সোসাইটির, অন্যখানা বর্ধমান সাহিত্য সভার। পূর্ণাঙ্গ পুথিটি বিশ্বভারতীর। এই চারখানা পুথির প্রাপ্তিস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমা। এখানে কবির 'নিবাস' বলে উল্লিখিত 'বাদুড্যা' গ্রামের অভিন্ন নামে বাদুড়িয়া থানাও আছে। আবার নাদুড্যা<নাদুড়িয়া নামে একটি ছোট গ্রামও আছে। চারখানা পুথিতেই গ্রন্থারম্ভ পালায় অভিন্ন রচনাকাল মিলেছে। চারখানা পুথিরই লিপিস্থান একই এলাকা। পুথির লিপিতে 'র'-এর নীচে বিন্দু রয়েছে যখন, তখন লিপিকাল নিশ্চিতই উনিশ শতক, ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পরে অনুলিখিত। ঐ স্থানে প্রচলিত কোন আঠারো শতকী পুথির এগুলো উনিশ শতকী প্রতিলিপি হওয়া সম্ভব। কবিও ঐ অঞ্চলের, মনে হয় বিপ্রদাসের খ্যাতি অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করেনি কখনো। রচনার কালটি এই—

'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।'

অতএব ১৪১৭ শকে তথা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' বা 'মনসাবিজয়' রচিত হয়। চারখানা পুথিতেই যখন অভিন্ন রচনাকাল মেলে, তখন এ তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা ও গ্রন্থোক্ত কিছু তথ্য পুথির সামগ্রিক অকৃত্রিমতায় প্রবল সন্দেহ জাগায়। যেমন—চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা পথের বর্ণনায় খড়দহে শ্রীপাট, কলকাতা এবং ব্রিটিশ আমলে খ্যাত হুগলি, ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, বিসিড়া, কোন্নগর, কামার হাটি, চিৎপুর, বারুইপুর প্রভৃতি জায়গার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

আবার পনেরো শতকে অজ্ঞাত তামাকুর কথাও আছে—'কেহ আনন্দিত হইয়া/সুবর্ণের হুকা লৈয়া/তামাকু ভরিয়া দেয় আগে', আবার বাবুরের ভারত বিজয়ের ত্রিশ বছর আগেই সপ্তগ্রামে মোঙ্গল (মুঘল) বাসিন্দা প্রত্যক্ষ করেন কবি— 'নিবসে যবন যত/তাহা বা বলিব কত/মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম'।

আর ভাষাতো প্রায় সর্বত্র সংস্কৃত শব্দবহুল এবং ক্রিয়াপদ আধুনিক কথ্যরীতির আদলপ্রাপ্ত। এ-সব কারণে বিদ্বানেরা বিপ্রদাস পিপিলাইকে প্রাচীন কবি বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন। তবে রচনাকালটা আঠারো শতকের শেষ পাদের বা উনিশ শতকের প্রথম পাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন চতুর লিপিকরের সংযোজন কিনা তাও নির্ণয় করবার উপায় নেই। বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়ের' সম্পাদক ডক্টর সুকুমার সেন সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছেন নানা যুক্তি দিয়ে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন কবি 'সাতটি' পালাই লিখেছিলেন, পরবর্তী লিপিকর বা গায়েনদের প্রক্ষিপ্ত রচনায় ১৩টি পালায় পাঁচালীটি স্ফীতকলেবর হয়েছে। তাঁর এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে কাব্যোক্ত এই তথ্যটি : 'সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত/কহিল মঙ্গলগীত/বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি'। এমনি অনুমান ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যও করেছিলেন। (পৃঃ ২৫১ ৩য় সংস্করণ)

বলা বাহুল্য, এ অনুমানের পক্ষে যুক্তি নিতান্ত দুর্বল, সপ্তনিশির জন্যে 'সাত' পালাই প্রয়োজন এমন কোন কথা নেই। তবে প্রক্ষিপ্ত উপাদানে যে পাঁচালীটি স্ফীত কলেবর ও আধুনিকতা পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণের' জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত সংস্করণে দেখতে পাই প্রক্ষিপ্ত পাঠ গ্রন্থের মূল পাঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই বিপ্রদাসের পাঁচালীর বেলায়ও হয়তো এমনটিই ঘটেছে। বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের রচনায় বৌদ্ধ সংস্কারের প্রভাবই সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দু পুরাণের প্রভাব সর্বগ্রাসী হবার আগেই এগুলো রচিত।

'দেব নিরঞ্জনে বন্দো ত্রিদেবের নাথ/ডাকিনী-যোগিনী বন্দো মোর ধর্ম-মা/নিরঞ্জন কায় ভেদ সর্বশাস্ত্রে জানি/ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া নাম হৈল ব্রহ্মাণী/মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপাণি/'যোগেশ্বরী নাম আর সরসা যোগিনী/জাঁগিয়া জাগুলী নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি — ইত্যাদি বৌদ্ধ তত্ত্ব ও সংস্কার লক্ষণীয়।

সৃষ্টিপত্তন অংশও বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বানুগ :

যখন না ছিল গোসাঞি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
পবন আকার গোসাঞি ছিল জ্যোতির্ময়।
আদ্যাশক্তি সৃজন করিলা মহাশয়/.....
ধবল ছত্র ধরি শিরে/উলকে করিয়া আরোহণ/ধর্মের বদন দেখি।
গঙ্গা ধবল মুখী/দেখি নিরঞ্জন কায়/আন্তরীক্ষে ধর্মরায়/
গঙ্গে দিলা পরিচয়.../বল্লুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা–

ধর্মের চরণ দেখবার জন্যে হর পুষ্প তোলে বার বছর ধরে।

বিপ্রদাসও মনসার স্বপ্নাদিষ্ট :

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।

কবির আত্মপরিচয় সূত্রে জানা যায় :

মুকুন্দ পণ্ডিত-সুত বিপ্রদাস নাম
চিরকাল বসতি নাদুড্যা বটগ্রাম।
বাৎস্য গোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর
সামবেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর।

অতএব, দ্বিজ বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। তাঁরা সামবেদী ব্রাহ্মণ, কুতুব (কৌথুম) শাখ, গোত্রে বাৎস্য, কুলবাচী— পিপিলাই। নিবাস নাদুড্যা (বাদুড্যা) বটগ্রাম। বর্তমান বশিরহাট মহকুমায় কবির নিবাস হলে, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) কবি বলে দাবি করা চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মার নব নির্মিত পুরীতে—

প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্র নীতি
বাসিন্দারা— ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কায়স্থ হরষিত।
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বর্ণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাদ্য পুরক কলু কুশলি কাঠুর‍্যা
শাঁখারি কাঁসারি বৈসে তামলি সেকরা।
তাঁতি যুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদী কূলে।

এই কাব্যে হাসান-হুসেন 'তুরুক' (তুর্কী) বটে, কিন্তু অভিজাত বিত্তবান গৃহস্থ। শতেক গোলাম কৃষাণ নিয়ে জমি চাষ করায়। 'জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল খেদাইয়া/হরিষে চলিল পথে পাচনি লইয়া।' কিন্তু পরবর্তী বর্ণনায় নগরই হয়ে গেছে, গ্রাম আর গ্রাম নেই। এখানে আক্রমণকারী অর্থাৎ বিরোধ বাধায় রাখালেরা—অকারণে তারা গোলামকে তাড়া করে। 'ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুরুক দেখিয়া/ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া'। গোলাম পালিয়ে গিয়ে সর্দার কৃষাণ গোরা মিনাকে খবর দিল, রাখালেরা—করিছে ভূতের থানা দরক্তের তলে। ঘন ঘন তসলিম করএ বহুতর।' কবি বহু তুরুকের নাম উল্লেখ করেছেন—এই নামেই বিদ্রূপ প্রকট—সাহাতন, পয়তন, গয়তন সেবদিন-মুজদিন-খরদিন-তকদিন ইত্যাদি। বান্দিদের নাম চিরা বিবি, হারি, আরজায় কালাফুলি, বুলবুলি, দুলদুলি, নাজিবি, টগরী ইত্যাদি। এর মধ্যে টগরী প্রভৃতি দেশী নাম।

হাসান-হুসেনের হাসাননগর অতি সমৃদ্ধ—

'সুবর্ণ রচিত পুরী ঘর শোভে সারি সারি
নৃত্য গীত আনন্দ বিস্তরে।
শতেক বিবির সঙ্গে হাসন আনন্দ রঙ্গে
রভসে নিবসে সর্বক্ষণ।
কর্পূর তাম্বুল খায় কস্তুরী-চন্দন গায়
গোলামে যোগায় ঘনে ঘন।
কেহ মলে অঙ্গ পদ কেহ করে খোসামদ
কেহ শ্বেত চামর দোলায়।
কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুক্কা লৈয়া
তামাকু ভরিয়া দেয় আগে।
কাজি মজলিস করি কেতাব কোরান ধরি
খতাগুনা-তজবিজ করে।
যতেক সৈয়দ মোল্লা জপয়েত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কালিমা দিল মুসলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুসলমান।
শিখাএ নামাজ অজু, সদাই মক্তবে রুজু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরন্তর ফলিপা জোগান।
নিকা-বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদা খোসালিত অতিশয়।
মোকাদিমে লৈয়া যায় কলিমা কোরান তায়
ফএতা পড়িয়া সাঙ্গ হয়।
কোথা মোল্লা ডাকি লয় পীরের হাজত দেয়
শিরনি ফয়েতা কুতূহলে।
মিঞা যদি ফৌত হৈল গোলামেরে খোষ পাইল
বিবি লৈয়া পলাইতে চায়'—

এতে তুর্কী আমলের মুসলিম গাঁয়ের নয়, পরবর্তী কালের হিন্দুর চোখে মুসলিম সমাজের একটি স্থূল চিত্র মেলে। উচ্চবিত্তের মুসলমান গোলাম-বাঁদী দিয়েই সব কাজ করাত, গাঁয়ে দেশজ মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশি। শাস্ত্রীয় শিক্ষা গাঁয়ে গাঁয়ে চালু ছিল, পীরের দরগায় ফাতেহা সিন্নি হত। বহু বিবাহও বিরল ছিল না, তালাকও ছিল অবিরল। বর্ণনার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েইছে।

'মনসামঙ্গলগীত' অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতি :

'এ সব সম্পূর্ণ কথা শুনে যেই জন
ধন জন বৃদ্ধি হয় বিঘ্ন বিনাশন।
সর্প হইতে কভু ভয় না হয় বিনাশ
ইহকালে সুখে থাকে মৈলে স্বর্গবাস।...
যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়
সর্বক্ষণ বিষহরি তাহার সহায়।
যাহার কল্যাণে গো তোমায় ব্রত গাই
মনোনীত বাঞ্ছাপূর্ণ করিবে সদাই।' ইত্যাদি।

১৩
জয়েনউদ্দীন
সূচনা

কবি জয়েনউদ্দীনের 'রসুলবিজয়' কাব্যের একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সংগ্রাহক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। এর পর সত্তর বছর গত হয়েছে, কিন্তু এ কাব্যের আর কোন পাণ্ডুলিপি কারো চোখে পড়েনি। সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ সালে[১] এই পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং তখন থেকেই বিদ্বানদের মধ্যে এ বিবরণ-ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়।

১. ক. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০৬-৮। খ. মৎসম্পাদিত রসুল বিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৭০ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যের নাম

পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে নাম-পৃষ্ঠা কিংবা পুষ্পিকা সূত্রে কাব্যের নাম জানা যায়। তবে ভণিতা দেখে মনে হয় কাব্যের নাম 'রসুলবিজয়'। যেমন :

ক. শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত।

খ. রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।

গ. রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার।

পীর ও আদেষ্টা

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির গোড়ার আট পাতা নেই। মনে হয় এতে রেওয়াজ মতো হামদ, না'ত, পীর-প্রশস্তি, প্রতিপোষক-পরিচিতি ও কবির আত্মপরিচয়াদি লেখা ছিল। এখন ভণিতা কয়টিই আমাদের সম্বল, এগুলো থেকেই আমরা কবির ও কাব্যের এবং পীরের ও পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি। কবির নাম জনুদ্দীন, জয়দ্দিন, জএনুদ্দিন, জএনুলদ্দিন রূপে লেখা রয়েছে। কাব্যের নাম রসুলবিজয়, পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান আর আদেষ্টা বা প্রতিপোষক হচ্ছেন ইউসুফ খান; তিনি 'রাজরত্ন, রাজেশ্বর, নায়ক ও সুনায়ক' বলে আখ্যাত হয়েছেন। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, রাজরত্ন শ্রীযুত ইউসুফ খানের আরতির জন্যে পীর শাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করে 'পাঞ্চালি' রচনা করেছেন। ভণিতাভাগে কবি অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করে পীরের ও ইউসুফ খানের গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাতে স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমাদের মনের সংশয় ঘোচে না। আমরা এখানে ভণিতাগুলো উদ্ধৃত করলাম।

১. হীন জএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ।
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ।

২. দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান।।
ভাবে ভব কল্পতরু জানে শুক্রজ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হয় মহেশ সমান।
শান্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীর শাহা মোহাম্মদ খান।।
তান পদ-রজ-পঙ্ক তালে তির পরি রঙ্গ
কহে জএনুদ্দিন [ইহ] লোকে।
ধর গিয়া সে চরণ জয় দিব নিরঞ্জন
কিসকে ভাব মন দুখে।।

৩. করুণা সাগর পীর গুণের সাগর।
অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধুবর।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ।
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহার বাখান।।
কমল চরণ রেণু শিরেত করিয়া।
হীন জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥
শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত।।

৪. রসুল বিজয় বাণী অমৃতের ধার।
শুনি মনে সব অধিক আনন্দ অপার।।
সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিধি।।
শাহা মোহাম্মদ খান সর্বগুণবিধি।।
তান পাদপদ্মে বন্দি ধেয়ানে ধেয়াই সার।
শিশু জএনুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার।।

৫. দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত শঙ্কর সম জান।।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ খান জান।।
তান পদ রেনু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়দ্দিনে রচিল পয়ার।।

৬. শ্রীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান
সুরুচির সুবুদ্ধি সুঠাম।
রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।।
কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীর জন।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
পীর শাহ মোহাম্মদ জান।।
তান পদযুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি।

৭. হীন জএনুলদ্দিনে কহে নবীর চরণ
ভজিয়া শরণ মাগি উদ্ধার কারণ।।

৮. রসুল বিজয় বানী সুধারস ধার।
শুনি গুণিগণমন আনন্দ অপার।।
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত অতি সুনায়ক।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. শাহা মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির
সেই পদ প্রসাদে পয়ার।
জএনুলদ্দিনে কহে আর কেবা পারে মারিবার
যাহারে রাখএ করতার।।

১০. হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর
কে বুঝিতে পারে তার অনন্ত মহিমার।

১১. আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার।
শ্রীযুত ইছুপ মন আনন্দ অপার।
শিশু জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার।

মোট এগারোটি ভণিতায় :
ক. দুটোতে কবির নাম নেই,
খ. দুটোতে কবির নাম জএনুদ্দিন,
গ. তিনটেতে জনুদ্দিন,
ঘ. আর চারটেতে জএনুলদ্দিন রয়েছে।

অতএব কবির প্রকৃত নাম "জএনুলদ্দিন" ছিল বলেই অনুমান করতে হয়। তবে 'জএনুদ্দিন ও জনুদ্দিন'কে অভিন্ন মনে করলে অর্থাৎ 'জনুদ্দিন' জএনুদ্দিনের বিকৃতি বলে ধরে নিলে কবির নাম 'জয়নুদ্দীন' বলেই মানতে হয়।

ক. তিনটে [২, ৩, ৬] ভণিতায় পীর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে।
খ. তিনটে [৪, ৫, ৯] ভণিতায় কেবল পীরের চরণ বন্দনাই রয়েছে।
গ. দুটোতে [৮, ১১] কেবল প্রতিপোষকের উল্লেখ আছে।
ঘ. তিনটেতে [১, ৭, ১০] পীর বা প্রতিপোষকের নাম নেই।
ঙ. দুটোতে [৬, ৮] কবির নাম নেই।

সুতরাং পীরের নাম ছয়বার, পৃষ্ঠপোষকের নাম পাঁচবার এবং কবির নাম নয়বার পাচ্ছি।

১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত কবি মুহম্মদ খানের "মক্তুল হোসেন" কাব্যে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা পীরগণের নাম আছে। সেখানে শাহ মুহম্মদ খানের নাম নেই।

২, ৬, ৮ সংখ্যক ভণিতায় ইউসুফ খানকে যথাক্রমে রাজরত্ন, রাজেশ্বর (রাজস্বর), নায়ক ও সুনায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা পরাগলী মহাভারতে সেনাপতি ও যুবরাজ অর্থে 'নায়ক' ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আবার শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দরে 'যুবরাজ'কে রাজা এবং শাহ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে :

ক. শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান।
খ. ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
গ. রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনাকাল

আলোচ্য খণ্ডিত কাব্যে রচনাকাল পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপিটিও অর্বাচীন। কবির পীরও সম্ভবত কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। বাহ্য কোন তথ্য প্রমাণেও কবির আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের উপায় নেই। অবশ্য অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সে চেষ্টাও করেছেন। আমরা তা যথাসময়ে আলোচনা করব। অভ্যন্তরীণ কোন তথ্যও আমাদেরকে কোন প্রত্যয়ে পৌঁছায় না, যদিও অনুমানের অবকাশ দেয়। আর ভাষা বিচারে কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্রথমেই ভাষার কথা ধরা যাক। রসুলবিজয়ের ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন দুর্লক্ষ্য। রাজাক, আলিক, জানসি, চিনসি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বরং গোড়ার কয়েক পাতায় নিকলি, মালুম, ঢালিয়া, খোসাল, নেহাল, হদ, দিল, বাত, ফরমাইল, ফেকিলা প্রভৃতি দোভাষী পুথিসুলভ শব্দের ব্যবহার পাই। তবে কি রসুলবিজয় কোন সময় বটতলায় ছাপা হয়েছিল? ভাষা দেখে কালনির্ণয় সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কেননা মানুষ বিশেষে রচনশৈলী বিভিন্ন। বিশেষ করে গঠন যুগে (Formative period-এ) ভাষা প্রতিভাবানের হাতে নতুনত্ব পায়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বাঙলা ভাষার লেখকগণের বিভিন্ন লিখনভঙ্গীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হব। আমাদের হাতে অন্য প্রমাণও আছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি মুহম্মদ দানিশ[১] তাঁর 'জ্ঞান বসন্ত বাণী' গ্রন্থে এবং আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি মুহম্মদ জীবন[২] তাঁর 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' উপাখ্যানে পনের-ষোল শতকের ভাষার রূপ রক্ষা করেছেন। যেমন মুহম্মদ জীবনের কাব্যে ক্রিয়ারূপ : কহোঁ, নহোঁ, আসিছোঁ, কহসি, চিনসি, বদএ। কর্মে 'ক' বিভক্তি– কন্যাক, মোক, তোক, তাক প্রভৃতি। সর্বনাম তহু, মোত প্রভৃতি। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা কত অর্বাচীন; ভাষানির্ভর সিদ্ধান্ত যে অচল, এ যুগেও তার প্রমাণ রয়েছে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের রচনা-পড়ুয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে বাঙলা লিখতেন, তাতে তাঁদেরকে আজকের দিনের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়, আবার এখনকার অনেক লেখক উনিশ শতকী ঢঙে আজো লেখেন। আর এক কথা, জনপ্রিয় রচনার ভাষা লিপিকর পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েও আধুনিক রূপ লাভ করে। প্রমাণ, বৈষ্ণব পদাবলী, ডাক-খনার বচন ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কাজেই ভাষার প্রমাণে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নইলে চোখ বুজে বলা যেত, 'রসুলবিজয়' আঠারো শতকের রচনা।

এবার বাহ্য প্রমাণের কথা বলি। অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানই এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে "জইনউদ্দীন ছিলেন বারবক শাহের সভা কবি।[৩] জইনউদ্দীন প্রকৃত নাম জইনউদ্দীন খান—জাতিতে পাঠান। তিনি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা করিয়াছেন।... জইনউদ্দীনের জন্মস্থান হিরাট। তাঁহার আর একটি নাম ছিল ফতেখান। ফারসি কবিতায় তিনি নাকি ফতেখান বলিয়াই প্রচলিত ছিলেন। এই কারণেই 'রসুলবিজয়ের' রচয়িতা যে আমীর জইনদ্দীন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফারসিতে সুপণ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই বাংলায় কাব্য রচনা

---

১. মাহেনও — ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সন।

২. বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৬৭ সাল।

৩. ডক্টর এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ মনে করেন : এই বারবক শাহ সম্রাট বাহলুল লোদীর পুত্র জৌনপুরের সামন্ত শাসক বারবক শাহ। J. A. S. P. Vol. pp 214.15.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান বিশেষ পরিচিত। বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই যুবরাজ ইউসুফ খান আমীর জইনউদ্দীনকে রসুলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। ইহার ফলেই 'রসুলবিজয়' কাব্য সৃষ্টি হয়।... বিজয় কাব্যগুলির মধ্যে 'রসুলবিজয়' প্রাচীনতম বটেই এমন কি চণ্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন প্রাচীনতর হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।"[১] সুফিয়ান সাহেবের এই বিবৃতিতে কোনো তথ্য নেই, আছে তত্ত্ব। তত্ত্ব দিয়ে ইতিহাস হয় না।

আমীর জইনউদ্দীন হারুয়ী বারবক শাহর (১৪৫০-৭৬ খ্রীস্টাব্দ) সভাকবি ছিলেন। 'শরফনামা' নামক অভিধান রচয়িতা ইব্রাহীম কায়ুম ফারুকী তাঁকে 'মারেকুল শোয়ারা' বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো ফারসি কবির হিরাট থেকে এসে রুকনউদ্দীন বারবক শাহর সভাকবি হতে বাধা নেই। কিন্তু হিরাটে যাঁর জন্ম তিনি বাঙলাদেশে এসে বাঙলা শিখে বাঙলা ভাষায় একটি যুদ্ধ কাব্য লিখলেন, (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবন্ধ বা প্রকীর্ণপদ হলেও না হয় বিশ্বাস করা যেত) এ কথা বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ও সম্ভাব্যতার সীমাও বাড়িয়ে দিতে হয়। বিশেষ করে এ জয়েনউদ্দীন খান হারুয়ীই যদি 'রসুলবিজয়' কাব্য লিখতেন, তাহলে তাঁর কাব্যে হিন্দুয়ানি উপমাদি অলঙ্কার, রত্ন প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙলার আবহ এমনিভাবে পেতাম না। কর্ণ-দ্রোণ-শুক্র প্রভৃতিরও ঠাঁই হত না। ভাষাও হত দোভাষী। এ সূত্রে আমীর খুসরুর হিন্দি রচনার কথা স্মর্তব্য। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও দুই জয়েনউদ্দীনকে অভিন্ন ভাববার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন; "এঁকে (আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি) এবং 'রসুলবিজয়' রচয়িতা জৈনুদ্দীনকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে।"[২] পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন[৩] এবং জয়েনউদ্দীনকে সৈয়দ সুলতানের (১৫৮২ খ্রী.) পরবর্তী বলে বিশ্বাস করেছেন।[৪] আমাদের ধারণায় নামসাদৃশ্য ছাড়া দু'জনকে অভিন্ন ভাববার আর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে ইউসুফ খানকে কেন্দ্র করে দু'জনকে বড়জোর সমকালের বলে মনে করা যেতে পারে।

এবার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সন্ধান করা যাক। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইউসুফ খানকে 'রাজরত্ন', রাজেশ্বর (রাজস্বর), নায়ক ও সুনায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। এতেই আমাদের অনেকেন মনে আশা জেগেছে, হয়তো বা ইনি গৌড়ের সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) সন্তান ইউসুফ খান। ডক্টর সুকুমার সেন ইউসুফ খানকে কোনো জমিদার বলে অনুমান করেছেন। এ অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে। গত শতকের এমনি সময়ে কক্সবাজারের রামু থানার অন্তর্গত মিঠাসরাহ গাঁয়ের জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৮১৫-মৃত্যু ১৮৬৬ খ্রী.) কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আশ্রয়পুষ্ট চারজন কবির সন্ধান জানি। এঁরা এই সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিকে তোয়াজের ভাষায় 'নৃপতি, সুলতান, শাহা, রাজেশ্বর' প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন।[৫] পড়ে কারুর বুঝবার সাধ্য নেই যে আলী হোসেন একজন সাধারণ ধনী মাত্র। তোয়াজ-তোষামোদের ভাষায় চিরকালই এমনি বাড়াবাড়ি থাকে।

---

১. মাহেনও—মার্চ ১৯৫৭, 'কবি জইনুদ্দিন'।

২. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ১ম সং, (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী.) ২য় খণ্ড—পৃ. ১২২।

৩. দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন পৃ. ২১৫।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম পৃ. ১৯৫।

৫. বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৬ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণনগর-নাটোর-বর্ধমানের সামন্ত জমিদাররা চিরকাল যে-সব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন, তাতে মনে হবে মর্যাদায় ও দাপটে তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ্‌রও বড়। তোয়াজস্তুতির রেওয়াজ মতো যে কেউ "সসাগরা পৃথিবীর" অধীশ্বর হতে পারেন। কাজেই ইউসুফ খানকে গৌড়ের শাহজাদা বলেও অনুমান করা যায়। যেমন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[১] প্রমুখ করেছেন।

ক. 'ইউসুফ খান' নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি তখনো শাহ্ হন নি।

খ. ইউসুফ তখনো যুবরাজ বলেই গৌড় দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ নেই। এবং এ কারণেই তাঁকে সুনায়ক, রাজরত্ন ও রাজেশ্বর আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে, —গৌড়াধিপতি বা সুলতান প্রভৃতি যথার্থ রাজযোগ্য উপাধি প্রযুক্ত হয় নি। কেন না যে কোনো জমিদার ও সুলতানের পারিষদ রাজা, মহারাজা, রাজরত্ন বা রাজেশ্বর উপাধি পেতে পারতেন যেমন হিন্দু সামন্ত ও পরিষদরা চিরকাল পেয়েছেন। কাজেই উক্ত সব শব্দ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) জ্ঞাপক নয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা গুণরাজ খান মালাধর বসু[২] ও রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস ওঝা[৩] রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। কাজেই অনুমান করা যায় পরমতসহিষ্ণু উদারহৃদয়[৪] পিতা বারবক শাহ্ যখন দুই হিন্দু কবি দিয়ে দু'জন অবতারের (কৃষ্ণ ও রাম) মাহাত্ম্যকথা রচনা করিয়েছিলেন, তখন বিধর্মদ্বেষী ও স্বধর্ম-নিষ্ঠ[৫] পুত্র ইউসুফ খান পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসুলমাহাত্ম্য লিখবার জন্যে কোনো এক বাঙালি কবি জয়েনউদ্দীনকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন। কবির ভণিতা দেখে মনে হয়, কবি নিজে ইউসুফ খানের সভায় তাঁর কাব্য পড়ে শুনাতেন। আমাদের এ অনুমানের সপক্ষে আরো একটি নজির আছে। পিতা পরাগল খান যখন কবি পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়েছিলেন, তখন পুত্র ছুটি খান[৬] শ্রীকর নন্দীকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বমেধ পর্ব রচনায়। কাব্যের গোড়ার দিকে যে-আট পাতা নেই, তাতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌড় ও গৌড় রাজদরবারের বর্ণনাও ছিল। কাজেই শাহ্‌জাদা ইউসুফ খানের আগ্রহে 'রসুলবিজয়' রচিত হওয়ার সম্ভাব্যতাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আবার এই ইউসুফ খান যদি তাজখান কররানীর পুত্র, আত্মীয় বা সহযোগী হন, তাহলেও এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৫৭-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এ. টি. এম. রুহুল আমিনের মতে ইউসুফ খান তাজ খানের (১৫৬৪-৬৫) পুত্র।

১. অতএব, ইউসুফ খান যদি কোনো জমিদার হন এবং ভাষার অর্বাচীনতায় যদি গুরুত্ব দিই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে হয়।

---

১. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ. ৬০-৬২।

২. ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ), ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১২৩।
খ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী.) সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০২।

৩. ক. ঐ-পৃ.-১০২।
খ. কৃত্তিবাস – সুখময় মুখোপাধ্যায়।
গ. History of Bengali literature : Dr. Sukumar Sen. p. 68.

৪. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৭/১, ১১৯।

৫. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায় , পৃ. ১২১

৬. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টা পরাগল – তাঁর পুত্র ছুটি খান নন। বাঃ সাঃ ইঃ (পূর্বার্ধ), পৃ. ২৫১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আর যদি ইউসুফ খান তাজ খানের পুত্র হন, তা হলে জয়েনউদ্দীন ষোল শতকের মধ্যকালের কবি।

৩. পীর মীর কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য কবি মুহম্মদ খান (১৬৪৬ খ্রী.) যদি জয়েনউদ্দীনের পীর হ'ন, তাহলে 'রসুলবিজয়' কাব্য সতেরো শতকের তৃতীয় পাদে রচিত। অবশ্য এ নিতান্তই অনুমান। ইনি জয়েনউদ্দীনের পীর হলে পীরস্তুতিতে পীরের কবিখ্যাতিরও উল্লেখ থাকত।

৪. আর যদি ইউসুফ খানকে গৌড়ের সুলতান পুত্র বলে স্বীকার করি, তা হলে জয়েনউদ্দীনের কাব্য রচনার কাল ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ। এবং তখন এও মানতে হবে যে রসুলবিজয়ের পূর্বে ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা শুরু হলেও ওটি সমাপ্ত হয় [১৪৮০ খ্রী.] রসুলবিজয় কাব্য রচিত হওয়ার পরে। সুতরাং রসুলবিজয়ই বারবক শাহ্‌র আমলের আদি গ্রন্থ। অবশ্য 'কৃত্তিবাসী রাম পাঁচালী যদি তাঁর আমলের প্রথম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়, তা হলে 'রসুলবিজয়' হবে দ্বিতীয় গ্রন্থ। আর সেক্ষেত্রে এটিই আদি জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্যও।

॥ বিজয় কাব্য ॥

আমাদের আগের অনুমান অনুসারে 'রসুলবিজয়' বিজয় কাব্যেরও আদি হয়ে দাঁড়ায়; যদিও ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, 'বিজয় কাব্য" মানে দেবতার জয়যাত্রা বা জয় কাহিনী। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে 'মঙ্গল' ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয়। মঙ্গল ও বিজয় দুই স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভুল।"[১] গমন বা যাত্রা' অর্থে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার সুপ্রাচীন। বিজয়া দশমীও দেবীর যাত্রা বা গমন অর্থে ব্যবহৃত। বৈষ্ণব সাহিত্য এ অর্থে বিজয় বহুল ব্যবহৃত। যেমন 'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়। বিজয় যেন করিলা নন্দ ঘোষের বালা'। 'জয় জয় বিজয় কুঞ্জে কুঞ্জর বরগামিনী।'

সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশের 'ওফাৎ-ই-রসুল' অংশে প্রতিনিধি কিংবা উত্তরাধিকারী অর্থে 'বিজএ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, "তানে (আবুবকরকে) আহ্মি আপনার 'বিজএ' করিল/পালিবা আহ্মার কাব্য রাজ্য তানে দিল।' পাঠান্তরে 'তানে আপনার মুই 'বিজএ' করিলুম/পালিবারে জগৎ তানে ভার দিলুম।'

কিন্তু কোনো কোনো কাব্যে বিশেষ করে মুসলিম রচিত কাব্যে 'বিজয়' শব্দটি সামান্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামের পুরো অর্থসঙ্গতি রয়েছে; অতএব মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, কবি মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, মীর ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় ও সত্যপীর বিজয় কিংবা কবিশেখরের গোপালবিজয় কাব্যের নাম ডক্টর সুকুমার সেনের সংজ্ঞানুগ হলেও জয়েনউদ্দীন, শাবারিদ খান ও শেখ চাঁদের রসুলবিজয় ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয় এবং ফয়জুল্লাহ্‌র গাজীবিজয়-এ 'বিজয়' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত।

কেউ কেউ মনে করেন 'বিজয়' নামের মোহে পড়েই পরবর্তী কবিগণ কাব্যের নাম 'বিজয়' রাখেন। এতে কিছু সত্য আছে বলে মনে করি। কেননা আমরা দেখেছি গত শতকের –'নীলদর্পণ' নামের অনুকরণে বহু দর্পণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর আগেও 'রঘুবংশ' নামের

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ), পৃ. ১০৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসৃতি পাই 'হরিবংশ' ও 'নবীবংশ'-এ। এ ভাবে আমরা 'রসুলবিজয়' (তিনটি), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালবিজয়, গোপীনাথ-বিজয়, গৌরাঙ্গবিজয়, পাণ্ডববিজয়, গাজীবিজয়, গোরক্ষবিজয়, মনসাবিজয় প্রভৃতি পেয়েছি। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরো দুটো নাম পাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে—একটি 'মঙ্গল' অপরটি 'চরিত।'

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

আবার এই রসুলবিজয় দিয়েই বাঙলা ভাষায় চোখে দেখা রক্তমাংসের মানুষের জীবনকথা বা চরিতকথা লেখারও শুরু। এ ধরনের রচনাকে বলা চলে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কাল্পনিক রূপায়ণ বা অনৈতিহাসিক জীবনচিত্র। দ্বিতীয় স্তরে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে লৌকিক ও অলৌকিক এবং সত্য ও কল্পনার সমতা রক্ষিত হয়েছে।

। কবির নিবাস।

কবির ভণিতায় প্রকাশ তিনি স্বয়ং ইউসুফ খানকে তাঁর কাব্য পাঠ করে শুনাতেন। ইউসুফ খান যদি গৌড়ের শাহজাদা হন, তাহলে কবি গৌড়বাসী বা গৌড়প্রবাসী ছিলেন। রসুলবিজয়ের একটা চরণে আছে- "পদ্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।" এ উৎপ্রেক্ষা থেকে মনে হয় নদীবহুল বাঙলা দেশে পদ্মাই কবির বিশেষ পরিচিত ছিল। সুদীর্ঘ পদ্মার কোন্ তীরে কোন্ অঞ্চলে তাঁর নিবাস ছিল, তা অনুমানসাধ্য নয়। আবার কাব্যে 'হমাইতে, উয়াস, থু, খোন, ধাবাম. বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি প্রভৃতি বিশেষভাবে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দও রয়েছে।

অনুমানের অশ্ব ছুটিয়ে অনেক দূর এগুলাম। যা কিছু সম্ভব সব তুলে ধরেছি। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ না মিললে ইতিহাস কিছুই গ্রাহ্য করে না, সে দিক দিয়ে এ পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু তথ্য-নির্ধারণে এগুলো কিঞ্চিৎ দিশা দিতেও পারে, এ ক্ষীণ আশা রইল। নিঃসংশয়ে তথ্য-প্রমাণ যোগে সত্য নিরূপণ করতে হলে 'রসুলবিজয়'-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনো সূত্রে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া প্রয়োজন। নইলে ইতিহাসগ্রাহ্য কিছুই নিশ্চয় করে বলা যাবে না।

। কাব্যের বিষয়বস্তু ।

হযরত মুহম্মদের সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের লড়াই-ই এ কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এটি যে ঐতিহাসিক কোনো যুদ্ধ নয়, তা কাকেও বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। সৈয়দ সুলতানও তাঁর 'নবীবংশে' এ যুদ্ধ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামে একটি স্বতন্ত্র পুথিরূপেও চালু ছিল। শাহ বারিদ খানের 'রসুলবিজয়ে'র বিষয়ও এ লড়াই। 'মুসানামা'র কবি মুহম্মদ আকিলেরও এ নামের একটি রচনা রয়েছে। ফারসিতে এবং উর্দুতেও এঁদের কিসসা রয়েছে। জয়কুম সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি নাকি ইরাক কিংবা আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন।[১] বাঙলা কাব্যে বর্ণিত এ যুদ্ধ হয়তো ফারসি কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি বা অনুকৃতি। জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ সুলতান ও শাহ বারিদ খানের বর্ণনায় তাই সাদৃশ্য অনেক।

হযরত মুহম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোনো কোনো যুদ্ধে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বদর, ওহুদ, খয়বর প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে

১. Brumhardt : Zaqqum. King of Armenia. কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'জঙ্গনামা' ও 'জঙ্গনামা-ই-পাদশাহ-ই জকুম' নামে দুটি ফারসি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জঙ্গনামা' রচিত হয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামটি আজকাল বাঙলায় যোগরূঢ় হয়ে উঠেছে এবং 'জঙ্গনামা' বলতে সাধারণত কারবালা কাহিনীই নির্দেশ করে। মূলতঃ যে-কোন যুদ্ধ কাহিনীই ফারসীতে 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। আমাদের খোন্দকার নসরুল্লাহর 'জঙ্গনামা'টি হযরত আলীর দিগ্বিজয় বিষয়ক। সেকালে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখী। তারা জৈব ও মানস প্রয়োজনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা খুঁজত বাহ্য ঘটনায়। সেকালের রচনাও তাই বস্তুমুখী (objective)। সেকালের সাধারণ লোক ইতিহাস পড়ত না, রূপকথা, ইতিকথা ও কিংবদন্তীই তাদেরকে ইতিহাস পাঠের ফলশ্রুতি দান করত। সেদিনের কল্পনাপ্রিয় মানুষের কাছে যুক্তি ও বুদ্ধির মূল্য বেশি ছিল না; মনের প্রবণতাই তাদের জীবন-প্রয়াসে প্রেরণারূপে কাজ করত। রূপকথার যুগের পরে সাধারণ লোকের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার উৎস হল যুদ্ধ। এর মধ্যে যে thrill বা রোমাঞ্চ আছে, তা সে-যুগে আর কিছুতেই মিলত না। তাই যুদ্ধের বর্ণনা এযুগে আমাদের কাছে একঘেয়ে, নীরস ও রূপকথার রাজপুত্রের লড়াইতে তা শেষ হয় নি, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডেসী, শাহনামা প্রভৃতি দুনিয়ার সব প্রখ্যাত গ্রন্থেরও উপজীব্য হয়েছে। আসলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই যে জীবনানুভূতির স্ফূর্তি, তা মানুষ গোড়া থেকেই অবচেতন মনে উপলব্ধি করেছে। নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে আমরা এই দ্বান্দ্বিক জীবনই কৃত্রিমভাবে উপভোগ করি। যুদ্ধ ও adventure হল এর বাস্তব পন্থা, আর 'ষড়যন্ত্র ও মামলা' হল ইতর পন্থা, মধ্য পন্থা হচ্ছে প্রতিযোগিতা। তাই আগেকার দিনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ লোকের এত প্রিয় ছিল। এ যুগের আগে যুদ্ধ কোনোকালেই ঘৃণ্য ছিল না বরং মহান জীবনচর্যার অবলম্বন ছিল। অকাতর যোদ্ধাই ছিল বীর। জনগণের সম্মান-শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভীতি ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিল সে। বসুন্ধরা আজো বীরভোগ্যা। তা ছাড়া অজ্ঞতাবশে সে-কালের মানুষ ছিল অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈবনির্ভর ও স্বাপ্নিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রূপকথা মনে হতো বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠত রূপকথা। কেননা তারা ভূত-প্রেত-দেও-দানোতে বিশ্বাস রাখত, ঝাড় ফুঁক, তুক-তাক ও দারু-টোনাতে ভরসা পেত। রোগে-শোকে, সুখ-সৌভাগ্যে ও দুর্যোগে-দুর্দিনে তারা অনুভব করত অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য হাতের লীলা। এর ফলে তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রসার ছিল ত্রিভুবনব্যাপী। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন ছিল না মনে। তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে। বিমানে চড়ার পর আজকের কেউ পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কল্পনা করবে না, মেঘদূত-পবনদূতের কর্তব্য ভার নিয়েছে সরকারী ডাক ও তার বিভাগ। আজকের দিনে কল্পনার ক্ষেত্র হয়ে গেছে নিতান্ত সংকীর্ণ। মানস-উদ্ভাবনের বস্তুও হয়েছে দুর্লভ। মানুষের কোন সাহিত্যে সমকালের মানুষের বিশ্বাস-ভরসা, ভয়-ভাবনা, আশা-আরজু ও ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। সে-সাহিত্য তাদের জীবন-মুকুর। আজ আমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। ব্যবধান এমনি দুস্তর হয়ে উঠেছে যে অনেক ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব মুছে গেছে, এমন কি স্বাজাত্যবোধও হয়ে উঠেছে আবছা। তাই তাদের কালের সত্য ও তথ্য আমাদের কাছে আজগুবী। মাটির মায়াসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তত্ত্বপ্রিয়, যুক্তিবাদী ও জীবনরসিক আজকের পাঠক সেকালীন সাহিত্যের অলৌকিক-অবাস্তব জগতে বিচরণ করতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। সেকালীন বিস্ময়বোধ আমাদের উপহাসের সামগ্রী, সেকালের রোমান্টিক ভাবকল্পনা আমাদের চোখে অজ্ঞ অপরিণত মনের হাস্যকর বিলাস মাত্র! তাদের স্থূলতা পীড়াদায়ক, তাদের অজ্ঞতা অনুকম্পা প্রত্যাশী, তাদের প্রত্যয়ঋজু উক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদারুণ অর্বাচীনতা; তাদের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল বর্ণনভঙ্গীও মনে হয় বালভাষণের মতো তুচ্ছ। শালীন সাহিত্য হলেও তা লোকায়ত। কেননা, মনন সৌন্দর্যে ও সূক্ষ্মতায় সাহিত্য তখনো বিচিত্র ও অসামান্য হয়ে ওঠে নি।

আর একটি কথা, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতি-ভাষণের বীজ। তার নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্বিধিতে। এই বাড়াবাড়ির ফলে এক বস্তু-নামের অনেক প্রতিশব্দ তৈরি হয়েছে, যাদের সঙ্গে বস্তু-স্বরূপের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। অথচ রূপে কিংবা গুণে সাদৃশ্য ও অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এ ভাবেই চাঁদ হল শীতাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, শশোদর, শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি। মানুষের এই অতিভাষণেই তো কাব্য-কবিতার জন্ম!

তেমনি নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা বা ঘৃণা মানুষকে অতিকথনে এবং দোষগুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা যোগায়। ফলে মিথ্যা ভাষণ, অতিরঞ্জন ও তথ্যের বিকৃতি সাধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ভক্তের অভিভূতির গভীরতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি মনগড়া দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। লোকচরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে করেছে অতিমানুষ আর ঘৃণ্যজনকে বানিয়েছে অমানুষ। একারণে মানুষের ইতিহাস, চরিতকথা ও কিংবদন্তী যুক্তি-বুদ্ধি, বাস্তব-অবাস্তব এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা পেরিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপকথাকেও হার মানায়। ভক্ত ও বিদ্বিষ্ট মনের স্তুতিনিন্দার চোটে সত্য গেছে সরে, মানুষের ইতিহাস হয়েছে বিকৃত; সত্যাশ্রয় হয়েছে বিড়ম্বিত। সভ্যতা হয়েছে অর্থহীন।

এজন্যেই ফকির-দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি নির্বিচারে স্বীকৃত হয়। আমাদের দেশেই প্রায় পাঁচশ বছর আগের মানুষ কৃষ্ণগত প্রাণ বিশ্বম্ভর মিশ্র কৃষ্ণাবতার রূপে অপ্রাকৃত বিভূতিতে ভূষিত হয়েছেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবশক্তি এবং অরবিন্দের যোগ-বিভূতির কথা পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। তেমনি রসুলের জীবৎকালেই তাঁর নবুয়ত ও ওহিপ্রাপ্তি এবং এ দুটোর অস্বীকার স্বরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণ ও মে'রাজ ছাড়াও তাঁর আরো নানা মোজেজার কথা ভক্তসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলো তাঁর চরিতগ্রন্থে, এমনকি সহি হাদিসেও ঠাঁই পেয়েছে। যেমন, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন হয়রত মুহম্মদ একটি বকরীর কলিজা ও গোস্ত ১৩০ জন লোককে খাওয়ালেন এবং তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।[১] গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ সম্বন্ধেও রয়েছে এমনি কাহিনী।

কাজেই উত্তরকালে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তার অতিমানবিক শক্তির কাহিনীও বক্তার রুচি, বুদ্ধি, খেয়াল ও প্রয়োজন মতো কলেবরে ও সংখ্যায় বাড়তে থাকবে এ-স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি, হযরত মুহম্মদ জীবনে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো লড়াইয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই রসুলবিজয় কাব্যগুলোতে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে দিগ্বিজয়ী ইসলাম প্রচারকরূপে, বাস্তবের ক্ষীণসূত্র ধরে বোনা হয়েছে উপকথার জাল। আরব দেশ অনেক দূরে, রূপকথার ভাষায় বলা চলে সাতসমুদ্রের ওপারে। তাই সে-দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও আচার সম্বন্ধে এ দেশের লেখকগণের কোনো স্পষ্ট

১. তজ্‌রীদুল বুখারী–বাঙলা একাডেমী, হাদিস সংখ্যা -১১৫৭, পৃ. ৪৯৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা ছিল না। কাজেই এঁদের কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অনুপস্থিত। মরুভূ আরবের বিনামে তাঁরা অজ্ঞাতে দেশী আবহই তৈরি করেছেন। তাই আরবেরা ভাত খায়, ছেলের নাম রাখে রত্ন, লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে; আর চতুর্বেদ তাদেরও ধর্মগ্রন্থ। মাছের ব্যবসাও চলে সেখানে।

বলাবাহুল্য, রসুলবিজয় মৌলিক কাব্য নয়। তাই বলে অনুবাদও নয়। পূর্ববর্তী কোনো ফারসি কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি। কবি বলেছেন : পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে—

১. "বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ।"

২. তেকারণে না লিখিল সে সব কথন
কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে কহি শুন গুণিগণ।

৩. যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে :
ক. সে সব কহিতে বাড়ে পুস্তক বহুল।
খ. পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন।

এই লড়াইয়ে চার খলিফা, হাসান-হোসেন, হানিফা প্রভৃতি সব বীরই যোগ দিয়েছেন। তবে আলীই প্রধান যোদ্ধা। মধ্যযুগের সাহিত্যে মোহাম্মদ হানিফার খুব নামডাক। ইনি আলীর স্ত্রী হানুফার গর্ভজাত পুত্ররূপে পরিচিত। সাহিত্যে এ সম্পর্ক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসেও সমর্থিত।[১] ইনি খলিফা আবদুল মালেকের সময়ে রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এইসূত্রে তিনি কালে নানা উপকথার পাত্ররূপে লোকশ্রুতিতে প্রখ্যাত হয়ে যুদ্ধকাব্যের নায়ক হয়েছেন। হযরত আলীর, তাঁর পিতব্য হামজার ও পুত্র হানিফার বীরত্ব ও দিগ্বিজয় কাহিনী পরিকীর্তিত হয়েছে আরবি, ফারসি, উর্দু ও বাঙলা ভাষার বিপুল সংখ্যক কাব্যে। অবশ্য সবই বানানো। আগেই বলেছি যুদ্ধকাব্য নানাকারণে লোকপ্রিয় ছিল। তাই এর এত প্রসার। বস্তুমুখী (objective) কাব্যে তথা বর্ণনাত্মক ও কাহিনী মূলক (descriptive and narrative) রচনায় ঘটনার চমক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই এত অদ্ভুতের সমাবেশ।

ইসলামের উন্মেষ যুগের এসব বিজয় কাহিনী রচনার সময় কবিদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনা ও চিত্র। তাই কাফের মাত্রেই হিন্দু, রাজাও হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এসব যুদ্ধাভিযানের মূলে ধন বা রাজ্য লোভ নেই, আছে কেবল আল্লাহর নাম প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। তাই বশীভূত বা পরাজিত কাফের নৃপতি সপ্রজা ইসলাম কবুল করলেই তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বিনাশর্তে। এ সূত্রে আরো একটি কথা উল্লেখ্য, এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারী নিয়ে মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করেছে বলে যে-কথা চালু আছে, একালের মুসলমানরা তা বিধর্মীর বিদ্বিষ্ট মনের তৈরি বলেই জানে। অথচ দেশ-দুনিয়ার এক শ্রেণীর মুসলমানও একেই মুসলিম জীবনের গৌরবময় আদর্শ ও নৈষ্ঠিক ব্রত বলে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তার প্রমাণ রয়েছে রসুলবিজয়, আমীরহামজা, (আলীর) জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই, জৈগুনের কেচ্ছা, সোনাভান প্রভৃতি কাব্যে। নিন্দা কিংবা প্রশংসা করতেও যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নইলে তা যে ব্যাজস্তুতি হয়ে দাঁড়ায়, এ-ই তার প্রমাণ!

---

১. Annals of the Early Caliphate by S. W. Muir. p. 414.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্দ

জয়েনউদ্দীনের ছন্দবোধ সুষ্ঠু নয়। পয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসমাক্ষর। ত্রিপদীও ক্বচিৎ তাই।

১. পদান্ত মিলের অভাব :

মনেতে গৌরব ধরি আশীর্বাদ নবী
প্রশংসিয়া দিয়া সম্ভাষণ।

২. র-ল পদান্ত মিল :

ক. ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাবীল
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে সমর।

খ. চলি যায় ইমাম আলি হইয়া যে স্থির
মওতের কালে তোরে না করিলুম কবুল।

এ ছাড়া চাহে, নহে, কহে, প্রভৃতির সঙ্গে 'উড়াএ, ভএ, চলএ'-এর মিল অন্যান্য কবির মতো ইনিও দিয়েছেন।

ভাষায় ব্যাকরণগত কোনো উল্লেখ্য প্রাচীনতা নেই।

কাব্যালোচনা

যুদ্ধ-কাব্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম, তবু কাব্যের স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য দুর্লভ নয়। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি :

১. লেখাচিত্র :

ক. অঙ্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইলা চিন্তিত।
খ. সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কণ্ঠ তুলি।
গ. রুহিত বরণ হৈল দোহাঁর বদন
দ্বিজরাজ মিশি যেন উদিত তপন।
ঘ. কণ্ঠে চিবুক দিয়া নাসা দিষ্টি ধেয়াইয়া ইত্যাদি।
ঙ. তা দেখিয়া বীরবরে খেদিয়া খেদিয়া মারে
যেন সব বরাহের গতি।

২. বীরের শপথ :

পাষাণেত রেখা রাখ প্রভাত সমএ দেখ
সব সৈন্য করিমু সংহার।

৩. যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা :

ক. আছিল লক্ষ গজ তার কলেবর
কুম্ভকর্ণ সম দৈত্য মূর্তি ভয়ঙ্কর।

খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ
হেন মল্লযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন।

গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।

ঘ. যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি
আর মুখা হই ধাএ আপনাকে রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. উপমাদি অলঙ্কার :

ক. কেহ কেহ বোলে এই নহে পদাঘাত
আকাশ বিদ্যারি যেন হইল বজ্রপাত।

খ. গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার

গ. [দুলদুলকে] গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল।

ঘ. ব্রহ্ম সম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান।
আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জ্বলি মরে।

চ. দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ঘরেত আনিলা।

ছ. দেখিলাম অসিধার ফণীসম দুই জিহ্বা তার।

জ. কুলিশ-বিধানে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া।

ঝ. সিংহের সৌরভে যেন পলাএ কুরঙ্গ।

ঞ. গদাগদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।

ট. ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ
পদ্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।

ঠ. হেনকালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়া পুনি
প্রকাশে আকাশ উপর।

ড. সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত-স্নান কৈল ক্ষিতি।

এবার পুঁথির অন্তরের কিছু পরিচয় দিচ্ছি :

জয়কুম রাজার দূত যখন আপত্তিকর ভাষায় হযরত মুহম্মদকে রাজার বাণী জানাল, তখন

এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গরু।
সেই শের-খোন দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
বলি হীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির।

এ কথাগুলোতে মুসলিম বিজয়কালীন ঘটনার আভাস আছে। সসৈন্যে রসুলের যুদ্ধযাত্রা :

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে।
তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর
আকাশে উদিত যেন হইল শশধর।
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে।
নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার।
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল
তর্জিয়া গর্জিয়া রণে গেলেন্ত সকল।

একটি যুদ্ধের দৃশ্য :

পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ।
গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্ত পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশামেশি।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদা গদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।
খড়্গ খড়্গ যুদ্ধ করে উঠে খরতরি।
ভিন্‌সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি।
অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি
বাঝিল তুমুল যুদ্ধ ভূমিতলে গড়ি।

মুসলমানেরা কাফেরদের বোঝাচ্ছে :

কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ
কোটি জন্মের পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ।...
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান
কলিমা বাখান জান আছে তার স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ'—এ কথা বলবার সুযোগ করে নেবার জন্যেই দিগ্বিজয়। কয়েকস্থানে সৈয়দ সুলতান ও জয়েনউদ্দীনের কাব্য ভাষায় ও বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। এ গায়েন লিপিকরের দান কিংবা কবির অনুকৃতিজাত অথবা অভিন্নমূলের অনুবাদপ্রসূত তা আপাতত বলা যাবে না।

সেকালের সাহিত্যের প্রায়-সব বৈশিষ্ট্যই রসুলবিজয় কাব্যে বর্তমান। অবশ্য আমরা চৌতিশা, বিলাপ প্রভৃতি পাইনি। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। কাজেই এগুলোও যে ছিল না, তা জোর করে বলা যাবে না। 'রসুলবিজয়' কাব্যটি স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী মানুষের এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক মনের পরিচয় বহন করে। ইসলামের মর্মে অধিকার ছিল না এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব লোকের, তাই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই, এই শ্রেণী র কাব্যে। দিবসের কর্মে ক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা রাত জেগে বহুকাল ধরে পরম আগ্রহে শুনে আসছে এ ধরনের কাহিনী। ইসলামের উন্মেষ কালের এ সব বীরত্ব ও মহত্ত্বজ্ঞাপক উপকথাই যুগ যুগ ধরে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী সংস্কৃতির একটি অমার্জিত অতি স্থূল বোধ ও রূপ। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি হয় সমাজ কল্যাণ, তবে স্বীকার করতে হবে, এই শ্রেণীর কাব্য বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভে সহায়ক হয়েছে।

সম্প্রতি সংগৃহীত রসুলবিজয়ের এক পাণ্ডুলিপিতে কবি জয়েনউদ্দিনের পিতৃপুরুষের পরিচিতি মিলেছে–

।১।

শ্রীযুক্ত ইসুপ খান রূপে গুণে পঞ্চবান
রূপবর রসিক সুজন...
সিদ্দিকে সিদ্দিক সম সিদ্দিক বংশেত জন্ম
[প্রে] পিতামহ আবদুল্লা অংশ
তানবংশ অবতংস দানেত হাতিম অংশ
শাহা আলি প্রভুসনে নেহা।

।২।

তান সুত জ্ঞানবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীর সাহা জালালদ্দিন
তানপুত্র মতিমান প্রভুভাবে ভক্তজান
দিন [দ্বীন] ঠুনি হয় মৈনুদ্দিন।
তানপুত্র জগহীন ক্ষুদ্রমতি জৈনুদ্দিন
পাঞ্চালি রচিল মকরন্দ।
রসুল বিজয় বাণী সব গুনীগণে শুনি
মনে মনে অধিক আনন্দ।[১]

[আবদুস সাত্তার চৌধুরী সংগৃহীত পুথি, পৃ. ১১১-১২]

অতএব কবির পূর্বপুরুষ পরম্পরা এরূপ : আবদুল্লাহ-আলি-জালালউদ্দিন-মঈনউদ্দীন-কবি জয়েনউদ্দিন। সবার যুগদুর্লভ বিশুদ্ধ আরবি নাম দেখে মনে হয় এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ধার্মিক ও পীর পরিবারে কবির জন্ম। জয়েনউদ্দীনের আবির্ভাবকাল তর্কাতীত নয়, তাঁকে কেউ পনেরো শতকের, কেউ ষোল শতকের, কেউ বা আঠারো শতকের কবি বলে জানেন। তিনি কোনো এক রাজা বা ধনী অভিজাত ইউসুফ খানের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। এই ইউসুফ খান সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর পুত্র [১৪৭৬-৮৪ খ্রী.] সোলায়মান করবানীর ভ্রাতা তাজখান করবানীর পুত্র [১৫৫৮-৬৫] কিংবা আঠারো শতকের চট্টগ্রামের কোনো ধনী-মানী কাব্যরসিক জমিদার।

কাব্যের রচনাকাল বিতর্কিত বলেই আলোচনা দীর্ঘ করতে হল।

---

১. মৎসম্পাদিত রসুলবিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭০ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

বিদ্যাপতি

ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিণীর ভণিতায় কবি বিদ্যাপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, —সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর সমরবিজয়ী বীর শ্রীদর্পনারায়ণের আগ্রহে তিনি ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় "ইতি সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর বীর শ্রীদর্পনারায়ণ দেবেন সমরবিজয়িনাজ্ঞাপ্ত শ্রীবিদ্যাপতি কৃতো শ্রীব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণ্যাস প্রমাণ তরঙ্গ প্রথমঃ। শ্রীব্যাড়ীচরণে মত্তক্তিরস্তু।"[১]

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল তথা জীবৎকাল নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি আজো। মুখ্যত লক্ষ্মণ সংবৎই এর জন্যে দায়ী। মিথিলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংবৎ গণনার চারটি ভিন্ন রীতি ছিল ষোল-সতেরো শতক অবধি। মোটামুটিভাবে কোনটির সঙ্গে ১০৮০, কোনটির সঙ্গে সঙ্গে ১১০৮, কোনটির সঙ্গে ১১১৯-২০ এবং কোনটির সঙ্গে ১১২৯ বছর যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ মেলে।[২]

আমরা বিদ্যাপতিরচিত গ্রন্থে ও পদাবলীতে মিথিলার ও প্রতিবেশী রাজ্যের রাজপুরুষ, রানী ও রাজাদের নাম পাই। ভোগীশ্বর, গণেশ্বর, কীর্তিসিংহ, বীরসিংহ, ভবসিংহ, দেবসিংহ, হরসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, রাঘবসিংহ, ভূপতিসিংহ, রাজবল্লভ রুদ্রসিংহ, ধীরসিংহ, মিথিলারাজ ভোগীশ্বর-পত্নী পদ্মাদেবী, দেবসিংহ-পত্নী হাসিনী দেবী, শিবসিংহ-পত্নী লক্ষ্মীদেবী, পদ্মসিংহ-পত্নী বিশ্বাসদেবী , নারায়ণ-পত্নী মেনকা দেবী,রেনুকা দেবী, রাজা অর্জুন, চন্দ্রসিংহ, রূপিনী দেবী, ভূপতিনাথ, কংসনারায়ণ ও তৎপত্নী সুরমা দেবী, রাঘব সিংহ-পত্নী স্বর্ণমতী দেবী, পুরাদিত্য লক্ষ্মীনারায়ণ-পত্নী চন্দ্রল দেবী প্রভৃতি এবং আরসালান, মালিক বাহারুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন, আলম শাহ, নসরত শাহ, ইব্রাহীম শাহ, হুসেন শাহ, ফিরোজ শাহ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের সুলতান ও রাজপুরুষদের নাম রয়েছে কবির গ্রন্থে ও পদাবলীতে।

ঐনবার বংশের কামেশ্বর-পুত্র রাজা ভোগীশ্বরই বিদ্যাপতির রচনায় প্রথমোল্লেখিত ব্যক্তি।[৩] ভোগীশ্বর দিল্লীর তুঘলক সুলতান ফিরোজ শাহর (১৩৫১-৮৮) সমসাময়িক ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাপতি :

" ভোগী সরাঅ বর ভোগ পুরন্দর।...
পিঅ সখা ভণি পিঅরোজ সাহ সুলতান সমানল।"[৪]

এই ভোগীশ্বরের রাজত্বকালেই যে বিদ্যাপতি গান রচনা শুরু করেন, তার প্রমাণ –এঁর পূর্বেকার মিথিলার কোন রাজা বা রাজপুরুষের নাম মেলে না বিদ্যাপতির পদে। ভোগীশ্বরের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাদেবী। বিদ্যাপতি বলেন :

বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে
তোঁকে অছ গুণক নিধান

---

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'তে বিস্তৃত আলোচনা (ইতিহাস পত্রিকা ১৩৭৫ সন, ঢাকা) দ্রষ্টব্য।

২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : লক্ষ্মণ সংবৎ রহস্য : ১৯৫৮ পৃ. ২১-৩২।

৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড) : মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৩৪২ সন, পৃ. ২১২, পদসংখ্যা ১৭।

৪. কীর্তিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃ. ৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাউ ভোগিসর গুণ নাগরা রে
পদমা দেবী রমাণ।[১]

ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বরের সঙ্গে ২৫২ লক্ষ্মণ সংবতে আরসালান (আসলান) নামের এক রাজ্যলোভী তুর্কীর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আরসালান পরাজিত হন। কিন্তু পরে এক সময় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এবং সে-সুযোগে আরসালান গণেশ্বরকে হত্যা করে মিথিলার শাসক হন।[২] কীর্তিলতা সূত্রেই আমরা এ তথ্য জানতে পাই :

লখখন সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখখ পঞ্চদ্দে
তনুহমাসহি পঢ়ম পখ্খ পঞ্চমী কহি অজে।
রজ্জলুব্ধ অসলান বুদ্ধি-বিক্কম বলে হারল
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল।[৩]

এর থেকে আমরা দুটো বিষয়ে ইঙ্গিত পাই, ক. ২৫২ সংবতের তথা ১৩৮২ (২৫২ + ১১২৯) খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয় আর ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পরে কোনো সময়ে গণেশ্বর আরসালানের হাতে প্রাণ হারান। খ. এবং ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই গান লেখার মতো বয়স হয়েছিল বিদ্যাপতির। অতএব বিদ্যাপতির জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

কীর্তিলতা থেকেই জানা যায়, গণেশ্বর-পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০ খ্রীস্টাব্দ) আশ্রয় ও সহায়তা পেয়েছিলেন।[৪] অতএব অন্তত ১৪০১ খ্রীস্টাব্দ অবধি মিথিলা আরসালানের অধিকারে ছিল।

ইব্রাহিম শর্কী গণেশ্বর-পুত্র কীর্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৫] কীর্তিসিংহের আগ্রহে তাঁর বীরত্বকথা বর্ণিত বলেই গ্রন্থের নাম 'কীর্তিলতা'। কীর্তিসিংহের পরে মিথিলার রাজা হল কামেশ্বরের অপর পুত্র ভবসিংহ। তাঁর পরে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র দেবসিংহ। পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতা দেবসিংহকে তাড়িয়ে নিজেই রাজা হলেন। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ আবার সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ রাজা হন। অবশ্য এঁদের কেউ বেশি দিন রাজত্ব করেন নি। তবে শিবসিংহ প্রতাপশালী

---

১. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড), মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী।

২. তীন সের বিহার চাপিন : কীর্তিলতা : পৃ. ৫০-৫১। -সাকসেনা। ১৩৭১ বা ১৩৮১ (২৫২ ল. সং) খ্রীস্টাব্দে যদি আরসালানের হাতে গণেশ্বর নিহত হন, তা হলে তাঁর সন্তানেরা ৩০ বা ২০ বছর পরে ইব্রাহিম শর্কীর সহায়তায় হৃতরাজ্য (১৪০১-০২ খ্রী.) উদ্ধার করেন। এত কাল পরে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আকস্মিক প্রয়াসের নজির ইতিহাসে দুর্লক্ষ্য। কাজেই আরসালান ২৫২ ল. সংবতের (১৩৮১ খ্রী.) যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অনেককাল পরে তৈমুরের ভারত আক্রমণ কালে (১৩৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে) বন্ধুত্বের সুযোগে গণেশ্বরকে হত্যা করে ত্রিহুত দখল করেন, এই ধারণাই সঙ্গত। বিশেষত আরসালান কর্তৃক ২০-৩০ বছর ধরে মিথিলা শাসনের সাক্ষ্য নেই। এবং 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী, মতে খানজাহান শর্কীই তখন কনৌজ, আগ্রা, অযোধ্যা, ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতির অধিপতি। Elliot vol. IV. p. 29.

৩. কীর্তিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় পল্লব।

৪. শিরি ইমরাহিম শাহ গুণে, নহি চিন্তা নহি শোক—কীর্তিলতা, সাকসেনা পৃ. ৩৮।

৫. ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০) সহায়তায় যদি কীর্তিসিংহ মিথিলার সিংহাসন পেয়ে থাকেন, তা হলে ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে (ল. সং ২৯৩. শক ১৩২১, বিক্রম সং ১৪৫৫, ফসলী সন ৮০৭) রাজা হিসেবে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করতেই পারেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গৌড়ের রাজা গণেশের মিত্রতা ছিল এবং তিনি সম্ভবত মিথিলাকে জৌনপুরের প্রভাবমুক্ত করেন।[১] শিবসিংহের আমলেই বিদ্যাপতি তাঁর অধিকাংশ পদ এবং গ্রন্থ রচনা করেছিলেন! কাজেই শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির যশ ও খ্যাতি পারস্পরিক প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার ফল। গণেশের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম শর্কীর গৌড় অভিযান কালে (১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে) শিবসিংহ ইব্রাহিম শর্কীর হাতে নিহত অথবা বন্দী হন। এবং শর্কী দেবসিংহকে আবার রাজা করেন।[২] কাজেই ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে শিবসিংহের রাজত্ব শেষ হয়। শ্রীধরের 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের পুষ্পিকা সূত্রে বলা যায় (৩৯১ লঃ সং + ১১১৯) শিবসিংহ ১৪১০ সনের দিকে পিতৃসিংহাসন দখল করেছিলেন।[৩] দেবসিংহের পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ রাজা হন। পদ্মসিংহের পরে হয়তো দেবসিংহের ভাই ত্রিপুর সিংহের (নৃপনারায়ণ) পুত্র অর্জুন ও অমর সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। এই সুযোগ নেপালের সপ্তরী জনপদের পুরাদিত্য অর্জন ও অমরকে পরাজিত ও হত্যা করে দ্রোণবারে স্বাধীন রাজা হন। তাঁর সভাতেই বিদ্যাপতি এই বিপর্যয়ের সময় আশ্রয় পান। হয়তো শিবসিংহের পরিবারও রাজাবনৌলি গ্রামে বিদ্যাপতির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।[৪] পদ্মসিংহের পরে দেবসিংহের ভাই হর বা হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ বা নৃসিংহ রাজত্ব পেয়েছিলেন। এই নৃসিংহ বা নরসিংহের একটি শিলালিপি মিলেছে মাধিপুরা মহকুমার কানাদাহা গাঁয়ে। এতে 'শক শরাশ্ব মদনঃ' তথা ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দে পাওয়া যায়।[৫] অতএব নরসিংহ অন্তত ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। নরসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি 'বিভাগসার', তাঁর স্ত্রী ধীরমতির আগ্রহে 'দানবাক্যাবলী', পুত্র ভৈরবসিংহের আজ্ঞায় 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে কবি নরসিংহ ও তাঁর পুত্র ধীরসিংহকে 'রাজা' বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব পিতার জীবিত কালেই পুত্র রাজা বা যুবরাজ হয়েছিলেন। নরসিংহেরই বিরুদ্দ ছিল দর্পনারায়ণ। এই দর্পনারায়ণের আদেশেই কবি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। শিবসিংহের দুই জ্ঞাতি-ভ্রাতার নাম ছিল রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহ এবং ধীরসিংহের পুত্র ও পৌত্রেরও যথাক্রমে এ দুটো নাম ছিল। বিদ্যাপতির তিনটে পদে রাঘব সিংহের ও দুটো পদে রুদ্র সিংহের নাম আছে। ধীরসিংহের সময়েই তাঁর পুত্র-পৌত্রকে পাওয়া যায়, কাজেই রাঘব ও রুদ্র শিবসিংহের জ্ঞাতি ভ্রাতা না হয়ে যদি ধীরসিংহের পুত্র এবং পৌত্রও হন, তাতে বিদ্যাপতির জীবৎকালের পরিসরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অতএব, বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছেন। আমরা ওপরে যা আলোচনা করেছি, ছকে তা এরূপ দাঁড়ায় :

---

১. Bengal. Past & Present : LXVII 1984 note 31.

২. ibid.

৩. "ইতি তর্কার্চা ঠক্কুর শ্রীশ্রীধর বিরচিত কাব্যপ্রকাশ বিবেক দশম উল্লাসঃ। শুভমস্তু। সমস্ত বিরুদাবলী মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুর নগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া খোঁয়াল সং শ্রীদেবশর্ম বলিয়ামসং শ্রী প্রভাকরাড্যাং লিখিতৈ যা হস্তাড্যাং ল. সং ২৯১ কার্তিক বদি ১০। পুস্তক লিখন পরিশ্রম বিদ্বজ্জনো নান্যঃ । সাগর লঙ্ঘনখেদং হনুমামে কঃ পরঃ বেদ।" India govt MS. folio-117A.

৪. Radha Krishan Chowdhury : Otnwaras of Mithila : Journal of Bihar Research Society = vol XL. pt. 2,1954, pp. 117-20.

৫. ঐ 1934. pp. 15-19.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

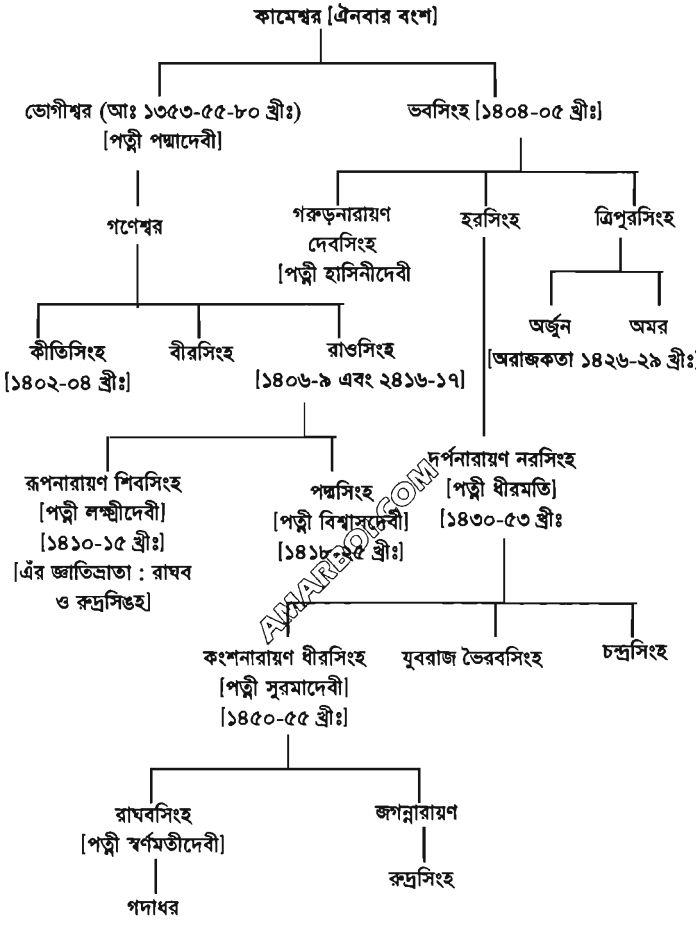

ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কামেশ্বর বংশীয় সব রাজা, রাজকুমার ও রানীর প্রশংসাসূচক ভণিতা দিয়েছেন বিদ্যাপতি তাঁর রচিত পদে। গ্রন্থগুলোও রচিত হয়েছে তাঁদের কারো না কারো নির্দেশে। বংশতালিকাটি দীর্ঘ হলেও কালপরিসর দীর্ঘ নয়। খুব দীর্ঘায়ু না হয়েও এমনি স্বল্পজীবী অনেক সুলতানের [গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক অবধি] প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবি আমীর খুসরুও [১২৫৩-১৩২৬ খ্রী.]। ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কালের বিস্তৃতি হবে মোটামুটি ৭৫ বছর [আনুঃ ১৩৮০-১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ। বিদ্যাপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে লোকশ্রুতি আছে। অতএব, বিদ্যাপতির আয়ু (১৩৬৪-১৪৫৪ খ্রী.) নব্বই বছর হলেই ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি সবাই তাঁর জ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক কিংবা কনিষ্ঠ সমসাময়িক হতে পারেন।

আমাদের ধারণা দর্পনারায়ণ নরসিংহের রাজত্বকালেই যুবরাজ ছিলেন। ধীরসিংহ এবং ভৈরবসিংহ রাজত্ব করেছেন পনেরো শতকের শেষদশকে [মুদ্রার প্রমাণে]। ধীরসিংহের পুত্র রাঘব কিংবা পৌত্র রুদ্রসিংহ দর্পনারায়ণ নরসিংহের আমলেই যথাক্রমে প্রৌঢ় ও যুবক ছিলেন। আর সৌজন্যে ভাষায় রাজপরিবারের লোকমাত্রই 'রায় বা রাজা'। এই জন্যে তাঁরা যথার্থ রাজা ছিলেন বলে মনে করা অসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘজীবী আওরঙজেবের বংশধারা–বাহাদুর শাহ-আজিমুশশান-ফররুখশিয়র প্রভৃতি স্মর্তব্য। আওরঙজেবের মৃত্যু কালে প্রপৌত্র ফর্‌রুখশিয়রই প্রায়-প্রৌঢ়। উল্লেখ্য যে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৬৫৮-১৭১৩ খ্রী.) আমরা শাহজাহান-ফররুখশিয়র-এই পাঁচপুরুষের জীবৎকাল পাই।

বিদ্যাপতি যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর আদেষ্টানুক্রমিক তালিকা এরূপ :

গ্রন্থ	আদেষ্টা	
১. কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ [১৪০২-০৪]	
২. কীর্তিপতাকা	রূপনারায়ণ	
৩. পুরুষ পরীক্ষা	শিবসিংহ [১৪১০-১৫ খ্রী.]	
৪. গোরক্ষবিজয় [নাটক]		
৫. ভূপরিক্রমা	গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ [১৪১৬-১৭ খ্রী.]	
৬. শৈবসর্বস্বসার	পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী [১৪১৮-২৫ খ্রী.]	
৭. গঙ্গাবাক্যাবলী		
৮. লিখনাবলী	দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্য [ল. সং ২৯৯ + ১১২৯ = ১৪২৮ খ্রী.] [দ্রষ্টব্য : JASB, 1915, p 422.	
৯. বিভাগসার	দর্পনারায়ণ নরসিংহ	অঃ১৪৩০-৫৫ খ্রীঃ
১০. দানবাক্যাবলী	নরসিংহ পত্নী ধীরমতী	
১১. দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী	কংসনারায়ণ ধীরসিংহ ভৈরবসিংহ [রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণ]	
১২. ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী	দর্পনারায়ণ নরসিংহ	

১৩. বর্ষকৃত্য বা ক্রিয়া-অপ্রাপ্ত।

১৪. গয়াবাক্যাবলী বা গয়াপত্তন—অপ্রাপ্ত।

বিদ্যাপতি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'তে প্রসঙ্গক্রমে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র উল্লেখ করেছেন "অনুক্তং যদন্যম দুর্গাক্তিতরঙ্গিন্যাম অনুসন্ধেয়ং গ্রন্থ কলেবর শঙ্কয়াএ পুনর্লিখিতমিতি" —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক গণেশচরণ বসুর মতে স্মৃতিকারেরা নিজের রচনার উল্লেখ প্রসঙ্গেই সাধারণত. 'অনুসন্ধেয়ং' শব্দটি প্রয়োগ করতেন।[১]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র পরে রচিত। বিদ্বানদের মতে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ভৈরবসিংহের আদেশে প্রণীত। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহ দর্পনারায়ণ যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর তাম্রশাসন। কাজেই এ সময়ে বা এর কিছু আগে কিংবা পরে যে 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত এটিই বিদ্যাপতির শেষ গ্রন্থ।

সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন তুঘলকই (১৩২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে) মিথিলার কর্নাটবংশের উচ্ছেদ সাধন করে রাজপণ্ডিত কামেশ্বরকে মিথিলার সিংহাসন দান করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে হাজী ইলিয়াস ওর্ফে গৌড় সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে বিহার জয় করে হাজীপুর শহরের পত্তন করেন। পরে ফিরোজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে বিতাড়িত করে মিথিলার রাজা করলেন কামেশ্বর-পুত্র ভোগীশ্বরকে। হয়তো তাঁর ভাই ভবসিংহও বিহারের এক অংশ শাসনের অধিকার পান, এবং কীর্তিসিংহের পর ভবসিংহের পুত্র শিবসিংহ বাহুবলে বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হন।[১]

এক বিদ্বানের অনুমান, —আরসালান কর্তৃক গণেশ্বর নিহত হওয়ার পরে হয়তো গণেশ্বরের পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দিল্লী ও গৌড় সুলতানের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পরেও নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিথিলারাজকে হয়তো বিভিন্ন দরবারে ধর্ণা দিতে হয়েছে। এ সূত্রেই মিথিলার দরবারী কবি বিদ্যাপতি–গৌড়-সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্, গৌড়ের সূফী-পীর আলম শাহ (হযরত নূর কুতুব-ই আলম) অথবা দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলম শাহ (১৪৪৪-৪৮ খ্রী.) দিল্লীর তুঘলক সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ (১৩৯৪-৯৯ খ্রী.) গৌড় সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯ খ্রীস্টাব্দ), হুসেন শাহ শর্কী বা দ্বারবঙ্গের [দ্বারভাঙ্গা] মখদুম সুলতান হুসেন শাহ, মালিক বাহারুদ্দীন প্রভৃতির প্রশস্তি যোগ করেছেন তাঁর রচিত পদাবলীতে।[২]

যথা ঃ

১ নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (তুঘলক)
কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি।
(গুপ্ত ৩৪৯, মিত্র-মজুমদার ৯৩২)

---

১ New Indian Aniquary, vol. VIII nos 3 & 4. 1944. p 50
গণেশচরণ বসু নিম্নলিখিত স্মৃতি গ্রন্থগুলো থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন :
(ক) স্মৃতিতত্ত্ব - রঘুনন্দন রচিত, জীবানন্দ সম্পাদিত : পৃ. ৬, ১৫, ৫৯, ৬৮, ১১৩, ১৩৪, ১৫০, ১৫২, ১৬৫, ১৬৭।
(খ) শুদ্ধি কৌমুদী গোবিন্দানন্দ পৃ. ১৬০, ১৬২, ১৭৪, ৩২৫।
(গ) শ্রাদ্ধ কৌমুদী (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা) পৃ. ৮৫, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৮, ৩৮০।
(ঘ) বর্ষ ক্রিয়াকৌমুদী (ঐ) পৃ. ২০, ২২, ১১১, ২১৬, ২৩৬।
(ঙ) দুর্গোৎসববিবেক (শূলপাণি ssp), পৃ. ২, ৭, ৮, ১৫, ২১, ইত্যাদি।

২. Radha Krishna Chowdhury : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬, ১১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা,

বিদ্যাপতি ভানি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নাসির মধুপ ভুলে কমলবাণী
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সং ২৩৫৩)

২. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (গৌড়)

নাসির শাহ ভাণে
মুজে হানল নয়ন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
(গুপ্ত; ৪৪, মিত্র-মজুমদার ৯৩১)
পাঠান্তর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি সং ২৬৪৮
সাহা হুসেন ভাগে
জাকে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ।

৩ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (গৌড়)

বিদ্যাপতি কবি ভাণ
মহলম যুগপতি চিরেজীব জীবথু
গ্যাসদেব সুলতান
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ৭৪ পদ সং ২৯)

৪. হুসেন শাহ শর্কী বা দ্বারবঙ্গের মখদুম শাহ সুলতান হোসেন :

ভণই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর
পুহবী [পৃথিবী] দোসর কহাঁ
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতী সেনিক জহাঁ
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ১৩১ পদ সং ১৫১)

৫ মালিক বাহারুদ্দীন :

বিদ্যাপতি কবি রভসে গাব
মালিক বাহারদিন বুঝই ভাব
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ১২০, পদ সং ১১০)

৬. আলম শাহ :

দশ অবধান বন পুরুষ প্রেম গুণি
প্রথম সমাগম ভেলা
আলম শাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা।

(রাজতরঙ্গিণী, পৃ. ৮৬ গুপ্ত, সাহিত্য পরিষৎ সং পদ ৬ পৃ. ৫২৯, মিত্রমজুমদার ভূমিকা, পৃ. ১দ৯০)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য উক্ত সুলতানগণকে গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আর তাঁর পুত্র নুসরত শাহ ও গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ বলে অনুমান করে এগুলোকে সহজেই শ্রীখণ্ডবাসী বাঙালি কবি বিদ্যাপতির (কবিশেখর, কবিরঞ্জন) পদ বলেও প্রমাণ করা যায়, এবং অনেকেই তা করেওছেন।[১] কিন্তু তা করবার প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলোকে মৈথিল কবির রচনা বলে গ্রহণ করতে বাধা দেখিনে।

আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি ১৩৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অভিনব জয়দেব, নব কবিশেখর (কবিশেখর), কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠক্কুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত প্রভৃতি উপাধি ছিল।

আর আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি শৈবই ছিলেন। আমাদের বৈষ্ণব বিদ্বানেরাই বিশেষ করে এঁকে বৈষ্ণব বলে ভাবতে চান। তার কারণও রয়েছে।

চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন, সেই থেকে বিদ্যাপতি হয়েছেন মহাজন ও গোস্বামী। পাঁচশ বছর পরে আজ যদি বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন বলে কেউ দাবি করেন, তাহলে বৈষ্ণবের ভক্তি-বিশ্বাসের ভিতেই যেন ফাটল ধরে, পায়ের নীচের চোরাবালি যেন সরে যায়। কেননা সাধন-ভজনের পবিত্র বাহন আকস্মিকভাবে যেন আদিরসের পঙ্কমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব রাখতেই হয়, অথচ বিদ্যাপতি ছিলেন রাজপণ্ডিত ও স্মার্ত। সমাজকে স্মৃতির শাসনে রাখা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব বলেই তিনি জানতেন। তাই কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, পুরুষ পরীক্ষা ও গোরক্ষবিজয় নাটক ছাড়া তাঁর সব রচনাই স্মৃতিগ্রন্থ। আর রাধাকৃষ্ণ পদ তাঁর মানবিক প্রণয়সঙ্গীত। তার প্রমাণ তাঁর বিবিধ বিষয়ক গানও আদিরসাত্মক। যেমন :

আপনা মন্দির বেসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা
তহিখনে পহিয়া পাহুল আয়ল
বরিষয় লাগল দেবা।
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনী
বচনক ভেল অবকাশে।
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভাণে
কঞোনক কহব হমে কে পতিয়ায়ত
জগত বিদিত পচবাণে।
(নগেন্দ্র গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ২৩৮ পদ সং ১৫)

অথবা
বালম নিঠুর বসয় পরবাস
চেতন পড়োসিয়া নাহি মোর পাশ।
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ ।

---

১ ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বিদ্যাপতি শতক পৃ. 1/0-1./0।
খ. ঐ-বাংলাসাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড, ২য় সং) পৃ. ৭২-৭৩।
গ. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা পৃ. ৬২।
ঘ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : পৃ. ৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পহিলহি সাঁঝ শাও নহি সুঝ।
হসে ভরে যৌবতী রজনী অন্ধার
স্বপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার। ইত্যাদি।
(গুপ্ত পৃ. ২৩৯-৪০ পদ সং ২১)

এসব পদও বৈষ্ণবপদের মতোই। কেবল রাধাকৃষ্ণের নাম নেই। তা ছাড়া বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ, গঙ্গা ও রামসীতা বিষয়ক পদ, আর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে, পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। রসিক কবি সব দেবতাকে সমভাবেই ভক্তি করেন, বিদ্রূপ করেন অকাতরে। কাজেই পদাবলীতে বিদ্যাপতির ধর্মীয় আবেগ নয়, রসবোধই অভিব্যক্তি পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমলীলাই আকর্ষণীয় বলে কবি রাধা-কৃষ্ণলীলার পদই অধিক রচনা করেছেন। কবি, রসিক, পণ্ডিত ও ভাষার যাদুকর বিদ্যাপতি সংস্কৃত অবহট্‌ঠ ও মৈথিল বুলিতে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা, রসবোধ ও কাব্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন অবলীলায়।

এবার বিদ্যাপতির জন্মমৃত্যুর কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানের মতগুলো এখনে তুলে ধরছি :

১. সারদাচরণ মিত্র : খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাঁহার পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। (বিদ্যাপতি পদাবলী ১৮৭৮ খ্রী.)

২. জি, এ, গ্রিয়ার্সন : Vidyapati flourished and was a celebrated author during at least the first half of the 15th century (Introduction, p. 11. puruhsha pariksa)

৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : [ক] বিদ্যাপতি ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু হয় ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে (বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, বঃ সাঃ পঃ সং ভূমিকা পৃ. /০।)
(খ) বিদ্যাপতি সাতাশী-অষ্টাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। -মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির পৃ. ১।

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : জীবৎকাল ১৩৪৭-১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দ (কীর্তিলতা, ভূমিকা পৃ. ১৷৷ - ১।/০)

৫. কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ : জন্মসন ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ (বিদ্যাপতি কি পদাবলী প্র. ১১, ৩১)

৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : End of 14th, begining of 15th century, (Origin and Development of Bengali Language, vol. 1)

৭. দীনেশচন্দ্র সেন : জন্মসন ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোনো সময় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৩৭২, মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে (Journal of the Department of Letters, Calcutta, vol XVI, p. 36)

৯. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ : জন্ম ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দের পর নিকটবর্তী কোনো সময়। (বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা)

১০. খগেন্দ্রনাথ মিত্র : (ক) জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে, (পদামৃতমাধুরী ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৪৮) (খ) জন্ম : ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দে (বৈষ্ণব রসসাহিত্য)

১১. সতীশচন্দ্র রায় : জন্ম ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং শতাধিক বৎসর সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া নানা গ্রন্থ রচনা করেন (পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃ. ১৬৬-১৬৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জন্ম ১৩৫৪ এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দেও বিদ্যাপতি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিদ্যমান ছিলেন। রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে (১৪৭৫ থেকে শুরু) বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। ক. বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড পৃ. ৭২-৭৬। খ. বিদ্যাপতি শতক, ভূমিকা পৃ. /০-১০)

১৩. সুকুমার সেন ক. ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশিদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না (বিদ্যাপতি ১৪৬০ গোষ্ঠী, পৃ. ২২-২৩)
খ. বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং পৃ. ৩৮৩)।

১৪. বিমানবিহারী মজুমদার : ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। (বিদ্যাপতি পদাবলী ভূমিকা পৃ. ৩৷ -৩ । ।/.)

১৫. উমেশ মিশ্র : কবির জীবৎকাল ১৩৬০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাপতি ঠাকুর (হিন্দুস্থানী একাডেমী এলাহাবাদ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃ. ৩৬-৩৭)

১৬. শিবনন্দন ঠাকুর : জন্ম ১৩৫১ ও মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দ (মহাকবি বিদ্যাপতি পৃ. ৩৭-৩৯)

১৭. জয়কান্ত মিশ্র : জন্ম ১৩৬০ ও মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দ (History of Maithili literature)

১৮. সুখময় মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৩৭০-এ মৃত্যু আঃ ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের মতো সময়ে। (বাংলা সাহিত্যের কালক্রম পৃ. ৪৭-৪৮)

১৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম আঃ ১৩৮০ ও মৃত্যু আঃ ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯)

২০. সুভদ্র ঝা : মৃত্যু ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে (Songs of Vidyapati, Introduction)

লক্ষণীয়, এর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাপতির মৃত্যুসন ১৪৪৮ অথবা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ ধরেছেন। যারা ১৪৪৮ সন বলে মনে করেন তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে বিদ্যাপতির রচনা বলে অনুমিত একটি পদ :

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ
বসতি বরস পর সামর রূপ।
বহুত দেখল হম গুরুজন প্রাচীন
অব ভেলহুঁ হম আয়ু বিহীন।

[নগেন্দ্র গুপ্ত : বসুমতী সং পৃ. ২৩৮, পদ সংখ্যা-১৯, মিত্র ও মজুমদার পদ সংখ্যা ৯১৪]

এঁরা শিবসিংহের মৃত্যু সন ধরেছেন ১৪১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দ এবং বিশ্বাস করেছেন পদোক্ত স্বপ্নফল অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ১৪১৬+৩২=১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়েছিল। কেননা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-মতে স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

আর যাঁরা বিদ্যাপতির মৃত্যু সন ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ বলে নিরূপণ করেছেন তাঁদের দলিল হচ্ছে একটি পুথির লিপিকাল। হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন বিদ্যাপতির ছাত্র রূপধর। পুষ্পিকায় লিপিকাল ও জীবিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথা : "লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকুল কুমুদিনী চন্দ্রবাদি মওভ সিংহ পরম সচ্চরিত্র পবিত্র শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়ে ভ্য পঠিতা ছাত্র শ্রীরূপ ধরেন। লিখিত মদ : পুস্তকম।"

৩৪১ লক্ষণ সংবতের সঙ্গে ১১১৯ যোগ করেই তাঁরা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু ৩৪১ এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮ কিংবা ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে ১৪১২, ১৪৪৯ এবং ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দও পাওয়া যায়। তবে পুষ্পিকা সূত্রে মনে হয় বিদ্যাপতি তখন যশ ও মানে অনন্য, কাজেই লিপিকাল ১৪৪৯ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। বিশেষ করে যিনি নেপালের দ্রৌনবাররাজ পুরাদিত্যের আশ্রয়ে (রাজাবনৌলি গাঁয়ে) থেকেও জীবিকার্জনের জন্যে 'লিখনাবলী' রচনা করেছেন ২৯৯ লং খংবতে তথা (২৯৯ + ১১২৯) খ্রীস্টাব্দ[১] বা তৎপরে, তাঁর তখনো খ্যাতি-প্রতিপত্তি উক্ত সব বিশেষণে আনুপাতিক হয়ে না ওঠারই সম্ভাবনা।

বিদ্যাপতি নাকি তালপাতায় একখানি ভাগবতের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। তার পুষ্পিকায় বিদ্যাপতির নাম ও অস্পষ্ট লিপিকাল রয়েছে : 'শুভমস্ত সর্ব্বর্থগতা সংখ্যা লং সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজাবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতেলিপি রিয়মিত।" [দ্বারবঙ্গের রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত]

বিসফী গাঁয়ের কবি বিদ্যাপতি কিংবা রাজসভার কবি ও রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি ১৪৩৮ সনেও রাজাবনৌলি গাঁয়ে বসে ভাগবত নকল করেছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পদ্মসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সন্ধিকালে হয়তো রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে কবি নেপালে দ্রৌনবারের রাজার আশ্রয় নিয়েছিলেন। লিখনাবলী সূত্রে বোঝা যায় তিনি ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দেও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাই বলে আরো দশ বছর সেখানে বাস করার কথা নয় কেননা, তিনি নরসিংহ পরিবারের প্রীতি অর্জন করেছিলেন। কাজেই উক্ত প্রতিলিপি হয়তো অন্য কোনো বিদ্যাপতির কৃতি। নামসাদৃশ্যে গুরুত্ব আরোপ না করাই সঙ্গত। আর (৩০৯ + ১১২৯ =) ১৪৩৮ খ্রীস্টাব্দেই এ পুথি লিপীকৃত। কেননা ঐ বছরের শ্রাবণ মাসের শুদি ১৫ বা পূর্ণিমা তিথি মঙ্গলবারে পড়েছিল এবং ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই আগস্ট।[২]

এ ছাড়া বিদ্যাপতি রচিত 'দানবাক্যাবলীর' একটি প্রতিলিপি রয়েছে নেপাল রাজগ্রন্থাগারে। ওটি নাকি বিদ্যাপতির স্বহস্তে সংশোধিত। নকলের তারিখও রয়েছে লং সং ৩৫১। এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮, ১১১৯, ও ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে ১৪৩১, ১৪৫৯, ১৪৭০ ও ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ হয়। তবে ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সমীচীন।

১৩০৭ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত একটি অবহট্ঠপদ উদ্ধৃত করেছিলেন। পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি পদাবলীর বসুমতী সংস্করণে বিধৃত রয়েছে (পৃ. ২৩৬-৩৭ পদ সং ৯ ও পরিষৎ সং পদ ৫৩১)। পদটির শুরু এভাবে :

অনল রক্কর লকখন নরবই সক সমুদ্দকর অগিনি সসী
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপএ জাউলসী।

---

১. JASB. 1915, p. 422

২. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৯। জয়কান্ত মিশ্র ও রমানাথ ঝা-উভয়ে একসঙ্গে গিয়ে পুথি পরীক্ষা করে ল. সং ৩০৯ পেয়েছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ণিত ল. সং ৩৪৯ এবং উমেশ মিশ্র কথিত ল সং ৩৮৯ গ্রহণীয় নয়। Jayakanta Misra. P. 185. History of Maithili literature.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ সূররাএ সরু
দুহু সুরতান নীন্দে অবে শোয়উ তপন হীন জগতিমিরে ভরু।

শেষ – আরম্ভিয় অন্তেষ্টি মহামখ রাজসূয় অসমেধ যঁহা
পণ্ডিতঘর আচার বখানিয় যাচক কাঁঘর দান কঁহা।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবয় মানব মন আনন্দ ভয়ও
সিংহাসন শিবসিহ বইঠ্ঠো উচ্ছব বৈরস বিসরি গয়েও।

এখানে প্রদত্ত সন (অনল - ৩ রন্ধ্র-৯ কর-২) = ল সং ২৯৩ এবং শক (সমুদ্র. ৪, কর-২, অগ্নি-৩, শশী-১) = ১৩২৪ শক।

ল. সংবত থেকে ১৩৭৩, ১৪০১, ১৪১২ বা ১৪২২ খ্রীস্টাব্দ মেলে আর শকাব্দ থেকে পাই ১৪০১-২ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই ১৪০১-০২ খ্রীস্টাব্দই নির্দেশিত হয়েছে বলে মানতে হয়। কেউ কেউ শকাব্দের 'কর' স্থলে 'পুর' ধরে একে ১৩৪৩ শক বা ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ পেতে চান। এই সন শিবসিংহের ['কাব্যপ্রকাশবিবেক' সূত্রে সিংহাসন আরোহণ ১৪১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে] রাজত্বকালে পড়ে। কিন্তু এ পদটি অনেকের মতেই জাল। কেননা প্রথমত দেবসিংহের মৃত্যুর আগেই পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতাকে তাড়িয়ে রাজ্য দখল করেন, এ সংবাদ আমরা মোল্লা তাকিয়ার 'বয়ায' সূত্রে জানতে পাই।[১] দ্বিতীয়ত, 'পুরুষ পরীক্ষা' সূত্রে বোঝা যায়, এই গ্রন্থ রচনাকালে দেবসিংহ জীবিত ছিলেন, 'ভাতি যস্য জনকোরণছেত্তা দেবসিংহ গুণরাশিঃ[২] তৃতীয়ত নৈমিষারণ্যে আশ্রিত দেবসিংহের আদেশেই যে বিদ্যাপতি ভুপরিক্রমা রচনা করেছিলেন, তা 'ভুপরিক্রমা' থেকেই জানা যাচ্ছে। অতএব শিবসিংহের রাজত্বকালে দেবসিংহ মৃত নয়, নির্বাসিত অথবা পলাতক ছিলেন।

কেউ কেউ কীর্তিলতার দুটো শ্লোকের তাৎপর্য অনুসরণে বিদ্যাপতির জন্মসন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ নিরূপণে প্রয়াসী। শ্লোক দুটো এরূপ :

১. বালচন্দ্র বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নহি লগ্‌গেই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হরশির সোহই
ঈ নিশ্চই না অর-মন মোহই।

"বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা—এ দুইয়ের কোনোটিতেই দুর্জনের উপহাস লাগিবে না। যেহেতু চন্দ্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর বিদ্যাপতির ভাষা নাগরজনের মনোমোহন করে।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

---

১. ক. Raja kans, a Hindu Zamindar. acquiring ascendency in Bengal. oppressing the Muslims and instigating Sheosinge. the rebellious son of Devasingh, the Raja of Tirhurt, to commit depredations upon the Muslims... Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur marched against Bengal but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated and pursued and but had to face the opposition of SheoSingh in Tirhut. The latter was defeated and pursued and captured... his (Sheo Singh's) Father, the dispossessed Raja of Tjrhur was restored to power on condition of allegiance and loyalty. Bengal. Past & present : LXVII 1943.

খ. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩০৭ সন, পৃ. ২৯, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের প্রবন্ধ।

গ. বিমানবিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা : পৃ.। ১দ৯-২দ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মাধুর্য প্রসবস্থলী শুরু যশো শিক্ষাসখী
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবেবিদ্যাপতের্ভারতী।

"মাধুর্যের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারে শিক্ষাসখী সদৃশ 'খেলন কবি' বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রথমটাতে বালচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাষা তুলিত হয়েছে। বিদ্বানরা মনে করেছেন বিদ্যাপতি তখনো তরুণ। আর দ্বিতীয় 'খেলনকবি' অর্থে (খেলুড়ে– বাল্যক্রীড়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি যার) বালক কিংবা কিশোর কবি নির্দেশ করা হয়েছে বলেই তাঁদের ধারণা। কীর্তিলতা ১৪০১-০৪ সনের মধ্যে রচিত। কাজেই এঁদের মতে এটি কবির বিশ-বাইশ বছর বয়সের রচনা। এ জন্যে তারা কবির জন্ম সন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করেন।

আগে কয়েকটি গীত রচনা করলেও পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে কীর্তিলতাই বিদ্যাপতির প্রথম কৃতি। এ জন্যেই কবি এ নব প্রয়াসকে নবচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন : নবচন্দ্র যেমন নতুন ও ক্ষীণকায় বলে নিন্দনীয় নয়, তেমন নতুন কবির প্রথম কাব্য বলে কীর্তিলতাও অবহেলার বস্তু নয়। এমনি তাৎপর্যেও উক্ত শ্লোকটি গ্রহণ করা সম্ভব।

সম্প্রতি 'খেলনকবেবিদ্যাপতের্ভারতী' পাঠ কেউ কেউ অশুদ্ধ ও অর্থহীন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে শুদ্ধ পাঠ হবে 'খেলতু কবেবিদ্যাপতের্ভারতী'[১] অতএব যা ছিল বিনয়বচন, তা গর্বিত আহ্বানে হল পরিণত। কাজেই উক্ত দুই শ্লোক অপরিণত অল্প বয়সের সাক্ষ্য নয়। বিশেষ করে পদে রাজা ভোগীশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। জীবিত রাজা ভোগীশ্বরের প্রশস্তিই গেয়েছেন কবি তাঁর ভণিতায়। ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের আগে ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয়। কাজেই এসময়ে বিদ্যাপতির বয়স ১৫-২০ না হলে পাঠযোগ্য পদ রচনা সম্ভব হত না।

AMARBOI.COM

বিদ্যাপতির পদাবলী

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে আবির্ভূত। কিন্তু পরে প্রায় তিনশ বছর ধরে তিন শতাধিক কবি পদ রচনা করলেও বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রতিভা ও প্রভাব কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি বললে সত্যের অপলাপ হয় না। তাই এই অবৈষ্ণব কবি বৈষ্ণব-পূজ্য মহাজন ও গোস্বামী হয়ে রয়েছেন বৈষ্ণব সমাজে। সত্য বটে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ঠ শ্লোক-আর্যায়-গাথায় রাধাকৃষ্ণের কাম-প্রেম লীলা আগে অনেক রচিত হয়েছিল, জয়দেবও প্রিয় বটে, কিন্তু নারী-পুরুষের কাম-প্রেম সম্পৃক্ত এমন সূক্ষ্ম, বহুধা ও বিচিত্র অনুভব জগতের আর কোন সাহিত্যে মেলে না। রূপ-কাম-প্রেম সম্পর্কিত যত গভীর ও যত প্রকার অনুভব, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব, পদাবলীতে বিভিন্ন কবি সার্থক ভাবে তা প্রকট করেছেন। বিশেষ ছাঁচের ও বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট হয়েও তা' বিশ্বসাহিত্যে অনন্য। সীমিত অর্থে গীতিকবিতা হয়েও তা মানব বৃত্তি-প্রবৃত্তির, বাসনা-কামনার, আনন্দ-বেদনার, রূপ-অরূপের অভিব্যক্ত আধার ও আকাররূপের চির-সৌন্দর্যের ও চির-মাধুর্যের উৎস হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের হয়েও তা চির নতুন রূপ-রসের ভাষাবিগ্রহ ও ভাবমূর্তি। বিদ্যাপতিই এক অর্থে এই কাম-প্রেম রসের বিচিত্র বর্ণালী-জগতের প্রথম ও প্রধান সার্থক স্রষ্টা। গত পাঁচশ বছর ধরে কাম-প্রেমানুভূতির জগতে বোধে, অনুভবে, উপায়ে, উপকরণে, ভাষায়, ছন্দে রূপে, রসে ও চাওয়া-পাওয়ায় বিদ্যাপতিই ছিলেন আদর্শ ও দিশারী। বৈষ্ণব কবিরা কেবল কোথাও সার্থকভাবে কোথাও বা অসঙ্গতরূপে তাদের সাধনতত্ত্বের ছোপ লাগিয়েছেন কিংবা রাধাস্বভাবে চৈতন্য-আকৃতির রঙ যোগ করেছেন মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাপতির বর্ণনা অনুধাবনে আমরা মানসচক্রে যন্ত্রধৃত চলমান জীবন্ত নারীপুরুষ ও পরিবেষ্টনী দেখতে পাই। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ আধুনিক শহুরে নিঃসঙ্কোচ দুরন্ত কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী-যারা যথার্থ প্রেমিক। বয়ঃসন্ধি, সম্ভোগ, অভিসার, বিরহ ও প্রার্থনার পদ যেন প্রমূর্ত মাধুরী। আলঙ্কারিক কবি বিদ্যাপতি চিত্রশিল্পীও বটে। তাঁর মানসপটে বিধৃত চিত্র তিনি লেখনী মুখেও জীবন্ত করে অঙ্কিত করতে পারতেন। বিদ্যাপতির নানা উপাধি বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কেননা কবিবল্লভ, রায়শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন পদকারও ছিলেন। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপান্তরই বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বিদ্যাপতির নানা রসের বহু সুন্দর পদের কয়েকটি :

কি কহব রে সখি কানুক রূপ

বয়ঃসন্ধি
শৈশব যৌবন দরশন ভেল
দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন
যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই
সখা হে ভাল করি পেখন না ভেল
যব গোধূলিসময় বেলি
শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরই
সুধামুখী কে বিধি নিরমিল বালা
আর এক লাজ তোহে কি কহব মাই
অপরূপ পেখঁলু বালা

অভিসার
গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনি
অবনত আনন কএ হম রহলিওঁ
লাখে তরুবর কোটিহি লতা
সুন্দরী মাধব তুয়ে অনুরাগী
ধনি ধনি রমণি জন্ম ধনি তোর
নব অনুরাগিনী রাধা
চল চল সুন্দরী হরি অভিসার
রয়নি ছোট অতি ভীরু রমণী
রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ

মিলন
কি কহব হে সখি কহইতে লাজ
কি কহব হে সখি আছুক বিচার

মান
হমর বচন সূন সজনি
এতদিন ছল পিয়া তোহ হম
মাধব করিয় সুমখি সাবধানে

বসন্ত
নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
আএল ঋতুপতিরাজ বসন্ত
মধু ঋতু মধুকর পাঁতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরহ
হরি কি মথুরাপুর গেল
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা
নাহ দরশ সুখে বিহি কৈলে বাদ
প্রেমক অঙ্কুরজাত আত ভেল
অব মথুরাপুর মাধব গেল
এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর
চীর চন্দন হার উরে না দেলা
যেদিন মাধব
মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব
অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
কতদিনে ঘুচব ইহ
যেদিন মাধব পয়াণ করল

ভাবসম্মিলন
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
অঙ্গনে আওব যব রসিয়া
আজু রজনী হম ভাগে গোমায়ওনু
দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল
হাথক দরপণ মাথক ফুল

প্রার্থনা
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম,

পাঁচশ বছর ধরে মুখে উচ্চারিত ও বিকৃত হয়ে হয়ে বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী বাঙলায় ও ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কারো কারো মতে 'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ/সঘনে দামিনী ঝলকত' এবং 'এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর' শ্রীখণ্ডবাসী কবি রায়শেখরের রচনা এবং 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' নামের প্রখ্যাত ও অতুল্য পদটি চৈতন্য-শ্যালক কবিবল্লভ উপাধিধারী মাধবের রচনা।

১৫

কবিচন্দ্র মিশ্র

বিশ্বভারতীয় 'পুঁথিপরিচয়ের' তৃতীয় খণ্ডে সংকলক ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল পনেরো শতকের এক কবির খণ্ডিত কাব্য 'গৌরীমঙ্গল'-এর প্রাপ্ত পুরোপাঠ প্রকাশিত করেছেন এবং ভূমিকায়ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কবি ও কাব্য সম্পর্কে। (ভূমিকা, পৃ. ৬-১২, পাঠ : পৃ. ৪৭-৭৫)। এই কবির নাম কবিচন্দ্র মিশ্র। এই নামের কবির রচিত একখানি সম্পূর্ণ 'গৌরীমঙ্গল' পুথি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অর্ধশতাব্দীরও আগে চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই কবি চন্দ্রের আদেষ্টা এক পরমেশ্বর দাস। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এই পাঁচালী চণ্ডীর চরিত বটে তবে কাহিনী কেবল পৌরাণিক, এখানে কালকেতু-ধনপতি উপাখ্যান নেই। দক্ষযজ্ঞ থেকে মহিষ, মধুকৈটভ, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরবধই বর্ণিত বিষয়। তাই বোধ হয় পাঁচালীর নাম 'গৌরীমঙ্গল'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচ্য কাব্যটি বিশ্বভারতীয় ১০২৮ সংখ্যক পুথি। অন্তে খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ২১। ১-২২ পত্রের মধ্যে ১৩ সংখ্যক পত্র নেই। পুথির আকার ১৪/১৫, লিপিকাল নেই, দু'শ বছরের পুরোনো বলে সংকলক কর্তৃক অনুমিত। এই একুশ পত্রের পাঠ নানা রাগে বা ছন্দে বিভক্ত। এবং প্রতি রাগ বা ছন্দান্তর্গত পাঠের অন্তে উপান্তচরণে বা শেষচরণে ভণিতা রয়েছে। তাই ভণিতার সংখ্যাও ৩৯। কাব্যের ২য় পৃষ্ঠায় 'কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।' এবং ২য় ক-এ 'চণ্ডের চরিত্রে কিছু কবিচন্দ্রে ভণে।' —কথাটা থাকলেও অন্য ৩৭টি ভণিতায় কাব্যের নাম 'গৌরী মঙ্গলগীত' অথবা কেবল 'গৌরীমঙ্গল'। ৩৯টি ভণিতার মধ্যে ২৪টায় পুরোনাম 'কবিচন্দ্র মিশ্র' বলে বা ভণে রয়েছে। ১১টায় 'কবিচন্দ্র ভণে' তিনটায় আছে 'কবিচন্দ্র বিরচিত।' অন্য একটি ভণিতা নিম্নরূপ :

"পরম ভকতি। দৃঢ় একমতি। শঙ্কর কিঙ্কর ভণে। গৌরীমঙ্গল। দেই ইষ্টফল। কবিচন্দ্র মিশ্র সুরচনে" ((('পুঁথি পরিচয়' পৃ. ৬৬)। ঐ ২৪ টা ভণিতার একটায় আছে : "শঙ্কর কিঙ্কর। ভক্তি তৎপর। শুন লোক একমনে। গৌরীমঙ্গল। দেই ইষ্টফল। কবিচন্দ্র মিশ্র ভণে।', (ঐ পৃ. ৭০) এবং অন্য একটায় পাই : "হর গৌরি চরণে কমল মধুকর। কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল"।

বিশেষত কবির আত্মকথায় যখন পাই–"তথা গুণিজন সভে করিয়া সমাজ।–কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলেক কাজ" (ঐ পৃ. ১০) তখন কবির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তা ছাড়া অনেক ভণিতায় রয়েছে 'ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরণে।' অতএব কবির নাম যে 'কবিচন্দ্র মিশ্র' তাতে সন্দেহের কিছু মাত্র অবকাশ নেই। কবি শাক্ত। হরগৌরীর চরণাশ্রিত। তাই তিনি 'শঙ্কর কিঙ্কর' ও হরগৌরীর চরণকমল মধুকর।' অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবির নাম 'শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র' বলে বিশ্বাস করেন, তাঁর যুক্তি—কবিচন্দ্র কারো নাম হতে পারে না। ঐটি উপাধি এবং শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রই কবির নাম। ('মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', পৃ. ৯-১৩)। কিন্তু মুসলিম সমাজে 'শায়ের' আহমদ প্রভৃতি নাম মধ্যযুগেও চালু ছিল যেমন এ যুগে মেয়েদের নাম 'কবিতা' রাখা হয়।

কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরীমঙ্গলের উপক্রমে বন্দনা ও গ্রন্থোৎপত্তি বর্ণনা শেষেই ভণিতাংশে রচনাকাল (তথা রচনারম্ভ কাল) উল্লেখ করেছেন 'নব শশী সুর ইন্দ্র সক পরিমিত। কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির চরিত।'

এই 'নব শশী সুর ইন্দ্র' শকের মধ্যে 'সুর' (দিকপাল অর্থে-৪ ধর্মপূজা বিধান অনুসারে) ধরে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল ১৪১৯ শকাব্দ তথা ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু শুধু 'ইন্দ্রও ১৪ সংখ্যার প্রতীক" নব-৯, শশী-১ ইন্দ্র-১৪ (প্রাগুক্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯, সুর ইন্দ্রের বিশেষণ ও আঙ্কিক অর্থহীন) থেকেও ১৪১৯) শকাব্দ বা ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ মেলে। কবির 'বন্দনাংশে পঞ্চগৌড়েশ্বর হোসেন শাহরও (১৪৯৩-১৫১৯) প্রশংসা রয়েছে। অতএব এ রচনাকাল অকৃত্রিম। কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয়ের বছর দুয়েক পরে এ পাঁচালী রচিত। বর্ণিত বিষয় দৃষ্টে মনে হয়, এটি মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বা চণ্ডী পাঁচালীর কাহিনী জনপ্রিয় হওয়ার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে রচিত। চৈতন্যপূর্বে যে লোকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে' বলে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে, এই গৌরীমঙ্গল সেই 'চণ্ডীগীত' কি-না বলা যাবে না। কবি দেবতা, সিদ্ধা, বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি দেব-দ্বিজ-মুনি-ঋষি ও গুরু বন্দনার সঙ্গে পিতামাতারও বন্দনা করেছেন। বিশ্বভারতীর পুথিতে গুরু ও পিতার নাম নেই, মায়ের নাম আছে, পিতার পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধির উল্লেখও রয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরণী লোটাইয়া বন্দোঁ মাতা নিলাবতি।
বাপের চরণ বন্দোঁ গুণের নিধান
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতি অধিষ্টান,
সসিষ্য পণ্ডিত নাম অতি সুচরিত
যাহার বিমল জশ জগত বিদিত।

এরপরে ভণিতাংশ এবং তারপরে রয়েছে রাজ-প্রশংসা :

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড়নাম
নৃপতি হুসেন সাহা কলিজুগে রাম।
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন
জার ভয় কপিত (ভয়ে কম্পিত) সকল নৃপগণ।

অতএব গৌড়সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে কবিচন্দ্র মিশ্র তাঁর 'গৌরীমঙ্গল' পাঁচালী রচনা শুরু করেন।

এরপরে কবি তাঁর নতুন নিবাসগ্রাম 'বালাণ্ডার' পরিচয় দিয়েছেন। কবি ছিলেন অন্য কোনো ভিন্ন গ্রামের বা পরগনার অধিবাসী। সপ্তগ্রামের অন্তর্গত 'বালাণ্ডা'র পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে সুরেশ্বরী গঙ্গা, উত্তরে চক্রতীর্থ গ্রাম এবং দক্ষিণে পবিত্র বিদ্যাধরী (নদী) জল। এই বালাণ্ডা গাঁয়ে নৃপতিপূজিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্রের বাস, এবং সবাই সজ্জন। এই গাঁয়ের–

তথা গুণিজন সবে করিয়া সমাজ।
কবিচন্দ্র দিয়া আনিএা বলিলেক কাজ।
গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান।
সভে মিলেআ বলিলেক পাঁচালী বিধান।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল
তোমার মহিমা জেন ভ্রমে মহিতল।
ভক্তি করিয়া জেন সর্বলোকে পূজে
পুরাণ বচন যেন সর্বলোকে বুঝে।
নব সসি সুর ইন্দ্র সক পরিমিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির চরিত।

'গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান' এবং 'তথা'-শব্দ প্রয়োগ দেখে মনে হয় ঐটি কবির নিজ গাঁ নয়। এতে মনে হয় 'গৌরীমঙ্গল' রচনার আগেই তাঁর কবিখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই তাঁকে বালাণ্ডা গাঁয়ে ডেকে এনে সাদরে বসতি করতে দিয়ে পাঁচালি রচনার জন্যে অনুরোধ করে গ্রাম-প্রধানরা।

কবি গ্রন্থের উপক্রমে বর্ণিতব্য বিষয়সূচীও দিয়েছেন : দক্ষের উৎপত্তি, সতীর জন্ম, বৈশ্রবণের কুবের হওয়ার বিবরণ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ও গিরিগৃহে জন্ম, মদন ভস্মের বৃত্তান্ত, গৌরীর তপস্যা ও বর লাভ, হরগৌরীর বিবাহ, বারাণসী পুরী সৃষ্টির বৃত্তান্ত, সুরথরাজার কাহিনী, মধুকৈটভ, মহিষ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীর্য, চামুণ্ডা, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বধ এবং সুরথ রাজার রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনে পাঁচালী সমাপ্ত।

এই পাঁচালী পাঠের পূণ্য নিম্নরূপ :

অন্ধ কুষ্ঠ দারিদ্র্য হয়ে ধনুপুত্র পাই
শত্রুক্ষয় মিত্রজয় দীর্ঘ পরমাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজঘরে সম্মান বাড়ে ঠাকুরাল
লোকের যশ উজ্জ্বল সম্পদে যায় কাল।
রণে বনে প্রান্তরে খাণ্ডাএ অখণ্ডিত
যে যেই বর মাগে পাইব সকল।

রূপ বর্ণনায় কোনো নতুনত্ব নেই। উরু রামকদলী, চরণ-দীপ্তি স্থলকমলের, দেহবর্ণ দুগ্ধ-অলক্তের, নিতম্ব রথচক্রের, গতি রাজহংসের, স্তন হেমকটোরা, বাহু সুবলিত লতা, অঙ্গুলি নবমঞ্জরী, অধর বিম্বফল, নাসা তিলফুল, নয়ন কমল ইত্যাদি। তবু 'মাঝাখানি গোসাঞীর ত্রিবলি সুঠান। এ নব যৌবন গোসাঞীর হইল সোপান' পাঠককে চমকিয়ে দেয়। কাব্যটি পনেরো শতকের শেষ দশকের বলেই একটু বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এই প্রাচীন কাব্য আবিষ্কারের উল্লাসবশে একটি অনবধানতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কবিচন্দ্র মিশ্রকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করেছেন। দুই ভাইয়ের জীবনকালের মধ্যে প্রায় একশ বছরের ব্যবধান কল্পনাতীত।[১]

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিটি চট্টগ্রামের এবং ১১৯৬ মগীসনের অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত। এই গৌরীমঙ্গল রচয়িতাও দ্বিজ কবিচন্দ্র মিশ্র। পুথিটি ১-৫২ পত্রে সমাপ্ত। কবির আদেষ্টা এক শ্রীপরমেশ্বর দাস। এই পরমেশ্বর দাস কবীন্দ্র পরমেশ্বরও হতে পারেন। কেননা পুথি চট্টগ্রামের এবং পরমেশ্বর দাসও চট্টগ্রামের পরগনাশাসক লস্কর পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন। আসলে বোধ হয় পদস্থ কর্মচারীরূপেই সপ্তগ্রামের বালাণ্ডা থেকে পরমেশ্বর চট্টগ্রামে যান, যদিও তাঁর কবিখ্যাতির উল্লেখ ভণিতাগুলোতে মেলে না। কবিচন্দ্র মিশ্র ভণিতায় সুবুদ্ধি, গম্ভীর ধীর গুণী এবং চণ্ডীভক্ত বলে পরমেশ্বর দাসের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে কবিচন্দ্র মিশ্র প্রায় সব ভণিতায় পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লেখ করেছেন। পরমেশ্বর দাস যে চণ্ডীভক্ত ছিলেন, তারও নিঃসংশয় উল্লেখ রয়েছে এই কাব্যে। যথা –

"চণ্ডীর চরিত্র ছাড়ি আন নাহি চিত।
পুরাণ ভারতে শুনে দেবীর চরিত॥"
চণ্ডীপূজা চণ্ডীজপে চণ্ডীভাবে মনে
গোঞাত্র দিবসরাত্রি চণ্ডীর ধেয়ানে।

বিশ্বভারতীর পুথিতে আদেষ্টা বলে পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ নেই। বালাণ্ডা গাঁয়ের গুণীজনদের যৌথ অনুরোধে কাব্য রচনা করেন কবি। কিন্তু কাব্যে নৃপতি হোসেন শাহ্‌র উল্লেখ আছে।

সাহিত্যবিশারদের পুথিতে পরমেশ্বর দাসই আদেষ্টা। এখানে বালাণ্ডা গ্রামের পরিবর্তে পাঠ 'রণ্ডা' এবং হোসেন শাহ্‌র নাম যে চরণে থাকার কথা সেই চরণটি লিপিকর প্রমাদে বাদ পড়েছে।

কোন জনপ্রিয় নাম একই কালে ও স্থানে অনেক লোকের থাকে। পরমেশ্বর দাসও হয়তো অন্য এক ধনী-মানী ব্যক্তি—কবীন্দ্র পরমেশ্বর নন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, পরমেশ্বর

১. মঘীসন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভুল। চট্টগ্রাম প্রায় হাজার বছর ধরে আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। তাই চট্টগ্রামে বৈষয়িক জীবনে ও রাজস্বাদি ব্যাপারে মঘীসনই আজো চালু রয়েছে; ত্রিপুরা-ফেণীতে যেমন রয়েছে ত্রিপুরা সন। এবং মঘীসন শুরু হয় ৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে আর বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয় ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে। কাজেই বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৪৫ বছর যোগে-বিয়োগে নয়-মঘীসন মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাস নিজে মহাভারত অনুবাদ করার ও 'কবীন্দ্র' উপাধি লাভের আগেই স্ব-গ্রাম বালাগুায় বাসকালে কবিচন্দ্রকে কাব্য রচনায় প্রতিপোষণ দান করেন। সাহিত্যবিশারদের পুথিতে পাই– পরমেশ্বর দাসের সভা ছিল :

একদিন সভা মধ্যে বসি মহাসএ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ রচ চণ্ডির চরিত
তোমার কবিত্ব জেন ভ্রমে প্রিথিমিত।

এই অংশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর পুথি থেকে পূর্বে উদ্ধৃত অংশের ভাবগত মিল আছে। কিন্তু তথ্যগত পার্থক্য স্পষ্ট।

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে কবির 'আত্মপরিচয়' অংশের পাঠ নিম্নরূপ। বক্তব্য মোটামুটি অভিন্ন, তবে পাঠ বিকৃতিজাত বিভিন্নতা সর্বত্র প্রকট। এ বিকৃতি কতকাংশে আঞ্চলিকও।

১. লুটাইআ বন্দম মাতা নিলাবতি।
বাপের চরণ বন্দম গুণের সাগর।
সর্বসাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতে তৎপর।
বসিস্ট পণ্ডিত নামে অতি সুচরিত
জাহার বিমল জস জগত বিদিত।

২. পৃথিবীর সার রাজ্য পঞ্চম গৌর নাম
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপেত পাম (?)
জার তরে কম্পিত সকল নৃপগণ
মহাসত্য নরপতি প্রজার পালন।
গৌর মধ্যে পূণ্য তির্থ সপ্তগ্রাম নাম
তৃপিনির তিরে সপ্ত রিষির বিশ্রাম।
তথা সপ্ত রিষি তপ কৈলা ম [হা] সুখে
তেকারণে সপ্তগ্রাম নাম লোকমুখে।
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে রণ্ডা নামে পুরী
পূর্বে জাএ জমুনা পচ্চিমে সুরেশ্বরী।
উত্তরেত চণ্ড [চক্র] তির্থ নামে পুণ্যস্থান।
দেবচক্রপাণি তথা নিত্য অদিষ্ঠান
দক্ষিণে পবিত্র জল নামে বিদ্যাধরে
জার জল ছুইলে সকল পাপ হরে
অনেক পণ্ডিত তথা বৈসে মহাজন
কুলে সিলে গুণের নিধান দ্বিজগণ।
নিজ ধর্ম্মে সাবহিত নৃপতি পূজিত
ক্ষেত্রি বৈস্যগণ বৈসে অতি সুচরিত।
সূদ্রগণ বৈসে বিপ্র সেবনে তৎপর
নৃপতির হিত করে সুবুদ্ধি সাগর।
সর্বগুণে থাকে সেই উঞ্চল সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমিত পাঠ : তথাপতি মহামহিম গুণরাজ।
হরগৌরী চরণে কমল মধুকর
দ্বিজগুরু ভকত ধর্মেত তৎপর।
দানে দারিদ্র্য হরে সর্ব্বসিদ্ধি সার।
জাহার বিমল জস করি কণ্ঠহার।
পিতাসুত... ছিল প্রকৃতি সুন্দর
মহাবীর মহাসত্ত বুদ্ধিএ সাগর।
সুবুদ্ধি গম্ভীর ধীর তাহান তনএ
শ্রীপরমেশ্বর দাস মহাশএ।
চণ্ডির চরণ ছারি আন নাহি চিত
পুরাণ ভারতে সুনে দেবীর চরিত।
চণ্ডি পূজে চণ্ডি জপে চণ্ডি আবে মনে
গোআ এ দিবস রাত্রি চণ্ডির ধেআনে।
একদিন সভা মধ্যে বসি মহাশএ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্ডির চরিত
তোমার কবিত্ব জেন ভ্রমে পৃথিমিত্ত।
পরম ভকতি জেন সর্ব্বলোকে পূজে
পুরাণ বচন জেন সাবধানে বুঝে।
নব সিসু সিন্ধু ইন্দু সব নিজোজিত
কবিচন্দ্র মিশ্র বোলে চণ্ডির চরিত।

উভয় পুথির পাঠ পরীক্ষা করিলে নিম্ন লিখিত তথ্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. বিশ্বভারতীর পুথির 'আদর্শ পাঁচালী'-র ভণিতায় পরমেশ্বর দাসের নামোল্লেখ ছিল না। অথবা কালে পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয় তা হলে ভণিতাংশ লিপিকর কিংবা গায়েন-কথক পুনর্নির্মাণ করেছেন বলে মানতে হবে। কবির মূল রচনায় যদি পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লিখিত না হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে চট্টগ্রামের পুথিতে পরমেশ্বর দাসের নাম পরে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এমন অনুমানের ভিত্তি নেই, বরং রাঢ়ে অজ্ঞাত পরিচয় পরমেশ্বর দাসের নাম বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে বলে ধারণা করাই সঙ্গত। কেননা একটি প্রক্ষিপ্ত নাম শতোর্ধ্ববার সংযোজিত করা অধ্যবসায় সাপেক্ষ–তেমন জালিয়াতির অধ্যবসায় স্বয়ং পরমেশ্বর দাস ব্যতীত আর কারো থাকার কথা নয়। চট্টগ্রামের পুঁথিতে পরমেশ্বর দাসের পিতৃপরিচয়ও রয়েছে। যদিও নামটি দুষ্পাঠ্য (সুতস্মাদ?)। অথবা সেই নাম মহিগুণরাজ। বিশেষত বিশ্বভারতীর পুথিতে হোসেন শাহ্‌র নাম যখন মিলছে, তখন তাঁর সমকালের ও তাঁর লস্কর পরাগল খানের সভাকবি মহাভারতের অনুবাদক ও কবিচন্দ্র মিশ্রের আদেষ্টা পরমেশ্বর দাস অভিন্ন ব্যক্তি বলে মানতে বাধা নেই।

২. সাহিত্যবিশারদের পুথির পাঠে স্পষ্টতই লিপিকর-প্রমাদ ঘটেছে। তার ফলেই 'হোসেন শাহ্'র নামের চরণটি বাদ পড়েছে। এবং পদ মিলানোর জন্যে পরবর্তী লিপিকর গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন। 'নৃপতি হুসেন শাহ কলিযুগ রাম', বাদ পড়ায় 'নাম' এর সঙ্গে পদান্ত মিল দানের জন্যে তৃতীয় চরণের 'প্রতাপে তপন'কে 'প্রতাপেত পাম' করা হয়েছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ চরণের সঙ্গে পদান্ত মিল দেয়ার গরজে 'মহাসত্ব নরপতি প্রজার পালন' চরণটি যোগ করতে হয়েছে।

৩. সাহিত্যবিশারদের পুথিতে 'বালাণ্ডা' পুরী 'রণ্ডা' হয়েছে। চট্টগ্রামের লিপিকরদের 'বালাণ্ডা' পরগণা জানা ছিল না, তাই লিপিপরম্পরায় বালাণ্ডা 'রণ্ডা'-য় পরিণত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে এ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়।

৪. চট্টগ্রামের পুথিতে কবিচন্দ্রের পিতার নাম বশিষ্ঠ পণ্ডিত। বিশ্বভারতীর পুথিতে 'বশিষ্ঠ' স্থলে 'সশিষ্য' পাঠ রয়েছে। এই পাঠ স্পষ্টতই ভুল। কবির মাতার নাম নীলাবতী, এটি লীলাবতী'র বিকৃতিও হতে পারে।

৫. পরমেশ্বর দাসের অস্তিত্ব বা সম্পর্ক স্বীকৃত হয়নি বলেই বিশ্বভারতীর পুথিতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ অংশের পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে।– সেখানে আদেষ্টা ব্যক্তি নন– গাঁয়ের গুণীজন সমাজ।

৬. সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতেও কাব্য রচনার কাল রয়েছে 'নবসিসু সিন্ধু ইন্দু সব নিজোজিত। –এই পাঠ যে বিকৃত তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, নব শশী সুর ইন্দ্র শক কিংবা 'নব শশী সুর ইন্দু শক' পাঠ ধরলে হোসেন শাহ্ ও পরমেশ্বর দাস —উভয়ের সমকালীন কবি কবিচন্দ্র মিশ্রের কাব্য রচনার অভিন্ন সন মেলে।

অতএব, কবিচন্দ্র মিশ্র পনেরো শতকের অন্তিমলগ্নের কবি। আরো একটি রহস্যজনক বিষয় রয়েছে ৫২ পত্রের এই পুথির ঠিক ৩৯ক পাতায় শেষ বারের মতো আদেষ্টা পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ রয়েছে, পরবর্তী তেরো পাতায় নেই। পুথির ঠিক তিনভাগে আছে শেষভাগে নেই। অথচ গ্রন্থ সমাপ্তিকালে অন্তত আর একবার আদেষ্টার প্রশস্তি না হোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছিল স্বাভাবিক সৌজন্যের বিষয়।

এ থেকে আমাদের মনে হয়, শেষপর্যায়ে পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে কবির মনোমালিন্য ঘটে বা বিবাদ বাধে। তাই ভণিতায় আদেষ্টার নাম আর যোগ করা হয়নি, এবং নিজের রচনা বলেই মমতাবশে গ্রন্থের প্রথমাংশও সংশোধিত হয়নি, অথবা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপোষক পরমেশ্বর দাসকে প্রতিলিপি দেয়া হত বলে পরমেশ্বর দাসের হস্তগত প্রতিলিপির 'প্রশস্তি ও ভণিতা' সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। এবং এই প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়েই বালাণ্ডাবাসী পরমেশ্বর দাস চট্টগ্রামে পরাগল খানের অধীনে রাজকার্যে যোগদান করেন। কিন্তু পরে প্রতিলিপি তৈরি কালে স্বয়ং কবিই ভণিতা সংশোধন করেছিলেন এবং আদেষ্টা-প্রশস্তি অংশ একেবারে বাদ দিয়ে গাঁয়ের জনগণের আগ্রহ ও অনুরোধজ্ঞাপক অংশ যোগ করেছেন। বিশ্বভারতী সংগৃহীত পুথির আর একটি প্রতিলিপি পাওয়া গেলে এবং শেষ তেরোপাতাস্থ ভণিতায় ভাষাগত মিল পাওয়া গেলে আমাদের আপাত-অনুমান সত্য হয়ে উঠবে।

১৬

রামাই পণ্ডিত

রামাই পণ্ডিত যে ভারতে ও বাঙলায় বৌদ্ধ-বিলুপ্তির চরম মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। বারো শতকের শেষার্ধে বা শেষপাদে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বাঙলায় ও ভারতে তখন যে চিহ্নিত ও প্রকাশ্য বৌদ্ধ সমাজ ছিল না, তার প্রমাণ শূন্যপুরাণোক্ত 'ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান' উক্তিটি। বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম 'ধর্ম'-এর মূল তাত্ত্বিক তাৎপর্য তখন বাঙলায় অস্পষ্ট ও বিস্মৃতপ্রায়, তাই তথাগত বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌতমবুদ্ধের পরিবর্তে ধর্মই বৌদ্ধমত ও বুদ্ধজ্ঞাপক সাংকেতিক পরিভাষায় পরিণত। এবং নিরঞ্জন' ও 'শূন্য' নির্বাণতত্ত্বের প্রতীক– 'শূন্য পূজয় হরিচন্দ্র বিষাদ ভাবিয়া মতি।' রামাই পণ্ডিতের সময়ে বৌদ্ধমত হাড়ি-ডোম-বাগদী-কৈবর্তের মধ্যে নিবদ্ধ। তাই অশিক্ষাজাত অজ্ঞতার ফলে এ সমাজে ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র বিকৃত, অস্পষ্ট, পারম্পর্যহীন অসমন্বিত অসমঞ্জস শ্রুতি-স্মৃতি মাত্র। তাই পাঁচধ্যানী বুদ্ধও পাঁচপণ্ডিতে পরিণত– সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঞি– এঁরা যুগন্ধর ও যুগাবতার। শূন্যপূরাণ প্রভৃতি নামে, আগমপুরাণে ও ধর্মপূজাবিধানে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে প্রবল ও গভীর— এ প্রভাব স্বীকার করেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্মরক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল তাদের পক্ষে। তাই গণ্ডার, অশ্ব, মহিষ, অজ, হংস ও পায়রা বলি চালু করতে হয় এবং ধর্মও হতে থাকেন সমূর্ত।

শূন্যপুরাণের ভাষায় সর্বত্র প্রাচীন রূপ রক্ষিত নেই সত্য, কিন্তু উচ্চারণে অর্বাচীন অবহট্‌ঠ রক্ষিত। ষোল শতকের রচনা হলে বম্ভা (ব্রহ্মা), বিষ্টু (বিষ্ণু), বন্ন (বর্ণ), নহি (নাহি), থল (স্থল) ভরমন (ভ্রমণ), বিসাই (বিশ্বকর্মা), জানে (ধ্যানে), বলম্ভি, চিরাই (চিরায়ু) প্রভৃতি আমাদের লেখ্য ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল হওয়ার পূর্বস্তরের সাক্ষ্য। শূন্যপুরাণের গদ্যরূপ নিতান্ত অশিক্ষাপ্রসূত নয়— প্রাচীনতার নিদর্শন।

চৌদ্দ-পনেরো শতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরাও যখন আত্মপরিচয় বিস্মৃত, যখন ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, সহজপন্থীরা নিজেদের হিন্দু সমাজভুক্ত বলেই জানে ও মানে, তখন শূন্যপুরাণ বা ধর্মপূজাবিধান অব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও তত্ত্ব প্রচারের জন্যে রচিত হওয়ার কথা নয়। তাই আমরা রামাই পণ্ডিতের আদি শূন্যপুরাণ বারো শতকের বা তেরো শতকের গোড়ার দিকের রচনা বলেই বিশ্বাস করি, কালান্তরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে তা ক্রমে ভাবে ভাষায় আচারে ও তত্ত্বে রূপান্তরিত ও বর্ধিত কলেবর পেয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়*
মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপ

ঐহিক-পারত্রিক বিষয়ে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্মভাবের উদ্বোধন, প্রচার ও প্রসার লক্ষ্যে এবং ব্যক্তির ও সমাজের জাগতিক কল্যাণ কামনায় রচিত হয়েছে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য। আধুনিক সংজ্ঞায় সাহিত্য বলতে যা বোঝায় এ তা নয়। এ হচ্ছে শাস্ত্রকথার, বিশ্বাসের, সংস্কারের, লোককাম্য আদর্শের ও প্রত্যাশার গণবোধ্য হৃদয়বেদ্য সাহিত্যায়ন বা শিল্পায়ন।

সারা মধ্যযুগব্যাপী তাই এ সাহিত্য আঙ্গিকে, ছন্দে, বিষয়ে বক্তব্যে ও লক্ষ্যে বৈচিত্র্যহীন। এ অনুকৃতি ও পুচ্ছগ্রাহিতা দেখি রামায়ণে মহাভারতে, চণ্ডীর, মনসার, ধর্মঠাকুরের পাঁচালীতে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে। এমনকি অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক হিন্দি-ফারসী ভাষার প্রণয়োপাখ্যানের মানবিক প্রেমকথা রূপে অনুবাদকর্মেও পুচ্ছগ্রাহিতা প্রকট।

শাহ্-সামন্ত শাসিত অশিক্ষার, দাসত্বের, বৈষম্যের সে-যুগে মানুষের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা ছিল সাধারণভাবে শাস্ত্রনির্ভর তথা বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত। ভাগ্যে সমর্পিত দৈবনির্ভর জীবনে রোগে-শোকে, দুঃখে-দৈন্যে, পীড়নে-শোষণে ভরসায় বুক বেঁধে টিকে থাকার ও প্রবোধ পাওয়ার জন্যে বিশ্বাসই ছিল একমাত্র পুঁজি।

অবশ্য মধ্যযুগ অবধি সভ্যজগতের সব মানুষের চিন্তা-চেতনা-অনুভব এমনিই ছিল। কিন্তু সবদেশে মধ্যযুগ সমকালীন ও সমপরিসরের নয়। বাঙলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তার কারণ এদেশ ছিল চিরকাল বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী শাসিত। জীবিকার ক্ষেত্রে যেমন, মন-মননের ক্ষেত্রেও তেমনি বাঙালি স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিকাশের সুযোগ পায়নি কখনো। তবু জৈবধর্মের তাগিদে যুগপ্রতিবেশের চাপে মন সমকালীন প্রয়োজনে সাড়া না দিয়ে পারেনি।

তাই পরাধীন বাঙালিও বিকৃতভাবে হলেও নিজের ভাবনা ভেবেছে। আত্মপ্রত্যয়ী হবার উপায় ছিল না বলেই সে হয়েছে দৈবনির্ভর-অদৃষ্টবাদী। ফলে তার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রয়োজনেই সে দেব-অনুকম্পা ও দৈবসহায়তা কামনা করেছে। এভাবেই হয়েছে নানা লৌকিক, কালিক ও স্থানিক অরি ও মিত্র দেবতা-উপদেবতার উদ্ভব। বাইরের ধর্মশাস্ত্র বাহ্যত গ্রহণ করেও সে তাতে ভরসা পায়নি, তাই নিজেদের যোগ-তন্ত্র ও স্বসৃষ্ট দেবতাই হয়েছে অবলম্বন। ধনে রিক্ত ও মনে কাঙাল বলে নিঃস্ব মানুষ কেবল ভিক্ষাজীবীই হয়, তোয়াজস্তুতিই তার অবলম্বন, আর সুযোগ-সুবিধে মতো লিপ্সাবশে চুরির ঝুঁকি নেয়া কিংবা ছল-চাতুরী-মিথ্যার আশ্রয় নেয়া তার বিকল্প জীবনোপায় বলে বিবেচিত। শুধু তা-ই নয়, ধনে-বলে অসমর্থ বলেই সে মন্ত্রযোগে তাবিজে কবচে চারু-টোনায় বাণে-উচাটনে অলৌকিক শক্তিধর হয়ে দেবতা-

---

* এটি বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৮৩) প্রথম অধ্যায়। এ অধ্যায়ের বিষয় প্রাচীন বাঙলার বিলুপ্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র ও তত্ত্বদর্শন সম্পৃক্ত, যদিও সাহিত্য মধ্যযুগের। এজন্য এবার এ অংশকে প্রথম খণ্ডভুক্ত করা হল।– লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দানবকে জব্দ করারও ফন্দি আঁটে। দীন-দুর্বল বাঙালি তাই প্রয়োজন মতো অনেক অরি-মিত্র দেবতা সৃষ্টি করেছে যাঁরা ভারতের অন্যত্র অজ্ঞাত। সাধারণভাবে এঁরা পাপপুণ্যেরও তথা পারলৌকিক জীবননিয়ন্তা দেবতা নন। এঁরা পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি নিয়ামক শক্তি-প্রতীক দেবতা। এ জন্যেই এসব দেব-কল্পনায় জীবনের কোনো মহৎ ও বৃহৎ আদর্শের ও উদ্দেশ্যের সন্ধান মেলে না। জীবনের কোনো গভীর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনাও নেই এসব দেবকাহিনীতে। স্বার্থসচেতন সংকীর্ণচিত্ত ভীরু-ধূর্ত মানুষের মাটি-সংলগ্ন জৈবজীবনের স্থূল ও তুচ্ছ ভয়-ভরসা আশা-প্রত্যাশা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে এসব দেবপ্রতিমায় ও এঁদের গুণ-মান-মাহাত্ম্য কল্পনায়। মধ্যযুগের দেবতার গুণ-মান-মাহাত্ম্যের ঐ নিম্নমানই ধনে-মনে দীন-দুর্বল বাঙালির মন-মানসের স্বরূপ ও চিন্তা-চেতনার প্রকৃতি আর জগৎচেতনার ও জীবন-ভাবনার স্তর নির্দেশক। চিরকাল পরশাসিত জাতি অর্থকর উঁচু সরকারী পদ কিংবা স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সুযোগ সাধারণত পায় না। কাজেই পরাধীন দেশের সাধারণ মানুষ শোষণজনিত কারণে অত্যন্ত দরিদ্র থাকে। এ মানুষ সুস্থ ও স্বস্থ মন-মানসের মালিক হয় না। দারিদ্র্যদোষ মানুষের –ব্যক্তির সব গুণ নষ্ট করে–এ সবারই জানা কথা। বাঙালির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই বিদেশী পর্যটকের চোখে বাঙালিরা কোঁদলে, প্রতারক, মিথ্যাভাষী, ধূর্ত, চোর, হিংসুটে ও অসাধু ব্যবসায়ী।

ইসলামের মানস অভিঘাতে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করের নেতৃত্বে জাগল অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানবাদ, পরে তা ভক্তিবাদের রূপ নেয় ভাস্কর, নির্ম্বাক, মধ্ব, বল্লভ প্রমুখের বাণীতে ও সাধনায়। এ ভক্তিবাদই উত্তর ভারতে সন্তধর্ম নামে পরিচিত, এ-ও ইসলামের উত্তর ভারতীয় মোকাবিলায় উদ্ভূত। রামানন্দ, কবির, দাদু, নানক, একলব্য, রজব প্রমুখ সন্তগণ দেব-দ্বিজ-বেদবাদীদের পীড়ন ও বঞ্চনা থেকে সেদিন নিম্নবর্ণের দুস্থ মানবতাকে মুক্ত করেছিলেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে বাঙলায় তুর্কীবিজয় ঘটলে এখানে ইসলামের মুখোমুখি হয়ে হিন্দুসমাজ শাস্ত্রী ও নৈয়ায়িকদের নেতৃত্বে প্রথমে আত্মশোধনের এবং নিয়মনীতির সতর্ক ও দৃঢ় প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষের শিকার বঞ্চিত শোষিত বিক্ষুব্ধ নিম্নবর্ণের নিঃস্ব হিন্দু এবং লোপোন্মুখ নির্জিত নিঃস্ব বৌদ্ধরা ইসলামী সাম্যে আকৃষ্ট হয়ে নতুন প্রত্যাশায় আশ্বস্ত হয়ে রাজধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। রাজধর্ম ইসলাম তাদের জীবিকার তথা আর্থিক ক্ষেত্রে কৃচিৎ সহায়ক হয়েছে। কারণ সে-যুগের নির্দিষ্ট পেশাজীবী ও বর্ণাশ্রিত ভারতীয় সমাজ-প্রতিবেশে পেশান্তর বা স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচন সহজ ছিল না। তাই তাঁতী-তেলী-হাড়ী-ডোম-নিকারী সবাই স্বনামে বা নামান্তরে টিকে রইল মুসলিম সমাজে। অতএব, ইসলাম নবদীক্ষিতদের বৈষয়িক জীবনে ভাগ্যপরিবর্তনের তেমন সহায়ক না হলেও তাদের দিয়েছিল মানসমুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা, জাগিয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ ও আত্মমর্যাদার চেতনা, এনেছিল ঘরে-বাইরে অঘৃণার ও নিরাপত্তার স্বস্তি।

ইসলাম যখন বাঙলাদেশের দ্রুত প্রসারমুখী, তখনই ব্রাহ্মণ্যসমাজের ত্রাণকর্তারূপে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বভিত্তিক ভক্তিবাদ সূফীপ্রভাবে তাঁর চেতনায় প্রেমবাদরূপে প্রতিষ্ঠা পেল। তাঁর এই মনমাতানো, ঘরভোলানো, সুখজাগানো প্রেমতত্ত্বের প্রভাবে কিছু কালের জন্যে বাঙালির অন্যসব চিন্তা-চেতনা যেন বন্যার তোড়ে ভেসে গেল। এ নবপ্রেমের আবেগে বাঙালি জানল 'রাধা ছাড়া সাধা নেই— কানু ছাড়া প্রেম নেই.' এবং রাধা-কানু ছাড়া গীতও নেই। চৈতন্য-আন্দোলনে ইসলামের প্রসার রুদ্ধ হল, বলা চলে প্রায় বন্ধই হল। কেননা, ইসলামের যে-সব বৈশিষ্ট্য নিপীড়িত অবজ্ঞাত জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল, তাদের সবগুলোই চৈতন্যমতবাদে গৃহীত হল। যেমন, মানুষে মানুষে সমতা, মিত্রতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার, মানুষের স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের অধিকার, বর্ণভেদে, জাতিভেদে কিংবা সম্পদভেদে মানুষের মর্যাদার তারতম্য অস্বীকৃতি, [নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম দর্শন] ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে মূলসূত্র রূপে প্রীতির স্বীকৃতি, অসবর্ণ বিবাহ ও তালাক, নামকীর্তন, বিষয়ে অনাসক্তি, কৃষ্ণে সমর্পিত জীবন ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা, যে দেব-দ্বিজ-বেদের দোহাই কেড়ে বর্ণভেদের ও অধিকারভেদের প্রাচীরে বন্দী রাখা হয়েছিল কোটি কোটি নর-নারায়ণ মানুষকে, তার থেকে মুক্তিদান —মানবতার বিকাশের অসীম দিগন্তের সন্ধান দান। [এহেন মহাঠাকুরানী [রাধা] ভাব যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়] কাজেই নির্জিত হিন্দুর ইসলামে প্রয়োজন ফুরাল, যেমন উনিশ শতকে ব্রাহ্ম মতের বদৌলতে হিন্দুর কাছে ফুরিয়েছিল খ্রীস্ট ধর্মের প্রয়োজন কিংবা রামকৃষ্ণ যেমন পরোক্ষে রোধ করেছিলেন ব্রাহ্ম মতের প্রসার— য়ুরোপীয় হিতবাদে দৈশিক সংস্করণ কালীমাতার নামে নরসেবাবাদ প্রচার করে।

চৈতন্যদেবের এ প্রেমবাদ মূলত বৈরাগ্যবাদই। তাঁর প্রেমতত্ত্বে পার্থিবতা কেবল অবহেলিত নয়, অস্বীকৃতও। তাই তাঁর নববৈষ্ণবমত বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত আচারিক কিংবা তাত্ত্বিকভাবে জনপ্রিয় হয়নি। বাঙলার স্বল্পসংখ্যক লোকই নববৈষ্ণবমত বরণ করেছিল, পরেও বিশেষ প্রসার লাভ করেনি, এবং চৈতন্যের জীবৎকালেই অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে তত্ত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে চৈতন্যদেবের এ-ভাববিপ্লব সেদিন অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজকে আসন্ন বিপর্যয় কিংবা বিলুপ্তি থেকে চিরকালের মতো রক্ষা করেছিল, যদিও চৈতন্য প্রবর্তিত নববৈষ্ণবমত কোনো অর্থেই পুরোনো ব্রাহ্মণমতের নবায়ন নয়, বরং দেবদ্বিজবেদদ্রোহী নতুন মত। তবু যে অর্থে শঙ্করাচার্য, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভক্তিবাদী সন্তরা এবং উনিশ শতকের রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজের রক্ষক, সে তাৎপর্যেই চৈতন্যদেব বাঙলার বিপন্ন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ত্রাণকর্তা। বাঙলায় বিকৃত বৌদ্ধ মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী চিন্তা-চেতনা লোকমনে সুপ্ত-গুপ্ত ছিল বলেই সূফীমতের প্রভাবে প্রেমবাদ রূপে চৈতন্য-চেতনায় উদ্দীপ্ত বৈরাগ্যমুখী ভক্তিবাদ সহজেই গণমন জয় করেছিল। তাই চৈতন্যমতবাদ বাঙলার অধিকাংশ হিন্দু বা মুসলমান প্রত্যক্ষে গ্রহণ না করলেও মনেমেজাজে বরণ করেছিল–আকণ্ঠ পান করেছিল প্রেমসুধা। এ প্রেমবাদ মানুষকে ও মানবিক্ল মহিমাকে দিয়েছিল স্বীকৃতি। [চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ] সবার জন্যে অঙ্গীকার করেছিল প্রীতি। বলেছি, চৈতন্যমতবাদে পার্থিবতা ছিল না, তাই তাঁর মতবাদ পরবর্তীকালে নিষ্কর্মা নারী-পুরুষদের করেছিল মাননীয় ভিক্ষাজীবী, প্রেমচর্চার নামে কামাচারীও করেছিল–'নেড়ানেড়ী' নিন্দায় তা প্রকট।[১] আমাদের ধারণায় চৈতন্যমতবাদে অপার্থিবতার মূলে রয়েছে সেই সুপ্রাচীন কারণ– জাতি হিসেবে স্বাধীনসত্তার অভাব। চিরকাল বিদেশী বিজাতি বিভাষী শাসিত বলেই বাঙালীর মন-বুদ্ধি-আত্মার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। আত্মপ্রত্যয় অর্জন ঐ হীন পরিবেশে অসম্ভব ছিল বলেই সে প্রকাশ্যে সদর রাস্তায় পা বাড়ায়নি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, খিড়কীদোর দিয়ে গুপ্তপথেই সন্ধান করেছে বাঁচবার উপায়। কামনা করেছে স্বসৃষ্ট দেবানুগ্রহ, আয়ত্ত করেছে মন্ত্রশক্তি, প্রয়োগ করেছে তুক-তাক,দারু-টোনা, বাণ-উচাটন। তোয়াজস্তুতি হয়েছে তার সম্বল, চুরি-চামারি হয়েছে অবলম্বন,

১. অবজ্ঞায় নগ্নমাথায় বৌদ্ধভিক্ষু নির্দেশক 'নেড়া', পরে নেড়া মাথার সূফী নির্দেশক হয় এবং আরো পরে অবজ্ঞায় মুসলিম' অভিধা লাভ করে। আর ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবদম্পতিরাও অবজ্ঞায় 'নেড়ানেড়ী' নামে অভিহিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূর্ততা -প্রতারণা হয়েছে স্বীকৃত কৌশল। অবশ্য ছল-চাতুরী, তাবিজ-কবচ, দেও-দেবতা, জীন-পরী, ভূতপ্রেত প্রভৃতি সবদেশেই সুলভ। কিন্তু কোনো দেশেই এসব সুদীর্ঘকাল অধিকাংশ মানুষের মন-মনন আচ্ছন্ন করে রাখেনি, পরাধীনতার কারণে আমাদের যেমনটি অভিভূত করে রেখেছিল দু'হাজার বছর ধরে। দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার, তুক-তাকের ও অদৃষ্টের কবল-মুক্তি ঘটেছে আমাদের উনিশ শতকে ইংরেজী বিদ্যার বদৌলতে। আগে মানুষের —ব্যক্তির পৌরুষ বা পুরুষকার দেখেছি ক্বচিৎ। ভিন্ন কারণে আকস্মিকভাবে পেয়েছি চাঁদ-বেহুলাকে। নইলে আমাদের লাউসেনেরা দেবানুগৃহীত মাত্র। কালুডোম, ইছাই (ঈশ্বর) ঘোষ, লখাই ডোমনীরা হচ্ছে ব্যতিক্রম– ক্ষণপ্রভা।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের প্রমাণে বলা যায় রাঢ় অঞ্চলে সুপ্রাচীন কালে সভ্যতার বাণিজ্যিক বিকাশ ঘটেছিল, কাজেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবাহী উত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বঙ্গ প্রবেশের কিংবা নন্দ মৌর্য কম্বসুঙ্গদেব শাসন প্রসারের আগেও বঙ্গদেশে অন্তত তার অঞ্চল বিশেষে সভ্য ভব্য মানুষের বাস ছিল, অন্যেরাও কালিক মানে একেবারে বুনো বর্বর ছিল না। আমরা জানি এবং মানিও যে সাংখ্য ও যোগ অস্ট্রিক ভেডডিড্দের এবং তন্ত্র মঙ্গোলদের দান। দেহবাদ ও কায়াসাধন তাদেরই চর্যা। সেকালের কামরূপ-কামাখ্যার ভোজ বর্মনের অমৃতকুণ্ডও মঙ্গোলীয় অবদান। দেহবাদ থেকে দেহাত্মবাদে এবং আস্তিকদের শাস্ত্র প্রভাবে স-ঈশ্বর দেহাত্মবাদে পরিণতি আর বৌদ্ধ দেহাত্মবাদ ভিত্তিক মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী তত্ত্ব ও চর্যার উদ্ভব এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের নাথযোগী পন্থের উদ্ভব ও বিকাশ, গুণ ও শক্তিপ্রতীক লৌকিক দেবতার তত্ত্ব, যাদু ও মন্ত্র শক্তিতে আস্থা, তুক-তাক, দারু-টোনা বাণ-উচাটনের প্রয়োগ প্রবণতা, পীরনারায়ণ 'সত্য' ও তাঁর চেলা দেবভার উদ্ভাবন, চৈতন্যদেবের ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও বৈরাগ্যবাদ আর তজ্জাত প্রচ্ছন্ন সহজিয়াদের বৈষ্ণব নেড়ানেড়ী রূপে আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন গুরুবাদী হিন্দু-মুসলিম বাউলের আবির্ভাব আর সূফীবাদের দৈশিক রূপান্তর ও প্রসার দীন-দুর্বল পরাধীন বাঙালির প্রতিহত চিন্তা-চেতনারই প্রসূন।

মধ্যযুগের বাঙালির ব্যক্তিক ও সমাজমানসের এই রূপ তাদের অভিব্যক্ত সাহিত্যে ও পটে, আচারে ও আচরণে, রীতিতে ও রেওয়াজে, নীতিতে ও নিয়মে সুপ্রকট।

তবু চিন্তা-চেতনা যেহেতু মূলত ব্যক্তিক, কালিক ও স্থানিক এবং তা কোনো শ্রেণীর বা জাতির একচেটিয়া নয়, সেহেতু বাঙালির চিন্তার ফসল ও চেতনার ঐশ্বর্য আমরা কালে কালে প্রত্যক্ষ করেছি। গভীর উপলব্ধির সাক্ষ্য যেমন সাংখ্য, তেমনি সুপ্ত আত্মশক্তি আয়ত্তে আনার ও প্রয়োগের বাস্তবে গৃহীত পন্থা-পদ্ধতি হচ্ছে যৌগিক ব্যায়াম। আর জগৎ-প্রক্রিয়ার তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা হয়েছে তান্ত্রিক। তারপরে বৌদ্ধযুগে পেয়েছি আশ্চর্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা-আত্মমুক্তির বিচিত্র সব পন্থা— মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান— বিভিন্ন ও বিচিত্র উপায়ে কায়াসাধন পদ্ধতি, তার সঙ্গে নানা দেবতার কল্পনা— তারা, বজ্রতারা, শ্যামতারা, বৎসলা, অবলোকিতেশ্বর, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী, ওলা, শীতলা, ক্ষেত্রপাল, যক্ষ, হারিতী প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীর আত্মরক্ষামূলক প্রয়াসে সৃষ্ট 'নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতি' চৈতন্যদেবের নববৈষ্ণবমতবাদ, একালে রামমোহনের ব্রাহ্ম মত, রামকৃষ্ণের মাতৃকা পূজা ও নরসেবা প্রভৃতি চিন্তাজগতে বাঙালির বিশিষ্ট অবদান। সাধারণভাবে জীবনপ্রতিবেশ তাদের প্রতিকূল বলে এসব মহৎ চিন্তা-চেতনা তারা ধরে রাখতে পারেনি, তাই ভরেও তুলতে পারেনি জীবনের ভরা।

সাধারণ বাঙালির চিন্তা-চেতনা কেবল আবর্তিত হয়েছে আঠারো শতক অবধি, অগ্রসর হয়নি। তা ছাড়া যাঁরা বাঙলায় সাহিত্যচর্চা করেছেন, কিংবা অন্য কিছু লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্বান ছিলেন ক্বচিৎ কেউ, অন্যেরা ছিলেন স্বল্পবিদ্যার লোক। বিদ্বানরা সংস্কৃত ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ অবহট্ঠেও, সেখানেও তাঁদের সৃষ্টিশীলতার চেয়ে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। প্রকীর্ণ কবিতায়, শ্লোকে, দোহায় কারো কারো জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অনুভব উদ্ভাসিত। বাঙলাভাষা প্রতিভাবানের তথা মনীষাসম্পন্ন লেখকের পরিচর্যা পায়নি মধ্যযুগে; তাই মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে, বক্তব্যে, আঙ্গিকে, রুচিতে এবং লক্ষ্যে কেবল আবর্তিত হয়েছে, অগ্রসর হয়নি। লিখিত ভাষারূপে অর্বাচীন ইংরেজীতে শেক্সপীয়ার যখন নাটক লিখছেন, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম লিখছেন চণ্ডীর পাঁচালী। তাছাড়া বাঙলা ছিল চিরকাল প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকভাষা বা বুলি। এ চিরদিন অযত্নে লালিত, তবু বহু কালের বহু মানুষের প্রাণের কথার বাহন বলেই অবহেলার মধ্যেও এ পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে যথাসময়ে লিখিত ভাষা হিসেবেই। দরবারী ভাষার মর্যাদা না পেয়েও প্রশাসনের ভাষা না হয়েও ব্রিটিশ আমলে এ প্রাদেশিক ভাষা শ্রেষ্ঠ ভাব-চিন্তার আধার রূপে ভাষাজগতে স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

কিন্তু যে-কাল আমাদের আলোচ্য, সেকালে গর্ব করবার মতো ক্বচিৎ কিছু মেলে। আমরা চাঁদ-বেহুলার গৌরব করতে পারি– দেব-মানবে এ সংগ্রাম, এ পৌরুষ, এ দ্রোহ, এ জেদ, এ অধ্যবসায় দুনিয়ায় দুর্লভ, কিংবা গর্ব করতে পারি বৈষ্ণবপদাবলীর, অথবা কিছু তত্ত্বগ্রন্থের বা গাথা গীতিকার, কিন্তু বহুজনের বাচালতায় বহু অনুকৃতিতে এ সবের অপকর্ম আরও নিমাও লজ্জিত করে আমাদের।

বলেছি, আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য আসলে বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, গানে গল্পে রসিয়ে বলা শাস্ত্র-কথা মাত্র। চর্যাপদ কিংবা বৈষ্ণবপদ অথবা বাউলগান বা শাক্তসঙ্গীত সম্বন্ধে এ যেমন সত্য তেমনি রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও মঙ্গল পাঁচালী সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য। এমনকি কালপ্রভাবে রূপকথা বা অনূদিত প্রণয়োপাখ্যান সম্বন্ধেও তা একেবারে অপ্রযোজ্য নয়। প্রায় সব রচনায় যোগতন্ত্রকথা থেকে শুরু করে কিছু শাস্ত্রকথা, কিছু অধ্যাত্মতত্ত্ব, কিছু তুক-তাক দারু-টোনা, কিছু অলৌকিক কেরামতি মেলে। আর সত্যের জয়, মিথ্যার লয়, পাপের ক্ষয় তো আছেই, তা ছাড়া সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে স্থূল নীতিকথাও থাকে নানা প্রসঙ্গে— লেখক-পাঠক ওগুলোকেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা রূপ মণি-মুক্তের মনে করতেন। মানুষের বিশেষত আস্তিক মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের ও ইচ্ছার প্রতিফলন তা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ঘটেই।

অনূদিত রামায়ণে, মহাভারতে, মঙ্গলকাব্যে, গানে-গাথায় তবু শেষাবধি বাঙলার মাটির গন্ধ ও বাঙলার মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আমরা দেব-কাহিনীর আবরণে দৈব-লীলার ফাঁকে ফাঁকে পাই কালু-লখাই-মহামদ-সোমঘোষ-ইছাইঘোষ-কর্ণসেন- ভাড়ু দত্ত-খুল্লনা-লহনা-দুবলা-চাঁদ-বেহুলা-বড়াই-হীরা প্রভৃতি বাঙালিকে এবং বাঙালির হরগৌরী, মনসা, চণ্ডী, দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী, নদেরচাঁদ, মহুয়া, হোমনা, দুলাল, মদিনা—এঁরা আমাদের চির-চেনা ঘরের লোক, হাটে-বাটে দেখা মানুষ, আমাদেরই চিরকেলে প্রতিবেশী।

রূপকথায় বা প্রণয়োপাখ্যানে আমরা পাই দেশকালহীন কিছু মানুষের কথা। তাতে মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকটন রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের আমরা আপন করে নিজেদের মানুষরূপে পাইনে, তবে কবির অজ্ঞতার কারণে বা অনবধানতার ফলে ক্ষণে ক্ষণে এবং কোথাও কোথাও দেশ-কালও যেন ধরা দেয় ক্বচিৎ কখনো। তবু মনে রাখতে হবে এ সাহিত্য আন্তর্জাতিক ধারার অংশ, এর বিকাশ ও প্রসার বিদেশী প্রভাবজ। ইরান, মধ্য এশিয়া ও আরব-মিসর তখন একালের য়ুরোপের মতোই এ দেশের মানুষের অনুকরণ-অনুসরণ-অনুপ্রেরণার উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের রচনা দু'শ্রেণীর—মৌলিক আর অনূদিত। মৌলিক রচনা মাত্রই অনুকৃত ও পুচ্ছগ্রাহিতাদুষ্ট, বিষয়ে তো বটেই, ভাবে ভাষায় বক্তব্যেও পার্থক্য সামান্য ও নগণ্য। কাজেই অনূদিত নয় অর্থেই আমরা 'মৌলিক' সংজ্ঞা ব্যবহার করছি। শুধু মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণবপদ নয়, অনেক প্রণয়োপাখ্যানও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সবটাই অঙ্গে এবং অন্তরে অভিন্ন।

জ্ঞানের কথার, তত্ত্বকথার কিংবা তথ্যের আক্ষরিক অনুবাদ আবশ্যিক। অন্যথায় সব পণ্ড হওয়ার কথা। কিন্তু সাহিত্য যেহেতু ভাব-অনুভবের কথা, ভাব-অনুভবের শিল্পায়িত রূপ, বস্তুগত সত্যাসত্য এখানে গৌণ, সেহেতু সাহিত্য আক্ষরিক অনুবাদ হতেই পারে না, বাঞ্ছিতও নয়। অনুবাদ শিল্পসম্মত না হলে তার মূল্য কানাকড়িও নয়, কেননা সাহিত্য তত্ত্বের বা তথ্যের আধার নয়, তা পরহৃদয়বেদ্য সঞ্চারী রসের আকর। অনূদিত বক্তব্যকে শিল্পসম্মত বা শিল্পোত্তীর্ণ করতে হলে দশ শব্দকে এক শব্দে ব্যঞ্জিত বা ব্যঞ্জনা ঋদ্ধ এক শব্দকে দশ শব্দেও পরিব্যক্ত করার প্রয়োজন হয় ভাষার বাকরীতি, শব্দসম্পদ ও ব্যঞ্জনাশক্তি অনুসারে। এ কারণেই সাহিত্যের অনুবাদ কোথাও আক্ষরিক বা কায়িক, কোথাও ছায়িক বা ছায়াবলম্বনে, কোথাও ভাবিক বা ভাবাবলম্বনে হতেই হয়—গ্রহণবর্জনের অধিকার অনুবাদককে দিতেই হয়। আমাদের মধ্যযুগের কাব্য-অনুবাদক কবিগণও স্বাধীনতা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এসব বর্ণনামূলক কাব্যে শুধু উক্তি নয়, বর্ণনা নয়, কাহিনীও ইচ্ছেমতো গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন করেছেন। ঢেলে সাজিয়েছেন দেশ-কাল সমাজের অনুগত করে তাঁর প্রয়োজনের ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে। আর কবিতার অনুবাদ কখনো আক্ষরিক হতে পারে না, ভিন্ন পরিবেশের, ছন্দের এবং ভাষার বাগভঙ্গির দরুন ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

আগেই বলেছি, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীরূপ ছিল। বাঙালির ও বাঙলার সর্বজনীন কোনো সাহিত্য ছিল না। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য, শৈবসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, মুসলিমসাহিত্য ছিল, আরো ছিল একান্তই রাঢ়ের, বরেন্দ্রের, বঙ্গের-সমতটের কিংবা চট্টলের সাহিত্য। বলতে গেলে ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়মে কিংবা ১৮১৮ সনে সংবাদপত্রেই সর্বজনীন রচনার সূচনা। কোলকাতায় মুদ্রণযন্ত্রের ও পত্রিকার বদৌলত সর্বজনীন বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি শুরু হয়, যদিও বক্তব্যে তা শ্রেণী ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ছিল না। নির্বিশেষ মানুষ ও মানব-সমস্যা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন এ যুগের কম্যুনিস্টরাই।

সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত থাকে স্রষ্টার পরিচয়। তাই বাঙলা সাহিত্য পরিচিতির মধ্যেই মিলবে বাঙালির অন্তরঙ্গ পরিচয়,–এ রূপাধারে ধরা পড়বে তার স্বরূপ–এমনি বিশ্বাসবশেই আমাদের বাঙলা সাহিত্য আলোচনার এ প্রয়াস।

ষোল-সতেরো-আঠারো শতকের বাঙলা সাহিত্যকে আমরা উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে প্রত্যক্ষ করেছি, মূল্যায়ননীতিও আলোচনা এ প্রয়াস।

ষোল-সতেরো-আঠোরো শতকের বাঙলা সাহিত্যকে আমরা উপযুক্ত ধারণার আলোকে প্রত্যক্ষ করেছি, মূল্যায়নীতিও এ দৃষ্টির অনুগত।

আর একটি কথা একালের মন নিয়ে সেকালের রচনায় শিল্পসুষমা ও সাহিত্যেরস সন্ধান করা নিরর্থক। কেননা কালিক ব্যবধানে মনের ও রুচির পরিবর্তন হয়েছে। তবু দূর অতীতের এ সাহিত্যেই পাব সেকালের জীবনকে ও জীবনচেতনাকে; আর আবিষ্কার করব তদ্ধৃত তথ্য, তন্নিহিত জীবনপ্রতিবেশ এবং তৎসংলগ্ন ইতিহাস। এ সাহিত্যই এখন অতীতের সঙ্গে আমাদের একমাত্র পরিচয়সূত্র, যোগসেতু এবং আত্মীয়তার গ্রন্থি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধমত প্রভাবিত সাহিত্য
'ক' ধর্মঠাকুরতত্ত্ব ও সাহিত্য

১. প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য

এ সত্য আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজকের বাঙালির অধিকাংশই একসময়ে ছিল বৌদ্ধ। এবং প্রায় সব বাঙালিই আর্যরক্ত বঞ্চিত। গুপ্ত-শশাঙ্ক-সেনরা বাঙলাদেশের অংশবিশেষ বা অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও এখানে যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায়নি, তার আভাস রয়েছে আদিশূর কিংবদন্তীতে, সাক্ষ্য আছে বল্লালসেনী কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন প্রয়াসে এবং প্রমাণ আছে সামগ্রিকভাবে যজ্ঞ হোম প্রভৃতির অনুল্লেখে বা বিরল উল্লেখে আর লৌকিক দেবতাপূজক পঞ্চোপাসক বর্তমান হিন্দুসমাজের অস্তিত্বে।

পূর্বেই নানা প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছি যে, অস্ট্রিক-মঙ্গোল অধ্যুষিত এ দেশের মানুষের মন-মনন এক বিশিষ্ট ধারায় পুষ্ট ও বিবর্তিত হয়েছে। বহু বহু কাল তাদের চেতনা কেবল এই মর্ত্যজীবনের রহস্যজিজ্ঞাসু ছিল। তাই তাদের জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা তথা তাদের জন্ম-জীবন-মৃত্যু জিজ্ঞাসা তাদেরকে দেহ-সন্ধিৎসায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এরই প্রসূন সাংখ্যতত্ত্ব, যোগচর্যা এবং মন্ত্র ও তন্ত্র শক্তির আবিষ্কার। বহিরাগত শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও সমাজ-নীতি বাহ্যত বারবার গ্রহণ-বরণ করলেও বাঙালি কখনো তার স্বধর্ম ছাড়েনি, সাংখ্য-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী মতকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলামী মতের স্থানিক ও কালিক বিকৃতির মধ্যেই সেই সনাতন সংস্কারের স্থিতি। উক্ত সব মতবাদের ও শাস্ত্রের চাপে পড়ে কখনো ঋজুভাবে, কখনো বক্রভাবে স্বরূপে বা ছদ্মরূপে বাঙালির স্বকীয় বিশ্বাস-সংস্কারই দেহজ চর্মরোগের মতো আজো স্বতো ও স্ব-প্রকাশ রয়েছে। পশু -পক্ষী-বৃক্ষ-নারী পূজা, মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ এবং ধ্যান-কর্মবাদ-জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি যে দেশজ, —আর্য অবদান নয় তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না।

জীব-শ্রেণী হিসেবে বিশ্বমানবের চিন্তা-চেতনায় সাদৃশ্য রয়েছে। এ সবকে স্বভাবজ বা স্বতঃস্ফূর্ত বলে মানতে হয়। যেমন বুনো-বর্বর-ভব্য পৃথিবীর তাবৎ মানুষ মনে করে যে একসময়ে কিছুই ছিল না, ক্রমে সব সৃষ্টি হয়েছে, তারা এ-ও বলে যে আদিতে পৃথিবী ধূম্রময়, জলময় এবং অন্ধকারময় ছিল। সবাই অদৃশ্য অরি-শক্তি এবং মিত্র-শক্তিও মানে। সবাই অবচেতন মনে হয়তো বুঝেছিল যে সূর্যই প্রাণের উৎস। সূর্যরশ্মি ব্যতীত কিছুই জন্মায় না, বাড়ে না, বাঁচে না। তাই সূর্য হয়েছে সবারই পূজ্য। সূর্যের মর্ত্যপ্রতিরূপ অগ্নিও তাই হয়েছে উপাস্য। তা ছাড়া শক্তির, কল্যাণের, সৌন্দর্যের, পূর্ণতার ও পবিত্রতার প্রতীক হয়ে রয়েছে সেই আদিম আলো, জ্যোতি, প্রভা বা বিভা যা সূর্যসম্ভব ও সূর্যনিঃসৃত কাজেই এসব আদি ও মৌলিক ধারণার ক্ষেত্রে কেউ কারো কাছে ঋণী নয়। সাদৃশ্য মাত্রই লেন-দেন নয়।

সবিতা যে জগৎ-কারণ, তার মর্ত্যরূপ যে অগ্নি, তা জোরাস্ট্রীয় ও বৈদিক ঐতিহ্যে যেমন মেলে, তেমনি মেলে সেমেটিক ঐতিহ্যেও। মুসা তুর পর্বতে জ্যোতির্ময়-অগ্নিময় যেহোবাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যাঁর তেজে তুর পর্বত জ্বলে গেল। সূর্য যে সৃষ্টির ও বৃষ্টির উৎস, সে ধারণাও দেশী ঐতিহ্যে মেলে। আজো অস্বাভাবিক গ্রীষ্মকে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস বলে মনে করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। সূর্য-প্রতীক শিব আজো বৃষ্টির, ফসলের ও প্রজা-সৃষ্টির দেবতা। তাই বৈশাখ মাসে শিব থেকেই স্বামী-বর প্রার্থনা করতে হয়, শিব-লিঙ্গে পানি ঢালতে হয়, জলে নেমে সূর্যস্তব করতে হয়।

মানুষের আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার প্রতিকূল প্রতিবেশে গুল্ম-ঔষধির মতো সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে বটে, কিন্তু তা জড় থেকে যায় এবং দুর্বল মুহূর্তে তা জেগে ওঠে। বিশ্বাস-সংস্কার কালান্তরে রূপান্তর লাভ করে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় না। তাই সর্বপ্রাণবাদের, যাদু বিশ্বাসের ও টোটেম-টেবুর স্তরের অনেক কিছুই আমাদের চেতনা-প্রবাহে সুগোপনে থেকে যায়। তা ছাড়া স্থান ও কালের চাহিদানুযায়ী বাহ্যত অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হয়। বদলায় বটে, কিন্তু সংস্কার যেন মেরুদণ্ডের মতো কাজ করে। বিশ্বাস ও সংস্কারকে বীজরূপে কল্পনা করলে পল্লবিত মহীরুহরূপ সভ্য-সংস্কৃত মানুষের বিকাশ-বিস্তার অন্য অনেক কারণ-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হলেও কিন্তু ঐ বীজের ঋণ কিছুতেই ঘোচে না।

আমরা দেখেছি বাঙলাদেশের যারা অস্ট্রিক দ্রাবিড় অধিবাসী তারা বিজিত মানুষ। তারা যখন বুনো-বর্বর স্তরে, তখনই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সভ্য-মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনা প্রসূত শাস্ত্র ও তত্ত্বদর্শন এবং তার সঙ্গে এল বিদেশীদের সাম্রাজ্যিক শাসন-শোষণ। এর জন্যে তাদের মানস কিংবা ব্যবহারিক প্রস্তুতি ছিল না। এমন মানুষ সযত্নে আচার-আচরণ অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু বোধের জগতে আত্মবিশ্বাস ঘটাতে পারে না। তাই সাধারণ মানুষ শাস্ত্র মানে কিন্তু তত্ত্ব বোঝে না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মশাস্ত্র কেবলই আচারিক। বিদেশী শাসনকালে তাদের অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জীবন-জীবিকায়, জগৎ-চেতনায় ও জীবন-ভাবনায় আত্মোন্নয়ন ঘটেনি। সেই মানুষ আজো রিক্ত-নিরক্ষর বৃত্তিজীবী হাড়ী-ডোম-মুচি-মেথর-চাঁড়াল-বাগ্‌দী-কৈবর্ত-কামার-কুমার-তাঁতী-তেলী-নিকারী-নাপিত-ধোপা-চাষীরূপে সংখ্যায় গুরু। দু'হাজার বছর আগে তাদের জীবন-জীবিকা যে অমানবিক স্তরে ছিল, তা প্রমাণে অনুমানে জানা-বোঝা যায়। তেমন মানুষ সর্বপ্রাণবাদে, যাদু বিশ্বাসে টোটেম-টেবু নীতিতে আস্থা রাখত। এ সবই ছিল তাদের অলিখিত ধর্ম, শাস্ত্র, তত্ত্ব ও দর্শন। তাদের ব্যবহারিক ও মানস-জীবন নিয়ন্ত্রণ করত কালোচিত বিশ্বাস-সংস্কার। সে-মানুষ সৃষ্টি-সম্ভব পুরুষ-প্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখত। সাংখ্য তাদেরই মানস-প্রসূন। মর্ত্য-জীবনের বিরুদ্ধ পরিবেশে দেহ-চেতনাও ছিল তাদের আদিম, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেখানের বাধা তাদের অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি সম্বন্ধেও সচেতন রেখেছিল। কাজেই দৈব-প্রতীক অনেক শক্তির প্রতি তাদের ছিল সহজাত ভয়-ভরসা। আগেই বলেছি জন্ম-জীবনের উৎস সূর্যকে কেউ কোথাও অস্বীকার করেনি, সূর্য প্রাণপুরুষ বলেই শিব। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাধারণ ধারণা থেকে 'উমা'ও পরিকল্পিত। শাকম্ভরীর ধারণা তাই সুপ্রাচীন। এই মানুষই যখন জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী শাস্ত্র গুরুমুখ থেকে গ্রহণ করল, তখন কিছু না বুঝেও শাস্ত্রীর নির্দেশে শাস্ত্রাচার ব্যবহারিক জীবনে মানতে চাইল। মন বাঁধা রইল অতীত বিশ্বাসে-সংস্কারে, ভয়ে ও ভরসায়, আর প্রাত্যহিক জীবনে সমর্পণ করল অজ্ঞাত অবোধ্য শাস্ত্রে। ফলে জীবনে-মননে অতীত-বর্তমানের, বিশ্বাসের ও আচারের অসঙ্গত মিশ্রণ ঘটল। এমনি মিশ্রণ দুনিয়ার সভ্য সমাজে সর্বত্র আজো দৃশ্যমান। কারণ মানুষ না পারে পুরোনো সংস্কার ছাড়তে, আবার না পারে নতুন মত-পথকেও এড়াতে। তাই আমরা ধর্ম-পূজারীদের কেবল বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে নয়, ইসলাম-পন্থীদের সাথেও সহাবস্থানের গরজে আপোস করতে দেখি (বড় জালালী : শেক-শুভোদয়া ও ছোট জালালী তথা নিরঞ্জনের রুম্মা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। এ সূত্রে মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেন পালা ও পীর পাঁচালী স্মর্তব্য। উড়িষ্যার ও রাঢ় অঞ্চলের এক বিস্তৃত বুনো এলাকায় (মহাবীর ও জৈন শ্রাবকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঢ়।-পর্যটনের অভিজ্ঞতা স্মর্তব্য) জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয় খ্রীস্টপূর্ব কালে। এরা-বোঝা যাচ্ছে-সূর্য উপাসকও ছিল। কি নামে তারা সূর্যদেবতাকে ডাকত, তা আমরা জানিনে। জৈন-বিলুপ্তিতে সবাই যখন বৌদ্ধ তখন এসব মনে রিক্ত ও ধনে নিঃস্ব বুনো-বর্বর দৈবনির্ভর বৃত্তিজীবী মানুষের সাধ্যাতীত ছিল নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর নির্বাণবাদী বৌদ্ধ শাস্ত্র, তত্ত্ব ও দর্শন বোঝা। তারা শুনেছে এক রাজপুত্রও শাস্ত্রের প্রবর্তক। পূর্বসংস্কার বশে তারা সহজেই জেনেছে—বুঝেছে যে জীবন দৈবনিয়ন্ত্রিত। সে-দৈব শক্তি মানতে হবে। কাজেই সে-দৈব শক্তির নতুন নাম ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তক, সঙ্ঘ বা শ্রাবক ভিক্ষুরা হচ্ছেন শাস্ত্রী। কাজেই ঐ বুনো-বর্বর মানুষ বুঝল 'ধর্ম'ই তাদের পূর্বসংস্কারের সর্বনিয়ন্তা দেবতা। এবং পূর্বসংস্কার বশে এ ধর্মকে তারা সূর্যেরই' প্রতিরূপ মনে করল। শুধু তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মাত্রই পৌত্তলিক-অবয়বে-আচারে দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলে 'ভাব' রূপে কিছুই ধারণা করা সম্ভব হয় না। যারা নিরাকার স্রষ্টা মানে তারাও অনাদি জ্যোতিস্বরূপ কিছু কল্পনা করে। আর শক্তিকে অনুভবসাধ্য করার লক্ষ্যে মানুষ তাঁরও হাত-পা-নাক-কান চোখের রূপক ব্যবহার করে জানার, দেখার ও করার শক্তির ধারণা পাবার জন্যেই। বস্তুত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কিছুই মানুষ কল্পনা করতে পারে না, তাই ইন্দ্রিয়গত ধারণা প্রয়োগে সে হাত-পা-মাথা-চোখ-পাখার হ্রাসবৃদ্ধি করে দৃষ্টিগ্রাহ্য দেব-দৈত্য-রাক্ষস-জীন-পরী-গন্ধর্ব সৃষ্টি করেছে। ভাষায় প্রতীকী অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে এই প্রয়োজনেই।

যাহোক, বাহ্যত বৌদ্ধাচার যখন গ্রহণ করল তখন শাস্ত্রী-শ্রাবকের নির্দেশে বৌদ্ধ পরিভাষাও বুঝে-না বুঝে 'বুলি' হিসেবে তাদের উচ্চারণ করতে হয়েছে। সেইভাবেই নির্বাণ, শূন্য, তথাগত প্রভৃতি পরিভাষা ও তত্ত্ব এসেছে। না বুঝে শূন্যকে (কেননা তারা পাথর-প্রতীক মানে) ধ্যান করতে হয়েছে :

ষস্যান্তো নাদিমধ্যে ন চ করচরণো নাস্তিকায়ো ন নাদঃ।
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য।
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্বলোকৈকনাথম্।
ভক্তানাম কামপুরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম্।

আবার বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরে এরা যখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ছদ্মনামে আশ্রিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-উমা প্রভৃতি দেবতার নাম ও তৎসম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্য আবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছে। তুর্কী-বিজয়ের পরে আবার কিছু তুর্কী প্রভাবও স্বীকার করে কালোপযোগী রূপ দান করা হয়েছে। সবটাই মনে হয় অনুকরণের অবচেতন প্রেরণা প্রসূত। দেশজ মানুষের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের, শাস্ত্রের ও তত্ত্বের পৌরাণিক সমন্বয়, রূপান্তর ও বিকাশ এ সূত্রে স্মর্তব্য। কেবল ধর্মপন্থীদের ক্ষেত্রে নয়, দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্র-পন্থীদের মধ্যে এরূপ দেশজ, লোকজ ও অপর শাস্ত্রের প্রভাবজ আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতির মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে। তবু কোনো বিশেষ রীতি বা তত্ত্বের সাদৃশ্য সব ক্ষেত্রে প্রভাব জ্ঞাপক নয়—আকস্মিক মিলও বটে।

অতএব আমাদের ধারণায় প্রাচীন সূর্যদেবতা রাঢ়ের অন্ত্যবাসী বৌদ্ধ সমাজে ত্রিশরণের বা ত্রিরত্নের অন্যতম 'ধর্ম'রূপে কিন্তু নবতত্ত্বাশ্রিত হয়ে টিকে ছিলেন। রাজপুত্র প্রবর্তিত ধর্ম—এ সংস্কার বশে দেবতা হিসেবে কল্পিত 'ধর্মরাজা' রূপেও আখ্যাত। অথবা শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে

---

১. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে কোলদের কূর্মবাচক দরম বা দড়ম থেকে ধর্ম শব্দ উদ্ভূত—রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা (২য় সং)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি 'ধর্মরাজা' (ধর্ম রায়), আর দেবতা ও রাজা মাত্রই ঠাকুর। কাজেই তিনি ধর্মঠাকুরও। আবার অমরকোষে বুদ্ধকেই ধর্মরাজ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে : "সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্থথাগতঃ।" উল্লেখ্য যে বহু আরণ্যগোত্র —খরিয়া, ভুঁইয়া, বোণ্ডো, গদরা, জুয়াঙ, কন্দ, মাল পাড়াড়িয়া এবং ওঁরাওরা ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে 'ধর্ম' বলে। ডক্টর অতুল সুরের মতে, বৌদ্ধজাতকের ধার্মিক ও দাতা শিবিরাজ বেস্‌সান্তর গুণমুগ্ধ শ্রদ্ধাবান প্রজাপুঞ্জের কাছে–'ধর্মরাজ' নামে আখ্যাত হন এবং তাঁর পূজাও প্রচলিত হয়। বর্তমান ধর্মরাজার পূজা তারই নিদর্শন।... প্রমাণ হচ্ছে ধর্মরাজার পূজার মন্ত্র "শ্রী শ্রী ধর্মভট্টারক পূজামহম করিষ্যে। লক্ষণীয় যে, ভট্টারক শব্দটি লৌকিক রাজার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত।"[১] এ শিবিরাজ্য ছিল বর্তমান বর্ধমানের মঙ্গলকোট এলাকায়। বৌদ্ধরা নিজেদের সদ্ধর্মী (সৎ ধর্মী) বলে পরিচয় দিত। কাজেই ধর্মঠাকুরের পূজারীরা সদ্ধর্মী। ধর্ম সাধারণভাবে বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম হিসেবে বৌদ্ধ ভারতে তথা বৌদ্ধ জগতে অজ্ঞাত ছিল না। তাই আল্লাহ অর্থে 'ধর্ম' মুসলিম কবিও প্রয়োগ করেছেন।[২] যে দেবতা বন্ধ্যা নারীকে সন্তানবতী করেন, দুরন্ত কুষ্ঠরোগে নিরাময় দান করেন, ভক্তের চক্ষুরোগ দূর করেন, ভক্তের জীবনে জয় ও নিরাপত্তা দান করেন, তাঁকে ছাপোষা দুর্বল লিপ্সু বিষয়ী মানুষ অবহেলা করতে পারে না, তাই ডোম-চাঁড়াল-বাগ্‌দীর দেবতা 'ধর্মঠাকুর' প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও পূজ্য হয়ে উঠলেন। লক্ষণীয় যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-পাঁচালীর রচয়িতারা প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ। তাঁদের হাতে পড়েই বৌদ্ধ 'ধর্মঠাকুর' পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার (নারায়ণ) রূপ লাভ করেছেন। রামাই পণ্ডিত কিংবা ময়ূর ভট্টের হাতে তাঁর বৌদ্ধরূপ প্রায় অবিকৃত ছিল — যদিও তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসে গেছেন। ব্রাহ্মণ পাঁচালীকারেরাও তাঁর বৌদ্ধরূপ পুরো অপসারিত করতে পারেননি। তাঁদের অসাবধানতায় হয়তো বৌদ্ধরূপ স্থানে স্থানে প্রকট। এমন কি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল রচনা করতে গিয়েও ধবলাকার ধর্ম-নিরঞ্জনকে স্মরণ করেছেন।

অন্য প্রসঙ্গে[৩] আমরা বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের কথা বলেছি ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, গোরক্ষপন্থী, সহজপন্থী, বৈষ্ণব, বাউল (কিশোরীভজা, কর্তাভজা, সাঁইপন্থী প্রভৃতি সব শ্রেণীর বাউল) ও যোগী-তাঁতীরাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাছাড়া বিভিন্ন পন্থী যোগতান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা এবং বাঙলার সূফীরা গভীরভাবে বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্ব প্রভাবিত।[৪] বাঙলার বর্তমান হিন্দুসমাজে পূজ্য অধিকাংশ লৌকিক দেবতাই বৌদ্ধ যুগের (আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, তারা, বৎসলা, জাঙ্গুলী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি) আর আজকের হিন্দু-মুসলমানের ঘরোয়া আচারে-সংস্কারেও রয়ে গেছে বৌদ্ধ সমাজের নানা রীতি-রেওয়াজ। অতএব নাথ সাহিত্য, ধর্ম সাহিত্য, সহজিয়া সাহিত্য, যোগতান্ত্রিক সাহিত্য একান্তই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য।

২. ধর্মপূজা : ধর্মঠাকুর পরিচিতি

আজো বর্ধমান বিভাগের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধর্মঠাকুরের পূজা চালু রয়েছে, চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের গাজন। কারো কারো নিত্যপূজ্য গৃহদেবতাও ধর্মঠাকুর। ধর্ম ও ধর্মের কামিনী (কামিন্যা) ঈষৎভাবে এখন হর-গৌরী প্রভাবিত। ধর্ম একান্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। তাঁর শাস্ত্র ও মাহাত্ম্যগ্রন্থ রচনা একান্তভাবে রাঢ় অঞ্চলে ছিল সীমিত। অতএব

---

১. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ১ম সং, ১৩৮৩ সন, পৃ. ৩২-৩৩।
২. শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য দ্রষ্টব্য।
৩. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য : চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মঠাকুর আঞ্চলিক দেবতা। সেখানে কৃষ্ণের বা চণ্ডীর মতো ধর্মঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত ও অভিহিত। কৃষ্ণের মতো নানা গুণনামও রয়েছে তাঁর, যথা – যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায়, কালু রায়, দলু রায়, খুদি রায়, বুড়া রায়, মোহন রায়, জগৎ রায়, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি (মানিক গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল)। শিলাখণ্ড রূপেও (কৃচিৎ বারাসত প্রভৃতি অঞ্চলে) প্রমূর্ত দেবতারূপে তিনি পূজিত।

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন[১] বলেন, "বিহারে ধর্মপূজার চিহ্ন বিশেষ 'ছট পরব'। ... কোথাও কোথাও ধর্মরাজ জৈনসিদ্ধ ধর্মনাথে পরিণত হইয়াছিলেন।" জৈনদের ধর্মনাথ মেঘ-বৃষ্টির দেবতা। তাঁর মতে ধর্মনাথের শাসনদেবী যেমন কন্দর্পা তেমনি ধর্মঠাকুরের কামিনী বা কামিন্যা। তিনি আরো বলেন, "রাঢ়ে এখনো অনেক স্থানে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলে ধর্মরাজকে দুধে স্নান করানো হয় বৃষ্টি কামনায়। 'ধর্মঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্প বিস্তর নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ', আদিত্য-যম-সোমও এর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।" হরিশচন্দ্র রাজার ও বৈদিক বরুণ দেবতার কাহিনী দৃষ্টে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও ধর্মঠাকুরকে বরুণ দেবতার আধুনিক নাম ও রূপ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন।[২] সুকুমার সেন আরো অনেক কিছু সপ্রমাণ অনুমান করেছেন, যেমন, উড়িয়া 'মনোহি' ও 'মুনই' অভিন্ন। রাজসূয় আর বৈদিক 'বরুণসব'ও অভিন্ন এবং ধর্ম যেমন 'রাজা' বরুণও বেদোক্ত রাজা। বৈদিক শুনঃশেপ আখ্যান ও হরিশচন্দ্র রাজার কাহিনীর উদ্দেশ্যগত ঐক্য রয়েছে। আবার সদাডোমের একাদশীও বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি থেকেই আগত। হরিশচন্দ্র রাজার আখ্যানমূলও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের [হরিশচন্দ্র-রোহিতাশ্বশুনঃশেপ] আখ্যান। ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বও বৈদিক এবং এগুলোর সঙ্গে পরে ডোম-চাঁড়ালের রণদেবতা, অনার্য শিলাদেবতা, তুর্কী আমলে ফকিরদেবতা, আর আর্যেতর সংস্কারাদি যুক্ত হয়েও ব্রাত্য শৈব এবং নাথ মত মিশ্রিত হয়েছে। আমরা পূর্বে ধর্মঠাকুর সম্পর্কে যা বলেছি, তাতে এসব সাদৃশ্যের উত্তর রয়েছে। বাঙলাদেশের অন্যসর্ব প্রখ্যাত পণ্ডিত গবেষক ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলে স্বীকার করেন।[১]

ধর্মঠাকুর যে বিবর্তিত রূপে আদি সূর্যদেবতাই তার ইঙ্গিত মেলে ধর্মশিলার শ্বেতরূপে, অশ্ববাহন প্রতীকে এবং বৃষ্টির, কুষ্ঠের ও সন্তানবর দানের দেবতারূপে তাঁর স্বীকৃতিতে। আবার তিনি যে তাঁর পূর্ব-পূজারী ধর্মান্তরিত দেশজ বৌদ্ধদের ধারণায় শূন্যরূপে প্রতীয়মান হলেন, তার প্রমাণ তিনি শূন্যরূপে অনুধ্যেয় ও পরিকীর্তিত। লোকস্মৃতিতেও ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা। রামাই পণ্ডিতের জবানীতে শুনতে পাই : 'শ্রীধর্ম দেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।' ভারতে বিলুপ্তির পরে সিংহলেই বৌদ্ধধর্ম জাতীয় ধর্ম ছিল। অবশ্য নেপালে-তিব্বতে-চীনে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে ছিলই। ধর্মপূজা বিধানে ধর্মপূজারীরা সদ্ধর্মী বলে উল্লিখিত। তাছাড়া শূন্য,

---

১. ক. হরপ্রাদ শাস্ত্রী Discovery of Living Budhism in Bengal, JRASB. (Proceeding for December) 1894 Pt. I এবং হাজার বছরের পুরাতন বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, ভূমিকা। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

খ. ব্রজসুন্দর সান্যাল–'মানিকরাম ও ধর্মমঙ্গল–সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২ সন।

গ. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্যপুরাণ ভূমিকা-১৩১৪ সন।

ঘ. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ধর্ম পূজা বিধান' ভূমিকা : ১৩২৩ সন।

ঙ.চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণ ভূমিকা– চারু বন্দ্যো, ডক্টর শহীদুল্লাহ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা-১৩৩৬ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাথ, নিরঞ্জন, নিরাকার, আদি, অনাদি শব্দগুলো একান্তই বৌদ্ধ প্রয়োগ। পরে এগুলো আল্লাহ্ অর্থে বহু প্রযুক্ত। বৌদ্ধ প্রভাবে সন্ত-সন্ন্যাসীরাও 'নিরঞ্জন' ও 'নাথ' ব্যবহার করেছেন। যেমন –

১. ওঁ অধো ন উধ্বংস শিরো ন শক্তিঃ
নারী ন পুরুষো ন চ লিঙ্গমূর্তিঃ।
হস্তং ন পাদং রূপং ন ছায়া
তস্মৈ নমস্তে নিরঞ্জনায় (ধর্মপূজাবিধান, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭৭-৭৮)

২. শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্র বিঘ্ন বিনাশন [শূন্যপুরাণ]।

৩. বাড়ি মোর বল্লুকায়/পূজি শ্রীনৈরাকার/শূন্যমূর্তি ধ্যান করি [ধর্মপূজাবিধান]

৪. শূন্যত ভরমণ প্রভুর শূন্যে করি ভর। [শূন্যপুরাণ]

৫. শূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিষাদ ভাবিয়া মতি। [ঐ]

৬. হস্ত পদ নাই প্রভু নাই কন্ধ মাথা
বটুল সমান হইলেন তিলোকের ধাতা
নৈরাকার মূর্তি হৈলেন প্রভু নিরঞ্জন। [অনাদ্যের পুঁথি : সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড]

৭. সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন/নৈরাকার নিরঞ্জন/নিত্যানন্দ/নির্গুণ নির্বাণ
[ঘনরাম : ধর্ম মঙ্গল : পীযূষ মহাপাত্র সম্পাদিত পৃ. ৩]

৮. সূর্যরূপে ধর্ম শূন্যমূর্তি :
মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্।
এক চক্রধরং দেবং ত্বং সূর্যং প্রণমাম্যহম্
[ধর্মপূজাবিধান, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত বাঃ সাঃ ই, পৃ. ২৪৮
[৩য় খণ্ড]

৯. 'শনিবার ব্রত করিবারে জান শ্রীধর্মদুয়ার'–এ শনিবার বৌদ্ধদের কাছে শুভদিন।

ধর্মপ্রতীক গোলাকার শিলা সূর্যপ্রতিম, পরে তা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে কূর্মাবতার প্রতীকরূপেও হয়তো কল্পনা করা হয়। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমানই যথার্থ বলে মনে হয়। তাঁর মতে, 'ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়' হবার কারণ—ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত (এক স্তূপ) হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল। (পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ প্রতীক) পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। (তাই) আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি।'[১] সহজ কথায় ধর্ম স্তূপ প্রতীকে এবং সেই প্রতীকের সঙ্গে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ-প্রতীকের সমন্বয়ে কূর্মাকৃতির ধর্মঠাকুর তৈরি। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ-বৈরোচন, রত্ন-সম্ভব, অক্ষোভ্য, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি ধর্মপন্থীদের কাছে, পঞ্চ (ইন্দ্রিয়?) দ্বারপালরূপে পঞ্চ পণ্ডিতের (শেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঁই) রূপকও হয়েছে। তবে ধর্মশিলা বিভিন্ন আকারের দেখা যায়। কাজেই সবটাই হয়তো পুরাণ-প্রভাবিত কল্পনা মাত্র। বলেছি, ব্রাহ্মণ পাঁচালীকারদের হাতে পড়ে ধর্মঠাকুর কখনো ব্রহ্ম, কখনো বিষ্ণু-নারায়ণ, কখনো বা শিব, কখনো বা নাথ-নিরঞ্জন হয়েছেন। এবং পৌরাণিক অন্যান্য দেবতাদের আদলে তাঁর মাহাত্ম্য ও কৃতি বর্ণিত হয়েছে। যেমন —

---

১. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'–'বৌদ্ধধর্ম এখনও আছে' নারায়ণ, মাঘ: ১৩২২ সন (অসিত বন্দ্যো: উদ্ধৃত : বাঃ সা ইতিবৃত্ত, ৩য় সং, পৃ. ২৪৮-৪৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. দেবের দেবতা তুমি পুরুষ পুরাতন
ভকতের প্রাণ তুমি জীবের জীবন। [অনাদ্যের পুথি, বিশ্বভারতী]
২. আদি অনাদি তুমি পুরুষ ব্রহ্ম [যদুনাথের ধর্মপুরাণ]
৩. ব্রহ্ম বিষ্ণুদেব/দেব-দেবী সব/তব অংশে উপাদান
মৎসাদি আকার/দশ অবতার/মূর্তি ভেদে ভগবান।
কভু নিরাকার/কখন আকার/নির্বিকার নারায়ণ [ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ ধর্মের এমনি দশ অবতার মানিক গাঙ্গুলীও স্বীকার করেন] ধর্মমঙ্গল, ড. বিজিত দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, পৃ. ১১]।
৪. এক ব্রহ্ম সনাতন/নিরাকার নিরঞ্জন [রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ.-৩]
৫. বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম/ অনাদি অনন্ত ধর্ম/বিশ্ববীজ অখিল আধান।
[ঘনরামের ধর্মমঙ্গল]
৬. এক ব্রহ্ম সনাতন/নৈরাকার নিরঞ্জন/নির্গুণ নিদান শূন্যভরে [ঐ]

এতে বোঝা যায় নিরাকার নিরঞ্জন ক্রমে ব্রাহ্মণ্যদেবতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। তখন স্থানে স্থানে মূর্তিভেদও (মানিক গাঙ্গুলী) হচ্ছে, সে সঙ্গে নাম আর গুণভেদও। তাই ধর্মঠাকুর-প্রতীক শিলার কোনো একক রূপ নেই। হিন্দু কবি হিন্দুর দেবতা রূপেই তাঁকে কল্পনা করেছেন, এ-ই স্বাভাবিক। এই রূপান্তরকে গুরুত্ব দেন বলেই এঁদের পাঁচালীতে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকারদের বিভ্রান্ত করে। আগেও বলেছি স্থান-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আচার-আচরণের মতো দেবমূর্তি আর দেবগুণও বদলায়। দুর্গোৎসবের মূর্তিগুলোর অবয়ব ও সজ্জাগত বিবর্তন স্মর্তব্য। এবং শিবের নানা বিরুদ্ধ গুণও সূত্রে স্মর্তব্য। আগেও তাই হত। ধর্মঠাকুরও তাই তুর্কী-মুঘল যুগে কেবল ব্রাহ্মণ কিংবা ফকিরবেশী নন, কখনো কখনো তুর্কী-মুঘল ঘোড়সওয়ারও। যেমন :

১. হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা
অবশেষে বোলাইল গোউড়ের রাজা। [রূপরামের ধর্মমঙ্গল]
২. হাতে নিল তীর কামঠা পায়ে দিয়া মোজা
গোউড়ে বলান গিয়া ধর্মমহারাজা। [ধর্মপূজাবিধান]

সবাই জানে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধবাণী নির্ভর থাকেনি, কালে লৌকিক ও স্থানিক সংস্কার প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম বিকৃতি পায়; ধর্মঠাকুরের নামে মোরগ, পায়রা, ছাগল ও শূকর বলি নিশ্চিতই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফল। তার ফলে বহু লৌকিক দেবতায়-উপদেবতায় ও অপদেবতায় বৌদ্ধচৈত্য আকীর্ণ হাতে থাকে। বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যসমাজে তথা হিন্দুসমাজেও সে-সব দেবতা রক্ষিত ও পূজিত হতে থাকে। শ্যামতারা, তারিতা, তারা, বৎসলা (বাসুলী), বিষালাক্ষী (জাঙ্গুলী), চণ্ডী, ষষ্ঠ অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ এবং বজ্রসত্ত্ব-বজ্রতারা, প্রজ্ঞা-উপায়, করুণা শূন্যতা প্রভৃতি হর-গৌরী, মায়া-ব্রহ্ম, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতির আবরণে টিকে থাকেন। এঁরা এখন লৌকিক-পৌরাণিক হিন্দুদেবতা, তাই বৌদ্ধপ্রভাবে ও বৌদ্ধসাহিত্য চিহ্নিত করা আপাত দুঃসাধ্য বলে মনে হয় বিদ্বানদের। বলিদান নিশ্চিতই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফল। অর্ধ বর্বর স্তরে যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল, অজ্ঞতার দরুন সর্ব বিষয়ে শাস্ত্রানুগত্য তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যেমন দেখি বাউলদের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ধর্মপন্থীরাও বাউলদের মতো তাদের শাস্ত্র-তত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ কিংবা লক্ষ্যের কোনো খবর দিতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই বলেছি, রাঢ়ের নির্জিত আদিবাসীরাই ধর্মঠাকুরের পূজারী। আঠারো শতকের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়ের[১] ধর্মপুরাণে ধর্মপন্থীদের তালিকা আছে। বলা বাগুল্য, তারা সবাই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বৃত্তিজীবী অস্পৃশ্য।

সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বলী
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি।
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকার
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর।
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি
মাঝি বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি।
স্বর্ণকার সুবর্ণ বণিক কর্মকার
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা।

ক্ষত্রিয় কিংবা বৈদ্য-কায়স্থ অথবা স্বর্ণকার প্রভৃতির বর্ণ আক্ষরিক অর্থে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। কারণ রামাই পণ্ডিত জানিয়েছেন 'ডোমেও ব্রাহ্মণ ভেদ আছএ নিশ্চয়'। ধর্মপন্থীদের গুরু-পুরোহিত পূজারীরা পণ্ডিত নামে অখ্যাত। এঁরা তাঁদের পৈতা, আঙটি ও বালা ধারণ করেন। সাধারণত পণ্ডিতেরা ডোম শ্রেণীভুক্ত। অন্য শ্রেণীর পণ্ডিত বিরল।

৩. শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান ও রামাই পণ্ডিত

মঙ্গল পাঁচালীর অন্যান্য দেবতা যেমন পৌরাণিক স্বীকৃতি ও আভিজাত্য পেয়ে বাঙালি হিন্দুর পূজ্য হয়ে রয়েছেন, ধর্মঠাকুরও তেমনি মঙ্গল পাঁচালীতে পৌরাণিক হিন্দু দেবতা হয়ে উঠেছেন। প্রত্যেক দেবতা সম্পর্কে দুই প্রকার গ্রন্থ থাকে, একটি মন্ত্র , পূজার দিন-ক্ষণ-তিথি পূজা পদ্ধতি ও উপচার সম্পর্কিত শাস্ত্রকথা, অপরটি মাহাত্ম্যকথা। ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নেই। বরং এক হিসেবে কিছু অনন্যতা আছে। যেমন ১. দেবতার ও সৃষ্টির উদ্ভব এবং পূজারী ও পূজার বিবিধ ইতিবৃত্ত সম্পর্কিত শূন্যপুরাণ, ২. একটি দেবতার পূজার বিস্তারিত নিয়মাবলী সম্বলিত তত্ত্বগ্রন্থ– ধর্মপূজাবিধান-এর নাম সাংজাত খণ্ড– দুটোই রামাই পণ্ডিতের নামে চলে। এবং ৩. ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা–এ কাহিনীর বরপুষ্ট মানুষ-নায়ক লাউসেন।

আদিতে বোধ হয় নদীর বুকে ধর্মের পূজা হত। তাই সাংজাত খণ্ড নাম হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে সাংযাত্রিক– জলযাত্রী। ধর্মপন্থীদের কাছে দুটো নদী পবিত্র, একটি বল্লুকা—বর্ধমানে, অপরটি চম্পা– বাঁকুড়ায়। বল্লুকা নদীর তীরই পূজার আদি স্থান।

যদিও রামাই পণ্ডিত যুগাবতার রূপে কীর্তিত, এবং সে কারণে অনেক লৌকিক কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে তাঁর বাস্তব ব্যক্তিত্ব হারিয়ে গেছে। [যেমন সব অবতারকল্প মানুষের বেলায় হয়ে থাকে], তবু রামাই পণ্ডিত মনে হয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হবার পর ব্রাহ্মণ্য দেবতার আদলে ও আবরণে ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য যিনি নতুন করে প্রচার করেন, তিনি যে রামাই পণ্ডিত, এতে সন্দেহ নেই। জিন মহাবীর যেমন তাঁর পূর্বেকার তেইশ

---

১. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা কালে এই রামচন্দ্রের ধর্মপুরাণকেই ময়ূর ভট্টের রচনা বলে মনে করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন তীর্থঙ্কর স্বীকার করেছেন, গৌতম বুদ্ধ যেমন তাঁর পূর্বেকার বোধিসত্ত্বের কথা বলেছেন, তেমনি লোকগ্রাহ্য করবার জন্যে রামাই পণ্ডিতও তাঁর আগে তিন যুগে তিন জন ধর্মপূজা প্রবর্তক যুগাবতার স্বীকার করেছেন, এঁরা হচ্ছেন—সত্যযুগের শেতাই, ত্রেতাযুগের নীলাই, দ্বাপরের কংসাই। এবং মেহদীর মতো তাঁর পরেও একজন অবতার পণ্ডিত আসবেন, তাঁর নাম হবে গোঁসাই।

রামাই পণ্ডিতের এক সন্তানের কথাও শোনা যায়। তাঁর নাম কোথাও ধর্মদাস, আবার কোথাও বা শ্রীধর (অনাদ্যের পুথি)। এই পুত্র ধর্মপূজা প্রচারক, তাঁর সম্বন্ধেও রয়েছে নানা বানানো কাহিনী। অনাদ্যের পুথিতে তিনি গৌড়ের যবন রাজা অর্থাৎ সুলতান কর্তৃক নিহত হন বলে উল্লেখ রয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই রামাই পণ্ডিতের জীবৎকাল নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন নানা ঐতিহাসিক সূত্রের বিচার বিশ্লেষণ করে। যেমন ধর্ম সাহিত্যে প্রাপ্ত একটি সূত্র হচ্ছে ধর্মপাল রাজার পুত্রের রাজত্বকালে তাঁর শ্যালিকা পুত্র ছিলেন ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন। এ সূত্রে সবাই লাউসেন তথা রামাই পণ্ডিতকে দশ শতকের লোক বলে মানেন। সেখানে সমকালীন রাজার নাম অজানা এবং যে রাজা বাপের নামে চলেন, তার অস্তিত্ব যে কাল্পনিক তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এ কাহিনী দেবপালের আমলে ঘটেনি। 'ধর্মপাল' অনেকটা ভোজরাজার কিংবা বিক্রমাদিত্য রাজার মতো উপকথার উৎস হিসেবে উল্লিখিত।

তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, পালরাজ রামপালের পরে যক্ষপাল রাজা হলে তাঁকে তাড়িয়ে লবসেন রাজা হন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ তথ্যে আস্থা রেখে এবং লবসেনকে লাউসেন রূপে গ্রহণ করে রামাই পণ্ডিতকে বারো শতকের লোক বলে স্থির করেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে রামাই নয় শতকে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চৌদ্দ শতকে, এবং অনাদ্যের পুঁথি সূত্রেও চৌদ্দ শতকে রামাই পণ্ডিত আবির্ভূত। অতএব বিদ্বানদের মতে রামাই পণ্ডিত নয় থেকে চৌদ্দ শতকে অর্থাৎ প্রায় ছয়শ বছরের সময় পরিসরে যে-কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সবটাই যখন অনুমান তখন আমরাও একটি অনুমান করছি। আমাদের মনে হয়, সেন আমলে ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রথা মাহাত্ম্যকথা প্রকাশ্যে প্রচার সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। আর পাল আমলে যদি রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটত তা হলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ঠাঁই হত না তাঁর শাস্ত্রে। অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রামাই পণ্ডিত তেরো শতকেই ধর্মপূজা পদ্ধতি প্রচার করেন। তখন বিদেশীর রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী ও সমাজপতির ভয়মুক্ত হয়ে দেশের গণমানবেরা যেমন স্ব স্ব লৌকিক দেবতার প্রকাশ্য পূজায় ও মাহাত্ম্যকথা প্রচারে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তেমনি রামাই পণ্ডিতও তখন ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করে স্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে পূর্বপুরুষের ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সব মঙ্গল পাঁচালীকার গায়েনের লক্ষ্য ছিল স্ব স্ব দেবতাকে পৌরাণিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেয়া। তাই ব্রাহ্মণ্য পুরাণের এতো অসঙ্গত ও অসংলগ্ন সংযোজন ও মিশ্রণ। অন্যান্য মহাপুরুষ-সিদ্ধপুরুষের মতো রামাই পণ্ডিতও হয়তো মুখের শাস্ত্রকথা উচ্চারণ করেছিলেন, ভক্ত-সমাজে তা শ্রুতি স্মৃতির আকারে চালু ছিল, পরে ষোল শতকের দিকে তা লিপিবদ্ধ হয়; শ্রুতি-স্মৃতি প্রসূত কথা কখনো অবিকৃত থাকে না, তথ্যে ও কলেবরে বিকৃত ও পল্লবিত হয়। কাজেই রামাই পণ্ডিতের ভাষা শূন্যপুরাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ধর্মপূজাবিধানে চিহ্নিত করা যাবে না। উক্ত দুই গ্রন্থে বহু মনের ছায়া ও হাতের ছাপ পড়েছে। আদি ময়ূর ভট্টের নাম আছে, তাঁর রচনা নেই। এক অর্বাচীন ময়ূর ভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' পণ্ডিতজনের কবিত্বময় ও তত্ত্বপূর্ণ সুন্দর রচনা। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এ দুটো ছাড়াও যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' ও অজ্ঞাত নাম কবির 'অনাদ্যের পুথি' বিশ্বভারতীর সাহিত্য প্রকাশিকায় মুদ্রিত হয়েছে। সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ'ও এ সূত্রে উল্লেখ্য।

রামাই পণ্ডিত ডোমবংশীয় পণ্ডিত। শূন্যপুরাণের গ্রন্থোক্ত নাম 'আগম পুরাণ'। শূন্যপুরাণ সম্পাদক-প্রদত্ত নাম। আগেই বলেছি, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা গ্রহণ ও সমন্বয় মাধ্যমে হিন্দু পুরাণের সঙ্গে আপোস করে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হয়েছিল। শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, ধর্মপুরাণে ও অনাদ্যের পাঁচালীতে কিংবা ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন তত্ত্বে দেবস্তুতিতে ও রঘুনন্দনের দোহাইতে সেই আপোসের নিদর্শন প্রকট। মনে রাখা প্রয়োজন এসব শাস্ত্র ও মাহাত্ম্য গ্রন্থ সমাজের নিরক্ষর-নিঃস্ব নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি তাই এখানে জীবনোপকরণ ও সংস্কৃতি নিম্নতম স্তরের।

শূন্যপুরাণে তথা আগমপুরাণে প্রথম বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিপত্তন, তারপরে রয়েছে জল পাবন, টীকা পাবন, পুষ্প তোলন, দ্বার মোচন প্রভৃতি উনপঞ্চাশটি শীর্ষনামে বিভিন্ন কৃত্য আচারাদির পদ্ধতির বর্ণনা। এখানেও আমরা দেশজ লৌকিক চাষী শিবের সাক্ষাৎ পাই :

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুমি চষ চাষ
ভিক্ষায়, কখন অন্ন হয় গোসাঞি কখন উপবাস।
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘের ছড়।
তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলি তব পাএ
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ।

৪. বড় জালালী ও ছোট জালালী : নিরঞ্জনের রুস্মা

ধর্মপূজাবিধানের প্রথমাংশে পূজার বিষয় এবং বৃহত্তর দ্বিতীয়াংশে ধর্মের অর্চনা, ব্রত নিয়ম, উপচার প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত। শূন্যপুরাণে ও ধর্মপূজা বিধানে 'নিরঞ্জনের রুস্মা' বা বড় জালালী কলিমা এবং শোষোক্ত গ্রন্থে ছোট জালালী রয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে এগুলোর। আমরা এগুলো থেকে প্রসারমান প্রবল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি বিলুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ সমাজের ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বিদ্বেষের তীব্রতা অনুভব করতে পারি। ব্রাহ্মণ্যসমাজের ঘৃণা এবং পীড়নশ্লিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সামর্থ্য হারিয়েছে তখন। বিপন্নঅস্তিত্ব বৌদ্ধেরা তাই তুর্কী বিজয়কে ধর্মের তথা তথাগতের আশীর্বাদরূপে জেনে হিন্দুর পরাজয়ে ও দুর্দশায় উল্লাস বোধ করে এবং পরোক্ষ প্রতিশোধবাঞ্ছা চরিতার্থ করে। ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে মুঘল পতনে বাঙালি হিন্দুর তেমনি উল্লাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকি জালালী কলিমার অনুকরণে কবিতাও রচিত হয়েছিল :

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হৈলা সাহেব রূপী
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরানা কুঠী আদি
গতামল সুবেদারী শুভ সন বাহাত্তরী।
আংরেজ আমল তদবধি।
[সুকুমার সেন উদ্ধৃত বাঃ সাঃ ইঃ পৃ. ১১৩;
রামপ্রসাদ শর্মা বিরচিত দ্বার সায়রের কবিতা]

১১৭২ বঙ্গাব্দে তথা ১৭৬৪-৬৫ সনে মীর কাসিমের পতনে কোম্পানি রাজত্বের শুরু হওয়ার কথাই এখানে উক্ত হয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ উনিশ শতকের লিখিয়েদের ব্রিটিশপ্রীতি স্মর্তব্য। নির্জিত ব্যক্তির বা জাতির মনোভাব এমনই হয়। তেরো-চৌদ্দ শতকেও নির্জিত বৌদ্ধদের সেই একই মনোভাব কাজ করেছে তুর্কীবিজয় কালে। পরকে ডেকে ঘরের শত্রুকে (আত্মীয় হলেও) জব্দ করার নীতি দুর্বল মানুষে নতুন নয়। নিরঞ্জনের উস্মা বা রুস্মা :

জাজপুর পুরবেদী ষোল শঅ ঘর বেদী
বেদি লএ কন্নএ নগুণ
দক্ষিণা মাগিতে যাএ যার ঘরে নাহি পাএ
শাপ দিয়া পোড়াএ ভুবন।
মালদহে লাগে কর চিনে আপন পর
জালের নহিক দিশপাশ
বলিষ্ঠ হইআ বড় দশ বিশ হৈয়া জড়
সদ্ধমীরে করএ বিনাশ
বেদে করি উচ্চারণ বেরাজ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভায় কম্পমান
মনেত পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ।
এই রূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার
অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হৈল খোন্দকার [অন্ধকার]।
ধর্ম হৈয়া যবনরূপী শিরে ধরি কাল টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদাএ বলিয়া এক নাম।
[নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্‌মাদার[১]
যথেক দেবতাগণ সভে হৈয়া একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার

১. শাহ্ বদিউদ্দীন মাদার ১৪৩৪ কিংবা ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ১২৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন বলে কথিত। তিনি মাদারিয়া খান্দানের প্রবর্তক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মা হৈলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম হইল শূলপাণি
গণেশ হৈলা কাজী কার্তিক হৈলা গাজী
ফকির হৈলা যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হৈলা শেক
পুরন্দর হৈলা মলনা
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হৈয়া সেবে
সভে মিলে বাজাএ বাজনা।
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহঁ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মা হৈলা বিবি নূর
যথেক দেবতাগণ হৈয়া সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙে ক্যাড়া কিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় আল্লা (বোলে) বোল
সেবিয়া ধর্মের পাএ রামাই পণ্ডিত গাএ
ই বড় বিষম গণ্ডগোল।

তুর্কীদের উড়িষ্যা (জাজপুর) বিজয়কালীন চিত্র এখানে দেয়া হয়েছে। এখানে যে চিত্র পাই তাতে তুর্কীদের সঙ্গে তথা মুসলিম সমাজের সঙ্গে সদ্য এবং স্বল্প পরিচয়ের ছাপ রয়েছে। এ জন্যে মনে হয় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যেকার রচনা পরবর্তী যোজনা। এটি চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে ফিরোজ শাহ তুঘলকের উড়িষ্যা-অভিযান চিত্র বলে মনে হয় না। তেরো শতকের প্রথম পাদের কোনো যুদ্ধের ইঙ্গিত রয়েছে বলে অনুমান করি। কারণ তুর্কীবিজয়ের দেড়শ বছর পরে চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে 'নিরঞ্জনের রুস্মা' লেখার কারণ ও পরিবেশ কোনটাই ছিল না। উল্লেখ্য যে, রামাই স্বয়ং জাজপুরবাসী—'ধর্মের চরণে রামাই পণ্ডিত ভণে.... জাজপুরে যাহার বসতি' [সুকুমার সেন ১ম খণ্ড অপরার্ধ পাদটীকা পৃ. ১৪০]

পূর্বোক্ত যুদ্ধকালীন সেই বিষম গণ্ডগোলের চিত্র এরূপ :

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন
সাম্বাইলে জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গো হাড়ের ঘাএ
হাতে পুথি কর্যা কত দেয়াসি পালাএ।
ভালের তিলক যত পুছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।
ধর্মের গাজনে ভাই উড়িছে বলকা
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতাকা।
সেইতো নগরে দ্বিজ পাশাসিংহ নাম
বেদেতে প্রতাপ অতি রূপে অনুপাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনিয়া ত ধর্মরাজ কুপিল অন্তরে
সম্বাইল পাশা ছলে তাহান্দিরেমর।

এখানে লক্ষণীয় যে তুর্কীযোদ্ধারা ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করছে ও মন্দির-মূর্তি ভাঙছে। জাতিবৈর অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কেবল 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' অন্য প্রজার উপর এমনকি যুদ্ধকালেও (এখানে সদ্ধর্মীদের উপর) কোনো জুলুমের কথা নেই। কেবল সৈন্যরা 'ক্যাড়া-কিড়্যা খাএ' মাত্র। ব্রাহ্মণের উপর পীড়ন হচ্ছে, মন্দির ধ্বংস হচ্ছে আর নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত সদ্ধর্মী তা প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করছে। এ সূত্রে 'পলাশীর যুদ্ধ' স্মর্তব্য। এ হচ্ছে অক্ষম প্রতিহিংসাপরায়ণের বর্ণনা।

ছোট 'জালালীতে' রয়েছে বিজেতার ধর্মমত বুঝবার চেষ্টা। এই বিজাতি বিধর্মী শাসকদেরও তাদের দেশজ স্বধর্মীর সঙ্গে সহাবস্থানের জন্যেই তা প্রয়োজন। শেক শুভোদয়া, মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেন পালা, মুকুন্দরামের গুজরাটে মুসলিম বসতি ও ছোট জালালী, পীর-পাঁচালী প্রভৃতি একই উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে রচিত। ছোট জালালীতে মুসলিম সমাজের সঙ্গে আপোস করবার মনোভাব রয়েছে। কলিমা জালালী শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠের নির্দেশ রয়েছে : 'হংস অথবা কবুতরং নিত্বা পশ্চিমাভিমুখং কিত্বা পঠেৎ। হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ। মুসলিম পূজন্তি খোদায়। চারিবেদে পঞ্চমবেদ সে হৈল কাজী মলনা রে আল্লা। বুক কুড়িকুড়ি হয়রানে হিন্দু হিন্দু মারি গিয়া পুত।'– ইত্যাদি। আবার প্রথম দিকে রামাই পণ্ডিতের পীড়ক ছিল হিন্দু গৌড়ের হিন্দু রাজা [যম ধর্মরাজা 'ধরে নিল হিন্দুর ভূত] সতেরো -আঠারো শতকে আত্মবিস্মৃত ও হিন্দু সমাজ-ভুক্ত কবি [অনাদ্যের পুথি] আর হিন্দুবিদ্বেষী নেই। তাই তখন যবন সুলতানই রামাই পণ্ডিতের পুত্রের পীড়ক ও হন্তা বলে বর্ণিত। এমনি পরিবর্তন উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি হিন্দুরও হয়েছিল, তখন তারা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী।

AMARBOI.COM

৫. শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব

শূন্যপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন সংক্ষেপে এরূপ :

প্রথমে কিছুই ছিল না, কেবল অনাদি প্রভু ছিলেন 'শূন্যের ভরমণ প্রভুর শূন্যে করি ভয়।' এবং 'কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর।' তারপর 'অনিল' দুইজন সৃষ্টি করে 'বিম্ব' বা বুদবুদের উপর আসন করলেন, তারপর 'আপনি সৃজিলেন প্রভু আপনার কায়া।' প্রভুর দেহ থেকে জন্মালেন নিরঞ্জন ধর্ম।' তাঁর 'হাই' থেকে জন্মালেন উল্লুক পক্ষী। উল্লুকের পৃষ্ঠে বসলেন ধর্ম। উল্লুক ক্লান্ত হলে ধর্ম তাকে মুখামৃত দিলেন, অমৃতের কিছু শূন্যে পড়ল, তা থেকে হল জল। জলে ভাসল উল্লুক, উল্লুকের পাখা খসে পড়ল জলে, তা থেকে হল পরমহংস। ধর্ম হাঁসের পিঠে চাপলেন। বহু বহু যুগ পরে ক্লান্ত হাঁস উড়ে পালাল। জল হল উর্মিমুখর। শান্ত করবার জন্য ধর্ম জলে হাত দিলেন, তাতেই কূর্মের উদ্ভব। এবং কূর্মের পিঠে ভর করলেন ধর্ম। উল্লুক ধর্মকে ছায়া দিয়ে পাশে থাকল। এক সময় ভার অসহ্য হলে কূর্মও পালাল। এবার উল্লুকের পরামর্শে [জলের উপরে করু সিষ্টির সাজন] ধর্ম মন দিলেন সৃষ্টি কার্যে। প্রথমেই নিজের কনক পৈতা ছিঁড়ে জলে ফেললেন, তাতেই জন্মাল সহস্রফণা বাসুকী। ক্ষুধার্ত বাসুকী আহার খোঁজে, ভীত ধর্ম কানের কুণ্ডল জলে ছুঁড়লেন– তাতে জন্মাল ভেক। তৃপ্ত বাসুকী ধর্মের মাথায় ফণার ছত্র ধরে থাকল। এবার ধর্ম নিজের হাতে তাঁর গলার ময়লাগুলো রাখলেন বাসুকীর মাথায়, তাতেই তৈরি হল নবদ্বীপ পৃথিবী। ধর্ম ও উল্লুক পৃথিবী ঘুরে দেখতে লাগলেন, তাতে ঘর্মাক্ত হলেন পরিশ্রান্ত ধর্ম। তাঁর ঘর্ম বিন্দু থেকে আদ্যাশক্তিরূপিণী নারীর উদ্ভব হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম এ সময়ে বল্লুকা নদীও সৃষ্টি করলেন। নদীতীরে ধর্ম প্রজা সৃষ্টির মানসে চৌদ্দযুগ ধরে রইলেন ধ্যানে। এদিকে আদ্যাশক্তি হলেন যৌবনবতী। তাঁর যৌবন-চেতনা থেকে জন্মাল কাম। উল্লুক কামদেবকে লুকিয়ে রাখল। এতেই বল্লুকায় কালকূট বিষের উদ্ভব। ধ্যান শেষে ধর্ম আদ্যাশক্তির কাছে বিষ ও মধু রেখে বের হলেন তাঁর বরের সন্ধানে। এদিকে যৌবন-যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় আদ্যা বিষ পান করলেন, তাতে মৃত্যুর বদলে তার গর্ভসঞ্চার হল। যথাকালে তিনি প্রসব করলেন তিন সন্তান– ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে। তিনজনই তখন অন্ধ। জন্মমাত্র তিনজনই তপস্যায় বসলেন বল্লুকা তীরে। ধর্ম তাঁদের পরীক্ষা করবার জন্যে গলিত শবরূপে ভেসে চললেন তাঁদের সমুখ দিয়ে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু তিন অঞ্জলি জল দিয়ে দুর্গন্ধ শবকে দ্রুত দূরে ভাসালেন। শিব কিন্তু বুঝলেন কোথাও যখন মরবার মতো কেউ নেই, তখন এ নিশ্চিত শ্রীধর্মনিরঞ্জনের ছলনা। তাই শিব দুর্গন্ধ শব তুলে নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। ধর্মের ইচ্ছাক্রমে শিবের মুখামৃতে তিনজনেরই ঘুচল অন্ধত্ব। এ হচ্ছে আসলে জ্ঞানচক্ষু।

তারপর ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের এবং শিবকে সংহারের ভার দেয়া হল। আদ্যাশক্তির প্রার্থনাক্রমে শ্রীধর্মনিরঞ্জন তাঁকে বর দিলেন :

আদ্যাশক্তি বোলে পরভু মায়াধর
কেমনে করিব সৃষ্টি সংসার ভিতর।
অযোনি সম্ভবা ভোগ নাহিক আক্ষার
কেমন উপায় করি কহ করতার
মহাপরভু বোলে শুন আক্ষার বচন
যেরূপে করিব তুহ্মি সৃষ্টির সৃজন
যোনিরূপা হএ তুহ্মি সর্বজীবে রবে
মানুষ আদি জীবজন্তু গর্ভেত জন্মিবে।

ইনি আদি প্রকৃতিস্বরূপা আদ্যাশক্তি। কয়েকবার ইচ্ছামৃত্যু হয়ে ইনিই শিবপত্নী হলেন। ধর্মপূজাবিধানের সৃষ্টিপত্তনে দশ অবতারের নাম আছে এবং সৃষ্টিতত্ত্বে কিছু কিছু পার্থক্যও রয়েছে। মানিক গাঙ্গুলী বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন মোটামুটি শূন্যপুরাণের মতো। ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনে পুরাণের প্রভাব পড়েছে। নাথসাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনের সঙ্গে শূন্যপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনের মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অনাদিনাথ বা অলক্ষ্যনাথ ও ধর্মনিরঞ্জন এবং আদ্যাশক্তি ও কাকেতুকা অভিন্ন।

৬. ধর্মমঙ্গল উপাখ্যান

আগেই বলেছি ধর্ম-সাহিত্য একান্তভাবেই রাঢ় অঞ্চলের। ধর্মমঙ্গল কাহিনী নানা কারণে বিশিষ্ট ও অনন্য। প্রথম, এখানে প্রতিষ্ঠিত তথা স্বীকৃত দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থি শিথিল বলে এ পাঁচালীতে সমাজের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষের কথা আছে। এখানে রাজসভার ও সরকারের রাজনীতি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও আনুগত্য, খলতা-শঠতা ও সত্যসন্ধিৎসা, জুলুম ও ন্যায়-পরায়ণতা, ভীরুতা ও বীরত্ব, হিংসা ও প্রীতি, সংগ্রাম ও সাধনা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়, ভক্তি ও ঔদ্ধত্য প্রভৃতি সব রকমের গুণাগুণবিশিষ্ট প্রতীক চরিত্রও রয়েছে। তৃতীয়ত, এক বিশেষ কালের বিস্তৃত পটে জীবনে, জীবিকার, সমাজের ও সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক ও সামষ্টিক চিত্র মেলে ধর্মমঙ্গলে। এ জন্যে ডক্টর সুকুমার সেন 'ধর্মমঙ্গল' পাঁচালীকে রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) বলে অভিহিত করেছেন। লোভে-ক্ষোভে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহে-অসূয়ায়, বীরত্বে-ভীরুতায়, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-যন্ত্রণায়, জয়ে-পরাজয়ে, ত্যাগে-তিতিক্ষায় এখানে মাটির মানুষ প্রায় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'ধর্মমঙ্গল' কাহিনীতে বিদ্বানেরা ইতিহাস খোঁজেন। এখানে ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে বিড়ম্বিত হতে হয়। তবু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন রামপালের সমসময়ে লবসেন বলে কোনো এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রামপালের পরবর্তী যক্ষপাল নামের কোনো এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে রাজাকে তাড়িয়ে রাজা হন। তারনাথের ইতিহাসই তাঁর তথ্যের উৎস। লবসেন বা যক্ষপাল বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে তাঁরা সামন্ত-স্বাধীন শাসক নন। পঞ্জিকা-উক্ত আদিশূরের মতোই লাউসেনও কোনো জনপ্রিয় রাজা অথবা ধর্ম পাঁচালীর নায়ক হিসেবেই লাউসেন বাস্তব ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ওখেলো-রোহিণী-শ্রীকান্ত যেমন। আগেই বলেছি, যাঁর দরবারের ঘটনা বা যাঁর শাসনকালে ঘটনা ঘটেছে সেই রাজার নামই কাহিনীকারদের অজানা—তিনি ধর্মপালের পুত্রমাত্র। —এতেই বোঝা যায় উপাখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্যেই ভোজরাজা বিক্রমাদিত্য রাজার মতো প্রখ্যাত 'ধর্মপাল' রাজার নাম উচ্চারিত কিংবা ধর্মপূজারীদের কাছে এই নাম 'ধর্ম' প্রতীক। ঢেকুরগড়, কর্ণগড়, ময়নানগর প্রভৃতি বাস্তব নাম থেকেও গৃহীত হতে পারে, তাতে উপাখ্যান ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে না। আজকালকার গল্পে-উপন্যাসে নাটকে শহরে রাস্তা-গলি ও বাড়ির নাম নম্বর থাকে, কিংবা বাস্তব গাঁ-গঞ্জের নামও মেলে। তাই বলে তাতে বাস্তব জীবন ও মানুষ খুঁজলে বিড়ম্বিত হতে হবে। তবু ইছাই ঘোষ যদি ঈশ্বর ঘোষ হন, তাঁর পিতা ধবল ঘোষ যদি আলঙ্কারিক প্রয়োগে সোম ঘোষ হন, এবং রামগঞ্জের তাম্রশাসনে দেয়া বংশ তালিকা যদি তাঁরই হয়, তাহলেও ঢেকুরের ঈশ্বর ঘোষ তাঁর তাম্রশাসনের লিপির প্রমাণে বারো শতকের অগোকার নন। বারো শতকে রাঢ় অঞ্চল কি পাল শাসনে ছিল? অতএব ইতিহাস সন্ধান বৃথা।

ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যানের কাঠামোটি এরূপ :

গৌড়ের রাজার মহাপাত্র ছিল, তাঁরই শ্যালক মহামদ। সোম ঘোষ নামের এক গোয়ালা রাজকর দিতে না পারায় মহামদের চক্রান্তে বন্দী ছিল। রাজা একদিন মৃগয়ায় যাবার পথে তাকে দেখে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে তাকে ত্রিষষ্ঠীরা গড়ের শাসনকর্তা করে দিলেন। কর্ণসেন ছিল পূর্বেই ত্রিষষ্ঠীতে রাজকর্মচারী। সে সোম ঘোষের কর্তৃত্বে কাজ করতে থাকে। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ প্রবল প্রতাপ হয়ে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করল। কর্ণসেন গৌড়ে আশ্রিত হল। এদিকে ঢেকুরে গড় নির্মাণ করে স্বাধীন হয়ে গেল ইছাই। গৌড়েশ্বর তাকে দমানোর জন্যে নয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ঢেকুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তাঁর সৈন্য ভেসে যায় এবং কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়; ফলে ছয় বধূ সহমরণ বরণ করল। শোকে কর্ণসেন পত্নীও আত্মহত্যা করল, কর্ণসেন শোকে-দুঃখে মূহ্যমান হয়ে গেল। রাজা কর্ণসেনকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন এবং নিজের কিশোরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ে দিলেন তার সঙ্গে ভাই মহামদের অমতেই। বিয়ের পর কর্ণসেন ময়নানগরে সামন্ত নিযুক্ত হয়ে সেখানে সস্ত্রীক বাস করতে লাগল। মহামদের কামরূপ অভিযান কালেই রঞ্জাবতীর বিয়ে হয়, বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ করল। বিনা নিমন্ত্রণেই একবার কর্ণসেন রঞ্জাবতীর অনুরোধে গৌড়ে আসল, ক্রুদ্ধ মহামদ 'আটকুড়ে' বলে বোন-ভগ্নীপতির নিন্দা করল 'বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আঁটকুড়া; অপমানিত বোন সন্তান লাভের জন্যে তুক-তাক ও ঔষধের আশ্রয় নিল। অবশেষে ধর্মঠাকুরের পূজারী রামাই পণ্ডিতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদেশে সে ধর্মঠাকুরের কৃপা প্রত্যাশী হয়ে শালে ভর [লোহার শলা শ্রেণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া] করার ব্রত গ্রহণ করল। যথাসময়ে চম্পানদীর তীরে পূজা শেষ করে রঞ্জাবতী 'শালে ভর' করল এবং মারা গেল, 'বুকে পেটে ফুটে শাল পিঠে হল ফার/ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্ত ধার'। ধর্মঠাকুর তাঁর নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রাণ দান করে পুত্র বর দিলেন। যথাকালে পুত্র হলে তার নাম রাখা হল লাউসেন। তার খেলার সাথী হিসেবে ধর্মঠাকুর আর এক শিশু দিলেন, নাম কর্পূর সেন। যথাসময়ে লাউসেন কর্পূর সেন দুই ভাই যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠল। গৌড়ের পথে লাউসেন নরখাদক বাঘ ও কুমীর হত্যা করে জীবনের প্রথম বীরত্ব কীর্তি অর্জন করল, পথে ভ্রষ্টা নারী জামত তাকে প্রলুব্ধ এবং নারীরাজ্য গোলাহাটের রাণী তাকে হেঁয়ালী প্রশ্নে জব্দ ও বন্দী করতে চাইল, কিন্তু জয়ী হল লাউসেন। এদিকে গৌড়ে মামা মহামদ লাউসেনকে জব্দ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। গৌড়ে পৌঁছে লাউসেন এক গাছতলায় রাত্রিযাপন করছিল, মহামদের নির্দেশে এক রাজহস্তী এনে সেখানে রাখা হল, আর প্রাতে লাউসেনকে হাতীচোর বলে বন্দী করে হাজির করা হল রাজদরবারে। অপরিচিত মেসো রাজার কাছে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সমর্থ হল এবং রাজা তাকে অশ্ব উপহার দিয়ে তার হৃতমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। স্বদেশ ময়নানগরে ফিরবার কালে নয়জন ডোম যোদ্ধা নিয়ে গেল লাউসেন, এদের প্রধান হচ্ছে কালু। সেই হল ময়না নগরের সেনাপতি। তার স্ত্রীর নাম লখাই বা লক্ষী। মহামদের কুপরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে কামরূপের বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করবার নির্দেশ দিলেন। ভরা জলের ব্রহ্মপুত্র নদ পার হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। কাজেই দুঃসাধ্য ছিল যুদ্ধ করা। কিন্তু গৌড়ের রাজমাতা প্রদত্ত মন্ত্রপুত কাটারির ও জপমালার সাহায্যে অসম্ভবও হল সম্ভব ও সহজ। কাটারির স্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকাল, এবং জপমালার প্রভাবে কামরূপ অধিকার করা হল সহজ। বিজয়ী লাউসেন ফিরবার পথে কামরূপ রাজকন্যা কলিঙ্গাকে, মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলাকে এবং বর্ধমান রাজকন্য বিমলাকে পত্নীরূপে লাভ করে গৌড়ে পৌঁছল সগৌরবে ও সগর্বে।

সিমুলার রাজা হরিপালের রূপসী কন্যা কানড়াকে বিয়ে করতে চাইলেন গৌড়রাজ। অনিচ্ছুক কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটা লোহার গণ্ডার দেখিয়ে বলল যদি রাজা এক আঘাতে ঐ গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করতে পারেন, তাহলেই তিনি বরমাল্য পাবেন। বৃদ্ধরাজা ব্যর্থ হলেন, মহামদের চক্রান্তে রাজা লাউসেনকে নির্দেশ দিলেন তাঁর হয়ে গণ্ডার কাটার জন্যে। লাউসেন সহজেই সফল হল। কানাড়া তার অঙ্গীকার মতো লাউসেনকেই বরণ করল স্বামীরূপে, তাতে গৌড়েশ্বর অপ্রসন্ন হলেন তার ওপর।

মহামদ তার ষড়যন্ত্রে বার বার ব্যর্থ হয়েও ধৈর্য হারায়নি। এবার সে রাজাকে পরামর্শ দিল দুর্দান্ত বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষকে উৎখাত করবার জন্যে লাউসেনকে পাঠাতে। রাজাদেশে লাউসেন গেল ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ঢেকুরে। অজয় নদীর তীরে ইছাই ঘোষের বীর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের (লৌহ বজ্র) সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হল লাউসেনের। বিজয়ী লাউসেন লোহাটা বজ্জরের ছিন্ন মস্তক পাঠাল গৌড়েশ্বরের কাছে। দুষ্ট মহামদ সেটাকে লাউসেনের মায়ামস্তকে রূপান্তরিত করে পাঠাল কর্ণসেন রঞ্জাবতীর কাছে ময়নানগরে। পুত্রের ছিন্ন মস্তক দেখে পিতামাতা শোকাকুল হল। আর লাউসেন পত্নীরা তৈরি হল সহমরণের জন্যে। এমন সর্বনাশকর অবস্থায় ধর্মঠাকুর হনুমানকে ছদ্মবেশী সংবাদবাহক করে পাঠালেন ময়নানগরে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দেয়ার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে ধর্মঠাকুরের বরপুষ্ট লাউসেনের যুদ্ধ চলছে পার্বতীর প্রিয় ইছাই ঘোষের সঙ্গে। অবস্থাটা যেন ' কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। অবশেষে লাউসেনেরই হল জয়। ইছাই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও নিহত হল।

মহামদ বুঝল ধর্মঠাকুরের কৃপাপুষ্ট বলেই লাউসেন বিপন্মুক্ত ও অজেয়, তাই সেও ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহ লাভের প্রয়াসী হল ধর্মপূজা করে, কিন্তু শঠের পূজা গ্রহণ করতে ধর্মঠাকুর নারাজ। তাই তিনি অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করাতে লাগলেন গৌড়ে। বন্যায় গৌড় ডুবে যাচ্ছিল। তখন বিপন্ন গৌড়েশ্বর লাউসেনের সাহায্য চাইলেন। লাউসেন এবার দুষ্কর সাধনার সংকল্প গ্রহণ করল; ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে পুবের সূর্যের পশ্চিমে উদয় ঘটানোর অঙ্গীকারে। হাকন্দে লাউসেন যখন হাকন্দ ব্রতোদ্‌যাপনে নিরত, তখন মহামদ ময়নানগরের সেনাপতি কালুডোমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ময়নানগর দখল করতে গেল। লখাই, তার পুত্র, লখাইর অনুরোধে অবশেষে কালুও যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হল, তারপর রাণী কলিঙ্গা যুদ্ধে নামল ও মরল। অবশেষে রাণী কানড়া ও ধমনী মহামদকে পরাজিত করে নগর রক্ষা করল।

এদিকে লাউসেন নানাভাবে হাকান্দ (হাকন্দ বা আহ্বন্দ অর্থে) তপস্যা করেও সিদ্ধির আভাস পেল না, অবশেষে সামুলার পরামর্শে নিজের মাথা কেটে অগ্নিতে আহুতি দিল। এবার ধর্মঠাকুর প্রসন্ন হয়ে লাউসেনকে জিতিয়ে দিল ও অমাবস্যার রাতে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটালেন। গৌড়ের দুঃখ বিপদ কাটল। মহামদের কুষ্ঠ হল, পরে ক্ষমাও পেল। কালু-কলিঙ্গা প্রভৃতি ধর্মের কৃপায় আবার জীবন পেল। পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়ে লাউসেন যথাকালে স্বর্গে গেল। [বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যানে ছোটখাট পার্থক্য অনেক]

আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গলপাঁচালীর চেয়ে ধর্মমঙ্গল পাঁচালীর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। তার প্রমাণ মনসামঙ্গল ও কালিকামঙ্গল ব্যতীত এত কবির সাধনা আর কোনো মঙ্গলকাব্য রচনায় নিয়োজিত হয়নি। তাছাড়া মনসামঙ্গল কালিকামঙ্গল রচনা করেছেন বিভিন্ন কালের ও অঞ্চলের কবি, 'ধর্মমঙ্গল' রচিত হয়েছে কেবল একটি সীমিত এলাকায়। আবার 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেছেন অব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাই। এই অনন্যতাও গুরুত্বপূর্ণ। তা হলে ধর্মঠাকুরই এক মাত্র দেবতা, যাতে সর্বশ্রেণীর সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। তাছাড়া আগেই বলেছি, বিস্তৃত পটে সর্বস্তরের সর্বপ্রকার চরিত্রের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে কাহিনীতে। রাজদরবার থেকে পর্ণকুটির অবধি কিছু বাদ যায়নি, রাজা ও ডোম এখানে সমান গুরুত্বে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, হিংসা-প্রতিহিংসা, ক্ষমা-তিতিক্ষা, বীরত্ব-ভীরুতা, শঠতা-ছলনা, প্রেম-প্রতারণা, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য প্রভৃতি ঘরে-ঘাটে দরবারে জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা সবই এতে মেলে। তাছাড়া রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, দেবকথা, শাস্ত্রকথাও রয়েছে অনেক। তাই সব রুচির মানুষকে আকৃষ্ট করবার মতো উপাদান-উপকরণের সমাবেশ-সমন্বয় ঘটেছে এ কাব্যে, তাই 'ধর্মমঙ্গল' অনন্য।

কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয় : ১. সূর্য তাঁর অনুগত, ২. সন্তানদান তাঁর আয়ত্তে, ৩. জল বর্ষণ তাঁর কাজ, ৪. তাঁর দেওয়া দণ্ড কুষ্ঠ রোগ, ৫. চক্ষুরোগে নিরাময় তাঁর কৃপা, ৬. ধবল রূপ তাঁর প্রিয়, ৭. ঘোড়া তাঁর বাহন, ৮. বারো [মাস প্রতীক] তাঁর প্রিয় সংখ্যা, ৯. চৈত্র ও আষাঢ়ের মধ্যবর্তী সময়ই তাঁর বার্ষিক পূজার কাল, ১০. তিনি শূন্যমূর্তি [অদৃশ্য শ্বেত রশ্মি বাচক ও গোলাকার] – উক্ত দশটি গুণই প্রাচীন সূর্যদেবতার লক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. ধর্মমঙ্গলের কবি পরিচিতি

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট, তারপর ক্রমে আদি রূপরাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস, রাজারাম দাস, রামদাস আদক, প্রভুরাম (দ্বিজ), ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রামকান্ত রায়, ধর্মদাস বৈদ্য, বিশ্বনাথ দাস, হৃদয়রাম সাউ, অপ্রাপ্ত কাব্যের দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, নিধিরাম গাঙ্গুলী, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁদের অধিকাংশের 'রাম' যুক্ত নাম লক্ষণীয়। এ-ও হয়তো ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক ও প্রচারক রামাই পণ্ডিতের নামের প্রভাবজ। কোনো কোনো ধরনের নাম অঞ্চলবিশেষে বহুকাল জনপ্রিয় ও চালু থাকে। —উক্ত সব কবির মধ্যে ময়ূর ভট্ট চৌদ্দ-পনেরো শতকেরও হতে পারেন, রূপরাম ষোল শতকের, মানিকরামও হয়তো ষোল শতকের, প্রভুরাম সতেরো শতকের এবং অন্যরা আঠারো শতকের কবি।

১. ময়ূর ভট্ট

ধর্মমঙ্গলের অনেক কবিই ধর্মপাঁচালীর আদি কবি হিসেবে ময়ূর ভট্টকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু ময়ূর ভট্টের রচনার একটি চরণও কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। কেউ কেউ তাঁকে আদি কবি হিসেবে স্মরণকালে তাঁর রচনার যে তারিফ করেছেন, তা নিতান্ত সৌজন্যমূলক। না হলে আঠারো শতকেও তাঁর পাঁচালী চালু ও সুলভ ছিল বলে মানতে হবে। আর আঠারো শতকের সব পুথি লুপ্ত হবার কথা নয়। দু চার পাতা হলেও পাওয়া যেত। উল্লেখ্য যে, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শ্রীধর্মপুরাণ' ময়ূর ভট্টের রচিত নয়– রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। পাঠ বিভ্রান্তির ফলে নাকি 'রামচন্দ্র' 'ময়ূরক' হয়েছে। এ-সব কারণে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, সাত শতকের কবি বাণভট্টের সমসাময়িক 'সূর্য শতক' স্তব রচয়িতা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ময়ূর ভট্টকেই [ধর্মঠাকুর রূপী সূর্যপূজারী] রূপায়ণ আদি সূর্যস্তুতিকার হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।[১] এ মত মানতে হলে কল্পনার অতি প্রসার প্রয়োজন–আমাদের বিশ্বাস মনসাগীতির কানা হরিদত্ত চণ্ডীগীতির মানিক দত্ত প্রভৃতির মতো ময়ূর ভট্টের রচনাও কালে লুপ্ত হয়ে গেছে– কেবল নামটা শ্রুতি-স্মৃতিতে টিকে রয়েছে; এবং তিনি মঙ্গলগীতির উদ্ভব কালের তথা চৌদ্দ শতকের কবি। তাঁকে যাঁরা স্মরণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন :

১. রূপরাম চক্রবর্তী [ষোল শতক]
   ক. ময়ূর ভট্টে কৃপান্বিত হৈল করতার
      মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।
   খ. ময়ূর ভট্টের পদ মনে অনুমানি --ইত্যাদি।

২. মানিক গাঙ্গুলী [ষোল শতক /১৮ শতক]?
   ক. বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল
      দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।
   খ. বন্দিব ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
      দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে ধর্মগুণগান।

৩. সীতারাম দাস [সতেরো শতক]
   ক. ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে সীতারাম দাস গায়

---

১. বা: সা: ই-অপরার্ধ পৃ. ১৪২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী
গ. ময়ূর ভট্ট দ্বিজবর যোগে নিরমল
প্রকাশ করেন যেবা ধর্মের মঙ্গল।

৪. শ্রীশ্যাম পণ্ডিত | সতেরো শতক]
ক. ময়ূর ভট্ট দ্বিজবরে বিনয় করিয়া তারে
পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।

৫. গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় [আঠারো শতক]
ক. আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত।
ভাবিয়া তাহার পাদপদ্ম শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল।

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী [আঠারো শতক]
ক. হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞান জন্ম শ্রীধর্ম সভায়।
খ. ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।
গ. ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীতে আদ্যকবি।

আদি রূপরামের 'ধর্ম পাঁচালী'রও কোনো পুঁথি আবিষ্কৃত হয়নি। মানিক গাঙ্গুলী সূত্রে তাঁর নাম জানা যায় মাত্র। এই আদি রূপরাম সম্ভবত পনেরো শতকের কবি। তাই হয়তো উন্নততর রচনার জনপ্রিয়তায় তাঁর রচনা কালে লোপ পেয়েছে।

AMARBOI.COM

২. খেলারাম চক্রবর্তী

কেউ কেউ খেলারামের প্রাচীনত্ব এমনকি অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। হারাধন দত্ত ভক্তনিধিই প্রথম ১৪৪৯ শকে রচিত খেলারামের পুথির খবর প্রচার করেন[১] 'ভুবন শকে বায়ুমাস শরের বাহন/খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন/গৌড় কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।' হারাধন দত্তের অনেক আবিষ্কারই রহস্যজনক। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য বা পুথি পরে পাওয়া যায় না। তাই এ সন্দেহ। সম্প্রতি সুখময় মুখোপাধ্যায়[২] বিশ্বাস করেন যে সতেরো শতকের শেষ দশকের কবি যাদুনাথ তাঁর 'ধর্মপুরাণে' নিম্নের চরণগুলোতে কবি খেলারামের কথাই বলেছেন,

বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভণে
খেলারামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে।

এবং খেলারাম রূপরাম চক্রবর্তীর (১৬৬২-৬৩) ধর্মমঙ্গলের গায়েন ছিলেন। কৃতজ্ঞ রূপরাম বলছেন :

খেলারাম গায়েন করিল বহু হিত
হাতে যন্ত্র দিয়া করিল নাট গীত।
খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর।

---

১. গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত : জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ ৬৪৬-৬৪৭, বা, সা. ই. অপরার্ধে উদ্ধৃত।

২. মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃ. ২৮২-৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সাক্ষ্যেই তিনি খেলারামকে তথাকথিত 'গৌড়কাব্য' নামের 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা বলে মনে করেন এবং রচনাকাল ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দ [১৬১৪ শক] বলে মানেন। কিন্তু এসব তথ্যের বা যুক্তির জোর নেই। নামসাদৃশ্য নির্ভর মাত্র।

৩. রূপরাম চক্রবর্তী

ইনিই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি যাঁর কাব্য পাওয়া গেছে। তাঁর কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক একটি হেঁয়ালি আছে। এযাবৎ বিদ্বানেরা এর ব্যাখ্যায় বিব্রত বোধ করেছেন এবং নানা জনে বিভিন্ন তারিখ বের করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সুখময় মুখোপাধ্যায়[১] আশ্চর্যবুদ্ধি প্রয়োগে একটি নিঃসংশয় সমাধান দিয়েছেন। কালজ্ঞাপক হেঁয়ালিটি এই :

শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তায় রস দেহ
এই শকে গীত হৈল লেখা কর্‌্যা নেহ।

তিন বাণ= ৩ × ৫ = ১৫, চারি যুগ =৪ × ২ = ৮, বেদ = ৪ = ১৫৮৪ শকাব্দ তথা ১৬৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দ, এবং 'বৃহৎসারাবলী' নামের পুরাণসার সংগ্রহ গ্রন্থে' শাকে সিমে জড়' -- এই সংকেতে রচনাকাল নির্দেশ করেও আবার খ্রীস্টাব্দে রচনাকাল নির্দেশিত হয়েছে এভাবে--

৬ ছ শাস্ত্র অনুসারে সন সংখ্যা হয়
অষ্টাদশ পৃষ্ঠে বেদ বসু বিরাজয়।

অর্থাৎ ১৮, বেদ = ৪, বসু ৮ = ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ। একে শকাব্দে পরিণত করলে মেলে ১৮৪৮-৭৮ = ১৭৭০ শকাব্দ। অতএব

শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়
চারিবেদ ব্রহ্মবস্তু তাহে যুক্ত হয়।
রস ভাসে রস গুণে তায় যোগ দেও
এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও।[২]

চারি বেদ ব্রহ্মবস্তু ৪ × ৪১ = ১৬৪, রস = ৬, ভাস (সূর্যরশ্মি অর্থে) = ৭, রস = ৬ গুণ = ৩ অতএব, ৬ + ৭ + ৬ + ৩ = ২২

শাকে সিম জড় + ১৬৪ + ২২ = ১৭৭০ শকাব্দ। অতএব শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়', তা ১৭৭০ - ১৮৬ = ১৫৮৪ সংখ্যক অব্দ। এভাবে রূপরামের তৃতীয় চরণোক্ত হেঁয়ালির সমাধান মিলেছে। 'রসের উপরে রস তায় রস দেহ = [৪] ৬৬ × ৬ × ৪ = ১৫৮৪ শক, এবং ১৫৮৪ শকাব্দ অন্য অভ্যন্তরীণ তথ্য সমর্থন করে : রূপরামের একটি পুথিতে আছে :

১. রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল সুজা
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা
সেই হৈতে গীত গাই আসর ভিতর
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুর ঘর।

---

১. মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃ. ২৩১-৩৯।

২. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রচিত 'কি লিখি' গ্রন্থ থেকে সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য পুথিতে ২. গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ তার নাম।
তারে গিয়া স্বপনে কহিলা মায়াধর
[স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কবিকে] প্রভাতে গিয়া ভূপতি দিল মন্দির চামর।
সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে
অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে।

আর এক পুথিতে

৩. মহারাজা গণেশ রায় দেখিলা স্বপন।
চামর মন্দিরা দিল নানা বর্ণ সাজ
আনন্দে গাইলা গীত ধর্মের সমাজ।
রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা।...
সেই হৈতে গীত গাই আসর ভিতর
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর।

আওরঙজেবভ্রাতা সুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি তথা আওরঙজেব কর্তৃক বিতাড়িত হবার পূর্ব মুহূর্ত অবধি সুবাহ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। কবি 'ছিল' ক্রিয়াপদ যোগে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি আসরে সুজার আমল থেকে গান গাইতে শুরু করেন। গ্রন্থ রচনা শুরু করেন সম্ভবত পরে গোপভূমের জমিদার 'এড়াল' গাঁয়ের রাজা গণেশের আদেশে ও আশ্রয়ে থেকে। গ্রন্থসমাপ্তিকাল ১৬৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দ। কবির আত্মকথা থেকে জানা যায় রূপরাম চক্রবর্তী টোলঅধ্যাপক পিতার পুত্র। পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দময়ন্তী, অন্য দুই ভাইয়ের নাম রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর। সোনা ও রূপা বা হীরা বোন দুটোর নাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পীড়নে কবি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। নিরাশ্রয় কবি পাষণ্ড গাঁয়ের রঘুরাম ভট্টাচার্যের আশ্রয়ে থেকে তাঁর টোলে পড়তেন। পাঠ-বিষয়ক কোনো কারণে রুষ্ট পণ্ডিত একদিন পুঁথির বাড়ি মেরে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। নবদ্বীপের পথে বাড়ি আসার সময় ধর্মঠাকুর পলাশনের প্রান্তরে দেখা দিয়ে তাঁকে ধর্মমঙ্গল রচনার নির্দেশ দেন। কবি সবিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ধর্মরাজ বলেন ' যে বোল বুলিবে তুমি, সেই হবে গীত'। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর গ্রামে। কবির কাব্য পাণ্ডিত্যবর্জিত। কাব্যগুণও বেশি নয়। কিন্তু এটিই প্রাপ্ত আদি কাব্য। কবির কাছে ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে যেন জীবনপ্রীতি বড়। তাই পুত্রবর কামী রঞ্জাবতীর মুখে শুনতে পাই ---

আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর
কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধর।
সবে বলে মরিলে জীবন নাহি পায়
তোমার বচন শুন্যা প্রাণ উড়ে যায়।
পুত্রবর নাঞিত পাই শালে গিয়া মরি
মরে পুনরায় জীব হেন সাধ করি।
কি কহিব কাহারে এ বচন অগাধ
এমন বয়সে মরি বিধাতার বাদ।

লাউসেনের বিদ্যা অর্জনের বর্ণনা এরূপ :

ক খ আদি পড়িল অক্ষর যথোচিত
পড়িল আঠার ফলা হৈয়া সাবধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্মৈপদ পড়ে আত্মনেপদে মন।
তারপর তিন কাণ্ড সুবন্ত, ছন্দমঞ্জরী নিগম
শাস্ত্র, মহাভারত, পুরাণ জ্যোতিষ পাঠ করল লাউসেন।

৪. রামদাস আদক

ইনি বর্ণে ও বৃত্তিতে কৈবর্ত। পিতার নাম রঘু। ঝাড় গ্রামের কালুরায় [ধর্মরাজ] তাঁকে শুষ্কদীঘির ঘাটে দেখা দিয়ে পাঁচালী রচনার নির্দেশ দেন। তাঁর গানের প্রথম আসর বসে হায়াৎপুরের যাত্রাসিদ্ধিরায়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। রামদাস আদক রূপরামের সমকালীন কবি। রচনাকালও অভিন্ন। তবু রামদাসকে রূপরামের কাব্যেই 'রামদাস' ভণিতা বসিয়েছেন বলেও ডক্টর সুকুমার সেন ও সুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন।[১] কাব্য রচনাকাল 'বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার/ভদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার' = ১৫৮৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ। উভয়ের রচনায়ও সাদৃশ্য বিদ্যমান :

৫. রামদাস আদক

মন দিয়া শুন সভে চৈতন্য বন্দন
সংসারের সার পুরী আছে নবদ্বীপ
পতিত পাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ।
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর
যাহার ভবনে জন্মিলেন গদাধর
লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলকে বসিয়ে
ব্রহ্মা তারে স্তব করে চরণ ধরিয়ে।

রূপরাম চক্রবর্তী

মন দিয়া শুন সভে চৈতন্য বন্দনা
জম্বু দ্বীপের সার পুরী বন্দো নবদ্বীপ
পতিত পাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ।
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর
যাহার উদরে জন্ম লইলেন গদাধর।
লক্ষ্মীর সহিত হরি বৈকুণ্ঠে বসিয়ে
নিবেদন করে ব্রহ্মচরণ ধরিয়ে।

কবি ভুরশুট পরগনার জমিদার প্রতাপ নারায়ণের সমসাময়িক...

ভুরশিটের রাজা নাম প্রতাপনারায়ণ
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান।

এই প্রতাপ নারায়ণের বংশে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্ম– 'ভুরশিট রাজ্যবাসী/নানা কাব্যে অভিলাষী/ সে বংশে প্রতাপনারায়ণ। চন্দ্রপ্রভা [১৬৭৫-৭৬ খ্রীঃ] গ্রন্থ লেখক ভরত মল্লিক প্রতাপ নারায়ণের সভাসদ ছিলেন। রামদাস আদক জনপ্রিয় কবি ছিলেন না। তাঁর একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। তবে তাঁর আত্মকথায় খাজনার দায়ে বন্দী হওয়া, পালিয়ে যাওয়া, ও পালিয়ে বেড়ানো, সিপাহীর হাতে অপদস্ত হওয়া, বেগার খাটা প্রভৃতির বর্ণনা মেলে।

'ভাগ্যহীন জনার কখন নাহি সুখ/দেশে খাজনার তরে পালাইয়া যাই/ঘোড়া তাড়াইয়া

১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯-৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিপাই চলে সেই খানে/কবি রামদাস ভয়ে এত ভাবি বসে ধান বনে।' কিন্তু সিপাই দেখে ফেলে–

মনে কর বেটা তুমি যাবে পালাইয়া
এত বলি মাথে দিল ঝারি আর কম্বল।

পথশ্রান্ত বিনিদ্র অনাহারক্লিষ্ট কবি–

বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি।

আসলে সিপাইবেশী ছিলেন ধর্মঠাকুর কালুরায়।

৬ সীতারাম দাস

সীতারাম দাস প্রথমে ধর্মমঙ্গল ও পরে মনসামঙ্গল লিখেছিলেন। ধর্মমঙ্গল ১০০৪ মল্লাব্দে তথা ১০০৪+৬৯৪ = ১৬৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত। সীতারামের গ্রন্থেও বিস্তৃত বংশপরিচয় ও আত্মকথা রয়েছে :

পিতৃকুল : ধন্য পুণ্যবান ছিল গোপীনাথ দে
তাহার পুণ্যের কথা কহিবে কে।
তাহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন
মথুরা দাস, ধর্মদাস বল্লভ মদন।
ধর্মদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরি নামেতে
প্রথমে রাজীব দাস লিখিলাম পুথিতে।
দুর্যোধন কুশলরাম কনিষ্ঠ সভার
মদন-নন্দন দেবীদাস নাম তার।
দেবীর নন্দন দেখ সীতারাম নামে
যারে ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম শোভারাম

মাতৃকুল : মাতামহ-কুল মোর ইন্দাসেতে ধাম।
শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে
ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠী জানে সর্বলোকে।

[বাঃ সাঃ ইঃ অপরার্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৭৩]

কবি বর্ণে কায়স্থ। নিবাস সুখসায়রে। মাতুলালয় ইন্দাস। গৃহদেবতা গজলক্ষ্মী। পিতার নাম দেবীদাস। মাতার নাম কেকাবতী। ভবানীই কবিকে ধর্মনিরঞ্জনের সংকীর্তন করার আদেশ দেন।

স্বপ্নে– কলমে করিব ভর বলেন ভবানী
সাবধানে করহ ধর্মের সংকীর্তন
প্রভুর সহিত তোর হব দরশন।

তারপর– মহাসিংহ যে কালে লুটিল শাহাপুর
ঘরদ্বার পুড়াইল সব কৈল চুর।

সেই বৈশাখের প্রথমদিকে পিতৃব্য কুশলরামের আদেশে 'শাওড়াবনে' যাচ্ছিলেন কাঠ' কাটবার জন্যে। পথে শুনলেন এরাকী ঘোড়সওয়ার বেগার খাটাবার জন্যে লোক ধরছে 'যায়্য না রে এ পথে বেগার কত ধরে' । তবু কবি গা বাঁচিয়ে সে পথেই চললেন। কতদূর গেলে সন্ন্যাসীবেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, ঠাকুর বলেন–'সুখসায়ের দিয়ে তোরে খুঁজে এলাম ঘরে। ইনি বাঁকুড়ারায়, ইন্দাসে নারায়ণ পণ্ডিতের গৃহদেবতা। তিনি বলেন–

এ ভুবনে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি
আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি।

তাতে চিরকাল 'তোমার কীর্তি রহিব শিলের যেন চিন।' কবি চল্লিশদিনে তাঁর পাঁচালী রচনা সমাপ্ত করেন :

আনন্দেতে পুথি সব লিখিনু বসিয়া
থাপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে
আদ্য, ঢেকুর, হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম দুদিনে।
বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে
যেবা মনে করি ভাষা লিখি অনায়াসে।...
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে।

৭. যাদুনাথ

যাদবরাম নাথ ওর্ফে যাদুনাথ ধর্মপুরাণ রচনা করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন ও যাদুনাথের ধর্মপুরাণ সম্পাদক ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল যাদুনাথের গ্রন্থ ষোল শতকের শেষ দশকে অর্থাৎ ১৫৯১-১৬০০ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে অভ্যন্তরীণ প্রমাণসূত্রে অনুমান করেছেন। তাঁদের প্রমাণ সূত্র নিম্নরূপ :

যখন সমাপ্ত এই ধর্মপুরাণ
ক্ষেত্রিবংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্মরে যার নাম।
কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ বিমোচনে
চিরকাল রাজত্বি করেন বর্ধমানে।
মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেই কালে কৃষ্ণরায় নিল বসুন্ধরী
ভার্যা বন্দি দাস হয়ে করোড়ি তাহার
সেই কালে গীত সাঙ্গ হৈল আমার।
আঁক শক নাঞিত জানি কইনু মূর্খভাষ।...
বন্দনা হইল সায় যাদুনাথ গায়।

অন্যত্র সুখময় মুখোপাধ্যায় একটি ভণিতা থেকে–

প্রভুর কৃপায় ফলে/মদনা ঋতু ক্ষিতিতলে/
যাদব পণ্ডিণ ভণে,

–রচনাকাল বের করেছেন। তাঁর মতে মদনা-১৩, ঋতু-৬ ক্ষিতি-১ অঙ্কস্য বামাগতি অনুসারে ১৬১৩ শকাব্দ তথা ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দ হয়। তাছাড়া গ্রন্থোক্ত কৃষ্ণরাম ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে আওরঙজেব থেকে চৌধুরী সনদ লাভ করেন, জমিদারী এর আগেই অর্জিত হওয়ার কথা। অতএব ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দই গ্রন্থ রচনার কাল।

বর্ধমানরাজ বলরাম ও কৃষ্ণরামের উল্লেখ থেকেও রচনাকাল সঠিক বলে মানতে হয়। যাদুনাথ এক খেলারামের কল্যাণ কামনা করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় এঁকে কবি খেলারাম বলে মনে করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভণে
খেলারামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে।

এ খেলারাম গায়েন হওয়াই সম্ভব। কবির পিতার নাম ধর্মদাস–

কহে ধর্মদাসের নন্দন
ধর্মদাসের সুত ধর্মপথে অনুগত।

কবির দুই পূর্বপুরুষের নাম দামোদর ও বিনোদনাথ—এবং নিবাস 'দোম' গাঁয়ে।–

দামোদরপতি পিতা দোমেতে আলয়
পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয়
হত মূর্খ যাদুনাথ তাহার সন্ততি
সংক্ষেপে করিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী।

যদুনাথ বা যাদুনাথ দিল্লীর বাদশাহ্‌কে কলিকালের ধর্মাবতার বলে মানেন।
এই গ্রন্থে সৃষ্টিপত্তনের একাংশ এরূপ :

কূর্মের উপরে পাদুকা
কূর্ম বেড়িয়া বাসুকী নির্মাইল
বাসুকী বেড়িয়া ক্ষিতি
পৃথিবী বেড়িয়া প্রভুর মন্দির
চারিদ্বার থুইন তাথি...
পাদুকার বামভাগে হংসরাজ ঘোড়া
ডাহিনে উপুক মুনি।

অজা বলি দিয়ে মুণ্ড নতুন হাড়িতে পুরে কোলে নিয়ে বসলে বন্ধ্যানারীর সন্তান হয়–

অপুত্রক যেই নারী থাকে মহীতলে
লুইয়া কোলে করিলে তার পুত্র হয় কোলে।

[আঠারো শতক]

৮. ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম বৃহদাকার ও শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল রচয়িতা। রচনাকাল–১৬৩৩ শক বা ১৭১১-১২ খ্রীস্টাব্দ।

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।

কাল নির্দেশক এই পাঠ মিলেছে মুদ্রিত গ্রন্থে। উল্লেখ্য যে প্রায় একশ' বছর আগে ধর্মমঙ্গলের মধ্যে ঘনরামের পাঁচালীই প্রথম মুদ্রিত হয়। ঘনরাম সে সৌভাগ্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র রায়ের মতোই প্রখ্যাত। তাঁর উক্ত রচনাকাল অকৃত্রিম। কারণ তাঁর কাব্যে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের (১৭০৩-৩৭ খ্রীঃ) উল্লেখ রয়েছে। যোগেশচন্দ্র রায়ের গণনায় উক্ত শ্লোক থেকে ১৬৩৩ শকাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়ার এক প্রহর বেলায় গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় বলে জানা যায়।

অখিল বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান
চিন্তি তার রাজ্যোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বহৎ পাঁচালী নানা ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে রচনা করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল কবির। তাই তাঁর 'সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ'। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কবির বংশধর থেকে কবির জন্ম সন ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ বলে জেনেছিলেন। ঘনরামের রচিত অপর গ্রন্থ 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' নামের সত্যনারায়ণ পাঁচালী। এটি কবির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় রচনা তা জানা যায় না। দুটো গ্রন্থই কবির পরিণত বয়সের রচনা। উভয় গ্রন্থেই কবির চারপুত্রের রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের এবং রাজা কীর্তিচন্দ্রের নাম রয়েছে। ঘনরামের ইষ্টদেবতা ছিলেন রাম। তাই গ্রন্থে–

শ্রীরাম পদারবিন্দে দিবে মোর মতি/শ্রীরাম দাসের দাস/প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাসন— প্রভৃতির উল্লেখ পাই। এই ঘনরাম চক্রবর্তীই বৈষ্ণবপদও রচনা করেন। 'পদকল্পতরু'তে' তাঁর পনেরোটি পদ সঙ্কলিত রয়েছে। এতেই বোঝা যায়, ঘনরাম ধর্মপূজারী কিংবা বৈষ্ণব ছিলেন না। সমকালীন জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে পাঁচালী ও পদ রচনা করেছেন মাত্র।

পৌষম্বান বংশীয় ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনঞ্জয় এবং প্রপিতামহ পরমানন্দ। 'মাতা যার মহাদেবী সতীসাধ্বী সীতা' – তাঁর মাতার নাম মহাদেবী তিনি সীতার মতো সতীসাধ্বী অথবা 'সতীসাধ্বী মহাদেবী' সীতা। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার কইয়ড় পরগনার অন্তর্গত 'কৃষ্ণপুর' গ্রামে। মাতুলালয় ছিল রায়নায়। মাতামহের নাম গঙ্গাহরি। কবির উপাধি ছিল 'কবিরত্ন' [ঘনরাম কবিরত্ন মধুর রস গান'] কাব্য রচনার আদেষ্টা ধর্মরাজ নন, দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র। ঘনরাম ছান্দসিক ও পণ্ডিত কবি।

৯ দ্বিজ রামচন্দ্র

দ্বিজ রামচন্দ্র ওর্ফে রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত অন্য পাঁচালীটি ভুলক্রমে ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপুরাণ' নামে সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। রামচন্দ্রের পুরাণের ভাষা মার্জিত, চিন্তা-চেতনাও তত্ত্বঘেঁষা। তাঁর ধর্মমঙ্গল অনাদ্যমঙ্গল রচনার কালের উল্লেখ রয়েছে :

১. ময়ূর ভট্ট পদ ভাবি দ্বিজ রামচন্দ্র কবি
সেবি ধর্ম চরণ যুগল
ধর্মরাজ অনুবলে হাজার আটত্রিশ সালে
আরম্ভিলা অনাদ্যমঙ্গল।

২. মল্লরাজ্যে বাস করি মল্লের লেখি শক
হাজার আটত্রিশ সালে হৈল পুস্তক।

মল্লরাজ্যের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে ধর্মমঙ্গল রচিতঃ

দুর্জন সিংহ সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান
তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান।

অতএব গোপাল সিংহের আমলে ১০৩৮ মল্লাব্দে তথা ১৭৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে এ পাঁচালী রচিত।

রামচন্দ্রের পিতামাতার নাম ও নিবাস ভণিতা থেকে জানা যায় :

গয়ঘড় বন্দিঘাটি পূর্ববাস দিগঙ্গবাটী
মনোহর সৌরীর সন্তান
জীবন বাঁড়ুজ্জে সুত অশেষ গুণের যুত
রামচন্দ্র তাহার নন্দন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাইল নূতন গীত ভাবি নিরঞ্জন
দ্বিজ রামচন্দ্র মহামায়ার নন্দন
নিবাস—দ্বিজ রামচন্দ্রে গায় নিবাস চামোটে

—বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত।

কবি গোকুলনগরের ধর্মরাজ শল্যাসুরের কৃপায় 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন। 'গোকুলনগরের প্রভু শল্যাসুর/যাহার কৃপায় হল্যাম কবি এ প্রকার কোটি কোটি প্রণাম যাত্রাসিদ্ধির চরণে'।

১০. নরসিংহ বসু

ধর্মমঙ্গল রচয়িতা নরসিংহ বসু তাঁর পাঁচালীতে আত্মকথাও লিখেছেন। তাতে তাঁর একটা মোটামুটি পরিচয়ের সঙ্গে সমকালীন কিছু কথাও জানা যায়। নরসিংহ বসু বীরভূমের জমিদার আসফ উল্লাহ খানের উকিল ছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াব দরবারে। এই সময়ে বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন কীর্তিচন্দ্র রায়, এঁর নাম ঘনরাম চক্রবর্তীও করেছেন। কবির পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার বসুধা গাঁয়ে। সেখান থেকে মথুরা বসু 'শাঁখারি' গাঁয়ে এসে বাস করতে করতে থাকেন–

বসুধা মিরাস ভূমি ছিল পূর্বাপর
মথুরা বসুজা কৈল শাঁখারিতে ঘর।

শাঁখারি ছিল বর্ধমানের মহারাজার অধিকারে। 'অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়।' মথুরা বসুর তিন পুত্র–ঘনশ্যাম, রাধিকা [নাথ] ও রামকৃষ্ণ। কবির পিতা ঘনশ্যাম, মাতার নাম নবমল্লিকা। পিতৃহীন নরসিংহ বসু পিতামহীর যত্নে লালিত। কবি বাল্যকালে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। পিতামহী তাঁকে 'বাঙ্গলা পারসী উড়্যা [উড়িয়া] পাড়াল্যা নাগরী [হিন্দুস্থানী]' কবির প্রথম জীবনে 'নানা দেশে রোজগার করি নানাস্থানে' অবশেষে বীরভূমের ঝাড়খণ্ডের জমিদার আসফউল্লাহর উকিল পদ লাভ করেন। এটি সেকালের একটি বহুসম্মানের উচ্চপদ।

সেকালে সামন্তরা প্রতাপে প্রবল ছিলেন। কবির ভাষায়–

বাঙ্গলার বীরভূমি বিখ্যাত অবনী
শ্রীআসাফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।
প্রবল প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড
সবদেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড।
অস্ত্রে-শস্ত্রে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে।
তীরন্দাজ ধানুকির নাহিক সুমার
অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু'হাজার
সব 'বলে' পরিপূর্ণ রিপু নাহি আঁটে
বিষশয় নৃপতি যাহার আজ্ঞা খাটে
দেশে নাঞি ডাকাচুরি রিপু কম্পমান
তার দ্বারে থাকে সদা হাথে কর্যা প্রাণ।

সেকালে নির্দিষ্ট সময়ে নওয়াব দরবারে বার্ষিক রাজস্ব দাখিল করতে না পারলে জমিদার বন্দী হত, শারীরিক নির্যাতনও পেত এবং জমিদারীও হাতছাড়া হত। কোম্পানির সূর্যাস্ত আইন এর আদলেই তৈরি হয়েছিল। সেকালের প্রজাদের বেগার খাটানো হত–'কাহার বেগার দিল করিয়া লৌকিক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বাঙলাদেশে সেকালে পালকী চড়ে লোক দূর-দূরান্তরে যাতায়াত করত। সন্ন্যাসী বেশে জুঝাটির খেজুরতলায় ধর্মরাজ তাঁকে দেখা দিয়ে ধন্য করলেন এবং 'অনাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত'।

দিনে দরবার কবি রাত্রে করি গীত
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত।

কাব্য রচনার আরম্ভকাল হচ্ছে :

শক শশীপিঠে ঋতু ভুবনেতে রস
কবিত্ব আরম্ভ কর্কটের দিন দশ।

শশী-১, ঋতু-৬, ভুবন-৩, রস-৬ = ১৬৩৬ শকাব্দ বা ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দ। কীর্তিচন্দ্র রায় [১৭০৩-৩৭] এবং মুর্শিদকুলি খান [১৭১২-২৭ খ্রীঃ] কবির সমসাময়িক। কবি আত্মীয় বন্ধু-বৎসল ছিলেন, অন্য কবিদের মতো কেবল সন্তানের নয়, সব আত্মীয়-পরিজন-পরিচিত জনের জন্যে তিনি কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন ধর্মনিরঞ্জনের কাছে।

১১. প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়

ইনি মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে তাঁর পাঁচালী রচনা করেন। রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জেও এই সময়ে (১৭৩২-৩৩খ্রীঃ) পাঁচালী রচনা করেছিলেন। 'গোপাল সিংহ নৃপবর/তস্যদেশে করি ঘর – ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে গোপাল সিংহের মৃত্যু হয়। অতএব ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই এ পাঁচালী রচিত।

প্রভুরামের পিতার নাম জানকীরাম, পিতামহের নাম গোবিন্দ, মাতার নাম অন্নপূর্ণা। নিবাস মল্লভূমের আলিগচিন্যা গ্রামে। চাষী ব্রাহ্মণ সন্তান একদিন গরু চরাতে গিয়ে গাছতলায় বিশ্রাম করছিলেন, তখন ধর্ম নিরঞ্জন 'আজ্ঞা দিলা রচিতে মঙ্গল।' প্রভুরাম তাঁর জ্ঞাত সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরের নামোল্লেখ করে প্রণাম জানিয়েছেন-জাজপুরের বাঁকুড়া রায়, দাঁতনের দেবনিরঞ্জন, গোলাড়ের ধর্মরাজ, চন্দ্রকোণার মল্লনাথ, কুণ্ডাপুরের যাত্রাসিদ্ধি রায় এবং তাজপুরে, গোলাড়ে গর্বপুরে হাকন্দ, ইত্যাদি। 'শ্রী ধর্মপাদুকা' যত আছে সেগুলোও বন্দ্য।

সেকালের বাঙালি কায়স্থরা 'বাঙ্গালা', উড়িয়া ও নাগরী (মৈথিলী) পড়ত। বাঙলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবাহ-বাঙলার অফিসের চাকরির জন্যে এ তিন ভাষায় অধিকার দরকার হত। উল্লেখ্য যে কবি নরসিংহ বসুও উক্ত তিন ভাষা শিখেছিলেন।

কাছেতে কায়স্থ কত করে লেখাপড়া
সমুখে সভার শোভে কাগজের গড়া।
বাঙ্গালা পড়ায়ে উড়্যা নাগরী সুন্দর
লেখায় উত্তম সব যার যে দপ্তর।

১২. গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এঁর রচনার খণ্ডাংশ মাত্র সংগৃহীত হয়েছে। কাজেই এর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। ভণিতা-'রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল।' ইনি সম্ভবত আঠারো শতকের কবি।

১৩. হৃদয়রাম সাউ (সাণ্ড)

'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (পৃ ৩৭৯) কবির সম্বন্ধে নিম্নরূপ তথ্য মেলে— হৃদয়রাম সাউ মাতৃপিতৃহীন হয়ে বর্ধমান জেলার খুরুল গাঁয়ে মাতুলালয়ে লালিত হন। মাতুলালয়ে গৃহদেবতা ছিলেন 'চাঁদরায়'। মাতুলদের সঙ্গে বিবাদের ফলে মাতুলালয় ত্যাগ করে নানুরের নিকটবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচকরণ গাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। অজয় নদের তীরবর্তী 'সিদিয়া দহে' তিনি ধর্মনিরঞ্জনের এক মূর্তি আবিষ্কার করে উচকরণে গৃহদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ধর্মঠাকুরের আদেশেই তিনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন— উচকরণে কবির বংশধরেরা আজও বাস করেন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকুতা, পিতামহের নাম কমল, কবি জাতে শুঁড়ি। কাব্যরচনার কাল ১১৪৬ সালের ২রা আশ্বিন তথা ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ।

ভণিতা : নিরঞ্জনের মহিমা কহেন না যায়
ময়ুর ভট্টে বন্দিয়া হৃদয়রাম গায়।

অন্য একটি অর্বাচীন পুঁথিতে[১] ময়ূর ভট্ট ও রাধাকান্ত বা রাধাই পাল—উভয়ের ভণিতা মেলে, যেমন

১. বিষম ধর্মের কথা কহেন না যায়
ময়ূর ভট্ট বন্দিয়া রাধাকান্ত গায়।
২. অনাদিমঙ্গল গীত শ্রীরাধাই পাল গান
৩. লিখিল রাধাই পাল মধুর সঙ্গীত।

হৃদয়রামের ভণিতা :

১. গাইল হৃদয়রাম সখা চাঁদ রায়।
২. গাইল হৃদয়রাম খুরুলে যার ঘর
৩. ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস।

উপরে সংগৃহীত তথ্য যদি নির্ভুল হয়, তাহলে হৃদয়রামই কবি, আর রাধাকান্ত পাল কবিযশপ্রার্থী গায়েন বা লিপিকর।

AMARBOI.COM

১৪. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী

এক কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। ইনিও সম্ভবত আঠারো শতকের কবি।

ভণিতা : ১ শ্রীকবি শঙ্কর ধর্মের কিঙ্কর
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে।
২ অনাদি মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।

'কবিচন্দ্র' ভণিতায় মধ্যযুগে বিভিন্ন কবি নানা বিষয়ক পাঁচালী রচনা করেছেন। পনেরো শতকের এক কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরীমঙ্গল রচয়িতা।

১৫. নিধিরাম গাঙ্গুলী

'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী নিধিরাম গাঙ্গুলী নামে অপর এক কবিও ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

ভণিতা : ১. নিধিরাম গাঙ্গুলী ধর্মের গীত গান।
২. অনাদি মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গান।
৩. নিধিরাম কবিচন্দ্র কৈল বিবরণ।

কবির আরো চার ভাই ছিল। তাঁদের একজন ছিলেন, 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত প্রখ্যাত ব্যক্তি।-' এই রস গান বিদ্যাসাগরের ভাই।'

---

১. বা. সা. ই., অপরার্ধ ১৯১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন জ্যেষ্ঠ ও এক কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম—

রামেশ্বর শ্যাম লক্ষ্মীকান্ত জ্যেষ্ঠ আছে
হিদু নিমাঞের বড় নিধিরাম রচে।

১৬. রামনারায়ণ

এঁর ধর্মমঙ্গলের খণ্ডাংশ 'ইছাইবধ' পালা সংগৃহীত হয়েছে। কবি নিজে ছিলেন শাক্ত। সোমঘোষের মৃত্যুতে বিচলিতা ভবানী—

লাউসেনে ডাকি কথা কহেন ভবানি
ইচ্ছা-এর শ্রাদ্ধ কর্য থাকিয়া আপনি

এবং সোমঘোষেরে [লাউ] সেনে সঁপি সর্বমঙ্গলা
কৈলাসে কালিকা দেবী করিলা গমন
রামকৃষ্ণানুজ গায় রামনারায়ণ।

এতে বোঝা যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ এলাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মমতে ও পাঁচালীতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা এই গ্রন্থে লক্ষণীয়।

১৭. মানিকরাম গাঙ্গুলী

মানিকরামকে কেউ কেউ ষোল বা সতেরো শতকের কবি মনে করেন। সবারই অনুমানের ভিত্তি মানিক প্রদত্ত রচনাকালজ্ঞাপক সাংকেতিক পদবন্ধ। এটি অত্যন্ত জটিল—

শাকে ঋতু (রীত্ত) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যোগ দক্ষে যোগ তার সনে।
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহতি
শর্বরী শরাগ্রিদণ্ড সাঙ্গ হল্য গীতি।

সাহিত্য পরিষৎ মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ—

সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে
সিদ্ধসহ যুগদক্ষে যোগতার মনে।

এর থেকে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ১৪৬৯ শক, বিভূতিভূষণ দত্ত ১৫৬৯ শক, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৪৮৯ শক এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৪৯১ শক পেয়েছেন। কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ভাষার নিদর্শনে ও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে মানিক গাঙ্গুলীকে আঠারো শতকের প্রথম ভাগের কবি বলে মনে করেন। তাঁদের পরিবেশিত তথ্যগুলো এই—

১. ভাষা একেবারে আধুনিক চলতিরীতি ঘেঁষা–গেছে, লভগে, যেয়ে, খেতে, খাব, জেতের (জাত্তের) দুঃখ, চেলের (চা'লের), 'যেতে-হতে' পদান্ত মিল ইত্যাদি। সুকুমার সেনের মতে, "ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। ...তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বহুল এবং তাহার মধ্যে আঞ্চলিক কথ্যভাষার পদ প্রচুর।"
২. অজস্র আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার।
৩. 'আদি রূপরাম' নামের তিনি যে রূপরামের বন্দনা করেছেন, তিনি আসলে রূপরাম চক্রবর্তী এবং তাঁকে মানিক গাঙ্গুলী অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছেন, যেমন– 'ইছাইবধ' পালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. সুরিক্ষার পাটে বন্দীনাগরদের তালিকায় কবি কৃত্তিবাস, নরোত্তম (দাস), নিধিরাম, খেলারাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণরাম, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতির নাম রয়েছে। অতএব কাশীরাম, ঘনরাম, নিধিরাম প্রভৃতি নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ববর্তী কবি।

৫. মানিকরামের পাঁচালীতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে। মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে এবং সে-মূর্তি পরে রাজা চৈতন্যসিংহ বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ) বন্ধক রাখেন। সেই সময় থেকে বাগবাজারেই মদনমোহন ঠাকুর রয়েছেন। এসব প্রমাণ ছাড়াও উপযুক্ত কালজ্ঞাপক হেঁয়ালি থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন এটি যথার্থ বলে মানেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় সিদ্ধ-১০ [দশমহাবিদ্যা অর্থে], যোগ-২৭ [জ্যোতিষোক্ত সংখ্যা বিশ্বকোষ ১৬শ ভাগ, পৃ. ৪০], মহীপুত্র-মঙ্গলবার, শরাগ্নি ৫× ৭ = ৩৫ ধরে অন্যদের মতো তিনি (ঋতু-৬, বেদ-৪, সমুদ্র-৭) প্রথম চরণে-৬৪৭ এবং দ্বিতীয় চরণে ১০২৭ পেয়েছেন। দুটো যোগ করলে হয় ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দ। এবং মঙ্গলবার রাত্রি ৩৪ দণ্ডে রচনা সমাপ্ত। এটিই রচনাকাল। মানিক গাঙ্গুলীর পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম অনন্ত রায়, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্নীর নাম শৈব্যা। দুর্গারাম, মুক্তারাম, ছকুরাম (গায়েন), রামতনু ও নয়ন—এই পাঁচজন তাঁর ভাই। তাঁর তিন পুত্র—কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রমানাথ এবং এক কন্যা নাম অভয়া। নিবাস বেলডিহায় [বেলটে, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়] তাঁর 'গাঞি' ছিল বাঙ্গাল গাঙ্গুলী বা গাঙ্গুলী বাঙ্গালপাস।

তিনি 'শীতলামঙ্গল'ও রচনা করেছিলেন। মানিকরাম পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন শীতলসিংহ ধর্মঠাকুর। দেশড়ার মাঠে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে দেখা দিয়ে তিনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনার নির্দেশ দেন মানিকরাম গাঙ্গুলীকে।

মানিক গাঙ্গুলী ধর্মঠাকুরের (বাঁকুড়ারায়ের) সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নানা আজগুবী ঘটনা রচনা করেছেন। ধর্মঠাকুরের শেষ কথা এই—

বারো দিনে সমাপ্ত হইবে 'বারমতি'
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি।
আর গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর।

মানিকরামের শীতলামঙ্গলেরও একটি ভণিতায় 'গাঞি' পিতৃনাম ও নিবাস মেলে :

গাঙ্গুলী বাঙ্গালপাস বেলটা গ্রামেতে বাস
পিতা গদাধর গুণময়
দ্বিজ মানিক ভণে কৌশল্যা করিয়া মনে
ভাবিয়া শীতল পদদ্বয়।

অন্য একটি ভণিতা এরূপ— 'বেলডিহা গ্রামে বাস দ্বিজ শ্রীমানিক রাম।' যদিও আমরা 'ধর্মমঙ্গলে'র কবি এক রূপরামকে জানি, তবু আদি 'রূপরাম' উল্লেখ থেকে মনে হয় মানিক গাঙ্গুলীর সমকালে স্বপ্নখ্যাত বা অখ্যাত আর এক 'রূপরাম' কবি ছিলেন।

১৮. রামকান্ত রায়

রামকান্ত রায় গৃহস্থ চাষী সন্তান। কিন্তু কৃষিকর্মে তাঁর অনীহা। ছয় মাস বেকার অবস্থায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান। মনে তাঁর স্বস্তি নেই, বৈষ্ণব-বৈরাগী হবার সাধও জাগে কখনো—'কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল'। এমনি সময়ে গাঁয়ের বাঞ্ছারাম সরকার সেবিতে বাবলাতলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মনিরঞ্জন 'বুড়ারায়' তাঁকে দিয়ে 'বারমতি' লেখানোর জন্যে তাঁর পিছু নিলেন। ব্রাহ্মণ বেশে তাঁকে দেখা দিয়ে এবং স্বপ্নে নির্দেশ দিয়ে বুড়ারায় তাঁকে 'বারমতি' তথা ধর্মের পাঁচালী রচনায় প্রবর্তনা দিলেন এবং গাঁয়ের বাঞ্ছারাম সরকারের বাড়িতে বসে কবি গ্রন্থরচনা শুরু করলেন। সাত দিনে একুশ পত্র লেখার পর আর কলম চলে না, বারোদিন লেখা বন্ধ রইল, আবার বুড়ারায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বল-ভরসা যোগালেন : 'জাগাব তোমার নাম দেশ-দেশান্তরে। রাখিব তোমার কীর্তি পাষাণের রেখা।' অবশেষে বাষট্টি দিনে পাঁচালী সমাপ্ত হল :

এগার শ' সাতানয় (সাতানব্বই) সালের আশ্বিনে
আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে।
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে
বারমতি সাঙ্গ হৈল বাষট্টি দিবসে।

১১৯৭ বঙ্গাব্দ হলে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ হয়।

রামকান্ত কেবল গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নয়, বংশ পরিচয়ও বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন :

নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর
সামিল সমরশাহী পরগনা ভিতর।
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর
শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর।
তাহার দেশে বাস সামন্ত খেআতি।
অনেক পুরুষ সেহারাএ অবস্থিতি।
বুড়ারায় সেখানে আপনি অধিষ্ঠান
বাবলা তলায় যার আশ্রম দেহারা।

বাঞ্ছারাম সরকার ছিলেন বুড়ারায়ের সেবক। কবি পরিবার এই বাঞ্ছারাম সরকারের আশ্রিত ছিলেন—

তাহার (বাঞ্ছারামের) আশ্রিত বাস করি বরাবর
সেহারায় নিবাস অনেক কাল যায়
পিতামহের নাম বনমালী রায়।
কনিষ্ঠ মহিন্দিরাম চারিপুত্র তার
জ্যেষ্ঠ আমি গয়ারাম অনুজ আমার
রামলোচন গুরুদাস নাম তারপরে
আমার জননী যে শিবানী নাম ধরে।
সুখসায়রের রামচন্দ্র সোমের দুহিতা
অভয়া সিউলি পাটু তাহার বনিতা।
তাহার তনয় রাধাগোবিন্দ নাম ধরে
কল্যাণে রাখিবে প্রভু তাহার কুমারে।

এছাড়াও, আত্মীয়-পরিজনের নাম রয়েছে। কবি কল্যাণ কামনা করেছেন সব 'সামন্ত' কায়স্থদের।

১৯. শ্রীশ্যাম পণ্ডিত

এঁর রচিত পাঁচালীর নাম 'নিরঞ্জনমঙ্গল'

নিরঞ্জনমঙ্গলের অপূর্ব বন্দনা
'আদর করিয়া ভাই শুন সর্বজনা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ পাঁচালী আজো সংগৃহীত হয়নি। দুটো খণ্ডিত পুঁথি[১] মিলেছে। কিন্তু ভণিতায় ধর্মদাস, ধর্মের দাস নামও মেলে। রূপরামের রচনাংশ ভণিতায় আছে। তাই শ্যামপণ্ডিত কিংবা শ্রীশ্যাম পণ্ডিত নামের কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিদ্বানেরা সন্দিহান। বিশ্বভারতী সংগৃহীত পুথির লিপিকাল ১৬২৫ শক বা ১৭০৩-০৪ খ্রীস্টাব্দ। অতএব শ্যামপণ্ডিত সতেরো শতকের কবি। ইনি উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের (বীরভূম) লোক। তাঁর বর্ণিত আখ্যানে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন সোমঘোষের উপাস্য ছিলেন শ্যামরূপা, শ্যামরূপার পূজক ছিলেন পুরোহিত চণ্ডীদাস, লাউ-সেনের সেনভূমে বাস ও বল্লাল সেনের জ্ঞাতি বলে পরিচয় দান, ঢেকুর গড়ের স্থলে ত্রিহট্র গড় (ত্রিষষ্ঠীর), জল্লাদ শেখর স্থলে সামন্ত শেখর ইত্যাদি। অভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করলে মানতে হবে যে, শ্যামপণ্ডিত হয়তো নিজেকে ধর্মদাস বা ধর্মের দাস বলে অভিহিত করেছেন। সুকুমার সেন শ্যামপণ্ডিতের রচনায় প্রাচীনত্বের ছাপ লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এই প্রাচীনত্ব স্থানীয় বুলির প্রভাবজ হতে পারে। যেমন–'ত' স্থলে 'থ' উচ্চারিত। শ্যামপণ্ডিতের রচনায় ডোমদের জীবনযাত্রার একটি বাস্তব চিত্র রয়েছে।

কালুডোম প্রসঙ্গে বর্ণিত অংশটি এই :

কালু জানি তোর বীরপনা গেঠাঞে গেঠাঞে টেনা
বেড় দিয়ে বাঁধিতে কমরে
লক্ষ্যা তুমার নারী কাঁখে করিএ ঝারি
আমানি মাগিথ ঘরে ঘরে
তালপাতে ডঙ্গানিতে আমানি চঁচাঞে খেথে
দুটি আঁটু ভূমিতে পড়িএগ্রা
সভাকে করিয়া হীন উপবাসে যেথ দিন
জল খেথে মৃত্তিকার ভাঁড়ে
ধুলাতে থাকিথে শুএগ্রা পরিথে শনের খুএগ্যা
তৈল বিনে অঙ্গ খড়ি ধনুকে শণের ঝুঁড়ি
ছেঁড়্যা জুতা করিয়ে চরণে
তালপত্রের ছাউনি বাতাসে উড়িথ চাল
যবে অন্ন নাহি পেথে কেসব কুড়িঞে খেথে
ঘরের বনিতা বত না ছিল তোমার গত
নগরে বেচিথ পানিফল
তাথে না পুরিথ আশ খেথে শূকরের মাঁস
তালগাছে কাটিতে বাকুড়ি।
ঋণ করে খেতে যার শুধিতে নারিথে তার
ঘরে ঘরে বেচিতে চুপুড়ি
যদি না বিকাথ ঝুড়ি না পেথে মদের কড়ি
বান্ধা দিথে বিপ্রের কাটারি
না পাঞে মদের কড়ি ক্রোধযুক্ত হয়ে শুঁড়ি
বেন্ধে থুত তুমার সুন্দরী

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী সংগৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারা পুত্র বান্ধা থুইয়া আপনে বিকল হঁআ
নগরে করিথে যেঞে চুরি।

হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়ালের জীবনে আজো দুরবস্থা ও নিঃস্বতা বিদ্যমান।

২০. 'বসর' নিবাসী বণিক ধর্মদাসের ভণিতা এরূপ :

ধর্মদাস বণিকের রচন সুসার
ধর্মদাস বণিকের সরস রচন।
বান্যা ধর্মদাস গীত করিল রচন।
রচিল ধর্মের দাস বসরে যার স্থিতি।

এঁর পাঁচালীর নাম ব্রতকথা— 'এতো দূরে নিরঞ্জন ব্রতকথা সায়
প্রভুর চরণে ধর্মদাস গীত গায়।

২১. রাজারাম দাস

এর একখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেছেন অক্ষয় কুমার কয়াল[১]। রচনাকাল মিলেছে–

পক্ষ পক্ষ রস মহী শক সম্বৎসর
বাদসাহা অরঙ্গসাহা দিল্লীর ঈশ্বর।

পক্ষ–২, রস–৬, মহী–১=১৬২২ শক বা ১৭০০–১৭০১ খ্রীস্টাব্দ হয়। এর পাঁচালীর হরিশচন্দ্র পালায় কিছু অভিনবত্ব আছে।[২]

এছাড়া ২২. ভবানন্দ রায় ২৩. দ্বিজ রাজীব ২৪. দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ ২৫. এবং বিশ্বনাথ দাস প্রভৃতি কয়েকজন 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতার নাম মেলে। আবার ধর্মদাস নামের দু'জন কবিরও নাম পাই। একজনের কথা শ্যামপণ্ডিত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

২৬. অন্যজন জাতে বৈদ্য, নিবাস মান্দারণে। আদেষ্টা বাঁকুড়ারায়

"ধর্মদাস কবি গান মান্দরণে ঘর
কহে কবি ধর্মদাস বাঁকুড়ারায়ের বরে।"
কহে কবি ধর্মদাস তিষব কুমার।

ইনি রূপরামের অনুকারক।

বিস্তার কহিয়া গেছেন রূপরাম
সংক্ষেপে করিয়া কহে বৈদ্য ধর্মদাস।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মদাস বৈদ্যের 'অনাদ্যমঙ্গলের' কাহিনীর, কবিত্বের, ও চরিত্র-চিত্রণের প্রশংসা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের মুরারি শীলের মতো এখানেও কালু ডোম..

বীরের শব্দ শুনি শুঁড়ি রহে ঘর
সত্য করি কহ মাসী মেসো কোথা গেছে।

মাসী : শুন বাপু বীর কালু বাক্য শুন মোর
দিন দশ হৈল ঘরে মেসো নাঞি তোর।

---

১. ধর্মমঙ্গলের নতুন কবি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৭৫ সন, পৃ ৩৮৬-৯৩।
বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে উদ্ধৃত; পৃ ৭১৩-১৫।

২. ঐ পৃ ৭১৩-১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি শত্রুপক্ষের সৈন্য দেখে কালু ডোমের অবস্থাও কাহিল—

দেখিয়া ত্রাসেতে বীর উড়িল পরাণ
কাতর কপোত যে দেখিএ সয়চান।

কলিঙ্গার চরিত্র এখানে জীবন্ত :

কলিঙ্গা কালিয়া যেন সর্পের সভায়
কোন্দল পাইলে মাগী তেজে অন্নজল
মুখানি ক্ষুরের ধার খই যেন ফুটে।

পূর্বোক্ত বিশ্বনাথ দাসের 'নিশিজাগরণ' পালা মুদ্রিত হয়েছে।

মনে হয় এক সময়ে বৌদ্ধযুগের কাহিনীগুলোকে একত্রিত করে গ্রন্থনের একটা প্রয়াস চলেছিল। তারই নিদর্শন দেখি সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণে' এবং 'লক্ষ্মণের ধর্মপুরাণে'। এ দুটো গ্রন্থে সৃষ্টিপত্তন, সংজাত পদ্ধতি, আদিনাথ শিব কাহিনী, মীননাথ-গোরক্ষনাথ আখ্যান, সদাডোম-রামাই উপাখ্যান, হরিশচন্দ্র-মদনা-লুইচন্দ্র আখ্যান এবং তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য গঙ্গা উপাখ্যানও যুক্ত হয়েছে।

২৭. সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ' আঠারো শতকের মধ্যভাগ [সুকুমার সেনের মতে ১৭৫০-এর কাছাকাছি সময়ে] রচিত। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ, পিতামহ রাজারাম এবং কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব। নিবাস গুগলী জেলার বালিগড় পরগনার রাধানগর ওর্ফে নন্দনবাটি।

সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণের' কয়েকটি ভণিতা নিম্নরূপ :

১. শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেবে ভণে
কাঁলাচাঁদ কালুরায় যারে কৃপা করিল স্বপনে।
২. দ্বিজ সহদেব গাএ অনাদি ভাবনা
রাধানগর বাড়ী যাব বালীগড় পরগনা।
৩. গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা
নিবাস নন্দনবাটি বালিগড় পরগনা।

২৮. লক্ষ্মণ সর্বত্র ভণিতায় রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়ে তাঁর 'ধর্মপুরাণ' রচনা করেছেন। মাত্র একটি ভণিতায় তাঁর নাম মেলে–

অনাদ্যের মায়া কহন না যাএ
দ্বিজ রামাঞি পণ্ডিতের কবি লক্ষ্মণে গাএ।

লক্ষ্মণ নিজেকে 'চাওয়াল গায়েন' বালক গায়েন বলে অভিহিত করেছেন—

'দ্বিজ রামাই পণ্ডিতের গীত ছাওয়াল গাএন গায়।'

লক্ষ্মণের পুঁথিতে মুসলমানের বকরঈদের কোরবানী প্রকারান্তরে কালীর কাছে বলি বলে উল্লিখিত হয়েছে– এ চেতনা মিলনবাঞ্ছা প্রসূত :

সৈয়দ মওলানা কাজী বৈসে স্থানে স্থানে
ইদ পার্বণ করে আনন্দিত মনে।
নিরঞ্জনভাগে তারা নিজ শাস্ত্র পড়ি
বনের পশু আনি তার গলায় দেয় ছুরি।
নিরক্ষ রুধির পান করে মহেশ্বরী।

এই গ্রন্থে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মতে মিশ্রণ-বাঞ্ছা এবং যোগের গুরুত্বচেতনা প্রবল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খ' নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য

১. নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ

নাথশৈব, বৈষ্ণবসহজিয়া ও হিন্দু-মুসলিম বাউল মত ইদানীং আপাত পৃথক মত ও সাধনা বলে মনে হলেও মূলে তিনটিই এক ও অভিন্ন উৎস ও তত্ত্বসম্ভূত। এ তত্ত্ব ও মতের জড় হয়েছে আদিম মৈথুনতত্ত্বে ও টোটেমবিশ্বাসে। ভারতের, অস্ট্রেলিয়ার ও আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে দেখতে পাই পশু, পাখি ও বৃক্ষের নামানুসারে গোত্র ও ব্যক্তির নাম।[১] তার রেশ আজো রয়েছে আমাদের সমাজে–তোতা, ময়না, চম্পা, বকুল, বাঘা, সিংহ, রোহিত নাম দুর্লভ নয়।

মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে মুখ্যত কৃষিজীবী সমাজেই। প্রাচীন মানুষের ধারণায় মৈথুন ও প্রজনন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের।[২] এবং সন্তান উৎপাদন ও ফসল উৎপাদনের পদ্ধতিও ছিল তাদের চোখে অভিন্ন। ফসল উৎপাদনের আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াসে জাভার, নিউগিনির, অস্ট্রেলিয়ার, মেক্সিকোর অধিবাসীরা এবং ভারতের অদিবাসী সাঁওতাল হো, মুণ্ডা, পাঞ্চা, কোটর প্রভৃতি আজো মৈথুন উৎসব করে। R. Briffault বলেন : The assimilation of the fruit bearing soil to the child bearing women is universal.... the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same".[৩] আমাদের শাকম্ভরী দেবী আদ্যাশক্তি [প্রকৃতি] দুর্গাপূজার কলাবউ বা শস্যবধূ এবং দুর্গার অন্নদারূপ এ সূত্রে স্মর্তব্য। এবং হরপ্পার সীলেও মিলেছে লতাপ্রসূতি এই নারীমূর্তি।[৪] সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের এবং হঠযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার উৎস ও ভিত্তিও ঐ মৈথুনতত্ত্বে নিহিত। দেশীতত্ত্বের প্রভাবে আর্যমানসও এ তত্ত্বে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই বাজসনেয়ী সংহিতায় ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে আমরা মৈথুন, প্রজনন, জীবস, সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত দেখতে পাই। ছান্দোগ্যে মৈথুন যজ্ঞের সঙ্গে তুলিত হয়েছে : হে গৌতম, স্ত্রীলোকই যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই সমিধ, ঐ আহ্বানই ধূম, যোনিই অগ্নিশিখা, প্রবেশক্রিয়াই অঙ্গার, রতিসম্ভোগই স্ফুলিঙ্গ।' এবং এ যজ্ঞের ফলে আয়ু, সন্তান, পশু, কীর্তি ও মহত্ত্ব অর্জিত হয়। মন-মননের তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ফলে স্থূল চেতনা ও চর্যা সূক্ষ্ম প্রতীকীরূপে আজো বিদ্যমান। তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র, মণ্ডলচক্র, ভৈরবীচক্র, গোপীচক্র, নৈশচক্র, প্রভৃতি আজো সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। ডালিম ও সিন্দুর যেমন রজঃ প্রতীক, পদ্মও তেমনি যোনি প্রতীক। আদ্যাশক্তিই সৃষ্টিসম্ভবা, তাঁর থেকেই পুরুষের উৎপত্তি। তার সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়েই পুরুষ হয়েছে শক্তিমান–তাই পুরুষ প্রকৃতি তথা মায়া-ব্রহ্ম, শিব-উমা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা, করুণা-শূন্যতা প্রভৃতি নানা নামে নানা তাৎপর্যে দ্বৈত-অদ্বৈত রূপে, দ্বয়-অদ্বয় চেতনার সেই সৃষ্টিসম্ভব শক্তি-স্বরূপই জগৎ-কারণ, মৈথুনতত্ত্বেরই বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। এর বহুধা প্রকাশ দেখেছি সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে গাণপত্যে ও লিঙ্গায়েতে।

---

১. Golden Bough—James Frazer/ লোকায়ত দর্শন-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৩২-৩৪
২. Ancient Symbol Worship; H.M. Westrop. PP 23-29.
৩. The Mothers, Vol III, pp. 54; 57.
৪. Mahenjodaro and the Indus civilization; J. Marshall, Vol, 1 p. 52

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈথুন যেমন আদিতে সন্তান ও ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি পরে আবার রতি-নিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। তাই জে. ফ্রেজারও বলেন : Thus from the same crude philosophy the same primitive notions of nature and life, the savage my derive by different channels a rule either of profligacy or asceticism.[১]

কাজেই বামাচারী ও ব্রহ্মচর্য ও চর্যার ও সাধনার উৎস অভিন্ন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস এবং জাদু অনুষ্ঠান।[২] সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র যে অনার্য মানস-উদ্ভূত মত ও চর্যা তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না।[৩] শুধু তাই-ই নয় এ হচ্ছে অস্ট্রিক-মঙ্গোল মননের প্রসূন। এ অঞ্চলের আজীবিক, কাপালিক, লোকায়তিক প্রভৃতি যোগী-তান্ত্রিকেরা এ সাধনাই করত। কাশ্মীরে-নেপালে-তিব্বতে-চীনে এ সবের প্রচার ও প্রসার লক্ষণীয়। আমাদের জীবন-যাত্রায়, মনে-মননে, আচারে-সংস্কারে, শাস্ত্রে-সমাজে অপরিমেয় অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবের কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গুছিয়ে বলেছেন।[৪] এবং ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও আদি-অনার্য (অস্ট্রিক) সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের ব্রাহ্মণ্য শৈব-শাক্ত, জৈন ও বৌদ্ধ রূপান্তর বিশ্লেষণ করেছেন সুনিপুণ ভাবে।[৫] বশিষ্ঠ চীন থেকে তন্ত্রাচার লাভ করেন বলে কথিত। বিকাশ স্থান, নাম (চীনাচার) ও বৈশিষ্ঠ-প্রবাদে আমাদের সিদ্ধান্তে সমর্থন মেলে।

আধুনিক বিদ্বানদের মতে নারীতে ঐশীশক্তি আরোপ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, শিবের ও বিষ্ণুর শক্তি, মহিমা ও ক্রিয়ার ধারণা এবং আগমশাস্ত্র অবৈদিক।[৬] 'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি/লায়ে রামানন্দ/প্রকট কিয়া কবীরণে'-এ তথ্য নির্ভুল, কেননা কুমারিল ভট্ট অন্ধ্রদেশে, শঙ্করাচার্য কেরলায়, রামানুজ তামিলদেশে, মাধবাচার্য কর্ণাটে, নিম্বার্ক ও ভাস্কর দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত। এবং এঁরা দ্রাবিড়। –বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে দেখি সব বাদ দিয়ে চরম তত্ত্ব উচ্চারিত হচ্ছে 'আত্মাই ব্রহ্ম'।

বৃহস্পতিলৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এ কারণেই তাঁদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়। এঁরা বস্তুবাদী, অধ্যাত্মবাদী নন। বেদের আমল থেকেই এঁদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার আগেও যে লোকমনে এর 'জড়' ছিল, তা' অনুমান করা যায় বেদে এ মতের উল্লেখ থেকে। রামায়ণের জবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতম বুদ্ধের সমকালীন অজিতকেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি ও ভাগুরি, পুরন্দর, পুরাণ কসসপ, মকখালি গোসাল, পকধকচ্চায়ন, নাথপুত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী এবং নাস্তিক্যবাদের ধারক ও

---

১. Golden Bough-P. 138

২. লোকায়ত দর্শন পৃঃ ৫৩৯, ৪৫০।

৩. ক. History of Indian Philosophy (ভেলকার ও রানাডে) পৃঃ ৮১, ৪, ৫১, ৫২

খ. Philosophy of the Upanisads & Ancient Indian Metaphysics–A.E.gough পৃ ৮

গ. Philosophy of India–H.H. Zimmer.

ঘ. রচনাবলী (২য় খণ্ড) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৪. ৮৩।

ঙ. বৌদ্ধ ধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃ ৩৭।

চ. The obscure Religious Cult etc. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহক ছিলেন।[১] এ চিন্তাধারার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ, মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো স্ব স্ব ভূতে মিশে যায়। কাজেই কর্মফলভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। 'জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি'—এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক[২] উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্রবিরোচন উপাখ্যানে। বৌদ্ধমতের 'জড়'ও এখানেই নিহিত।

সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে প্রকৃতিকে তথা নারীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

In Tantric writings Female principle is personified and made prominent to the almost total exclusion of the male.

আচারভেদতন্ত্র মতে 'পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম বামাচারো ভবত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম।"

শক্তি সাধনাও এরূপ : The ambition of every pious follower of the system is to become identical with Tripura Sundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a woman.[৪]

সহজিয়া সাধনতত্ত্বও এরূপ : The Sahajias also believe that at a certain stage of the spiritual culture the man should transform himself into a woman.[৫] বৈষ্ণবের 'রাধাভাব' এবং গোপীভাবও এরূপ। তন্ত্রমতে পুরুষ এবং প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।[৬] সাংখ্যেও তাই।[৭] পরকীয়া সাধনার বিভিন্ন স্তরে 'বামাচারী তান্ত্রিক চর্যার নারী সঙ্গী' দরকার হয় — রজকী, শবরী, ডোমনী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী, ত্রিপুরা-সুন্দরী প্রভৃতি নানা নামে সঙ্গিনী বিভিন্ন মতবাদীর মধ্যে প্রচলিত। এর শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক নাম 'শক্তি'। সাধকের মাধ্যানাসুরে সঙ্গিনী নির্বাচনকে বলে কুল, — এ নির্বাচনযোগ্যতাকে বলে কৌলজ্ঞান।

অতএব সাংখ্যের, যোগের, শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধতন্ত্রের মূলকথা — 'যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। —ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্টন্তি কলেবরে।'[১] -কাজেই দেহভাণ্ড খোঁজ, সব পাবে। — 'দেহের সাধন সর্বসার, তীর্থব্রত যার জন্যে/এদেহে তার সব মিলে।' ছান্দোগ্য উপনিষদেও এ তত্ত্ব মেলে। বিরোচন বলেছেন—'এই পৃথিবীতে দেহের পূজা করবে, দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহীয়ান ও পরিচর্যা করলেই ইহলোক ও পরলোক—এ উভয় লোকই লাভ হয়।" (৮।৮।৪)। মহাভারতের উদ্দালক ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান থেকে জানা যায় 'গাভীগণের মতো স্ত্রীগণ শতসহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই নিত্যধর্ম।' বার্হস্পত্য সূত্রে আছে 'সর্বথা লোকায়িতকমেব শাস্ত্রমর্থ সাধনকালে কাপালিকমেব কামসাধনে।' গুণরত্ন বলেছেন, 'কাপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। লোকায়তিকরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায়, এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। বছরে একদিন বা পাঁচদিন তারা এক স্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয় — অর্থাৎ কামোৎসব করে। দেশী বিদেশী আদিবাসীদের [চিলিতে, মেক্সিকোতে, নিরাকাগুয়ায় এবং হো, পাঞ্চা, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এখনো এ উৎসব চলে[২]] মধ্যে আজো সেই মৈথুন-উৎসবের রেশ রয়ে গেছে। W. Gooke এতে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা ছিল বলে মনে করেন।[৩] মাধবাচার্য বলেছেন, 'লোকায়তিকরা কামাচারী— অর্থ ও কাম-সাধনাই তাদের লক্ষ্য।' অতএব দেখা যাচ্ছে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র-তত্ত্ব নির্ভর একটা সর্বব্যাপী সাধনা এদেশে গোড়া থেকেই চালু ছিল। কালান্তরে, স্থানান্তরে এবং জনান্তরে তার বিচিত্র এবং বহুধা বিকাশ-বিস্তার ঘটেছে মাত্র। কিন্তু মূলে রয়েছে সেই আদিম মৈথুনতত্ত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্যেই বলেছেন : 'সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরী-ভজা, কর্তাভজা পরকীয়া সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১] ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, বাঙলাদেশে এবং তার সংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে খ্রীস্টীয় আট শতক থেকে বারো শতক অবধি তন্ত্রের প্রভাবে মহাযান মতে বজ্র-সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হয়। বাঙলাদেশের হিন্দু তন্ত্রগুলো বারো শতক থেকে পনেরো শতকের মধ্যে রচিত। এই তন্ত্রসাধনাই বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাগীতি হয়ে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে— বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ে তার ক্রমপরিণতি ঘটেছে। এবং সতেরো শতক থেকে এই তন্ত্র নবরূপে বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

নাথ, তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া ও বাউল—সবাই দেহচর্যাকেই মূলব্রত করেছে। তান্ত্রিক সহজিয়া ও বিশেষ বিশেষ বাউলপন্থী রতিপ্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে এ সাধনা করে। যোগবলে শুক্র নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটা অনুভব সৃষ্টি করা চলে, যাতে স্থায়িভাব হচ্ছে কেবল আনন্দ। এ আনন্দকে মহাসুখ, সহজানন্দ, কিংবা শূন্যতা বলে বজ্র সহজযানীরা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুকুমার সেনও নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, নাথপন্থ, বৈষ্ণবসহজিয়াপন্থ ও বাউলপন্থ বৌদ্ধ মহাযান প্রসূত মন্ত্রযান, বজ্রযান ও সহজযান থেকে উদ্ভূত বা এ সবের অনুসৃতি'।[২]

২. নাথসাহিত্য

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে "নাথপন্থা যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত বা প্রভাবিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই নাথপন্থ বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৩] এই নাথপন্থারই অপর নাম বজ্রসিদ্ধি। আগেই বলেছি, বৌদ্ধ বিলুপ্তির সময়ে নিম্নবিত্তের বৌদ্ধেরা স্বধর্ম রক্ষার প্রয়াসে বাহ্যত ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ও সমাজ অঙ্গীকার করে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হয়ে আত্মরক্ষা করেন। এ সময়েই প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা, করুণা-শূন্যতা, নাথ-নিরঞ্জন প্রভৃতি পরিহার করে তারা মুখ্যত আদিনাথ-আদ্যাশক্তির বদলে হর-গৌরী নাম বরণ করে। ক্রমে আদিনাথ ব্রহ্মে, আদিনাথ-চন্দ্রনাথে, বৈদ্যনাথ-শিবে, তারা চণ্ডীতে-পার্বতীতে, লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুতে, জাঙ্গুলী-মনসায়, বৎসলা-বাসুলীতে রূপান্তরিত হয়ে হিন্দুর দেবতা রূপে গৃহীত হন। ষোল শতকেও অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এসব দেবতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। বৃন্দাবন দাস চণ্ডী-মনসা-বাসুলী-যক্ষ পূজাকে অনাচার বলে মনে করেছেন।

তাঁতীশ্রেণীর বৌদ্ধরাই প্রধানত নাথপন্থী। এদের কুলবাচি আজো নাথ। তাই এরা 'নাথযোগী বা যুগী' নামে পরিচিত। এদেরই একটা বিরাট অংশ ইসলাম বরণ করে 'জোলা' [জুল্‌হা] নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রমাণে-অনুমানে মনে হয়, আদিনাথ-মীননাথ কাহিনীর শুরু আট শতকে। এবং মীননাথ গোরক্ষনাথ কিংবা হাড়িপা-কানুপা-কাহিনীর উদ্ভব তার পরেই। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও মানিকচাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদ কাহিনী দশ শতকের আগেকার নয়। অতএব, আট-দশ শতকের কায়াসাধনার রূপক কাহিনী মুখে মুখে চালু ছিল। ষোল শতকের মীননাথ-

১.শাক্তসাহিত্য, পৃঃ ১১-১২।

২. এ প্রসঙ্গে 'চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড) পৃ ১৭, ২২, ২৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোরক্ষনাথ কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়' রূপে লিখিত রূপ পায়। গোপীচাঁদ গানও সতেরো-আঠারো শতকের লিখিত পাঁচালীতে স্থিতি পায়, কিন্তু মানিকচাঁদ-ময়নামতী গাথা লোক-সাহিত্য রূপে বিশ শতকেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়। এ সব কাহিনী বৌদ্ধজ হিন্দু-মুসলিমই রক্ষা করেছে। কেননা অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে তারা বৌদ্ধ মত ও চর্যার গুপ্ত অনুসারী ছিল। এদের প্রয়োজনে লাগেনি বলেই হয়তো বৌদ্ধ যুগের যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত [সম্ভবত, যোগ, ভোগ ও জড়বাদের প্রতীকগাথা] লোপ পেয়েছে।

মৌখিক নাথসাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে হাজার বছর পূর্বের জীবনচেতনার, জীবনযাত্রার, সমাজের ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন ও আভাস মেলে।

নাথসাহিত্য বলতে আমরা নিম্নলিখিত রচনাগুলোকেই জানি :

১. গোরক্ষবিজয় ২, মানিকচন্দ্র রাজার গান ৩. ময়নামতীর গান ৪. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ৫. যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত ৬. চোরঙ্গীনাথ ৭. সাধন মাহাত্ম্য। ৮. যোগীর গান ৯. যোগীকাচ ১০. যোগচিন্তামণি।

হিন্দি-মারাঠী-উড়িয়া-তিব্বতী ভাষায়ও এসব কাহিনী রয়েছে। বিশেষ করে মীননাথ [মৎস্যেন্দ্রনাথ-মছলন্দর] গোরক্ষনাথ কাহিনী সর্বভারতীয় এবং নেপাল তিব্বতেও প্রচলিত। গোরক্ষপন্থীর সংখ্যা আজো নগণ্য নয়। নাথযুগীদের ধর্মে-কর্মে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য। এরা যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এও তার এক বড় প্রমাণ। আদিতে যে যোগতান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা নির্বাণ, তা-ই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, দীর্ঘজীবন এবং অলৌকিক শক্তি অর্জনই হল সাধনার উদ্দেশ্য। যদিও অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টসিদ্ধি নামটি অপরিবর্তিত রইল কিন্তু অষ্টসিদ্ধবস্তু বদলাল; গুলো হচ্ছে—যোগ, মন্ত্র ও তন্ত্র বলে অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার অবলম্বন—১. অণিমা [অণু হবার শক্তি], ২ লঘিমা [লঘু হবার শক্তি], ৩. গরিমা [গুরুভার হওয়ার শক্তি], ৪. প্রাপ্তি [ইচ্ছামাত্র প্রাপ্তি], ৫. মহিমা [বৃহৎ], ৬. প্রকাম্য [যথেচ্ছ প্রাপ্তি], ৭. ঈশিত্ব [প্রাধান্য], ৮. বশিত্ব [বশীভূত করার শক্তি]-এর মধ্যে পার্থিবতাই প্রকট। ভূতসিদ্ধি খেচরসিদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যেই কায়াসাধন চলে। আদিতে চৌরাশি আঙুল-পরিমিত কায়ার সাধনে সিদ্ধ আদিনাথ-মীননাথ-গোরক্ষনাথ-চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি মন্ত্রী-বজ্রী-সহজী-তন্ত্রীদের সাধারণ গুরু ছিলেন। পরে যখন মত ও চর্যার বিশেষ পার্থক্য দেখা দিল, তখন গুরু পরম্পরার নামও ভিন্ন হয়ে গেল। পরে স্মৃতিভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলো চৌরাশিজন ব্যক্তিসিদ্ধা খুঁজতে থাকে। তার ফলেই বজ্র-সহজযানী চৌরাশি সিদ্ধা ও চৌরাশি নাথসিদ্ধার তালিকার মিল ও অমিল নয় শুধু, অসম্পূর্ণতাও দেখা দিল।

আগেই বলেছি, মহাজ্ঞান মন্ত্র হুঙ্কার, কুলবৃক্ষ বকুল, অঙ্গীকার [তন্ত্রের] দশ বীজ, আভরণ রুদ্রাক্ষমালা, আহার্য কচুশাক আর কানে কড়ি, কুণ্ডল, শঙ্খ, গায়ে ভস্ম, কাঁধে কাঁথা-ঝুলি, গলায় নয় গুণ সূতা, হাতে খর্পর প্রভৃতি নাথযোগী সন্ন্যাসীর চর্যা ও সজ্জা। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীদের সেব্যে ও সজ্জায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে। দেহাধার সম্পর্কিত 'চাঁদ সূর্য, ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না, রবি-শশী, মন-পবন, অনাহত ধ্বনি, গঙ্গা-যমুনা, শশধর, মনরাজ প্রভৃতি বজ্রসহজযানী সাধনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধর্মপূজাপদ্ধতি থেকে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল 'প্রাণসংকলি' উদ্ধৃত করেছেন ঃ[১]

নমহোঁ আদিনাথ সুন নাথ সঙ্খেদ
কহ কহ দেব কায়ার সভেদ।—
কোন্ মতে নাদ-বিন্দু হয় পবন সঞ্চয়

১. গোর্খ বিজয়—ভূমিকা, পৃষ্ঠাঙ্কহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথা বৈসে রবি-শশী কোথা বল রয়।
কোন্ মতে নাদ-বিন্দু কায়ার বিচার।

তিনি বলেন, 'দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে প্রথমেই আদ্যের গোসাঞী ধর্মঠাকুরকে বন্দনা করা হইয়াছে এবং সাত সিদ্ধা ধর্মঠাকুরের অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছেন। কাজেই নাথ ও ধর্মসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। জাতিতে তিলি, পদবী নাথ, কুলদেবতা ধর্মঠাকুর এরূপ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পশ্চিমবঙ্গে অনেক আছেন।— ইহা ছাড়া বাঙ্গালাদেশের যুগী-কাচ, যোগীর গান, বোলান, বাউলসঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই যুক্তধারা [ধর্ম ও নাথপন্থের] নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও আপনার পথ আপনি কাটিয়া অব্যাহত প্রবহমান।"[২]

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে [যাহারা] "নিরঞ্জনপন্থী, কনফট, মচ্ছেন্দ্রী, সারঙ্গীহার, কানিপা ইত্যাদি নামে পরিচিতি আছেন তাহারা [সন্ন্যাসীরা] নাথপন্থেরই পথিক। বাঙ্গালাদেশে নাথপন্থী সাধুরা এখন শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নাথপন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।— নাথপন্থ নিরীশ্বর।—ধর্মমঙ্গল শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ ঐতিহ্যের নিরঞ্জন আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণকথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা একই।"[৩]—আমাদের মতে মূল উৎস মহাযান প্রসূত মন্ত্র-বজ্র-কালচক্র-সহজযান ও তন্ত্র বলেই এরূপ সাদৃশ্য ও মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু লক্ষ্মণ ও সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণে' ধর্মপন্থ ও নাথপন্থ প্রায় অভিন্নরূপে প্রতীয়মান। শুধু তা-ই নয়, যে প্রশ্ন আমরা চর্যাগীতিতে দেখেছি, সে জিজ্ঞাসা এখানেও প্রবল।

১. সরুআ সংকীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ

২. পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা
মৎস্য নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।

তুল : কমল বিকশিল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবি ধোকে ন ভ্রমরা।

৩. পুতকি দুগধে/সমুদ্র উথলিল/পর্বত ভাসিয়া যায়।

৪. মধ্য সমুদ্রে/নৌকা রাখিনু/ কাঁকড়া ধরিল কাছি

৫. মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল/পিপিড়ার মনে হাসি।-

৬. দূর্বার ডালে/ঘুঘুর বাসা/তায় কেন কাকের ছা।
গাই বুড়াইল/বলদ বিয়াইল/চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন
আকাট ঝাঁঝার/পুত্র হইয়াছে/ সে খাত্যে চায় পায়রার দুধ।
শকুনি দুগধে/লাকড়ি শুষিল/বিলাই পালায় তরাসে।—

৭. মৎস বলিয়া/দোয়াড়ি শুনিতে যাই/হরিণী পালায় লাফে লাফে
বাঘে বলদে/হালখানি জুড়িলাঙ/মন-পবন তাহার কৃষাণ।
তালের গাছে/শোলের পোনা/সয়চানে ধরি ধরি খায়
পর্বত শিখরে/পানি উজাইল/চৌরঙ্গী পলু লয়্যা ধাএ।
[অনিলপুরাণ, দ্বিজলক্ষ্মণ]

---

২. গোর্খ-বিজয়—ভূমিকা।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাথদেরও যোগসাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজাবস্থা প্রাপ্তি। শুক্র ঊর্ধ্বগামী করা, বায়ু নিরুদ্ধ করে চিত্ত নিষ্ক্রিয় করাই কায়াসাধনার লক্ষ্য—পরিণামে আত্মজ্ঞান, অষ্টসিদ্ধি, অজরত্ব এবং অমরত্ব লাভ হয়।

মন থিরতো বচন থির
পবন থিরতো বিন্দু থির
বিন্দু থিরতো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।

নাথসাহিত্যে আমরা স্পষ্টত দুটো ধারা দেখতে পাই, একটি বামাচারী হাড়িপা-কানুপা-ময়নামতী-গোপীচাঁদ উপাখ্যানে বিবৃত, অন্যটি ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী যা মীননাথ-গোরক্ষনাথ আখ্যানে বর্ণিত। চর্যাগীতিতেও এই দুই ধারার আভাস রয়েছে [কাহ্নপার পদ স্মর্তব্য]। শিবপ্রোক্ত 'মহাজ্ঞান' হচ্ছে কায়াসাধন তত্ত্ব তথা শুক্রনিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব [শুক্র/যার বৌদ্ধনাম বজ্রসত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ] যার ফলে সহজানন্দ, সচ্চিদানন্দ, নির্বাণ, শূন্যতা প্রাপ্তি এবং অজরত্ব-অমরত্বও ঘটে। মহাজ্ঞান প্রচারে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এ জন্যেই—

যতেক জ্ঞান-কথা শিব-দুর্গাকে কহিব
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।

গোড়াতে বামাচারী ও ব্রহ্মচর্য সাধনায় সবমূল্য দেয়া হলেও নাথ সাহিত্যে তান্ত্রিক-কাপালিক-পরকীয়া সাধনার উপরে ঠাঁই দেয়া হয়েছে ব্রহ্মচর্য অবলম্বিত সাধনার।

AMARBOI.COM

৩. মহাজ্ঞান ও উপাখ্যানসমূহ

এখানে হর-পার্বতীর, মীননাথ-গোরক্ষনাথ এবং ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ আখ্যানের সার সংকলন করে দিচ্ছি :

কৈলাসে হরগৌরীর সংসারে মীননাথ ও হাড়িপা শিবের সহচর হিসেবে আছেন। আবার তাঁদের দুজনেরও রয়েছে দুই শিষ্য। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, আর হাড়িপার শিষ্য কানুপা। গৌরীর হঠাৎ বাসনা হল শিবের থেকে 'মহাজ্ঞানতত্ত্ব' জানার। 'মহাজ্ঞান' আয়ত্তে এলে মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

তুমি কেনে থাক গোঁসাই আমি কেনে মরি
সেই তত্ত্ব কহ গোঁসাই যুগে যুগে তরি।

কাজেই 'মহাজ্ঞান' প্রচার হয়ে গেলে সবাই 'অমর' হতে চাইবে, তাতে সৃষ্টির নিয়ম বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব এ গুপ্ত ব্যক্ত করা যায় না। এদিকে পত্নীর আবদারে শিব বিচলিত। অবশেষে স্থির হল সমুদ্রে টুঙ্গি তৈরি করে নির্জনে গৌরীকে মহাজ্ঞানতত্ত্ব শোনাবেন শিব। সে ব্যবস্থা হল। এদিকে মীননাথ টের পেয়ে বোয়াল মাছ হয়ে টুঙ্গির নিচে মহাজ্ঞান শুনবার জন্যে উপস্থিত। নারীর পেটে কথা থাকে না, কাজেই সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায় ধর্মনিরঞ্জন গৌরীর ওপর মায়ানিদ্রা বিস্তার করলেন। ভোলানাথ শিব মহাজ্ঞানতত্ত্ব বিবৃত করলেন। গৌরীর হয়ে হুঁ হুঁ করে সায় দিয়ে মীননাথ 'মহাজ্ঞান' পেয়ে গেলেন।

আবার হঠাৎ একদিন গৌরীর মনে প্রশ্ন জাগল মীননাথ-গোরক্ষনাথেরা বিয়ে করে না কেন? শিবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—এঁরা সিদ্ধপুরুষ কাজেই কামমুক্ত জিতেন্দ্রিয়, 'কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ রহিল এড়াই।' গৌরী তাঁদের পরীক্ষা করবার বাসনা প্রকাশ করলে শিব অনুমতি দিলেন। মহামায়া গৌরী মায়া বিস্তার করলেন। একদিন সব সিদ্ধাকে নিমন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পরমা সুন্দরী গৌরী তাঁদের আহার্য পরিবেশন করছিলেন। ছলনাময়ী রূপসীর রূপ-যৌবন-ফাঁদে আটকা পড়লেন সবাই, কামপীড়িত হয়ে তাঁকে কামনা করছিলেন সবাই কেবল গোরক্ষনাথই রইলেন স্বস্থ নির্মোহ। তিনি মনে মনে ভাবলেন এমন রূপসী পেলে তাঁকে মা করে রাখব। বিজয়িনী গৌরীর শাপে মীননাথ কদলীনগরে কাম-সম্ভোগ করতে গেলেন—'ষোল শত রমণী লৈয়া কর গিয়া কেলি।' হাড়িসিদ্ধা গেলেন মেহেরকুলে বা পাটিকায় বা পট্টিকের রাজ্যে যেখানে ময়নামতীই রানী। রূপবতী গৌরীর রূপমুগ্ধ হাড়িপা—

তবে মনে চিন্তিলেক হাড়িপা সিধাই
এমন সুন্দরী কভু আক্ষি যদি পাই।
হাড়ি কর্ম করি যদি থাকি তার পাশ
হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলা এহি বর
হাড়ি-রূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর
হাতে ঝাড়ু লও তুমি কান্ধেতে কোদাল
মেহের কুলেতে চল বর পাইলে ভাল। [গোরক্ষ বিজয়,পৃঃ ১৯-২০]

সেখানে জালন্ধরী ওর্ফে হাড়িপা হাড়িবৃত্তি নিয়ে অর্থাৎ ঝাড়ুদার হয়ে রইলেন। তাঁদের শিষ্য গোরক্ষনাথ ও কানুপা স্বতন্ত্রভাবে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

গৌরী গোরক্ষনাথকে টলাবার জন্যে উলঙ্গ হয়ে তার সমুখে আসলেন, মাছি হয়ে তাঁর উদরে প্রবেশ করলেন, তবু তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেননি, বরং লাঞ্ছিতা হলেন। গোরক্ষনাথকে শিব একবার তপস্বিনী পত্নী লাভের বর দিয়েছিলেন। বর অব্যর্থ। শিবের বরে এ গন্ধর্বরাজকন্যা গোরক্ষনাথের প্রেমে পড়ে তাঁকে পতিরূপে বরণ করে। যোগী ব্রহ্মচারী গোরক্ষ মহাফাঁফরে পড়লেন। অবশেষে পত্নীকে কোপীন (কর্পটি) ধোয়া পানি পান করিয়ে পুত্রবর দান করে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। এভাবে যথাকালে যে সন্তান হয় তারই নাম কর্পটিনাথ। এদিকে ডাহুকার গড়ে কামুক কানুপার মাথা কাটা যায় এবং শিষ্য বাইল ভাদাই তাঁকে বাঁচায়। গাভুর সিদ্ধ চৌরঙ্গীনাথ বিমাতার সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে হাত-পা হারায়—'সৎমায়ে ভজিবে তুমি দেখিয়া জোয়ান/তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান'। গোরক্ষনাথ ও কানুপা দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের স্ব স্ব গুরুর খোঁজ খবর জানতেন না। কিন্তু একে অপরের গুরুর সন্ধান জানতেন। একদিন আকস্মিকভাবে গোরক্ষনাথ ও কানুপার সাক্ষাৎ হল পথে, তাঁরা স্ব স্ব গুরুর পতনের সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। উভয়েই স্ব স্ব গুরুর সন্ধানে ও উদ্ধারে ছুটলেন।

মীনচৈতন্য বা গোরক্ষবিজয় কাহিনীর এবং ময়নামতী গোপীচাঁদ আখ্যানের উদ্ভব এখানেই। এখান থেকেই দুটো স্বতন্ত্র পাঁচালীর বা গাথার শুরু।

৪. মানিকচাঁদ-ময়নামতী আখ্যান

মানিকচন্দ্র ছিলেন ষোল বঙ্গের রাজা। মেহেরকুল ছিল তাঁর রাজধানী। তিলকচাঁদের [ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব] কন্যা ময়নামতী ছিলেন তাঁর রানী। স্বামী-স্ত্রীতে তেমন সদ্ভাব ছিল না। ময়নামতী ছিলেন সিদ্ধা ডাকিনী যোগিনী। মানিকচাঁদের দেওয়ান প্রজাপীড়ন করত বলে প্রজাদের শাপে ধর্মরাজের ইচ্ছায় রাজার আয়ু কমে মাত্র ছয় মাসে ঠেকল। ময়নামতী এসংবাদ জানতে পেরে মানিকচাঁদকে মহাজ্ঞান দিয়ে অমর করে রাখতে চাইলেন, কিন্তু পৌরুষ-ও আভিজাত্যগর্বী রাজা স্ত্রী ময়নামতীকে বা হাড়িকে গুরু মেনে দীক্ষা গ্রহণে রাজি হলেন না। ফলে যথাসময়ে গোদাযম এল তাঁর প্রাণ হরণের জন্যে। খবর পেয়ে ময়নামতী গোদাযমের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। সে লড়াই চলল জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে-মর্ত্যে-পাতালে-স্বর্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লড়াইকালে ময়না ও গোদাযম সিদ্ধি বলে নানা পশু-পাখি-কীট-সরীসৃপ রূপ ধারণ করে যুদ্ধ করলেন। তবু মানিকচাঁদের প্রাণ ফিরে পাওয়া গেল না। কারণ সাধনা যার নেই তাকে অন্যে বাঁচাতে পারে না। ব্যর্থ প্রয়াসে হতাশ ময়নামতীকে গোরক্ষনাথ পুত্রবর দিয়ে প্রবোধ দান করে রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

৫. ময়নামতী-গোপীচাঁদ উপাখ্যান

ময়নামতী যতি গোরক্ষনাথের বরে পুত্র লাভ করলেন, নাম রাখলেন 'গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র।' তার খেলার সাথী হিসেবে আর একটি শিশু কুড়িয়ে পাওয়া গেল তার নাম কেতু বা খেতুয়া। বারো বছর বয়সে বিয়ে হল গোপীচাঁদের হরিশচন্দ্র রাজার মেয়ে অদুনার সঙ্গে, যৌতুক হিসেবে পাওয়া গেল তার বোন বা মাসতুতো বোন পদুনাকেও। [পদুমাকে]। অন্যমতে রতনমালা বা কাঞ্চনমালা কিংবা চন্দনা ও ফন্দনা নামে আরো দুই স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন গোপীচাঁদ। দৈবজ্ঞ এসে জানিয়ে গেল গোপীচাঁদের আয়ু রয়েছে মাত্র বিশ বছর। এক বা বারো বছর ধরে সন্ন্যাস জীবনে যোগসাধনা না করলে তার মৃত্যু রোধ করা যাবে না। হাড়িপা'র কাছে দীক্ষা নিয়ে অবিলম্বে গৃহত্যাগ প্রয়োজন। রমণসুখ ভোগী গোপীচাঁদ এমন সুখের সংসার ত্যাগ কতে নারাজ। তার পত্নীদেরও আপত্তি প্রবল। স্নেহাতুরা মাতা ময়নামতীও স্বল্পায়ু পুত্রকে জোর করে গৃহত্যাগ করিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে দৃঢ়সংকল্প। তাই মাতা-পুত্রে, শাশুড়ী-বধূতে লাগল ষড়যন্ত্রাশ্রিত দ্বন্দ্ব-বিবাদ। অবশেষে মাতার জয় হল। গোপীচাঁদকে অনেক তত্ত্ব বুঝিয়ে, ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে, হাড়িপার সিদ্ধির ও অলৌকিক শক্তির দৃষ্টান্ত নিয়ে তাকে দীক্ষা গ্রহণে রাজী করানো সম্ভব হল। বারো বছরের পথিকজীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। রাজপুত্রের অহঙ্কার বিনাশের জন্যে গুরু হাড়িপার কৌশলে গোপীচাঁদকে হীরা নটীর বা সুলোচনা বেশ্যার দাসত্ব করতে হল। গুরুর গাঁজার বা মদের পয়সা যোগাতে ঋণী গোপীচাঁদের মাত্র বারোটি কড়ি বা বুড়ির অভাবে এ দাসত্ব। পরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তথা 'মহাজ্ঞান' পেয়ে অজর অমর হয়ে ফিরে এল গোপীচাঁদ ঘরে-সংসারে।

৬. মীন-চেতন বা গোরক্ষবিজয় উপাখ্যান

মীননাথ মনে মনে রূপসী গৌরীকে কামনা করায় দেবীর শাপে কদলীনগরে নারীরাজ্যে 'ষোলশ' নারীর কবলে পড়লেন। সর্বক্ষণ নারীবেষ্টিত থেকে কামাভিভূত মীননাথ 'মহাজ্ঞান' বিস্মৃত হলেন, হারালেন তাঁর পূর্ব সাধনালব্ধ সিদ্ধি। দেহ তাঁর এখন জরা-মৃত্যুর অধীন। তাঁর শিষ্য যোগী গোরক্ষনাথ কানুপার মুখে তাঁর গুরুর এই নৈতিক পতনের সংবাদ পেয়ে অতিকষ্টে কদলীনগরে উপস্থিত হলেন। নারীমহলে বন্দী গুরুর সাক্ষাৎ পেতে ছদ্মবেশী গোরক্ষের নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। অবশেষে অন্দরে প্রবেশ করলেন নটীবেশে। আত্মবিস্মৃত গুরু শিষ্যকেই চিনতে পারেননি। মাদলে নানা সাংকেতিক ও প্রতীকী ধ্বনি তুলে মীননাথ পুত্র বিন্দুনাথকে হত্যা করে [অবশ্য পরে জীবিত করেন] বহু কষ্টে অবশেষে গুরুর পূর্ব চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন শিষ্য। এজন্যেই গোরক্ষবিজয়ের অপর নাম মীনচৈতন্য।

আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র/উন্মুক্ত গরল চন্দ্র/এই চারি শরীর ব্যাপন
আদিন চন্দ্র করি স্থিত/নিজচন্দ্র সহিত/উন্মত্ত করিয়া সন্ধান
গরলচন্দ্র সব কর পান/চারিচন্দ্র সম্বরিয়া/ভবসিন্ধু তর গিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামচর্চা যে জীবনবিধ্বংশী এবং শুক্র বা বিন্দুধারণই যে অজরত্ব, অমরত্ব ও আনন্দলাভের উপায় নাথসাহিত্যে উপাখ্যান মাধ্যমে তা-ই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নাথসাধনা বামাচার বর্জিত যোগসাধনা। নাথসাহিত্যে একটি অনন্যতা আছে। শিষ্যও যে পতিত গুরুর উদ্ধার সাধন করতে পারে, সিদ্ধিগত যোগ্যতা যে জাত-বর্ণ-বিত্তের ঊর্ধ্বে এবং পুত্রহিতকামী মাতাও যে পুত্রের বৃহত্তর স্বার্থে ও কল্যাণে নিষ্ঠুরের মতো কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অটল থাকতে পারে, গৌতমবুদ্ধের মতো রাজ-ভোগ ত্যাগ করে বৈরাগ্য বরণেও যে একটা চাঞ্চল্যকর অনন্যতা আছে, তার দৃষ্টান্ত মেলে নাথ-আখ্যানে। নাথসাহিত্য যেন বামাচারী-পরকীয়া-তান্ত্রিক সাধনার প্রতিবাদ। মূল বজ্র-সহজযানের এ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য বিবর্তন। এখনকার নাথ-সাহিত্য ঈশ্বরবাদী, মূলে ছিল নিরীশ্বর, এখনকার নাথসাহিত্যে শিব-উমা, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য আচারনিষ্ঠা প্রভৃতি অনুপ্রবিষ্ট, মূলে ছিল ধর্মনিরঞ্জন, আদিনাথ, আদ্যাশক্তি। কিন্তু নাদবিন্দুতত্ত্ব তথা কায়-সাধনতত্ত্ব প্রায় অবিকৃতই রয়েছে।

৭. নাথসাহিত্যের রচয়িতা পরিচিতি

নাথ আখ্যানগুলো দশ-এগারো শতকেই বৌদ্ধ বজ্র-সহজযানীদের প্রাবল্যের যুগেই রচিত তথা মুখে মুখে চালু হয় বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ এ আখ্যানগুলো কয়েকটি বাস্তব ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক—যেমন মীননাথ, জালন্ধরী পা, কানুপা, গোরক্ষনাথ তাঁদের স্বকালে তাঁরা স্বসমাজের সিদ্ধপুরুষ রূপে স্বীকৃত না হলে তাঁদের সম্বন্ধে যেসব অলৌকিক কাহিনী স্বকালে প্রচারিত হয়ে পরবর্তীকালে পল্লবিত হয়েছে ইতিহাসবিরল সেযুগে সমকালে চালু না হলে পরে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেত। দেশে বৌদ্ধবিলুপ্তি কালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলিম স্ব স্ব ধর্মমতের সঙ্গে সমন্বিত করে ঈষৎ রূপান্তরে যোগ-তান্ত্রিক চর্যা ও তত্ত্ব চালু রেখেছে। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সূফী-বাউলে তা প্রকট। কাজেই গত আটশ বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দেহতত্ত্বে ও কায়াসাধনে সমভাবে যে নিষ্ঠ তা স্বীকার করতে বাধা নেই। অতএব শেখ বা মীর ফয়জুল্লাহ্ও 'গোরক্ষবিজয়' রচনা করতে পারেন এবং তা ষোল শতকেই। কারণ ষোল শতকে কোনো মুসলিমের পক্ষে যদি 'গোরক্ষবিজয়' রচনা করা সম্ভব না হয়, তা হলে সতেরো-আঠারো -উনিশ শতকে তাঁর শাস্ত্র-নিন্দিত বিষয়ে এবং হৃত বা বর্জিত ঐতিহ্য নিয়ে কোনো মুসলমানের নতুন করে কিছু লেখার পরিবেশ বা প্রেরণা কোনটাই পাওয়ার কথা নয়। কাজেই মুসলিম লেখকদের বিদেশীর বংশধর বলে অনুমান করে তাদের রচনায় কালজ্ঞাপক শ্লোকের পাঠ পরিবর্তন করে মনমত কাল নিরূপণ অসঙ্গত।

'গোরক্ষবিজয়' পাঁচালী ফয়জুল্লাহরই রচনা। কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমসেন রায়, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন প্রভৃতি গায়ক মাত্র। লৌকিক গাথাকে তিনি পাঁচালীর রূপ দিয়েছেন ষোল শতকে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় চাকরী, রাধাকানু, বেশ (বেশী) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখে রচনাকে আধুনিক বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু গায়েনের আসরে গীত পাঁচালীর ভাব-ভাষা যে সমকালীনতা পায়—এ স্বীকৃত তথ্যই এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। 'গোরক্ষবিজয়ের' বোধ হয় মোট ষোলখানা পুঁথি সংগৃহীত রয়েছে। আটখানা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের, সাতখানা অধ্যাপক আলী আহমদ এবং একখানা ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী (ভণিতা শ্যাম দাস) সংগৃহীত। ষোলখানাতেই ফয়জুল্লাহর ভণিতা এবং এগারোখানাতে এককভাবে ফয়জুল্লাহর ভণিতা মেলে। ভট্টশালী সম্পাদিত পুথিখানার নাম 'মীন-চেতন'। এবং ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত বিশ্বভারতীর পুথিখানার নাম 'গোর্খবিজয়' দেয়া হয়েছে। ভট্টশালী শ্যামদাসকে এবং মণ্ডল ভীমসেন রায়কে ভণিতা দৃষ্টে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ১৯১৫ সনে ডক্টর ভট্টশালী এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১৭ সনে সাহিত্যবিশারদ তথ্য-প্রমাণের স্বল্পতা হেতু যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এড়াতে পারেননি, পরবর্তীকালে তথবাহুল্য সত্ত্বেও ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল অকারণে অবাঞ্ছিত জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বাহুল্যবোধে আমরা বিতর্কে নামব না। সবার সব যুক্তির ও সিদ্ধান্তের একটি একটি করে খণ্ডন করারও আজ আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণের অভিঘাতে সে-সব স্বতঃখণ্ডিত হবে বলেই বিশ্বাস করি।

প্রথমত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বহু বছর আগে বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে একটি পুথিতে যে অংশটুকু পেয়েছিলেন, তার ভণিতায় সন্দেহ করবার মতো কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। কারণ 'গাজীবিজয়ও পাওয়া গেছে।'[১] তাতে রয়েছে :

গোর্খবিজয় আদ্যে মুনিসিদ্ধা যত
কহিলাম সব কথা শুনিলাম যত।
খোটাদূরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজএ সেহ মোক হৈল রাজি।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লাহ্ ভণে ভাবি দেখ মন।

এ পদবন্ধ লক্ষ্য করলে কবির এক বিশেষ মানসপ্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রবণতা ছাড়াও বীরপূজার প্রেরণাও ছিল প্রবল, তাই সিদ্ধগুরু গোরক্ষনাথের, দরবেশ পীর ইসমাইল গাজীর, পীরনারায়ণ সত্যের মাহাত্ম্য কথা তিনি রচনা করেছেন। রচনার বিষয়, ভাব ও উদ্দেশ্যগত মিল লক্ষণীয়। এমনি মানসপ্রবণতা ও বীরপূজা লক্ষ্য করেছি আমরা উনিশ শতকের কবি নবীনচন্দ্র সেনের মধ্যেও। কবি কৃষ্ণরাম দাসও এমনি বীরপূজার আগ্রহ বশে সব স্বল্প মর্যাদার অরিদেবতার মাহাত্ম্য কথা রচনা করেছেন।

ইসমাইল গাজী রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) অধীনে সেনানী-শাসক ছিলেন এবং তাঁর আদেশেই গাজী নিহত (১৪৭৪ খ্রীঃ) হন। কাজেই ইসমাইল গাজী পনেরো শতকের তৃতীয় পাদে বর্তমান ছিলেন। তাঁর দরগাহ ও প্রসিদ্ধি আজ অবধি বর্তমান ও স্থান। কাজেই ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে নিয়ে পাঁচালী রচনা অস্বাভাবিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমান কবিদের কেউ কেউ [যেমন সৈয়দ সুলতান] রস অর্থে নয় ধরেছেন। এখানে 'মুনি রস বেদ শশী' ৭৯৪১ 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মে হবে = ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রীস্টাব্দ। ডক্টর সুকুমার সেন ইচ্ছেমতো এই পাঠ বিন্যাস করে [মুনি-বেদ-রস শশী-১৬৪৭ শক] ১৭২০ খ্রীস্টাব্দ করেছেন। আর সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন ষোল শতকে সত্যপীর অজ্ঞাত ছিলেন বাঙলাদেশের সাহিত্যে। পীরনারায়ণ সত্য সর্বভারতীয় লৌকিক দেবতা [ভূমিকা ২০ গ পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য] বোধ হয় 'অল্লোপনিষদ' যেমন শাসিত জনের আত্মরক্ষামূলক প্রয়াসপ্রসূন, তেমনি তুর্কী-মুঘল আমলে শাসক-শাসিতের নির্বিরোধ সহাবস্থানের জন্যে এই 'সত্য' [Ultimate Truth] রূপ পীরনারায়ণ পরিকল্পিত। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল (১৬৮৭-৮৮ খ্রীঃ) কিংবা সত্যপীর পালা-পাঁচালীর পাঁচ-সাত রকমের আখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, ষোল শতক কেন তারও আগে থেকেই সত্যনারায়ণ পুরাণের শুরু। হোসেন শাহ সম্পৃক্ত লোকশ্রুতি [লালমনের কেচ্ছা-আরিফ] ধরলেও ষোল শতকের গোড়ার দিকেই এর

১. সুকুমার সেন-বাঃ বাঃ ই, অপরার্ধ, পৃঃ ৫৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপত্তি। ফয়জুল্লাহর রচনার ক্রম ধরলেও ইসমাইল গাজীর পরেই সত্যপীর। সত্যপীর পাঁচালী যে ষোল শতকের তৃতীয় পাদে রচিত হতে পারে [বরং সে সময়টিই সত্যপীরের প্রতিষ্ঠা পাবার যথার্থ সময় ১৫৩৮-১৬১৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি শাসন-প্রশাসনিক বিপর্যয়ের দরুন] সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

এবার মীর ফয়জুল্লাহ যে 'গোরক্ষবিজয়'-এর রচয়িতা তা দেখা যাক। তার আগে স্মর্তব্য যে গুপ্ত ও অধ্যাত্ম কায়াসাধন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় আমাদের বৌদ্ধজ হিন্দু-মুসলমানে জাতিভেদবুদ্ধি ছিল না। তাই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ফয়জুল্লাহর ভণিতাযুক্ত পুথিগুলোর সম্বন্ধে বলেছেন : "যতগুলি প্রতিলিপি পাইয়াছি, সবগুলিই হিন্দুর বাড়িতে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি বৌদ্ধের লেখা [এই বৌদ্ধেরা আরাকানী উদ্ভূত], আর সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারকের হস্তলিপি।" [ভূমিকা-গোরক্ষবিজয়]।—ততদিনে ওয়াহাবী আন্দোলনে চঞ্চল—মুসলিম ঘরে এসব পুঁথি রক্ষণ নিশ্চয়ই শাস্ত্রবিরোধী বলে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু অধ্যাপক আলী আহমদ "সংগৃহীত পাঁচখানি পুথির লিখক [লিপিকার] মুসলমান এবং একখানা পুথিতে লিখকের নাম নাই।"

১. অধ্যাপক আলী আহমদের চারটি পুথিতে [৬৫, ৮৩, ৩০৯ ও ৪৩৪ সংখ্যক][১] একই স্থানে নিম্নোক্ত অংশটি রয়েছে ঃ

মন দিয়া শুন মীর ফয়জুল্লার বাণী
গোর্খের বিজয় কথা তন্ত্রের কাহিনী
মাতা পিতা পীর গুরু এক মনে আনি
শুনিয়া রচিল যোগতন্ত্রের কাহিনী
লেখিত পাপিষ্ঠ কহে শুন সভা ভরি
গোর্খের বিজয়কথা কি লেখিতে পারি।
পড়ুয়ার ঠাঁই কহি বিনয় বচন
সুসার করিবা শুনি অশুদ্ধ লিখন।
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত অতি
সুচরিতে লিখিবার কি মোর শকতি।
লেখিত পাপিষ্ঠ মতি কি লেখিতে জানি
মন দিয়া শুন মীর ফয়জুল্লার বাণী।

এখানে গোরক্ষ আখ্যান রচয়িতা যে মীর ফয়জুল্লাহ সে বিষয়ে লিপিকর [বোধ হয় শ্রুতিধর] নিঃসন্দেহ। এই অংশের বক্তা 'হাফেজের' মতো শ্রুতি-স্মৃতি থেকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন মূলপাঠ। তাই এ ভূমিকা। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, এ উক্তি ফয়জুল্লাহর সমকালীন কবি-আদিষ্ট অনুলেখকের, যিনি আদি গায়েনও। এবং পুথিতে আদি গায়েনের নাম কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন হয়েছে। [প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২] আলী আহমদের ৬৫, ৮৩ ও ৪৩৪ পুথিতে ঃ

---

১. বাঙলা একাডেমীর পুথিশালায় রক্ষিত।

২. পাঠান্তরে 'রহিয়াছে/গোর্খ নাথের বিজয় কাহিনী' যোগতত্ত্বের কাহিনী।
প্রথম দুই চরণ ৮৩ নং পুথিতে অন্য একবার , ৩০৯ নং পুথিতে অন্য একবার, ৪৩৪ সং পুথিতে অন্য একবার ৫১৫ সং পুথিতে একবার, ৬৩১ সং পুথিতে একবার রয়েছে। স্পষ্টত উপর্যুক্ত চারখানা পুথি অভিন্নমূল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. গোর্খের বিজয় বাণী কি লেখিতে আমি জানি
রচিয়াছে মীর ফয়জুল্লা
এ মীর ফয়জুল্লা বাণী রচিয়াছে যোগধ্যানী [বা যোগধ্বনি]
একমনে শুনিয়া শ্রবণে।

খ. শেষোক্ত দুই চরণ অন্যভাবেও মেলে ঃ
গোর্খের বিজয় বাণী শুনিয়াছে যোগধ্যানি [ধ্যানী বা ধ্বনি]
এক মনে শুনিবা শ্রবণে।

এটি ৬৫ সং পুথিতে দুইবার, ৮৩, ও ৪৩৪ সংখ্যক পুথিতে একবার, ৬৩১ সং পুথিতে দুই বার রয়েছে।

৩. আলী আহমদের ৮৩, ২০৮ এবং সাহিত্যবিশারদের ২, ৩, ৪, ৫, ও ৮ সংখ্যক পুথিতে নিম্নোক্ত ভণিতা মেলে :

কহে শেখ ফয়জুল্লাহ বিচারি মন পাঁজি [পাঠান্তরে : বোঝ মন পাঞ্জি]
স্ত্রীর বিষম মায়া যেন হাসি বাজি [পাঠান্তরে : মিথ্যা বাদিয়ার বাজিঃ]

'শেখ, স্থলে ৮৩ ও ৫ সং পুথিতে 'মীর' আছে।

আজ অবধি প্রাপ্ত আঠারোখানা পুথির মধ্যে ষোল খানাতেই ফয়জুল্লাহর ভণিতা মেলে।

সাহিত্য বিশারদের ১ম পুঁথিতে শুধু ফয়জুল্লাহ, ২য় পুথিতে একটি শুধু ফয়জুল্লাহ্, একটি শেখ ফয়জুল্লাহ এবং একটি মীর ফয়জুল্লাহ, ৩য় পুথিতে (ভণিতা সংখ্যা তিন) কেবল শেখ ফয়জুল্লাহ, ৪র্থ পুথিতে একটি ভণিতায়—শেখ ফয়জুল্লাহ

৫ম পুথিতে একটি ভণিতায় মীর ফয়জুল্লাহ
৬ষ্ঠ " " শেখ "
৭ম " " হীন "
৮ম " দুইটি " শেখ "

অধ্যাপক আলী আহমদের ২৩৮ সং পুথিতে একটি মাত্র ভণিতা আছে এবং শেখ ফয়জুল্লাহ, ৩০৯ সং পুঁথির চারটি ভণিতার মধ্যে একটি ভণিতার মধ্যে ফয়জুল্লাহ। তাই আলী আহমদ মনে করেন কবির নাম মীর; কিন্তু 'যয়নবের চৌতিশা'য়' মাত্র একটি ভণিতা আছে এবং তাতে পাই শেখ ফয়জুল্লাহ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের প্রাপ্ত পাঠেও শেখ ফয়জুল্লাহ রয়েছে। কিন্তু মুসলিম কবির পদসাহিত্যে[১] বিধৃত আটটি পদের ছয়টিতে মীর ফয়জুল্লাহ এবং দুটিতে মির্জা ফয়জুল্লাহ্ ভণিতা রয়েছে, একটিতেও শেখ নেই। আবার রাগমালায় রয়েছে : 'হীন শেখ ফয়জুল্লাহ কহে মনে বিমর্সিয়া'।

আলী আহমদ 'মীর'-এর সংখ্যাধিক্যে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ফয়জুল্লাহ 'মীর' ছিলেন, 'শেখ' নন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুথিতে আমরা 'শেখ' পাই, 'গাজীবিজয়ে'ও 'শেখ' মেলে। মুদ্রিত পুস্তকবিরহী সেযুগে আদর্শ পুথির অনুলিপিতে লিপিকর প্রমাদের পুনরাবৃত্তি ঘটত। সেকালে যাচাই করে সংশোধনের উপায় ছিল না। কাজেই কুমিল্লার পুথিতে একবার 'মীর ' চালু হওয়ায় সর্বত্র 'মীর'ই অনুসৃত হয়েছে, পদাবলীতেও তাই। কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। 'শেখ' বা 'মীর' কোথাও কোথাও দুটোই ব্যবহৃত হল কেন? আমরা যদি শেখ ও মীর

১. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা; বৈশাখ-শ্রাবণ ১ম সংখ্যা ১৩৬৬ সন।
২. সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৭সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফয়জুল্লাহ্ অভিন্ন [বস্তুত তাই] বলে স্বীকার করি, তাহলে মানতে হবে চাকুরীসূত্রে শেখ ফয়জুল্লাহ্র পিতা, মীর [আমির] হয়েছিলেন। তিনি নিজে শেখ ফয়জুল্লাহ বলেই আত্মপরিচয় দিতেন। তাঁর সমকালের গায়েন লিপিকর শ্রদ্ধাবশে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে 'মীর', 'মীর্জা' বসিয়েছে। অথবা কবি স্বয়ং কোনো কোনো ভণিতায় মীর ও মীর্জা ব্যবহার করে থাকবেন, যেমন— কোনো কোনো ভণিতায় কেবল 'ফয়জুল্লাহ্'ই রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের যে 'ফয়জুল্লা' সত্যপীর পুথি রচনা করেছেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁর পুথি দোভাষীতে তথা 'বাঙলা-হিন্দুস্থানী' মিশ্রভাষায় রচিত। তিনি উনিশ শতকের এবং বন্দর-নগর কোলকাতার সংলগ্ন হাওড়ার পাঁচলা গাঁয়ের লোক।

দয়াল নামে এক গায়েন ফয়জুল্লাহ্র 'গোরক্ষবিজয়'-এর বিশুদ্ধ প্রতিলিপি করেছিলেন সফর আলী নামের এক ব্যক্তির আদেশে। কিন্তু তাঁর আদর্শ পুথি ছিল খণ্ডিত। তাই গায়েন-লিপিকর বাকি অংশ তাঁর স্মৃতি থেকেই লিপিবদ্ধ করেন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। সে-কথাই দয়াল বলছেন :

আইদ্যে খণ্ড অর্ধ ছিল পুস্তক প্রবন্ধ
তান আজ্ঞা শিরে ধরি পূরাই সুছন্দ।[১]

সফর আলি 'গোর্খের বিজয় গ্রন্থ যোগ দরশন/পুস্তক করাইল শুদ্ধ অতি সযতনে।' শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'গোরক্ষবিজয়', 'গাজীবিজয়', 'সত্যপীরবিজয়', 'যয়নবের চৌতিশা' [বিলাপ], রাগমালা, পদাবলী রচনা করেন এবং সম্ভবত 'সুলতান জৈমজমা'ও।

'গোরক্ষবিজয়ে' দেহতত্ত্ব ও কায়াসাধন সম্বন্ধে যে-সব তত্ত্বকথা রয়েছে তার কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি :

দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়া বহে?
শব্দ উঠিলে ধ্বনি রহে গিয়া কোথা?
কোন্ নালে আইসে প্রাণ কোন্ নালে যায়?
কোথায় বৈসে মন কোথায় পবন?
সহস্রার বলি কারে সে বা কোন্ হয়?
নিদ্রাকালে মনুরাএ [মনরাজ] কোনখানে যায়?
কোথা রাএ মনুরাএ কোথাত সঞ্চার?
কোথাত বৈসত শিব কোথাত শকতি?

—এমনি সব প্রশ্ন এবং তার উত্তর।

কায়াসিদ্ধিবিহীন দেহ হচ্ছে বিনাশের শিকার : তা বৈরীর হাতে ভাণ্ডার দেয়া, শঠের হাতে কাণ্ডার দেয়া কিংবা উদ্‌কে মাছের প্রহরী করা, বিড়ালকে দুধের প্রহরী করা, বাঘের মুখে গরু, ডাকাতের হাতে ধন এবং সাপের মুখে ব্যাঙ রাখার মতো সর্বনাশকর ব্যবস্থা। এর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অজর-অমর হওয়ার জন্যে চাই কায়াসাধন :

দেহের— অধে উর্ধ্বে তালি দেঅ গুরু মোছন্দর
আণ্ডমা নিচল কর শরীর ভিতর।
বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী

৩. পুঁথি পরিচিতি : সাহিত্যবিশারদ সংকলিত, পৃ ১৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল-কমল মধ্যে বায়ুর কর সন্ধি।
শরীর সংযোগে বায়ু কমল শোধন
ষটচক্রভেদ গুরু খেলএ গগন।
মেরু মূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা
বেহ্মানলে সাধ গুরু বা করিঅ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা। ...
রবি শশী চলি যার তারে কর বন্দী
মন হয় পবন, পবন হয় সাঞি।.....
মন পবন সহিতে এক করি জোড়
ক্রমে ক্রমে টানি আন মনের ভাণ্ডার।
তিন তিহরী চাপ উড়িয়া যাউক ধূয়া
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া।
উপরেত চন্দ্র রাখি কর ঠাকুরালি।
পবন নিচল কর চিন রবি শশী।
কায়া সাধিয়া গুরু জিন যম কাল।

যোগীকাচে বা যুগীকাচে, যোগচিন্তামণিতে বা যোগীর গানে এই দেহতত্ত্ব ও দেহসাধন তত্ত্বই পরিব্যক্ত। গুরুর মাহমুদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসেও পাই;

শুন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী
বাইন শুদ্ধ হৈলে নৌকা না লৈব পানি।
খাকের খুটি নৌকা টাটী আবের গড়া
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসেত মোড়া।
কাক কাণ্ডারী নায়ের শকুন ভাণ্ডারী
শৃগালে বলেন আমি নায়ের অধিকারী।....
পাঁচ পণ্ডিত লৈয়া মনুরাএ বৈসে হৃদয়
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয়।

সাংকেতিক তত্ত্ব :

১. বাসাতে ছাও নাই সদায় উড়ে পড়ে
নগরেতে মনুষ্য নাই বসতি চালে চালে।
পুকুরেতে পানি নাহি পাড় কেনে ডোবে
অন্ধলে দোকান দেয় খরিদ করে কালে।

২. ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী
সুতিয়া আছেন ব্যাঙ ভুজঙ্গ প্রহরী।
বলদ প্রসব কৈল গাই হৈল বাঁঝা
বাছুরক দোহাএ তাহার সি তিন সাঁজা।
শুয়াপক্ষী বসিয়া বিড়াল ধরি খায় ...
শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুঝে।
কোটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে।

—এই অংশ চর্যাগীতির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল : পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়।
সরিষা বুড়িতে জলবিন্দু নাই ডুবিল দেউলে চূড়া।
গাই বুড়াইল বলদ বিয়াইল এ বড় বচন অদ্ভুত
মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল পিপিড়ার মনে হাসি
বাঘে বলদে হাল জুড়ি মর্কট হৈল কৃষাণ-
পানির কুম্ভীরে হুড়া ছাড়ি গেল মুষাএ বুনিল ধান
তালের গাছে শোলের পোনা সয়চান ধরিয়া খায়।

[অনিলপুরাণ—সহদেব চক্রবর্তী, বা. সা. ই ঃ অপরার্ধ, পৃঃ ২১২-১৩।]

অতএব বজ্র-সহজযানীর চর্যার তত্ত্বধারা সর্বত্র বহমান। তাই সাদৃশ্য এত বেশি।

অন্যান্য কবি পরিচিতি

ডক্টর সুকুমার সেন নেপালে রচিত এক 'গোপীচন্দ্র নাটক'-এর কথা বলেছেন। এটি বাঙলা ও নেওয়ারী ভাষায় সিদ্ধি নরসিংহের রাজত্বকালে (১৬২০-৫৭ খ্রীঃ) রচিত। এখানে গোপীচাঁদের পরিচয় নিম্নরূপ :

বাপ রূপচন্দ্র হে মএনাবতী মাএ
যার কোখি (কুক্ষি) জনমিয়া বোলাইল রাএ
আইল হে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের অধিপতি
উদনা পদুমা লৈয়া কেলি করন্তি।

এখানে গোপীচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন নাম। তিনি বঙ্গাধিপতি। তাঁর পিতার নাম রূপচন্দ্র ও মাতা ময়নাবতী, পত্নী উদনা ও পদুমা। আর একটি পাঁচালীর চারটি পত্র পেয়েছেন অক্ষয়কুমার কয়াল। সুকুমার সেনের মতে, 'এই কাহিনী দুর্লভ মল্লিকের বর্ণনারই মতো, হয়তো কিছু অর্বাচীন, নবীনত্বের চিহ্ন কাহিনীর উপসংহারে পরিস্ফুট।' [বাঃ সাঃ ইঃ পৃঃ ২৩৫]

১. আবদুল শুকুর মাহমুদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ১১১২ বঙ্গাব্দে বা ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত :

১১ সও ১২ সালে দিন সাত ষষ্ঠী
তখনি যোগান্ত পুস্তক ভূমে হৈল সৃষ্টি। [যাকারিয়া সম্পাদিত পৃঃ ছয়]

এবং পুথি রচনার আরম্ভ মাস ছিল কার্তিক;

পহেলা কার্তিকে পুথি ধরিলাম লেখিবার।

তাঁর নাম ও পিতার নাম সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি ঃ

১. আবদুল শুকুর নাম পিতাএ রাখিল
শুকুর মোহাম্মদ নাম কিতাবে ঘুষিল।

২. আবদুল শুকুর নাম পিতাএ রাখিল
শুকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘুষিল।

৩. শএক আনার নাম ফকির গুণমন্ত
তাহার তনয় পুস্তক রচিল যোগান্ত।

৪. সায়ের আল্লাহ নাম ফকির গুণমন্ত
(বটতলার পুথির পাঠ ঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব কবির নাম ছিল আবদুল শুকুর মাহমুদ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল শেখ আনার [আনোয়ার] ফকির। কবির নিবাস ছিল রাজশাহীর রামপুরা-বোয়ালিয়ার কাছে বালুরঘাটের সিন্দূরকুসুমী গাঁয়ে। –কবির উক্তি এরূপ :

১. ভাবিয়া আপন মনে শুকুর মামুদে ভণে
কুসুম সিন্দূরে বাস।

২. ভাবিয়া আপন মনে আবদুল শুকুর ভণে
সেন্দূর কুসুমীতে যার বাস।

কবি নিজেও ফকির [অধ্যাত্ম সাধক] ছিলেন :

'ফকির যোগীর বেশে কবি শুকুর মামুদে ভণে।'

শুকুর মামুদের পাঁচালী ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় একটি [১৯২৫-১৩৩২] ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় [১৯২৪ খ্রীঃ] একটি এবং আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সম্পাদনায় অন্য একটি প্রকাশিত হয়েছে [১৯৭৪ খ্রীঃ]

২. দুর্লভ মল্লিকের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত [১৩৮০ সনে]। কবি সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তাঁর পুথির অনুলিপি কাল ১২০৬ [১৮০০ খ্রীঃ], কোলকাতার এন্টালী থেকে সংগৃহীত। এতে আখ্যান পল্লবিত নয়, তবে যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রবণতা অধিক।

৩. ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান' ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। অন্য একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পুথি সংগ্রহ করেছিলেন ও মুদ্রণের জন্যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। আর সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছিল ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম। আবদুল করিম প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। [ভূমিকা : ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গান]

এটি ভবানী দাসের রচনা নয়। ভবানী দাস সম্ভবত গায়েন-লিপিকর ভণিতায় নিজের নাম বসিয়েছিন। এটি কোন মুসলমান কবির রচনা—এ অনুমানের সমর্থনে গ্রন্থের ভাষায় ও তত্ত্বে বহু প্রমাণ মেলে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিস্তৃত উদ্ধৃতিযোগে তা দেখিয়েছেন [বাঃ সাঃ কথা, মধ্যযুগ পৃঃ ১০৬-১৬] এমন কি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লক্ষ্য করেছিলেন যে, গ্রন্থে ভবানী দাসের চারটি ভণিতা রয়েছে এবং তাও যেন সন্নিবেশিত স্থানে ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে সমন্বিত হয়নি। তিনি আরো বলেছেন, 'ভবানী দাসের ময়নামতীর গানে মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত চালিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে মূল গান মুসলমানের রচিত, তাহাতে ভবানী দাস নিজের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।' এটিই যথার্থ অনুমান।

চট্টগ্রামে এক দ্বিজ ভবানী দাস 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' রচনা করেছেন চট্টগ্রামেরই আরাকানরাজ সামন্ত জয়ছন্দের আদেশে। আলোচ্য ভবানী দাস ভিন্ন ব্যক্তি।

ডক্টর শহীদুল্লাহর যুক্তিগুলো এই :

ক. মধ্যে মধ্যে মুসলমানী ভাব ফুটে উঠেছে।

খ. মুসলমানী নিয়মে গোপীচাঁদের চার স্ত্রীর কথা আছে। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত গীতে আছে ছয়কুড়ি (১২০) স্ত্রী এবং নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত গীতে আছে শত স্ত্রীর উল্লেখ।

গ. কলির বর্ণনায় রয়েছে—ব্রাহ্মণ আলিম দেখি মান্য না করিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. গোপীচাঁদের যুদ্ধসজ্জায় আছে—

হস্তী ঘোড়া সাজে আর মহা মহা বীর
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির।
বাষট্টি নাজির সাজে তেষট্টি শিকদার।

ঙ. গোপীচাঁদ স্ত্রীদের 'মা' বলে গৃহত্যাগ করেন। হিন্দুর রচনা হলে ফিরে এসে 'মা'-দের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারতেন না। [অবশ্য মুসলমানের ক্ষেত্রেও তাই হত]।

চ. হিন্দুর রচনায় 'দৈত্য' ও 'পিশাচ' সমার্থক বা অভিন্নার্থক রূপে ব্যবহৃত হত না—

সিদ্ধা বলে পিশাচ যে শুন আগু হৈয়া
সিদ্ধা বলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা ' পরে।

ছ. কেশের সাঁকোর ক্ষুরের্ মতো ধার—মুসলিম পুলসিরাতের অনুরূপ।

জ. বিধবা-বিয়ের কথাও আছে—

ভাল মনিষ্যের বেটি কুল দেখি রএ
অধার্মিক নারী হৈলে ফিরে বর লএ।

ঝ. এমন সুন্দর তনু খাকেত মিশাইব-এটি মুসলিম-কবর নির্দেশক।

ঞ. 'কোন কর্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত। কি বুলি জোয়াব দিব স্বামীর সাক্ষাৎ'-মুসলিমের হাসর নির্দেশক—নাথপন্থীর মোক্ষের নয়।

ট. এগুলো ছাড়াও অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলাম সম্পর্কিত শব্দের ও ভাষার ব্যবহারেও প্রমাণিত হয় যে 'ময়নামতীর গান' মুসলমানের রচনা।

৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'সাধনমাহাত্ম্য' নামের আর একখানি নাথগ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন : "সাধনমাহাত্ম্য রচয়িতা মকসুদ আলী। ইহাতে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গোপীচাঁদের পিতা ও মাতার নাম শীতলনৃপতি ও ময়নামতী। পত্নীর নাম ছত্রজ্যোতি। ময়নামতীর গুরু কানুকনাথ, তাঁহার গুরু আরিপানাথ। [হাড়িপা নাথ], তাঁহার গুরু মীননাথ। সকলের গুরু গোরক্ষনাথ। পুস্তকখানি একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং অমুদ্রিত। ইহার বৃত্তান্ত জনাব নাগর আলী ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন" [রাঃ সাঃ কথা, প্রাচীন যুগ, ২২]।

৮. নাথসাহিত্যে প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতি নিদর্শন

১. মানিকচন্দ্র রাজার দক্ষিণদেশীয় প্রজাপীড়ক দেওয়ান এক কানি জমির খাজনা 'দেড়বুড়ি' থেকে বৃদ্ধি করে 'পনের গণ্ডা' করায় প্রজারা রাজাকে অভিশাপ দেয়। বিদ্রোহের কথা নেই বটে, তবে সে যুগে করবৃদ্ধিতে আপত্তি ও দ্রোহ দেখা দিত।

২. সেযুগে মন্ত্র বা বিদ্যা অর্জনে অধিকারী ভেদ ছিল, মন্ত্রগুলি বা বিদ্যাগুপ্তি সাধারণ নীতির অন্তর্গত ছিল। এটাও জীবিকা সম্পৃক্ত বলেই ব্যক্তি বা মোল্লা-গুরু-ব্রাহ্মণের শ্রেণী স্বার্থের বিষয় ছিল।

৩. বৌদ্ধসমাজেও ধন-বৃত্তি-লিঙ্গ ভেদে মানুষ সম্মানিত কিংবা ঘৃণ্য ছিল, আভিজাত্যবোধ তখনো ছিল। হাড়ির কিংবা নারীর কাছে দীক্ষা গ্রহণে মানিকচন্দ্রের ও গোপীচন্দ্রের আপত্তি ছিল এ কারণেই।

৪. বহু বিবাহ চালু ছিল। ফাও হিসেবেও স্ত্রী মিলত। পদুনাকে [পদুমা] গোপীচাঁদ যৌতুকরূপেই পেয়েছিলেন।

৫. দেশে ডাক-যোগীর মতো ডাকিনী-যোগিনীও ছিল অসংখ্য—কেবল ভিক্ষুনী সন্ন্যাসিনীরা নয়, কুলবধূরাও হত ডাকিনী-যোগিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. 'গুরুবাদে' আস্থা ছিল প্রবল। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা ব্যতীত সিদ্ধি অসম্ভব—এ ধারণা ছিল সর্বজনীন। যোগ ও তন্ত্র জনপ্রিয় ছিল। ভূতসিদ্ধি-খেচরসিদ্ধিতে লোকের বিশ্বাস ছিল।
৭. বামাচারবর্জিত যোগসাধনা তথা কায়াসাধন না করলে কিংবা অবাধ কামচর্চা করলে অকালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—এ ধারণাও ছিল প্রবল।
৮. সতীদাহের নীতি বৌদ্ধসমাজেও একেবারে দুর্লভ ছিল না। মধ্যযুগে দেশজ মুসলিমের মধ্যেও সহমরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ময়নামতীর সহমরণ স্মর্তব্য।
৯. বাল্যবিবাহ সমাজের সর্বস্তরে বহুল প্রচলিত ছিল, রাজপুত্র গোপীচাঁদের বিয়ে হয়েছিল নয় কিংবা বারো বছর বয়সে।
১০. অলৌকিক উপায়ে 'সত্য,' 'ধর্ম', 'ন্যায়' ও 'পুণ্য' পরীক্ষার রেওয়াজ ছিল—ময়নামতী কিংবা হাড়িপার পরীক্ষা স্মর্তব্য। সিদ্ধি বলে 'মড়া' বাঁচানো সম্ভব বলে লোকে বিশ্বাস করত। দুর্গার, হাড়িপার, কানুপার, গাভুর সিদ্ধার, রানীদের আত্মহত্যার কথা স্মর্তব্য।
১১. ঘুষ-উৎকোচ সর্বকালেই স্বার্থসিদ্ধির মোক্ষম উপায়। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস যাত্রার দিন-ক্ষণ বিলম্বিত করার জন্যে জোতিষী বামুনকে রানীরা উৎকোচে বশ করেছিল।
১২. রাজপুরীতেও ব্যভিচার ছিল। গোপীচাঁদের অনুপস্থিতিতে অদুনা-পদুনা ছাড়া অন্যান্য রানীদের 'খেতুয়া' বা 'খেতু' আকৃষ্ট করেছিল। ধন বা রাজ্য লিপ্সার বিশ্বাসঘাতকতা সেদিনও অজ্ঞাত ছিল না।
১৩. বেশ্যারা সমাজে ঘৃণ্য ছিল না। হীরা নটী বা সুলোচনা বেশ্যারা সেকালে টাকা লগ্নি করত—বস্তু বা মানুষ বন্ধক রেখে টাকা ঋণ দিত।
১৪. কড়ি, বুড়ি প্রভৃতি বিনিময় মুদ্রারূপে চলিত। মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, মুদ্রা দুর্লভ ছিল, তাই সামান্য বারো কড়ার জন্যে গোপীচাঁদ দাসরূপে বন্ধক ছিল।
১৫. দুর্বাসার মতো সন্ন্যাসীরাও প্রতিশোধলিপ্সু ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল, ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করায় তিনজন ক্ষুব্ধ সন্ন্যাসী মানিকচাঁদের প্রাণ সংহার করে।
১৬. আঙ্গিক লক্ষণে নারীকে হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে স্বভাব-চরিত্র বিচার কবার প্রাচীন প্রথা তখনো চালু ছিল।
১৭. ষড়যন্ত্র ও বিষের নাড়ু যোগে হত্যা সাধারণে বিরল ছিল না।
১৮ যোগীরা কবরের মধ্যে সমাধিস্থ থাকতে পারত দীর্ঘকাল। হাড়িপা তাই ছিলেন।
১৯ তান্ত্রিক যোগসাধনায় কামিনী, গাঁজা, মদ (কারণ বারি) এবং স্নানান্তে নারিকেল সেবন করার রেওয়াজ ছিল।
২০ দিন-ক্ষণ-তিথী-নক্ষত্র-লগ্ন প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই মানত। তাই গণক-দৈবজ্ঞের কদর ছিল—ঘরোয়া জীবনে তারা ছিল প্রায় অপরিহার্য।
২১ যোগীরা গায়ে ছাই মেখে, কাঁধে কাঁথা ঝুলিয়ে বেড়াত।
২২ এ কাহিনীতে কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি রয়েছে–মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ভাদাই (ভাদে বা ভদ্র পা) জালন্ধরীপা, কানুপা, গাভুর সিদ্ধা (ওর্ফে চৌরঙ্গীনাথ), কর্পটিনাথ (ওর্ফে চপটিনাথ) সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, ধাড়িচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র।
২৩ কয়েকটি স্থানের নামও ঐতিহাসিক –পাটিকে, মেহেরকুল, লালিন্তি [লালমাই বা রোহিতগিরি]। অবশ্য এসব নাম আখ্যানে উল্লিখিত বলেই কাহিনীমূল ঐতিহাসিকতার দাবিদার হতে পারে না–এ সূত্রে পদ্মিনী উপাখ্যানও স্মর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গ' সহজিয়া-বাউল মত ও সাহিত্য

১, মৈথুন তত্ত্ব

নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ পরিচ্ছেদে যা আলোচিত হয়েছে তার আলোতে সিদ্ধান্ত এই–সৃষ্টিসম্ভব আদিতত্ত্ব মৈথুন থেকেই সাংখ্যতত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বে প্রকৃতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে তন্ত্র মতের এবং পুরুষের ওপর গুরুত্বদানের কারণে লিঙ্গায়েত মতের ও যোগ-পদ্ধতির বিকাশ। নিজের মধ্যে আলৌকিক শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ সাধনার লক্ষ্য। তাই মূলত এটি শক্তিবাদ। যোগপদ্ধতি, তান্ত্রিক আচার অথবা যোগতান্ত্রিক মিশ্র আচার মাধ্যমে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস চলেছে। যেখানে শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি প্রাধান্য লাভ করেছেন, সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু গুরুত্ব পেয়েছে, সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতবাদের উন্মেষ। যোগ ও তন্ত্র প্রায় সর্ব মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। যারা অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়, সে-সব সাধকের সাধনার আবশ্যিক অঙ্গ হয়েছে তন্ত্র অথবা যোগ। বাঙলাদেশে পাল আমলে আদি অনার্য-সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণমতের এবং মহাযান বৌদ্ধমতের সমন্বয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের, এবং মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান ও শেষে সহজযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, মণ্ডল, লতা, ভগ, যোগ ও নানা হৃহ্যপ্রক্রিয়া এসব মতের ভিত্তি। এবং সাধারণভাবে আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক বর্ণরেখাত্মক-যন্ত্র, যোগ-ক্রিয়া, দীক্ষাগ্রহণ এমন কি সম্প্রদায় বিশেষে মূর্তিপূজার মাধ্যমেই উপাসনা চলে। বাঙলাদেশে 'অষ্টাদশ শৈব আগমন নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগে রচিত হয় এবং খুব সম্ভব গুপ্তযুগের শেষের দিকে ও পালযুগে তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রচলন হয়।[১] বর্তমান হিন্দু পূজাপদ্ধতিতেও তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং উচ্চশ্রেণীর অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ এবং নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযানের ও নাথপন্থের উদ্ভব। এর জের রয়েছে বৈষ্ণবসহজিয়া ও বাউল মতে। 'এই তত্ত্ব সাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাগীতির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।'[২] এবং 'সহজিয়াধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।'[৩] ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে। একটি মিশ্রমত —যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। যোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। একসময়ে এই নাথপন্থের ও সহজিয়ামতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। চর্যাগীতি ও নাথসাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামের ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু

---

১. Studies in the Tantras : Dr. P. C. Bagchi. P 102

২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬২ সন পৃষ্ঠা ১০২।

৩. ঊনবিশ শতাব্দিতে বাঙলার নবজাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা ৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে ইসলামের ও বৈষ্ণবধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল-মতের উদ্ভব। সূফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।'[১] ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদই বাউলমতের প্রবর্তক এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই [বা বীরচন্দ্র] বাউলমত জনপ্রিয় করেন।[২] এ মতের সমর্থন মিলেছে বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা' নামের এক অজ্ঞাতপ্রায় পুথিতে। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলছেন :

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা শহরে...
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধববিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। ... বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল।... বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্বযুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পর থেকে বাংলাদেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিকভাবের দু'টি ধর্মমত চলিত ছিল– শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজিয়ামত। এই দুই সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের যোগী বা কাপালিক বলত, এরা কানে নরাস্থি-কুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাহিরে ছিল এদের কুঁড়েঘর।[৩] যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ'। বর্তমান সময়ে যুগী জাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। বৌদ্ধ সহজসাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে।[৪] ছকে ফেলে দেখলে বাংলার তান্ত্রিক ধর্মের বিবর্তন এরূপ দাঁড়ায় :

---

১. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।
২. বাংলার বাউল ও বাউলগান–ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮।
৩. শূদ্র সম্বন্ধে মনুসংহিতার পাঁতি হচ্ছে
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ
পুলকাশ্চৈ ধ্যান্যানাং জীর্ণশ্চৈর পরিচ্ছদা।
ঋষি গৌতমও বলেছেন : জীর্ণান্যুপানচ্ছত্র বাসা :
-কুর্চান্যুচ্ছিষ্টাশনং।
৪. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

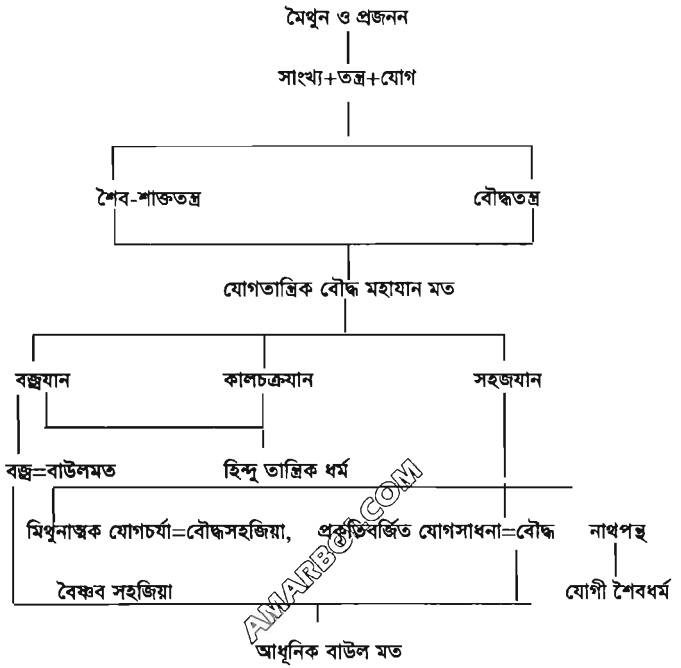

AMARBOI.COM

২. তান্ত্রিক শৈব-শাক্তধর্ম

তন্ত্র হচ্ছে ভোগ-মোক্ষবাদ-ভোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভই আদর্শ। নারীই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া, কালী, তারা, শিবানী। নারীশক্তিতেই পুরুষ হয় শক্তিমান। শিব হচ্ছেন শক্তিমান। শিব-শক্তি অদ্বয়ও বটে, ভিন্নও বটে। সাধনায় শক্তিমান হওয়া তথা শিবত্ব উপলব্ধি করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। এর সঙ্গে বৌদ্ধ 'বোধিচিত্ত' বা মহাসুখ তুলনীয়। এ সাধনায় প্রকৃতিসঙ্গ প্রয়োজন। মৈথুনে বীর্যধারণের দরকার হয় না। রেতক্রিয়া অবিধেয় নয়। এ সাধনা করতে হয় নারীভাবে—'বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্।' লতা, ভগযানযন্ত্র, পদ্ম তথা নারীর যোনি-প্রতিম পূজার উপাদান। আসন, ন্যাস, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, যোগক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এরা গুরুবাদী। সাধনাও গূহ্য। পঞ্চ 'ম' কারে তথা মাংস, মৎস্য, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনে এরা বিশেষ আসক্ত। এরাও পরকীয়া বামামৈথুনই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মানে। এদের গুরু চার প্রকার—গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্টি গুরু ও পরাৎপর গুরু। তাঁরা সবাই শিবের অংশ। হিন্দুতন্ত্রে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে পর পর ছয়টি চক্র বা ষট্‌চক্র– মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র (দ্বিদল চক্র) ও তাদের সন্নিহিত পদ্ম, এবং ইড়া [গঙ্গা] পিঙ্গলা [যমুনা] সুষুম্না [সরস্বতী] প্রভৃতি বহু নাড়ীর কল্পনা করা হয়েছে। সর্বনিম্নের চক্রের নাম মূলাধারচক্র। এতেই সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী সুষুপ্ত রয়েছে। ষট্‌চক্রের উর্ধ্বে রয়েছে সহস্রার [সহস্রদলপদ্ম], তাতে থাকেন পরম শিব। যৌগিক প্রক্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারা এই কুণ্ডলিনীকি ক্রমাগত উর্ধ্বে নিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ত্রিগুণাতীত শিবত্ব উপলব্ধি হয়। এটি এক পরমানন্দময় অদ্বয়সত্তা–শিব-শক্তির অদ্বয়সত্তা—এই মিলনজাত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। শিব পুরুষশক্তির প্রতীক—উমা নারীশক্তির প্রতীক—উভয়ের মিলনজনিত যে সামরস্য তাই কেবলানন্দ, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের মহাসুখ ও বৈষ্ণবসহজিয়ার মহাভাবরূপ সহজাবস্থা। মূল পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই হিন্দুর শিবশক্তি, বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায় এবং বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব সহজিয়ার রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে রূপ নিয়েছে।

শাক্ততন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাচার নামে দুই সাধনপদ্ধতি আছে। বামাচার পঞ্চ 'ম'-কার ভিত্তিক। আর দক্ষিণাচার 'ম'-কার বর্জিত যোগনির্ভর।

	চক্র	দেহস্থান	পদ্মদল অধিষ্ঠাত্র দেবতা
১	মূল ধারা	গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	৪ ব্রহ্ম + ডাকিনী
২	স্বাধিষ্ঠান	জননেন্দ্রিয়ের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিনী নাড়ীস্থ	৬ মহাবিষ্ণু + রাকিনী
৩	মণিপুর	নাভিমূলে	১০ রুদ্র + লাকিনী
৪	অনাহত	বক্ষ	১২ ঈশ + কাকিনী
৫	বিশুদ্ধ	কণ্ঠ	১৬ অর্ধনারীশ্বর (শিবশক্তি) + শাকিনী
৬	আজ্ঞা	ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থ	২ পরশিব + হাকিনী

এর ওপরে রয়েছে সহস্রদলপদ্ম, নাম সহস্রার। এটি পরমশিব ও কুণ্ডলিনীর মিলনস্থল। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীই বায়ুপ্রবাহ পথ। ইচ্ছামত বায়ু সঞ্চালনই যোগক্রিয়ার মূলভিত্তি। তাই নাড়ীর সঙ্গে যোগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু অনৈক্যও রয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতির তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিব্যাচার, সময়চার, দক্ষিণাচার ও পশ্বাচার প্রভৃতি নামমাত্র তান্ত্রিক আচার। যথার্থ তান্ত্রিক আচার হচ্ছে : বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলচার। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। বেশ্যা, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী প্রকৃতিই যোগ্য সাধনসঙ্গিনী।

৩. বৌদ্ধতন্ত্র

প্রকৃতি ও পুরুষকে বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায় নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুতন্ত্রের ষটচক্র বা পদ্ম বৌদ্ধতন্ত্রে চারচক্র বা পদ্ম। এবং তা 'কায়' রূপে পরিকল্পিত। প্রথম চক্রটি নাভির নীচে অবস্থিত। এর নাম নির্মাণকায়। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়দেশে অবস্থিত। এর নাম ধর্মকায়। তৃতীয় চক্র কণ্ঠদেশে, এর নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থটি ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত। এর নাম সহজকায় এই সহজকায় বা উষ্ণীষিকমলকে মহাসুখচক্র বা মহাসুখকমলও বলা হয়। 'হে বজ্রতন্ত্র' অনুসারে "জননেন্দ্রিয়ের স্থান হইতে চেতন-অচেতন সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রদেশে নির্মাণকায় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মচক্র সমস্ত ধর্মের তত্ত্বরূপ বলিয়া হৃৎপ্রদেশে স্থাপিত, সম্ভোগ অর্থে ষড়রস সম্ভোগ, সম্ভোগকায় আনন্দ-রস সম্ভোগস্বরূপ, ইহা কণ্ঠদেশে স্থাপিত। মহাসুখচক্র তথা মহসুখকায় মস্তকে স্থাপিত।"[১]

১. বাংলার বাউল গান, পৃষ্ঠা ৪৪৯ – ৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহস্থান	চক্র/কায়	পদ্ম	মুদ্রা	আনন্দ	দেবী	ক্ষণ
নাভি	নির্মাণচক্র/কায়	নাভিপদ্ম চৌষট্টিদল	কর্মমুদ্রা	আনন্দকায়	লোচনা	বিচিত্র
হৃদয়	ধর্মচক্র "	হৃৎপদ্ম বত্রিশ দল	ধর্মমুদ্রা	মারমানন্দ	মানকী	বিপাক
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র"	কণ্ঠ পদ্ম ষোড়শ দল	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	পাণ্ডরা	বিমর্দ
মস্তক	সহজচক্র "	উষ্ণীষপদ্ম চর্তুদল	সময়মুদ্রা	সহজানন্দ	তারা	বিলক্ষণ

এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ -সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা।

চার আর্য সত্য - দুঃখ, দুখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায়।

চার তত্ত্ব - আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব।

এর সঙ্গে চার নিকায়, ষোড়শ সংক্রান্তি, চৌষট্টি দণ্ড ও চার প্রহরাদির সম্পর্ক রয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে [যেমন সেকোদ্দেশটীকা] কায়-বাক-চিত্ত-জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের চার প্রকার ভেদ ধরে মোট ষোল প্রকার আনন্দ নির্দেশ করা হয়েছে।[১] বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া নাড়ীর নাম ললনা, আলি, দমন, চন্দ্র প্রভৃতি। পিঙ্গলার নাম রসনা, কালি, চমন, সূর্য প্রভৃতি। সুষুম্না নাড়ী অবধূতী, দেবী, প্রজ্ঞা, নৈরাত্মা, যোগিনী, সহজসুন্দরী প্রভৃতি নামে পরিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে ললনাকে প্রজ্ঞা [চন্দ্র] এবং রসনাকে উপায় [সূর্য] বলা হয়েছে। এই দুটো নাড়ীর মিলন হয় অবধূতীতে। এ মিলন প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। ললনা বিন্দু বহন করে, রসনা রজ বহন করে, অবধূতী বহন করে প্রজ্ঞা-উপায় মিলনজনিত বোধিচিত্তকে। এই অবধূতীই সহজানন্দ স্বরূপিনী।[২]

বৌদ্ধতন্ত্র সাধনায় হঠযোগের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, বিন্দুধারণ এবং তা ঊর্ধ্বে সঞ্চালনই এর লক্ষ্য। খড়্গ, অঞ্জনা, পাদলেপা, অন্তর্ধান, রস রসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল বৌদ্ধতন্ত্রের এই অষ্টসিদ্ধি [সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০] নটী, রজকী, ডোমনী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণীই সাধনসঙ্গিনীরূপে বিশেষ উপযোগী। যোগিনী-ডাকিনীরা সিদ্ধিপ্রভাবে অলৌকিক শক্তিধর হয়।

৪. মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত উপমতসমূহ

বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে হয়, তা সঠিক বলা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে 'বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে, বুদ্ধদেবই সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য মুদ্রা, মন্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করেন।[৩] মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসই তান্ত্রিকতার ভিত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে মন্ত্রকে বলত, ধারণী [যা দিয়ে কিছু ধারণ করা যায়]। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের

১. ক. সেকোদ্দেশটীকা। পৃষ্ঠা ২৭। [বাংলার বাউল ও বাউল গানে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৫]
খ. Tantric Buddhism, PP 165-66

২. ক. ibid P 169-74
খ. Studies in Tantras, P 69

৩. An Introduction to Buddhist Esoterism. P 48.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলো রচিত হতে থাকে। এ সময়ে বৌদ্ধ ক্ষান্তি-পারমিতা, দান-পারমিতা প্রভৃতি তত্ত্ব দেবীরূপে কল্পিত হয়ে প্রমূর্তরূপে পূজা পেতে থাকেন। ধারণী বা বীজমন্ত্রও এ সময় থেকে রচিত হয়।[৪] অষ্ট সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা>প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র> প্রজ্ঞাপারমিতা ধারণী> প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্ররূপ সংক্ষেপকরণ পরম্পরায় অবশেষে 'প্র' এই বীজমন্ত্রে [তুলনীয় ওঁ] রূপ নিয়েছে। এই মন্ত্রনির্ভর পূজা-ধ্যান পদ্ধতির নাম মন্ত্রযান। সম্ভবত এই মন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের যোগাচার পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এর দার্শনিক ভিত্তি হয়। তার থেকেই ক্রমে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়ে পাল আমলে তিনটি বিশিষ্ট উপমত হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ তিনটি হচ্ছে ঃ বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান।

নাগার্জুনের মতে শূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। এ মত পরে বসুবন্ধুরও সমর্থন পায়। তিনি বলেন গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা আর এই শূন্যতাই নির্বাণ। অর্থাৎ বাহ্যত সবকিছু থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব মায়ামাত্র-ভ্রমস্বরূপ—এটি অবিদ্যাজাত। কাজেই এ উপলব্ধির ফলে একটি নির্বেদ অবস্থায় উত্তরণ ঘটে সাধকের। এ নির্মাণ বা শূন্যতাই সহজাবস্থা।

ক. বজ্রযান

বজ্রযানে এই শূন্যতার নাম বজ্র। এটি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী বজ্র। এই তত্ত্বই বজ্রসত্ত্ব—তার প্রমূর্তরূপ আদিবুদ্ধ। তিনিই পরমদেবতা। এই পরমদেবতা আত্মাও বটে, আবার সর্বজনীন পরমসত্তারূপে পরমাত্মাও বটে। এ বোধ মূলত ঔপনিষদিক এবং আস্তিক্যসূচক। এই বজ্রসত্ত্ব পরমব্রহ্মের মতো নির্গুণ বটে, এই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা শূন্যতা, করুণা ও জ্ঞানরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা।

বৌদ্ধ ধর্মচক্র বা ধর্মকায় বজ্রযানে বজ্রকায়রূপে অভিহিত হয়। এই বজ্রকায় বজ্রসত্ত্বস্বরূপ এবং জ্ঞান ও করুণারূপ বুদ্ধ। এই আদি বুদ্ধের পঞ্চগুণ-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের নাম পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক দেবতা হচ্ছেন, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। উক্ত সব স্কন্দের ধ্যানের প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে দেবতারা ধ্যানীবুদ্ধ নামে অভিহিত হন। এঁদের প্রকৃতি বা শক্তি হচ্ছেন যথাক্রমে তারা [বজ্রধাত্বেশ্বরী] মামকী, পাণ্ডুরা, আর্যাতারা বা তারা ও লোচনা। এঁদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন চক্রপাণি [সমন্তভদ্র], রত্নপাণি, পদ্মপাণি [অবলোকিতেশ্বর] বিশ্বপাণি ও বজ্রপাণি। এরা ভূতপিশাচদেরও নাকি পূজা করত। যোনি-প্রতীক যন্ত্রপূজাও করত।

দেবীদের মধ্যে আর্যতারা—শ্যামতারা, শ্বেততারা, উগ্রতারা প্রভৃতি নানা নামে বিশেষ জনপ্রিয় হন। তাছাড়া হারিতা, মারীচি প্রভৃতি নামের প্রকৃতিও পরিকল্পিত হয়েছে। এই 'তারা' পরে হিন্দুর 'কালিকা'তে রূপান্তরিত হয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন হেরুক বা হে বজ্র এবং তাঁর প্রকৃতির নাম হচ্ছে বজ্রসত্ত্বাত্মিকা, বজ্রবরাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি আর তার আবাহনের বীজমন্ত্র হল 'হুং'। শূন্যতা ও করুণাকে কমল [প্রজ্ঞা], বজ্র [পুরুষ] প্রজ্ঞা [নারী], উপায় [পুরুষ], চন্দ্র [নারী], সূর্য পুরুষ এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। এ দুটো মিলন জনিত এক তুরীয় আনন্দময় অবস্থা বা চেতনার নাম বোধিচিত্ত। এইটিই তান্ত্রিকতত্ত্ব। শৈব-শাক্ত তন্ত্রের সঙ্গে এখানেই বৌদ্ধ-তন্ত্রের মৌলিক ঐক্য। বোধিচিত্তেই

৪. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসুখ, কমলকে [প্রজ্ঞা তথা নারী] বৌদ্ধতন্ত্রে যোনির এবং বজ্রকে [উপায় তথা পুরুষ] পুংলিঙ্গের প্রতীকরূপে ধরা হয়েছে! তাই 'বজ্রকমল সংযোগ' অর্থ মৈথুনক্রিয়া। এই মৈথুনে যে সামরস্য তাই 'যুগনদ্ধ' বা অদ্বয় এবং এই সামরস্যজাত আনন্দাবস্থাই বোধিচিত্ত। [এতদ অদ্বয়ং ইতি উক্তং বোধিচিত্তং ইদম পরম—সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭] অতএব প্রজ্ঞা-উপায় মৈথুনজাত মহাসুখরূপ বোধিচিত্ত লাভ করাই এ সাধনার লক্ষ্য। হে বজ্রতন্ত্রে হে বজ্র [বজ্রসত্ত্ব] নারী যোনিতে শুক্ররূপে বাস করেন বলে এবং শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ সম্ভব নয় বলে বর্ণিত হয়েছে। বজ্রযানীরা চর্যাগীতির মতো বজ্রগীতিতে তাদের সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করত। উল্লেখ্য যে আদিকাল থেকেই গানের মাধ্যমে সাধন-ভজন রীতি চালু রয়েছে। সব ধর্মেই গান [ক্বচিৎ নাচ] সাধনা ও উপাসনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অঙ্গ।

খ. কালচক্রযান

বজ্রযানের সঙ্গে কালচক্রযানের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। কালচক্রযানে কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। অর্থাৎ এখানে 'কাল'-এর ওপরই অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননাকাল ঘসতি ভূতানি'। কালচক্র হচ্ছে—শূন্যতা ও করুণার তথ্য প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়সত্তা। কালকে জয় বা অতিক্রম করে চিরন্তন বোধিচিত্ত লাভ তথা জন্ম ও মৃত্যু [উৎপত্তি ও ক্ষয়] নিরোধক শক্তিলাভই এ সাধনার লক্ষ্য। তাই কালচক্র বুদ্ধের জনকস্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায়ের ধারক। [বিমলপ্রভা–বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫]। "সাধন সম্বন্ধে কালচক্র-যানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়। অভয়াকর গুপ্ত 'কালচক্রাবতার' গ্রন্থে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-কারণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে কালচক্রপন্থী সাধকেরা গ্রহ নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাঁহাদের সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন।"[১] বৌদ্ধতন্ত্রে-বজ্রই মুখ্য ও কালচক্রযানে-তুকতাক্-উচাটন-বশীকরণ-মারণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারাদি ছিল।

গ. সহজযান

সহজযান দেব-দেবী, পূজা, মন্ত্র, প্রভৃতি সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ও আচারিকি ধর্মের বিরোধী। কিন্তু বজ্রযানের সাধনপদ্ধতি ও সহজযানের সাধনপদ্ধতি অভিন্ন। এমন কি বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্বকে তারা মানে। সহজযানের প্রসারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। এ মার্গের শাস্ত্র-গ্রন্থগুলোও তাই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত। আমাদের দোহাকোষ ও চর্যাপদগুলো সহজযানী সিদ্ধাদের রচিত। চর্যাপদে বামাচার ও প্রকৃতিবর্জিত সাধনার মিশ্রণ আছে। সহজযান মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন জনিত সামরস্য থেকেই মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব। এটিই বোধিচিত্ত। বৌদ্ধ চৌরাশীসিদ্ধার [৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত কায় সাধকদের] সবাই সহজিয়া ছিলেন না।

তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী–এঁরা প্রকৃতিবর্জিত পরম যোগী। কেউ কেউ সহজিয়া ছিলেন, তা চর্যাগীতিতে লক্ষণীয়।

---

১. ক. বিমল প্রভা (বরোদা সংস্করণ)
খ. বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : প্রবোধচন্দ্র বাগচী : পৃষ্ঠা ৪৬ (বাংলার বাউল ও বাউল গানে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজকীয় প্রয়াস চলে। এ সময়েরই 'কালবিবেক', 'দায়ভাগ' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থোল্লেখিত ব্রাহ্মণ্য আচার সমাজে বহুল প্রচলিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণের শুরু হয় এভাবেই। চর্যাপদ থেকে এমনও অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে সহজযানীদের মধ্যে দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতি চালু ছিল; একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিকপদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত-বিশুদ্ধ যোগপ্রণালী, হঠযোগের [চন্দ্র সূর্য] মাধ্যমে দেহ বা কায়াসাধনই ছিল এদের লক্ষ্য।

বিন্দু ধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন করে সহস্রার মধ্যে নিয়ে সচ্চিদানন্দ রূপ 'মহাসুখ' ও 'সহজানন্দ'-এর অবস্থা সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। এটিই নির্বাণানন্দ তথা 'শূন্যতা।'।

৫. নাথধর্ম

বলেছি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজধর্মরূপে গৃহীত হয়। ফলে বিভিন্ন ও বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলো ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে পড়ে। বিশেষ করে স্মৃতির বিধান-অনুগ সমাজ ও শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় লোকজীবনে সে-প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। সেনদের রক্ষণশীলতা আর অনুদারতাও বৌদ্ধবিলুপ্তির জন্যে অংশত দায়ী। এ বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনো কোনো বৌদ্ধসম্প্রদায় কিছু হিন্দুদেবতাও আচার গ্রহণ করে হিন্দুয়ানীর আবরণে পৈত্রিক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসী হয়। এরূপে এক যোগী-তান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিব-উমা' নাম দিয়ে নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার রক্ষা রাখে। মীননাথ গোরক্ষনাথ-হাড়িপা-কানুপা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মীননাথ-গোরক্ষনাথের নাম অনুসারেই এ সম্প্রদায় 'নাথপন্থী' রূপে আমাদের কাছে পরিচিত। বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের কালে দুটো ভিন্ন পথে রূপান্তর লাভ করে : বামাচার বর্জিত যোগীরা শৈবনাথ রূপে এবং কামাচারীরা বৈষ্ণবসহজিয়া রূপে হিন্দু সমাজের উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দ্রাবিড়দেবতা শিব ও উমাকে[১] অনেক আগেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পুরুষ-প্রকৃতির বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছিল, পরে শৈব-শাক্ততন্ত্রের শিব-উমাই [বা গৌরী] অবলম্বন হয়। তেমনি বৌদ্ধরাও পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রজ্ঞা-উপায় রূপে কল্পনা করে। আবার বৌদ্ধ বিলুপ্তিকালে প্রজ্ঞা-উপায়ের প্রতীকী পরিবর্তনে 'রাধাকৃষ্ণ' তথা বিষ্ণু-লক্ষ্মী আরাধ্য হয়ে ওঠেন। এ কারণে, এ সম্প্রদায় 'বৈষ্ণব সহজিয়া' নামে এক উপসম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণু ও তাঁর অবতার কৃষ্ণ মহাভারতীয় যুগ থেকেই উত্তর ভারতিক ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছেন। নাথপন্থ যে বৌদ্ধসহজিয়া মতবাদ থেকে উদ্ভূত তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুশীলকুমার দে প্রমুখ স্বীকার করেছেন।[২] অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও কল্যাণী মল্লিকের মতে নাথপন্থ একটি প্রাচীন শৈবমত। কিন্তু ডক্টর মল্লিক বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও স্বীকার করেছেন। 'নাথমার্গে' হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সার্ধম্য আছে।... নাথধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধ

---

১. Indo-Aryan and Hindi, P 44.

২. ক. বৌদ্ধগান ও দোহা : ভূমিকা : ১৬।

খ. Religion-P.C. Bagchi, History of Bengal, Vol I. D. U. P 423.

গ. শূন্যপুরাণ : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবেশক : ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩-৭।

ঘ. Sanskrit Literature : Dr. S. K. De. History of Bengal Vol I. D. U. PP 338-39.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ-তত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।'[১] আসলে প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিব-শক্তি'র প্রতীকীরূপে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েই ডক্টর মল্লিক হিন্দুতন্ত্রে, সহজিয়ামতে ও নাথপন্থে নানা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেও নাথমার্গকে শৈবমত বলেছেন। নাথেরা যে ব্রাহ্মণ্য শৈব নয়, তার একটি প্রমাণ নাথেরা শূন্যবাদী এবং কায়াসাধনব্রতী। আর ব্রাহ্মণ্য 'আদিনাথ' শিব 'আদিবুদ্ধে'রই প্রতিশব্দের মতো। নাথদের এক পীঠস্থান কামাখ্যা। কদলিনগরও নাকি কামরূপে। নাথযোগী সম্প্রদায় [তাঁতিরা] তাদের সমাজ, আচার, পূজাপদ্ধতি ও সৎকারাদি আজো স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা ও পালন করে। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অবশ্য বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে এরা হিন্দু-শৈবযোগীদের প্রভাবে পড়েছে। 'ভৈরব' নামে শিবপূজা এ প্রভাবের অন্যতম। নাথপন্থী সাধকরাও নানা মতগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তারা যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখন এসব উপসম্প্রদায়ের কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বা [বৌদ্ধ] যোগী। তাই এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্গাপূজা, চক্রপূজা, যোনি ও লিঙ্গ পূজা, শ্রীযন্ত্রপূজা প্রভৃতি চালু রয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে বলেই শক্তিকে এরা 'মাতৃকা' জ্ঞান করে না। বৌদ্ধতন্ত্রের অষ্ট সিদ্ধির অন্তর্ধান, খেচর প্রভৃতি সিদ্ধি আমরা মীননাথ-গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কাহিনীর মধ্যে পাই। মারণ-বশীকরণ-উচাটন-জ্যোতিষী প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারসিদ্ধিও নাথপন্থের লক্ষ্য ছিল। নাথমার্গেও শূন্যবাদ আছে। শৈব ব্যোমবাদ- আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ বৌদ্ধ সহজযানীদের শূন্য, অতিশূন্য ও সর্বশূন্যের তুল্য। শূন্য ও বোধিচিত্ত এবং নির্গুণ তুরীয় অবস্থা একই। এ-ই নির্বাণ।

AMARBOI.COM

৬. বৈষ্ণব সহজিয়া

বলেছি, বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পর বাঙালি বৌদ্ধসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে মিশে গিয়ে হিন্দুয়ানীর আবরণে তাদের মতাবলী প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। বৈষ্ণবসহজিয়া, ধর্মপূজারী, নাথযোগী, হিন্দুতান্ত্রিক প্রভৃতির উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়ার পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। কেবল শূন্যতত্ত্বের বা নির্বাণের বা বোধিচিত্তের স্থলে 'মহাভাব' রূপ সহজ তথা পরমানন্দ এবং প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'রাধা-কৃষ্ণ' নামই পার্থক্য সূচিত করেছে। এ কারণে পরকীয়া নারী-মৈথুন, বিন্দুধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন এবং রাগানুগা সাধনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নামান্তর ঘটেছে। বৌদ্ধদের মতো এরাও বেদ বিরোধী। বৌদ্ধদের মতো এরা একান্তভাবে গুরুবাদী। সৎগুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে কেউ মহাভাব বা 'সহজ'-এর অধিকারী হতে পারে না। এভাবে হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মও গড়ে উঠেছে বৌদ্ধতন্ত্রের কোনো কোনো পরিভাষার ও পদ্ধতির রূপান্তরে ও তত্ত্বের কলেবর বৃদ্ধিতে। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি-শিল্পে তার সাক্ষ্য রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। তারাই অন্য লোকের চোখে 'নেড়ানেড়ী'। নেড়ানেড়ী কথাটিও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী [মুণ্ডিত মুখ ও মস্তক]। কেবল রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্যে [তথা পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে] যারা সাধন ভজন আবদ্ধ রেখেছে, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। আর যারা নির্বিচারে নানা রূপক ও প্রভাব গ্রহণ করেছে, তারাই বাউল। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এ-ই।

সহজিয়াসাহিত্য ও সহজিয়াপদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে।

---

১. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস-দর্শন ও সাধন প্রণালী : পৃ: ১৮৮-৯১, ১৫৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. বাউল

বাউলদের জনশ্রুতিজাত ধারণা– স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধন প্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক। রূপ, সনাতন, নিত্যানন্দ, জীব প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকগণের পরকীয়া সঙ্গিনী ছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং মুসলমান আউলচাঁদ রূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধনপ্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আউল চাঁদের-পুত্র রামশরণ, তাঁর পুত্র দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে। সম্ভবত আউলচাঁদের শিষ্যা মাধববিবি এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র বাবীরচন্দ্র এই সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। আউলচাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত এবং কর্তাভজা মতের আদি গুরু বলে পরিচিত। বাউলেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। বাউলদের লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। তাই তারা কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। এ জন্যেই পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনেকটা অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

না বললেও চলে যে 'রাধাকৃষ্ণ' নামের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার চৈতন্যদেবকে বাউলমতের উদ্ভাবক রূপে প্রচার করে তারা এই সাধন তত্ত্বকে শ্রদ্ধেয় করার এবং আভিজাত্য দানের প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া বা রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই হয়তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আউলচাঁদ। আর অপর শাখার প্রবর্তক ছিলেন মাধব বিবি। এই শাখার বিস্তৃতি ঘটে সম্ভবত বীরভদ্রের চেষ্টায়। এটিরই লোকপ্রচলিত নাম 'বাউল সম্প্রদায়'। যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।

হিন্দুপ্রভাবে বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজন্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গনি, রসুল, রুহ, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধ নাথ এবং নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরাণিক উপমা ও কুরআন-হাদীসের বাণীর নানা ইঙ্গিত [যেমন বর্জখ] অবশ্য বাউল রচনায় এসব শব্দ ও পরিভাষা তাদের মতানুগ অর্থান্তর তথা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও সূফী সাধনার সঙ্গে বাউল মতের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার করে যে মিলন-ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক ও স্থায়ী করার জন্যে পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেও এক সর্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় 'পরম তত্ত্ব' পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছে মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই [অলক্ষ্য স্বামী], 'অচিন পাখী,' মনুরা [মনোরায়, মনোরাজা] প্রভৃতি পরমাত্মা—আত্মারই পূর্ণাঙ্গরূপ। দেহস্থিত আত্মাকে কিংবা আত্মা সম্বলিত নরদেহকে যখন 'মানুষ' বলে অভিহিত করি, তখন পূর্ণাঙ্গ বা অখণ্ড আত্মা বা পরমাত্মাকে মানুষ বলতে বাধা কি?

বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদও ভোগমোক্ষবাদ। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ ও পুরুষ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতিতত্ত্বের, সূফীমতের ও নানা লৌকিকতত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে বাউল মতে অসঙ্গতিও কম নেই। তবু বাউলদের ওপর বৈষ্ণব মতের [চৈতন্য চরিতামৃতের মাধ্যমে] এবং সূফীমতের [কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে] প্রভাবই অত্যধিক। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাউলমতের উদ্ভব। গুরু, মৈথুন ও যোগ তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউলমতের। তাই গুরুর, বিন্দুধারণের ও দমের বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বাউল গানে অত্যধিক। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউলমতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা হয়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই। বাউলের 'রসস্বরূপ' হচ্ছে সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এটিই অটলমানুষ তথা আত্মতত্ত্ব। এ হচ্ছে অরূপের কামনায় রূপসাগরে ডুব দেয়া, স্বভাব থেকে ভাবে উত্তরণ। সহজিয়াদের 'সহজ'ই সহজমানুষ। মৈথুন মাধ্যমে বিন্দু ধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালনের সময়ে গঙ্গা (ইড়া) ও যমুনা (পিঙ্গলা) বেয়ে সরস্বতীকে (সুষুম্নায়) ত্রিবেণী (মিলন) ঘটাতে হয়। তারপর সেখান থেকে সহস্রায় [মস্তক-স্থিত-সহস্রদল পদ্মে] যখন বিন্দু গিয়ে পড়ে, তখনই সৃষ্টি হয় মহাভাব বা সহজ অবস্থা। মূলাধারের রজঃকে ফুল, শুক্রকে ক্ষীর এবং নিঃসৃত রজঃকে নীর বলে। এই রজো বীজে বা নীরে-ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজমানুষ। বৌদ্ধমতে হে বজ্র [বজ্রসত্ত্ব] শুক্ররূপে নারী যোনিতে বাস করেন। সহজিয়াদের মতেও "ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষ্ণশক্তি' [বিবর্তবিলাস—অকিঞ্চন দাস]। এজন্যে পুরুষ নারীরজঃ এবং নারী পুরুষের শুক্র পান করে। সাধনার দ্বারা সহজমানুষের বা মহাচৈতন্যের তথা আত্মার অবিমিশ্র সত্তাবোধ জাগাতে হয়। মৈথুন পদ্ধতিই রাগানুগ পদ্ধতি। চারিচন্দ্র হচ্ছে—মল, মূত্র, রজঃ ও শুক্র। এসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। রস বলতেও উক্ত চার পদার্থকে বোঝায়, আবার সাধারণভাবে প্রেম বা শৃঙ্গার রসও নির্দেশ করে। 'বাণ' পুরুষশক্তি এবং প্রকৃতি-শক্তি।

বাউলদের মনের মানুষ, মনুরা, সহজমানুষ, অধরমানুষ, ভাবের মানুষ বা অলখ সাঁই-এর সঙ্গে আদিবুদ্ধ, আদিনাথ, বোধিচিত্ত ও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের মৌলিক ঐক্য রয়েছে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে হিন্দু-বাউলের অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন গুরুর মত বা নামানুসারে এরা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত, যথা কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বলরামী, শম্ভুচাঁদী প্রভৃতি। মুসলমান বাউলরা নেড়ার ফকির, আউল, সাঁই, সাহেব ধনী, হজরতী, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরুপন্থী সমাজে বিভক্ত।

দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। এই ধারণাই দেহতত্ত্বে আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে দেহের চর্যা ও দেহ সম্বন্ধীয় তথ্য উদঘাটন আবশ্যিক হয়েছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের আমল থেকে দেহ ও সাধনা সম্বন্ধীয় যে-সব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছি। এতে দেহের বাম ও দক্ষিণের একটি স্থূল পরিচয় মিলবে :

দেহের দক্ষিণাংশে : রসনা, পিঙ্গলা, সূর্য, রবি, অগ্নি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, উপায়, যমুনা, রক্ত, পলিতা, সূক্ষ্ম রেতঃ, ধর্ম, স্থির, পর, দ্যৌ, ভেদ, চিত্ত, বিদ্যা, রজঃ, ভাব, পুরুষ, শিব, জিনপুর, নির্মাণকায়, গ্রাহ্য ও গগন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের বামাংশে : ললনা, ইড়া, চন্দ্র, শশী, সোম, অপান, ধমন, আলি, নাদ, প্রজ্ঞা, গঙ্গা, শুক্র, বলি, স্থূল, রজঃ, অধর্ম, অস্থির, অপর, পৃথিবী, অভেদ, অচিত্ত, অবিদ্যা, তামস, অভাব, প্রকৃতি, শক্তি, সম্ভোগকায় ও গ্রাহক।

অবশ্য এসব পরিভাষার সবগুলো বাউলসাধনায় ও বাউলরচনায় মিলবে না। কারণ কালে অনেকগুলোর গূঢ়ার্থের স্মৃতি লোকমানস থেকে মুছে গেছে। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের ও সাধন-প্রণালীর প্রভাবে পড়েছে বলে বাউলসাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এ জন্যে মুসলমান বাউলদের মধ্যে পরকীয়া ও মৈথুনাত্মক সাধনা দুর্লক্ষ্য; তারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দেয়।

বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউলমত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়। তাই পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।

নানাবরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

মানুষ নির্বিশেষকে এমন উদারদৃষ্টিতে দেখা যে-জীবন বোধের দ্বারা সম্ভব, তার উৎস যে-ধর্মমত বা মরমিয়াবাদ তা কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। মুসলমান বাউলের হিন্দু গুরু, হিন্দু বাউলের মুসলমান গুরু এমন প্রায়ই দেখা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে মুসলমান বাউলেরা আধা-মুসলমান। এরাই বাঙলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সূফী-দরবেশরা তাদের এমনি আধা-মুসলমান করে না রাখলে, সরাসরি শরীয়তী ইসলাম প্রচারে এত লোককে দীক্ষিত করা যেত না হয়তো। আগে নামত মুসলমান সমাজভুক্ত ছিল বলেই উনিশ-বিশ শতকে তাদের অধিকাংশকে সহজেই পুরো মুসলমান করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফরায়েজী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ-বিশ শতকে শরীয়তী ইসলামে ফিরে এসেছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল-সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে। নইলে বাঙলার বিশেষ করে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের, এক কথায় পদ্মার ওপারের নিম্নশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে বাউলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

বাউল ধর্মে বৈরাগ্য নেই। বাউলেরা মুখ্যত তাত্ত্বিক, গৌণত প্রেমিক। এই তাত্ত্বিকতা অনেককেই বিষয়ে অনাসক্ত রাখে। তাই বাউল দুই প্রকার : গৃহী [বিষয়ী গৃহী] ও বৈরাগী [অনাসক্ত গৃহী]। বাউল বৈরাগীরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালীর মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের ওপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালির জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্যে বাঙালিকে শ্রদ্ধেয় করেও তুলত।

৮. বাউল নামের উৎপত্তি

'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। নামটি বাউলদের স্বপ্রদত্ত নয়। পনেরো শতকের শেষপাদের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এবং ষোল শতকের শেষপাদের চৈতন্যচরিতামৃতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক্ষেপা' ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের আদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের কাছে প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের একটি হেঁয়ালিতেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখেছি। রাঢ় অঞ্চলে এখনো বাউলকে 'ক্ষেপা' বলে। কেউ বলেন 'বাউল' [এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল] থেকেই 'বাউল' নামটির উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য উত্তর ভারতের 'বাউরা'র সঙ্গে আমাদের 'বাউল'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবু 'আকুর' থেকে 'আউল' এবং 'ব্যাকুর' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেন–এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা বাজিয়েদেরকে লোকে 'বাতুল' বলে উপহাস করত। এ 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' নামের উদ্ভব। কারুর কারুর মতে 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'স্বার্থে ল' যুক্ত হয়ে, বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সাধনাকারী অর্থে বাউল শব্দ তৈরি হয়েছে। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বাউল' শব্দটি 'আউল' শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'আউল' আরবি 'আউলিয়া' [ওলির বহুবচন] সম্ভূত। ডক্টর সৈয়দ আবদুল হালিমের মতে 'আউল' শব্দটি 'আউয়াল' শব্দজ। আগমের আরবী পরিভাষা হিসেবে 'আউয়াল শব্দটি গ্রহণ করে মুসলমান আগমতাত্ত্বিকেরা আউয়াল বা 'আউল' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য 'আগম'-এর আরবী পরিভাষা 'আউয়াল'-এর 'আউল' রূপে বহুল প্রয়োগ বাউল গানে দেখা যায়। উপরোক্ত এ কয়টি ব্যাখ্যার কোনটাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে 'ব্যাকুল' বা 'বাতুর' থেকেই 'বাউল' নামের উদ্ভব বলে অনুমান করা সম্ভবপর। আমাদের এ অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উচুঁস্তরে বাউলেরা কোনো কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পায়নি। তাই মনে হয় 'ব্যাকুর' (ভাবোন্মত্ত) কিংবা 'বাতুল' (অপদার্থ) অর্থে উপহাসস্থলে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। আর 'আউয়াল' থেকে আউল শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না। আবার বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নামটিও আউলচাঁদ। হয়তো আউয়ালবাদী (আগমবাদী) বলেই তাঁর নাম আউলচাঁদ। কিংবা গোড়ার দিকে আউলচাঁদের অনুসারীরাই ছিল 'আউল' বলে পরিচিত।

সম্প্রতি ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা' নামের প্রবন্ধে[১] 'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেছেন। তিনি অবহঠট রচনায় ও চর্যাগীতিতে[২] ব্যবহৃত বাজিল, বাজুল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলোকে বাউল শব্দের পূর্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বজ্রী-বজ্জির-বাজির-বজ্জিল-বাজিল-বাজুল-বাউল। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ যদি 'বজ্রকুল' নামে অভিহিত হত বলে অনুমান করা সম্ভব হয়, তাহলে 'বজ্রকুল'

---

১. সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭৬ সন, পৃঃ ৯৩-১৩৭। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. ক বাজুলে দিল মো লক্খ ভণিআ–ভাদেপাদ।

খ নাচন্তি বাজিল গাত্তি দেবী-বীণাপাদ।

গ সো বাজির নাহুরে ময়ি বুত্ত পবমখে-কানুপার দোহাকোষ।

ঘ জোইনি গাঢ়ালিঙ্গণ হি বজ্জিল লহু উপসন্ন–সরহের দোহাকোষ। (অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

বিভিন্ন তান্ত্রিকতত্ত্ব ও পদ্ধতির পরিচয়দানের জন্যে আমরা একটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিনি। হাড়মালা, সাধনমালা, কৌলজ্ঞান, নির্ণয়, বৃহৎ তন্ত্রসার (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পাদিত) Studies in the Tantras by P. C. Bagchi, Introduction to Tantric Buddhism by Dr. S. B. Dasgupta. বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাঙালির ইতিহাস : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, নাথধর্ম ও সাহিত্য : প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী : ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, সহজ সাধনা : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, বিবর্তবিলাস : অকিঞ্চন দাস প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা সহায়ক হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে 'বাউল' হওয়া আরো সহজ। যেমন বজ্রকুল-বজ্জউর-বাজুল-বাউল। যা হোক, বাউল যে বজ্রযানী নির্দেশক, সে-সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

৯. বাউল সাধনা

বাউল গান তাত্ত্বিক রচনা –তত্ত্বসাহিত্য। স্বল্পশিক্ষিত লোকের রচনা বলে এগুলো লোক সাহিত্যের উপরে উঠতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন আঙ্গিক সৌষ্ঠবে, ভাবের সুষম অভিব্যক্তিতে, কাব্যরসে, শিল্পসৌন্দর্যে, ছন্দলালিত্যে ও সুচিত শব্দসম্পদে উৎকৃষ্ট কবিতার লাবণ্য লাভ করেছে, বাউল গান তেমন নয়। আঙ্গিকে, ছন্দে এবং অভিব্যক্তির অসঙ্গতিতে ও শিল্পরুচির অভাবে এসব রচনা কবিতার পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিশেষ করে লালন, পাঞ্জু, হাউরে, মদন, যাদুবিন্দু প্রভৃতি কয়েকজনের রচনায় কাব্য-মাধুর্য দুর্লভ নয়। সাহিত্য হিসেবে বিচার করলে বাউল গান লালিত্যবিরল লোকগীতিমাত্র, আর কিছু নয়। সুরের একঘেয়েমিও তত্ত্ব-বিমুখ শ্রোতার পক্ষে পীড়াদায়ক। বাউলগানের কদর আছে ভাবুক ও তত্ত্বপ্রিয় লোকের কাছে এবং তা গান হিসেবে নয়–তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবে। বাউলেরা গানকে তত্ত্বপ্রচারের, ভজনের ও আত্মবোধনের কাজে লাগায়। গানের প্রথম চরণেই সাধারণত মূল বক্তব্যের আভাস মেলে এবং তার সৌন্দর্যও অবশ্য স্বীকার্য।

সব গুহ্য সাধনাই যোগ নির্ভর। তাই এখানে যৌগিক সাধন প্রণালীর স্থূল পরিচয় দেয়া হল : দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। তার মধ্যে তিনটে প্রধান–ইড়া,পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এ তিনটিকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতোস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র, রজঃ, নীর-ক্ষীর-রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ুচালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।

আবার শুক্র, রজঃ ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত—জীবনীশক্তি ও বিনাশবীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস. কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে গোটা দেহের ওপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়ীতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতাই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম।

ললাটদেশে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি রজঃবিষ বা কামবিষের প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দলাভ করাই সাধ্য।

এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। তখন যে-শুক্রের স্খলনে নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়ীমাধ্যমে ঊর্ধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি সংরক্ষিত হয়। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।

যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক সর্পস্বরূপ মনে করা হয়েছে। কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই কুণ্ডলিনী নাম পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কামবিষ। কামবিষরূপ সৃষ্টিশীল শুক্র স্খলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনীশক্তি। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করা দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের বিনাশ নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ীর মাধ্যমে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট-দেশে সঞ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাখলেই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। এটিই সামরস্য, সহজাবস্থা, চিররমণানন্দাবস্থা বা সচ্চিদানন্দাবস্থা—শিব-শক্তি, প্রজ্ঞা-উপায় বা রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় সংস্থিতি। এটিই সিদ্ধি। আজকের যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে একপ্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, আর তাতেই হয়তো মনে করে যে তারা অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং তাদের আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।

সাধনার তিনটে স্তর : ১. প্রবর্ত, ২. সাধক ও ৩. সিদ্ধি।

১. প্রবর্তাবস্থায় যোগী সুষুম্নামুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃতধারায় স্নাত হয়।

২. শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে তথা বিন্দু ধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নামুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান।

৩. এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীপথে শুক্র ইচ্ছামত চালু রেখে অজরামরবৎ বোধগত সামরস্যজাত পরমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যামৃত ধারাবারে স্নান। এতে স্থূল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাব স্বরূপ শৃঙ্গারানন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধভাণ্ড শৃঙ্গার রূপ মন্থনদণ্ড সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা যায়। এর ফলে জরাগ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজমান থাকে।

AMARBOI.COM

১০. বাউলমত ও বাঙালিচিত্তের উৎকর্ষ

বাউলমতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সমাবেশ করার চেষ্টা করেছি উপরে। কিন্তু সে-সব বাহ্যপরিচয় বহন করে। অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্যে তত্ত্বকথার জাল বুনতে হবে এবং তাতে ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। প্রমাণ যা থাকবে তা পরোক্ষ, তাই পঙ্গু হবে বিরল।

চলমান জীবন প্রতিমুহূর্তে বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করে। অভিব্যক্তির এ প্রবাহকে কোনো ছকে ফেলে যাচাই করা চলে না। একথা কেবল ব্যক্তিসম্পর্কে নয়, জাতিক জীবন সম্বন্ধেও সত্য। তবু জানবার বুঝবার সুবিধের জন্যে একটা মাপকাঠি স্বীকার না করলেই নয়। তাই সমাজনীতি, ধর্মনীতি, রাষ্ট্র সংস্থা, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, পোশাক, আচার, আচরণ, প্রভৃতি সাধারণভাবে সমাজের বা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচায়ক ও পরিমাপক বলে স্বীকৃত হয়, যদিও এমন কোনো সাধারণ তৌল কিংবা সমীকরণ পদ্ধতি নেই, যা দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের বিচিত্র আচরণকে একটি সামগ্রিক ধারণার বশীভূত করে বিচার করা সম্ভব। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় নিবদ্ধ নেই বলে সামগ্রিক স্বরূপে কোনো জাতিকে চিহ্নিত করাও অসম্ভব। তবু মানুষের বোধের ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে তার জাতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের যে রেওয়াজ চালু রয়েছে, আপাতত আমাদের তা-ই অনুসরণ করতে হবে।

জাতির পরিচয় ক্ষেত্রে ধর্ম ও সাহিত্যকে প্রধান উপকরণ বলে গণ্য করা হয়। কেননা, জীবন একান্তই স্থান-কাল-ভিত্তিক। কাজেই মানুষের দেহ-মন গড়ে তোলে প্রতিবেশ। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অন্তরের অকপট অনুভূতিও উপলব্ধির সুন্দরতম ও নিগূঢ়তম প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে এবং জীবনের তথা মননের ও আচরণের অলক্ষ্য নিয়ন্তা হচ্ছে শাস্ত্র সংস্কার। ধর্মের অন্তর্লীন প্রভাবের স্বরূপ যাই হোক, সাহিত্য যে মানুষের অবিকৃত বোধ-বুদ্ধির প্রতিরূপ তা মানতেই হবে। কেননা সাহিত্য জীবনালেখ্য নয়, জীবনের অভিব্যক্ত সাক্ষ্য। এজন্যেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর বলে স্বীকৃত। সাহিত্যে মানুষের মর্মলোকের স্বরূপ বিধৃত থাকে বলে, মানুষের অন্তর্সত্তার পরিচায়করূপে এক বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর মানুষের মননে ও আচরণে স্থানিক ও কালিক ছাপ অনপনেয় বলে যে-কোনো সাহিত্য মানুষের প্রেরণার মাতৃকা, কর্মের দিশারী ও মর্মের পরিচায়ক। কাজেই সাহিত্য ও ঐতিহ্যের উজান পথেই সন্ধান নিতে হবে তত্ত্বের।

মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগতের ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন জিজ্ঞাসা রয়েছে তারই জবাব খোঁজা হয়েছে ধর্ম ও অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কিত রচনায়। বাস্তববাদী ও শক্তিমানের যে-জিজ্ঞাসা মানুষকে বিজ্ঞানী করেছে, ভাববাদী দুর্বলকে তা-ই করেছে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। এই জিজ্ঞাসা আপাতবিরোধী দু' কোটির চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা ও জন্ম দিয়েছে। এই একই জিজ্ঞাসা কাউকে করেছে বহির্মুখী, কাউকে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। বহির্মুখিতা মানুষকে করেছে বিজয়ী ও বিজ্ঞানী। অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে করেছে রহস্যবাদী—গড়ে তুলেছে অধ্যাত্মবাদ। বিজ্ঞান এনেছে ভোগবাদ বা ঐহিক জীবনবাদ তথা বস্তুতান্ত্রিকতা। অধ্যাত্মবাদ দিয়েছে বৈরাগ্য ও ইহবিমুখতা– জাগিয়েছে জীবনেতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। বৈরাগ্য প্রাচ্যের মানসসম্পদ, আর বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য। দুটোরই মূল প্রেরণা জিগীষা, একটার লক্ষ্য আত্মজয়, অপরটির কাম্য দুনিয়া জয়, একটার সম্বল হৃদয় ও মনোবল, অপরটির হাতিয়ার বুদ্ধি ও বাহুবল। একটি হৃদয়বৃত্তির লীলা, অন্যটি প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি।

তত্ত্বচিন্তা মানুষকে তিনটে মার্গের সন্ধান দিয়েছে : জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মার্গ। জ্ঞানবাদ আস্তিক্য, নাস্তিক্য ও সংশয়-প্রবণ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। কর্মবাদ সমাজ, শাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলেছে আর ভক্তিবাদ হয়েছে নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের উৎস। এবং ভক্তিবাদের উপজাত কিংবা পরিণতি হচ্ছে প্রেমবাদ। বাঙলা ভাষাও একই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিন ধারার, সাহিত্যসৃষ্টির উৎস হয়েছে : ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও মরমিয়াসাহিত্য। বাউল গান হচ্ছে তত্ত্বাশ্রয়ী মরমিয়াসাহিত্য।

বাউল গান আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলিম প্রভাবে তথা সূফীমতের প্রত্যক্ষ সংযোগে এক প্রাচীন মতের রূপান্তরে বাউল মতের উদ্ভব। বলেছি এই মতের জড় রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আদিকাল থেকেই মানুষ সাধারণভাবে দৈহিক শুচিতাকে মানস শুচিতার সহায়ক বলে বিবেচনা করেছে। এই জন্যে যে-কোন ধর্মমতে উপাসনাকালে দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যিক। মনে হয়, এ বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। যোগে সাংখ্যে, বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে এবং সূফীসাধনতত্ত্বে দেহকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেহের আধারে যে চৈতন্য, সেই তো আত্মা। এই নিরূপ-নিরাকার আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা শারীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে দেহযন্ত্র নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহ-যন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবে সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অসামান্য। তাই এদেশে অধ্যাত্ম সাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। বাঙলায় পাল আমলে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখা মধ্যযুগে সূফী প্রভাবে বৈষ্ণবসহজিয়া ও বাউল মত রূপে প্রসার লাভ করে। এভাবে চর্যাগীতির পরিণতি ঘটে সহজিয়াপদে ও বাউলগানে। তত্ত্বসাহিত্যে তথা মরমিয়া সাধনায় সাধারণভাবে যোগ আর সূফীসাধনতত্ত্বের ও পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। সমাজ ও ধর্মের আচারিক প্রভাব সত্ত্বেও শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তরালে ভিন্নাদর্শমুখী দুটি জাতির মধ্যে কি নিবিড় প্রাণের যোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে বাউলগানে ও এধরনের অন্যান্য রচনায়। জীবনের যে চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাতি, ধর্ম ও সমাজ চেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। মানসসংস্কৃতির এরূপ লেন-দেন, এমনি আত্মিক যোগাযোগ চিরকালই মানুষের চিত্ত প্রসারের ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছে।

আরব-তুর্কী বিজয়ের পরে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, পরে উত্তর ভারতে এবং অবশেষে বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নের বাহ্যরূপ ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ ও তজ্জাত ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সূফীতত্ত্বই এসব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের 'ভক্তিধর্ম' উত্তর ভারতের 'সন্তধর্ম' আর বাঙলার বৈষ্ণব ও বাউলমত সূফীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। সেদিন ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মহিমা যে আবেগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল, তারই ফলে মন্দির ছেড়ে মসজিদের পথে না গিয়ে উদার আকাশের নীচে স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের এ নতুন প্রয়াস মাত্র। তারা বুঝেছে যদিও 'হিন্দু ধাবই দেহরা মুসলমান মসীত।' সেখানে তো আল্লাহ নেই। কবীরের ভাষায় তাঁদের মতে আল্লাহ বলেছেন :

মো কো কঁহা ঢুঁঢ়ো বন্দে মৈঁ তো তেরে পাসমে।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ।

জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপন আত্মার পরিশুদ্ধিই আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়। তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই এদের প্রাথমিক ব্রত। এঁদের আদর্শ হচ্ছে ' knoweth thyself', আত্মানং বিদ্ধি– নিজেকে চেন। হাদীসের কথায় 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'।-যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে। জীবনের পরম এবং চরম সাধনা সে-আল্লাহকে চেনা।

ইরানী সূফীসাধনাও যৌগিক প্রক্রিয়ানির্ভর। ভারতবর্ষের যোগসাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে সূফীদের দেহচর্যায় যোগশাস্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়ে। সূফী দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়ে উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যিনি ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁর নাম শেখ শরফুদ্দীন বু আলী কলন্দর শাহ (মৃত্যু) ১৩২৪ খ্রী.)। তাঁর প্রবর্তিত সাধন পদ্ধতির বাঙলা নাম 'যোগকলন্দর'। পানিপথে তাঁর সমাধি আছে। উত্তর ভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর তাঁর খ্যাতি আজো ম্লান হয়নি। এক সময়ে বাঙলার কলন্দরপন্থী বৈরাগীর এমনি প্রাদুর্ভাব ছিল যে 'কলন্দর' বলতে মুসলিম বৈরাগীই বোঝাত। কবিকঙ্কনচণ্ডীতে আছে : 'কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি। ঋণ কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর।"

আর সূফীতত্ত্বের সঙ্গে এদেশের লোকের সাহিত্যিক পরিচয় ঘটে প্রথমে রুমীর মসনবীর মাধ্যমে এবং পরে হাফিজ প্রমুখের সৃষ্টির মারফৎ। ব্যবহারিক পরিচয় তো আগে থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছে। কেননা, ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রধানত সূফীদরবেশ ও তাঁদের অনুচরদের মাধ্যমে।

আত্মা পরমাত্মার অংশ, কাজেই আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকেই জানা হয়। তাই দেহাধারস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত-

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।"

'এ দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।'

বাউলেরা তাঁদের ভাষায় 'অচিনপাখী' 'অলখসাঁই' (অলক্ষ্যস্বামী), মনের মানুষ বা 'মানুষরতন' রূপ আত্মা তথা পরমাত্মাকে জানবার সাধনা করে। বৈষ্ণব বা সূফীর মতো এরা প্রেমিক নয়; যোগীর মতো তাত্ত্বিক। বাউলগান একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন, সাধনসঙ্গীত ও ভজন, গান ও গীতি-কবিতা; তথাপি ভাষায়, আঙ্গিকে ও ভঙ্গিতে এগুলো আমাদের লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত।

মোটামুটি ভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাঁদই এ মতের প্রবর্তক বলে বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রই বাউলমত জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।

ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই বাউলেরা সাধনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধকের ও দার্শনিকের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা সাম্য ও মানবতার বাণী প্রচার করে। তারা রুমী-হাফিজের স্বগোত্র এবং কলন্দর, রামানন্দ, কবীর, দাদু ও রজবের উত্তরসাধক। বাউলগুরুরা একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও মরমী। তাদের গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়– বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর। চর্যাপদ, দোহা প্রভৃতি সব মরমীয়া রচনার মতো বাউলগানও সাধারণত রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত। সে-রূপক দেহাধার, বাহ্যবস্তু ও ব্যবহারিক জীবনের নানা কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সংগৃহীত। কারণ, 'all creation's wonders excite the cry of love (Rumi) '।

বলেছি, ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়সাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এই সাধনা চলে। এক সময়ে এই নাথপন্থ এবং সহজিয়ামতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক এক সময়ে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম ও বৈষ্ণবধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে; তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব। বাউলেরা অশিক্ষিত, এজন্যেই তাদের কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই এবং তাদের মতবাদের কালিক কিংবা দার্শনিক পরিচয় তারা দিতে পারে না। সমাজের অজ্ঞ ও গরীব লোকের মধ্যেই এ সাধনা আবদ্ধ বলে বাউলমত শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধা পায়নি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের ঔৎসুক্য জাগান।

গুণী ও মরমী হয়েও বাউলেরা সমাজে উপেক্ষিত। বাউল সম্প্রদায়ের জাতি বা শ্রেণী বৈষম্য নেই। হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই। হিন্দুগুরুর মুসলিম শিষ্য, মুসলিম গুরুর হিন্দু সাগরেদ গ্রহণে কোনো দ্বিধা-বাধা নেই। তাই "বাউল মনাই শেখের শিষ্য কালচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য হারাই নমশূদ্র, তাঁহার শিষ্য দীনু জাতিতে নট, তাঁহার শিষ্য কালচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য ঈশান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগী, তাঁহার শিষ্য মদন। নিত্যনাথের শিষ্য বলা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য বিশা ভুঁইমালী, তাঁহার শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য মাথা পাটিয়াল বা কাপালী, তাঁহার শিষ্য গঙ্গারাম। গঙ্গারাম ও মদন দুই বন্ধু ছিলেন।"[১]

অস্ট্রিক-মঙ্গোল অধ্যুষিত বাঙলাদেশের জনগণ চিরকাল অত্যধিক ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতা বা হৃদয়োচ্ছ্বাস থেকেই বাঙালির গীতিকবিতার উদ্ভব। বাঙলা কেবল ধানের দেশ নয়, গানের দেশও। এখানকার মাটির ফসল ধান, মনের ফসল গান। শুধু বন্যাতেই দেশ প্লাবিত হয় না, গানেও হৃদয় প্লাবিত হয়। লাল কাঁকরের পশ্চিমবঙ্গ, শুষ্ক উত্তরবঙ্গ ও নদীবহুল পূর্ববঙ্গবাসীর দৃষ্টি চিরকাল আকাশের দিকে। শ্যামসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা জানায়, তেমনি প্রকৃতির নিদারুণ রুক্ষতায় কিংবা বিরূপতায় তারা ঊর্ধ্বে দু'চোখ তুলে ফরিয়াদ জানায়। এই ভাবপ্রবণ বাঙালির হৃদয়ে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রহস্যময় মানবজীবন সম্বন্ধে যে-জিজ্ঞাসা জেগেছে, সেই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে বাঙালি কেবল কালে কালে ঘরছাড়া হয়নি, আত্মহারাও হয়েছে। সেই জন্যে এদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লৌকিক দেবতার কাছে হার মেনেছে। মমতায় আঁকড়ে ধরা নয়, চরম ঔদাস্যে মোহমুটি শিথিল করাই এদের জীবনাদর্শ। তাই চর্যাপদের দেশেই বৈষ্ণব-বাউলের উদ্ভব। মূলত সবগুলোই এক। প্রকাশভঙ্গিই ভিন্ন। সিদ্ধা-সূফী-যোগী-বৈষ্ণবেরা যেমন গুরুবাদী, বাউলেরাও তাই। বাঙালির স্বভাবেই রয়েছে মরমীবাদ। তাই স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শরিয়তী ইসলামের নিষেধের বেড়া ভেঙে, জগৎ ও জীবনের রহস্যসন্ধানী বাঙালি নিজের মনমত পথ তৈরি করে নিয়েছে। এজন্যেই এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান এক গুরুর দীক্ষা নিয়ে মনে মনে এক হতে পেরেছে, স্রষ্টার একটা সর্বজনীন রূপ দেয়ার জন্যেই বাউলেরা 'অনামক অলখ সাঁই'র সন্ধানী। এজন্যেই তারা সহজেই বলতে পারে :

"কালী কৃষ্ণ গড় খোদা
কোন নামে নাহি বাধা
মন কালী কৃষ্ণ গড খোদা বলরে।"

পথের পার্থক্য, মতের অনৈক্য এবং সাধনপদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাউল, বৈষ্ণব ও সূফীদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিণামগত মিল বর্তমান। তাই একের বাণীতে অপরের মনের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এক চরমক্ষণে দেহাধারস্থিত পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তখন পরমকে উপলব্ধির আনন্দে সবাই একই সুরে বলে 'আনল হক' কিংবা 'সোহম'। এই অদ্বৈতসিদ্ধি আমরা বাউলে বৈষ্ণবে ও সূফীতে প্রত্যক্ষ করি। রাগাত্মিকা ভক্তিতে শুনি 'মুর্খই সেই'[২], সূফীরা বলেন 'আনল হক'; বাউলও[৩] বলেন, 'দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ, ডাকলে কথা কয়।'

'এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষরতন।'
'এই মানুষে রঙ্গে-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার।'

অথবা, ক্ষেপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়

---

১. ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী—বাউল : বাঙলার হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা।
২. চৈতন্যদেব ২. মনসুর, বায়েজিদ প্রভৃতি
৩. লালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায় ...
আমি যেরূপ দেখনা সেরূপ দীন দয়াময়
কিংবা, ডুবে দেখ দেখি মন তারে-কিরূপ লীলাময়,
যারে আকাশ-পাতাল খোঁজ এই দেহে তিনি রয়।
...লামে আলিফ লুকায় যেমন মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা না হলে কি সব নূরের তন আদম তনকে সেজদা জানায়!
অথবা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তাহার পায়।
বা, কারে বলবো কেবা করে বা প্রত্যয়
আছে এ মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।
এবং আত্মা আর পরমাত্মা ভিন্নভেদ জেনো না।
রুমী ও বলেন– I gazed into my own heart, there I saw Him.
He was nowhere else.
কিংবা; I All in All becoming
Now clear see God in All
And up from Union yearning
Take flight the cry of love.
রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(আমি) তাই হেরি তায় সকল খানে।...
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে আমার বুকে
ওরে দেখরে আমার দু'নয়নে।"
কিংবা, "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিল
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাইনি।"
অথবা, "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

এমনি বোধেরই গাঢ়তায় জীবাত্মা-পরমাত্মার ব্যবধান ঘুচে যায়। ইরানের সূফীমত ও ভারতের বেদান্ততত্ত্ব বাঙলার মাটিতে বাউলবাণীতে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছে। সূফী-বৈষ্ণবদের মতো গানের মাধ্যমেই বাউলদের সাধন-ভজন চলে :

"বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মৈথুনাত্মক যোগসাধনই বাউলপদ্ধতি। ইন্দ্রিয় নিরোধ, বিষয় ত্যাগ কিংবা বৈরাগ্য এদের লক্ষ্য নয়। তবু প্রাচীন ভারতিক ঐতিহ্য প্রভাবে মুনি, আজীবিক, ভিক্ষু, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈরাগী প্রভৃতির মতো বাউলেও ভিক্ষাজীবী বৈরাগী আছে। সে হিসেবে বাউল দুই প্রকার : গৃহী ও বৈরাগী। বর্তমানে এরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হযরত, গোবরাই, পাগলনাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনী, জিকির, ফকির, বাউল, আউল, কর্তাভজা, সাঁই, ন্যাড়া, বলরামী, শম্ভুচাঁদী, রামবল্লভী প্রভৃতি নাম থেকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের নাম ও সাধনপন্থার আভাস পাওয়া যায়। তাদের সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার ও ধর্মদর্শনের কোনো লিখিত ইতিহাস বা শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। তাই এসব মতের উন্মেষ, বিকাশ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণতির খবর পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে বাউলেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। তাদের শ্রুতি-স্মৃতির উপর তেমন নির্ভর করা চলে না।

বাউলসাধনার মর্মকথা বাউল কবির ভাষায় এরূপ :

"সখি গো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।"

এবং "উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।"

বাউল কবিদের মধ্যে : লালন সাঁই, শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাঞ্জু সাঁই, পদ্মলোচন (পোদো), যাদুবিন্দু, দুদ্দু, পাঁচু, চণ্ডী গোঁসাই, রশীদ, হাউড়ে গোঁসাই, গোপাল গোঁসাই, চণ্ডীদাস গোঁসাই, ফুলবাসুদ্দীন, ঈশান, বাখের সাঁই, এরফান সাঁই, সৈয়দ শাহনূর, মিয়াধন, শীতলং সাঁই, আতর চাঁদ, তিনু, শ্রীনাথ, শেখ কিনু প্রমুখ জনপ্রিয়। লালনপূর্ব কালের কোনো বাউল গান পাওয়া যায়নি। বাউল গান উনিশ-বিশ শতকের সম্পদ। বাউল গানের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় বাউলপ্রভাব কম নয়। তাঁর ভাষাতেই আলোচনা শেষ করছি : "[বাউল গান] থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এ মিলনে গান জেগেছে। ...এ গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।"

ঝগড়া বাধেনি, কারণ তারা বিষয়ী লোক ছিল না। ভেদবুদ্ধিহীন নির্বিষে মানবতা উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই এ সাধনা করে বাউলরা। বাউলের অনুচ্চ কণ্ঠের লীলায়িত ভঙ্গিমার সুর-প্রবাহে মন ভাসিয়ে দিলে দূরলোকের উদাস-করা যে-ধ্বনি চিত্তবীণায় ঝঙ্কার তোলে, তা মনের ও আত্মার গ্লানি মুছে দিয়ে এক আনন্দ-সুন্দর জীবনচেতনায় চিত্তকে ঋদ্ধ করে। তখন মাটির মমতাকে তুচ্ছ জেনে উৎকণ্ঠ মন-বলাকা পাখা মেলে দিগন্তহীন গগন পানে– জন্মের, জগতের জীবনের তাৎপর্য সন্ধানের প্রেরণায়। জগতের, জীবনের স্রষ্টার যে-রহস্য জিজ্ঞাসায় আত্মার এ আকুলতা, অকূলে কূল পাবার আকুলতার মতোই তা অসার্থক। পিঁপড়ের সমুদ্র-সাঁতারের আকাঙ্ক্ষার মতো ক্ষুদ্র মানুষের অসীমের সীমা খোঁজার এ প্রয়াসও চির অসাফল্যে বিড়ম্বিত জেনেও তবু এতেই আত্মার আকুতি আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। জীবনে অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষার এই প্রদীপ্ত আবেগ, অধরাকে ধরার প্রত্যাশার এই আনন্দিত অভিভূতির পুঁজিই বাউলদের পথে নামিয়েছে। পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে পথ বাড়িয়ে তাই তারা তৃপ্তির প্রত্যাশায় অতৃপ্ত-হৃদয়ে ঘুরে বেড়ায়।*

* বিস্তৃত আলোচনা আমার 'বাউলতত্ত্ব' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আহমদ শরীফ রচনাবলী ২ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. বাঙলার সূফী সাহিত্য ও কবি পরিচিতি

১. সূফীমতের উদ্ভব

সূফীমতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিদ্বানেরা নানা মত পোষণ করেন। Von Kremer ও Dozy-এর মতে বেদান্ত প্রভাবেই ইরানে সূফীমতের উন্মেষ হয়। Merx ও Nicholson -এর ধারণা নিউপ্ল্যাটোনিজম থেকেই এর উদ্ভব। E. B. Browne মনে করতেন, বাস্তববাদী শামীয় (Semitic) আরবধর্ম ইরানের ভাবপ্রবণ আর্য মনে যে প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছিল, তা-ই সূফীতত্ত্বে রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু মানব মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এত ঋজুভাবে ঘটে না। কাজেই কোনো এক সরল পথে কিংবা কোনো এক মতবাদের প্রভাবে অথবা প্রতিক্রিয়ায় সূফীমত গড়ে উঠেছে বলা যাবে না।

ভাববাদী কৌতূহলী ইরানীমানসে জোরাস্টার, মানী, মজদক, বাইবেল, কোরআন প্রভৃতির বিচিত্র মতবাদ ও তত্ত্ব যেসব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাতে এক দিকে আশারীয়, মোতাজেলা প্রভৃতি মত দেখা দিয়েছে যেমন, অপরদিকে তেমনি নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে ইমাম আবু হানিফাদির নেতৃত্বে কোরআন-হাদিসানুগ ধর্মানুশীলনে। এর পটভূমিকায় ছিল রাজনৈতিক বিপ্লব। ইরানে স্বাধীন তাহেরী (৮২০ খ্রী.), সফাবী (৮৬৮ খ্রী.) সাসানী (৮৭৪ খ্রী.) বংশীয়দের প্রতিপত্তিরও কমবেশী প্রভাব রয়েছে। তবু বলতে হবে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ইরানে ভাববিপ্লব ত্বরান্বিত করেছে। এবং একত্বপ্রবণ ইরানী মনের উদারতার ছিদ্রপথে মুসলিম ইরানীমনে সর্বেশ্বরবাদও প্রবেশ করেছিল। সূফীধর্ম হচ্ছে প্রেমবাদ। সে-প্রেম আল্লাহ্-প্রেম। সাধ্য আল্লাহ্ বটে, কিন্তু এর মানবিকতাই প্রেমসাধনার প্রথম পাঠ। সৃষ্টিপ্রেমেই স্রষ্টার প্রেমের বিকাশ। মরণনদীর এপারে ওপারে ব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই এ সাধনার সিদ্ধি। তাই সূফী বলেন, 'আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রীতি দান কর আর পরের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ কর। মানুষের হৃদয় জয় করাই সব চেয়ে বড় হজ। একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও বেশী; কেননা কাবা আজর-পুত্র ইব্রাহীমের তৈরি একটি ঘর মাত্র, আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহ্র আবাস'। সূফীদের ভাববাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলে বৌদ্ধ নির্বাণবাদও ফানাতত্ত্বের উন্মেষে সহায়ক হয়েছে, সে-সঙ্গে গুরুবাদও।'[১]

তাত্ত্বিক মরমীয়া হলেও সূফীরা ইসলামকে ভোলেনি, কোরআনের সমর্থনকেই সম্বল করে জীবন ধর্মকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। এতে দ্বৈত অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতি সম্ভব করে নিয়েছে এবং তাতে আবার দোহাই কেড়েছে কোরআনের। ভোগ-পরিমিতিবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদ প্রশ্রয় পেয়েছে সূফীতত্ত্বে।

মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস রসুল ব্যক্তিগত জীবনে তাত্ত্বিক তথা মরমিয়াও ছিলেন। এবং তাঁর প্রিয় সহচর আলিকে ও আবুবকরকে এই তত্ত্বে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। কোরআনের এক আয়াতে আছে, "যেহেতু আমরা তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে ওহী পাঠ করেন, তোমাদের দোষমুক্ত করেন, তোমাদেরকে 'কিতাবের' শিক্ষা ও প্রজ্ঞা [wisdom] দান করেন, এবং যা তোমরা আগে জানতে না, তাই জানিয়ে দেন।"[২]

---

১. Development of Metaphysics in Persia : Sir Muhammad Iqbal, P. 83
২. সূরাহ-২, আয়াত ১৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রজ্ঞাকে সূফীরা কোরআন-উক্ত ব্যবহার-বিধি বহির্ভূত 'অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান' বলে ব্যাখ্যা করেন।

আর একটি আয়াতে আছে, "এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে এবং তোমার নিজের মধ্যে তুমি কি তা দেখ না।[১] আবার আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের রগ বা শিরার চেয়ে নিকটতর।[২] আল্লাহ্ পৃথিবীর ও আকাশের জ্যোতি স্বরূপ।[৩] উটের দিকে তাকিয়ে দেখ কি কৌশলে তা' সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের মহিমা দেখ, পর্বতগুলো কেমন দৃঢ় করে স্থাপন করেছেন।[৪] বল তা' হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ বা শক্তি।"[৫]

কোরআনের এসব আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেই সূফীবাদের ইসলামীরূপ প্রতিষ্ঠিত। আবার জ্যোতিঃতত্ত্বে মানী মজদকী দর্শনের এবং আত্মতত্ত্বে সর্বেশ্বরবাদের এবং সৃষ্টির মহিমা বৈচিত্র্যতত্ত্বে ভাববাদের আশ্রয়ও মিলেছে।

O' Leary -র মতে[৬] Plotinus - এর Enneads, St. Paul-এর শিষ্য Dionysius ও Psendo Dionysius মতের ' On Mystical Theology' এবং ' On the names of God' প্রভৃতি খ্রীস্টীয় মরমীয়াবাদের উৎস ছিল। Stephen Bar/Sudaili alias Hirothens নামে এক সিরীয় Monk-এর [খ্রী. ৫ম শতক] রচনাও সূফীমতবাদের উদ্ভবে পরোক্ষ সহায়তা করেছে।"

Akhlaq-i-Jalali থেকে Browne[৭] সূফী আবু সায়ীদ বিন আবুল খায়ের (মৃত্যু ৪৪১ হিঃ ১০৪৯ খ্রী.) ও ইবনে সিনার আলাপ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দার্শনিকের তাত্ত্বিকের অভিন্ন লক্ষ্যের আভাস মেলে, ইবনে সিনা বলেছেন, What I know he sees, সায়ীদ মন্তব্য করেছেন, 'What I see he knows.'

সূফীমতের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন মিসরীয় কিংবা নুবীয় [Nubian] লেখক জুননুন (মৃত্যু ২৪৫-৪৬ হিঃ)। তিনি ছিলেন মালিক বিন আনাসের শিষ্য। জুননুনের রচনাবলী সুসংকলিত সুসম্পাদিত করেন জুনাইদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হিঃ)। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে O'Leary বলেছেন, " in it appears essential doctrine of sufism, as of all Mysticism, the teaching of tawhid, the final union of the soul with god, a doctrine which is expressed in a way closely resembling the neo-platonic teaching , save that in sufism the means whereby this Union is to be attained is not by the exercise of the intuitive faculty of reason but by the piety and devotion.[৪]

সূফী মতবাদ সর্বেশ্বরবাদের রূপ নেয় ইরানের সূফীদের মানসেই।[৯] জুনাইদের পরে তাঁর শিষ্য খোরাসানের আস্‌শিবলীর [মৃত্যু ৩০৯ হিঃ] প্রচারণায় প্রসার লাভ করে এই মত।[১০] সর্বেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী সূফীদের মধ্যে হোসেন বিন মনসুর হাল্লাজ [মৃত্যু : ৩০৯ হিঃ,]

---

১ সুরাহ-৫১, আয়াত ২০-২১
২ সুরাহ-৫০, আয়াত ১৫
৩ সুরাহ-২৪, আয়াত ৩৫
৪ সুরাহ-৮৮, আয়াত ২০
৫ সুরাহ-১৭, আয়াত ৮৭
৬ Arabic Thought in History pp 188-89
৭ ক. Literary History of Persia/Vol. I. P. 26
খ. Arabic Thought in History p. 189
৮ ibid– Pp. 172-93.
৯ Arabic Thought in History p. 192
১০ Ibid p. 192

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়জীদ বিস্তামী [ওর্ফে আবু এযীদ, মৃত্যু : ২৬০ হিঃ] প্রভৃতি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। এঁদের মতের সঙ্গে ঐক্য আছে বৈদান্তিক ধারণার। তবে বৌদ্ধ নির্বাণ ও ফানা [আত্মসমর্পণ, এবং-চেতনার বিলয়] অভিন্ন নয়। নির্বাণ বিলয় বা শূন্যতা জ্ঞাপক আর ফানা অখণ্ডে মিলন সূচক [বাকা অখণ্ডে অভিন্ন হয়ে মিয়ে যওয়া—অদ্বয় অবস্থা]।

এঁরা হুলুল-এ বিশ্বাসী, অর্থাৎ জীবাত্মা যে পরমাত্মারই অংশ তা' এদের বিশ্বাসের অঙ্গ। এ বিশ্বাস মূলত বৈদান্তিক। তবু আত্মা-পরমাত্মা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে নব প্ল্যাটোনিক মতেরই প্রভাব বেশি।[১] যিকর সূফীদের অবশ্য আচরণীয় চর্যা। এটিতে কোরআনেরও সমর্থন মেলে—আল্লাহ্‌কে ঘন ঘন স্মরণ কর।[২]

প্রচলিত বিভিন্ন শাখার সূফীমতগুলো ভিন্ন ধরনের। ইসলামের মৌল অঙ্গীকারের সঙ্গে পার্থক্য কম নয় এগুলোর। এ না হয়ে পারেনি। কেননা সূফীমত একটি মিশ্র দর্শনের সন্তান। তা আবার একক মত থাকেনি।

তাই আজকের দিনে সূফীমত বলতে মত-সমষ্টিই বোঝায়। ইসলামের উদ্ভবের প্রায় দেড়শ বছর পর থেকে সন্তর্পণে অঙ্কুরিত হতে থাকে এ মত। কুফার আবু হাশিমই (মৃত্যু : ১৬২ হিঃ) প্রথম সূফী বলে পরিচিত। তিনি হুজুইরীর সংজ্ঞানুগ সূফী। অর্থাৎ ত্যাগ, আনুগত্য, ধৈর্য, বাক্‌সংযম, আত্মপীড়ন, ভোগবিমুখতা, ভেক, দারিদ্র্য—এ অষ্ট গুণসম্পন্ন সূফী।[৩] আসলে ইব্রাহীম আদহম (মৃত্যু : ১৬২ হিঃ), ফজিল আয়াজ (মৃত্যু : ১৮৮ হিঃ) মারুফ কর্খী, দাউদ তায়ী (মৃত্যু: ১৬৫ হিঃ), হাসান বসোরী প্রমুখের সাধনা ও বাণী থেকেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে সূফীমত।[৪]

ভারতে বিভিন্ন সূফীমতের ওপর স্থানিক প্রভাব পড়েছে প্রচুর। নক্‌শবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সব চেয়ে বেশি। তারা স্বীকার করে কুণ্ডলিনীশক্তি। ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড় রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই নক্‌শবন্দিয়ার সাধনার লক্ষ্য। এটি শিব-শক্তি মিলন জাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত। তেরো শতক থেকেই ভারতীয় যোগ বেদান্তের প্রভাব পড়তে থাকে সূফীদের উপর। ভোজবর্মণ রচিত অমৃতকুণ্ডের সঙ্গে বিশ্বের সূফীদের পরিচয় গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল তেরো শতকেই, প্রভাবও ছিল নিবিড়।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষে ক. চিশতিয়া, খ. কাদেরিয়া, গ. সোহরাওয়ার্দীয়া ঘ. নকশবন্দিয়া—এই চারটি মতবাদই প্রধান। অন্যগুলো এ চারটির উপমত মাত্র।[৫]

সুতরাং শাত্তারিয়া, মাদারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটির যে কোনো একটির উপমত।[৬]

১. অদ্বৈতবাদ, ২. সর্বেশ্বরবাদ, ৩. দেহতত্ত্ব [কুণ্ডলিনীশক্তি], ৪. বৈরাগ্য, ৫ ফানাতত্ত্ব, ৬. সেবাধর্ম ও মানবপ্রীতি, ৭. গুরু বা পীরবাদ, ৮. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ, ৯. ইনসানুল কামেল তথা

---

১ ibid p.p. 194-95, 20

২ সূরাহ-৩৩, আয়াত ৪১।

৩ Kashf-al Mahjub : Usman Huzori, Trans : R. A. Nicholson, Chapter III, p. 40

৪ Arabic Thought in History pp 184-85

৫ ক. Sufism, its saints and shrines [Luknow, 1938] J. A. Sobhan p 174
খ. Mohammadanism : H. A. R. Gibb (1953) Chapter VII & IX,

৬ Tasawwuf-I-Islam : Abdul Majid (Azamgarh) p. 45

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধপুরুষবাদ, ১০. স্রষ্টার লীলাময়তা প্রভৃতি ধারণার বীজ বা প্রকাশ ছিল আরব-ইরানের সূফীতত্ত্বে। নিও-প্ল্যাটোনিক মানী, মজদকী, খ্রীস্টীয়, ইহুদী, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ তত্ত্বের মিশ্রণে এসব তত্ত্বের উদ্ভব।

ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রবল হতে থাকে সূফীতত্ত্বে। এখানে সূফীমতে স্থানিক প্রভাব লক্ষণীয়। ইসলাম সূফীমতের প্রভাবে ভারতে দেখা দেয় চিন্তা-বিপ্লব। দক্ষিণ ভারতের মায়াবাদ-ভক্তিবাদ-অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম, বাঙলার নববৈষ্ণববাদ বা প্রেমবাদ এরই প্রসূন।

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিলেন ইরানী সূফীরা। সূফীসাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা শুরু করেন নতুন সূফীচর্যা। ভারতবর্ষে মুসলিম অধ্যাত্মসাধনা যোগ-দেহতত্ত্ব বিহীন নয় এ কারণেই। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব অন্য অধ্যায়ে। অতএব সঙ্গীত, যোগ, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালি মুসলমানের অধ্যাত্ম তথা মরমীয়া সাধনার ভিত্তি।

ভারতীয় যোগ-চর্যাভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেওয়ার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়, নামত। কেননা আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত রইল এর ইসলামি রূপায়ণ। যেমন নির্বাণ হল ফানা কুণ্ডলিনীশক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা।

হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এঁদের অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর হয়ে ওঠে আলোকময়—এ হচ্ছে এক জ্যোতির্ময় অদ্বয়সত্তা। এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় "সামরস্য" জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্ত অবস্থার।[১]

ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম জপের রূপ নিল সূফীর যিকর। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে [ইরানে, সমরকন্দে, বোখারায়, বলখে] ভারতিক বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ-গুরুবাদও [যোগ-তান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতি বশে] অপরিহার্য হয়ে ওঠে সূফীসাধনায়। সূফীমাত্রই পীর-মুর্শীদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই কবরপূজারও [দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর 'স্তূপ' পূজারই মতো হয়ে উঠল] রূপ পেল পরিণামে। আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন সূফীরা। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য যোগ্য হয় আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সাধনায়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশশেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম "ফানা ফিল্লাহ'। প্রথমটি 'রাবিতা' [গুরুসংযোগ] দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ্' [আল্লাহর ধ্যান]; এই 'মুরাকিবাহ'য় গৃহীত হয়েছে যৌগিক পদ্ধতি। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পীরের খানকা, বা আখড়ায় সামা [গান] হালকা [ভাবাবেগে নর্তন], দারা [আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর] হাল [মূর্ছা], সাকী, ইশক প্রভৃতি চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির আমল থেকেই। পরবর্তী কালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গৃহীত হয় এই রীতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় রয়েছে এরই অনুসৃতি।[২]

---

১. Development of Metaphysics in Persia -Sir, M. Iqbal, pp. 110-11

২. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ১৬৯-৮২।
খ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য, ভূমিকা —আহমদ শরীফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. সূফীর দেহতত্ত্ব, মোকাম মঞ্জিল, হাল ও দর্শনের দেশী অবয়ব

বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাঙালি সূফীর যৌগিক কায়া-সাধনের উদ্ভব। বাঙালি সূফীরা দুইকূল রক্ষার প্রয়াসে দেহতত্ত্বের ও সাধনচর্যার অসমন্বিত মিলন ঘটিয়েছেন। ফলে মোকাম, মঞ্জিল, হাল, সূফীতত্ত্ব প্রভৃতি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তার চিন্তায়। বাংলাদেশের বাইরে কলন্দর ও কবীরই প্রথম সমন্বয়কারী। তাঁদের শিষ্য উপশিষ্যর হাতে বাংলায়ও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অধ্যাত্ম সাধনা শুরু হয়। এ প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. বৌদ্ধ চতুষ্কায়ের আদলে তন লতিফা, তন কসিফু, তন ফানি এবং তন বাকাউ কল্পিত।

খ. আবার চার 'দীল'-ও পরিকল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী [বক্ষের দক্ষিণাংশ], দীল মনুবরী [বক্ষের বামাংশ], দীল মুজাওয়ারী [মস্তকে], দীল নিলুফারী [উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে]। এটিও বৌদ্ধ চার তত্ত্বের– আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি। আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির—এই চার রুহও হয়েছে কল্পিত। [তালিবনামা]

গ. হিন্দুর ষটচক্র বা ষড়পদ্মও স্বীকৃত। বিশেষ করে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রের বহুল প্রয়োগ সর্বত্র সুলভ।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরাশিবশক্তিকে এঁরা অভিহিত করেছেন জ্যোতি [লতিফা] নামে।

ঙ. আবার ষড়পদ্মের আদলে ষড় 'লতিফা'-ও কল্পনা করা হয়েছে : কল্‌ব [হৃদয়, রুহ, আত্মা,] সির [গুপ্তহৃদয়], খাফি [গুপ্ত আত্মা] কসফ [বিবেকী আত্মা] ও নফস [দুষ্প্রবৃত্তি]। এগুলো বিশেষ করে নক্‌শবন্দিয়া খান্দানের পরিকল্পিত।

গুনানুসারে রুহও চার প্রকার –ক. মাতকি, খ. সামি, গ. জিসিমি, ঘ. নাসি।

চ. ইড়া [গঙ্গা], পিঙ্গলা [যমুনা] ও সুষুম্না [সরস্বতী] নাড়ী এবং প্রাণ-অপান-বায়ুর [দমের] নিয়ন্ত্রণ ও উল্টাসাধনা এদের লক্ষ্য।

ছ. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধদেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, তারার মতো কিংবা হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা ব্রহ্মা—ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চতুর্দ্বারের জন্যে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজ্রাইল এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত।

জ. হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্র, সঙ্গীতাদি প্রায় সব শাস্ত্র ও তত্ত্ব যেমন শিবপ্রোক্ত বলে বর্ণিত, তেমনি মুসলমানের কাছে রসুলের পরেই আলির স্থান এবং সব ইসলামী গূহ্যতত্ত্বই আলিপ্রোক্ত।

ঝ. শরীয়ত-নাসুত, তরিকত-মলকূত, হকিকত-জবরুত, মারফত-লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তত্ত্ব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে। এবং অদ্বৈততত্ত্ব তথা সর্বেশ্বরবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত। আর বাকাবিল্লাহ লক্ষ্যে সাধনাও দুর্লক্ষ্য নয়। 'হমহ্-উস্ত' [সবই আল্লাহ্] বিশ্বাসে এবং 'হাহুত' [পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম-অবস্থা] লক্ষ্যের সাধনায় বৌদ্ধনির্বাণবাদের এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয়।

ট. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ প্রভৃতিও হয়েছে সূফীদের যিকরের অপরিহার্য অঙ্গ। রেচক, পূরক ও কুম্ভক সূফীদের দম নিয়ন্ত্রণ চর্যার অঙ্গ।

ঠ. 'পীরবাদ' চালু হয়েছিল বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রভাবেই। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে সূফীসাধনায় পীরের উপর অপরিমেয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধ্যাত্ম-সাধনা মাত্রই গুরুনির্ভর। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা–[গুরু সংযোগ] মুরাকিবাহ [আল্লাহর ধ্যান] তথা 'ফানাফিশ্‌শেখ' ও ফানাফিল্লাহ পরিকল্পিত।

ঢ. আল্লাহকে বৌদ্ধ শূন্যের সঙ্গে অভিন্ন করেও ভেবেছেন কোনো কোনো সূফী সম্প্রদায় :

দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেতে পরম হংস শূন্যে ব্রহ্ম জ্ঞান
যথাতে পরমহংস তথা যোগ ধ্যান। [জ্ঞান-প্রদীপ]

ণ. পরকীয়া প্রেমসাধনা তথা বামাচারী যোগসাধনাও কারো কারো স্বীকৃতি পেয়েছে :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেম রস
পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস [জ্ঞান-সাগর]

৩. ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টির পত্তন, তা সব বাঙালি সূফীই মেনে নিয়েছেন।

মুসলিম বিজয়ের পরে ভারতিক সূফীমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এককথায় অধ্যাত্ম-সাধনার তথা মরমীয়াবাদের ভিত্তিই হল যোগপদ্ধতি। বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী হিন্দু শৈব, শাক্ত মুসলিম সূফী ও হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মধ্যে আজ তা অবিরল। বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, গোর্খসংহিতায়, যোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে মাধবের ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেবের লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গোবিন্দ-দাসের কালিকামঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপবর্ণনে আর যোগচিন্তামণি, বাউল গান প্রভৃতি সব গ্রন্থে ও রচনায় যোগ ও যোগীর কথা পাই।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, শেখ জাহিদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকিম, শেখচাঁদ, যোগকলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলি রজা, শুকুর মাহমুদ, রমজান আলী, রহিমুদ্দিন মুনশী প্রভৃতিকে যোগ পদ্ধতির মহিমা কীর্তনে মুখর দেখি।

'প্রাণসঙ্কলি'নামে সৃষ্টিপত্তন এবং মানবজন্মরহস্য রয়েছে শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজা বিধানে, যোগীর গানে, যোগীর কাচে, ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিতে।[১] মুসলিম রচিত গোরক্ষবিজয় আগম মোকামমঞ্জিল আদ্য-পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রাণসঙ্কলি দেখি। এটি যোগগ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ।

শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়েও বর্ণিত হয়েছে এমনি গর্ভরহস্য। ধর্মঠাকুর পন্থীদের [অনাদ্য ধর্মের আদ্য অনাদ্য গুরু] প্রভাবও পড়েছে এ গ্রন্থে।

৩. কবি পরিচিতি

১. সৈয়দ সুলতান

আজ অবধি আমরা প্রায় বিশটি সূফীশাস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। যথা-ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, অজ্ঞাতনামা লেখকের যোগকলন্দর, মীর সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ-জ্ঞানচৌতিশা, হাজী মুহম্মদের নুরজামাল, মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা, শেখচান্দের হর-গৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা, আবদুল হাকিমের চারি মোকামভেদ ও সিহাবুদ্দীন পীরনামা, আলি রজার

১. গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পৃঃ জ-ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগম-জ্ঞানসাগর, বালক ফকিরের জ্ঞানচৌতিশা, নেয়াজের যোগকলন্দর, মোহাসেন আলীর মোকাম-মঞ্জিল কথা, শেখ মনসুরের সির্নামা, শেখ জাহিদের আদ্যপরিচয়, শেখ জেবুর আগম, মুকুল রচিত শাহজালাল মধুমালা, রমজান আলীর আদ্যব্যক্ত, রহিমুল্লাহর তনতেলাওত, সিহাজুল্লাহর যুগীকাচ।

পীর মীর সৈয়দ সুলতান ষোল শতকের প্রখ্যাত কবি, পীর, তাত্ত্বিক ও কবিগুরু। পনেরো-বিশজন পরবর্তী কবি তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রণাম জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শেখ পরাণ, হাজী মুহম্মদ, মুত্তালিব, ফতে খান, মুকুল ওর্ফে মঙ্গল মুহম্মদ মুকিম, মুহম্মদ আলী, নাসিরউদ্দিন, শেখ মনোহর, আব্দুল করিম খোন্দকার, মীর মুহম্মদ সফী, শরীফ শাহ, মুজাফফর, শেররাজ, চুহর প্রভৃতি। প্রত্যক্ষভাবে এঁর অধ্যাত্ম কাব্যশিষ্য ছিলেন কবি মুহম্মদ খান, পৌত্র ছিলেন মীর মুহম্মদ সফী ও শরীফ শাহ এবং দৌহিত্র ছিলেন মুজাফফর। সৈয়দ সুলতানের নিবাস ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালায়। তার রচিত পদাবলী, নবীবংশ ও জ্ঞানপ্রদীপ আমরা পেয়েছি। নবীবংশে আদম থেকে হযরত মুহম্মদের ওফাত অবধি বর্ণিত হয়েছে। এটিই তাঁর প্রধান রচনা। তিনিও সূফী ছিলেন। তাঁর পীরের নাম সৈয়দ হাসান। 'জ্ঞান প্রদীপ' তাঁর সূফীচর্যা গ্রন্থ। 'জ্ঞানচৌতিশা' এরই অংশ বা সংক্ষিপ্ত সার। সৈয়দ সুলতান 'গ্রহশত রস যোগে বা যুগে' তাঁর নবীবংশ রচনা শুরু করেন। এটি হিজরী সন বলে অনুমিত। অতএব [৯৯২-৯৪ হিঃ]১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনার শুরু

সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপে' আলোচিত বিষয় এই :

প্রথমে জানিব যত দরূদ বিচার
দ্বিতীয় জানিব যত এবাদত খোদার।
তৃতীয় জানিব সর্ব তনের বিচার
চতুর্থে জানিব সেই তত্ত্ব আপনার।
পঞ্চম প্রকারে কহে দীনের বিচার
ষষ্ঠ যে প্রকারে কহে জিকির হুঙ্কার।
সপ্তম প্রকারে বুঝে পঞ্চ যথা রহে
অষ্টম প্রকারে কর আত্তমা পরিচয়।
নবমে জানিব ব্রহ্মতত্ত্ব কহি যারে
দশমেত কার্য করিবেক যে প্রকারে।

হর-গৌরীর পরিবর্তে হযরত আলির ও নবী মুহম্মদের প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে সব তত্ত্ব বর্ণিত।

শূন্যতত্ত্ব : দেখিতে না পারি যারে তারে বুলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।... ইত্যাদি

এর সঙ্গে শেখ চান্দের তালিবনামার, আলি রজার জ্ঞানসাগরের ও ফয়জুল্লাহর গোরক্ষ-বিজয়ের শূন্যতত্ত্ব তুলনীয়।

দেহের প্রতীকী পরিচয় :

শরীরের মধ্যে জান চার চন্দ্র হএ
আদি নিজ গরল উন্মত্ত নিশ্চএ।
শরীরের মধ্যেতে অপূর্ব তিন পুরী
শ্রীহাট, কামরূপ, আর কনকপুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈসে
কামরূপ গর্ভে তালুত শ্রীহাট প্রকাশে।
অজুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদএ
স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যে বরিষা নিশ্চএ।
অনাহত চক্রেত শরৎ বৈসএ
বিশুদ্ধ চক্রেত শিশির প্রকাশএ
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋতু বৈসে
আজ্ঞা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।

যোগতত্ত্ব : সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী।
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষি।
উরু হন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
চক্ষু হোন্তে ভুরু মধ্যে অর্ধ আঙ্গুল।
এহি স্থানে জানি যোগের আদি মূল
নাভি স্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবারাত্রি নীর বিন্দু বহে।
তালু মূলে ধেয়াইব পূর্ণসম ইন্দু
নাসিকাত ধেয়াইব দেখিবা প্রাণবন্ধু।

মুদ্রা : এখানে কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ
প্রথমে কহিএ শুন মুদ্রা খেচরী
সর্বসিদ্ধ হএ যে রোগ পরিহরি।
সাপে খাইলে তরে সে নাহি বাহে
নিদ্রাতে না টলে বিন্দু কামিনী পাশএ।
তালুমূলে সুষুম্নার পন্থের সন্ধান
জিহ্বা তুলি দিব সেই বন্দের বন্দান
তুলি দিলে জিহ্বা এ অমৃত লাগ পাএ।
সে অমৃতপানে যে অজর হএ কাএ।

মহামুদ্রা : প্রথমে বুক 'পরে চিবুক পড়িব
গুহ্যদ্বারে বামপদ দড় করি দিব।
দক্ষিণ পাও তুলি দুই হাতেত ধরিব
পিঙ্গলাএ পূরি বাউ কোষেত ভরিব।
ডড়যথা শক্তি কুম্ভকেত পিঙ্গলা রেচিব
কুম্ভকে পিঙ্গলাএ সমান করিব।
ইঙ্গলা-পিঙ্গলা যদি সমন্বয় হএ
তবে সেই মুদ্রা যেন এড়িতে জুয়াএ।

হিন্দুর অদ্বৈতবাদ, তন্ত্রের কাম-প্রেম প্রভৃতি এসূত্রে স্মর্তব্য।
ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার।...
জলকুণ্ড কুম্ভজল একহি মিলন। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চয় সে রূপ বৈসে সভার অন্তর।
ঢেউ-জল জল-ঢেউ নহে ভিন্নাকার
তেলএ বারিত যেন বৈসে হুতাশন
তনু মধ্যে তেন মতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্র দলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।
থাবর জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দিশিনিশি রবিশশী নাহি স্থান স্থিত...
দিশিনিশি আপেত আপনা লক্ষণ ...
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন।

শুক্রই ব্রহ্ম, শুক্রই হেব্রজ প্রভৃতি তত্ত্বে প্রতিধ্বনি রয়েছে এই চরণে।

লখন অলখ লখ লই তার নাম
লীন হই সর্বত্রে আছএ সর্বঠাম।...
বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।

সহস্রার : সহস্র দলেত গুরু শতদলে বিধ
ষটচক্র ভেদিয়া তাতে কৃষ্ণই উদ্দেশ।
সহস্র দলেত রঙ্গি দেখি সর্বময়
সূর্যের দৃষ্টেত যেন চন্দ্রের উদয়।

গুরু সাধন : শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হেরে তিন
শক্তিবিন্দু ইচ্ছা বাক্য গুরুর অধীন।

বায়ু : সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দধিয়া।

শিব শক্তি : শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।

আজ্ঞি [পরমাত্মা] - আজ্ঞিরূপে ত্রিখণ্ড বিদিত নিরঞ্জন। [তুল : ওঁ]

২. শেখ চাঁদ

কবি শেখচাঁদের পিতার নাম ফতে মুহম্মদ। আর পীরের নাম ছিল শাহদৌলা। কুমিল্লা জেলার পাটিকের পরগনায়, কদবা পরগনায় ও হুড়ুয়া গাঁয়ে পীরের সান্নিধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা জেলার লালমাই রেল স্টেশনের ৮/১০ মাইল দূরবর্তী বাকসার গাঁয়ে কবির সমাধি রয়েছে।

তিনি 'রসুলবিজয়' নামে এক বিপুল গ্রন্থের রচয়িতা। এত বড় গ্রন্থ বাংলাদেশে আজ অবধি রচিত হয়নি। এই গ্রন্থেরই শেষ পর্ব 'কেয়ামত নামা'য় দুটো তারিখ মিলেছে :

ক. এক সও বাইস পুস্তক রেচান
সাহাচান্দ ফকিরে বোলে সোন গুণিরগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. মুরশিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হিন চান্দ
এগারস বাইশ সন রচিল প্রবন্ধ।[১]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রকৃত পাঠ 'এক সহস্র বাইশ সন' ধরে নিয়ে ১০২২ ত্রিপুরাব্দ তথা (১০২২ + ৫৯০) ১৬১২ খ্রীস্টাব্দেই রচনাকাল বলে স্থির করেছেন।[২] আর ১১২২ ত্রিপুরা সন ধরলে রচনাকাল দাঁড়ায় ১৭২২ খ্রীস্টাব্দ।

শেখ চান্দের 'হর-গৌরীসম্বাদে'র ও 'তালিবনামার' বিষয়বস্তু অভিন্ন। পার্থক্য কেবল এই, হর-গৌরীসম্বাদে উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব জগৎসৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব তথা মহাজ্ঞান কথা বলেছেন, আর 'তালিবনামা'য় ঐ কথাগুলোই শেখ চান্দের জিজ্ঞাসার জবাবে পীর শাহদৌলা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কয়েকটা মুসলিম পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন।

শেখ চান্দ 'হর-গৌরীসম্বাদে' প্রথমে সৃষ্টিঅধিকারীকে প্রণাম করে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর—এই তিন আদিদেব ও ইন্দ্র-যম-বরুণ-কুবের হুতাশনাদি ত্রিশকোটি দেবতাকে প্রণামে জানিয়েছেন, তারপরে চন্দ্র, সূর্য অষ্টলোকপাল, দেবর্ষি, নরঋষি, সিদ্ধা, ব্যাস, বৃহস্পতি, মহামায়া, জাহ্নবী, যমুনা প্রভৃতির বন্দনা করেছেন।

দেহ পরিচয় : লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বামে স্থিতি
কণ্ঠেত সুষুম্না নাড়ী ভবানী মুরতি।
বাসত্তর কোঠা তাতে নাভি দেশে ঠায়
অষ্টকলে কণ্ঠ দেশে বাজে নিজ নাম।

তারপর রগ, যোগ, আসন, বায়ু, গুরু, চন্দ্র, মূল, সঙ্গম প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে।

গুরু পরিচয় : তনের গুরু মন মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নির্গুণ।
ধ্যানের গুরু সাধন, সাধনের গুরু ধর্ম।

এ সব কথা 'মহেশ গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে।'
শূন্যরূপ নিরঞ্জন বান্দার জীবন
শূন্যগুণে পালে প্রভু এতিন ভুবন।
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জল
মণিতে বসর্তি নূর জগতে উঝল।

উল্টা সাধনা : উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা।"

তারপরে দেহতত্ত্ব পাকপাঞ্জাতন, রগ, চার রুহ [হারিস, মারিস, মুকিম, মুসাফির], চার চিজ চার ঋতু, চার মোকাম ও চার ফিরিস্তাপ্রহরী, জীবদেহে পিতামাতা ও আল্লাহ প্রদত্ত আঠারো উপাদান, চার তন, [লতিফু, কসিফু, ফানাউ, বকাউ] চার কুতুব [সীমান্ত চিহ্ন], মনোগতি, চন্দ্র, সঙ্গম, আজ্ঞি নির্দেশ, বিষূ, সপ্তাহ, তালি, দম, মঞ্জিল, দৃষ্টি, নাড়ী বায়ু, ঋতু, সঙ্গম, মরণ লক্ষণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

শুক্র রহস্য : চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত-পুরুষ পরাণপুরে বাস।

---

১. ক ও খ-অধ্যাপক আলী আহমদ ও অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া প্রাপ্ত পাঠ।
২. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ: ২৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্য তত্ত্ব : অষ্টকলে তালি দিয়া রহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে অষ্টকলে সাজে।
অষ্টগণ করি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু, শূন্যে বায়ু, শূন্যে মোর মন
আকল ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জীউ, শূন্যে পিউ, শূন্যে সব জিন্দা।

কবি বলেন, সাধনার দ্বারা "কায়াসিদ্ধি হৈলে তবে তরিবা যে ভবে।"

৩. যোগকলন্দর

জনপ্রিয় 'যোগকলন্দর' গ্রন্থটি অজ্ঞাতনামা কবির। এটিই সম্ভবত আদি সূফীশাস্ত্র গ্রন্থ। লোকসাহিত্যের মতো এটিও গণরচনা অর্থাৎ-আদিতে হয়তো কোনো ব্যক্তিবিশেষ একটি পদবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা লোকশ্রুতিতে রক্ষিত হয়ে পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মূলাধার হচ্ছে তিন তিহরী [তিন মাথাবিশিষ্ট উনুন, মেরুদণ্ড ও নিতম্বের হাড়ের সন্ধিস্থলকে তিন তিহরী বলে]। আল্লাইল তার প্রহরী।

নাসুত মোকাম : অরুণ উদিত জান সেই মূলাধার
জীবাত্তমা স্বামী হেন জানিহ তাহার।...
অধর কমল তথা গৃহস্বামী বৈসে
অনুদিন আনল জ্বালিও সেই দেশে।...
শরীর অমর হএ সে আনল হোন্তে
সাবধানে থাকিবা না নিবে যেন মতে।...
পশুএ লাদিলে যেন টিপ দিয়া তোলে
তেনমত টিপ জান দিব গুহ্যমূলে।
কামার শালেত যেন আনল জ্বালন
তেনমত টিপ তথা দিব ঘন ঘন।

এভাবে– ঘট মধ্যে চিনে লও প্রভু নিরঞ্জন।

প্রথমে দেহের সাধন-মূলাধার থেকে শক্তির (অনলের) উর্ধ্বায়ন ও লতিফা তথা জ্যোতির উন্মেষ সাধন। দ্বিতীয় স্তরে মণিপুরে তথা নাভিদেশে বায়ুর নিয়ন্ত্রণ নাসিকা লক্ষ্যে ধ্যান। এই স্তরে আত্মার দর্শন ঘটে। তৃতীয় স্তরে, কলিজাস্থিত অমৃতরূপ জলকুণ্ডে শশী দর্শন। এখানে আত্মা নূর মুহম্মদের মিলন। নূর-মুহম্মদ পরমাত্মার প্রতীক। চতুর্থ স্তরে দেহস্থ সহস্রদল পদ্মের উপরে জ্যোতির্ময় আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এভাবে ঘটের মধ্যে [দেহের মধ্যে] চিনে নিতে হয় 'প্রভুনিরঞ্জনকে'।

আসনে বসে ধ্যান করলে ক্রমে মাণিক্যবর্ণ, গোশৃঙ্গে শস্য, মুক্তার কণা, লাল-জরদ-ছেহা-সফেদবর্ণ, পুরুষমূর্তি, লাল রঙের মধ্যে ছেহাবর্ণ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে এক সময়ে পরমজ্যোতি দর্শন সম্ভব হবে। তাতেই আসবে সিদ্ধি।

৪. হাজী মুহম্মদ

কবি হাজী মুহম্মদের কোনো আত্মপরিচিতি পাওয়া যায়নি। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য পরোক্ষ তথ্য রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতানের পৌত্র, শেখ মুত্তালিবের পীর সৈয়দ হাসানের পুত্র নুরনামা রচয়িতা পীর শাহ মুহম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন :

কহে মোহাম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার ঘর্মে সৃষ্টি উতপন।
পীর হাজী মোহাম্মদ শিরে বন্দী তান পদ
পাইতে সে নুরের দরশন।[১]

হাজী মুহম্মদকে সৈয়দ হাসানের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সৈয়দ সুলতানের বয়ঃকনিষ্ঠরূপে কল্পনা করলে তাঁর আবির্ভাব কাল ১৫৬৫-১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, ইনি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

তত্ত্বকথা বর্ণনায় হাজী মুহম্মদের মতো এমন নৈপুণ্য আর কেউ দেখাতে পারেননি। জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা প্রাঞ্জল ও সরস করে বলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল তাঁর। এ ব্যাপারে তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্যতা রাখেন। হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা' বাঙলার সূফীশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর সঙ্গে তুলিত হতে পারেন কেবল আলি রজা ও বিবর্তবিলাসের কবি।

কবি বলেন : পাপ থেকে দূরে থাকবার উপায় হচ্ছে শরীয়ত-দুর্গের আশ্রয় নেয়া। কিন্তু মানুষের এতেই চলে না। বৃহতের আকাঙ্ক্ষায়, মহত্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে তাকে। তার গন্তব্য সুদূরে, দুস্তর বাধা অতিক্রম করে তাকে পৌঁছতে হবে অভীষ্ট মঞ্জিলে। এ জন্যে তার চাই পটু দিশারী; কিন্তু শরীয়তের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। এটিই সব উন্নততর সাধনার ভিত্তি।

সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ত ভিতর।
শরীয়ত চাপনি খলিতা তরিকত
হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারফত।

এবার কবি সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দিয়েছেন। এতে দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্ব সহজ ও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে :

জাত সিফত ছিল গোপত ভাণ্ডার।
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন হইল জাহির।
জাত সিফতে সেই নুর অনুপাম
নুর মুহম্মদ তার রাখিলেন নাম।
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা
সেই নুর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা।
এক হোন্তে হইল দুই দুই হোন্তে সকল
"আল্লা হোন্তে বান্দা সব হৈছে পয়দাএ
এ থেকে সে বান্দা সব সুরত আল্লার।

মূলত সৃষ্টি স্রষ্টার অভিন্ন :

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হএ

১. পুথি পরিচিতি ; পৃঃ ৯৩-৯৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে হএ তিন জান তিনে এক হএ।
বীজবৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে।
কিন্তু তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ।
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়
তেন রূপে জানি যে বান্দা আর খোদায়।
দরিয়ার পানি যেন গোরকি উথলে
গোরকি দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে।
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
সেই সিন্ধু উথলিলে গোরকি নাম হএ।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে।
বান্দা হীন নামমাত্র আপন সকলে
গোরকি হেন নামমাত্র হএ সব জল।
কাজেই, তুহ্মি আহ্মিনামমাত্র সকল সেই সে
নানারূপে করে কেলি নানান যে বেশে।...
ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সর্বঠাম
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম।...
এবং, জলস্থল অন্তরীক্ষে যত চলাচল
আপনে করন্তি খেলা সৃজিয়া সকল।...
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।

৫. মীর মুহম্মদ শফী

মীর মুহম্মদ শফী বা শফীউদ্দিন সৈয়দ হাসানের পুত্র এবং সৈয়দ সুলতানের পৌত্র। সৈয়দ সুলতান পীরের নামানুসারেই পুত্রের নাম থুয়েছিলেন। শরীফ পিতা সৈয়দ হাসান ছিলেন কিফায়তুল মুসল্লিন [১৬৩৯ খ্রী.] রচক শেষ মুত্তালিবের পীর। আবার শফীর পীর ছিলেন হাজী মুহম্মদ। অতএব মীর মুহম্মদ শফী সতেরো শতকের প্রথমার্ধের কবি। সৈয়দ সুলতানের কেবল পীর পরিবারই নয়, কবি পরিবারও, সৈয়দ সুলতান, তাঁর পৌত্র শরীফ শাহ [লালমোতি সয়ফুলমুলুক রচয়িতা] ও মুহম্মদ শফী এবং দৌহিত্র মুজাফ্ফর [ইউনান দেশের পুথি লেখক] কবি ছিলেন।

কহে মীর শাহ শফী আমি দুঃখমতি
এহলোকে পরলোকে সেই নুর গতি।
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ।

এগ্রন্থের বক্তব্যের বিষয় এই :

কি রূপে হৈল নুর আল্লার দিদার।
কোন মতে হৈল স্বর্গ ক্ষিতি উতপন
কেমতে হৈল বোল জীবের সৃজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব আতস খাক বাত কোথা হোন্তে হৈল
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল।
চন্দ্র সূর্য কি রূপে হইল দুইজন
চারি ফিরিস্তা হৈল কেমতে সৃজন।
সবস্থানে স্থানমাত্র ঘর্ম উৎপন
কোন ঘর্মে কোন জীব হৈল সৃজন।

—এ সব প্রশ্নের জবাব আছে এ গ্রন্থে।

সৃষ্টিতত্ত্ব : নূরের সকল অঙ্গে-ঘর্ম নিকলিল
সে ঘর্মে উপজিল যথ কুদরুতি।

তারপর, চার চন্দ্র-আদি, নিজ, উন্মুক্ত ও গরল চন্দ্রের পরিচয় আছে। তারপর কুর্সি, হাওজ-ই-কওসর, আব-ই-জমজম, সপ্তনদী, খাক, বাত, আতস, বিশ্বকর্মা, মুনি, দেবতা, হুর, গন্ধর্ব, পরী, নহস, নসরানি, কীট-পতঙ্গ, তুবাবৃক্ষ [কল্পতরু], ভেহেস্ত, দোজখ প্রভৃতি সৃষ্ট হল।

৬. কাজী শেখ মনসুর

শেখ মনসুর সম্ভবত রোসাঙ্গ রাজ্যান্তর্গত রামুর [কক্সবাজার মহকুমাস্থ] কাজী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ঈসা।

রোসাঙ্গে আছিল আমি রামু কৈল বাস।
কহত মনসুর কাজী ঈসার তনয়।

পীর সম্বন্ধে কবি বলছেন :

সুলতান বংশের কাণ্ডি শাহ তাজুদ্দীন
ভাগ্যফলে হৈল আসি তাহার অধীন।

এই তাজুদ্দীন সম্ভবত কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতানের প্রপৌত্র। শেখ মনসুর তাঁর কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন :

যথ হইল মঘী সন লও পরিমাণি
এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গুণি।

অতএব তাঁর কাব্য ১০৬৫ মঘীসনে তথা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

গ্রন্থোৎপত্তি : বচন আরবি ভাষে সব শাস্ত্র মূল
বুঝিতে ফারসীভাষে কিতাব বহুল।
বাঙ্গালে না বুঝে সব ফারসী কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে পাএ তাপ।
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পারিএ যদি যাএ মনস্তাপ।
তেকাজে বাঙ্গালা ভাষে ফারসী বচন
পদবন্দী [পদবন্ধ] কবি কৈলুঁ পুস্তক গ্রথন।
'আছাফল' নাম এক কিতাবের বাণী
সব প্রচারিয়া দিলুঁ রাখি খানি খানি।

অতএব 'আসাফল' গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন কবি। কবি অন্যত্র বলেছেন :

আহারল মসা এক কিতাব উপাম
'ছিরি' বুলি রাখিলাম পুস্তকের নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব ফারসি গ্রন্থের নাম 'আহারল মসা' তথা 'আসরারুল মসা' বা বীর্যরহস্য। বাঙলা নাম 'ছিরি' তথা 'শ্রী' বা 'সির'। কিন্তু এটি যথার্থ অনুবাদ নয়। কবির স্বাধীন অনুসৃতির সাক্ষ্য সর্বত্র বিদ্যমান। দেশী যোগকেই তিনি আরবি-ফারসি পরিভাষায় মণ্ডিত করেছেন।

গ্রন্থে নয়টি অধ্যায় বা বাব বা ফয়সাল – দরবেশী, এবাদত, তন, রাবি, দীল, বাবি [বায়ু] ঋতু, রুহ ও শ্রীনিরঞ্জন।

মনুষ্যাত্মা নাতকি, পশ্বাত্মা সামি, উদ্ভিদাত্মা জিসিমি এবং শিলাত্মা নাসি নামে পরিচিত।

প্রথমেই 'দম' [শ্বাস-বায়ু] মাহাত্ম্য-বর্ণিত হয়েছে। 'দম' থেকেই সব কিছুর উদ্ভব :

ঈশ্বর পুরান [অনাদি] জান সেই এক দম
সে দমে তু হইয়াছে এ দুই আলম।

৬. আলি রজা [১৭৫৯-১৮৩৭]

আলি রজা ওর্ফে ওয়াহেদ কানুফকির ছিলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা এলাকার ওশখাইনগাঁবাসী। তাঁর পিতামহের নাম মুহম্মদ আকবর এবং পিতা মুহম্মদ শাহি। তাঁর পীরের নাম শাহ কিয়ামউদ্দীন। কবির দুই পুত্র এশাদুল্লাহ আর সরাফতউল্লাহ পদাবলী রচনা করেছেন। আলি রজা উনিশ শতকে সাঁইত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন। 'ফয়দুল মুকতদী' ও 'জ্ঞানচৌতিশা' প্রণেতা বালক ফকির এবং ফয়দুল মুকতদী, কালাকাম, মৃগাবতী, আইয়ুবনবীর কিস্‌সা প্রণেতা মুন্‌শী মুহম্মদ মুকিম ছিলেন তাঁর শিষ্য। আলি রজা সাধক, তাত্ত্বিক কবি ও পীর হিসাবে ছিলেন প্রখ্যাত। তাঁর বংশধরেরা বহুকাল পীরালি করেছেন। আলি রজা সঙ্গীতগ্রন্থ 'ধ্যানমালা', পদাবলী; সিরাজকুলুব এবং আগম ও জ্ঞানসাগর [একই গ্রন্থের দুই পর্ব] রচনা করে অমর হয়েছেন। তাত্ত্বিক হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও হাজী মুহম্মদের সঙ্গেই তাঁর আসন।

নৈরাকার মগ্ন হৈল প্রেমরস ভাবে
নুর মুহম্মদ পরে দর্শিলা গৌবরে।
তারপর অন্যে অন্যে প্রেমরসে দর্শন করিল
প্রেমরস তেজ হৈতে দোহান ঘর্মিল
তবে অনাদি নিগুণ প্রভু করতার
সেই ঘর্ম-নীর হৈতে সৃজিল সংসার।

এভাবে ঘর্ম থেকেই ত্রিভুবন, চতুর্বেদ, ব্রহ্মজ্ঞান, চতুর্দশ শাস্ত্র, সাতাশ ব্রহ্মাণ্ড, জীবাত্মা পরমাত্মা, দেবতা, ফিরিস্তা, নর, পরী, বহ্নি, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টির উদ্ভব।

নিরঞ্জন : জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সুরত
তাই, নুর মুহম্মদ কায়া সেরূপ সৃজিলা।

অতএব, আল্লাহ্‌র অবয়বে মুহম্মদ নির্মিত।

শূন্যতত্ত্ব : সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম
শূন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্য যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
সে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।

উল্টা সাধনা : পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জীয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।

দেহে আছে : ষষ্ঠপদ্ম ষষ্ঠচক্র ষষ্ঠঋতু গতি
যথা চক্র যথা পদ্ম ঋতুর বসতি।
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহত
আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান এই চক্র বুলি ঋত।
শ্রীগোলার হাটে তথা নিত্যানন্দ বাজার
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পশার।
সর্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল।
.....
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নরকুল।

কেবল কায়া সঙ্গে জীবাত্তমা সতত মিশ্রিত
পরাত্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত।
কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।

—এখানে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব প্রকট।

অনাহত শব্দ কহে যে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম।
সে হুঙ্কার মূলেত পরমতত্ত্ব সার
তারপরে যোগ সিদ্ধিপন্থ নাহি আর।

সাধনতত্ত্ব : শব্দ স্থির হএ যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন। [তুল : গোর্খবাণী]

পরকীয়া সাধন : স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।

যোগই হচ্ছে একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি পন্থ। তাই :

যোগ বিনু পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।

৭. শেখ জাহিদ

শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়—এর মণীন্দ্রমোহন চৌধুরীর সম্পাদিত একটি এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদিত অপর একটি সংস্করণ রয়েছে। শেখ জাহিদের পুথিতে রচনাকাল দেয়া আছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে
গুণিলে যত হয় সহস্র উপরে
এত লোকের [শাকের] মাঝে করিল প্রচার
পয়ার প্রবন্ধে কহি আত্মাবিচার।

এর থেকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক [রাবণের কর-২০] ব্রহ্মার আনন ৪+১০০০ ধরে ১৪২০ শক বা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। এবং তিনি কবি শেখ জাহিদকে গৌড়ের সূফী আলাউল হকের পৌত্র বলে মানেন। আমাদের মতে ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে = ২০+৪, ২০×৪ কিংবা ২০৪ সংখ্যা নির্দেশক। অতএব ১০২৪, ১০৮০ কিংবা ১২০৪ বঙ্গাব্দের তথা ১৬১৭, ১৬৭৩ কিংবা ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের যে কোনো একটি এ পুথির রচনাকাল।

আদ্য পরিচয়ে অমৃতকুণ্ডের আদলে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়ে বর্ণিত হয়েছে 'কায়া-সম্ভেদ'। এ গ্রন্থে ধর্মঠাকুর-পন্থীদের প্রভাবও পড়েছে। এর 'প্রস্তাবনাঅংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী
বুঝিলে মুকতি হয় শুনিতে মধুর বাণী।
আউটি বিচার যেবা জানিব নিশ্চয়
জ্ঞান কর্মেতে তাকে সন্দেহ নাহি রয়।
জ্ঞান জন্মিব যেবা করিব ধেয়ান
ধ্যান না কৈলে তার কিবা গেয়ান
দান ধ্যান যেবা করএ সমিরস
যোগতন্ত্র সিদ্ধাতন্ত্র রাখে সব হএ বশ। .....

এভাবে গ্রন্থে আট ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মতত্ত্ব, জন্মের তিথি, ক্ষণ, লগ্ন, বিধিলিপি, গর্ভধারণ, গর্ভস্থ সন্তানের কালিক বুদ্ধি, সন্তানে মায়ের ও বাপের অংশ আর বিধাতার দানে বিচার, দেহ ও ইন্দ্রিয় পরিচিতি, কায়াতত্ত্ব, শিরা শরীর ও হাড়তত্ত্ব এবং আউটিতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। মানুষের দেহে মনে মা-বাপ ও স্রষ্টার দান এরূপ :

মায়ে চারি দ্রব্য পিতার চারি ধন
অনাদ্য ধর্মের যথ বৈসএ রতন।

শেখ জাহিদ স্রষ্টা বা আল্লাহ অর্থে অনাদ্য ধর্মনিরঞ্জনের উল্লেখ করেছেন, এতে আপাতত তাঁকে প্রাচীন কবি [পনেরো শতকের ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের] বলে মনে হলেও আমাদের অনুমান তিনি বর্ধমান বিভাগের লোক ছিলেন। তাই মধ্যযুগে মুসলমান সমাজে বহুল ব্যবহৃত বৌদ্ধ 'নিরঞ্জন' তার রচনায় অনাদ্যধর্ম রূপেও নির্দেশিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফজোলেখা' ও দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' স্মর্তব্য।

ষোল-সতেরো শতকের কবি নেয়াজের 'যোগকলন্দর' সতেরো শতকের রাজ্জাক নন্দন আব্দুল হাকিমের 'সিহাবুদ্দিননামা' বা 'দুররে মজলিস' কিংবা চারিমোকামভেদ, আঠারো শতকের মোহসিন আলীর 'মোকাম' মঞ্জিল কথা', উনিশ শতকের বটতলা প্রকাশিত রমজান আলীর 'আদ্যব্যক্ত', রহিমুল্লাহ্‌র 'তনতেলাওত', 'সিহাজউল্লার 'যুগীকাচ' অতিরিক্ত কোনো তত্ত্বের সংবাদ দেয় না, তাই আলোচনা করা হলো না।*

* এ অধ্যায়ের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আমার 'বাঙলার সুফীসাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামী সঞ্জীবপ্রসাদ সেন

গণমানবসেবী আসহাবউদ্দীন আহমদ

চট্টলৈতিহাসিক আবদুল হক চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চল বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুর থেকে আসামের করিমগঞ্জ-কাছাড় অবধি এবং উড়িষ্যার কটক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অবধি বিস্তৃত। এবং আদিকাল থেকে এ অভিন্ন ভাষাই হয়েছে উক্ত অঞ্চলের মানুষগুলোর আত্মীয়তার ও জ্ঞাতিত্বের, মানসিক ঐক্যের, বিশ্বাস-সংস্কারের ও সমাজ-সংস্কৃতির, মিলের এবং আংশিকভাবে জীবনাচারে নিয়ম-নীতির ও রীতি-পদ্ধতির সাদৃশ্যের বা অভিন্নতার বন্ধনসূত্র বা কারণ।

বাঙালী যে গোত্র-সঙ্কর জাতি তা সবাই স্বীকার করেন[১]। সঙ্করজাতির ভাষাও মিশ্র ভাষা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি হয়নি। বাঙলা ভাষায় এদেশের সব-গোত্রীয় অধিবাসীর বুলির উপাদান থাকলেও এর মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে আর্যভাষার এক বুলি ভিত্তি করে। এভাষাই রয়েছে এদের আত্মীয়তাবোধের ও ঐক্য-চেতনার মূলে। তবে যানবাহন, ছাপাখানা, ডাকব্যবস্থা, পত্রিকা প্রভৃতি যোগাযোগের সহজ মাধ্যম না থাকায় উনিশ শতকের পূর্বাবধি বাঙলায় লিখিত সাহিত্যাদি রচনা ছিল আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীগত জীবনদৃষ্টি-দুষ্ট। তা'ছাড়া গোটা বাঙলাভাষী অঞ্চল ব্রিটিশ পূর্বকালে কখনো কোন একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। ফলে প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিচ্ছিন্নতা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। বিশেষত রচনার বিষয় শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার সম্পৃক্ত তথা ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক হওয়ায় এ আঞ্চলিকতা, গৌত্রিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যে স্থায়ী রূপ লাভ করে। তাই বর্ধমান বিভাগে ধর্মঠাকুরের, চণ্ডীর ও বাসুলীর মঙ্গলপাঁচালী হয়েছে রচিত, পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্য, পূর্ববঙ্গে মনসার ভাসান-পাঁচালী, ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে বাস্তব জীবনে ঘটে-যাওয়া, কাম- প্রেম, শোষণ-পীড়ন, জয়-পরাজয় নিয়ে গাথাসাহিত্য আর চট্টগ্রামে (আরাকানরাজভুক্ত) রচিত হয়েছে প্রণয়োপাখ্যান ও পৌরাণিক শিবমঙ্গল। তা ছাড়া হিন্দু, মুসলিম ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ সাহিত্য স্বতন্ত্র তো ছিলই। এক কথায় আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ ও সর্ববঙ্গীয় এবং কিছুটা সর্বশ্রেণীর পাঠ্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সাময়িক পত্রিকা মাধ্যমে উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই মাত্র। ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি নিয়ে ঐহিক ও দৈহিক, ব্যক্তিক ও দৈশিক চেতনা নিয়ে ভূনির্ভর জগৎ ও জীবনসম্পৃক্ত সাহিত্য হতে থাকে ইংরেজী শিক্ষিতদের হাতেই। প্রতীচ্যপ্রভাব এদেশের মানুষের মনের দিগন্ত, চেতনার জগৎ বিশাল ও ব্যাপক করে দেয়। আবার মানুষনির্বিশেষের জন্য, গণমানবের জন্য বৈশ্বিক মানববাদ ভিত্তিক সাহিত্য রচিত হতে থাকে কম্যুনিস্ট লেখকদের হাতেই। অন্যদের রচনায় স্ব স্ব দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্মের ছাপ থাকে ও থাকত, সর্বমানবিক চিন্তা- চেতনা প্রকাশ পেত কৃচিৎ কদাচিৎ।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার না করে সাধারণভাবে বলা যায়, এদেশের অধিবাসী হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল গোত্রীয় লোক[২]। কাজেই অনুমান করতে হয় যে 'আধুনিক বাঙলা' নামের আর্য বুলির আগে এদেশে বিভিন্ন গোত্রীয় বুলিগুলো চালু ছিল; এবং গোত্রগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ও লেন-দেনের প্রয়োজনে হয়তো কোন প্রবল কিংবা সংখ্যাগুরু গোত্রের ভাষা Lingua Franca রূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তার কোনো আভাস পাইনে। এতে বোঝা যায় তাদের যে কেবল লিখন-পদ্ধতি জানা ছিল না তা নয়, তাদের সাংস্কৃতিক মানও নিতান্ত আদিম পর্যায়ে ছিল। মুণ্ডা, কুরুক, বোরো, সাঁওতাল, নাগা, খাসী, কুকী প্রভৃতি গোত্রের আজকের দিনের ভাষায় ও আচারে-সংসারে[৩] তার পরোক্ষ আভাস মেলে। কবে যে এদেশে আর্য-বসতি ও আর্যপ্রভাব শুরু হয়, ইতিহাস তা সঠিক বলতে পারে না। তবে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে[৪] বিশেষ করে জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচারের জন্যই বাঙলাদেশে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটে[৫]। সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—"এদেশে আর্যভাষা অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দী হইতে প্রচলিত আছে[৬]।" তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি বলেন "ইরান হইতে ভারতবর্ষে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দুই বা ততোধিক ধারায় আসিয়াছিল[৭]" এবং অর্বাচীন ধারার সমাজে ব্রাত্য নামে অভিহিত প্রাচীন ধারার "ব্রাত্যরাই বাঙলাদেশে আর্য সংস্কৃতির প্রথম বাহক ছিল বলিয়া" তিনি মনে করেন[৮]। অনার্য ভাষা ও সংস্কৃতির নিদর্শনের বিরলতাই তাঁকে সম্ভবত এ অনুমানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের ধারণায় জৈন বৌদ্ধমত প্রচারসূত্রেই বাঙলাদেশে উল্লেখ্য আর্য বসতি ঘটে এবং এ সময় থেকেই জৈন-বৌদ্ধমতের মাধ্যমেই এদেশবাসী আর্যভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে[৯]। এই দুই মতবাদের উদ্ভবক্ষেত্র ছিল বিহার। আধুনিক বিহার গড়ে উঠেছে সেকালের অঙ্গ, বিদেহ ও মগধ রাজ্য নিয়ে। দেব-দ্বিজ ও বেদদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত হচ্ছে আর্যধর্মের সমাজের ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অনার্য অভ্যুত্থানের বাহন বা ফল।[১০] গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং অনার্য বংশসম্ভূত। তা তাঁর জন্মস্থান, বংশের নাম ও চেহারা থেকে বোঝা যায়[১১]। অনেক জৈন তীর্থঙ্করের জন্মস্থান, সাধনা আর প্রচারক্ষেত্রও বাঙলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ[১২]। অতএব কারুর অস্বীকৃতির আশঙ্কা না করেই বলা চলে, লোকায়তিক-পাকালিক আজীবিক ও জৈন বৌদ্ধমত সম্বল করেই উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্যভাষা ও সংস্কৃতি বাঙলাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, আর রাঢ়-পুণ্ড্র অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়। জৈনমত সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যায়নি, কিন্তু বৌদ্ধমত রাজধর্মের মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে বিচিত্র বিকাশের সুযোগ লাভ করে। এ কারণে পাল রাজত্ব বাঙলার ও বাঙালী সংস্কৃতির সোনার যুগ[১৩]। যদিও গোটা আধুনিক বাঙলাদেশ বা বাঙলাভাষী অঞ্চল পালরাজ্যভুক্ত ছিল না কখনো।

তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে বাঙলাদেশে আর্যভাষা চালু হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ ভাষার নাম রেখেছেন প্রাচীন প্রাকৃত। তাঁর অনুমান, গৌতম ও মহাবীর এ ভাষায় কথা বলতেন[১৪]। অতএব জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে এ ভাষারই লিখিত রূপ পাই। আমরা জানি কোন বুলিরই লেখ্য ও কথ্যরূপ এক হতে পারে না। লেখ্যভাষা গভীর ও বিচিত্র ভাববাহী হয়ে শালীন ও মার্জিত রূপ ধারণ করে। এ যদি সত্য হয়, তা হলে এ সময়কার কথ্য প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত কিছুটা বিকৃত ছিলই। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সম্প্রতি অর্ধমাগধী ও মাগধী প্রাকৃতের সম-স্তরের 'গৌড়ী প্রাকৃত'কেই বিহারী, উড়িয়া ও বঙ্গ-কামরূপী বুলির জননী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মতে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

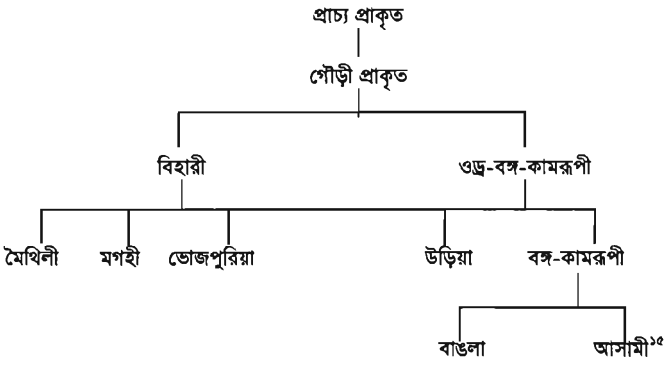

আর জর্জ গ্রিয়ার্সন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাঙালা ভাষার উদ্ভব[১৬]। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র গৌড়ী প্রাকৃতে ও অন্যান্য মাগধী প্রাকৃতে কেবল নামেই তফাৎ, কেননা ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ বিহারকে গৌড়ী-প্রাকৃতের আওতাভুক্ত করেছেন। অথচ এই বিহারের এক অংশই ছিল মগধ, বিশেষ করে তাঁর গৌড়ী-প্রাকৃত এবং গ্রিয়ার্সন ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলো অভিন্ন[১৭]। তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তিনি মাগধী প্রাকৃতকে দেশছাড়া করেছেন, বেদিয়া-জিপসির ভাষাতেই খুঁজেছেন এই ভাষার জীবন্ত বিবর্তন[১৮]। আর্যভাষা বাঙলাদেশে যখনই আসুক, এসেছে বিহার হয়েই[১৯]। মৌর্য ও গুপ্তবংশের শাসন-কেন্দ্র আর্যাবর্ত ঘেঁষা বিহারের আর্যসংস্কৃতিপুষ্ট ও আভিজাত্য-গর্বী অধিবাসীরা গৌড়ীয় 'আসুরিক' ভাষার প্রভাবে পড়েছিল, এই কথা ভাবতে অদ্ভুত ঠেকে। এমন কি মগধ-উদ্ভূত পাল রাজাদের আমলে বাঙলার বাইরে-বিক্রমশীলায়, উড্ডিয়ানায়, মহাস্থানে [পুণ্ড্রে] ও নালন্দায়। কাজেই প্রাচ্য-প্রাকৃতের আদি মঞ্জিল মগধের নামে একে মাগধী প্রাকৃত বলাই সঙ্গত। ভাষা হচ্ছে বহতা নদীর মতো, যুগে যুগে ও অঞ্চলে তার বিচিত্র বিকৃতি ঘটেছে। সেই বিকৃতির উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ করেই[২০] ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ গৌড়ী প্রাকৃত কল্পনা করেছেন এবং দণ্ডী প্রমুখ পণ্ডিতের উক্তিতে সমর্থন খুঁজেছেন[২১]। আজকের বাঙলাদেশের আঞ্চলিক বুলিগুলোর ধ্বনিতে ও রূপে এত তফাৎ যে, এগুলো যে একই জননীর সন্তান তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য; তাই বলে কি আমরা প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পৃথক প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ কল্পনা করব? তবে এ-ও স্বীকার্য যে আমাদের মুখে মুখে রচিত আদি দোঁহা কিংবা চর্যাগীতি এমন কি লেখ্য প্রাচীন বাঙলাও অপেক্ষাকৃত মার্জিত শৌরসেনী দরবারী প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ প্রভাবিত।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "কথ্য সংস্কৃত হইতে বাঙলার উৎপত্তি। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কথ্য সংস্কৃতের যে রূপ চলিত ছিল তাহা ক্রমে প্রাচ্য প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের আগেই। এই প্রাচ্য-প্রাকৃত কালক্রমে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহাকেই বলা হয় প্রাচ্য অপভ্রংশ।

এই প্রাচ্য অপভ্রংশের অর্বাচীনরূপ অবহট্‌ঠ। অবহট্‌ঠ পরে (আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) তিনটি আঞ্চলিক আধুনিক আর্য ভাষায় পরিণত হয়। পশ্চিমে বিহারী, উত্তর-পশ্চিমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈথিলী এবং পূর্বে বাঙলা-উড়িয়া। বিহারী ভাষা হইতে আধুনিক ভোজপুরী (পশ্চিম-বিহারে) ও মগহী (দক্ষিণ-বিহারে) আসিয়াছে। বাঙলা হইতে আরো পরে অসমীয়া উৎপন্ন হইয়াছে[২২]।"

'সংস্কৃত' এ নামেই প্রকাশ, এটি 'কথ্য' হতে পারে না। এ বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতই সুচিন্তিত ও সুযৌক্তিক বলে মনে করি, তাঁর মতে লেখ্যবৈদিক ভাষার পাশে কথ্য যে সমকালীন ভাষা ছিল;[২৩] সেই প্রাচীন বুলি থেকে ক্রমবিবর্তনে আমাদের বাঙলা ভাষা গড়ে উঠছে। পীঠিকায় এরূপ দাঁড়ায়[২৪] ঃ-

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০–৮০০ খ্রীঃ পুঃ)
২. প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য বা আদি প্রাকৃত (৮০০০–৫০০০ খ্রীঃ পুঃ)
৩. প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত (৫০০০ খ্রীঃ পুঃ–২০০খ্রীঃ)
৪. গৌড়ী প্রাকৃত (অপর মতে মাগধী) (২০০–৬৫০ খ্রীঃ)
৫. গৌড়ী অপভ্রংশ (অপভ্রষ্ট) (৪৫০–৬৫০ খ্রীঃ)
৬. প্রাচীন বাঙলা যুগে (৬৫০–১২০০ খ্রীঃ)

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে[২৫]ঃ

১. ১৫০০/১২০০–৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
২. ৬০০–২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
৩. ২০০–খ্রীঃ পুঃ–২০০ খ্রীস্টাব্দ
৪. ২০০–৬০০ খ্রীস্টাব্দ
৫. ৬০০–১০০০ খ্রীস্টাব্দ
৬. ১০০০–১২০০ খ্রীস্টাব্দ

কথ্যভাষা বিভিন্ন স্তরের, গোত্রের ও অঞ্চলের লোকের মুখে বিচিত্র বিকৃতি লাভ করে। আর কথ্য ভাষা যখন লিখিতও হয়, তখনো কথ্য ও লেখ্য কথায় তফাৎ কম থাকে না[২৬]। লিখিত কথ্যের ব্যাকরণ-চেতনাজাত বিশুদ্ধি এবং শব্দচয়ন ও বিন্যাসপ্রসূত লাবণ্য কথ্য বুলিতে দুর্লভ। এবং কথ্যভাষা বা বুলিই দ্রুত পরিবর্তনশীল। লেখ্যভাষা কৃত্রিম উপায়ে অবিকৃত রাখার চেষ্টা চলে। তাই লেখ্যভাষার রূপান্তর অত্যন্ত মন্থর। সেজন্য আমাদের ধারণায় প্রাচীন ভারতিক কথ্য বুলি থেকে কথ্য প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত; তার থেকে কথ্য মাগধী প্রাকৃত। এর গৌড়ীয় বিকৃতি অপভ্রষ্ট; তার থেকে অর্বাচীন অবহট্‌ঠ, তার থেকে প্রাচীন বাঙলা, উড়িয়া ও আসামী ভাষা উদ্ভূত হয়েছে।

আমাদের বাঙলা কিংবা সংস্কৃত অবিমিশ্র আর্যভাষা নয়। অনেক অনার্য শব্দ, ধ্বনি, রূপতত্ত্ব বা পদরূপ (Morphology) ও বাক্যরীতি বা পদক্রম (Syntax) এ ভাষা গোড়া থেকেই আত্মস্থ করেছে [২৭]। এগুলোর উত্তরাধিকার তো রয়েইছে, তাছাড়া প্রাকৃত, অপভ্রষ্ট ও নব্য ভারতীয় বুলিও বিভিন্ন স্তরে নানা অনার্য উপকরণ-উপাদান নিয়ে হয়েছে পুষ্ট। এমনি করে সংস্কৃত যুগে উত্তর ভারতীয় অনার্য, বিদেশী পহলভী ও গ্রিক শব্দ সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারকে ঋদ্ধ করেছে। বাঙলায় এসব ছাড়াও দেশী কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, মুণ্ডা, বিদেশী ফারসী এবং এর মাধ্যমে আরবী ও তুর্কী; আর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজী এবং এর মাধ্যমে য়ুরোপীয় ল্যাটিন-আদি যাবতীয় ভাষার শব্দ, এবং, একালে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে পৃথিবীর উল্লেখ্য সব ভাষারই দু'চারটি করে শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে বা করছে। বাঙলা শব্দ-সম্পদকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়; সংস্কৃত সম [তৎসম], সংস্কৃত জাত [তদ্ভব], বিকৃত সংস্কৃত [অর্ধ বা ভগ্ন তৎসম],

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশী [কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, মোঙ্গল] ও বিদেশী]। এদের মধ্যে ফারসী শব্দের সংখ্যা প্রায় চার হাজার এবং বাঙলা শব্দকোষের শতকরা চার ভাগ, য়ুরোপীয় তথা ইংরেজী শতকরা প্রায় দুই ভাগ [চিকিৎসা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ]।

২

আশ্চর্যচর্যাচয় বা চর্যাগীতি

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ-গ্রন্থাগার থেকে এক পুথি আবিষ্কার করেন। এটি একটি পদ বা গীতির সঙ্কলন গ্রন্থ। প্রকাশ কাল ১৩২৩ সন। পুথিটি মুনিদত্ত নামের এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা সম্বলিত। এই সটীক গ্রন্থের টীকাকার-প্রদত্ত নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (অবশ্য চর্যাচর্যবিনিশ্চয় রূপে লিপীকৃত)। এ জন্য পদসংগ্রহের শুদ্ধ নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়' ছিল বলে অনুমান[২৮] করা হয়। আমাদের আলোচনার ভাষায় চর্যাগীতি বা চর্যাকোষ। সঙ্কলন গ্রন্থে মোট একান্নটি গান ছিল[২৯]। মুনিদত্ত একটা বাদ দিয়েছেন। প্রাপ্ত পুথিতে তিনটি পদ খোয়া গেছে; অপর একটির অর্ধেক নেই। কাজেই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ ও তেইশ জন পদকারের নাম পাচ্ছি। তবে ভণিতায় যাঁর নাম রয়েছে তিনিই রচয়িতা এমন অনুমান করা চলে না। কেউ কেউ গুরুর নামে ভণিতা দিয়েছেন। তা বুঝি নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা'-এর যোগে। কতগুলি স্পষ্টতই ছদ্মনাম। যেমন কুক্কুরী, বাণী, তন্ত্রী, ডৌম্বী, তাড়ক, কঙ্কণ, শবর[৩০]। এঁদের কেউ কেউ প্রখ্যাত চৌরাশী সিদ্ধার অন্তর্ভুক্ত [চৌরাশী অঙ্গুলি পরিমিত দেহ-সাধনায় সিদ্ধ যে, সেই চৌরাশী সিদ্ধা]।

চর্যাগীতি বৌদ্ধ মহাযান মতের উপশাখা তান্ত্রিক বজ্রযান সম্প্রদায়ের বামাচারী সহজিয়া-যোগী-শৈব পন্থের সাধন-ইঙ্গিত সম্বলিত রূপক রচনা। এতে তৎকালীন বিভিন্ন মতের মিশ্রণ ঘটেছে[৩১]। এ রূপকাশ্রিত হেঁয়ালি সন্ধ্যা ভাষা'য় রচিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর নাম দিয়েছেন 'আলো আঁধারী ভাষা। এই ধর্মমত, সাধনতত্ত্ব, ও রচনারীতির অনুবর্তন রয়েছে নাথপন্থী, বৈষ্ণব সহজিয়া[৩২] ও বাউলদের মধ্যে। গোরক্ষবিজয়ে, বৈষ্ণব সহজিয়াপদে ও বাউল গানে তা আজও সুলভ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মণীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর সুকুমার সেন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও উড়িয়া আসামী য়ুরোপীয় বিদ্বানেরা চর্যাগীতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে লঘু-গুরু অনৈক্য রয়েছে বহু বিষয়ে। ডক্টর সুনীতিকুমার ও তাঁর অনুসারীরা চর্যার ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চর্যাগীতিকে দশ থেকে বারো শতকের রচনা বলে মত দিয়েছেন[৩৩]। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ও তাঁর মতের সমর্থকরা তিব্বতী সূত্রে প্রাপ্ত চৌরাশী সিদ্ধার আবির্ভাব কালের উপর আস্থা রেখে মনে করেন সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যেই চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল[৩৪]।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, Dev-ther snon-po-এর জর্জ রোরিককৃত অনুবাদ The Blue Annals আর Bu Ston Rin-Po. Che-এর E. Obermiller কৃত অনুবাদের আলোকে সুখময় মুখোপাধ্যায় চর্যালেখক সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অনুমান ৭৫০-১০৫০ সনের মধ্যে চর্যাগীতিগুলো রচিত হয়েছিল[৩৫]। আমরাও তাঁর অনুমান যৌক্তিক বলে মনে করি। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন কালিক ও স্থানিক বহুল উচ্চারণের ফলে তিনশ' বছরের পরিসরে রচিত গীতিগুলোর মূলভাষা বিবর্তিত ও বিকৃত যে হয়েছে, তাও মানতেই হবে।

৩

বাঙালীরা চর্যাপদকে বাঙলা বলেই জানে। এবং বারো শতক অবধি চর্যাপদের রচনাকাল বলে মানে। এরপরে তেরো শতক থেকে চৌদ্দশ' পঞ্চাশের মধ্যেকার কোন বাঙলা রচনার নিশ্চিত নিদর্শন মেলে না। তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময়ে কিছুই রচিত হয়নি এবং তাঁরা তুর্কী বিজয়কেই এজন্য দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, তুর্কী বিজয়ের ফলে দেড়শ'-দু'শ কিংবা আড়াইশ বছর ধরে বাঙলা দেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চলে। তাদের জীবন-জীবিকার এবং ধর্ম-সংস্কৃতির উপর বেপরোয়া ও নির্মম হামলা চলে। উচ্চবিত্তের ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচলো, আর যারা এর মধ্যে মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন-রজনী গুণে গুণে রইল। কাজেই নতুন করে কিছু তো হলই না, সাহিত্য-সংস্কৃতির যা ছিল তাও লোপ পেল। এই হল তাঁদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। এসব উক্তির মূলে যে কোন তথ্য নেই, তা বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করা চলে। এক : উত্তর ভারতে আগেই তুর্কী বিজয় ঘটেছিল, সেখানে শতাব্দব্যাপী রক্তে ও আগুনে বিভীষিকার কথা শোনা যায় না, বাঙলা তো দিল্লীর সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমেই বিজিত হয়। লক্ষ্মণ সেন বাধা দেয়ার চেষ্টা না করেই পালিয়ে গেলেন, কাজেই বখতিয়ার বিনা যুদ্ধেই পেলেন উত্তর বাঙলার অধিকার। যেখানে রাজা কিংবা প্রজা রুখে দাঁড়ায়নি, সেখানে অহেতুক পীড়ন চালানোর কথা নয়। প্রায় একশ' বছরেরও অধিককাল ধরে তুর্কীরা বাঙলাদেশের কেবল এক তৃতীয়াংশের কম অঞ্চলেই আধিপত্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের শাসনে আর পূর্ববঙ্গও ছিল সেন-সামন্তদের অধীনে। বাঙলা ভাষায় তখন সাহিত্য রচনার রেওয়াজ থাকলে হিন্দুশাসিত এসব অঞ্চলের সাহিত্য পাওয়া যেত। দুই : ১২০১-০৪ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি ৩৩৫ বছরের মধ্যে (বখতিয়ার খলজী থেকে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ ওরফে আবদুল বদর অবধি), History of Bengal, DU vol. II-এর অনুসরণে হিন্দু পীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন বখতিয়ার খলজী (১২০৪-০৬), আলী মর্দান (১২১০–১৩), মালিক তাজুদ্দীন আরসালান খান (১২৫৯–৬৫), সোনারগাঁয়ের ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮৩৫০) এবং শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর ওরফে সিদিবদর (১৪৯১–৯৩)। এঁদের রাজত্বকাল একুনে বিশ বছর[৩৬]। অবশিষ্ট ৩১৫ বছরের ফসল কি। তিন : সেনরাজারা নিম্নবর্ণের লোকদের লেখাপড়া করার সুযোগ দেননি[৩৭]। চার : ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও উচ্চবর্ণের বৌদ্ধরা সংস্কৃতেই লিখতেন, তাই তুর্কীবিজয়ের আগেকার কোন বাঙলা রচনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। পাঁচ ঃ শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোন অবহট্‌ঠেই লিখবার রেওয়াজ ছিল না[৩৮]। গৌড়ী অবহট্‌ঠে লিখবার রেওয়াজ চালু না হয়ে থাকলে বাঙলাতেও থাকার কথা নয়। ছয় : এসময় বাঙলা পদাদি রচিত হলে 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' ও 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' সংকলিত হত। অথবা এরূপ বাঙলা সংকলন থাকত। সাত : তুর্কী আফগানরা নিশ্চয়ই বেছে বেছে বাঙলা বইগুলোই নষ্ট করেনি, বাঙলায় বই থাকলে সেন-দরবারে রচিত সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্র গ্রন্থের সঙ্গে এগলোও থাকত, তুর্কী অধিকারেও নিশ্চয়ই সব বাড়ি ও সব মন্দির জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়নি। এছাড়া হিন্দুশাসিত অঞ্চল তো ছিলই। আট :-এ সময় বাঙলায় কিছু রচিত হলেও আগুন-পানি-উই-কীটে ধ্বংস করেছে অথবা জনপ্রিয়তা হারিয়ে তথা পাঠকের অভাবে অযত্নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোপ পেয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শেখ শুভোদয়া বা চর্যাগীতির একাধিক পুথি পাওয়া যায় নি।

৪

এবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি যে বাঙলা এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবীদার। ডক্টর শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালী বিদ্বানেরাও ওদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন[১]। সব সিদ্ধার বাড়ি বাঙলায় নয়, বাঙলা তখনো শালীন লেখ্য সাহিত্যের ভাষা নয়—আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যার মিথিলার কিংবা আসামের লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব মানতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য ((গৌড়ী?) অবহট্‌ঠে রচিত। সেসময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা-আসামী-অবহট্‌ঠ মোটামুটি অভিন্ন ছিল। নাথ-সহজিয়া পন্থের অন্যতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ। কাজেই মানিকচাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদের দেশে (আধুনিক কুমিল্লাদি জেলায়) বহুল চর্চার ফলে (নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশাদি পূর্ব বাঙলার লোকেরাই নিয়ে যান) চর্যাগীতিতে বঙ্গ গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে[৬]। এতেই জোগালো হয়েছে বাঙলার দাবী। মুনিদত্তের টীকাযুক্ত চর্যাগীতি নেপালে পাওয়া গেছে বাঙলা প্রভাবিত নেওয়ারী হরফে লিখিত পুথিতেই। বিদেশে বিভাষীর পক্ষে ভিন্ন ভাষার অলিখিত শাস্ত্রে চর্চা সম্ভব নয়। কাজেই চর্যাগীতি নেপালে স্বাভাবিককভাবেই লিখিত ও টীকা সম্বলিত হয়েছে। কিন্তু আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও তার লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। নাথ-সহজিয়া পন্থ যোগ-তান্ত্রিক বজ্রযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা। কাজেই এই উপসম্প্রদায়ের লোক সংখ্যায় বেশী ছিল না এবং তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করেনি। অতএব সেকালের বাঙালী-বিহারী-আসামী-উড়িয়া সমাজ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবী বা যোগ্যতা এদের ছিল না। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। শাস্ত্রচর্চার ও শাসন পরিচালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহট্‌ঠেরও লেখ্যরূপ মেলে না। গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠেই যদি লেখার রেওয়াজ না থাকে, তা হলে তখনো নিতান্ত অবজ্ঞেয় আঞ্চলিক মুখের বুলি আসামী-বাঙলা-উড়িয়া-বিহারীতেই বা লেখ্যরচনার সম্ভাব্যতা কোথায়? কাজেই এ দেশে চর্যাগীতির কোন লেখ্যরূপ ছিল না এবং এগুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকসাহিত্য বা লোকায়ত শাস্ত্ররূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা।

অতএব, আমাদের অনুমান এই যে, চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়—অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং মৌখিক রচনা। কেবল ডক্টর শহীদুল্লাহ্ আর ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ই নন, ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন, "অসমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাঙলা ও অসমীয়া দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না[২]" এবং "উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে[৩]। কাজেই ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিল ও অসমীয়ার উদ্ভব। ডক্টর সুকুমার সেন এর নাম দিয়েছেন, 'প্রত্ন-বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া[৪]"। এই সাধারণ স্তর আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণায় অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ স্ফুটনকালীন অবহট্‌ঠ। অতএব চর্যাগীতি কেবল বাঙলার নয়, উক্ত অপর ভাষাগুলোরও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সব কয়টি ভাষার জননী।[৫] সে-স্তরেই চর্যার ভাষা কিঞ্চিৎ শৌরসেনী অবহট্‌ঠ প্রভাবিত।

তবে অধিকাংশ চর্যাগীতি বাঙলাদেশের আবহে এবং বাঙালীর রচিত তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলাদেশ, বঙ্গাল জাতি, পঁউয়া (পদ্ম) খাল, বঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ, সাধারণের প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেয়া রূপপ্রতীক—তুলা-ধূনা, নৌকা চালান, মদ চোলাই করা, নদী ঘাট থেকে জল ভরা, সাঁকো তৈরী করা, দাবা খেলা, শবরবৃত্তি, গোয়ালবৃত্তি প্রভৃতির রূপক সেকালের নিম্ন ও নিঃস্ব শ্রেণীর সমাজ-চিত্র দান করছে[৬]। এমনটি বৈষ্ণব পদাবলীতেও মেলে না, সেখানে রাধা-কৃষ্ণ সমাজ ও বাস্তব জীবনকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাকৃতিক পরিবেশে ও জনজীবনাচারে পার্থক্য সামান্য-সাদৃশ্যই বেশি।

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোন বুলিই লেখ্য-সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতবর্ষের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাববিনিময়ের বাহন। তাই কোন অঞ্চলের মধ্যে আর্য-ভারতিক বুলিই লেখ্যভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায়নি। বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—'পালি ও প্রাকৃত' সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্রশাসনের কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোন বুলিই লেখ্যভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষায় রূপ পায়'[৭]।

এর পরে তুর্কী-মুঘল আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাববিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে উপমহাদেশের আধুনিক আর্য ভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এ ক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহন রূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, কবীর, নানক, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগতন্ত্র ও শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্যভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তী কালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল—চৈতন্য প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দুসমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের নবসৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে নি, কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপে পড়ে বাঙলা কোনদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

শিক্ষার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোকের ভাষা। সেকালে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতির-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বুলিতেই। এভাবে তারা গান-গাথা, ছড়া-বচন ও রূপকথা-রসবার্তা তৈরী করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। বহু মুখের স্পর্শে ওগুলোর রূপ ও রস বদলায়। ফলে ও-সবকে ব্যক্তির রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই আজকাল ওগুলোকে সাহিত্যিক গণরচনা বলে নির্দেশ করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় ঐগুলোই লোক-সাহিত্য বা পল্লী-সাহিত্য। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লী-সাহিত্য সাহিত্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস-প্রসূতও নয়। তবু মানবমনের কোমল অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ বলেই এগুলো সুন্দর এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পুষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃতজনের রচনা লোক-সাহিত্যের মাধ্যমেই। বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে শেখশুভোদয়া ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কয়েকটা পদ, ডাক ও খনার বচন, ছড়া-প্রবচন, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত (অপ্রাপ্ত), ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গীত, মীননাথ-গোরক্ষনাথ-হাড়িপা-কাহিনী, শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রামপাঁচালী, ভারত কথা প্রভৃতি আর শিলা বা তাম্রলিপিতে এবং বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকা সর্বস্বে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে, শূন্যপুরাণে প্রাপ্ত কিছু শব্দে। ব্রাহ্মণাবাদীদের হাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাহিনীগুলো রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ-বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধকাহিনী ময়নামতী-গোপীচাঁদ কথা গাথা রূপেই রয়ে গেছে, এবং পালাগীতি লোপ পেয়েছে।

অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন বা রাজ্য শাসনের বাহন কিংবা প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে বলে রাখা ভাল, তুর্কী-আফগান সুলতান-সুবাদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পোষকতা করেন। লেখ্য ভাষা বইপত্র ছাড়া শেখা যায় না। কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যেমনটি হয়েছিল। আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অতএব, আলোচ্য দু'শ বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না মেলার অনুমিত কারণগুলো এই :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয়নি বলে বাঙলা তুর্কী বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায়নি।

খ. ফলে, তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা ভাষা উচ্চবিত্তের লোকের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠে নি। এ-সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গান, গাথা ও ছড়া-পাঁচালীই চলত।

গ. সংস্কৃতের কোন ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয়নি[১০]। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই প্রাকৃতজনেরা গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত ও প্রাকৃত বা শৌরসেনী অবহট্‌ঠই ছিল। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ভাষায় রচন, পঠন ও শ্রবণ ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃতের মাধ্যমে বৌদ্ধ-শাস্ত্রেরও চর্চা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা ও সম্ভাব্যতা কোন উচ্চ শিক্ষিত লোকের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগেনি। পাল ও সেন আমলে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে এবং মুসলমান-বিজয়ের পরে প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেককাল গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এতেই ভাষা বিকশিত হয়েছে; তার প্রমাণ মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে। এ গ্রন্থেই দেখা যায়, ইতোমধ্যে এক ডজন ফারসী-তুর্কী শব্দ বাঙলা সাহিত্যের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ঘ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু-শাসিত মিথিলায়। তাই এ-সময়ে বাঙলাদেশে সংস্কৃতচর্চা বিশেষ হয়নি, কেবল কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল। মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পরে নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চার তথা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ঙ. তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে আলোচ্য যুগে বাঙলায় কিছু কিছু পুথিপত্র রচিত হয়েছিল, তা হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজের ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। যত্ন করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পায়। আগুন-পানি-উই-কীট-তো রয়েইছে। কিন্তু আলোচ্যযুগে যে ভাষায় কিছু লিখবার রীতি ছিল না, তার বড় প্রমাণ পনেরো শতকের শেষাবধি নানা মঙ্গলগীতি, রামায়ণ-গান, ভারত-পাঁচালী এবং বিশ শতকেও পূর্ববঙ্গগীতিকা ও ময়নামতীর গানের লিখিতরূপ পাওয়া যায় নি। অথচ এগুলো সুপ্রাচীন।

চ. আবার লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), শেখ শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে তুর্কী বিজয়ের পূর্বে রচিত সংস্কৃতসাহিত্যের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ নাটক, কাব্য, প্রকীর্ণ কবিতা ও শ্লোকসংকলনগ্রন্থ এবং সংস্কৃতে রচিত শাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ পাওয়া গেছে। তেরো থেকে ষোল শতক অবধি তুর্কী-আফগান আমলে রচিত সব সংস্কৃতগ্রন্থও রক্ষিত রয়েছে, বাঙলায় কোন গ্রন্থ তুর্কীপূর্ব ও তুর্কী উত্তরকালে রচিত হলে তাও, অন্তত তার কিছু অংশ পাওয়া যেত। সংস্কৃতগ্রন্থ তুর্কীরা নষ্ট না করলে কিংবা তুর্কীর ভয়ে সংস্কৃত রচনা বন্ধ না হলে, কেবল বাঙলার ক্ষেত্রে তুর্কীরা ভিন্নরূপ আচরণ করেছে অর্থাৎ বাঙলা রচনা নষ্ট করেছে ও বাঙলা রচনায় বাধা দিয়েছে—এমন কল্পনা ও যুক্তি কেবল বাতুলেই সম্ভব। তাছাড়া নগরে তুর্কীশাসক-সেনানী থাকলেও গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দুর দেশে হিন্দু রইল, তার ধর্মাচার রইল, শাস্ত্র রইল, মন্দির রইল, পূজাঅর্চনা-বিয়ে-পার্বণ-উৎসব রইল, বৃত্তি-বেসাত রইল, সন্তান-ফসল উৎপাদনও নির্বিঘ্ন রইল, তার সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না সমেত গার্হস্থ্য-দাম্পত্যজীবন রইল, বাধা ছিল—শঙ্কা-ত্রাস ছিল কেবল হিন্দুর গাঁয়ে বসে বাঙলা পয়ার ত্রিপদী রচনায়—এমন অদ্ভুত যুক্তি বিদ্বানের মনে জাগে কি করে।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তা হলে তেরো-চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠনযুগ তথা স্বরূপ-প্রাপ্তির যুগ। এ-সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির শাসনমুক্ত হয়ে প্রাকৃতজনেরা পূর্বসংস্কার বশে নানা লৌকিক দেবতার-চণ্ডীর-মনসার-ধর্মঠাকুরের-বাসুলীর-ষষ্ঠীর-যক্ষের-ক্ষেত্রপালের মাহাত্ম্যকথা মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে এবং এ-ভাবেই ভাষার শাব্দিক প্রসার, ছান্দসিক উৎকর্ষ ও রাগবৈচিত্র্য ঘটতে থাকে। কাজেই এ-সময়ে কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা। চর্যাগীতি ছাড়াও বারো শতকের বাঙলা-ঘেঁষা রচনার নমুনা মেলে শেখ শুভোদয়ার আর্যায় ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোন কোন পদে। বাঙলা তখন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা বাঙলা কবিও দেখতে পেতাম। এবং পূর্ববঙ্গের ও রাঢ়ের মতো হিন্দুশাসিত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কী বিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না। এবং মুসলিম বিজয়ে তাদের মূর্ছাহত হবার কথাও নয় বলে তাদের রচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবার কারণ ঘটেনি। কেবল তা-ই নয়, বাঙলা লেখ্য ভাষা হলে গৌড় সুলতানের দরবারে রাজ্য-শাসনের প্রয়োজনে গোড়া থেকেই অন্তত বাঙলা ফরমান লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায় নি, লৌকিক দেবতার পূজাপ্রচার প্রয়াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দুর রচনায়।

অত্যাচার যতই তীব্র হোক, তা দেড়শ দু'শ বছর অবধি চলতে পারে না। সাত-আট পুরুষ ধরে পীড়ন চালানোর পরেও দেশে হিন্দু প্রজা রইল, তাদের খাওয়া-পরার, বিয়ে করার আর ধর্মরক্ষার অধিকারও রইল, আর আনুষঙ্গিক উৎসব-পার্বণও চলছিল নিশ্চয়ই, প্রাকৃত পৈঙ্গল, সদুক্তি কর্ণামৃত সংকলিত হল এ-সময়ে, কেবল বাধা পেল গান-গাথা রচনায় ও কথকতায়—এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণের জন্যে কল্পনার অতিপ্রাকৃত প্রসার প্রয়োজন। আমরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ আর দাঙ্গার দিনেও সাহিত্য রচিত হতে দেখেছি, পারিবারিক ও সামাজিক আনন্দ-উৎসবও চলতে দেখেছি অবাধে। সাত-আট পুরুষ ধরে মানুষ ত্রস্ত ও স্তব্ধ থাকতে পারে না। বাঙলায় লিখিত রচনার রেওয়াজ থাকলে তার নিদর্শন আমাদের হাতে আসতই। চিরকেলে নিয়মে শাসকগোষ্ঠীর কৃপালিপ্সু বহু হিন্দু রাজ-সরকারে চাকুরি নিয়ে অনুগতের নিরুপদ্রব জীবনে স্বস্তি-সুখ ভোগ করত। এ-কৃপাজীবী-চাকুরে শ্রেণীর বাঙলায় লেখার রেওয়াজ থাকলে, কিছু লিখতেন নিশ্চয়ই, কেননা এ-সময়ে কেউ কেউ সংস্কৃত শাস্ত্রের টীকা-ভাষ্য রচনা করেছেন।

পরাধীনতার গ্লানি হিন্দুর মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চারশ' বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয়নি, বাঙলা দরবারী কিংবা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি বলেই।

অতএব আমাদের অনুমান এই যে, বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্য ভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এ হচ্ছে বাঙলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।

৫

বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় পেতে হলে বাঙালীর পরিচয় নিতে হবে। নইলে এ-সাহিত্যের স্বরূপ ধরা যাবে না।

আর্যেরা ছিল প্রাকৃত শক্তির পূজক। তাদের প্রভাবেই হয়তো এদেশে প্রাকৃত শক্তিকে জয় করার প্রয়াস বিশেষ দেখা যায়নি। সে-শক্তিকে তোয়াজে তুষ্ট রেখে জীবনযাপনের চেষ্টাই হয়েছে চিরকাল। অরি ও ইষ্ট শক্তির পূজাই বাঙালীর ধর্ম। বাঙলা দেশের ভোগেচ্ছু অনার্য মানস একান্তভাবে জীবনমুখী। তাই এদেশে বৃহৎ ও মহৎ আদর্শচেতনা কিংবা অধ্যাত্মবোধ তত তীব্র ছিল না কখনো, যত প্রবল ছিল জীবনোপভোগের প্রয়াস। উপনিষদের মহৎ বাণী, নির্বাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব কিংবা গীতার জীবনবোধ বা শঙ্করের জ্ঞানবাদ তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারেনি[১]। তাই এদেশে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আদর্শ এত বিকৃত হয়েছে। অনার্য বাঙালীর প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারই বারবার বহিরারোপিত শাস্ত্র ও নীতিবোধের উপর জয়ী হয়েছে[২]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী ভোগেচ্ছু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ, তাই দৈবশক্তি ও তুক্‌তাকের উপরই তার ভরসা। পৌরুষ প্রয়োগে তার উদ্যোগ কম। ইহ-জীবনবাদী এসব মানুষের দেবতাও ইহকালীন জীবন বিধাতা[৩]। মনসা, শীতলা, শনি প্রভৃতি অরি দেবতার পূজায় যেমন একদিকে পার্থিব অকল্যাণ এড়ানোর ভরসা পেয়েছে, তেমনি লক্ষ্মী, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির সেবায় সুখের, শান্তির ও ঐশ্বর্যের আশ্বাস লাভ করেছে[৪]। তাই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের নিয়ন্ত্রী মহৎ ধর্মশাস্ত্রে তারা খেই পায়নি।

অতএব, আদিকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে কোন বহিরারোপিত ধর্মমত বা জীবনাদর্শ বাঙলা দেশে টেকেনি, বাঙালীরা সবসময়ে নিজেদের জীবন-জীবিকার গরজমতে ধর্মমত, ইষ্টদেবতা এবং জীবনদর্শন তৈরি করে নিয়েছে[৫]। যখনই জীবন-জীবিকায় বিপর্যয় বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখনই বাঙালী নিজের পছন্দমত দৈব আশ্রয় খুঁজেছে।

এতে বাঙালী চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়েছে। সাহিত্য মানুষের মানস-মুকুর। তাই সাহিত্য থেকেই জাতীয় অকৃত্রিম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী চরিত্রের যেরূপ প্রতিফলন হয়েছে, তাতে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাব-প্রবণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধন ভীরুতা ও কাণ্ডালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য[৬]।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালী সাহিত্যে বিশেষ করে বাঙালীর এই চারিত্র্য—এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্ট দেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণ-প্রাচুর্যের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তার স্বধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন ধর্ম, কোন নীতি-আদর্শ সে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয়নি। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে, কিন্তু হৃদয়ানুভূতি গোচর না হলে কিছুই গ্রহণ করে না। তাই সে মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায় কিন্তু আচরণে প্রয়োজনকেই কেবল স্বীকৃতি দেয়[৭]।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে আদর্শবাদী, ও বৈরাগ্যধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় বস্তুবাদী, গণভাষায় জীবনবাদী এবং নীতিবিদের ভাষায় ভোগবাদী। এ-জন্যেই নৈরাত্ম্য ও নিরীশ্বরবাদী নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালী স্বীকার করে নিলেও বৌদ্ধচৈত্য হয়ে উঠেছিল দেব-দেবীর আখড়া।

বৌদ্ধযুগে নির্বাণের জন্য নয়—অমরত্বের ও চিরসুখের প্রত্যাশায় সুকঠোর যোগতান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে দৈবশক্তিধর হয়ে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে জীবনোপভোগের প্রয়াসী হয়ে উঠল বাঙালী। মহাজ্ঞান, তুক-তাক, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা 'সিসম ফাঁক' আয়ত্ত করে খিড়কীদোর দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হ'ল। যোগ ও সাংখ্য—এই দুই অনার্য দর্শনজাত যোগ-তান্ত্রিক সাধনাই হল এক শ্রেণীর লক্ষ্য। এরই নমুনা পাচ্ছি চর্যাগীতিতে। পাল আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসার লাভ করে তখন বাঙালী বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করল। কিন্তু মায়াবাদ, পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্ম-পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোন উৎসাহ ছিল না। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে সে চণ্ডী মনসা শীতলা ষষ্ঠী শনি লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে জীবনের ও জীবিকার ব্যাপারে হয় নিশ্চিত। জয়দেবের গীত-গোবিন্দই প্রমাণ করে যে, এ-সময়ে বৈষ্ণব মতবাদও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে[৮]; যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়মূল করবার জন্য সমাজ কাঠামো স্থায়িভাবে তৈরী করবার প্রয়াসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন রাজারা উচ্চবর্ণের লোক আমদানী করে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনে তৎপর হয়ে ওঠেন[৯]। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই লৌকিক দেবতারা তার পারলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "সেনরাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য, কিন্তু এতকালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যত: না হউক গৌণত: হইলেও এই সমাজ দেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ—এই উভয়ের সংঘাত মুহূর্তে বাঙলা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা (বাঙালীরা) নতুনকে (ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে) যেভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল। এই দেশীয় প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গলকাব্যগুলি এই নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পরমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়...তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি[১০]।" একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলাদেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতা ও ইসলামের নির্দেশকে ছাপিয়ে ওঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনদেবী-বনবিবি, কালুগাজী-কালুরায়, বড় খাঁ গাজী-দক্ষিণরায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি[১১] জীবনের ও জীবিকার এবং নিরাপত্তার ও কল্যাণের ইষ্ট ও অরি দেবতা। মধ্যযুগে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম এবং গত শতকের রামমোহন-প্রচারিত ব্রাহ্মমত এবং শিক্ষিত সাধারণের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনানুগত্য বাঙালীর এই বন্ধনমুক্ত মনোভাবের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অতএব, কোন বৃহতের ও মহতের সাধনা বাঙালীর কোন কালে ছিল না। সে একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এ-ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। এ-কারণে বাঙলার সংস্কৃতি চিরকালই পনেরো আনা বাঙালী সংস্কৃতি[১৩]। চন্দ্রশাসনের ও পাল আমলে বৌদ্ধদের যোগতান্ত্রিক সাধনায় আগ্রহের প্রমাণ মেলে চর্যাগীতিতে, ডাকিনী ও যোগিনীর কিংবদন্তীতে, ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গাথায়, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি পাঁচালীতে এবং 'যোগী'পাল, 'মহী'পাল, 'ভোগী'পাল গীতির ঐতিহ্যে ['যোগী', 'মহী' ও 'ভোগী' নামেতেই রূপকাশ্রিত তত্ত্ব সিদ্ধান্তের আভাস রয়েছে।]

সেনদের স্বল্পকাল রাজত্বের সময়কাল শূন্য-পুরাণতত্ত্বে, শেখ-শুভোদয়ায়, গীত-গোবিন্দে ব্রাহ্মণ্য বিকৃতি লক্ষণীয়। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতে এসেছিল শিথিলতা। মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধিদৈবিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা এ-যুগের প্রাসাদ ও কুটীরবাসীর চিত্তদৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে[১৪]। বৌদ্ধদের উপর এ-সময়ে উৎপীড়ন চলছিল—'বৈদিক আচারে রাজা মহসুখী হৈল, বৌদ্ধাচারীগণ প্রতি নির্যাতন কৈল।' [কান্দি রাজবাড়িতে প্রাপ্ত কারিকা : ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বাঙলার ইতিহাসের ধারা'য় উদ্ধৃত পৃঃ ৫৩] এবং 'নিরঞ্জনের রুশ্মা'ই তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধরা তখন শৈব, সহজিয়া, নাথযোগী ও ধর্মপন্থী হয়ে হিন্দুসমাজে আত্মগোপন করতে প্রয়াসী হয়[১৫]। সেন আমলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। এ-সময়ে "শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।...এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ রহিয়া গেল[১৬]।" দেশী লোকের ও দেশী ভাষার প্রতি অবজ্ঞাবশে সেনেরা বিদেশী ব্রাহ্মণ আনয়নে এবং সংস্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্চার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। এ-সব কারণে বাঙলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হতে দেরী হল অনেক, তার জন্য তুর্কী বিজয়ের প্রয়োজন ছিল।

কাজেই তুর্কী বিজয়ে কেবল সদ্ধর্মীদেরই পীড়ন মুক্তির নিঃশ্বাস পড়েনি, বাঙলা ভাষারও সুদিনের শুরু হয়েছে। তুর্কী অধিকারে সেন-আমলের বৈষম্যমূলক শাসন রহিত হয়। "রাজ্য শাসনে ও রাজস্বব্যবস্থায় এমন কি সৈন্যাপত্যের হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল[১৭]।" "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুর হাতে ছাড়িয়া দিতেন।...এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্ত ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন[১৮]।" "বাঙলাদেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।...এই পাঠান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজে নতুন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড় পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধা বোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করিলেন; তাহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ-কার্য শেষ করিয়া তাহারা শাস্ত্রের অনুবাদক ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপরদিকে বাঙলা ভাষায় ধর্মপ্রচার এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব্যভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরাজগণ আন্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্যশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগাইলেন। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙালার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনো সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই[১৯]।" কেবল বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ সেন নন, এ-তথ্য এখন প্রবোধ ঘোষ [বাঙালী, পৃঃ ৭৯-৮০], অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় [বা. সা. ই. ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫], সুখময় মুখোপাধ্যায় [বা.ই.দু'শ বছর পৃঃ ৪৬৩], সুকুমার সেন [বা.সা.ই. ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮৮] প্রমুখ সবাই স্বীকার করেন।

অনার্য সংস্কার বশে নিম্নশ্রেণীর জনগণ কিভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে রাজশক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজেদের পূর্বতন ধর্ম, আচার ও সংস্কার জিইয়ে রেখেছিল, তা আমরা দেখেছি। বৌদ্ধচারিতা, বজ্রতারা, অবলোকিতেশ্বর শিব কিংবা ধর্মঠাকুর লোক-মানস প্রশ্রয়ে বৌদ্ধ আবরণে যেমন পূজিত হয়েছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য যুগে তাঁরা যথাক্রমে মনসা, চণ্ডী, লৌকিক বিষ্ণু, শিব, ধর্মঠাকুররূপে নতুন পোষাকে হিন্দু দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন; নাথ ও সহজিয়া পন্থাও বৌদ্ধ আবরণে যেমন পূজিত হয়েছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য যুগে তাঁরা যথাক্রমে মনসা, চণ্ডী লৌকিক বিষ্ণু, শিব, ধর্মঠাকুররূপে নতুন পোষাকে হিন্দু দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন; নাথ ও সহজিয়া পন্থাও বৌদ্ধ এবং হিন্দুর সাম্প্রদায়িক মত রূপে গৃহীত হয়[২০]। এসব সুপ্রাচীন মতের উদ্ভবের স্থান ও কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে এগুলো যে অতি প্রাচীন অনার্য মানস সম্ভূত ও জাদু বিশ্বাস যুগের সৃষ্টি তাতে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না[২১]। বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে রাজশক্তির বিরূপতায় বহিরাগত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যদের মধ্যে তথা অভিজাতের ও উচ্চবর্ণের মধ্যে এসব লৌকিক মতের ও দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল না। তুর্কী আমলে রাজভয় থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণ উচ্চবিত্তের সমাজেও তাদের ধর্মের ও দেবতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা দানে প্রয়াসী হয়। এ-কারণেই তখন থেকে শুরু হয় দেব-মানবের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ-যে-জায়গায় আমার দখল নাই সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে? যে-উপায়েই হোক। তারপর যে-সকল উপায় দেখা গেল, মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়ের জয় হলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল মন্দির দখল করল তা' নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে, চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে[২২]।' মনসা-চাঁদের দ্বন্দ্ব, কালকেতু-ধনপতির উপর চণ্ডীর অহেতুক নির্যাতন ও অনুকম্পা, লাউসেনের সৌভাগ্য, ইছাই ঘোষের বিপর্যয় প্রভৃতি এরই ফল। কবিরাও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহিমা কীর্তনে তৎপর হয়েছেন। পাঠক-শ্রোতাও বংশ-নিপাতের ভয়ে শ্রদ্ধা নিয়ে পঠনে-শ্রবণে মনোযোগী হয়েছে। এমনি করে উচ্চবর্ণের লোকেরা লৌকিক দেবতার কাছে হার মেনেছে। বাঙলা সাহিত্যের বারোআনা রচনাই নিয়োজিত হয়েছে এই লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে।

এ-ভাবে তেরো-পনেরো শতকের মধ্যে বাঙলার নিম্নবর্ণের গণদেবতা জাতীয় ইষ্ট দেবতার মর্যাদায় উন্নীত হলেন। তখন এসব লৌকিক দেবতায় আভিজাত্য দানের জন্য আর্যীকৃত প্রাচীন দেবতা সূর্য ও শিবের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক পরিকল্পিত হল। এভাবে ধর্মঠাকুর হলেন স্বয়ং সূর্য; চণ্ডী বা কালী হলেন শিব-পত্নী; মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী হলেন শিবকন্যা।

কাজেই বৌদ্ধযুগ থেকেই লৌকিক দেবতার পূজা-পদ্ধতি ও মাহাত্ম্যকথা মুখে মুখে চালু ছিল। পাল আমলের শেষের দিকে তাদের কেউ কেউ পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করেন। এবং তুর্কী শাসনকালে নির্বিঘ্ন প্রচার পেয়ে উন্নীত হন জাতীয় দেবতার স্তরে, সে-সঙ্গে তাঁদের মাহাত্ম্যকথাও বৈচিত্র্য এবং বিপুলতা লাভ করে[২৪]। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে তাই

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করত্র কেহ দিয়া বহু ধন।
বাশুলী পূজএ কেহ নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত[২৫]।

কিন্তু পাল আমলের অবহট্‌ঠে কিংবা সেন আমলের বাঙলা বুলিতে এগুলো লিখিত হয়নি। একে তো সেনরাজারা নিম্নবর্ণের লেখাপড়া শেখার বিরোধী ছিলেন, তার উপর সমাজের উচ্চবিত্তের লোকেরা রাজশক্তির প্রভাবে পড়ে লৌকিক দেবতা ও প্রাকৃতজনের ভাষা এড়িয়ে চলতেন এবং তাঁদের সংস্কৃত প্রীতিও এ-সময়ে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল, তাই জয়দেব, সন্ধ্যাকর নন্দী, সর্বানন্দ, হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী, মুরারি মিশ্র প্রভৃতি অবহট্‌ঠের বাক্-রীতিতে রচনা করেছেন সংস্কৃত[২৬]। কাজেই বাঙলায় লেখার রেওয়াজ যত আগে চালু হওয়া সম্ভব ছিল তত আগে হয়নি। তবে "এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ-বাহিনী, কৃষ্ণলীলা-কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট বড় গানের অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবমন্দিরে।... রামায়ণ মহাভারত কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা গান রাজসভায় ও সামন্ত সভায় প্রধানভাবে অনুশীলিত ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে অর্থাৎ দেশী-ভাষাবলম্বী 'লোক' সাহিত্য বিশেষভাবে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা-চণ্ডী-ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই অনুমানের সমর্থন মিলে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম দ্রৌপদী দশরথ রাম সীতা ইত্যাদি মহাভারত রামায়ণ কাহিনীর নামগুলি তৎসম (সংস্কৃত) রূপেই প্রচলিত। কিন্তু কানু বা কানাই (কৃষ্ণ), রাই (রাধিকা), আয়ান (অভিমন্যু), গোই, গুই (গোপী, গোপিকা) খুল্লনা (ক্ষুদ্র), লহনা (লোভনা), বেহুলা (বিহ্বলা) ইত্যাদি নামগুলি তদ্ভবরূপেই মিলিতেছে। ইহা হইতে এ অনুমান অপরিহার্য যে শেষের সব কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে[২৭]'

লিখিত বাঙলা সাহিত্য

বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ দেব-গাথাগুলো পাঁচালী পর্যায়ে উন্নীত হয়ে লিখিত রূপ পায়নি। কিন্তু হিন্দু দেবকাহিনী চৌদ্দ শতক থেকে লিখিত রূপ পেতে থাকে। মানিকদত্ত, কানাহরি দত্ত প্রভৃতির নামসার স্মৃতি থেকে এবং শূন্যপুরাণের ভাষার কাঠামো থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব) পুথিপ্রাপ্তি থেকে আমরা তা' অনুমান করতে পারি। আমরা নাথ কাহিনী-বিধৃত সমাজ-পরিবেশের আভাস থেকেও আমাদের এ-অনুমানের সমর্থন পাই। লিখিত বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে তথা আদি বাঙলা কাব্য হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাহিনী স্বীকৃতি পাচ্ছে সম্প্রতি। কিছুটা তথ্যের, কিছুটা যুক্তির এবং কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন এটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে(১৩৮৯—১৪১০) রচিত হয়। ভাষা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো প্রাচীন নয়। তবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষা স্মরণে রেখে এবং স্রষ্টা অর্থে 'ধর্ম' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না।

মহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার।
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজএ।
মোহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিয়া
লৈলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া।

এর মধ্যেই সোনারগাঁয়ের যুদ্ধে পিতৃহন্তা গিয়াসুদ্দীন আযম শাহকে নির্দেশ করা হয়েছে বলে ডক্টর হক অনুমান করেছেন। লিখিত বাঙলা সাহিত্যের সর্বজন-স্বীকৃত আদি নিদর্শন হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি সম্পাদক প্রদত্ত নাম। রচয়িতা বাসুলীর সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আনুমানিক রচনাকাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ বা পনেরো শতকের প্রথমার্ধ। জয়দেবের গীত-গোবিন্দেই প্রথম রাধা-কৃষ্ণলীলার পর্বানুগ বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রসানুগ লীলাবিভাগ এবং পর্ববিন্যাস রয়েছে। এতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাগানুগ সূফী সাধনা-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন[২৮]। তবে এ-সময়ে যে শাসক-শাসিতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার আভাস পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্যিক তুর্কী-ফারসী-আরবী শব্দের মিশ্রণে। এই রাধাকৃষ্ণলীলা মহাভারতীয় নয়, লৌকিক কাহিনী-প্রসূত। আভীর জাতির লোকগাথার নায়ক কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন। নয়-দশ শতক থেকেই এ-লিখিত সাক্ষ্য মেলে[২৯]। যদিও লৌকিক ধামালী ভিত্তি করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতিনাট্য রচিত এবং এর সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বের ভাব ও তত্ত্বগত তফাৎ বিস্তর, তবু পরবর্তী বৈষ্ণবতত্ত্বে ও সাহিত্যে এ-গ্রন্থের প্রভাব বিপুল। এটি পৌরাণিক আবরণে লৌকিক প্রণয়-কাহিনী। নায়ক দেবকল্প বলে মধ্যে মধ্যে আধ্যাত্মিকতার আভা আছে। কেবল পদাবলী নয়, রাধাকৃষ্ণ লীলারস কল্পনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদলে গড়ে উঠেছে। রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ আদি গোস্বামীর তাত্ত্বিক রচনায় এর প্রভাব দৃশ্যমান[৩০]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত আদিরসাত্মক রচনা হলেও এর বিশেষ গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এটি গীতিনাট্য, বিভিন্ন ছন্দ ও রাগ-রাগিণীযুক্ত, এবং ভাষা প্রাথমিকতার আড়ষ্টতামুক্ত। এতে বোঝা যায়, এর আগে মুখে মুখে বাঙলা ভাষা শব্দে সমৃদ্ধি এবং প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত লোকসাহিত্য এবং কথকতারই লেখ্য রূপ। তাই বক্তব্যের ভাষা ও ভঙ্গি প্রায়ই পৌনঃপুনিকতা দোষে এবং বর্ণিত স্থান-কাল-বিষয় ভ্রান্তিতে দুষ্ট।

এর পরের রচনা হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমাদের অনুমান কৃত্তিবাস [জন্ম আনু. ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দ : আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস এর গ্রহণীয় সম্ভাব্য সন]। রুকনউদ্দীন বারবক শাহর প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন, যেমন পেয়েছিলেন গুণরাজ খান মালাধর বসু[৩১]। কৃত্তিবাসের বিকৃত আত্মবিবরণীর অংশ পাওয়া গেছে। তা দিয়ে তাঁর পৃষ্টপোষক রাজা ও সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলছে গত ষাট বছর ধরে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাই ভাষায় প্রাচীনতার কোন ছাপ রক্ষিত হয়নি। বাঙালীর ধর্মবোধ মহাভারত প্রভাবিত এবং বাঙালীর উপর রামায়ণের ধর্মাচরণ সংক্রান্ত প্রভাব নিতান্ত সামান্য। বাঙলাদেশে রাম-মন্দির নেই। কোথাও কোথাও প্রথারক্ষা গোছের রামনবমী উদ্‌যাপিত হয়[৩২]। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী হিন্দুর কাছে রামকে একান্ত আপন করে তুলেছে। বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক জীবনে রয়েছে এর সর্বাত্মক প্রভাব। বাঙালী হিন্দুর জীবনের আদর্শ হচ্ছে রামায়ণের পাত্র-পাত্রিগণ। তাছাড়া আধুনিক হিন্দুর সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মননের উৎস হয়েছে রামায়ণ আর মহাভারত।

রামায়ণ তিনটে স্বাধীন-কাহিনীর সমষ্টি। যোগসূত্র কেবল নায়ক রাম। প্রথমটিতে ঘরোয়া জীবনে ঈর্ষা-অসূয়া জাত বিপর্যয়, দ্বিতীয়টিতে গৃহবিবাদের বা ভ্রাতৃবিরোধকালে রাষ্ট্রিক জীবনে পরাশ্রিত হওয়ার পরিণাম এবং তৃতীয়টিতে দর্প ও দাপট বশে নারী সম্পর্কে নীতিভ্রষ্টতার পরিণাম স্বতো-উদঘাটিত। অবশ্য আর্য গৌরবগর্বী কবি বাল্মীকি স্বগণ— ও স্বদেশ-দ্রোহী সুগ্রীব-বিভীষণকে অনুগতের সম্মান দিয়েছেন, যেমনটি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদীরা এ-যুগে দিয়ে থাকে।

মালাধর বসু বারবক শাহর আগ্রহে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। বারবক শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন :

স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।
তাঁর আজ্ঞামত গ্রন্থ করিনু রচন।

আদিযুগে হিন্দুরা বাঙলা লিখতে গিয়ে সমাজের ভয় করেছেন। তাই স্বপ্নে প্রাপ্ত দেবাদেশের দোহাই পেড়েছেন, মুসলমানেরা করেছেন পাপের ভয়, তাই পাপ-ভয় খণ্ডন করতে চেয়েছেন যুক্তি দিয়ে। আর একটি তথ্য এই

পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচালী লেখার সাহস ও পড়ার এই অধিকার তুর্কী শাসনের দান।

কবি বলেছেন—ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।।
কাব্যরচনার কাল-তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।

১৩৯৫—১৪০২ শক বা ১৪৭৩—১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ।

অতএব, গ্রন্থ বারবক শাহর আমলে শুরু হয়ে সমাপ্ত হয় ইউসুফ শাহর আমলে। কবি ছিলেন বর্ধমানের কুলীন গ্রামবাসী কায়স্থ এবং রাজকর্মচারী।

জৈনুদ্দীন নামের এক কবির 'রসুল বিজয়' কাব্যের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে। এতে রসুলের সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের কাল্পনিক যুদ্ধকথা বর্ণিত হয়েছে। ভণিতায় রাজরত্ন, সুনায়ক ও রাজেশ্বর ইউসুফ খানের প্রশস্তি ও কাব্যে কবির পিতৃপুরুষদের নাম আছে। কেউ কেউ এই ইউসুফ খানকে ও সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহকে অভিন্ন মনে করেন।

এরপরে পাচ্ছি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান। বরিশালের ফুল্লশ্রী গাঁয়ের কবি বিজয়গুপ্ত

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতিতিলক।।

—এই শ্লোকে কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন। এতে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪—৮৫ সন মেলে। অতএব এই 'হোসেন শাহ' আসলে সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ, যার সাধারণ্যে ডাক নাম ছিল 'হোসেন শাহ'। এঁর কোন কোন মুদ্রায় 'হোসেন শাহী' কথাটি লেখা রয়েছে[৩৩]। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য হিসেবে সুন্দর ও সুখপাঠ্য। এঁর কাব্যে অক্ষম পূর্বসূরি হিসেবে মনসামঙ্গল রচক কানা হরিদত্তের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।

বিদ্যাপতি কীর্তিলতায়, বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গলে, জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে একই ভাবে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন, এতে মনে হয় শাসক-শাসিতের সম্পর্কসূচক একটা গৎবাঁধা কথা সর্বত্র চালু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাপতি মিথিলার হিন্দু রাজার আশ্রয়পুষ্ট কবি। মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী তাঁর কাছে শোনা-কথা মাত্র। অথচ 'কীর্তিলতা'র বর্ণনা দেখে মনে হয় তাঁর চারপাশে এমনি ঘটনা অহরহই ঘটছে। এবং তিনি নিজেও সে-বিভীষিকায় ত্রস্ত। বিজয়গুপ্ত 'হাসন হোসেন' পালায় একইরূপ অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করেছেন; অথচ তিনিই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, 'রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত'। এবং ফুলিয়া গাঁয়ের হিন্দু ও মুসলমান সবাই সজ্জন এবং সুখে বাস করে। জয়ানন্দও চৈতন্যদেবের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেও চৈতন্য-সমকালে হিন্দুপীড়নের বাঁধাগতে বর্ণনা দিয়েছেন অথচ 'চৈতন্যভাগবত' কিংবা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তেমনটি নেই।

পনেরো শতকের অপর কবি হচ্ছেন 'মনসাবিজয়' রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার কোন অঞ্চলের বাদুড্যা বা নাদুড্যা গ্রামবাসী। তাঁর গ্রন্থরচনা কাল

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ের প্রধান।

এতে ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ হয়।

এই হোসেন শাহ অবশ্য সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯)। এঁর আমলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরীমঙ্গল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস মহাভারত এবং শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য

বাঙলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

মুসলমানদের সিন্ধুবিজয়ের ফলে নতুন জাতির, সমাজের ও সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিন্দুসমাজে যে মানস-আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং এক বিদেশী-বিধর্মীর ও বিভাষীর ধর্মাদর্শের বৈষম্যমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার ও মানবিকতার মোকাবিলা করতে গিয়ে হিন্দুসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দিল, তার সমাধান খুঁজলেন শঙ্কর তাঁর জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ বলে পরিচিত অদ্বৈততত্ত্বে। ইসলাম অধ্যাত্ম হেঁয়ালিমুক্ত প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারবিধি। একেশ্বরবাদ তার শিক্ষার উৎস। শঙ্করের বৈরাগ্যবাদে বাস্তব জীবনের গুরুত্ব অস্বীকৃত রইল বটে, তবে অদ্বৈতবাদের আবরণে একেশ্বরবাদে ও মানবিক যুক্তিবাদে আস্থা রেখে ইসলামের মোকাবিলায় তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর এ-মতবাদ জীবন-চর্চার সহায়ক না হলেও সেদিন একদিকে ইসলামের প্রসার-রোধে এবং অপরদিকে বৌদ্ধ-উচ্ছেদে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রাবল্যের সহায়ক হয়েছিল। এবং তাঁর দর্শনের পরোক্ষ প্রভাবে অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্যে 'ভক্তিবাদ' প্রসার লাভ করতে থাকে। ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এ-ধারার বিকাশের ও বৈচিত্র্যের ফল। "একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে। নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে এই নতুন ধর্মের সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।...ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন।...ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ থেকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।...ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকেরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শুদ্ধজ্ঞানের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতির স্তরে নেমে এলেন[৩৪]।" এ-তথ্য তারাচাঁদ, সতীশচন্দ্র, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রায় সবাই স্বীকার করেন।

মুসলিম বিজয়ের পরে উত্তর ভারতেও ইসলামের সাম্যবাদ ও উদার মানবিকতা নিম্নশ্রেণীর নিপীড়িত জনমনে নতুন আশা জাগাল, এক নয়া সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে গেল তাদের সামনে। তারা বুঝল, জন্মসূত্রে নয়, যোগ্যতা দিয়েই হবে জীবন নিয়ন্ত্রিত। তখন স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হল না, আবার ইসলাম গ্রহণেও ছিল সমাজ-সংস্কারের বাধা। ফলে ঘরের বাঁধন হল আলগা, কিন্তু গন্তব্য ছিল না স্থির, তাই দেখা দিল পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস।

রামানন্দ, কবীর, নানক,একলব্য, দাদু, রামদাস প্রভৃতি সন্তদের ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ লোপ, সমাজে এবং শাস্ত্রে নিম্নবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মনুষ্য সত্তায় মর্যাদা দান। এবং সেই-সঙ্গে শাসক-শাসিতের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম সমন্বয়ের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্যের বাণীও প্রচারিত হল। এরূপে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের ও উত্তর ভারতের সন্তধর্মের উদ্ভব ঘটে ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে[৩৫]।

বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ইসলামের প্রভাবে হিন্দুসমাজে যে ভাঙন ধরে তা রোধ করবার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁরা শাস্ত্রের উদার ও শিথিল ব্যাখ্যায় জনচিত্ত আকর্ষণে প্রয়াসী হলেন। সমাজে নতুন মেল-পটী বন্ধনের সাড়াও পড়ে গেল। এই প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের প্রতি জনমনে আস্থা সৃষ্টির জন্য 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে' বলে ভবিষ্যদ্বাণীও রটিয়ে দেয়া হল। তবু এতে ভাঙন রোধ করা গেল না দেখে চৈতন্যদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সন্তদের অনুসরণে এখানেও ভক্তিধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলেন। চৈতন্যের সাধনাতেই ভক্তি প্রেমরূপে মহিমান্বিত হল। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় নবদ্বীপে এবং ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু ঘটে। রূপেগুণে অনন্য চৈতন্যদেব অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্যে, তর্কপটুতায়, চরিত্রমাধুর্যে ও ব্যক্তিত্বে নদীয়ার গুণীজ্ঞানী বয়স্কদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর পিতামহের বয়সী অদ্বৈতাচার্য, বয়োজ্যেষ্ঠ রামানন্দ প্রমুখ গুণীব্যক্তিদের আনুগত্যই তার প্রমাণ। যখন তিনি হরিসংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর নব মতবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। এতেই তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অসামান্যতা বোঝা যায়। মুসলিম রাজশক্তি পাছে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এই ভয়ে তিনি হিন্দু রাজ্যান্তর্গত নীলাচলে গিয়ে আখড়া করলেন। পদস্থ রাজকর্মচারী রূপ-সনাতন প্রমুখ অনেক গুণী-জ্ঞানী তাঁর শিষ্য হয়ে দেশে দেশে নতুন প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। বাঙলাদেশে অদ্বৈতাচার্য ও রামানন্দ রয়ে গেলেন তার প্রতিনিধি রূপে। বাস্তব জীবনকে আড়াল করে চৈতন্যদেব এক অধ্যাত্ম মনোজীবন সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। এ-কারণেই সম্ভবত বাঙলায় বৈষ্ণব মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্য এক সময়ে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনে রসের তরঙ্গ তুলেছিল। তুর্কী-আফগান সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণে বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের বুনিয়াদ তৈরি হয়, আর বৈষ্ণব-রচনার দ্বারা ভাষায় ও সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটে। কেবল সাহিত্য সৃষ্টির ও ভাষার পুষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙলার ধর্মে, সমাজে-সংস্কৃতিতে এবং মননেও এর প্রভাব ও দান অপরিমেয়। পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য প্রভাবের বিপুলতার ও বৈচিত্র্যের সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলতে পারে। বৈষ্ণবের প্রেমবাদের মাধ্যমে নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্মদর্শনের দীক্ষা পেল বাঙালী। এই প্রীতিধর্মের প্রভাবে বাঙালীর মানবতাবোধ হল তীব্র, তীক্ষ্ণ ও উদ্দীপ্ত। ষোল শতক তাই বাঙালীর ও বাঙলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের যুগ। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে এদেশের হিন্দু-মুসলমান[৩৬] বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করে। এ-মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সহজিয়া ও বাউল মতবাদ পুষ্ট হয়। বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শাক্ত সম্প্রদায়ে ভক্তিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে এবং প্রধানত বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্ত পদাবলী রচিত হয়[৩৭]। মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণকে আত্মা-পরমাত্মা, দেহ-মন এবং ভক্ত-ভগবানের রূপক হিসেবে গ্রহণ করে পদরচনা ও আস্বাদন করেছে। লৌকিক প্রণয়গীতিতেও নায়িকা অর্থে 'রাই' এবং নায়ক অর্থে 'কালা' সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। 'ব্রজবুলি' নামে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টিও হয় এ-সময়ে। ভাগবতাদির কথা বাদ দিলে চোখে দেখা রক্ত-মাংসের মানুষের চরিতাখ্যান রচনাও শুরু হয় এ-সময় থেকেই। বাঙলায় গীতিকবিতা রচনার এবং অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাতও করেন বৈষ্ণবেরাই। বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও উদার মানবিকতার প্রভাবে ক্রূর, নিষ্ঠুর, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ লৌকিক দেবতাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষ্ণবোত্তর যুগে উদার কৃপাশীল এবং ভক্ত বৎসলরূপে চিত্রিত হয়েছেন মঙ্গল পাঁচালীগুলোতে।

চৈতন্য পূর্বযুগের রাধাকৃষ্ণলীলার পদকার ছিলেন সংস্কৃতে জয়দেব এবং বাঙলায় বড়ু চণ্ডীদাস, মিথিলায় বিদ্যাপতি, হোসেন শাহের কর্মচারী যশোরাজ খান এবং ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। চৈতন্যোত্তর যুগে প্রায় দশ হাজারের মতো বাঙলা ও ব্রজবুলি পদ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচ ছয়শ' পদই গীতিকবিতা হিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছে, বাকী পদগুলো পুচ্ছগ্রাহিতাদোষে দুষ্ট ও কৃত্রিম অনুশীলনে আড়ষ্ট। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদও বাঙালীর মুখে মুখে বাঙলা পদে পরিণত হয়েছে। ফলে পনেরো শতকের প্রথমার্ধের মৈথিল কবি বিদ্যাপতিও এখন বাঙলার ও বাঙালীর প্রিয় কবি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রামানন্দ বসু, বংশীবদন, জগদানন্দ, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি দাস, নরোত্তম দাস, প্রমুখ এবং মুসলমানদের মধ্যে ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, আলাউল ও সৈয়দ মর্তুজা শ্রেষ্ঠ পদকার। প্রেমানুভূতির ও প্রেমের আনুষঙ্গিক ভাবের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অভিব্যক্তির আধার হয়ে পদাবলী হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে অতুল্য।

চৈতন্যদেবের বাঙলা জীবনীগ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' (১৫৪৫–৫৫) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' (১৫৬০–৬৫) শ্রেষ্ঠ। চরিতামৃতের মূল্য বৈষ্ণবতত্ত্বগ্রন্থ হিসেবেই সমধিক। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (১৫৫০–৬০) অতিরঞ্জিত বর্ণনায় দুষ্ট। চূড়ামণি দাসের অলৌকিক ও বানানো তথ্যপূর্ণ 'গৌরাঙ্গবিজয়'ও [ষোল শতক] সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বৈষ্ণব মোহান্ত তথা চৈতন্য পার্ষদাদির জীবনীগ্রন্থও আছে—অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতপ্রকাশ ও সীতা চরিত্র প্রভৃতি। সতেরো শতকে রচিত হয় প্রখ্যাত প্রেমবিলাস, বীর রত্নাবলী, রসিকমঙ্গল, জগদীশবিজয়, অনুরাগবল্লী, অভিরাম লীলামৃত প্রভৃতি আর আঠারো শতকে পাচ্ছি চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, উদ্ধব দাসের 'ব্রজমঙ্গল', 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি।

মহাভারত

আগেই বলেছি বাঙালী হিন্দুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে বলে রামায়ণ বা রাম পাঁচালী তাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মহাভারত যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শের কুঞ্জী, তবু তা ধর্মাদর্শের উঁচু মঞ্চ থেকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে নেমে আসেনি। কেননা মহাভারতের কুন্তী, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির কাহিনী এবং অন্য নানা উপকাহিনী বাঙালীর নীতিবোধের অনুকূল নয়। তাই গোটা মহাভারত অনেককাল বাঙলায় অনূদিত হয়নি। পরেও তুলনায় কম হয়েছে। অথচ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বারোআনা উপকরণই মহাভারতীয়। রাজকীয় কূটনীতি ও যুদ্ধশাস্ত্র সম্বলিত হওয়ায় মহাভারত রাজা ও রাজপুরুষদের প্রিয় ছিল। এরূপ কৌতূহলই ছিল পরাগল ও ছুটি খানের। তাই অশ্বমেধাদি পর্বই তাঁরা শুনতে চেয়েছেন। কামতা দরবারেও তাই এর আধিক্য দেখতে পাই। পরাগল খান পরমেশ্বরকে বলেছেন

কুতূহল বহুল ভারত কথা শুনি
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর...
কেমত পৌরুষে পাইল নিজ বসুমতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এহি সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালি পড়িয়া।

তাই এঁর কাব্যের নাম 'পাণ্ডববিজয়'।

বাঙলা ভাষায় আদি মহাভারত অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী। গৌড়সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর উত্তর-চট্টগ্রামস্থ সেনানী শাসক পরাগল খানের (আঃ ১৫১৩–৩২) আগ্রহে তাঁরই সহকর্মী হুগলীর বালাণ্ডানিবাসী পরমেশ্বর সংক্ষেপে মহাভারত কাহিনী বর্ণনা করেন এবং সম্ভবত তাঁর পুত্র নসরত খানের ওরফে ছুটি খানের প্রবর্তনায় শ্রীকর নন্দী অনুবাদ করেন অশ্বমেধ পর্ব। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টাও পরাগল–ছুটি খান নন[৩৮]। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে বালাণ্ডা গাঁয়ে বসেই কবিচন্দ্রমিশ্র ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে হোসেন শাহের আমলে 'গৌরীমঙ্গল' রচনা করেন।

মহাভারতের তৃতীয় অনুবাদক সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলের রামচন্দ্র খান। ইনি সম্ভবত ১৫৫২–৫৩ সনে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এ তিনজনের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙলাদেশের সর্বত্র এঁদের পুথি পাওয়া গেছে। সম্ভবত সতেরো শতকের কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত এঁদের কাব্যযশ ম্লান করে দেয়। গায়েন কবি সঞ্জয়ের মহাভারত আসলে একটি পাঁচমিশেলি সংকলনগ্রন্থ। এঁর আসল নাম সম্ভবত হরিনারায়ণ দেব।

কামতা-কামরূপের রাজসভায় মহাভারতের চর্চা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অনেক কবিই বাঙলায় মহাভারত অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন রাজা ও রাজকুমারের আগ্রহে। কামতা-কামরূপের রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র সমরসিংহের অভিপ্রায় অনুসারে কবি পীতাম্বর ঊষাপরিণয় (১৫৩৩) ও নলদময়ন্তী (১৫৪৪) রচনা করেন। দুটোই যথাক্রমে বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত। পীতাম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণকাহিনীও (১৫০৩) বাঙলায় লিখেছিলেন। এছাড়া কামতা-কামরূপের পরবর্তী রাজা শুক্রধ্বজের সভাকবি অনিরুদ্ধ মহাভারত, তাঁর পুত্র গোপীনাথ মহাভারতের দ্রোণপর্ব এবং অনিরুদ্ধের জৈষ্ঠে ভ্রাতা কবি চন্দ্র ও নাগ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কামতা রাজ্যে মহাভারত রচয়িতা আর আর কবি হচ্ছেন বিশারদ চন্দ্রবতী রুদ্রদেব, গোবিন্দ কবিশেখর (১৬২৭–৩২), শ্রীনাথ (১৬৩২–৬৫), দ্বিজ রঘুরাম, জয়দেব, হরেন্দ্র নারায়ণ, ব্রজসুন্দর কৌশারি, দ্বিজ বলরাম, বৈদ্যনাথ, পরমানন্দ, মহীনাথ, রামবল্লভ দাস, লক্ষ্মীরাম, বৈদ্য পঞ্চানন, রামনন্দন প্রভৃতি।

এদিকে মহাভারত কাহিনীর অনুসরণ পাচ্ছি সতেরো শতকে। এই শতকের কবিদের মধ্যে কাশীরাম দাস সবচেয়ে জনপ্রিয়; তাঁর কাব্য আজো হিন্দু বাঙালীর ঘরে ঘরে পরম আগ্রহে পড়াশোনা হয়। কাশীরামের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহ সুধাকর এবং প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর। নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি বা সিদ্ধি গ্রামে। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গদাধরও কবি ছিলেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং গদাধর লেখেন জগন্নাথমঙ্গল। কাশীরাম বিরাট পর্বের কতকাংশ অবধি লিখে পরলোকগমন করেন।

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপূর।

তারপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস অবশিষ্টাংশ রচনা করেন।

তাঁর উক্তি এরূপ : –ভ্রাতুষ্পুত্র হই আমি তিহোঁ খুল্লতাত
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।

কিন্তু নন্দরাম দাস অবশিষ্টাংশ পুরো রচনা করেছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা কাশীদাসী মহাভারতের শান্তি পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুথির পাঠে যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও কাশীরামের পুত্র জয়ন্ত দাসের ভণিতা মেলে। কাশীদাসের কাব্যের মাধ্যমেই মহাভারত ও তার ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়। সে-জন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো কাশীরাম দাসের মহাভারতের দানও বাঙালী জীবনে অপরিমেয়। মহাভারতের অপর এক রচয়িতার নাম বিশারদ। রচনা কাল ১৬১৩ সন। সতেরো শতকে মহাভারতের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বসু, রামনারায়ণ দত্ত, অনন্ত মিশ্র, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস, দ্বিজ প্রেমানন্দ, দ্বিজ অভিরাম, কৃষ্ণরাম দাস, জ্ঞানদাস, ষষ্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, রামেশ্বর নন্দী, রামলোচন প্রভৃতি। এঁরা সম্ভবত মহাভারতের খণ্ডাংশের অনুবাদক।

আঠারো শতকের কবিদুর্লভসিংহ, গোপীনাথ দত্ত (বা নন্দী বা পাঠক), সুবুদ্ধি রায়, অম্বষ্ঠ বল্লভ, পুরুষোত্তম দাস, ভবানী দাস, দ্বিজরাম লোচন, দ্বিজ গোবর্ধন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ, অকিঞ্চন দাস, বসুদেব, নিমাই, রাজীব সেন প্রভৃতির গ্রন্থের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে।

মানুষের চরিত্রের, আচরণের, সমস্যার ও সম্পদের হেন দিক নেই যা মহাভারতে চিত্রিত ও বর্ণিত হয় নি। তাই বলা হয়—'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে।' পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা-কাহিনী-ভারে ভারী বলেই নাম মহাভারত। 'গীতা'ও মহাভারতের একটা সর্গ।

AMARBOI.COM

রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পরে পনেরো-ষোল শতকে রামায়ণ কেউ রচনা করেন নি। বৈষ্ণব প্রভাবে তখন সবাই কৃষ্ণলীলা-রসের তরঙ্গাঘাতে দিশাহারা। কাজেই রামায়ণ রচন-শ্রবণের দিকে কারুর উৎসাহ ছিল না। সতেরো শতকে যখন বৈষ্ণবীয় নেশা কিছুটা মন্দ হল, তখন আবার নতুন করে রামায়ণ গান শুরু হয়েছে। এ-সময়কার উত্তর-বঙ্গের খ্যাতিমান রামায়ণ-রচক হলেন নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন। পৈতৃকনিবাস পাবনা জেলার বড় বাড়ী বা অমৃতকুণ্ডা। ইনি সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি। 'অদ্ভুত রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত বলে এই গায়েন-কবিও 'অদ্ভুতাচার্য' নামে পরিচিত হন। কৈলাস বসুও অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করেন। ময়মনসিংহবাসী মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীও সম্ভবত কথকতা করতেন, সে-সূত্রে তাঁরও লিখিত রামায়ণ রয়েছে গাথার আকারে। এক ঘনশ্যাম দাসও রামায়ণ রচয়িতা। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে রামশঙ্কর দত্ত নামের এক কবিও 'অদ্ভুতাচার্য' বলে কলমী নাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিজ ভবানীনাথ, দ্বিজ লক্ষ্মণ প্রভৃতিও রামায়ণ রচনা করেন আঠারো শতকে। উল্লেখ্য যে, বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও অধ্যাত্ম তাৎপর্যজ্ঞাপক অধ্যাত্মরামায়ণ, সাংখ্য-যোগতত্ত্ব সম্বলিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং যোগ-তান্ত্রিক নানা বিষয়ক অদ্ভুত রামায়ণও পরে পরে চালু হয়েছে সংস্কৃতে এবং সেগুলোর প্রভাব পড়েছে বাঙলা রামায়ণগুলোতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগবত ও কৃষ্ণবিষয়ক রচনা

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের পরে ষোল ও সতেরো শতকীয় অনেক কবিরই ভাগবত ও কৃষ্ণবিষয়ক বাঙলা রচনা পাওয়া গেছে। বৈষ্ণবেরা তো লিখেইছেন, তাঁদের প্রভাবে পড়ে অবৈষ্ণবেরাও পৌরাণিক ও মহাভারতীয় কৃষ্ণের মহিমাকীর্তন করেছেন উচ্চকণ্ঠে। সম্ভবত ষোল শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয় দ্বিজ গোবিন্দের 'কৃষ্ণমঙ্গল'। এটি ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা। এ-শতকের দ্বিতীয় রচনা রঘু পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। মাধব আচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', কবি শেখরের 'গোপাল বিজয়', শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলও' ষোল শতকের রচনা। এ-সময়কার একটি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ তথা তাত্ত্বিক গ্রন্থ হচ্ছে কবিবল্লভের 'রসকদম্ব'। সতেরো শতকে এই ধারায় আরো কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলোতে পৌরাণিক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে বৈষ্ণবীয় প্রভাবই প্রকট হয়েছে বেশী। সতেরো শতকের বৈষ্ণবতত্ত্বগ্রন্থ হচ্ছে ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ'। এ-শতকের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হচ্ছে ভবানন্দের 'হরিবংশ'। পরশুরাম, জীবন, অভিরাম দাস, হরিদাস, যশশ্চন্দ্র, বাণীকণ্ঠ, বংশীদাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ণ বা খণ্ড বিবরণ-কাব্য রচনা করেছিলেন। আঠারো শতকের কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে বলরাম দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত', দ্বিজ রামনাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', শঙ্কর চক্রবর্তীর 'গোবিন্দমঙ্গল', মাধবেন্দ্রের 'ভাগবত সার', দ্বিজ রামেশ্বরের 'গোবিন্দমঙ্গল', প্রভুরামের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত', শিবানন্দের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', যুগল কিশোর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং এমনি আরো অনেকের কাব্যের সন্ধান মিলেছে। এ-ধারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অব্যাহত ছিল।

লৌকিক দেবতার পাঁচালী

রামায়ণ-মহাভারত হচ্ছে আদর্শ অনুশীলনের কৃত্রিম প্রয়াস জাত সৃষ্টি। তাই গোটা মহাভারত অনেককাল জনসমাজে সমাদৃত হয় নি। রামায়ণ বৈষ্ণব-প্রভাবের যুগে বিস্মৃত-প্রায় কাব্য এবং যদিও ভক্তিবাদ সূফীমতের মিশ্রণে প্রেমরূপে মহিমান্বিত রূপ লাভ করে চৈতন্যমতবাদে, তবু তা জীবনকে আড়াল করে অধ্যাত্মলোক সৃষ্টির প্রয়াস বলে বাঙালীর স্বভাব-ধর্মের সঙ্গে এর অকৃত্রিম সঙ্গতি ছিল না। তাই বাঙালী চরিত্রের খাঁটি পরিচয় রয়েছে তার মানস-প্রবণতার অনুগ লৌকিক দেবকল্পনায়। তার জীবন-জীবিকার ইষ্ট ও অরিদেবতা সৃষ্টির কল্পনায়, আদর্শে ও তত্ত্বে প্রকটিত হয়েছে তার চারিত্রিক স্বরূপ লক্ষণ, সমাজ-সংস্কৃতির নকশা। এখানে দেবতাও প্রবল-প্রতাপ মানুষ। মঙ্গলকাব্যে তাই মানুষ আর মানবিক রসই মেলে। মঙ্গলকাব্যগুলো বাঙালী হিন্দুর মন-মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। অর্থই হচ্ছে শক্তির উৎস, ধন যার আছে মান তারই। ধনী বলেই তো রাজা শক্তিমান, রাজার পরে সমাজে সদাগরই ধনী। তাই মধ্যযুগের বাঙলায় বণিক চাঁদ সদাগর-ধনপতি সদাগরেরাই ছিল সমাজের নিয়ামক। বহির্বাণিজ্যে তাদের বাধা ছিল না। তারাই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ধারক ও রক্ষক। তাই লৌকিক দেবতার লক্ষ্যও তারা। মানুষ মুখে যত বড় মহৎ কথাই বলুক, বুকে পোষণ করে জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তার ভাবনা। তাই প্রাকৃত শক্তির প্রসন্নতাকামী কৃষি-নির্ভর রোগভীরু, অজ্ঞ এবং অসহায় মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়তিরূপ দেবতার প্রভাব অনুভব করল যখন, তখন দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় রইল না তাদের। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ধর্মের ইতিহাস হচ্ছে এই পার্থিব জীবনে সুখ ও নিরাপত্তাকামী মানুষের উপ-ও অপ-দেবতা সৃষ্টির ও পূজার কাহিনী। এর ভিতরে কোন অপার্থিব সুমহৎ আদর্শ বা লক্ষ্য নেই। আছে এই মাটিকে—এই জীবনকে ভালবাসার স্বাক্ষর;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ ও শান্তিলাভের নিদারুণ প্রয়াস। মঙ্গলকাব্যগুলোতে তাই দেবলীলার আবরণে বর্ণিত হয়েছে সমকালীন বাঙলাদেশের ও বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিবৃত্ত। ফুল্লরা-খুল্লনা-বেহুলা-রঞ্জাবতী-লখাই-গৌরী কিংবা, লহনা-হীরা-মনসা-চণ্ডী অথবা শিব-চাঁদ-ধনপতি-শ্রীমন্ত-কালকেতু-লাউসেন-কর্ণসেন-কালুডোম আর মহামদ-মুরারিশীল-ভাঁড়ু দত্ত ভালয়-মন্দয় নামভেদে আমাদেরই প্রতিবেশী—আমাদেরই ঘরের লোক।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীদেবী এক নন, অনেক। তাঁদের মধ্যে যিনি পরে তারা-গৌরী-পার্বতী-দুর্গা প্রভৃতি নামে পৌরাণিক আভিজাত্য লাভ করেন, সেই শিবপত্নী চণ্ডীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। চণ্ডী কাব্যের দুটো উপাখ্যান। একটি আদি, যা নিম্নবর্ণের কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনীতে রূপ পেয়েছে। আর একটি পরবর্তী—ধনপতির সদাগর নামেতেই তা তুর্কী আমলের প্রভাব স্বীকার করেছে। চণ্ডী মাহাত্ম্যের 'জড়' পাই 'বৃহদ্ধর্ম' পুরাণে। আসলে এক অনার্য নারী-দেবতা-'চণ্ডী' নামই যার সাক্ষ্য বহন করছে—বৌদ্ধ সমাজে বজ্রতারা রূপে পূজিতা হন, সেই বজ্রতারাই ব্রাহ্মণ্য সমাজে তারা বা চণ্ডী নামের আবরণে গৃহীতা হয়েছেন।

প্রাচীন অনার্য নারী-দেবতা এই চণ্ডী, ইনি শক্তিস্বরূপা, শতাধিক নামে চণ্ডী অনার্য সমাজে পূজিতা হতেন। ক্রমে আর্য সমাজে তিনি শিব বা হর-গৃহিণী রূপে শিবানী, উমা, গৌরী, তারা, দুর্গা প্রভৃতি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, পৌরাণিক যুগে এঁর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অসামান্য রূপে বেড়ে যায়। দশ প্রকার শক্তির আধার রূপে তাঁর দশ মহাবিদ্যার দশমূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে, যথা : কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। চণ্ড-চণ্ডী নামের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রচণ্ড শক্তির আধার রূপে স্বীকার করা হয়েছে। চণ্ডী মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গীয় তথা রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আমলে ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর বালাণ্ডাগাঁয়ে বসে মহাভারত অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে আদি-পৌরাণিক অসুরদলনী গৌরীর অসুরবধ-বৃত্তান্ত 'গৌরীমঙ্গল' রচনা করেন বালাণ্ডার পাশের গাঁয়ের কবি কবিচন্দ্র মিশ্র। অতএব কবিচন্দ্র মিশ্র আমাদের পনেরো শতকের কবিদের একজন।

এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শিব আশুতোষ-ভোলানাথ নামে যোগীতপস্বী হিসেবে নির্গুণ শক্তি স্বয়ম্ভুরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। আর চণ্ডী কালো বলে কালিকা, কালী বা শ্যামা নামে শক্তি দেবতারূপে পূজিতা হতে থাকেন। সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে পড়ে তাঁর উগ্র রৌদ্ররূপ কমনীয় করুণাময়ী রূপে পরিণত হয়। তখন তিনি অন্নপূর্ণা, কমল ও দুর্গারূপে বাঙলাদেশে পূজিতা হতে থাকেন। দুর্গারূপে দশদিক রক্ষার প্রতীক দশপ্রহরণ ধারিণী হিসেবে তাঁর দশভূজা মূর্তি পরিকল্পিত হয়। দুর্গারূপে তিনি শ্যামা নন—গৌরী। অনার্য প্রভাবে এককালে তিন অনার্য দেবতা—বিষ্ণু, শিব ও কালী (চণ্ডী) সর্বভারতিক দেবতা-রূপে পূজিত হন। ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবীয় প্রেমবাদের প্রভাবে বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্তমত তথা সন্তানবৎসল জননীরূপিণী শ্যামা-ভক্তিবাদ বাঙলাদেশে আঠারো শতক থেকে প্রসার লাভ করতে থাকে'। এভাবে চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক 'চণ্ডীমঙ্গল', কালিকামাহাত্ম্য সূচক 'কালিকামঙ্গল, গৌরী পরিচায়ক 'সারদামঙ্গল' ও 'গৌরীমঙ্গল', দুর্গামহিমাজ্ঞাপক 'দুর্গামঙ্গল' এবং মাতৃরূপিণী শ্যামার স্তুতির জন্য 'শ্যামাসঙ্গীত' রচিত হয়েছে। এতে গৌরী-দুর্গা-উমা-কালী এ-চার স্বরূপে তাঁর মহিমা বর্ণিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন মধুর রসের প্রাধান্য, এখানে তেমনি মান-অভিমানের সুরই প্রবল। এই শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন।

চণ্ডী মুখ্যত রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। পশুর ইষ্টদেবী চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু উপাখ্যানে ব্যাধের ইষ্টদেবীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বাহন গোধিকা। মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতির কাহিনী পাঁচালী রূপে লিখিত হওয়ার আগে কথকতার মাধ্যমে চালু ছিল :

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে,
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোনজন..
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
এই সব শুনিতে লোক আনন্দিত।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম লিখিত পাঁচালীর উল্লেখ রয়েছে, মুকুন্দরামের ও মাণিক দত্তের কাব্যে। তাঁরা এক মাণিক দত্তকে চণ্ডীগীতির আদি রচয়িতা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় এক মাণিক দত্তের পাঁচালী পাওয়া গেছে। ইনি মালদহ অঞ্চলের কবি। তাঁর কবিত্বসম্পদ ছিল না বটে, তবে চণ্ডী পাঁচালীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তাঁর কাব্যেই পাচ্ছি। তাঁর কাব্যও রচিত হয় দেবীর স্বপ্নাদেশে এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি স্বয়ং দেবীর বরপুষ্ট নায়ক। ইনি সম্ভবত আঠারো শতকের লোক। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য হচ্ছেন চণ্ডী-পাঁচালীর তৃতীয় কবি। এঁর কাব্যরচনা কাল ১৫০১ শক বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ।

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে কহে সারদা চরিত।

তাঁর কাব্যে অর্জুন-তুল্য বাদশাহ আকবরের স্তুতি আছে। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য পশ্চিমবঙ্গের লোক। সম্ভবত তিনি কর্মজীবনে চট্টগ্রামে বাস করতেন, তাই তাঁর কাব্যগুলো চট্টগ্রামেই ছিল সুলভ।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং ষোল শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের যুগ রূপ-কথার আমল। অলৌকিক দেব-মহিমার কাহিনী বর্ণনা করতে বসেও মুকুন্দরাম তাঁর প্রতিবেশ ভুলতে পারেন নি। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এখানেই। তিনি কাব্যে এক গ্রাম্য পরিবেশে যুগদুর্লভ ঘরোয়া আবহ সৃষ্টি করেছেন। এ হয় তাঁর কল্পনাশক্তির অভাব-প্রসূত, নয়তো তাঁর যুগোত্তর অসামান্য জীবনবোধ, লোকচরিত্র জ্ঞান ও শিল্পীসুলভ তীক্ষ্ণস্বাসিক দৃষ্টির সুফল। চিত্র, নকশা এবং আধুনিক উপন্যাসের আদল এতে আশ্চর্য নৈপুণ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা নাট্যকার দীনবন্ধুর মধ্যে এমনি কবি-দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছি। জীবন-রসে রসিক এই কবির কাব্যের সুষমা তাই আজো অম্লান। বৈষ্ণব প্রভাব-পুষ্ট কবিচিত্তের স্নিগ্ধ সহানুভূতির প্রলেপে চণ্ডীমঙ্গল রসশ্রীমণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবের পরে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

এরপর সম্ভবত বৈষ্ণবমতের ও সাহিত্যের প্রভাববশত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করেনি। রামানন্দ, যতি লাল, জয়নারায়ণ সেন, দ্বিজ কমললোচন, দ্বিজ জনার্দন প্রভৃতি দু'চারজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাই সতেরো শতকে এই ধারার ক্ষীণ ও ম্লান অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। হরিরাম, ভবানীশঙ্কর, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, রামদেব প্রমুখও চণ্ডীর মাহাত্ম্যকথা রচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর 'চণ্ডী' নাম ও কালকেতু-ধনপতি-উপাখ্যান বর্জিত হয়েছে। 'কালিকা' নাম ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়োপাখ্যান দিয়ে নতুন করে 'কালিকামঙ্গল' রচিত হতে থাকে। এতে মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। কেবল কালিকার বরে সন্তান লাভ এবং কালিকার স্তুতির দ্বারা 'সুন্দরের জীবন রক্ষা' ছাড়া এতে কালিকার মঙ্গলকাব্য সুলভ কোনো ভূমিকা নেই। এখানে কালিকা সুপ্রতিষ্ঠিত তথা স্বীকৃত ইষ্ট দেবতা মাত্র।

অবশ্য কালিকামঙ্গলও ষোল শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই রচিত হয়েছে। এর প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ যুবরাজ ও (সুলতান) ফিরোজ শাহর (১৫৩২–৩৩) প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। আর শা'বরিদ খানও ওই শতকের প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করেন। আঠারো শতক অবধি, কালিকামঙ্গলের অন্যান্য কবি হচ্ছেন বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, রাধাকান্ত মিশ্র, রামপ্রসাদ সেন, কবীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাণরাম চক্রবর্তী, নিধিরাম আচার্য প্রভৃতি। ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল'ও একটি কালিকামঙ্গল। তাঁর কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত—দেবীখণ্ড, বিদ্যাসুন্দর খণ্ড ও মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড। শেষোক্ত কাহিনী তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। গোটা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান নানা কারণে অনন্য। তাঁর কাব্যের নামও অভিনব। আঠারো শতকে বর্গী-হার্মাদের হামলা ও য়ুরোপীয় বেণের দৌরাত্ম্য, পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল শাসন, অমাত্য ও সামন্ত প্রাধান্য ও তজ্জাত স্বৈরাচার প্রভৃতি যখন জন-জীবনে অভিশাপরূপে নেমে এসেছে, তাদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ব্যাহত করেছে, তেমনি পরিবেশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। তিনি নিজেও প্রথম জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে নানা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। তাই তাঁর দেবী অন্নদা— অন্নপূর্ণা। আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিকথা দেবীমাহাত্ম্যের আবরণে রচনা করেছেন। কিন্তু স্বধর্মী-স্বজাতিদ্রোহী অখ্যাত ভবানন্দের ঘটনা বিরল জীবন-কাহিনী কাব্যরসসৃষ্টির অনুকূল নয় বলেই ইনি দেবীখণ্ড এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সুকৌশলে কাব্যান্তর্ভুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি, শহুরে কবি, দরবারী কবি, রসিক কবি। তার চেয়েও বড় কথা ভাব, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির উপর তাঁর অসামান্য কর্তৃত্ব। জগৎ ও জীবন, সমাজ ও ধর্ম, মানুষের দোষ ও গুণ, আশা ও হতাশা তাঁর বিকারহীন রস-দৃষ্টিতে তামাসার মতো প্রতিভাত হয়েছে। উদার ও সহিষ্ণু রসিকের মতো তিনি জন-জীবনের সর্বপ্রকার অসঙ্গতি থেকে কেবল বিদূষক-সুলভ রসিকতার উপাদানই খুঁজে পেয়েছেন। বলা চলে এক বেপরোয়া বাচালতার কাব্য এই অন্নদামঙ্গল। এ কাব্য রচিত হয় :

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।

১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২–৫৩ খ্রীস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।'

মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল (১৬৬৯ শকে বা ১৭৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দে) কৃষ্ণজীবন দাসের দুর্গামঙ্গল (১৭শতকের শেষার্ধে), কবিচন্দ্র মিশ্র (১৪৯৭) ও দ্বিজ শিবচরণের গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি চণ্ডীরই বিভিন্ন রূপ ও গুণের পরিচায়ক কাব্য। উল্লেখ্য যে, আজকের বাঙালী হিন্দুরা মুখ্যত শাক্তই। বৈষ্ণবের সংখ্যা কম এবং কেবল শিব উপাসক গৃহী বিরল। অথচ গীতাও সবার মান্য। এ-জন্যই বাঙালী হিন্দু পঞ্চোপাসক বলে অভিহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবায়ন

এই চণ্ডীমঙ্গল ও নাথসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিবের স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যকাহিনী 'শিবায়ন' নামে রচিত হতে থাকে। শিব অতি প্রাচীন সর্বভারতীয় অনার্য দেবতা। তাই তাঁকে কেন্দ্র করে নানা গোত্রীয় ধারণা অসমন্বিত ও বিচিত্র রূপে প্রকটিত হয়েছে। এ-জন্য নানা বিরুদ্ধ গুণে, বিভিন্ন আকারে ও অসংলগ্ন জটিল তত্ত্বে শিব অদ্ভুত মূর্তি লাভ করেছেন। বাঙলা শিবায়নে তাঁর দুই রূপ—দুইধারা। একটি পৌরাণিক, অপরটি লৌকিক। পৌরাণিক ধারায় শিব-চতুর্দশীর গুরুত্বজ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চট্টগ্রামের রতিদেবের মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪) ও রাম রাজার 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ' এই ধারার রচনা।

কৃষির দেবতা চাষী শিবের লৌকিক কাহিনীতেই দরিদ্র বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের অকৃত্রিম আলেখ্য বিধৃত। মেনকা কন্যা বিদায়কালে জামাতা শিবকে মিনতি করে বলছেন : কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি, (আমার মেয়েকে) আঁঠুঢাকি বস্ত্র দিও পেট পুরি ভাত' — কন্যার ভাগ্য সম্বন্ধে পিতা-মাতার চিরন্তন উৎকণ্ঠার এমন মর্মস্পর্শী আন্তরিক প্রকাশ সুদুর্লভ। এই লৌকিক শিবায়ন কাব্যের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের (১৭১০ খ্রী ঃ) কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় শঙ্কর, কবিচন্দ্র, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম প্রমুখও শিবায়ন রচনা করেছেন। মধ্যযুগে দেবকাহিনী প্রায়শ 'মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। আলোচ্য প্রধান শাখাগুলো ছাড়াও বহু উপ-ও অপ-দেবতার মঙ্গল রচিত হয়েছে, যেমন, গঙ্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, শনিমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি। বিশেষ উল্লেখ্য যে, পনেরো শতকের কবি কবিচন্দ্র মিশ্র ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের আগ্রহে অসুরদলনী গৌরীর পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে গৌরীমঙ্গল রচনা করেন। কাব্যে হোসেন শাহর প্রশস্তি রয়েছে। চণ্ডী-গৌরী-কালী-দুর্গা-সারদা বিষয়ক এটিই প্রাচীনতম বাঙলা পৌরাণিক কাব্য।

AMARBOI.COM

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। সে-সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু মানব ও মানবিকতা হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ সদাগর ও বেহুলা গোটা বাঙলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। মনসামঙ্গল কাব্য মুখ্যত পূর্ব বাঙলার দান। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র তীরের সংগ্রামী মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের ও মুসলমানের একেশ্বরবাদের প্রভাব রয়েছে চাঁদ-বেহুলার চরিত্র কল্পনায়। চাঁদ দেবীর কাছে মাথা নত করেনি, সে আত্মসমর্পণ করেছে এক বালিকার অসামান্য সাহস, অধ্যবসায় ও কৃচ্ছসাধনার কাছে। আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন ও কৃতসঙ্কল্প মানুষের ও মনুষ্যত্বের এমনি চিত্র সাহিত্যে বিরল। পনেরো শতকের কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাইর পরে ষোল শতকে কোনো মনসার ভাসান রচয়িতার সন্ধান পাইনে; আমাদের বিশ্বাস বৈষ্ণব পদাবলীর রস-বন্যায় কিছুকালের জন্য অন্য তত্ত্বচিন্তা চাপা পড়ে ছিল। প্রেম-ধর্মের প্রাথমিক আবেগের তরঙ্গ-তোড় অবসিত হলে আবার সতেরো শতক থেকেই মনসামঙ্গল রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। এই শতকে আমরা দ্বিজ বংশীদাস (রামায়ণের কবি চন্দ্রাবতী এঁরই কন্যা), নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, কালিদাস, রসিক মিশ্র, দ্বিজ বংশীদাস সীতারাম দাস প্রভৃতি কবিদের পাচ্ছি। এঁদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস, নারায়ণ দেব ও ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠ। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল আসামে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। ফলে কাব্যের অহমিয়া ভাষায় রূপান্তর ঘটেছে এবং আসামীরা তাঁকে আসামের কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই জানে। তাঁকে কেউ কেউ ষোল শতকের প্রথম পাদের কবি বলেও দাবী করেন। এঁর কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'।

আঠারো শতকের কবি হচ্ছেন জগজ্জীবন, ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, জানকীনাথ, জগন্নাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, বাণেশ্বর প্রভৃতি।

পীর-পাঁচালী

সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের বাঙলা বিজয়ের ফলে বাঙলার সম্পদ তেরো নদীর ওপারে দিল্লীতে চালান হত। তখন গাঁ-গঞ্জের দরিদ্র বাঙালীর জীবনে দুঃখ-দৈন্য চরমরূপ লাভ করে। এসময়ে নিঃস্ব নিরন্ন বাঙালী মন্দিরে-মসজিদে, আল্লাহ-ঈশ্বরের দয়ায় ভরসা হারিয়ে পীর-নারায়ণ 'সত' নামের স্বসৃষ্ট এক লৌকিক দেবতার আশ্রয়, প্রশ্রয় ও জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে সহায়তা কামনা করে। এ-পীর-নারায়ণ সত্যকে অবলম্বন করে রাঢ়-সুহ্মের (আধুনিক প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের) গাঁ-গঞ্জের দীন-দুঃখী অসহায় মানুষ সেদিন জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা সন্ধান করেছিল। বন্যার স্রোতের তোড়ে বিপন্ন সাপ ও মানুষ যেমন এক ভেলায় সহাবস্থান করে, তেমনি সেদিনকার বিপন্ন হিন্দু-মুসলিম সে চরম দুরবস্থায় আপসে অভিন্ন পীর-দেবতা সত্য-আশ্রয়ী হয়ে বাঁচবার ও বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল। মোল্লা পুরুতে একসঙ্গে সিন্নি খায়, 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুই কূলে সেবা লয় হইয়া জাহির।'

সত্যপীর মাহাত্ম্য-কথা ষোল শতক থেকেই রচিত হতে থাকে। ষোল শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর বিজয়', কঙ্ক 'বিদ্যা-সুন্দর' [এতে সত্যপীরের প্রশস্তি রয়েছে] এবং কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। সত্যপীরের হিন্দুচেলা দক্ষিণের রায় (রাজা) এবং মুসলমান ভক্ত বড় খাঁ গাজী। প্রায় ষাট-সত্তর জন হিন্দু কবি ও কিছু মুসলমান কবি সতেরো থেকে উনিশ শতক অবধি সত্যপীর পাঁচালী রচনা করেছেন। 'সত্যপীর' তত্ত্বের প্রভাবে অনেক লৌকিক দেবতা বা কাল্পনিক পীর কাহিনীও লিখিত হয়েছে, যেমন বনবিবি-বনদেবী, শীতলা, ওলা, দক্ষিণরায় বড়খাঁ গাজী, ষষ্ঠীদেবী, কালুগাজী-কালুরায় প্রভৃতি। আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রী পীর-পাঁচালী যথা মোবারক, গোরাচাঁদ, ইসমাইল গাজী, খাঞ্জা খাঁ, [খানজাহান খান], সফীউদ্দীন গাজীর কাহিনী প্রভৃতিও রচিত হয়েছে এ-সূত্রে। পীর-পাঁচালী নিম্ন ও পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। বাউল মতের মতো পীর-নারায়ণ সত্যকে কেন্দ্র করেও নিম্ন ও পশ্চিম বাঙলার সাধারণ ও দুঃস্থ হিন্দু-মুসলমানের এক মিলন ময়দান তৈরি হচ্ছিল। 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুই কূলে সেবা লয় হইয়া জাহির।' পীর-নারায়ণ সত্য এমনকি অল্লো-পরিষদের আল্লাহর মতো এক সময়ে সর্ব-ভারতীয় ও সর্বজনীন দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, ফকির রামদাস, বিকল চট্টো, কৃষ্ণকান্ত, শিবচরণ, রামশঙ্কর, গিরিধর, অযোধ্যারাম, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, জনার্দন, ফকির চাঁদ, ভারতচন্দ্র রায়, ফকির গরীবুল্লাহ, কঙ্ক, আরিফ, ফৈজুল্লাশাহ প্রভৃতি অনেকেই সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখেছেন উনিশ শতক অবধি।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যে রেনেসাঁস আসে, তার ফলে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। বৌদ্ধবিলুপ্তি তার অনিবার্য ফল। বাঙলাদেশের বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানভুক্ত বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় হিন্দুয়ানি আবরণ গ্রহণ করেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুস্থির থাকতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টারই পরিণতি দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্ম' মতবাদে, নাথ যোগীপন্থে, বৈষ্ণব সহজিয়াবাদে ও বাউল মতে।

বৌদ্ধ-বিলুপ্তি সত্ত্বেও নাথ-সাহিত্য লুপ্ত হয় নি, কারণ যোগতাত্ত্বিক বিষয় বলে হিন্দু যোগীর ও মুসলমান সুফীর কাছে তা' সমাদৃত ছিল। তাই ময়নামতী-মানিকচাঁদের গান, গোরক্ষবিজয়, যোগী কাচ প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক রচিত হয়েছে। ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় (১৫৭৫), সতেরো শতকের কবি ভবানীদাসের ময়না-মতীর গান, আঠারো শতকের দুর্লভ মল্লিক ও শুকুর মুহম্মদের 'গোপী-চাঁদের সন্ন্যাস' এবং পুরোনো গাথা প্রভৃতি এই ধারাকে প্রবহমান রেখেছে।

সহজযানপন্থী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা এই সময়ে ইসলাম ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তাদের বিশ্বাস-সংস্কার তখনো তারা জিইয়ে রাখে। ফলে বৈষ্ণব থেকে বৈষ্ণব-সহজিয়া, মুসলমান ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ থেকে বাউল মত গড়ে ওঠে। চর্যাগীতি এদেরই ঐতিহ্য এবং বৈষ্ণব সহজিয়াপদ ও বাউল গান চর্যাগীতিরই আধুনিক রূপান্তর। হিন্দু সমাজের নাথ-যোগীরা (পেশায় তাঁতী) পুরোনো বৌদ্ধ নাথপন্থেরই ধারক।

বৌদ্ধ আদিনাথ ও বজ্রতারাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা শিব-তারা নামের আবরণে পূজা করতে থাকে। এবং গোরক্ষনাথ, মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধসিদ্ধা প্রবর্তিত সাধনপন্থ ও শৈব নাথপন্থ রূপে পরিচিত হয়। ফলে এগুলো শৈবমতের শাখারূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর পূজারীর ধর্মঠাকুর মূলত অনার্য সূর্যদেবতা। বৌদ্ধ আমলে বৌদ্ধের ত্রিশরণের অন্যতম প্রমূর্ত 'ধর্ম'-রূপে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের পর নিম্নবর্ণের দেবতা ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হচ্ছেন। তাঁর মাহাত্ম্য-কথাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের পার্থক্য এই যে, ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত নির্বিবাদী দেবতা। কাহিনীতেও বৈচিত্র্য এবং বিস্তার আছে। এক বিস্তৃত পরিসরে রাজা আর ভিখারী, অভিজাত ও ডোম, ন্যায়নিষ্ঠা ও শাঠ্য, বাহুবল ও কূটকৌশল, বিদ্রোহ ও বিপর্যয়, বিগ্রহ ও বশ্যতা, গার্হস্থ্য সমস্যা ও রাজসভার দুশ্চিন্তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসব কারণে ধর্মমঙ্গলগুলো বিশিষ্ট রচনা। এখানে বাঙলার বিশেষ করে প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের সর্বস্তরের নারী-পুরুষের জীবন-যাত্রার বাস্তব চিত্র বিধৃত রয়েছে। রাজসভার ছল-চাতুরী, প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন-বিদ্রোহ, সন্ধি-বিগ্রহ, বীরত্ব-মহত্ত্ব প্রভৃতির চিত্র যেমন আছে, তেমনি রয়েছে ধনী-নির্ধনের ঘরোয়া জীবনের প্রেম-ঈর্ষা, ক্ষমা-প্রতিহিংসা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা, উল্লাস-যন্ত্রণা ও আশা-হতাশার আলেখ্য। কাহিনী সুসংবদ্ধ নয় বটে, কিন্তু মহামদ কর্ণসেন-কালু-লখাই-রঞ্জাবতী-লাউসেন-ইছাই প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে লিখিত রূপ অর্বাচীন। কিন্তু এগুলোতে যে-সব কাহিনী ও সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র রয়েছে তা প্রাচীন। এদিক দিয়ে এ-সাহিত্য বাঙলার ও বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ।

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মপূজা-বিধান' হচ্ছে এ মতের শাস্ত্রগ্রন্থ। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'টি (কলিমা জলাল) এই শূন্যপুরাণেই পাওয়া গেছে। ফিরোজ শাহ তুগলকের উড়িষ্যা বিজয় উপলক্ষে এটি রচিত বলে অনুমান করা হয়। এ-উপাখ্যানে কেউ কেউ বিস্মৃত সামাজিক ইতিহাসের ছায়া লক্ষ্য করেন। ধর্মমঙ্গলের আদি লেখক বলে ময়ূর ভট্ট নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। বিলুপ্ত ধর্মপাঁচালীর আর এক কবির নাম ছিল রূপরাম। ইনি সাহিত্যের ইতিহাসে আদি রূপরাম নামে চিহ্নিত। যাঁদের পাঁচালী পাওয়া গেছে, তাঁদের অনেকেই ব্রাহ্মণ। উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মঠাকুরের স্বীকৃতি আদায়ই হচ্ছে এসব মঙ্গল রচনার পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো শতক থেকেই ধর্মমঙ্গল রচিত হতে থাকে। খেলারাম চক্রবর্তীও ধর্মপাঁচালীর আদি লেখক বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর কাব্যও পাওয়া যায়নি। সতেরো শতকের আর যেসব কবির নাম মেলে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, যাদবনাথ, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস প্রমুখ। এঁদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী প্রধান। আঠারো শতকে পাচ্ছি ঘনরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামচন্দ্র, নরসিংহ বসু, দ্বিজ প্রভুরাম, হৃদয়রাম সাধু, শঙ্কর চক্রবর্তী, নিধিরাম গাঙ্গুলী, দ্বিজ গোবিন্দ রাম, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, রামকান্ত রায়, দ্বিজ রাজীব প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী কবিত্বে ও জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ। এঁদের অধিকাংশের 'রাম'-যুক্ত নাম প্রাচীনতর শাস্ত্র-সংস্কারের আভাস দান করে।

৬

লোকসাহিত্য

বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাগীতি, ডাক ও খনার বচন ছড়া, প্রবচন, প্রবাদ, রূপকথা, ব্রতকথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত (অপ্রাপ্ত), ময়নামতী-মানিকচাঁদ গোপীচাঁদ গীত, মীননাথ-গোরক্ষনাথ-হাড়িপা কাহিনী, ধর্ম ঠাকুরের কথা, চণ্ডী-মনসার কথা, যজ্ঞকথা, শিবের পাঁচালী, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালী, ভারত পাঁচালী প্রভৃতি। এগুলো মুখে মুখে ফিরেছে বলে এগুলোর ভাষা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু কাহিনী প্রাচীন। তেমনি তুর্কী-মুঘল আমলের নির্দশন হচ্ছে ব্রতকথা, গাজীর গীত, সত্যপীর, ওলাবিবি প্রভৃতির কাহিনী, মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, পীর-মাহাত্ম্যকথা, বাউলগান, আদ্যের গম্ভীরা, ঝুমুর, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি এবং ব্রিটিশ যুগের ও হাল আমলের লোক-সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাউল, ভাটিয়ালী ও কবিগান। এবং সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নানা গান, গাথা, কবিতাও লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। এর মধ্যে কবিওয়ালার ও কবিগানের উদ্ভবের আলাদা সামাজিক, সাংস্কৃতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এ-হচ্ছে যুগসন্ধি কালের বিপর্যস্ত জীবনের সাক্ষ্য অথবা পূর্ব-প্রাভাতিক অন্ধকারের (predawn darkness-এর) প্রতিরূপ।

স্থানীয় কবি, গায়েন ও কথক কর্তৃক আঞ্চলিক বুলিতে স্থানীয় নিরক্ষর লোকের উদ্দেশে মুখে মুখে রচিত বলে লোকসাহিত্য অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে সর্ববঙ্গীয় হতে পারেনি। এজন্যে লোকসাহিত্য মাত্রই আঞ্চলিক। এবং কালে কালে বহু মুখের স্পর্শেও পরিচর্যায় এগুলো ভাবে বিচিত্র, ভাষায় কালোপযোগী, ভঙ্গিতে চাহিদানুসারী এবং কল্পনায় পল্লবিত হয়েছে বলে লোকসাহিত্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ গণ-রচনা রূপে পরিচিত। অতএব ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে ও কাহিনী-বিন্যাসে লোকসাহিত্য যুগে যুগে নবকলেবর পরিগ্রহ করে যুগের চাহিদা মিটিয়েছে, এবং নতুন বিষয়ে হয়েছে পুষ্টি। লোকসাহিত্য নিরক্ষরতার দান তথা অশিক্ষিত অক্ষম প্রাকৃতজনের সৃষ্টি। এক হিসেবে তা সমাজের নির্জিত-শোষিত-পীড়িত-শাসিত জনগণের প্রাকৃত মন-মননের সৃষ্টি। প্রাকৃত বা লোক (Folk) সংস্কার, আচার-আচরণ কিংবা সাহিত্য-শিল্প উচুঁমানের ও পরিমার্জিত হয় না। কাজেই আমাদের অতীতের জীবনধারার সাক্ষ্য হিসেবে এ-সবের মূল্য অপরিসীম হলেও একালে শহুরে শিক্ষিত মানুষের লোকসাহিত্য সৃষ্টি এবং লোক-সংস্কৃতি জিইয়ে রাখা বাঞ্ছিত হতে পারে না। কেননা মানুষকে অবাঞ্ছিতভাবে অজ্ঞ অনক্ষর অপরিশীলিত না রাখলে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি হওয়া বা আধুনিক রূপে চালু থাকার কথা নয়। 'লোক'-শব্দটিই অবজ্ঞাজ্ঞাপক। এতে নিঃস্ব নিরক্ষর চাষামজুরকে গেয়ো বর্বর বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমান করা হয়। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ও ময়মনসিংহ-গীতিকা লোকসাহিত্যের তথা বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাস্তবতায়, মানবিকতায় ও জীবন চেতনায় এগুলো অনন্য। এতে ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ মেলে গাথাগুলোতে। গীতিকাগুলোর রচনাকালের পরিধি ষোল থেকে আঠারো শতক অবধি বিস্তৃত। গাথাগুলোর অধিকাংশই বিয়োগান্তক বা ট্র্যাজিক পরিণামজ্ঞাপক। আমরা জানি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রই ট্র্যাজেডি। দেওয়ান-মদিনা, মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, সখিনা প্রভৃতি বহু গাথা আমাদের বেদনা-সুন্দর সাহিত্যসম্পদ। যৌবনবতী রূপসীর বিড়ম্বিত জীবনই অধিকাংশ গাথার বর্ণিত বিষয়।

বলেছি, এ-দেশে তুর্কী-মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ধর্মচর্চার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাঙলা তখনো মুখের বুলির স্তর পার হয়নি। এ-ভাষায় যে কিছু লেখা যায়, এ-ভাষাও যে সাহিত্যের ভাষা হতে পারে, তা তখনো কোনো গুণীজন ভাবেননি। অশিক্ষিত জনগণ তাদের বুলিতে মুখে মুখে গান, গাথা, ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা ও উপকথা রচনা করে মনের ভাব প্রকাশ করত। এ ছাড়াও দেবতার পূজা করবার কিংবা তাঁর কাছে সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা নিজে নিবেদন করবার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র রচনে-পঠনে-শ্রবণে শূদ্রের ও নারীর অধিকার ছিল না বলে জনগণ কথকতার মাধ্যমে দেবকথা ও ধর্মকথা জানবার চেষ্টা করত। এভাবে রামের ছড়া, ভারতকথা, কৃষ্ণ-ধামালী, মনসা ও চণ্ডীর কথা, ব্রতকথা প্রভৃতি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল। কিন্তু 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরং নরকং ব্রজেৎ'।—ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিদের এ-রকম কঠোর পাঁতি ছিল বলে কেউ সে-সব লিখবার ও পড়ে শুনাবার সাহস পায়নি।

তাছাড়া সেন আমলে সাধারণ লোকের বিশেষ করে শূদ্রের লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না। অতএব মুসলিম বিজয়ের আগে এদেশে বাঙলায় কিছু লিখিত হয়নি। চর্যাগীতিরও এ-দেশে লিখিত রূপ চালু ছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। কাজেই "আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গ ভাষার। [এই লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হইবার] সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল"। তাই নিরঞ্জনের রুস্মাতে কেবল নিপীড়িত বৌদ্ধদের স্বস্তি ও উল্লাস ধ্বনিত হয় নি, বাঙলা ভাষারও সুদিনের আভাস সূচিত হয়েছে। তুর্কী-আফগান শাসকের প্রশ্রয়ে ও প্রতিপোষণে সম্ভবত চৌদ্দ শতকের শেষ বা পনেরো শতকের গোড়া থেকেই বাঙলা লিখিত রূপ পেতে থাকে। এজন্য এ-সময় থেকেই কৃষ্ণ-ধামালী, মনসার ভাসান, রামায়ণ-কথা ও ভারতকথা পাঁচালী রূপে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ-বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ 'পালাগীতি' লুপ্ত হয়েছে এবং ময়নামতী-গোপীচাঁদ কথা যোগ সম্বন্ধীয় হওয়ায় যোগপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান দ্বারা রক্ষিত হয়, এবং মুসলমানদের হাতে যোগীর কাহিনী বলে গোরক্ষনাথ কাহিনী কিংবা ময়না-গোপীচাঁদ কাহিনী যথাক্রমে ষোল ও আঠারো শতকে পাঁচালী পর্যায়ে উন্নীত হল। মৌখিক রচনায়ও ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়েছিল। নইলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) কিংবা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাষার এমন অর্থবহ বিকশিত রূপ পেতাম না। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ব্যবহৃত গোটা বারেক আরবী ফারসী শব্দ থেকে বোঝা যায় এ-সময়ে দরবার আর দরবারী ভাষাও লোকপরিচিত এবং লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব মুসলমানেরা কেবল বাঙলা সাহিত্য স্রষ্টা নয়, লেখ্য বাঙলার সৃষ্টি সহায় এবং পোষ্টাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

রাজকীয় প্রতিপোষণ

এ-কথা না বললেও চলে যে, তুর্কী-আফগান সুলতান-সুবাদারের আগ্রহে, উৎসাহে, প্রশ্রয়ে ও প্রতিপোষণেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য লেখ্য রূপ লাভ করে। শাসিতদের শাস্ত্র, সমাজ, নিয়মনীতি, রীতিপদ্ধতি প্রভৃতির প্রয়োগের ধরন ও প্রভাবের গভীরতা এবং সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিকভাবে তাদের মন-মেজাজের রূপ ও মনন-চিন্তনের স্বরূপ জানা ভাষা-সাহিত্য আর শাস্ত্র-শাসনবিধিই জানা-বোঝার প্রশস্ত মাধ্যম। উৎসাহদানের মূলে সুলতানদের এ-গরজের প্রেরণা ছিল। যেমন ধর্মপ্রচার ও প্রাশাসনিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলে বাঙলা গদ্যের চর্চা হয়, অনূদিত হয় হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্র ও শাসন সম্পৃক্ত আইন-কানুন।

গঠনযুগে ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তুর্কী-আফগান সুলতান-সুবাদারের আগ্রহে সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলোর বাঙলা অনুবাদ শুরু হয়। কেবল তা-ই নয়, এ-ব্যাপারে বাঙালী মুসলমানও অগ্রণী ছিল। গৌড়-সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর আমলে (১৩৮৯–১৪১০ খ্রীঃ) কর্মচারী শাহ মুহম্মদ সগীর 'কিতাব চাহিয়া ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯–৭৪) অভিপ্রায় অনুসারে কৃত্তিবাস অনুবাদ করেন 'রামায়ণ'। বারবক শাহ ও তাঁর পুত্র সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর আমলে 'গুণরাজ খান' মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদ করেন (১৪৭৪-৮০ খ্রীঃ) আর জায়নুদ্দিন রচনা করেন 'রসুল বিজয়'।

বরিশালের ফুলিয়া (ফুল্লশ্রী) গাঁয়ের বিজয়গুপ্ত (১৪৮৫ খ্রীঃ) জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ওর্ফে হোসেন শাহর আমলে (১৪৮২-৮৬ খ্রীঃ) পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে মনসার ভাসান রচনা করেন। মধ্যবঙ্গে বিপ্রদাস পিপিলাই(১৪৯৪ খ্রীঃ) মনসামঙ্গল ও কবিচন্দ্র মিশ্র 'গৌরীমঙ্গল' (১৪৯৭) রচনা করেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে। সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী শাসক (Military Governor) পরাগল খানের সহকর্মী কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'পরাগলী মহাভারত' এবং তাঁর পুত্র ছুটি খানের সভাকবি শ্রীকর নন্দী 'ছুটি খানী অশ্বমেধ পর্ব' রচনা করেন। হোসেন শাহর পৌত্র ফিরোজ শাহর আদেশে সংস্কৃত কাহিনীর অনুসরণে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ)। পদ রচনা করেন সৈয়দ আফজল। কবিশেখর বিদ্যাপতি আর যশোরাজও তাঁদের পদে নাসির শাহ (নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ) ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহর স্তুতি করেছেন আকবরের আমলে মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, শাহজাহানের আমলে গদাধর দাস (জগন্নাথমঙ্গল ১৬৪৩ সনে), শায়েস্তা খাঁর আমলে কৃষ্ণরাম দাস। আবার সামন্তের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে দৌলত উজির বাহরাম খান, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, মুকিম প্রমুখ অনেকেই কাব্য রচনা করেন।

চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত। আর আরাকানের রাজধানী ছিল মোহং (Mrauhang)। এর বিকৃত বাঙলা নাম রোহাং বা রোসাঙ। রোসাঙের বাঙালী মুসলমান রাজমন্ত্রী আশরাফ খানের আগ্রহে কাজী দৌলত (১৬২২-৩৫) অনুবাদ করেন হিন্দি কবি মিয়া সাধনের অধ্যাত্ম রূপক কাব্য 'ময়নাসৎ'। এর বাঙলা নাম 'সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী'। মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান, নবরাজ মজলিস প্রমুখ রাজমন্ত্রীর আদেশে যথাক্রমে পদ্মাবতী সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, রতন কলিকা-আনন্দবর্মা, তোহফা, সপ্ত পয়কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সেকান্দরনামা অনুবাদ করেন আলাউল। এভাবে কারো না কারো প্রতিপোষকতায় মধ্যযুগীয় ধারার অনুবাদের কাজ এবং মৌলিক কাব্য রচনায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি চলেছে।

মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুরা সংস্কৃতের ভাষাকে ধর্মকথা তথা লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই কেবল ব্যবহার করতেন, মালাধর বসুর কথায় 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার।' —এ-উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হননি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করাবার জন্য তাঁরা প্রেম ও বিরহ-কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং এতে সাহিত্যশিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয় মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক সম্ভাব্য কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষার ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য-সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেনি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্য ধর্ম-সম্পৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। কেবল আঠারো শতকেই কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। আর্যেরা প্রকৃতিপূজক ছিল। আর্য-প্রভাবে উপমহাদেশের জনগণ প্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তোয়াজে-তারিফে তুষ্ট করে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা খুঁজেছে চিরকাল। ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পদানত করে জীবনকে বিপন্মুক্ত করবার চেষ্টা দেখা যায়নি কখনো। এভাবে বাঙালী হিন্দুর মন-মানসে সাহস স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে পারে নি। ফলে দেবতা ও অপদেবতার কাল্পনিক অনুকম্পানির্ভর জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে অনেকাংশে। এ-বিকৃত মন-মানসের স্বাক্ষর রয়েছে পুরাণমিশ্রিত মঙ্গলকাব্যে ও অন্যান্য পাঁচালীতে। সংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদী মুসলমানের সংস্পর্শে আসার ফলেই এদেশী হিন্দুর প্রাণে-মনে মানবাত্মার মহিমা এবং মানবিক শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অভিনব বোধ জাগে। মুসলিম প্রভাবে এই মানবমহিমা ও মানবিকতার উদ্বোধনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে মানবাত্মার অপরিসীম মহিমা ও সম্ভাবনার বাণীবাহী বৈষ্ণব মতের, আর পূর্ব বাঙলার নদী-নির্যাতিত সংগ্রামী মনে জেগেছে পৌরুষ; দেবদ্রোহিতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও মর্যাদাবোধ যেমন হয়েছিল দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তি-ভিত্তিক সন্তধর্মের উদ্ভব। তাই মনসামঙ্গলের বিকাশ-ভূমি পূর্ব বাঙলা। মনসার ভাসান দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার আত্মা হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ সদাগর আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক শক্তির প্রতীক। তিনি মাথা নোয়ালেন দেবতার পায়ে নয়, একটি কিশোরীর অনমনীয় কৃচ্ছ সাধনার কাছে। চাঁদ বেনে ও বেহুলা বাঙালী পুরুষ ও নারী। মানুষকে এ-স্বরূপে ইতিপূর্বে বাঙালীর রচনায় আর দেখা যায়নি। ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার যে বাঙালীর চিত্তলোকে বাসন্তী হাওয়া বয়ে আনে, তাদের মানসজগৎ যে নবজীবনের সংস্পর্শে বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্য আর বৈষ্ণব মতবাদ ও সাহিত্য। মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য দেশদুর্লভ নতুন ভাব, চিন্তা, রস ও আত্মবিশ্বাসপুষ্ট জীবনবোধের আকর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্য

বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ-যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষকতা পেয়ে পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, মুসলমানেরা তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানগণের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে ধর্ম-প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্য তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য আমরা তাঁদের হাতেই পেয়েছি। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ-দেশের হিন্দু ও মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ তাদের ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বাঙ্গীকরণে সহায়তা করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু গোঁড়ামিপ্রবণ হিন্দুর পক্ষে ছয়শ' বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য—প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেন নি।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে অর্থাৎ বিস্ময়-ব্যাকুল কল্পচারী মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানস-সৃষ্টি দেব-দানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতূহল চোখে-দেখা মানুষের প্রতি নিবদ্ধ হল। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল, মানুষকেও জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের, লৌকিক ও অলৌকিকের, স্বপ্ন ও কল্পনার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোনো সীমারেখা স্বীকৃত নয় এ-জগতে। নদী-নগরীর, মরু-কান্তারের ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দেব-দানব-রাক্ষসের, ভূত-প্রেত-জীনের এবং বুনো পশু-পাখী-সরীসৃপের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ-জগৎ। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ, সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায় সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ-সাহিত্যে পরিব্যক্ত।

ভারতবর্ষে আরবী-ইরানী-তুর্কী-মুঘল অধিকার যেমন আরবী-ইরানী-তুর্কী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ-দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দুস্তানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

৯

উপাখ্যান

হিন্দুরচিত সাহিত্য যেমন মুখ্যত অনুকৃতি, বাঙালী মুসলমান রচিত সাহিত্যও তেমনি প্রধানত অনুবাদ। গোটা মধ্যযুগব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের বাঙলা রচনা অনুকৃতিতে ও অনুবাদে সীমিত। এ অসম্পূর্ণ শিক্ষার ও অসামর্থ্যেরই সাক্ষ্য। এঁদের রচনা পরিমাণে প্রচুর কিন্তু উৎকর্ষে বিশিষ্ট নয়। আমাদের মুকুন্দরাম যখন চণ্ডীমঙ্গল লিখছেন, তখন শেক্সপীয়র লিখছেন তাঁর কালজয়ী নাটক। এতেই বোঝা যায় উনিশ শতকের আগে বাঙলা কখনো প্রতিভার পরিচর্যা পায়নি। তাই তারা লাটিমের মতো কেবলই ঘুরেছে, কিন্তু পাঁচশ' বছরেও ভাষায় ও সাহিত্যে এতটুকু অগ্রসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। মূলত, ফারসী ও হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম ও যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থগুলো। অনুবাদ সাধারণত তিন প্রকারের হত—কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অর্থাৎ আক্ষরিক,স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবানুসরণ। সেকালে অনুবাদ ক্বচিৎ আক্ষরিক হত। হিন্দি ও ফারসী প্রণয়োপ্যাখ্যানগুলো সাধারণত সূফীতত্ত্বের তথা জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান রূপেই। তত্ত্বকথাকে এ-ভাবে রস-কথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে ঐহিক জীবনবাদী বাঙালী মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবগান, বাউল-মুর্শিদ-মারফতী প্রভৃতি অধ্যাত্ম গীতির দেশে এ মানবিক রস-প্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বাঙালী চরিত্রের একটি নুতন দিগদর্শন। এদিক দিয়ে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯–১৪১০) 'ইউসুফ-জোলেখা'ই সম্ভবত গোটা আধুনিক উপমহাদেশীয় সাহিত্যে প্রথম লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান।

সে যুগের হিসেবে বাঙলা রোমান্টিক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র নয়। চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ অবধি তার ইতি ঘটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ আর ভাবে-ভঙ্গিতেও বৈশিষ্ট্যহীন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ওসব রচনার আর কোনো সাহিত্যিক মূল্যই নেই আর সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো শতক অবধি রচিত জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি।

চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা। ষোল শতকে পাচ্ছি দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহবারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে দোনা গাজীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'। কাজী দৌলতের 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী', আলাউলের 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', 'সপ্ত পয়কর', 'রতন কলিকা', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমোতি সয়ফুলমুলক', 'ইউসুফ জোলেখা', নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাউলি', পরাগলের 'শাহপরী', মঙ্গলচাঁদের 'শাহজালাল-মধুমালা', সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মুলক শামারোখ', আবদুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', শরীফ শাহর 'লালমোতি সয়ফুলমুলক'। আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে মুহম্মদ রফিউদ্দিনের 'জেবল মুলক শামারোখ', শাকের মাহমুদের 'মনোহর মধুমালা', নুর মুহম্মদের 'মধুমালা', ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রজার 'তমিম গোলাম চতুন্নছিলাল', 'মিশরীজামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহপরী মল্লিকাজাদা', 'হাসান বানু', আবদুর রাজ্জাকের 'সয়ফুলমুলুক লালবানু', শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ' এবং মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহরাম গোর', 'কামরূপ কালাকাম', খলিলের 'চন্দ্রমুখী' প্রভৃতি। উনিশ শতকে কবি চুহর 'মধুমালতী', 'আজরশাহ-শামারোখ' প্রভৃতি, বাকের আলি চৌধুরী 'মনুচেহের মাহসুমাপরী', সৈয়দ নাসির 'বেনজির বদর-ই-মুনীর', মুন্‌শী মুহম্মদ মুকিম 'কালাকাম', 'মৃগাবতী', তমিজী 'লালমোতি তাজলমুলুক', মুহম্মদ মুকিম 'গুলেবকাউলি' এবং দোভাষী শায়েরেরা বিভিন্ন উপাখ্যান তর্জমা করেন। মুসলিম প্রভাবে আঠারো-উনিশ শতকের কয়েকজন হিন্দুও প্রণয়োপাখ্যান লিখেছেন। সুশীল মিশ্রের 'রূপবান-রূপবতী' উপাখ্যান, বাণীরাম ধরের 'শীত-বসন্ত' কাহিনী, রামজী দাসের 'শশিচন্দ্রের পুথি', দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী', মহেশচন্দ্র দাসের 'সয়ফুল তমিজ জরুখভান', গোপীনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসের 'মনোহর মধুমালতী' এ-যাবৎ আমাদের হাতে এসেছে। এ-সবের মধ্যে 'ইউসুফ জোলেখা', 'লায়লী মজনু', 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী', 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক', 'লালমোতি সয়ফুলমুলুক', 'মধুমালতী', 'গুলেবকাউলি' ও 'চন্দ্রাবতী' কাব্যগুণে, কাহিনী-মাধুর্যে কিংবা বৈদগ্ধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১০

তত্ত্বসাহিত্য

মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন জিজ্ঞাসা রয়েছে, তারই মনোময় জবাব খোঁজ হয়েছে আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কিত রচনায়। বাস্তবধর্মী শক্তিমানের জিজ্ঞাসা মানুষকে করেছে বিজ্ঞানী, ভাববাদীদুর্বলকে তা-ই করেছে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। একই জিজ্ঞাসা আপাত বিরোধী দু'কোটির চিন্তার ও কর্মের প্রেরণার জন্ম দিয়েছে। এই একই জিজ্ঞাসা কাউকে দিয়েছে বহির্দৃষ্টি, কাউকে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। বহির্দৃষ্টি মানুষকে করেছে বিষয়ী ও বিজ্ঞানী। অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে করেছে রহস্যবাদী, গড়ে তুলেছে অধ্যাত্মবাদ, দিয়েছে বৈরাগ্য বা ইহবিমুখতা, জাগিয়েছে জীবনেতর জীবনের পিপাসা। বৈরাগ্য প্রাচ্যের মানসসম্পদ আর বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য। দু'টোরই মূল প্রেরণা জিগীষা। একটার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, অপরটার কাম্য দুনিয়া জয়। একটার সম্বল হৃদয় ও মনোবল, অপরটার হাতিয়ার বুদ্ধি ও বাহুবল। একটি হৃদয়বৃত্তির লীলা, অপরটি প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি।

তত্ত্বচিন্তা মানুষকে তিন মার্গের সন্ধান দিয়েছে—জ্ঞানের, কর্মের ও ভক্তির। জ্ঞানবাদ আস্তিক্য, নাস্তিক্য ও সংশয়প্রবণ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। কর্মবাদ সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলেছে আর ভক্তিবাদ হয়েছে নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের উৎস এবং ভক্তিবাদের উপজাত (by product)—কারুর কারুর মতে পরিণতি হচ্ছে সূফী-বৈষ্ণবের প্রেমবাদ।

বাঙলা ভাষায়ও এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হয়েছে : এগুলো ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও অধ্যাত্ম প্রেমগীতি। এখানে উল্লেখ্য যে, আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত শাস্ত্র ও ধর্মকথা বাঙলায় অনুবাদ করলে তার পবিত্রতা, মাহাত্ম্য ও মহিমা বিনষ্ট হবে আশঙ্কায় লেখকদের ও সাধারণ মুসলিমদের মনে পাপভীতি জাগে। তাই শাস্ত্রকথা অনুবাদে পনেরো-ষোল এমনকি সতেরো শতকের গোড়ার দিকেও লেখক-পাঠক-শ্রোতা-মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। লেখকরা নিন্দা পেয়েছেন, বাধাও পেয়েছেন কেউ কেউ। নিঃসংশয় না হয়েও যাঁরা অনুবাদ ও ধর্মকথা প্রচারে এগিয়ে আসেন, তাঁরা হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, মুজাম্মিল, হাজী মুহম্মদ, শেখ মুত্তালিব, আবদুর নবী প্রমুখ। নিঃসংশয় ছিলেন কেবল রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিম।

১. মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ। (শেখ মুত্তালিব)

২. লোক উপকার হেতু তেজি সেই (পাপ) ভয়। (আবদুন নবী)

৩. মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেত পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি। (সৈয়দ সুলতান)

আবার একই কারণে গোড়ার দিকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের হিন্দু অনুবাদকগণও হয়েছেন স্বধর্মীর কাছে নিন্দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুণ ঘেঁষে।
এ তিন সর্বনেশে।

কিংবা ২. অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

ক. ধর্মসাহিত্যে উল্লেখ্য হচ্ছে : নেয়াজ ও পরানের (১৬ শতক) কায়দানী কেতাব, খোন্দকার নসরুল্লাহর (১৮ শতক) হেদায়তুল ইসলাম, শরীয়তনামা (১৭৫৫), শেখ মুত্তালিবের (১৬৩৯ খ্রীঃ) কিফায়তুল মুসল্লিন, আলাউলের তোহফা, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৮ শতক) হাজার মোসায়েল, দুল্লা মজলিস, আশরাফের (১৭ শতক) কিফায়তুল মুসল্লিন, আবদুল্লাহর (১৮ শতক) নসিয়ত নামা, আলী রজার (১৯ শতক) সিরাজকুলুব, কাজী বদিউদ্দীনের (১৮ শতক) সিফৎ-ই-ঈমান, সৈয়দ নাসিরউদ্দিনের (১৮ শতক) সিরাজ সবিল, বালক ফকির ও মুহম্মদ মুকিমের (১৯ শতক) ফায়দুল মুকতদী, সৈয়দ নুরুদ্দিনের (১৮ শতক) দাকায়েকুল হাকায়েক, রুহুনামা, রাহাতুল কুলুব, মুহম্মদ আলীর (১৮শতক) হায়রাতুল ফেকাহ্, হায়াৎ মাহমুদের হিতজ্ঞানবাণী, সর্বভেদ-বাণী প্রভৃতি।

খ. তত্ত্ব সাহিত্যে সাধারণত যোগ ও সূফী সাধন-তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। সমাজ ও ধর্মের আচারগত প্রভেদ সত্ত্বেও শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তরালে দুটো ভিন্নাদর্শ জাতির মধ্যে কি নিবিড় প্রাণের যোগ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে এ-ধরনের রচনায়। জীবনের যে চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাত, ধর্ম ও সমাজ চেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। মানস-সংস্কৃতির এরূপ লেন-দেন, এমনি আত্মিক যোগাযোগ চিরকালই মানুষের চিত্ত-প্রসারের ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছে।

ইরানী সূফী সাধনাও যৌগিক প্রক্রিয়ানির্ভর। ভারতবর্ষের যোগ-সাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে সূফীদের দেহ-চর্যায় যোগশাস্ত্রের গভীর প্রভাব পড়ে। সূফীদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়ে উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যিনি উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁর নাম শেখ শরফুদ্দীন বু আলী কলন্দর শাহ (মৃত্যু, ১৩২৪ খ্রীঃ)। তাঁর প্রবর্তিত সাধন পদ্ধতির বাঙলা নাম 'যোগ কলন্দর'। পানিপথে তাঁর সমাধি আছে। উত্তর ভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর তাঁর খ্যাতি আজো ম্লান হয়নি। এক সময়ে বাঙলায় কলন্দরপন্থী বৈরাগীর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, কলন্দর বলতে মুসলিম বৈরাগীই বোঝাত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে

কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি।
ঋণ কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর।

এই তত্ত্ব বা সূফী সাহিত্য পাই ষোল শতকের শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', অজানা কবির 'যোগকলন্দর', কবি হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা' বা 'নুরজামাল', সতেরো শতকের কবি শেখচান্দের 'হর-গৌরীসম্বাদ', 'শাহদৌলাপীর' বা 'তালিব নামা', আবদুল হাকিমের 'শিহাবুদ্দীননামা' ও 'চারিমোকামভেদ', মীর মুহম্মদ সফীর 'নূরনামা', আর আঠারো-উনিশ শতকের কবি আলি রজার 'আগম-জ্ঞানসাগর', কাজী মনসুরের 'শির্নামা', 'শেখ জেবুর আগম', শেখ জাহেদের 'আদ্য পরিচয়', রমজান আলীর 'আদ্যব্যক্ত', মোহসীন আলীর 'মোকাম মঞ্জিলের কথা' প্রভৃতিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. সওয়াল সাহিত্য : এ-সাহিত্যকে সেকালের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বলা যেতে পারে। প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে জ্ঞানানুশীলনের রীতি সুপ্রাচীন, এ-ধরনের গ্রন্থে জগতের ও জীবনের নানা রহস্য চিন্তা, হেঁয়ালি ও সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, জীবতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, আচার-ব্যবহার বিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর রয়েছে : শেখ সাদীর 'গদা-মালিকা', সেরবাজ চৌধুরীর 'ফক্করনামা' বা 'মালিকার সওয়াল', এতিম আলমের 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল', আবদুল হাকিমের 'নূরনামা', আকিলের 'নূরনামা' ও 'মুসানামা', সৈয়দ নুরুদ্দীনের ও নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'মুসার সওয়াল' প্রভৃতি এ-জাতীয় গ্রন্থ। শেখচাঁদের 'হরগৌরীসম্বাদ' প্রভৃতিও যোগগুহ্য সাধন সম্বন্ধীয় সওয়াল সাহিত্য।

ঘ. সাধন ও ভজনসঙ্গীতরূপে পাচ্ছি : রাধাকৃষ্ণরূপক গীতি, বাউল গান ও অন্যান্য অধ্যাত্মসঙ্গীত।

রাধাকৃষ্ণ রূপকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমবিষয়ক সূফীমতের অধ্যাত্মসঙ্গীত যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মীর ফয়জুল্লাহ, মির্জা কাঙালী, সৈয়দ মোর্তুজা, নাসির মাহমুদ, সৈয়দ সুলতান, চাঁদ কাজী, আলাউল, ফাজিল নাসির মুহম্মদ সৈয়দ আইনুদ্দীন, মোহসেন আলী, আবাল ফকির, পীর মুহম্মদ, বকশা আলী, এবাদুল্লাহ, শেখ ভিখন, শেখ ফতন (ফতেহ), আলিমুদ্দিন, মনোহর, আফজল, শমসের আলী, আলি রাজা, এর্শাদুল্লাহ, সর্ফতুল্লাহ, আলি মিয়া, মোহাম্মদ হানিফ, কমর আলি, চম্পা গাজী, মোহাম্মদ হাসিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বাউল গান আমাদের তত্ত্ব-সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলিম প্রভাবে তথা সূফী মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও সংযোগে বাউল মতের আধুনিক রূপান্তর হয়েছে সত্য, কিন্তু এর মূল রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আদিকাল থেকেই যে-কোন ধর্মে দৈহিক শুচিতাকে মানসশুচিতার সহায়ক বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। সাংখ্যে, যোগে, বৌদ্ধদর্শনে ও সূফী সাধনতত্ত্বে দেহের বিশেষ মূল্য রয়েছে। দেহের আধারে যে-চৈতন্য, সে-ই তো আত্মা। এ-নিরূপ-নিরাকার আত্মার স্বরূপ মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ-থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে –দেহযন্ত্র-নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহ-যন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এ-ভাবেই সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়া অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এদেশের অধ্যাত্ম সাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র ভারতবর্ষের আদিম অনার্য শাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা দেখা যায়। বাঙলায় পাল আমলের তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখাই প্রাচীন যুগে সহজিয়া গানে ও মধ্যযুগে বৈষ্ণব-সহজিয়া পদে আর পরবর্তীকালে বাউল গানে রূপ পেয়েছে।

উনিশ শতকের আগে রচিত বাউল গান দুর্লভ। বাউল গানের প্রধান কবি ফকির লালন সাঁই, শেখ মদন, পাগলা কানাই, তিনু, আতর চাঁদ শ্রীনাথ, নলিন চাঁদ হীরালাল, মেছেল চাঁদ সদাই সাঁই, খেদমত সাঁই, ইরফান সাঁই, শীতলাং সাঁই, গোপাল প্রমুখ।

'মুরশিদা-মারফতী' এ-ভুল নামে দেহতত্ত্ব-নির্ভর গুরুবাদী কায়াসাধন ও আত্মবোধনমূলক সাধন, ভজন ও তত্ত্ব-গানের কবি হচ্ছেন সৈয়দ শাহনুর, মুন্সী হোসেন বুরহানি, ফজলুল শিকদার, সাওয়াল শাহ (রমজান আলী), খতিশাহ (আবদুল মজিদ), উসমান, উমর আলী, হেকিম আবদুল মালেক, সৈয়দ আবদুল বারী, হাসান উদাস, শেখ কিনু প্রমুখ এবং চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার খানকার ভক্তগণের রচিত গানগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিকাংশ তথাকথিত মুর্শিদা-মারফতী গানে বাউল প্রভাব লক্ষণীয়। এগুলোর সঙ্গে হামদ-নাতের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব-তুর্কী বিজয়ের পরে হিন্দুর ও মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্মের ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে পরে উত্তর ভারতে এবং সবশেষে বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজে যে আলোড়ন হয়, তার বাহ্যরূপ ছিল ধর্মের ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ তজ্জাত ভক্তিবাদ ও ইসলামের সূফী তত্ত্বই এসব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম, এবং বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বাউল মত সূফী মতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। কাজেই আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা হয়। তাই দেহাধারস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত।

ক. সখীগো জন্ম-মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্ব সার।
তীর্থব্রত যাঁর জন্য
এই দেহে তাঁর সব মিলে।

খ. খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তাহার পায়।।
এ দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

বাউলেরা তাঁদের ভাষায় 'অচিন পাখী', অলখসাঁই (অলক্ষ্য স্বামী); 'মনের মানুষ' বা 'মানুষ রতন'-রূপ আত্মা তথা পরমাত্মাকে জানবার সাধনা করেন। বৈষ্ণব বা সূফীর মতো এঁরা প্রেমিক নন, যোগীর মতো তাত্ত্বিক। মুর্শিদা-মারফতী ও বাউল গান আমাদের লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। বাউলেরা উদার মানবতাবাদী। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। বাউল মতবাদকে ও সত্যপীরকে কেন্দ্র করে বাঙলার নিম্ন-বিত্তের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব হয়েছিল।

জীবনী সাহিত্য

মুসলমান কবিগণ এক বিরাট জীবনী সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের চরিতকথাগুলো একাধারে জীবনী, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম-কথা ও কাহিনীকাব্য, এসব চরিতাখ্যান তেমন নয়। এখানে বাস্তব-অবাস্তবের, লৌকিক-অলৌকিকের কিংবা প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সীমারেখা মানা হয়নি। এখানে কল্পনা ইতিহাসাশ্রিত নয়। চরিতাখ্যানের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে জৈনুদ্দিনের 'রসুল বিজয়' (১৪৭৩ খ্রীঃ), সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (১৫৮৬ খ্রীঃ), শাহ বারিদ খানের 'হানিফার বিজয়' ও রসুল বিজয় 'শেখ ফয়জুল্লাহর 'গাজী বিজয়', শেখ চাঁদের 'রসুল বিজয়', নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'জঙ্গনামা', আবদুন নবীর 'আমীর হামজা', গরীবুল্লাহর (পশ্চিমবঙ্গ) 'ইউসুফ-জোলেখা', 'আমীর হামজা', সৈয়দ হামজার (পশ্চিমবঙ্গ) 'আমীর হামজা', হাতেম তাই', উজীর আলীর 'নসলে উসমান ইসলামাবাদ' (কুলজী-মূলক) এবং বিভিন্ন কবির 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'সিফাতুল আম্বিয়া' ও অন্যান্য আওলিয়া কাহিনী প্রভৃতি। এগুলো রচিত হয়েছে মুখ্যত মুসলমানদের মুসলিম ঐতিহ্য-গর্বে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঙ্গনামা

কারবালা কাহিনী নিয়েও অনেক যুদ্ধকাব্য ও মর্সিয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এগুলো সাধারণত 'জারি' ও 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। এ-বিষয়ক ফারসী কেতাব মক্তুল হোসেনকে আদর্শ করেই বাঙলা জঙ্গনামাগুলো রচিত হয়েছে। বাঙলায় মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামার আদি কবি দৌলত উজির বাহরাম খান (১৬শতক)। দ্বিতীয় কবি শেখ ফয়জুল্লাহ, ইনি 'জায়নবের চৌতিশা' নামে বিলাপ রচনা করেন। তৃতীয় কবি মুদম্মদ খান। ইনিই জঙ্গনামার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'মক্তুল হোসেন'। এঁর পরে যাঁরা জঙ্গনামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হায়াৎ মাহমুদ, জাফর, গরীবুল্লাহ, সফীউদ্দিন, সা'দ আলী, আলি মোহাম্মদ, জিন্নাত আলী, হামিদুল্লাহ খান, আবদুল ওহাব, রাধাচরণ গোপ, মুহম্মদ মুন্সী, আবদুল হামিদ ও জনাব আলীর নাম উল্লেখ্য। কারবালা যুদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু আমাদের পুথিকারেরা অলৌকিক ও অপ্রাকৃত-কাহিনী সংযোগে তাকে রূপকথায় পরিণত করেছেন। এ-ছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধ কাহিনী রয়েছে—'রসুল বিজয়', 'আলির জঙ্গনামা', 'জয়কুমরাজার লড়াই', 'হানিফার লড়াই', 'হামজার দিগ্বিজয়', 'জঙ্গে বদর', 'জঙ্গে খয়বর' প্রভৃতি। ইসলামের উন্মেষ যুগের এসব গৌরবগাথা রচনা করে মুসলমানকে স্বাজাত্যগর্বী ও স্বধর্মনিষ্ঠ করবার প্রয়াস ছিল কবিদের।

বিবিধ রচনা

এ-ছাড়া রাগ-তাল, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তুক্‌তাক্ প্রভৃতি নানা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। বারমাসী কিংবা চৌত্রিশা কোন বিশেষ বিষয়ক রচনা নয়। বারমাসীতে মাস ও ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার (কৃচিৎ নায়কের) হৃদয়ের বৃত্তি-প্রবৃত্তির রূপান্তরের—বিশেষ করে বিরহ ব্যথার,—চিত্র অঙ্কিত হয়। আর বাঙলার চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে এক বা একাধিক পংক্তির আদ্যক্ষর রূপে প্রয়োগ করে যে-পদবন্ধ রচনা করা হয়, তাকেই চৌত্রিশা বলে। প্রায় সব পুথিতে বারমাসী ও চৌতিশা পাওয়া যায়। এগুলো সেকালের সাহিত্যশিল্পের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

দোভাষীরীতি

সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'রায়মঙ্গল' নামক কাব্য বড় খাঁ গাজীর মুখে ভাঙা হিন্দি প্রয়োগ করেছিলেন, সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন সত্যনারায়ণ পাঁচালীকার ও ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি অবাঙালী পাত্র-পাত্রী মুখে বিকৃত হিন্দুস্তানী ব্যবহার করেছেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে হাওড়াবাসী কবি ফকির গরীবুল্লাহ (মৃ. ১৮৮০?) প্রথম বাঙলা ও হিন্দুস্তানী বাকধারার মিশ্রণে তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা', 'সোনাভান', 'মদন কামদেব পালা' (সত্যপীর পাঁচালী) ও 'জঙ্গনামা' (হোসেন মঙ্গল) রচনা করেন। এই রীতির নাম দোভাষী রীতি। এ-ভাষার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ আরবী-ফারসী ও হিন্দি শব্দাধিক্য) শব্দ এবং হিন্দি বাক্য-গঠন-রীতির প্রভাব প্রসূত তেরা, মেরা, এয়সা, যেয়সা প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ। আঠারো শতকে গরীবুল্লাহর অনুসরণ করেন হাওড়াবাসী সৈয়দ হামজা (১৭৩২-১৮০৮ খ্রীঃ)। উনিশ-বিশ শতকে হাওড়া-হুগলীবাসী কবি মালে মুহম্মদ, জনাব আলি, মুহম্মদ খাতের প্রমুখ বহু কবি দোভাষী রীতিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু হাওড়া, হুগলী ও কলকাতা অঞ্চলের বাইরে কোথাও মুসলমানেরা এ-রীতি অনুকরণ বা চর্চা করেনি।

কাজেই দোভাষী রীতি ব্রজবুলির মতো একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। নতুন বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব এবং তার চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দি-বাঙলা মিশ্র-ভাষী অধিবাসীরাই এর স্রষ্টা এবং ধারক। দোভাষী সাহিত্য ইংরেজ আমলের রাজধানী ও বন্দর অঞ্চলের অর্থাৎ কলকাতা-হাওড়া-হুগলী এলাকার নির্জিত আধা বাঙালী মুসলমানের মন, মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। রোমান্স থেকে শরীয়ত-কথা অবধি সব বিষয়েই দোভাষী গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু এগুলো ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গিতে সাহিত্য হয়নি। তবু গত দেড়শ' বছর ধরে বাঙলার অশিক্ষিত জনসাধারণের রস-পিপাসা ও জিজ্ঞাসা মিটিয়ে আসছে এ-সাহিত্য। বিকল্প পাঠ্য পুস্তকের অভাবে সবাইকে পড়তে-শুনতে হয়েছে বলে একে জনপ্রিয় সাহিত্য বলে মনে করবার হেতু নেই। আকালে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ যা খায় তাকে পুষ্টিকর সুখাদ্য বলে না, ওতে ধড়ে প্রাণ যদি-বা টিকে থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। দোভাষী পুথিও মানস আকালের সাহিত্য। যাঁরা এ-সাহিত্যে রচনা করেছেন তাঁদের বর্তমান ছিল অনিশ্চিত আর ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। তাই তাঁরা আশ্রয় খুঁজেছেন কল্পলোকে এবং অতীতের গৌরবময় ও আনন্দোচ্ছল জগতে একটু শ্রান্তিহর ও গ্লানিমুক্ত স্বস্তির ভরসায়। অতএব, জীবন-বিমুখ কল্পনাশ্রয়ী এ-সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের, মনের বা মাটির যোগ ছিল না, এ হল পরগাছা।

দোভাষী পুথিতে কেউ কেউ মুসলমানদের গৌরবের সামগ্রী খুঁজে পান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গরীবুল্লাহর আবির্ভাব পলাশী যুদ্ধের পরে এবং তাঁর গ্রন্থগুলি রচিত হয় ১৭৬০—৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের এবং রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক ভাঙাগড়ার এ-সময়টিতে জীবন-জীবিকার যে-বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, বর্গীর হাঙ্গামা ও কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে ধন-প্রাণের উপর আকস্মিক বিপদ-পাতের যে-শঙ্কা জেগেছিল, তাতে কারো পক্ষেই রসচর্চা করা সম্ভব ছিল না। তবু মানুষ যেহেতু স্থবির নয় এবং শারীর ক্ষুধার মতো মানস-ক্ষুধাও মেটাতে হয়, সেহেতু নিতান্ত গরজে পড়ে কাজ-চালানো গোছের রসচর্চা তাকে করতেই হয়েছে। সুখ-সৌভাগ্যে যেমন রাজধানীর লোকেরই অগ্রাধিকার, দুঃখ-নির্যাতনেরও তেমনি তারাই প্রথম শিকার। এ রাষ্ট্রিক, আর্থিক, তজ্জাত নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদ ও নতুন বন্দর কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের লোক যখন দিশেহারা, তখনো দূরাঞ্চলে সে-হাওয়া পৌঁছেনি। কলকাতায় তখন বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী কিন্তু চরিত্রহীন, ঘরছাড়া বেপরোয়া লোকের ভিড় জমেছে। কলকাতা তখন দালাল, বেনিয়া, জোচ্চোর ও ঠকের আড্ডা। এ-বাজারে ইংরেজ-বাঙালীর চারিত্রিক ভেদ ছিল না। অযোগ্য ও দুশ্চরিত্র লোকের হাতে টাকা এলে যা হয় তাই হল; এসব হঠাৎ-নবাবেরা ধরাকে সরা জ্ঞানে উদ্দাম হয়ে উঠল। স্বল্প লোকের এ-শ্রেণীটা ছাড়া বাকি লোকের জীবন তখন সবপ্রকার অনিশ্চয়তায় ম্লান। এমনি পরিবেশে কলকাতার হিন্দুসমাজে 'কবিওয়ালা' আর মুসলমান সমাজে ' শায়ের'-এর উদ্ভব। দুটো নামই তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক। প্রশ্ন হতে পারে, কোম্পানীর প্রত্যয়-পুষ্ট কৃপাজীবী হিন্দুরা যখন কোম্পানীর অযাচিত অনুগ্রহে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, তখন হিন্দুসমাজে কেন এল বন্ধ্যা যুগ? উত্তরে এটুকু বললেই চলে যে আপামরে বিলাবার মতো কৃপার পুঁজি তখনো কোম্পানীর হাতে আসেনি; বিশেষত দেশের কোটি মানুষের জীবনে যখন দুর্যোগ-দুর্দিন নেমে এসেছে, তখন গুটিকয় সুখী মানুষের অন্তর্জীবনেও স্বস্তি থাকতে পারে না। দূষিত আবহ তাদের অবচেতন মনে নিশ্চিতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়— 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'?

দোভাষী পুথিতে যে ইসলামী আবহ-সৃষ্টির তথাকথিত প্রয়াস আছে, তাও লজ্জাকর। নিন্দা বা প্রশংসা করবার জন্যও যোগ্যতা চাই। অযোগ্য মুখে নিন্দা বা প্রশংসা দুই ব্যাজস্তুতি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। ফকীর গরীবুল্লাহ ছিলেন পীর-পূজারী, তাও লোক-শ্রুতির কাল্পনিক পীর দেবকল্প বড় খাঁ গাজী। তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সত্যপীরও তার অন্যতর জীবন-নিয়ন্তা। দোভাষী শায়েরেরা ইসলামের উন্মেষ যুগের নানা বীরের ও দেবকল্প নানা পীরের কাহিনী নিয়েই প্রধানত পুথিগুলি রচনা করেছেন। যে-কথা বিজাতিরা বললে মুসলমানেরা রুষ্ট হয়, 'সেই একহাতে কোরআন আর হাতে তরবারী' নিয়ে রসুল, হযরত আলী, হামজা হানিফা প্রমুখ দিগ্বিজয়ীরা পরাজিত রাজা ও অধিকৃত রাজ্যের মানুষকে বল প্রয়োগে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে মুমীনের কর্তব্য করলেন বলে উল্লাস ও কৃতার্থ বোধ করেছেন। তাঁদের পুরনারীরা পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মল্লযুদ্ধে নেমেছেন। হিন্দুর দেব-কাহিনীর অনুকরণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পটভূমিকায় আল্লাহ, রসুল ও ফেরেস্তার সমবায়ে দেবকল্প মুসলিম বীরের ও পীরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ-যেন বাস্তব জীবনে গ্লানি ভুলবার জন্য ইসলামের গৌরবদিনের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে পরপীড়িত জাতির আত্মপ্রবোধ লাভের অপপ্রয়াস। সূফী ভাবের নানা কাহিনী রচনায়ও আদর্শ চেতনা সর্বত্র দেখা যায় না। আবার শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা-বোধ থেকে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার সহায় হিসেবে উপদেবতার উদ্ভব হয়েছে। কেবল সত্যপীরের নয়, বনবিবি, ওলাবিবি, কালুগাজী, বড় খাঁ গাজী, উদ্ধার বিবি, বাস্তুবিবি প্রভৃতির পূজা শিরনীও চালু হল একেশ্বরবাদী মুসলমান সমাজে। এঁদের সম্বন্ধে কাহিনী গড়ে ওঠে ষোল শতকে কিন্তু এঁদের মাহাত্ম্যকথা তথা পীর-পাঁচালী রচিত হয়েছে মুখ্যত উনিশ-বিশ শতকে। কাজেই এ-সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্যোগ-দুর্দিনের ঐতিহাসিক দলিল— গৌরবের কিংবা গর্বের সামগ্রী নয়। এ Predawn darkness নয়— অমাবস্যার তমিস্রা। রেনেসাঁসের নয়— পতনের ও গ্লানির প্রতিচ্ছবি। অতএব এ আত্মবিকাশ কল্পে আত্মবিস্তার প্রয়াস নয়। এমনি দুর্দিনের সাক্ষ্য বাঙলার ইতিহাসে আরো রয়েছে, এমনি দুর্যোগের ঘনঘটা আগেও বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছে, তখনো অসহায় বিমূঢ় বাঙালী অনুরূপ দিশেহারা ভাব দেখিয়েছে।

বাঙালীর জীবন ও মননধারা

যখনই সামাজিক ও আর্থিক জীবনে নিরাপত্তার ও স্বস্তির অভাব ঘটেছে, তখনই বাঙালী অধ্যাত্ম জীবনের বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ ত্যাগ করে জীবন-জীবিকার সহায় শক্তিদেবতার সন্ধান করেছে; আর দেবতার কৃপাজীবী হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তাই আমরা পালরাজাদের পতন যুগে নৈরাত্ম্য-নিরীশ্বরবাদী নির্বাণকামী বৌদ্ধ-সমাজকে অসংখ্য দেবদেবীর স্তব-স্তুতিতে মুখর দেখতে পাই। মাটির মায়ামুগ্ধ জীবনবাদী বৌদ্ধরা অমরত্বের ও চিরসুখের প্রত্যাশায় যোগতান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে দৈব শক্তিধর হয়ে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে জীবনোপভোগের প্রয়াসী হয়ে উঠল। তুক-তাক-দারু-টোনার শক্তি আয়ত্ত করে বৌদ্ধ ডাকিনী-যোগিনীরা কামাচার-সর্বস্ব যে-বীভৎস জীবনলীলা শুরু করল, তা রূপকথার আকারে আজো ভয়ঙ্কর, চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর হয়ে চালু আছে। রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ বৌদ্ধের জীবন-জীবিকার সহায়ক দেবতা হিসেবে এক আদিম সূর্যদেবতা ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হতে থাকেন।

শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানবাদের প্রভাবে বাঙলাদেশেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসনকালে তাঁদের প্রতিপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলার লোকধর্মে পরিণত হল, আর তাদের বিরূপতায় বৌদ্ধমত লোপ পেল। এই সেনদের মন্দার দিনে তুর্কী বিজয়ের কিছু আগে থেকেই সুমহৎ বেদান্ত দর্শনে আস্থা হারিয়ে বাঙালী জনসাধারণ আবার তাঁদের অনার্য সংস্কারানুসারী পার্থিব জীবন-জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজায় ব্রতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের গরজে। মনসা ও চণ্ডীই এঁদের মধ্যে প্রধান। অপর দিকে গীতগোবিন্দে ও শেখ শুভোদয়ায় বাঙালীর চারিত্রিক শৈথিল্য ও কাঙাল মনের পরিচয় পাচ্ছি।

তুর্কী পরাজয়ে পেলাম সত্যপীর, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, কালুরায়-কালু গাজী, বনদেবী-বনবিবি, শীতলা-ওলা-ষষ্ঠী-বাস্তুদেবী প্রভৃতি আর মুঘল শক্তির পতনে পেলাম বিদ্যাসুন্দর ও পীর পাঁচালী আর কবিওয়ালা ও শায়ের।

বাঙলাদেশে তথা পাক-ভারত-বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রথমত ও প্রধানত সূফী সাধকদের মাধ্যমে [৬০]। দেশী প্রাকৃত জন ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, দরবেশ প্রচারকদের কেরামতির আকর্ষণে ও প্রভাবেই ইসলাম বরণ করেছিল। কাজেই শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড় হয় নি। তবু গৌড়-সুলতানদের আমলে ইসলাম জনমনে কিছুটা জাগ্রত ছিল। কিন্তু ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশে নামত মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুঘলেপাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্তশক্তির মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছিল এবং তার ফলে যে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল [আসলে শের শাহর বঙ্গ বিজয় (১৫৩৯ খ্রী) থেকেই এর শুরু] তাতে প্রাকৃতজনের ধন-প্রাণ নিরাপদ ছিল না। আকবর-জাহাঙ্গীরের আমল এভাবে কেটে যাওয়ার পর যদিও শাহজাহান-আওরঙ্গজীবের আমলে দেশে শক্তির দ্বন্দ্ব ছিল না, তবু সাত সমুদ্র না হোক, তেরো নদীর ওপারের দিল্লী শাসনে জনগণের আর্থিক দৈন্য ঘোচেনি। কেননা আর সব সাম্রাজ্যবাদীর মতো মুঘলেরাও ছিল কেবল শাসনে তৎপর ও শোষণে উৎসুক, প্রজার হিতসাধনের দায়িত্ব নেয়নি তারা। শাহজাহানের আমলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং মঘ-হার্মাদ দৌরাত্ম্যে মানুষ ত্রাসের মধ্যে বসবাস করত, আর আওরঙ্গজীবের আমলে বেনে স্বেচ্ছাচার বেড়ে গিয়ে নতুন উপসর্গ হয়ে চেপেছিল। এ-সবের সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হল বিদ্রোহ-বিগ্রহ, বর্গী বর্বরতা, সুবাদারের স্বেচ্ছাচার, সামন্ত স্বৈরাচার ও বেনে দৌরাত্ম্য। তারপর পলাশী-উত্তর অর্ধ শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও আর্থিক দুর্গতি মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। এমনি বিপর্যয়ের মুখে দেশজ মুসলমানেরা ও হিন্দুরা রাজশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে অগত্যা জীবনের ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য উপদেবতা সৃষ্টি করে পূজা-শিরনী দিতে থাকে। এরূপে ষোল শতকের শেষপাদ থেকে সত্যনারায়ণ-সত্যপীর, বনদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালুগাজী, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, শীতলা-ওলা, ষষ্ঠী-উদ্ধার-বাস্তুদেবী-বিবি হিন্দু-মুসলমানের পূজা পেতে থাকেন। অন্যদিকে নিম্ন ও উত্তর-পশ্চিম বাঙলার কিছু সংখ্যক বাঞ্ছাহত লোক বাউল-বৈরাগী জীবনে আত্মপ্রসাদ খুঁজতে থাকে। অবশ্য রাজধানী থেকে দূরে এবং সুফলা বলে পূর্ববাঙলায় এসব উপদেবতার প্রভাব কমই পড়েছে এবং চট্টগ্রামে শরীয়ত অনুগ ধর্মসাহিত্য ষোল শতকের শেষপাদ থেকেই রচিত হতে থাকে। অবশ্য ১৬৬৬ সন অবধি উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সন অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্তই ছিল, কাজেই সেদিক দিয়ে চট্টগ্রাম বাঙলার বাইরে এবং সেকারণে উপদ্রুত অঞ্চলও নয়। ষোল শতক থেকে বাঙালীর প্রধান দেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর। হিন্দু যে-কিছুকে 'নারায়ণ' ভাবতে পারে, কিন্তু একেশ্বরবাদী মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই মুসলমান নারায়ণকে পীরের মর্যাদা দিয়েছে। এঁকে অবলম্বন করেই মুঘল আমলে দুঃখী ও বিমূঢ় হিন্দু-মুসলমান জীবনের ও জীবিকার দুর্দিনে এক মিলন ময়দানে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তাদের এ মিলন-রাখী হল 'সত্য' (truth) এবং প্রমূর্ত সত্যই যুগপৎ সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর নামে পূজা-শিরনী পেতে থাকেন দুঃখীর দেবতা রূপে। ষোল শতক থেকে আজ অবধি ষাট-সত্তর জন সত্যনারায়ণ পাঁচালীকারই এর অপ্রতিহত প্রভাবের সাক্ষ্যদান করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র জিগির! এখানো কি অলীক যুক্তবঙ্গের হিন্দু ভূতের ভয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে। একদিকে রাষ্ট্রপতি দেশে সবাইকে বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী হতে আহ্বান জানান আর বাইরে আত্মপরিচয় দেন মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে; অন্যদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-মুদ্রিত বিকৃত বাঙলা কেতাবে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাই প্রকট। বাঙালী মুসলিম কি কখনো দৈশিক ও ঐহিক জীবনের চিন্তাচেতনা নিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী রূপে আত্মোপলব্ধির ও আত্মবিকাশের পথে এগুবে না, কেবল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা স্বপ্নে এবং অতীতের ও বিদেশের মুসলিম কৃতিগর্বে বিভোর থাকবে? আমরা কি চিরকাল কেবল মুসলিমই থাকব, বৈষয়িক ঐহিক মানুষ হব না?

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৮১

ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাঙলাদেশ

১৯৭১ সালের সংগ্রামের ও সাফল্যের বয়স প্রায় দেড়দশক হতে চলল। কাল নিরবধি বলে মহাকালের পটে পনেরো বছর নগণ্য বটে, কিন্তু আজকের যন্ত্রযুগে সংহত পৃথিবীতে চৌদ্দ-পনেরো বছরের এ কাল পরিসর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আর্থিক সামাজিক রাজনীতিক বিবর্তন ধারায় কিংবা চিন্তা-চেতনার জগতে তুচ্ছ নয়, সে কারণে ইতিহাসেও এ কাল পরিসর গুরুত্বহীন নয়।

এ পনেরো বছরে স্থিতধী বাঙালী নিশ্চয়ই আবেগমুক্ত হয়েছেন, প্রয়োজনের তাগিদে ও আবেগ বশে ইতিহাস সচেতন মননশীল বিদ্বানেরাও যুদ্ধকালে অনেকের অনেক অসত্য উক্তি ও ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এখন জাতি হিসাবে স্বস্থ ও সুস্থ হওয়ার প্রয়োজনে সত্যসন্ধ, তথ্যনিষ্ঠ এবং নিরুচ্ছ্বাস হতে হবে আমাদের। এখন তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও পরিণাম জানতে বুঝতে হবে, নিরূপণ করতে হবে ভাবী পন্থা, পাথেয়ও করতে হবে নির্ধারণ ও সংগ্রহ। অর্থাৎ কোন হিতকর উদ্দেশ্যে ও কোন লক্ষ্যে জাতি হিসাবে আমাদের এগুনো বাঞ্ছনীয়, তা জাতীয় স্তরেই সুপরিকল্পিত ও সুনির্ধারিত হওয়া আবশ্যিক। নইলে সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাজ ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের সরকার ও আমলা স্ব স্ব স্বার্থেই দেশের আর্থিক রাষ্ট্রিক স্বার্থ নিয়ে যে-ব্যবসা করছে, তা কোন দিন বন্ধ হবে না। কারণ এমনি সরকার ও আমলা গোষ্ঠী চরিত্রে জুয়াড়ী। ব্যক্তি জুয়াড়ী যেমন পরিবারকে পথে বসায়, সরকারি জুয়াড়ীও রাষ্ট্রকে দীন দুর্বল ও মর্যাদাহীন করে।

আমাদের জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে ব্রিটিশ-ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সব সময়েই কেবলই প্রতিহত হবে স্বাধীন ভারতে, এ কারণ আশঙ্কায় মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বা বাসভূমি কামনা করেছিল মুসলমানরা মুসলিমলীগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের জন্য সংখ্যানুপাতে চাকরি ও পরিষদ সদস্যপদ এবং এমনিতর সবক্ষেত্রে সংখ্যানুগ স্বার্থ রক্ষার দাবি পেশ করার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদায়ের জন্যই লর্ড মিন্টোর পরামর্শে ১৯০৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় মুসলিমলীগ নামে সর্বভারতীয় রাজনীতিক সংস্থা। বহুকাল এ সংস্থা ছিল জনসম্পর্ক বিরহী উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের মুসলিম নেতাদের সমিতি।

১৯৩৭ সনের পর থেকে উত্তর ভারতে ধনী মানী মুসলিমদের নেতৃত্বে এবং বাঙলার জমিদার শোষিত চাষী মজুর ও চাকরিকামী কিন্তু বাবুদের দ্বারা বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিমদের সমর্থনে মুসলিমলীগ বাঙলায় এবং ধনেমানে প্রবল কিন্তু সংখ্যায় দুর্বল মুসলিমদের বিহারে ও উত্তর প্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যায় গুরু মুসলিম অধ্যুষিত এখনকার পাকিস্তানের কোথাও সে-দিন মুসলিমলীগ শিকড় গাড়তে পারেনি। কারণ সে-অঞ্চলের মুসলিম মনে আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দু প্রবলতার ভীতি ছিল অনুপস্থিত। আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ভীতিই যে মুসলিমদের পাকিস্তান দাবির উৎস, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল তখনই, পাকিস্তান দাবির বিকল্প হিসাবে ১৯৪৫ সনে যখন ব্রিটিশ সরকারের দেয়া ব্রিটিশ ভারতে আঞ্চলিকবর্গে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ সাগ্রহে গ্রহণ করল। জওহরলালের মুখে কংগ্রেসী কাপট্যের আভাস পেয়েই শঙ্কিত জিন্নাহ পরে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূল কারণ সংখ্যাগুরুর আর্থিক প্রাশাসনিক শোষণ-পীড়ন ভীতি হলেও পাকিস্তান দাবির উচ্চারিত যুক্তি ছিল মুসলিমদের জাত-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম দুটো জাতি। কাজেই পাকিস্তানদাবির মূলে ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। ১৯৪৭ সনে লর্ড মাউন্টব্যাটন কার্যত পকিস্তানদাবি মেনে নিলেও এ দাবির ভিত্তি যে দ্বিজাতি তত্ত্ব তা গ্রহণ করেননি এবং এমনকি জিন্নাহকেও দ্বিজাতি তত্ত্বে আস্থা পরিহার করতে বাধ্য করেছিলেন। তার ফলেই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিলেটে গণভোট গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে।

যদিও মুসলিমলীগের ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যা-গুরু অঞ্চল নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটো রাষ্ট্রগঠনের দাবি ছিল তবু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ঐক্যের কিংবা অভিন্নতার আবেগ বশে ১৯৪৬ সনের দিল্লী কনভেনশনে মুসলিমলীগ সদস্যগণ অভিন্ন ও একক পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ সিদ্ধান্তের রূপায়ণে পাকিস্তানের রাজধানী হল করাচি এবং পরে রাওয়ালপিণ্ডি বা ইসলামাবাদ। এখনকার পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সারাকি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুশ্ত, বালুচ, গুজরাটি প্রভৃতি ছিল ১৯৪৭ সনে অবিকশিত— প্রায় বুলির স্তরে। তাই তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ নিজেদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবার যোগ্য বলে কল্পনা করেনি। ফলে এ ব্যাপারে তাদের কোন দাবি বা বক্তব্য ছিল না এবং উর্দুর বিরুদ্ধেও ছিল না কোন আপত্তি, যদিও উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই (লাহোর শহর ছড়া) ভাষা ছিল না, এমনকি জনগণের বোধ্য ভাষাও ছিল না, সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বড়ো আমলাদের ও সেনাপতিদের প্রায় সবাই ছিল উত্তর ভারতের উর্দু ভাষী, আর কোলকাতা থেকে লাহোর অবধি প্রতাপে প্রবল মুসলিমলীগ নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া উর্দুর পক্ষে আর একটি প্রবল যুক্তি ছিল যে-জাত-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে হাসিল হল, অঙ্গে ও আত্মায় সে-স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণবাহী হচ্ছে উর্দু, আরবী হরফ, ফারসী। কাজেই পাকিস্তানকামী মুসলিম মাত্রই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাদরে সাগ্রহে বরণ করতে রাজি। ঢাকা শহরের শিক্ষিত বাঙালীরা দেখল, কেবল উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হলে উত্তর ভারতের উর্দুভাষীদের (এরাই তখনকার পাকিস্তানের মালিক, ভোক্তা ও নিয়ন্তা) সঙ্গে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা করতে পারবে না, তা ছাড়া বাঙালী মুসলিমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতো শিক্ষা, ভাষা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুন্নত নয়। এদের ভাষা রবীন্দ্রসম্পদে পুষ্ট বিশ্বনন্দিত। কাজেই উর্দুর পাশে বাঙলার ঠাঁই হওয়া চাই। স্মরেণ্য যে, যুক্তি হিসাবে কোন কোন বাঙালী পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হিসাবে বাঙলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালেও তাতে আন্তরিকতা ছিল না বলে সে দাবি সমর্থিত কিংবা জোরালো হয়নি। এর পশ্চাতে ছিল হিন্দু ভীতি বা বিদ্বেষ জাত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও তমুদ্দন প্রীতি।

বাঙলার দাবি নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব-কোন্দল-সংঘর্ষ। অবশেষে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কাগুজে স্বীকৃতি পেল বাঙলা। কারণ তখনো ইংরেজীই চলছিল সর্বত্র, বরং বাস্তব কারণে ও প্রয়োজনে ইংরেজীই চালাতে হচ্ছিল। বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল বটে, কিন্তু বাঙালী চেতনা ততদিনে ইসলামী ঐক্যচেতনা ম্লান করে দিয়েছে, বিলোপ করেছে তরুণদের চিত্তে। ফলে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ক্যানসারের মতোই ছড়াচ্ছিল নানা ক্ষেত্রে, এতকাল পরে পঁয়ত্রিশ বছরের কাল পরিসরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সাদা চোখে দেখছি আর ঋজু বুদ্ধিতে বুঝতে পারছি পাকিস্তান ভাঙার মূলে ছিল একটি কারণই, তা হচ্ছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা না থাকলে বিভাষীর শাসন-শোষণ প্রবঞ্চনা এমনি প্রকট হয়ে উঠত না। ব্রিটিশ আমলের কোলকাতায়ও ছিল বিদেশীর ও বিভাষীর শোষণ ও দাপট, তবু বাঙালীর মনে কখনো এমন তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেনি। হিন্দুভীতি ও হিন্দু বিদ্বেষজাত ইসলামী জোসের আধিক্যবশে সে-দিনকার বাঙালীরা অভিন্ন ধর্মকেই দুই অঞ্চলেই মানুষের অবিচ্ছেদ্য ও চিরন্তর বন্ধন রজ্জু বলে স্বীকার করেই স্বপ্নচারিতার ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ দিয়েছিল। যেখানে আকাশের ও বাতাসের, চাঁদের ও সূর্যের রূপও ভিন্ন, যেখানে স্থান-জাত-গোত্র-অবয়ব-ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ, ঘরবাড়ি, নিয়মনীতি, খাদ্য, পোশাক আবহাওয়া সবটাই ভিন্ন ও অচেনা সেখানে ধর্মমত কি অভিন্ন চেতনার জন্ম দিতে পারে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী ও রাষ্ট্রবিদরা অনুমান করেছিলেন ওই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুনই পাকিস্তান দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মাত্র তেইশ বছরের মধ্যেই তাদের অনুমান নিয়তির মতো অমোঘ হয়ে ফলল।

বাঙালীর সম্মতিক্রমেই দেড়হাজার মাইলের ব্যবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মধ্যেখানের বিপুলকায় ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে মনোবলে অস্বীকার করে সেদিন পূর্ব বাঙলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত-প্রদেশ নিয়ে সাড়ম্বরে ও সোৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাংবিধানিক ও প্রাশাসনিক নিয়ম-নীতি নির্ধারণে সংখ্যাগুরু বাঙালীরও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কাজেই আভিধানিক অর্থে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সংজ্ঞানুসারে স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালীও ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক।

সুতরাং বাঙালীরা ১৯৪৭ সালে চৌদ্দই আগস্ট থেকেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। যৌথ পরিবার ভেঙে ভাইরা যখন পৃথগন্ন হয় তখন তাকে স্বাধীনতা বলে না, কিংবা তামিলনাড়ু, অথবা বিহার বা রাজস্থান ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তারা নতুন করে স্বাধীন হবে না, বিচ্ছিন্ন হবে মাত্র। দিল্লী সরকারে উত্তর প্রদেশের লোকের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য থাকে বলেই ভিন্নভাষী দক্ষিণ ভারত যেমন পরাধীন নয়, অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলো কি পরাধীন? পরাধীন হলে যুক্তরাষ্ট্র নামের কোন তাৎপর্যই থাকে না। স্বাধীন বাঙলাদেশ ও তার অপর শরিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ১৯৭১ সনে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে। একে অধীনতা থেকে মুক্তি বলে আখ্যাত করলে জাতির ও ইতিহাসের অবমাননা হয় মাত্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙলাদেশ ও বাঙালী পরাধীন ছিল ভাবলে বলতে হবে ১৯৪৭ সনে বাঙালী মুসলমানরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছায় ভিন্ন জাতির দাসত্ব বরণ করেছিল। অতএব ১৯৭১ সনে বাঙালীরা বাঙলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।' ১৯৭১ সনের সংগ্রাম ছিল প্রবল দলের বা শরিকের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ যদি স্বদেশী ও স্বধর্মী স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণের অধিকার আদায় করে বা জনগণের প্রতিনিধি রূপে কৃষাণ মজদুর সরকার গঠন করে তাকে স্বাধীনতা অর্জন বলা যাবে না। জারের রাশিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার রূপান্তর তাই স্বাধীনতা নয়—গণমুক্তি। এ-ও তেমনি। কবি শামসুর রহমান তার স্বাধীনতা কবিতায় গণমুক্তির এ উল্লাসকেই বলেছেন স্বাধীনতা। সুতরাং ১৯৭১ সনে যুদ্ধ ছিল পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যুদ্ধ। এ সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক তাৎপর্য ও ফল এক কথায় দেশ-কালহীন মুসলিম ভাতৃত্ব ঐক্য বা জাতীয়তা থেকে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের দৈশিক জাতীয়তা চেতনায় তথা বাঙালীত্বে উত্তরণ। এ-ও সত্য যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক পাকিস্তান না হলে বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক বাঙালাদেশও সম্ভব হত না। অতএব ২৬ শে মার্চ কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর নাজাত দিবস হতে পারে, কোন সংজ্ঞাতেই আজাদী দিবস হিসেবে স্মরেণ্য নয়। বরং বাঙালী জাতীয়তার উন্মেষ মুহূর্ত হিসেবে জাতীয় দিবস হিসেবে স্মরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

পাকিস্তান আন্দোলনেরও সার্থক শুরু বাঙালীর হাতে, কিন্তু শেষটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না, যেমন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন সংকল্প ও সংগ্রাম ছিল বাঙালীরই, তবু সাফল্য এনেছে ও পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যরা। ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূলে সিপাহী জনতা গণবাহিনী ছিল বলে স্বয়ং জিয়াউর রহমানই ৭ই নভেম্বর প্রথম রেডিও ঘোষণায় স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কার্যত ক্ষমতা গেল জিয়ার চক্রান্তে সামরিক জান্তার হাতে এবং পরে তার নিজের হাতে। এবারেও তাই শুরু ও শেষ এক হাতে থাকেনি, এভাবে হয়নি। তাই ভূতের মুখে রাম নাম উচ্চারণের মতো দিল্লী-মস্কোর নির্দেশ অকালে অসময়ে আকস্মিকভাবে বাঙলাদেশের অপ্রস্তুত সরকার ও আমলারা না জেনে না বুঝে এবং অনিচ্ছায় উচ্চারণ করেছে রাষ্ট্রের চার নীতি ১. গণতন্ত্র২. ধর্মনিরপেক্ষতা ৩. জাতীয়তা ও ৪. সমাজতন্ত্র। এর মধ্যে যে আন্তরিকতা বা অকপটতা ছিল না, ছিল ফাঁকির ফাঁক, তার প্রমাণ অজ্ঞ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য কুমীরের এক ছানাকে দশবার দেখানোর মতো এক নীতিকে চার নামে রঙিন করে ঘোষণা করা হল। কেননা, সমাজতন্ত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা আর কৃষাণ মজুরের বা দলীয় গণতন্ত্র থাকেই, তা রশুনের মতো অভিন্নমূল এবং সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী উপজাত। দিল্লী-মস্কোর সমাজতন্ত্রী বিদেশীদের দিয়ে সমাজতন্ত্রের কপটবুলি আওড়ানোর ও জিগির তোলানের পরিণামে দেখা গেল কখনো গণতন্ত্র, কখনো মন্ত্রিতন্ত্র, কখনো নায়কতন্ত্র নামে সরকারের ও সংবিধানের রূপ বদলাচ্ছিল ঘন ঘন। আর দলের সমাজতন্ত্রীরা লুটে হত্যায় ধর্ষণে পীড়নে দেশব্যাপী জোর-জুলুমের ও ত্রাসের বিভীষিকা স্থায়ী করে রেখেছিল। ফলে এমন আপাত সর্বশক্তিমান সর্বজনীন বাকশাল নেতা নিহত হওয়ার মুহূর্তেই পানির ছোঁয়ায় নুন যেমন, তেমনি ভাবে হাওয়া হয়ে গেল বাকশাল ও সমাজতন্ত্র। মুজিব হত্যার পরে বাঙলাদেশ বিশ্বস্ত ইয়াঙ্কী মুৎসুদ্দীর কবলে পড়ে, তার হাত থেকে দিল্লী-মস্কোর এজেন্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন, সিপাহী জনতা গণবাহিনী ৭ই নভেম্বর তাকে হত্যা করে নির্বোধের মতো আরেক সেনানীর হাতে তুলে দিল ক্ষমতা। তিনি তখন ইয়াঙ্কী সৌদি টাকায় ধরাকে করছেন সরাজ্ঞান। তিনি এবং পরবর্তী সেনানী শাসক জুয়াড়ীর ঝুঁকি নিয়ে প্রচণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করছেন। আর অন্যান্য চালাকি দিয়ে করছেন বাজিমাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশকে দৃঢ় আর্থিক ও নৈতিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে তার একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি আদর্শ থাকা আবশ্যিক। এর জন্য প্রাথমিক ভাবে নীতিনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ লক্ষ্যে সুষ্ঠু বিদেশ নীতি নির্ধারণ আর দেশকে বৃহৎ শক্তির খপ্পর বা ছোবল মুক্ত রাখার জন্য সযত্ন সতর্কতা প্রয়োজন। আমাদের দীনদুর্বল রাষ্ট্রের প্রায় স্বনির্ভর হওয়ার ও সার্বভৌম থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করা। আর এ মুহূর্তে জনগণস্বার্থে জনকল্যাণ লক্ষ্যে সামন্ত-বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক প্রতিবেশ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রিত ইয়াঙ্কী-সৌদি প্রভাবিত সরকারকে ভদ্রলোকের স্বার্থমুখী রাজনীতি পরিহার করতে বাধ্য করাই সরকার বিরোধী রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া দরকার।

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ

১৫১৬ সন থেকেই পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আসা শুরু করেছে। একশ বছরের মধ্যে য়ুরোপীয় বেণে কোম্পানীরা—পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ এবং আর্মেনীয়রা—সমুদ্রপথে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তখন বিনিময় মাধ্যম পণ্য থেকে মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়েছে বহুল পরিমাণে। দেশী বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-মহাজন-গোমস্তা-দেওয়ান-দালালের চেতনায় এ নতুন রীতি নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। সে-সঙ্গে দেশী রাজপুরুষ পরিবারেও সহজে অর্থসম্পদ অর্জনের বাসনা হয়েছে প্রবল। তখন কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারী মাত্রই ঈর্ষার ও আকর্ষণের পাত্র, কোম্পানীর লোক মাত্রই দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাণিজ্যনীতিতে, যুদ্ধাস্ত্রে, হিসেব রাখার পদ্ধতিতে, বাণিজ্যচুক্তির ধরনে-ধারণে, পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞানে আর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নতুন এবং অনন্য।

পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি গোটা য়ুরোপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, চিন্তায় ও চেতনায়, সম্পদে ও সমস্যায়, বিশ্বাসে ও সংস্কারে, নিয়মে ও নীতিতে, মতে ও পথে, বিদ্যায় ও বোধে নানা ভাঙা-গড়ার বিরোধ বিবাদের, সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে বিজয়ে-উৎকর্ষে উন্নত ও উত্তীর্ণ। এরা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পাঁচ মহাদেশের সর্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করেছিল উন্নততর বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও বাণিজ্যবুদ্ধি প্রয়োগে। উত্তর আফ্রিকার ও এশিয়ার সভ্য-ভব্য মানুষের রাজা-রাজ্য তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই শেষাবধি টিকতে পারেনি। ইংরেজের ভারত জয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাপ্ত হলেও, তুর্কীসাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অবশ্য য়ুরোপীয় শক্তির ১৯১৮ সন অবধি সময় লেগেছে। এতকাল পরেও আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-প্রকৌশলের ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসাদপুষ্ট য়ুরোপের কাছে আজো আফ্রো-এশিয়া সমকক্ষতা দাবি করতে পারছে না। জাপান অবশ্যই ব্যতিক্রম।

কাজেই মীরজাফর-জগৎশেঠ-রাজবল্লভ ষড়যন্ত্র না করলেও, পলাশীতে যুদ্ধ না হলেও, য়ুরোপীয় যে-কোন কোম্পানি ভারত দখল করতই। তার প্রমাণ, অনুরূপ ষড়যন্ত্রের সুযোগ না-পেয়েও একশ বছরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ এক রকম বিনা যুদ্ধেই ইংরেজের পদানত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। এ সূত্রে গোয়া, দমন, দিউ, কারিকল, মাহে, পণ্ডীচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি এলাকায় পর্তুগীজ ও ফরাসী অধিকার স্মর্তব্য।

তখন ভারতব্যাপী চলছিল অবক্ষয় যুগ, অর্থাৎ তখন নীতিনিষ্ঠা, বিবেক, আদর্শানুগত্য, দায়িত্বচেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি এদেশের মানুষে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। সিরাজুদ্দৌলা তাই পলাশীর পরাজয়েই নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ, মীর জাফর নবাব হয়েও অসহায়, মসনদলোভী বিশ্বাসঘাতক মীর কাসিম তাই অসমর্থিত ও পরাজিত।

তা ছাড়া, তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ছিল বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী। দেশের সত্তর ভাগেরও বেশি অধিবাসী ছিল অমুসলমান। স্বল্প সংখ্যার শাসক মুসলিম থাকত শহরে—শাসনকেন্দ্রে, দেশজ মুসলিমেরা ছিল নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের ও নির্বিত্তের নিরক্ষর বৃত্তিজীবী দরিদ্র মানুষ। দেশী খ্রিস্টান ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে যেমন কোনো আত্মিক-বৈবাহিক-সামাজিক-প্রাশাসনিক সম্বন্ধ ছিল না, এদের মধ্যেও ছিল তেমনি অনাত্মীয়তার অপরিচয়ের আর অসম্পর্কের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া দেশজ মুসলিমদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সাক্ষর শিক্ষিত হিসেবে মোল্লা-মুয়াজ্জিম-মৌলবী-মুন্সী-উকিল-হাকিম-কাজী থাকলেও, অন্য সব ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বিত্তে নগণ্য। হিন্দুর গাঁয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা ছিল জোত-জমির, অর্থ-সম্পদের, বিত্ত-বেসাতের ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী। পঞ্চায়েত পাটওয়ারী-রাজস্বসংগ্রাহক গোমস্তা ছিল চিরকালই হিন্দু। অতএব সাধারণভাবে দেশী বৃত্তিজীবী আতরাফেরা বা আজলাফেরা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা চিরকালই ছিল হিন্দু জমিদার-মহাজন-গ্রাম্যপ্রশাসক-চিকিৎসক-শিক্ষকের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের কালিক রেওয়াজমতো দাসপ্রায় অস্পৃশ্য দীন-দুর্বল অজ্ঞ-অনক্ষর প্রজা। কাজেই স্বধর্মী তুর্কী-আফগান-মুঘল-ইরানী রাজা-রাজপুরুষের, শাহ-সামন্তের জ্ঞাতিত্বের গৌরব-গর্ব অনুভব করবার কিংবা জাতির শক্তি-সম্পদের ছিটেফোঁটা লাভের সুযোগ তারা পায়নি কখনো। আজো বাঙলায় বিহারে উড়িষ্যায় পুরোনো আশরাফ মুসলিমদের ক্বচিৎ কেউ দেশজ মুমীনের বংশধর। অতএব পতনযুগে কোন্দলাসক্ত তুর্কী-মুঘল-ইরানী শাসক-সুবাদারে দেশজ মুসলিমের সাহায্য সমর্থন পায়নি। আর বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসকের প্রতি হিন্দুদের প্রীতি প্রত্যাশিত ছিল না। বাস্তবেও তারা নাকি তখন মুসলিম বা মুঘল শাসনের অবসানকামী হয়ে উঠেছিল[১]। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকেই ছিল হিন্দু। সুতরাং মীর কাসিমের পরাজয়ে (১৭৬৪ সনে) বা দিল্লীর বাদশাহ থেকে দেওয়ানী লাভে (১৭৬৫ সনে) ইংরেজ কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্রুততর হয়েছিল মাত্র।

কোম্পানী কেবল শোষণ করবে, কি শাসন-শোষণ সমভাবে চালাবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে কোম্পানীর প্রায় তিরিশ বছর লেগেছিল। অবশেষে ১৭৯৩ সনে ইংরেজরা শাসনের দায়িত্ব ও শোষণের শাসকসুলভ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এর আগের তিরিশ-পয়ঁত্রিশ বছর ছিল বন্দরনগরী কোলকাতার ইংরেজ-বাঙালীর বেদেরেগ বেপরওয়া জনসম্পদ লুটপাটের কাল। তখন কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষায় অজ্ঞতা, এবং দেশী বেণে ফড়ে-গোমস্তা-মুৎসুদ্দি দেওয়ানের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব জনজীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে। কার দণ্ড কখন কার মুণ্ডে পড়েছে দেখবার জানবার ও বলবার লোক ছিল না তখনকার কোলকাতায়, তথা দেশে। দ্বৈত-শাসন নামের দুঃশাসনে ও নৈরাজ্যে ঘুষখোরের, জালিমের, মতলববাজ টাউটের, জমিদার-মহাজনের, লুঠেরার, মৌজুতদারের, প্রতারকের ও লম্পটের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল দেশ। এ সময়ের দুর্নীতি-দুষ্কর্মের জন্যেই হয়েছিলেন ক্লাইভ ও হেষ্টিংস অভিযুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজের হাতে শাসনক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবিভাগের তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ও উত্তরভারতীয় পদস্থ কর্মচারীরা উত্তরভারতের দিকেই পালাল। যে-নগণ্য সংখ্যক লোক রয়ে গেল, তারা মুর্শিদাবাদেই থাকল, কিছু বিদেশী বুদ্ধিমান উকিল মুর্শিদাবাদ ছেড়ে রোজগারের লোভে কোলকাতায় চলে এল। কোলকাতায় আরও এল উর্দুভাষী বৃত্তিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিছু মুসলিম। ফলে কোলকাতায় কোম্পানীর প্রাশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তাদানের জন্য বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ধনী-মানী-জ্ঞানী হিন্দু পুরুষ পাওয়া গেল অনেক, চাকরী করার জন্য তো মিলল অসংখ্য। কিন্তু দেশজ মুসলিমদের প্রতিনিধিরূপে তাদের হয়ে তাদের স্বার্থে তাদের জন্যে কোম্পানীকে পরামর্শ দেয়ার কোনো বাঙলাভাষী দেশজ মুসলমান মিলল না। আর দেশজ মুসলিমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক এবং বৃত্তি-বেসাতগত জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না বিদেশাগত উর্দুভাষী ফরাসী-বিৎ কোলকাতা ও মুর্শিদাবাদ শহরবাসী কোম্পানীর উপদেষ্টাদের। আশ্চর্য তবু সে-ধারায় উর্দুভাষী জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রায় ১৯৪৭ সন অবধি বাঙালী মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান ছিল অধিকাঠামোয় নামত শাসক-শাসিত; কার্যত শহরে-বন্দরে-দপ্তরে, সেনাবিভাগে, দরবারে মুসলমান ছিল হিন্দুর ও শাসকগোষ্ঠীর সম বা ঈষৎ-অসম শরীক বিশেষ। গোটা ভারতে রাজস্ব বিভাগে হিন্দুর চাকরি ছিল প্রায় একচেটিয়া। তেরো-চৌদ্দ শতকে গাঁয়ে হয়তো মুসলিমই ছিল না, পনেরো শতক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতি শতকে বেড়ে বেড়ে শতকরা পাঁচ/দশ/পনেরো/বিশ/পঁচিশ হচ্ছিল হয়তো আঠারো শতক অবধি। আর যেহেতু গাঁয়ে গঞ্জে জমাজমি, অর্থসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, জমিদারী, মহাজনী, চিকিৎসা, রাজস্বআদায় ও প্রশাসন প্রভৃতি ছিল সাতশ বছর ধরে বর্ণ-হিন্দুদের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের অধিকারে, সেহেতু গাঁয়ে-গঞ্জে দেশজ মুসলিমেরা ছিল নির্জিত আর বর্ণ-হিন্দুর শাসিত ও শোষিত, এবং তারা ছিল অস্পৃশ্য বৃত্তিজীবীদেরই সমশ্রেণীর। ব্যতিক্রম ছিল বিরল। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে তুর্কী-আফগান-মুঘল আমলে বর্ণ-হিন্দু ও মুসলিম ছিল অসম, অপ্রতিযোগী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী।

কোম্পানী আমলে আকস্মিকভাবে সে সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেল; যদিও বাহ্য বৈষয়িক সম্পর্ক রইল অটুট। এখন হিন্দু-মুসলিম পরস্পর প্রতিবেশী, শাসক-শাসিত নয়। আগেই কার্যত তা-ই ছিল, কারণ শাসক মুসলিমেরা ছিল ব্রিটিশের মতোই বিদেশাগত এবং প্রশাসনকেন্দ্রবাসী, তারা কখনো প্রতিবেশী ছিল না। এখন তারা মুর্শিদাবাদে নবাব বাড়ীতে ছাড়া আর কোথাও দৃশ্যমান নয়। হিন্দুর মনে বিদ্বেষ ছিল শাসক মুসলমানের প্রতি, তাদের অভাবে ব্রিটিশ বিদ্বানরচিত ইতিহাস পড়ার ফলে (তুর্কী-আফগান-মুঘল নামের পরিবর্তে অভিসন্ধিমূলক মোহামেডান বা মুসলমান নামে প্রয়োগের প্রভাবে, অথচ ইংরেজ কখনো খ্রীস্টান হল না।) হিন্দুরা তাদেরই গাঁয়ের দাসপ্রায় অস্পৃশ্য নিঃস্বপ্রজাকে প্রাক্তন তুর্কী-মুঘল প্রভুর জ্ঞাতি কল্পনাকরে তাদের প্রতি চিন্তায়, কথায়, কাজে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে ঘৃণার, অবজ্ঞার, উপহাসের, নিন্দার, ক্ষোভের ও বিদ্বেষের বিষ ছিটাতে লাগল ডনকুইকসোটি কায়দায় সারা উনিশ শতক ধরে।

নিরবলম্ব দেশজ নবশিক্ষিত মুসলিমেরাও হিন্দু-ব্রিটিশের বানানো এ তত্ত্ব লুফে নিল। কামার -কুমার-তাতী-তেলী-ডোম-শিকেরী-চাষী-মজুরের জ্ঞাতি দেশজ আতরাফ মুসলিমরা এভাবে তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী ও জ্ঞাতি হয়ে একাধারে খান্দান এবং স্বধর্মীয় জাতিচেতনা লাভ করে হল ধন্য। এতকাল পরে তারা উপলব্ধি করল-দিল্লী আগ্রার বেবাক কেল্লা-কুঠি, মঞ্জিল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদ, তাজমহল-শালিমারবাগ এক হিসেবে তাদেরই, নিজের না হলেও চাচার ধন-দৌলত আর খ্যাতির মতোই, ভোগে না আসুক-পরিচয়-গৌরব থেকে বঞ্চিত করে কে! তখন থেকেই শুধু ভারতভর্ষ নয়, স্পেন-উত্তর আফ্রিকা-আরব-ইরান হয়ে মধ্য এশিয়া অবধি যেখানে যা কিছু মুসলিম নামসম্পৃক্ত সবটাই হল তাদের বলতে গেলে নিজেদেরই। কেননা ইসলামে দেশকালের গুরুত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান স্বীকৃত নয়, কেবল স্বধর্মীয় অভিন্ন সত্তাই একমাত্র পরিচয়চিহ্ন। এ জন্য উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম চার দশক অবধি নজরুল ইসলাম তক সব মুসলমানের অনুধ্যানের, রচনার, আলোচনার, গৌরবের, অনুভবের, চিন্তার ও ভাবনার বিষয় ছিল পনেরো শতক অবধি অতীতের মুসলিম জগৎ। স্বদেশের ও নিজেদের উদ্ভবের ইতিহাসে অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পরে উর্দুভাষী দেলোয়ার হোসেন, এবং আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ কয়েকজন মাত্র। এভাবে তাদের কায়িক ও বৈষয়িক বাস ছিল বাঙলাদেশের কুটীর ও প্রান্তরে, ক্ষেতে ও খামারে, হাটে ও বাজারে, কিন্তু মানস-বিচরণের ক্ষেত্র হল স্বপ্নে-ও শুনে-পাওয়া অদেখা ভুবন। এ রোগ তাদের মোটামুটি ১৯৪০ সন অবধি ছিল। রাজনৈতিক চাল হিসেবে বাঙলার একশ্রেণীর সুবিধেবাদীর প্রচারণার ফলে অজ্ঞ ও স্বল্প-বুদ্ধির মুসলিমেরা এখনো এ রোগের শিকার।

বস্তুত কোম্পানী আমলে এভাবেই বাঙলার হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশী বানানো তত্ত্ব অঙ্গীকার করেই জীবনের ও মননের সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্তায় ও পৃথক ধারায় পরস্পরের চিরশত্রু, চিরপ্রতিযোগী, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আধুনিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা নিয়ে আত্মরক্ষণে ও আত্মপ্রসারণে আত্মনিয়োগ করে। কোম্পানী-শাসনের ও প্রতীচ্যবিদ্যার ফলে বাঙলায় এবং ভারতেরও সর্বত্র শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হিন্দুজাতীয়তায় এবং মুসলিম স্বধর্মীর অভিন্ন জাতিচেতনায় মুগ্ধ ও ঋদ্ধ হচ্ছিল। কেউ আর নিছক বাঙালী বা বিশুদ্ধ ভারতীয় রইল না। বিরোধের ও বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়িয়েছিল উর্দু ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। হিন্দুরা দেখল উর্দু রচনায় হিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, তাই তারা নাগরী অক্ষরে হিন্দীর চর্চা শুরু করল। বাঙালী মুসলিমও দেখল হিন্দুর বাঙলা রচনায় মুসলিম অনুল্লিখিত কিংবা অবজ্ঞাত বা নিন্দিত, তারাও তাই বাঙলাকে জানল হিন্দুর ভাষা বলে, নিজেদের জন্য তাই কামনা করল উর্দু বা ফারসী।

নিরক্ষরদের মধ্যে অবশ্য এ সচেতন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু বিশ শতকের ভোটাধিকার তাদেরও মনে ও আচরণে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনা এবং বিধর্মীদ্বেষণা জাগিয়ে দিয়েছে। এভাবেই বাঙলার তথা ভারতের হিন্দুর ও মুসলিমের স্বতন্ত্র ইতিহাসের শুরু, যদিও হাট-ঘাট বাট-মাঠ আর খরা-ঝড়-বৃষ্টির ও বন্যা রইল অভিন্ন, যদিও ওলা-শীতলা-ম্যালেরিয়া দেবীর মতো জমিদার-মহাজনেরাও হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য কখনো স্বীকার করেনি।

॥ ২ ॥

এবার কোম্পানী আমল থেকে আধুনিক বাঙালীর ক্রমোন্নতির ধারা আমাদের আলোচ্য। হিন্দু ও মুসলিম নিজেরা জীবনধিরোধী স্বাতন্ত্র্য-চেতনা বয়ে চললেও প্রকৃতি তাদের সমর্থন করেনি। এর পরেও তারা স্ব-স্ব প্রয়োজনে দ্বন্দ্বে-মিলনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বাস করছে। এক জনের গায়ের গন্ধ লাগছে অপরের নাকে, একের ঘরের আগুনে পুড়ছে অন্যের ঘর। যুক্ত বঙ্গে যেমন ছিল, স্বাধীন বঙ্গে-বাঙলায়ও তেমনি রয়েছে। কাজেই কোন অবস্থাতেই কেউ কারো প্রতি উদাসীন থাকতে পারছে না, নিজের বাঁচার গরজে তাই ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, বিদ্বেষে, শত্রুতায়, সহিষ্ণুতায় কিংবা বিরোধে-বিবাদে স্মরণ ও সহাবস্থান করতেই হচ্ছে। অতএব, হিন্দুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস কিংবা মুসলিমের ইতিকথা এ-দুয়ের কোনটিকে বাদ দিয়ে বাঙলার ও বাঙালীর কোন বৃত্তান্তই কখনও পূর্ণাঙ্গ হবে না- হতে পারে না।

কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরেই ছিল ইংরেজ কোম্পানীর এবং একান্তভাবে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। বন্দরে ইংরেজের বাণিজ্য সহযোগী, বেয়ারা, বরকন্দাজ, সেবন্দী থেকে বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-মহাজন-দেওয়ান-দালাল এবং ব্যবসায়ী অবধি সবাই ছিল হিন্দু। কাজেই দেশের মুঘল-উত্তর ইতিহাসের শুরু থেকেই শাসক ইংরেজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগী শহুরে বর্ণহিন্দুর উত্থান ও আত্মবিস্তার সমান্তরাল।

বলেছি, ১৭৯৩ সনের পূর্বেকার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরব্যাপী নৈরাজ্যের ও অস্থিরতার সুযোগে কোম্পানীর বন্দরবাসী দেশী-বিদেশী কর্মচারীরা এবং প্রাশাসনিক কাজের মফস্বলবাসী সহযোগীরা ঘুষে, লুটে ও তথাকথিক সওদাগরীতে প্রাপ্ত অর্থে ধনী-মানী হয়ে উঠেছিল। তাদের কেউ কেউ সেই অর্থ পুঁজি করে হল ব্যবসায়ী, কেউ কেউ নিলামে জমিদারী কিনে হল জমিদার। নতুন ও পুরোনো জমিদারের কেউ কেউ ছিল মুর্শিদকুলী খান নিয়োজিত ইজারাদার বংশীয়ও।

কিন্তু উনিশ শতকের আগে রামমোহন ব্যতীত কেউ তেমন ইংরেজী ভাষা জানত না। আভাসেও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী শব্দ উচ্চারণে ইংরেজ মনিবের সান্নিধ্য ও সুনজর-লিপ্সুরাই তখন ছন্দোবদ্ধ ছড়া বা আর্যার মাধ্যমে [if যদি is হয় what অর্থ কি? ইত্যাদি] ইংরেজী শেখার কসরত করছিল। আর উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই ইংরেজ কর্মচারীদের ঘরে ঘরে বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দির সন্তানদের ইংরেজী শেখানোর স্কুল বসে গেল—এখনকার ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় গিন্নির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মতোই। এ ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের নাম ও দান স্মরণীয়।

ইংরেজীকে প্রশাসনের মাধ্যম করার কথা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে তখনো না আসলেও বিচক্ষণ লোকেরা বুঝল—আত্ম-উন্নয়নের তথা ধনী-মানী হওয়ার যাদুমন্ত্র হচ্ছে ইংরেজীভাষা উচ্চারণ; তাই কোলকাতায় গোঁড়া হিন্দু আর জাতিচ্যুত কালো খ্রিস্টান অথবা ফারসী-সংস্কৃত প্রিয় পণ্ডিত-মুন্সী সবাই সাগ্রহে সাড়ম্বরে ১৮১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত করল বর্ণহিন্দুর জন্য হিন্দু কলেজ। এখন থেকে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী বিদ্যানেরা পরিচিত হচ্ছিলেন পণ্ডিত, মুন্সী, ও মৌলবী নামে, আর ইংরেজী শিক্ষিত তরুণেরা অভিহিত হচ্ছিল 'এজু' (Educated) আখ্যায়—এবং ডিরোজিওপন্থী দ্রোহীরা নিন্দিত হল 'ইয়ংবেঙ্গল' রূপে। সাধারণ এজুরা হল ডেপুটি, মুন্সেফ, দারোগা প্রভৃতি এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের চাকুরে, আর শিক্ষক উকিল ব্যবসায়ী প্রভৃতি। ইয়ংবেঙ্গলেরা স্বকালে ছিলেন নিন্দিত, পরবর্তী কালে হলেন বন্দিত। ইয়ংবেঙ্গল ও অন্যান্যদের অভিব্যক্ত মনীষাই একালে 'রেনেসাঁস' অভিধায় চিহ্নিত ও প্রশংসিত হয়েছে ও হচ্ছে।

সম্প্রতি রেনেসাঁস বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। হালে প্রশ্ন উঠেছে উনিশশতকী কোলকাতার প্রতীচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের-মনীষার অভিব্যক্তিকে, কর্মের উদ্যোগকে 'রেনেসাঁস' বলা যায় কি-না, গেলেও তাকে বাঙলার ও বাঙালীর রেনেসাঁস আখ্যায় অভিহিত করা যাবে কি-না।

মানবীয় মনীষার, মননের, সংস্কৃতির ও সভ্যতার য়ুরোপীয় উৎকর্ষে ও বিকাশে আমরা মুগ্ধ। তাই আমাদেরও সর্বপ্রকার জীবনস্বপ্ন য়ুরোপীয় আদলে রচিত। কাজেই নামে-কামেও আমরা সব সময়ে য়ুরোপকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি। স-তাৎপর্য 'রেনেসাঁস' কথাটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখান থেকেই নেয়া। রেনেসাঁস হচ্ছে জীবনের জাগরণ, পুরোনো ধারার বা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ নবজাগরণ বা নবজন্ম। ইতালীর জাগরণের ইতি-কথা রচয়িতা 'জর্জো ভাসারি-ই নগজাগরণ বা নবজন্ম ঘটানো সৃষ্টি-সম্ভব মনস্বিতা অর্থে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আসলে ব্যক্তিজীবনেও ঘটে নবজন্ম— নবজাগরণ। যৌবনের দৈহিক-মানসিক পরিপূর্ণতার অবচেতন অনুভবে ব্যক্তিও আত্মপ্রকাশের আত্মপ্রতিষ্টার ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষাচালিত হয়, তখন সে কল্পনায়, কর্মে, উদ্যমে, উদ্যোগে এক অনির্বচনীয় আবেগ ও আগ্রহ অনুভব করে, প্রাণের এই আনন্দিত আবেগ, অস্পষ্ট অনুভবের এই পুলক তাকে করে কস্তুরী-মৃগের মতোই চঞ্চল। দিকে দিকে আত্মবিস্তারের এই সময়কার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে তার প্রবণতা, শক্তি ও মেধা অনুসারে বানায় কোনো কিছুর স্রষ্টা বা কোনো কিছুর উদগাতা, উদ্ভাবক, আবিষ্কর্তা কিংবা প্রতিষ্ঠাতা।

সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর ধারায় প্রবহমান জনস্রোত। কোনো দেশে কোনো বিশেষ কালে আকস্মিকভাবে একই সময়ে যদি তেমন একদল শক্তিমানের মনীষা জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায়, কর্মে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে-দেশের, সেকালের মানুষের জাতীয় জীবনে 'রেনেসাঁস' ঘটেছে বলে মানতে হবে। কারণ এর ফলে অর্থাৎ ওই মনীষীদের অবদানে সেদেশে সেকালে জীবনচেতনায় ও জগৎ ভাবনায় রূপান্তর ঘটে। তখন জীবনযাত্রায়, মতে-মেজাজে, মনে-মননে, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কে, আর সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে উৎকর্ষ আর পরিবর্তন। জীবনরুচির এ সামূহিক উদ্‌বর্তন বা উৎকর্ষই ঘটায় মানব সভ্যতায় যুগান্তর—সৃষ্টি হয় নবযুগ। এ হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানস-বসন্ত।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁস এক দিনেরও নয়, একস্থানেরও সৃষ্টি নয়। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ, প্রকট হতে এবং অভিপ্রেত সামগ্রিক ফল পেতে সুদীর্ঘ চারশ বছরের নিরলস বিরামহীন আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে পুরোনো বিশ্বাসসংস্কারের, নিয়মনীতির ও রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে। সে-সংগ্রামে জানে-মালে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে অনেক। শুধু সুখ-স্বস্তি নয়, —ধনপ্রাণও দিতে হয়েছে অনেক মানবমুক্তিকামীকে—জ্ঞানসাধককে।

রেনেসাঁসের উন্মেষ ইতালীতে পনেরো শতকে। কিন্তু সেখানে তা নিবদ্ধ ছিল না—ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। এক হিসেবে সৃষ্টিশীল মনীষা বা মনস্বিতা ঠিক দেশ-কাল পরিবেশ নির্ভর নয়—ব্যক্তিক মনস্বিতা, আগ্রহ, উদ্যম ও উদ্যোগ ভিত্তিক। তাই রেনেসাঁস সম্ভব করার জন্য দৈশিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিক জীবনের উন্নতমান, সর্বজনীন শিক্ষা, কুসংস্কার মুক্তি, জনগণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক সুরুচি, শ্রমজীবী বা বৃত্তিজীবী মানুষের সহযোগিতা, সমর্থন বা দাবির প্রয়োজন হয় না। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষকালের যাজকপীড়িত নিরক্ষর সমাজ ও কোন্দলপরায়ণ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত দেশ ও রাজ্য, নির্যাতিত দাস-ভূমিদাসের দারিদ্র্য প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু রেনেসাঁসকে সার্থক ও জনকল্যাণকর করতে হলে উক্ত সব কিছুর প্রয়োজন হয়। ইতালীর রেনেসাঁসে প্রেরণা যুগিয়েছে সমকালীন আরবমনীষা ও তাদের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কৃতির সঙ্গে পরিচয়। বাঙলাদেশের কোলকাতা শহরে উদ্ভূত রেনেসাঁসের জন্য এসব কিছুই দরকার হয়নি। প্রতীচ্যবিদ্যা ও য়ুরোপীয় জীবনের উন্নত মানই তাদের সে-আদলে জীবন রচনায় প্রণোদিত করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন অবলম্বনযোগেই আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম ইন্ধন। কিন্তু আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন অনুভূত না হলে, জ্বালানোর অভিপ্রায় না জাগলে ইন্ধন উপযোগ হারায়। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, পেত্রার্ক প্রমুখ বহু বহু মনীষীর ক্রমে অভিব্যক্ত মনস্বিতার প্রসূন। এরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্পেনে আরববিদ্যার ঔজ্জ্বল্যে দেখে এবং আরবীর মাধ্যমে গ্রেকো-রোমক কৃতির আকর আবিষ্কারে। নতুন পরিচয়ে এমনি উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাবিলনীয়-আশীরীয় বিদ্যায় ইরানী, ফিনিসীয়-মিশরীয় বিদ্যায় গ্রীক, গ্রীক বিদ্যায় রোমক, গ্রেকো-রোমক বিদ্যায় আব্বাসীয় আরব এবং আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্যায় একালের বিশ্বভুবন অনুপ্রাণিত। এ তাৎপর্যে রেনেসাঁস সভ্যজগতের স্থানে স্থানে কালে কালে ফিরে আসে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক কালের বিদ্যাকেন্দ্রগুলো, মনস্বিতার আকস্মিক স্ফুরণকাল আর এককালের শহরগুলো এ সূত্রে স্মরণ্য।—কিছু মনীষী-মনস্বির মাধ্যমে কোনো দৈশিক ভাষিক কিংবা জাতিক জীবনে প্রাত্যহিকতার ম্লানিমার, আটপৌরে নীতিনিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের, বৈচিত্র্যহীন চিন্তাচেতনার, ঝিমিয়ে-পড়া জীবনের, বিরক্তি-ধরা জীবিকার নিগড়ভাঙা নতুন চেতনার, চিন্তার, উদ্যমের উদ্যোগের উন্মেষই হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পুরোনো-ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাববার, কল্পনা করবার, শিখবার, জানবার, আঁকবার, গড়বার, করবার এবং উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের আর স্বদেশকে, স্বভাষাকে ভালোবাসবার এবং নিজেকে শ্রদ্ধা করবার ও আত্মপ্রত্যয়ী হবার প্রেরণা ও স্বাধীনতা দান করে।

রেনেসাঁসের প্রভাবে জনজীবনে তথা জাতীয় জীবনে শাস্ত্র, সমাজ রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বিবর্তন ঘটে। অতএব, পরিণামে মানুষের মন-মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারে, বিজ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষের সংস্কারের ও সঙ্কীর্ণতার কবলমুক্তি ঘটে, বিবেকের প্রভাব হয় প্রবল, মানবিক বোধ পায় বিকাশ, এগিয়ে যায় সমাজ-সংস্কৃতি সভ্যতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের পুনরুজ্জীবনকামী ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন অতীতাশ্রয়ী ও অতীতমুখী বলেই রেনেসাঁস সম্পৃক্ত নয়। ওতে নতুন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, হৃতপুরাতনকে ফিরে পাবার সাধনা ছিল মাত্র।

উন্নততর চিন্তা-চেতনা-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে নতুন পরিচয়েই এই যন্ত্রযুগের আগে মানুষের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে কালান্তর ঘটত। শঙ্করাচার্য ইসলামের মোকাবিলায় বিপন্ন স্বধর্মীর স্বার্থেই নতুন মত-পথের প্রয়োজনীয় অনুভব করেন। তিনি একাধারে অদ্বৈতবাদ দিয়ে ঠেকালেন ইসলামের প্রসার আর মায়াবাদ দিয়ে আকৃষ্ট করলেন জৈন-বৌদ্ধদের। দক্ষিণভারতের রামানুজ-ভাস্কর-মাধব-নিম্বার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদ, উত্তরভারতের নানক-কবির-দাদু-রামনন্দ-একলব্য-রামদাস প্রমুখের সন্তধর্ম, বাঙলার চৈতন্যদেবের প্রেমবাদ আর পনেরো-ষোল শতকের বাঙলার ন্যায়-স্মৃতি চর্চা ইসলামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পরিচয়েরই ফল। এরও আগের পাল আমলের বিদ্যাচর্চা আর সেনযুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি ছোটো খাটো বিদ্যাচর্চা আর সেনযুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতিও ছোটো খাটো রেনেসাঁসই। এমনি তাৎপর্যে এ মুহূর্তের ঢাকায়ও রেনেসাঁস ঘটছে।

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মমতও খ্রীস্টধর্মের মোকাবিলার সৃষ্টি। পৌত্তলিকতা ছেড়ে তিনি হলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মবাদী। আর মূলে ব্রাহ্মমত ছিল সনাতনীদের আক্রমণ এড়ানোর ফিকিরমাত্র। এর জন্ম আড্ডায়-ক্লাবে-আত্মীয়সমাজে। উনিশ শতকী কোলকাতায় উদ্ভূত রেনেসাঁস তো ইংরেজী শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফল। য়ুরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান আর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবই বাঙালীদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস—এ সঙ্গে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যাটসিনি-গারিবল্ডীর ব্যক্তিত্ব তাদের প্রভাবিত করেছিল। বলেছি এজুরাই (ইংরেজী শিক্ষিতরাই) এই রেনেসাঁসের স্রষ্টা। এরা ছিলেন কোঁতে, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, রুশো, ভল্টেয়ার, হবস, লক, এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি দার্শনিকের ভক্ত। এজুদের মধ্যে সবাই একমতের ও এক পথের লোক ছিলেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়বাদী কেউ কেউ নাস্তিক, কেউ কেউ অজ্ঞেয়বাদী, অধিকাংশ আস্তিক এবং সবাই কম বেশি য়ুরোপীয় উদার মানবিকতাবাদী। আবার হিতবাদী-প্রত্যক্ষতাবাদী রূপেও ছিল এদের প্রশাখা। উনিশ শতকের এজুরা কথায়, কাজে ও লেখায় প্রকাশ করেছিলেন তাদের মনীষা—ছড়িয়ে ছিলেন তাদের চিন্তা-চেতনার বীজ। এ সব কিছুতেই-যে ঐক্য ছিল, তা নয়, বৈপরীত্যও ছিল সুস্পষ্ট। রেনেসাঁস বহুজনের নানা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ফসল। তবু এদের মধ্যে দূর থেকে চেনা যায় তিন মিনারের মতো—তিন আলোক-স্তম্ভের মতো তিন ব্যক্তিত্বকে—প্রথমে রামমোহন, মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র। এদের সহচর-অনুচর, সঙ্গী-সহযোগী ছিলেন অনেকেই। রামমোহন ছিলেন সংশয়বাদী, বিদ্যাসাগর ছিলেন নাস্তিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নাস্তিক শেষে ভক্তিমার্গী হিন্দু। রামমোহনের ছিল সমকালীন প্রাগ্রসর বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনা, বিদ্যাসাগরের ছিল দেশ-দুর্লভ নির্দ্বৈধ নিঃসঙ্কোচ উদার মানবতায় ও মানববাদে আস্থা, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল সমকালীন য়ুরোপীয় আদর্শের জ্ঞান-কর্ম-নীতিনিষ্ঠ সমাজ ও জাতিগঠনপ্রয়াস।

সচেতন বা অবচেতন ভাবে সাময়িক উৎসাহে কিংবা ব্রত হিসেবে আরও যারা স্ব-স্ব কথায়, কাজে ও লেখায় রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তাদের মধ্যে তিন খ্রীস্টান—লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত; অনেক ইয়ংবেঙ্গল—প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবকৃষ্ণ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ; তিন নাস্তিক—অক্ষয় কুমার দত্ত, রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; বহু ব্রাহ্ম—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীননাথ সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামপ্রাণ গুপ্ত; এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশ মুখার্জি প্রমুখ উদার মতের হিন্দু, আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রতীচ্যবিদ্যা প্রভাবিত গোঁড়া হিন্দু; এবং রামকৃষ্ণপরমহংস, বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রতীচ্য দর্শন প্রভাবিত সংস্কারপন্থী হিন্দু, আর আঁকিয়ে-লিখিয়ে ছাড়াও শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীরা কোলকাতাকে অঙ্গে ও অন্তরে অনুকৃত বা কৃত্রিম লণ্ডন করে তোলায় ছিলেন প্রয়াসী। তবু এর মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলনে খ্রীস্ট-ধর্মের প্রসার, রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের আন্দোলনে ব্রাহ্মমতের বিস্তার এবং স্বধর্মীর জাতীয়তাবাদের উন্মেষে প্রতীচ্যদর্শনের প্রভাব রুদ্ধ হয়ে যায়।

সপ্তম ও অষ্টম দশকে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণেরা— মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ চন্দ, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হিন্দুমেলার প্রতীকী আদর্শে নানা আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে এ রেনেসাঁসকে পূর্ণতা দান করেন। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের, সাময়িক পত্রিকার এবং নাটকের সহায়তার পরিমাণ অশেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁসের আলোচনায় কেউ ঈশ্বরগুপ্তের নাম নেন না। অথচ সাহিত্য-যে ব্যক্তিগত রসবিলাস নয়, এর-যে দৈশিক, জাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, গুরুত্ব ও উপযোগ রয়েছে; জাতি গঠনে, সংস্কৃতি নির্মাণে, নতুন চিন্তা-চেতনার প্রচারে ও প্রসারে এর দান যে অপরিমেয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে বাঙলাভাষার মাধ্যমেই-যে এর চর্চা আবশ্যিক, তা সচেতনভাবে প্রথম উপলব্ধি করেন ঈশ্বরগুপ্তই। এ চেতনা নিয়ে তিনিই প্রথম প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারের, ঐতিহ্য রক্ষণের এবং সাহিত্যের পরিচিতি সংকলনের, আর সাহিত্যসম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ ও আয়োজন করেন। তারই ফলে সংবাদ প্রভাকরে সাহিত্য প্রকাশন, কবি ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা, কবিওয়ালাদের কৃতি ও পরিচিতি সঙ্কলন এবং সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। কাজেই স্বল্পশিক্ষিত হলেও য়ুরোপীয় চেতনা-সূর্যের বাঙলায় উদয়লগ্নে ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন তার রশ্মিস্নাত একজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কালিক নিয়মে এজুদের প্রায় সবাই বাল্যে ও কৈশোরে বিবাহিত ছিলেন এবং মনস্বিদের প্রায় সবাই প্রতীচ্য-বিদ্যার মতো বিলেতী মদ্যকেও সাদরে-সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজনারায়ণ বসু, হরিশ মুখার্জি, রামতনু লাহিড়ী, রাধাকান্ত দেব, আর হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন-কমবেশি এদের সবারই ছিল মদানুরাগ। এটিকে তারা সংস্কারমুক্তির প্রথমপাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তই নাকি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বিলেতী পোশাক-পরুয়া ব্যক্তি।

বহুকাল ধরে অবক্ষয়গ্রস্ত একটা দেশের, কালের ও সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ নতুন চিন্তার-চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে এতকালের জাতীয় জড়তার ও জীর্ণতার মধ্যে জীবনের ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, লেখায়, নতুন কিছু বলে, করে, গড়ে লিখে এবং একে জনগণকে নতুন কিছু শিখিয়ে জানিয়ে লোকমনে শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও আশা জাগিয়ে এবং মাটির ও মানুষের প্রতি, স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি, জগতের ও জীবনের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়িয়ে—এক কথায় যা কিছু শ্রেয় সেসবের প্রতি সাধারণকে আকৃষ্ট করে—জাতীয় জীবনে যে উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটান তারই নাম রেনেসাঁস। সংজ্ঞাবদ্ধ করলে রেনেসাঁস মানে—জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা, নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তি। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করলে উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার রেনেসাঁসের মূল্যায়ন সহজ হবে। এবার বাঙলার ও ইতালীর রেনেসাঁসের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখা যাক :

১. ইতালীর রেনেসাঁসের উন্মেষ সৃষ্টিশীলতায়, বাঙলার রেনেসাঁসের প্রকাশ প্রতীচ্য শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহে ও ফলে।

২. কোলকাতা শহরের রেনেসাঁস, মনীষীদের স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর স্বার্থচেতনায় ছিল সীমিত। তারা যতটা হিন্দু হলেন ততটা বাঙালীও হলেন না, আর অস্পৃশ্যদের কিংবা দেশজ মুসলিমদের হিতচেতনা ছিলই-না তাদের মনে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস উদারতায় ও মানবতায় দীক্ষা দিয়েছিল।

৩. 'এজু'দের মর্ত্যপ্রীতি, জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা ছিল বটে কিন্তু তা নির্বিশেষে মানবিকবোধের বা মানবতাবোধের বিকাশ ঘটায়নি। য়ুরোপীয় খ্রীস্টান সমাজে বর্ণভেদ ও বিধর্মীভেদ ছিল না, ছিল শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের ভেদ। 'এজুদের অনুরাগ ও শ্রেয়োবোধ নিবদ্ধ ছিল স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর পরিসরে—মাটি ও মানুষ এদের চেতনার ছিল অবহেলিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃত ভূ-ভাগে ও সুদীর্ঘ কালে, উৎস ছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি (গ্রীক, রাম), এতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল সমকালীন আরব সভ্যতার। বাঙলার রেনেসাঁসের তথাকথিক উন্মেষ ও বিকাশকাল পঞ্চাশ বছরের পরিসরে ছিল সীমিত। প্রেরণার উৎস ছিল সমকালীন লন্ডন-প্যারিস।

৫. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার মোহ ঘুচিয়ে মানুষকে করেছিল মাতৃভাষামুখী, অন্ধ বিশ্বাস-সংস্কার কাটিয়ে মানুষ হয়েছিল যুক্তিবাদী ও মর্ত্যমুখী। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ, প্রোটেস্টান্ট মতের উদ্ভব, যাজকের দৌরাত্ম্যহ্রাস, কৃষকদের অধিকারচেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিকাশ, দিকে দিকে আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, শাস্ত্রীয় শিক্ষার চেয়ে মানববিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার, জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঐহিকতার প্রাধান্য দান, সর্বোপরি ব্যক্তি, সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং ন্যায় সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসাজাত তত্ত্বোপলব্ধির আলোকে জীবন-যাত্রার নিয়মনীতির ও রীতিপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং বাস্তবের হিতকর চাহিদা পূরণও ছিল য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের লক্ষ্য ও ফল। বাঙলার ব্রাহ্মমতে, রামকৃষ্ণের সেবাধর্মের আর বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত গীতানুগ কর্ম-ভক্তির তত্ত্বেই সংস্কারমুক্তির প্রয়াস অবসিত। এদের ব্যাখ্যার তত্ত্বের মধ্যে পরিহারের কথাই রয়েছে বেশি। এবং তা কেবল পুরোনোকে আস্থার ও আশ্বাসের অবলম্বনরূপে দৃঢ় করে আঁকড়ে থাকার প্রবর্তনা দেয়ার জন্যই। সমকালীন মানুষের মর্ত্যপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐহিক-মানবিক চেতনার পুষ্টিসাধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাঙলার রেনেসাঁসে সিসৃক্ষার চেয়ে সংস্কার স্পৃহাই (Reform-এর ঈহা) ছিল বেশী। এরা revivalist ও reformist-এর মতো adjustment ও accomodation-এর তথা মেরামতের প্রয়াসী ছিলেন, নতুন কিছু নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না।

৬. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল ভাষিক ও দৈশিক জাতিচেতনা, বাঙলার রেনেসাঁস জাগাল স্বধর্মীর স্বাজাত্যবোধ। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল গ্রহণশীলতা-আত্মপ্রসারের প্রেরণা, বাঙলার রেনেসাঁস মানুষকে করল আধুনিক য়ুরোপের অনুকারী আর প্রাচীন ভারতের অনুরাগী।

৭. সমাজবিপ্লব রেনেসাঁসের লক্ষণ না হলেও, চিন্তাবিপ্লব যেহেতু রেনেসাঁসের প্রাণস্বরূপ, সেহেতু রেনেসাঁস জীবনের ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রূপ বদলাতে, রঙ চড়াতে অবশ্যই সাহায্য করে। য়ুরোপে তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস কথায়, লেখায় ও রেখায় মাত্র অভিব্যক্তি পেয়েছে, কাজে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। তাই মনীষীরা ছিলেন সীমিত অর্থে ও ক্ষেত্রবিশেষ উদার, কৃচিৎ দ্রোহী এবং প্রায়ই সনাতন নিয়মনীতির অনুগত— জাতিভেদে, বর্ণভেদে ও অধিকারভেদে আস্থাবান।

৮. নিঃস্ব নিরক্ষর মানুষ য়ুরোপেও রেনেসাঁসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়নি, তবে পরোক্ষে নানা আন্দোলনের ও ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছিল। আমাদের দেশে প্রজাপীড়নে কোন উপশম কিংবা কৃষকবিদ্রোহে কোন সহায়তা রেনেসাঁসের জনক মনীষীরা বা তাদের চেলা ভদ্রলোকেরা দেননি। আর সিপাহীবিপ্লবের সময়ে তাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাই জাগেনি, বরং ব্রিটিশের পরাজয়ের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছিলেন তারা।

আসলে আঠারো শতকের ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লুট করার মতোই অনায়াসে লব্ধ বিত্তের অধিকারী কোলকাতায় ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট ধনী-মানী-বিষয়ীরা উনিশ শতকের উষাকাল থেকে সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। মুখ্যত তাদের থেকেই উনিশ শতকে একদল জ্ঞানী কর্মী-মনীষী, শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক-সাংবাদিক-স্বাদেশিক-চিকিৎসক-শিক্ষক-প্রকৌশলী কোলকাতা শহর মাতিয়ে তুললেন। এই 'এজু'রা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়ংবেঙ্গলরা— এক কথায় মনীষাসম্পন্ন তরুণেরা প্রাচ্যদ্বেষণা ও প্রতীচ্যএষণা তথা প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই শুরু করেন তাদের জীবনের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ। এদের মনীষীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিরই সগর্বে নাম দেয়া হয়েছে 'রেনেসাঁস'। দু'একজন ব্যতিক্রম ব্যতীত এদের কারো সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। তাই উনিশ শতকী এইসব মনীষীর চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে স্ববিরোধ প্রচুর ও প্রকট। এঁদের জাগরণ নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল-জাত জ্ঞান এঁদের স্বরূপে বই-পড়ে-পাওয়া য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল-জাত জ্ঞান এঁদের মনে য়ুরোপীয় আদলে জীবনরচনার আকাঙ্ক্ষা জাগাল। কোলকাতায় বসে লন্ডন-প্যারিসের সূর্যের বিম্বিত আলোকে অনুকূল লন্ডনে য়ুরোপীয় মন-মনন-সংস্কৃতির ধারক নকল নাগরিক হতে চাইলেন এরা। য়ুরোপীয়চিত্ত অধিগত ছিল না, কেবল বাইরের আভরণটাই এঁদের আকৃষ্ট করেছিল; তাই সব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল অসঙ্গতি।

বাঙলার রেনেসাঁসকে অন্য নিরিখেও যাচাই করা যায়, সে নিরিখের ভিত্তি এই পারিবারিক জীবনে যেমন আকস্মিকভাবে পরিবারের সব সন্তানই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পদে ও বিত্তে বড় হয়, জাতীয় বা দৈশিক জীবনেও তেমনি একদল জ্ঞানী-গুণী সৃষ্টিশীল মনীষীর একই সময়ে আবির্ভাব ঘটে, প্রাচীন গ্রীসে রোমে বাগদাদে যেমন দেখা গেছে। তেমনি একই সময়ে কয়েকটি গুণী-জ্ঞানীর পরিবারও মেলে, যেমন, দুই ঠাকুর পরিবার, বসু পরিবার, সোহরাওয়ার্দী পরিবার, মুখার্জী পরিবার, নেহেরু পরিবার, হাক্সলী পরিবার, প্রাচীন বাগদাদের বখ্‌ত ঈসা পরিবার, প্রাচীন বাঙলার দণ্ডপাণি পরিবার ইত্যাদি। এ মাপে দেশের, কালের, ধর্ম-সম্প্রদায়ের, গোত্রের বা জাতির জীবনে ওই সর্বাত্মক উঠতিই রেনেসাঁস—অন্য সব লক্ষণ বা কারণ-কার্য গৌণ। রেনেসাঁস চিরকালই শিক্ষিত শহুরে মানুষের দান বটে, তবে শিক্ষিত মাত্রেই মনীষাধর নয় বলেই চিরকাল রেনেসাঁস বিরলদর্শন ঘটনা বা অভিব্যক্তি।

বছরে বারোমাসই কোনো-না-কোনো তরুতে-লতায় ফুল পাওয়া যায়, এবং একটা গাছ দিয়ে বাগান হয় না। সুবিন্যস্ত বহু তরু-লতার সমাবেশে তৈরি স্থানই বাগান। যে-কোনো কালে ও স্থানে সাধারণ মাপের দু'চারজন মনীষী থাকেনই—বুদ্ধিজীবী থাকে অসংখ্য। তাতে রেনেসাঁস হয় না; প্রথম শ্রেণীর বহু কৃতী ও কীর্তিমান মনীষীর অবদানই কেবল রেনেসাঁস। অতএব রেনেসাঁস হচ্ছে উচ্চবিত্তের ও মধ্যবিত্তের; বুর্জোয়ার মনীষীর একই স্থানে, একই কালে, একই ভাষায় আকস্মিক নির্লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট বিচিত্র বর্ণালি প্রকাশ ও বিকাশ। কাজেই একজন মানববাদী বামপন্থীর কাছে মানব-মনীষার এই উজ্জ্বল ও বহুমুখী প্রকাশ সুন্দর হলেও সার্থক নয়। এর রূপ আছে, রস আছে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিপ্রেত উপযোগ নেই।

বলেছি, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতীচ্যবিদ্যাই বাঙলার এ রেনেসাঁসের উৎস, এ শিক্ষা 'তাসের দেশে' ঘটাল ভাববিপ্লব, শিক্ষিতদের মনে জাগাল দিগন্তবিসারী আকাঙ্ক্ষা, জীবনে সম্ভাবনার দ্বার হল উন্মুক্ত, খুলে গেল সংস্কারের নিগড়-বিশ্বাসের বাঁধন। এরকম সুফল প্রত্যাশা করেই লর্ড ম্যাকলে (১৮০০-৫৯) এদেশে ইংরেজীর মাধ্যমে প্রতীচ্য বিদ্যা প্রচারের সুপারিশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, ইংরেজী পড়লে এদেশী মানুষের গায়ের রঙ অপরিবর্তিত থাকবে বটে, কিন্তু দেশী অঙ্গে নতুন অন্তর তৈরি হবে, চিন্তায়-চেতনায়, মনে-মেজাজে, মতে-মননে, রুচিতে-সংস্কৃতিতে, দায়িত্ববোধে-কর্তব্যনিষ্ঠায় কালো অবয়বের এক এক জন মানুষ য়ুরোপের প্রাগ্রসর সুনাগরিকের সমকক্ষ হবে; এবং ওই চরিত্র, ওই যোগ্যতা, ওই উদ্যম, ওই রুচি ওই অতিক্রান্তকালে প্রাচীন আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত বিদ্যা দান করতেই পারে না। সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-প্রযুক্তিবিদ্যার এক তাক ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে গুণে, মানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যে ও তত্ত্বে তুলিত হবার যোগ্যতা সত্যিই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জ্ঞানের আকর আরবী-ফারসী-সংস্কৃত বইয়ের ছিল না। কিন্তু এ যথার্থ মূল্যায়নে সেদিনকার বাঙালীর তথা ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তাই তারা একে উপনিবেশনীতি সম্পৃক্ত চাল বলে জানল। তারা বুঝল—কেরানী, খ্রীস্টান ও অনুগত প্রজা তৈরির জন্যেই ইংরেজীভাষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা চালু করার সুপারিশ করেছেন লর্ড ম্যাকলে। ১৮৩৫ সনের দোসরা ফেব্রুয়ারীর সনেটে এ সুপারিশ করার আগে ১৯৩৩ সনের ১০ই জুলাই ম্যাকলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে যে মহৎ আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা হয় অজ্ঞতার দরুন, নয়তো অভিসন্ধি বশে উল্লেখ করেননি কেউ, ফলে লর্ড ম্যাকলে এখনো কেবল নিন্দার পাত্র। আমরা তার সে-বক্তৃতার সে-অংশ এখানে তুলে ধরছি :

"It may be that public of India may expand under our system till it has outgrown that system; that by good Government, we educate our subjects into a capacity for better Government, that having been instructed in European knowledge they may, in some future age, demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not, but never will I attempt to evert or retard it. Whenever it comes it will be the proudest day of English history. To have found. a great people sunk in the lowest depth of slavery and superstition, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all the privileges of citizens, would indeed be a title to glory all our own. The sceptre may pass away from us, unforeseen recidents may derange our most profound schemes of policy. Victory may be in constant to our arms. But there are triumphs which are followed by no reverse. There is an empire exempt from all natural causes of decay. Those triumphs are the speciffic triumphs of reason over barbarism that empire is the unperishable empire of our arts and our morals, our literature and our laws. [July 10, 1833]—ম্যাকলে-নিন্দুকদের এ ভাষণ স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ঐহিক জীবনের গুরুত্বচেতনা, মানববিদ্যার কদর, শাস্ত্রের উপর মানবতার প্রাধান্য, ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়বুদ্ধি, নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার চেতনা প্রভৃতি একাধারে রেনেসাঁসের ও আধুনিকতার লক্ষণগুলো ইংরেজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশে মন্থর গতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে।

বাঙলায় রেনেসাঁস যারা ঘটালেন আর যারা রেনেসাঁসের ফল ভোগ করলেন তারা ছিলেন কোলকাতা শহরের ধনী-মানীরা ও জমিদারেরা এবং তাদের সন্তানেরা—তাদের জীবনে যুক্তি, বুদ্ধি, রুচি, আনন্দ, আরাম বাড়ল বটে, তাদের চিন্তা-চেতনার জগৎ বিশাল হল বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, চাকরির, উৎকোচের ও উপঢৌকনের , ব্রিটিশের সহযোগীরূপে দেশী কুটিরশিল্পের বিলুপ্তিসাধনের, নীলকর সাহেবদের আদলে নীলচাষ করানোর, ব্যাঙ্কে মহাজনীতে আড়তদারীতে পুঁজি বিনিয়োগের, রাজস্ববৃদ্ধির ও আবওয়াব-সেলামীর প্রসাদ পেলেন রেনেসাঁসওয়ালারা এবং তাদের স্বগোত্রের ও স্ব-শ্রেণীর লোকেরা। আর নিঃস্বতার, দারিদ্র্যের, অনাহারের, পীড়নের, শোষণের এবং দুঃশাসনের শিকার হল দেশের শতকরা নিরানব্বই জন চাষী-মজুর-তাঁতী-মুলঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মানুষ। তা হলে রেনেসাঁসরূপ সামন্ত-বুর্জোয়ার চিৎপ্রকর্ষ গণমানবকে সমকালে কিছুই দেয়নি বরং পীড়ন ও বঞ্চনা বাড়িয়ে ছিল শত গুণ। তাদের বিদ্যা-বিত্ত-গুণ-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা তাদেরই স্বশ্রেণীর জীবনে ও জগতে বাসন্তী পরিবেশ তৈরি করেছিল মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র জিগির! এখানো কি অলীক যুক্তবঙ্গের হিন্দু ভূতের ভয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে। একদিকে রাষ্ট্রপতি দেশে সবাইকে বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী হতে আহ্বান জানান আর বাইরে আত্মপরিচয় দেন মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে; অন্যদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-মুদ্রিত বিকৃত বাঙলা কেতাবে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাই প্রকট। বাঙালী মুসলিম কি কখনো দৈশিক ও ঐহিক জীবনের চিন্তাচেতনা নিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী রূপে আত্মোপলব্ধির ও আত্মবিকাশের পথে এগুবে না, কেবল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা স্বপ্নে এবং অতীতের ও বিদেশের মুসলিম কৃতিগর্বে বিভোর থাকবে? আমরা কি চিরকাল কেবল মুসলিমই থাকব, বৈষয়িক ঐহিক মানুষ হব না?

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৮১

ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাঙলাদেশ

১৯৭১ সালের সংগ্রামের ও সাফল্যের বয়স প্রায় দেড়দশক হতে চলল। কাল নিরবধি বলে মহাকালের পটে পনেরো বছর নগণ্য বটে, কিন্তু আজকের যন্ত্রযুগে সংহত পৃথিবীতে চৌদ্দ-পনেরো বছরের এ কাল পরিসর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আর্থিক সামাজিক রাজনীতিক বিবর্তন ধারায় কিংবা চিন্তা-চেতনার জগতে তুচ্ছ নয়, সে কারণে ইতিহাসেও এ কাল পরিসর গুরুত্বহীন নয়।

এ পনেরো বছরে স্থিতধী বাঙালী নিশ্চয়ই আবেগমুক্ত হয়েছেন, প্রয়োজনের তাগিদে ও আবেগ বশে ইতিহাস সচেতন মননশীল বিদ্বানেরাও যুদ্ধকালে অনেকের অনেক অসত্য উক্তি ও ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এখন জাতি হিসাবে স্বস্থ ও সুস্থ হওয়ার প্রয়োজনে সত্যসন্ধ, তথ্যনিষ্ঠ এবং নিরুচ্ছ্বাস হতে হবে আমাদের। এখন তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও পরিণাম জানতে বুঝতে হবে, নিরূপণ করতে হবে ভাবী পন্থা, পাথেয়ও করতে হবে নির্ধারণ ও সংগ্রহ। অর্থাৎ কোন হিতকর উদ্দেশ্যে ও কোন লক্ষ্যে জাতি হিসাবে আমাদের এগুনো বাঞ্ছনীয়, তা জাতীয় স্তরেই সুপরিকল্পিত ও সুনির্ধারিত হওয়া আবশ্যিক। নইলে সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাজ ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের সরকার ও আমলা স্ব স্ব স্বার্থেই দেশের আর্থিক রাষ্ট্রিক স্বার্থ নিয়ে যে-ব্যবসা করছে, তা কোন দিন বন্ধ হবে না। কারণ এমনি সরকার ও আমলা গোষ্ঠী চরিত্রে জুয়াড়ী। ব্যক্তি জুয়াড়ী যেমন পরিবারকে পথে বসায়, সরকারি জুয়াড়ীও রাষ্ট্রকে দীন দুর্বল ও মর্যাদাহীন করে।

আমাদের জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে ব্রিটিশ-ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সব সময়েই কেবলই প্রতিহত হবে স্বাধীন ভারতে, এ কারণ আশঙ্কায় মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বা বাসভূমি কামনা করেছিল মুসলমানরা মুসলিমলীগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের জন্য সংখ্যানুপাতে চাকরি ও পরিষদ সদস্যপদ এবং এমনিতর সবক্ষেত্রে সংখ্যানুগ স্বার্থ রক্ষার দাবি পেশ করার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদায়ের জন্যই লর্ড মিন্টোর পরামর্শে ১৯০৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় মুসলিমলীগ নামে সর্বভারতীয় রাজনীতিক সংস্থা। বহুকাল এ সংস্থা ছিল জনসম্পর্ক বিরহী উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের মুসলিম নেতাদের সমিতি।

১৯৩৭ সনের পর থেকে উত্তর ভারতে ধনী মানী মুসলিমদের নেতৃত্বে এবং বাঙলার জমিদার শোষিত চাষী মজুর ও চাকরিকামী কিন্তু বাবুদের দ্বারা বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিমদের সমর্থনে মুসলিমলীগ বাঙলায় এবং ধনেমানে প্রবল কিন্তু সংখ্যায় দুর্বল মুসলিমদের বিহারে ও উত্তর প্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যায় গুরু মুসলিম অধ্যুষিত এখনকার পাকিস্তানের কোথাও সে-দিন মুসলিমলীগ শিকড় গাড়তে পারেনি। কারণ সে-অঞ্চলের মুসলিম মনে আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দু প্রবলতার ভীতি ছিল অনুপস্থিত। আর্থিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ভীতিই যে মুসলিমদের পাকিস্তান দাবির উৎস, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল তখনই, পাকিস্তান দাবির বিকল্প হিসাবে ১৯৪৫ সনে যখন ব্রিটিশ সরকারের দেয়া ব্রিটিশ ভারতে আঞ্চলিকবর্গে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ সাগ্রহে গ্রহণ করল। জওহরলালের মুখে কংগ্রেসী কাপট্যের আভাস পেয়েই শঙ্কিত জিন্নাহ পরে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূল কারণ সংখ্যাগুরুর আর্থিক প্রাশাসনিক শোষণ-পীড়ন ভীতি হলেও পাকিস্তান দাবির উচ্চারিত যুক্তি ছিল মুসলিমদের জাত-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম দুটো জাতি। কাজেই পাকিস্তানদাবির মূলে ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। ১৯৪৭ সনে লর্ড মাউন্টব্যাটন কার্যত পকিস্তানদাবি মেনে নিলেও এ দাবির ভিত্তি যে দ্বিজাতি তত্ত্ব তা গ্রহণ করেননি এবং এমনকি জিন্নাহকেও দ্বিজাতি তত্ত্বে আস্থা পরিহার করতে বাধ্য করেছিলেন। তার ফলেই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিলেটে গণভোট গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে।

যদিও মুসলিমলীগের ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যা-গুরু অঞ্চল নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটো রাষ্ট্রগঠনের দাবি ছিল তবু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ঐক্যের কিংবা অভিন্নতার আবেগ বশে ১৯৪৬ সনের দিল্লী কনভেনশনে মুসলিমলীগ সদস্যগণ অভিন্ন ও একক পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ সিদ্ধান্তের রূপায়ণে পাকিস্তানের রাজধানী হল করাচি এবং পরে রাওয়ালপিণ্ডি বা ইসলামাবাদ। এখনকার পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সারাকি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুস্তু, বালুচ, গুজরাটি প্রভৃতি ছিল ১৯৪৭ সনে অবিকশিত— প্রায় বুলির স্তরে। তাই তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ নিজেদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবার যোগ্য বলে কল্পনা করেনি। ফলে এ ব্যাপারে তাদের কোন দাবি বা বক্তব্য ছিল না এবং উর্দুর বিরুদ্ধেও ছিল না কোন আপত্তি, যদিও উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই (লাহোর শহর ছড়া) ভাষা ছিল না, এমনকি জনগণের বোধ্য ভাষাও ছিল না, সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বড়ো আমলাদের ও সেনাপতিদের প্রায় সবাই ছিল উত্তর ভারতের উর্দু ভাষী, আর কোলকাতা থেকে লাহোর অবধি প্রতাপে প্রবল মুসলিমলীগ নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া উর্দুর পক্ষে আর একটি প্রবল যুক্তি ছিল যে-জাত-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে হাসিল হল, অঙ্গে ও আত্মায় সে-স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণবাহী হচ্ছে উর্দু, আরবী হরফ, ফারসী। কাজেই পাকিস্তানকামী মুসলিম মাত্রই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাদরে সাগ্রহে বরণ করতে রাজি। ঢাকা শহরের শিক্ষিত বাঙালীরা দেখল, কেবল উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হলে উত্তর ভারতের উর্দুভাষীদের (এরাই তখনকার পাকিস্তানের মালিক, ভোক্তা ও নিয়ন্তা) সঙ্গে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা করতে পারবে না, তা ছাড়া বাঙালী মুসলিমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতো শিক্ষা, ভাষা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুন্নত নয়। এদের ভাষা রবীন্দ্রসম্পদে পুষ্ট বিশ্বনন্দিত। কাজেই উর্দুর পাশে বাঙলার ঠাঁই হওয়া চাই। স্মরেণ্য যে, যুক্তি হিসাবে কোন কোন বাঙালী পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হিসাবে বাঙলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালেও তাতে আন্তরিকতা ছিল না বলে সে দাবি সমর্থিত কিংবা জোরালো হয়নি। এর পশ্চাতে ছিল হিন্দু ভীতি বা বিদ্বেষ জাত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও তমুদ্দন প্রীতি।

বাঙলার দাবি নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব-কোন্দল-সংঘর্ষ। অবশেষে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কাগুজে স্বীকৃতি পেল বাঙলা। কারণ তখনো ইংরেজীই চলছিল সর্বত্র, বরং বাস্তব কারণে ও প্রয়োজনে ইংরেজীই চালাতে হচ্ছিল। বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল বটে, কিন্তু বাঙালী চেতনা ততদিনে ইসলামী ঐক্যচেতনা ম্লান করে দিয়েছে, বিলোপ করেছে তরুণদের চিত্তে। ফলে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ক্যানসারের মতোই ছড়াচ্ছিল নানা ক্ষেত্রে, এতকাল পরে পঁয়ত্রিশ বছরের কাল পরিসরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সাদা চোখে দেখছি আর ঋজু বুদ্ধিতে বুঝতে পারছি পাকিস্তান ভাঙার মূলে ছিল একটি কারণই, তা হচ্ছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা না থাকলে বিভাষীর শাসন-শোষণ প্রবঞ্চনা এমনি প্রকট হয়ে উঠত না। ব্রিটিশ আমলের কোলকাতায়ও ছিল বিদেশীর ও বিভাষীর শোষণ ও দাপট, তবু বাঙালীর মনে কখনো এমন তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেনি। হিন্দুভীতি ও হিন্দু বিদ্বেষজাত ইসলামী জোসের আধিক্যবশে সে-দিনকার বাঙালীরা অভিন্ন ধর্মকেই দুই অঞ্চলেই মানুষের অবিচ্ছেদ্য ও চিরন্তর বন্ধন রজ্জু বলে স্বীকার করেই স্বপ্নচারিতার ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ দিয়েছিল। যেখানে আকাশের ও বাতাসের, চাঁদের ও সূর্যের রূপও ভিন্ন, যেখানে স্থান-জাতি-গোত্র-অবয়ব-ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ, ঘরবাড়ি, নিয়মনীতি, খাদ্য, পোশাক আবহাওয়া সবটাই ভিন্ন ও অচেনা সেখানে ধর্মমত কি অভিন্ন চেতনার জন্ম দিতে পারে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী ও রাষ্ট্রবিদরা অনুমান করেছিলেন ওই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুনই পাকিস্তান দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মাত্র তেইশ বছরের মধ্যেই তাদের অনুমান নিয়তির মতো অমোঘ হয়ে ফলল।

বাঙালীর সম্মতিক্রমেই দেড়হাজার মাইলের ব্যবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মধ্যেখানের বিপুলকায় ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে মনোবলে অস্বীকার করে সেদিন পূর্ব বাঙলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত-প্রদেশ নিয়ে সাড়ম্বরে ও সোৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাংবিধানিক ও প্রাশাসনিক নিয়ম-নীতি নির্ধারণে সংখ্যাগুরু বাঙালীরও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কাজেই আভিধানিক অর্থে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সংজ্ঞানুসারে স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালীও ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক।

সুতরাং বাঙালীরা ১৯৪৭ সালে চৌদ্দই আগস্ট থেকেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। যৌথ পরিবার ভেঙে ভাইরা যখন পৃথগন্ন হয় তখন তাকে স্বাধীনতা বলে না, কিংবা তামিলনাড়ু, অথবা বিহার বা রাজস্থান ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তারা নতুন করে স্বাধীন হবে না, বিচ্ছিন্ন হবে মাত্র। দিল্লী সরকারে উত্তর প্রদেশের লোকের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য থাকে বলেই ভিন্নভাষী দক্ষিণ ভারত যেমন পরাধীন নয়, অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলো কি পরাধীন? পরাধীন হলে যুক্তরাষ্ট্র নামের কোন তাৎপর্যই থাকে না। স্বাধীন বাঙলাদেশ ও তার অপর শরিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ১৯৭১ সনে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে। একে অধীনতা থেকে মুক্তি বলে আখ্যাত করলে জাতির ও ইতিহাসের অবমাননা হয় মাত্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙলাদেশ ও বাঙালী পরাধীন ছিল ভাবলে বলতে হবে ১৯৪৭ সনে বাঙালী মুসলমানরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছায় ভিন্ন জাতির দাসত্ব বরণ করেছিল। অতএব ১৯৭১ সনে বাঙালীরা বাঙলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।' ১৯৭১ সনের সংগ্রাম ছিল প্রবল দলের বা শরিকের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ যদি স্বদেশী ও স্বধর্মী স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণের অধিকার আদায় করে বা জনগণের প্রতিনিধি রূপে কৃষাণ মজদুর সরকার গঠন করে তাকে স্বাধীনতা অর্জন বলা যাবে না। জারের রাশিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার রূপান্তর তাই স্বাধীনতা নয়—গণমুক্তি। এ-ও তেমনি। কবি শামসুর রহমান তার স্বাধীনতা কবিতায় গণমুক্তির এ উল্লাসকেই বলেছেন স্বাধীনতা। সুতরাং ১৯৭১ সনে যুদ্ধ ছিল পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যুদ্ধ। এ সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক তাৎপর্য ও ফল এক কথায় দেশ-কালহীন মুসলিম ভাতৃত্ব ঐক্য বা জাতীয়তা থেকে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের দৈশিক জাতীয়তা চেতনায় তথা বাঙালীত্বে উত্তরণ। এ-ও সত্য যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক পাকিস্তান না হলে বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক বাঙালাদেশও সম্ভব হত না। অতএব ২৬ শে মার্চ কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর নাজাত দিবস হতে পারে, কোন সংজ্ঞাতেই আজাদী দিবস হিসেবে স্মরেণ্য নয়। বরং বাঙালী জাতীয়তার উন্মেষ মুহূর্ত হিসেবে জাতীয় দিবস হিসেবে স্মরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

পাকিস্তান আন্দোলনেরও সার্থক শুরু বাঙালীর হাতে, কিন্তু শেষটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না, যেমন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন সংকল্প ও সংগ্রাম ছিল বাঙালীরই, তবু সাফল্য এনেছে ও পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যরা। ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূলে সিপাহী জনতা গণবাহিনী ছিল বলে স্বয়ং জিয়াউর রহমানই ৭ই নভেম্বর প্রথম রেডিও ঘোষণায় স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কার্যত ক্ষমতা গেল জিয়ার চক্রান্তে সামরিক জান্তার হাতে এবং পরে তার নিজের হাতে। এবারেও তাই শুরু ও শেষ এক হাতে থাকেনি, এভাবে হয়নি। তাই ভূতের মুখে রাম নাম উচ্চারণের মতো দিল্লী-মস্কোর নির্দেশ অকালে অসময়ে আকস্মিকভাবে বাঙলাদেশের অপ্রস্তুত সরকার ও আমলারা না জেনে না বুঝে এবং অনিচ্ছায় উচ্চারণ করেছে রাষ্ট্রের চার নীতি ১. গণতন্ত্র২. ধর্মনিরপেক্ষতা ৩. জাতীয়তা ও ৪. সমাজতন্ত্র। এর মধ্যে যে আন্তরিকতা বা অকপটতা ছিল না, ছিল ফাঁকির ফাঁক, তার প্রমাণ অজ্ঞ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য কুমীরের এক ছানাকে দশবার দেখানোর মতো এক নীতিকে চার নামে রঙিন করে ঘোষণা করা হল। কেননা, সমাজতন্ত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা আর কৃষাণ মজুরের বা দলীয় গণতন্ত্র থাকেই, তা রশুনের মতো অভিন্নমূল এবং সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী উপজাত। দিল্লী-মস্কোর সমাজতন্ত্রী বিদেশীদের দিয়ে সমাজতন্ত্রের কপটবুলি আওড়ানোর ও জিগির তোলানের পরিণামে দেখা গেল কখনো গণতন্ত্র, কখনো মন্ত্রিতন্ত্র, কখনো নায়কতন্ত্র নামে সরকারের ও সংবিধানের রূপ বদলাচ্ছিল ঘন ঘন। আর দলের সমাজতন্ত্রীরা লুটে হত্যায় ধর্ষণে পীড়নে দেশব্যাপী জোর-জুলুমের ও ত্রাসের বিভীষিকা স্থায়ী করে রেখেছিল। ফলে এমন আপাত সর্বশক্তিমান সর্বজনীন বাকশাল নেতা নিহত হওয়ার মুহূর্তেই পানির ছোঁয়ায় নুন যেমন, তেমনি ভাবে হাওয়া হয়ে গেল বাকশাল ও সমাজতন্ত্র। মুজিব হত্যার পরে বাঙলাদেশ বিশ্বস্ত ইয়াঙ্কী মুৎসুদ্দীর কবলে পড়ে, তার হাত থেকে দিল্লী-মস্কোর এজেন্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন, সিপাহী জনতা গণবাহিনী ৭ই নভেম্বর তাকে হত্যা করে নির্বোধের মতো আরেক সেনানীর হাতে তুলে দিল ক্ষমতা। তিনি তখন ইয়াঙ্কী সৌদি টাকায় ধরাকে করছেন সরাজ্ঞান। তিনি এবং পরবর্তী সেনানী শাসক জুয়াড়ীর ঝুঁকি নিয়ে প্রচণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করছেন। আর অন্যান্য চালাকি দিয়ে করছেন বাজিমাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশকে দৃঢ় আর্থিক ও নৈতিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে তার একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি আদর্শ থাকা আবশ্যিক। এর জন্য প্রাথমিক ভাবে নীতিনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ লক্ষ্যে সুষ্ঠু বিদেশ নীতি নির্ধারণ আর দেশকে বৃহৎ শক্তির খপ্পর বা ছোবল মুক্ত রাখার জন্য সযত্ন সতর্কতা প্রয়োজন। আমাদের দীনদুর্বল রাষ্ট্রের প্রায় স্বনির্ভর হওয়ার ও সার্বভৌম থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করা। আর এ মুহূর্তে জনগণস্বার্থে জনকল্যাণ লক্ষ্যে সামন্ত-বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক প্রতিবেশ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রিত ইয়াঙ্কী-সৌদি প্রভাবিত সরকারকে ভদ্রলোকের স্বার্থমুখী রাজনীতি পরিহার করতে বাধ্য করাই সরকার বিরোধী রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া দরকার।

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ

১৫১৬ সন থেকেই পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আসা শুরু করেছে। একশ বছরের মধ্যে য়ুরোপীয় বেণে কোম্পানীরা—পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ এবং আর্মেনীয়রা—সমুদ্রপথে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তখন বিনিময় মাধ্যম পণ্য থেকে মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়েছে বহুল পরিমাণে। দেশী বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-মহাজন-গোমস্তা-দেওয়ান-দালালের চেতনায় এ নতুন রীতি নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। সে-সঙ্গে দেশী রাজপুরুষ পরিবারেও সহজে অর্থসম্পদ অর্জনের বাসনা হয়েছে প্রবল। তখন কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারী মাত্রই ঈর্ষার ও আকর্ষণের পাত্র, কোম্পানীর লোক মাত্রই দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাণিজ্যনীতিতে, যুদ্ধাস্ত্রে, হিসেব রাখার পদ্ধতিতে, বাণিজ্যচুক্তির ধরনে-ধারণে, পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞানে আর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নতুন এবং অনন্য।

পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি গোটা য়ুরোপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, চিন্তায় ও চেতনায়, সম্পদে ও সমস্যায়, বিশ্বাসে ও সংস্কারে, নিয়মে ও নীতিতে, মতে ও পথে, বিদ্যায় ও বোধে নানা ভাঙা-গড়ার বিরোধ বিবাদের, সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে বিজয়ে-উৎকর্ষে উন্নত ও উত্তীর্ণ। এরা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পাঁচ মহাদেশের সর্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করেছিল উন্নততর বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও বাণিজ্যবুদ্ধি প্রয়োগে। উত্তর আফ্রিকার ও এশিয়ার সভ্য-ভব্য মানুষের রাজা-রাজ্য তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই শেষাবধি টিকতে পারেনি। ইংরেজের ভারত জয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাপ্ত হলেও, তুর্কীসাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অবশ্য য়ুরোপীয় শক্তির ১৯১৮ সন অবধি সময় লেগেছে। এতকাল পরেও আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-প্রকৌশলের ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসাদপুষ্ট য়ুরোপের কাছে আজো আফ্রো-এশিয়া সমকক্ষতা দাবি করতে পারছে না। জাপান অবশ্যই ব্যতিক্রম।

কাজেই মীরজাফর-জগৎশেঠ-রাজবল্লভ ষড়যন্ত্র না করলেও, পলাশীতে যুদ্ধ না হলেও, য়ুরোপীয় যে-কোন কোম্পানি ভারত দখল করতই। তার প্রমাণ, অনুরূপ ষড়যন্ত্রের সুযোগ না-পেয়েও একশ বছরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ এক রকম বিনা যুদ্ধেই ইংরেজের পদানত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। এ সূত্রে গোয়া, দমন, দিউ, কারিকল, মাহে, পণ্ডীচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি এলাকায় পর্তুগীজ ও ফরাসী অধিকার স্মর্তব্য।

তখন ভারতব্যাপী চলছিল অবক্ষয় যুগ, অর্থাৎ তখন নীতিনিষ্ঠা, বিবেক, আদর্শানুগত্য, দায়িত্বচেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি এদেশের মানুষে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। সিরাজুদ্দৌলা তাই পলাশীর পরাজয়েই নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ, মীর জাফর নবাব হয়েও অসহায়, মসনদলোভী বিশ্বাসঘাতক মীর কাসিম তাই অসমর্থিত ও পরাজিত।

তা ছাড়া, তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ছিল বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী। দেশের সত্তর ভাগেরও বেশি অধিবাসী ছিল অমুসলমান। স্বল্প সংখ্যার শাসক মুসলিম থাকত শহরে—শাসনকেন্দ্রে, দেশজ মুসলিমেরা ছিল নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের ও নির্বিত্তের নিরক্ষর বৃত্তিজীবী দরিদ্র মানুষ। দেশী খ্রিস্টান ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে যেমন কোনো আত্মিক-বৈবাহিক-সামাজিক-প্রাশাসনিক সম্বন্ধ ছিল না, এদের মধ্যেও ছিল তেমনি অনাত্মীয়তার অপরিচয়ের আর অসম্পর্কের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া দেশজ মুসলিমদের মধ্যে কৃচিৎ কেউ সাক্ষর শিক্ষিত হিসেবে মোল্লা-মুয়াজ্জিম-মৌলবী-মুন্সী-উকিল-হাকিম-কাজী থাকলেও, অন্য সব ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বিত্তে নগণ্য। হিন্দুর গাঁয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা ছিল জোত-জমির, অর্থ-সম্পদের, বিত্ত-বেসাতের ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী। পঞ্চায়েত পাটওয়ারী-রাজস্বসংগ্রাহক গোমস্তা ছিল চিরকালই হিন্দু। অতএব সাধারণভাবে দেশী বৃত্তিজীবী আতরাফেরা বা আজলাফেরা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা চিরকালই ছিল হিন্দু জমিদার-মহাজন-গ্রাম্যপ্রশাসক-চিকিৎসক-শিক্ষকের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের কালিক রেওয়াজমতো দাসপ্রায় অস্পৃশ্য দীন-দুর্বল অজ্ঞ-অনক্ষর প্রজা। কাজেই স্বধর্মী তুর্কী-আফগান-মুঘল-ইরানী রাজা-রাজপুরুষের, শাহ-সামন্তের জ্ঞাতিত্বের গৌরব-গর্ব অনুভব করবার কিংবা জাতির শক্তি-সম্পদের ছিটেফোঁটা লাভের সুযোগ তারা পায়নি কখনো। আজো বাঙলায় বিহারে উড়িষ্যায় পুরোনো আশরাফ মুসলিমদের কৃচিৎ কেউ দেশজ মুমীনের বংশধর। অতএব পতনযুগে কোন্দলাসক্ত তুর্কী-মুঘল-ইরানী শাসক-সুবাদারে দেশজ মুসলিমের সাহায্য সমর্থন পায়নি। আর বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসকের প্রতি হিন্দুদের প্রীতি প্রত্যাশিত ছিল না। বাস্তবেও তারা নাকি তখন মুসলিম বা মুঘল শাসনের অবসানকামী হয়ে উঠেছিল[১]। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকেই ছিল হিন্দু। সুতরাং মীর কাসিমের পরাজয়ে (১৭৬৪ সনে) বা দিল্লীর বাদশাহ থেকে দেওয়ানী লাভে (১৭৬৫ সনে) ইংরেজ কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্রুততর হয়েছিল মাত্র।

কোম্পানী কেবল শোষণ করবে, কি শাসন-শোষণ সমভাবে চালাবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে কোম্পানীর প্রায় তিরিশ বছর লেগেছিল। অবশেষে ১৭৯৩ সনে ইংরেজরা শাসনের দায়িত্ব ও শোষণের শাসকসুলভ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এর আগের তিরিশ-পয়ঁত্রিশ বছর ছিল বন্দরনগরী কোলকাতার ইংরেজ-বাঙালীর বেদেরেগ বেপরওয়া জনসম্পদ লুটপাটের কাল। তখন কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষায় অজ্ঞতা, এবং দেশী বেণে ফড়ে-গোমস্তা-মুৎসুদ্দি দেওয়ানের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব জনজীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে। কার দণ্ড কখন কার মুণ্ডে পড়েছে দেখবার জানবার ও বলবার লোক ছিল না তখনকার কোলকাতায়, তথা দেশে। দ্বৈত-শাসন নামের দুঃশাসনে ও নৈরাজ্যে ঘুষখোরের, জালিমের, মতলববাজ টাউটের, জমিদার-মহাজনের, লুঠেরার, মৌজুতদারের, প্রতারকের ও লম্পটের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল দেশ। এ সময়ের দুর্নীতি-দুষ্কর্মের জন্যেই হয়েছিলেন ক্লাইভ ও হেষ্টিংস অভিযুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজের হাতে শাসনক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবিভাগের তুর্কী-মুঘল-ইরানীরা ও উত্তরভারতীয় পদস্থ কর্মচারীরা উত্তরভারতের দিকেই পালাল। যে-নগণ্য সংখ্যক লোক রয়ে গেল, তারা মুর্শিদাবাদেই থাকল, কিছু বিদেশী বুদ্ধিমান উকিল মুর্শিদাবাদ ছেড়ে রোজগারের লোভে কোলকাতায় চলে এল। কোলকাতায় আরও এল উর্দুভাষী বৃত্তিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিছু মুসলিম। ফলে কোলকাতায় কোম্পানীর প্রাশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তাদানের জন্য বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ধনী-মানী-জ্ঞানী হিন্দু পুরুষ পাওয়া গেল অনেক, চাকরী করার জন্য তো মিলল অসংখ্য। কিন্তু দেশজ মুসলিমদের প্রতিনিধিরূপে তাদের হয়ে তাদের স্বার্থে তাদের জন্যে কোম্পানীকে পরামর্শ দেয়ার কোনো বাঙলাভাষী দেশজ মুসলমান মিলল না। আর দেশজ মুসলিমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক এবং বৃত্তি-বেসাতগত জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না বিদেশাগত উর্দুভাষী ফরাসী-বিৎ কোলকাতা ও মুর্শিদাবাদ শহরবাসী কোম্পানীর উপদেষ্টাদের। আশ্চর্য তবু সে-ধারায় উর্দুভাষী জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রায় ১৯৪৭ সন অবধি বাঙালী মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান ছিল অধিকাঠামোয় নামত শাসক-শাসিত; কার্যত শহরে-বন্দরে-দপ্তরে, সেনাবিভাগে, দরবারে মুসলমান ছিল হিন্দুর ও শাসকগোষ্ঠীর সম বা ঈষৎ-অসম শরীক বিশেষ। গোটা ভারতে রাজস্ব বিভাগে হিন্দুর চাকরি ছিল প্রায় একচেটিয়া। তেরো-চৌদ্দ শতকে গাঁয়ে হয়তো মুসলিমই ছিল না, পনেরো শতক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতি শতকে বেড়ে বেড়ে শতকরা পাঁচ/দশ/পনেরো/বিশ/পঁচিশ হচ্ছিল হয়তো আঠারো শতক অবধি। আর যেহেতু গাঁয়ে গঞ্জে জমাজমি, অর্থসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, জমিদারী, মহাজনী, চিকিৎসা, রাজস্বআদায় ও প্রশাসন প্রভৃতি ছিল সাতশ বছর ধরে বর্ণ-হিন্দুদের তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের অধিকারে, সেহেতু গাঁয়ে-গঞ্জে দেশজ মুসলিমেরা ছিল নির্জিত আর বর্ণ-হিন্দুর শাসিত ও শোষিত, এবং তারা ছিল অস্পৃশ্য বৃত্তিজীবীদেরই সমশ্রেণীর। ব্যতিক্রম ছিল বিরল। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে তুর্কী-আফগান-মুঘল আমলে বর্ণ-হিন্দু ও মুসলিম ছিল অসম, অপ্রতিযোগী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী।

কোম্পানী আমলে আকস্মিকভাবে সে সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেল; যদিও বাহ্য বৈষয়িক সম্পর্ক রইল অটুট। এখন হিন্দু-মুসলিম পরস্পর প্রতিবেশী, শাসক-শাসিত নয়। আগেই কার্যত তা-ই ছিল, কারণ শাসক মুসলিমেরা ছিল ব্রিটিশের মতোই বিদেশাগত এবং প্রশাসনকেন্দ্রবাসী, তারা কখনো প্রতিবেশী ছিল না। এখন তারা মুর্শিদাবাদে নবাব বাড়ীতে ছাড়া আর কোথাও দৃশ্যমান নয়। হিন্দুর মনে বিদ্বেষ ছিল শাসক মুসলমানের প্রতি, তাদের অভাবে ব্রিটিশ বিদ্বানরচিত ইতিহাস পড়ার ফলে (তুর্কী-আফগান-মুঘল নামের পরিবর্তে অভিসন্ধিমূলক মোহামেডান বা মুসলমান নামে প্রয়োগের প্রভাবে, অথচ ইংরেজ কখনো খ্রীস্টান হল না।) হিন্দুরা তাদেরই গাঁয়ের দাসপ্রায় অস্পৃশ্য নিঃস্বপ্রজাকে প্রাক্তন তুর্কী-মুঘল প্রভুর জ্ঞাতি কল্পনাকরে তাদের প্রতি চিন্তায়, কথায়, কাজে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে ঘৃণার, অবজ্ঞার, উপহাসের, নিন্দার, ক্ষোভের ও বিদ্বেষের বিষ ছিটাতে লাগল ডনকুইকসোটি কায়দায় সারা উনিশ শতক ধরে।

নিরবলম্ব দেশজ নবশিক্ষিত মুসলিমেরাও হিন্দু-ব্রিটিশের বানানো এ তত্ত্ব লুফে নিল। কামার -কুমার-তাতী-তেলী-ডোম-শিকেরী-চাষী-মজুরের জ্ঞাতি দেশজ আতরাফ মুসলিমরা এভাবে তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী ও জ্ঞাতি হয়ে একাধারে খান্দান এবং স্বধর্মীয় জাতিচেতনা লাভ করে হল ধন্য। এতকাল পরে তারা উপলব্ধি করল-দিল্লী আগ্রার বেবাক কেল্লা-কুঠি, মঞ্জিল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

., তাজমহল-শালিমারবাগ এক হিসেবে তাদেরই, নিজের না হলেও চাচার ধন-দৌলত খ্যাতির মতোই, ভোগে না আসুক-পরিচয়-গৌরব থেকে বঞ্চিত করে কে! তখন থেকেই ভারতভর্ষ নয়, স্পেন-উত্তর আফ্রিকা-আরব-ইরান হয়ে মধ্য এশিয়া অবধি যেখানে যা কিছু মুসলিম নামসম্পৃক্ত সবটাই হল তাদের বলতে গেলে নিজেদেরই। কেননা ইসলামে দেশকালের গুরুত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান স্বীকৃত নয়, কেবল স্বধর্মীয় অভিন্ন সত্তাই একমাত্র পরিচয়চিহ্ন। এ জন্য উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম চার দশক অবধি নজরুল ইসলাম তক সব মুসলমানের অনুধ্যানের, রচনার, আলোচনার, গৌরবের, অনুভবের, চিন্তার ও ভাবনার বিষয় ছিল পনেরো শতক অবধি অতীতের মুসলিম জগৎ। স্বদেশের ও নিজেদের উদ্ভবের ইতিহাসে অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পরে উর্দুভাষী দেলোয়ার হোসেন, এবং আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ কয়েকজন মাত্র। এভাবে তাদের কায়িক ও বৈষয়িক বাস ছিল বাঙলাদেশের কুটীর ও প্রান্তরে, ক্ষেতে ও খামারে, হাটে ও বাজারে, কিন্তু মানস-বিচরণের ক্ষেত্র হল স্বপ্নে-ও শুনে-পাওয়া অদেখা ভুবন। এ রোগ তাদের মোটামুটি ১৯৪০ সন অবধি ছিল। রাজনৈতিক চাল হিসেবে বাঙলার একশ্রেণীর সুবিধেবাদীর প্রচারণার ফলে অজ্ঞ ও স্বল্প-বুদ্ধির মুসলিমেরা এখনো এ রোগের শিকার।

বস্তুত কোম্পানী আমলে এভাবেই বাঙলার হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশী বানানো তত্ত্ব অঙ্গীকার করেই জীবনের ও মননের সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্তায় ও পৃথক ধারায় পরস্পরের চিরশত্রু, চিরপ্রতিযোগী, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আধুনিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা নিয়ে আত্মরক্ষণে ও আত্মপ্রসারণে আত্মনিয়োগ করে। কোম্পানী-শাসনের ও প্রতীচ্যবিদ্যার ফলে বাঙলায় এবং ভারতেরও সর্বত্র শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হিন্দুজাতীয়তায় এবং মুসলিম স্বধর্মীর অভিন্ন জাতিচেতনায় মুগ্ধ ও ঋদ্ধ হচ্ছিল। কেউ আর নিছক বাঙালী বা বিশুদ্ধ ভারতীয় রইল না। বিরোধের ও বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়িয়েছিল উর্দু ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। হিন্দুরা দেখল উর্দু রচনায় হিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, তাই তারা নাগরী অক্ষরে হিন্দীর চর্চা শুরু করল। বাঙালী মুসলিমও দেখল হিন্দুর বাঙলা রচনায় মুসলিম অনুল্লিখিত কিংবা অবজ্ঞাত বা নিন্দিত, তারাও তাই বাঙলাকে জানল হিন্দুর ভাষা বলে, নিজেদের জন্য তাই কামনা করল উর্দু বা ফারসী।

নিরক্ষরদের মধ্যে অবশ্য এ সচেতন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু বিশ শতকের ভোটাধিকার তাদেরও মনে ও আচরণে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনা এবং বিধর্মীদ্বেষণা জাগিয়ে দিয়েছে। এভাবেই বাঙলার তথা ভারতের হিন্দুর ও মুসলিমের স্বতন্ত্র ইতিহাসের শুরু, যদিও হাট-ঘাট বাট-মাঠ আর খরা-ঝড়-বৃষ্টির ও বন্যা রইল অভিন্ন, যদিও ওলা-শীতলা-ম্যালেরিয়া দেবীর মতো জমিদার-মহাজনেরাও হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য কখনো স্বীকার করেনি।

॥ ২ ॥

এবার কোম্পানী আমল থেকে আধুনিক বাঙালীর ক্রমোন্নতির ধারা আমাদের আলোচ্য। হিন্দু ও মুসলিম নিজেরা জীবনধিরোধী স্বাতন্ত্র্য-চেতনা বয়ে চললেও প্রকৃতি তাদের সমর্থন করেনি। এর পরেও তারা স্ব-স্ব প্রয়োজনে দ্বন্দ্বে-মিলনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বাস করছে। এক জনের গায়ের গন্ধ লাগছে অপরের নাকে, একের ঘরের আগুনে পুড়ছে অন্যের ঘর। যুক্ত বঙ্গে যেমন ছিল, স্বাধীন বঙ্গে-বাঙলায়ও তেমনি রয়েছে। কাজেই কোন অবস্থাতেই কেউ কারো প্রতি উদাসীন থাকতে পারছে না, নিজের বাঁচার গরজে তাই ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, বিদ্বেষে, শত্রুতায়, সহিষ্ণুতায় কিংবা বিরোধে-বিবাদে স্মরণ ও সহাবস্থান করতেই হচ্ছে। অতএব, হিন্দুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস কিংবা মুসলিমের ইতিকথা এ-দুয়ের কোনটিকে বাদ দিয়ে বাঙলার ও বাঙালীর কোন বৃত্তান্তই কখনও পূর্ণাঙ্গ হবে না- হতে পারে না।

কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরেই ছিল ইংরেজ কোম্পানীর এবং একান্তভাবে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। বন্দরে ইংরেজের বাণিজ্য সহযোগী, বেয়ারা, বরকন্দাজ, সেবন্দী থেকে বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-মহাজন-দেওয়ান-দালাল এবং ব্যবসায়ী অবধি সবাই ছিল হিন্দু। কাজেই দেশের মুঘল-উত্তর ইতিহাসের শুরু থেকেই শাসক ইংরেজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগী শহুরে বর্ণহিন্দুর উত্থান ও আত্মবিস্তার সমান্তরাল।

বলেছি, ১৭৯৩ সনের পূর্বেকার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরব্যাপী নৈরাজ্যের ও অস্থিরতার সুযোগে কোম্পানীর বন্দরবাসী দেশী-বিদেশী কর্মচারীরা এবং প্রাশাসনিক কাজের মফস্বলবাসী সহযোগীরা ঘুষে, লুটে ও তথাকথিক সওদাগরীতে প্রাপ্ত অর্থে ধনী-মানী হয়ে উঠেছিল। তাদের কেউ কেউ সেই অর্থ পুঁজি করে হল ব্যবসায়ী, কেউ কেউ নিলামে জমিদারী কিনে হল জমিদার। নতুন ও পুরোনো জমিদারের কেউ কেউ ছিল মুর্শিদকুলী খান নিয়োজিত ইজারাদার বংশীয়ও।

কিন্তু উনিশ শতকের আগে রামমোহন ব্যতীত কেউ তেমন ইংরেজী ভাষা জানত না। আভাসেও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী শব্দ উচ্চারণে ইংরেজ মনিবের সান্নিধ্য ও সুনজর-লিপ্সুরাই তখন ছন্দোবদ্ধ ছড়া বা আর্যার মাধ্যমে [if যদি is হয় what অর্থ কি? ইত্যাদি] ইংরেজী শেখার কসরত করছিল। আর উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই ইংরেজ কর্মচারীদের ঘরে ঘরে বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দির সন্তানদের ইংরেজী শেখানোর স্কুল বসে গেল—এখনকার ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় গিন্নির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মতোই। এ ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের নাম ও দান স্মরণীয়।

ইংরেজীকে প্রশাসনের মাধ্যম করার কথা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে তখনো না আসলেও বিচক্ষণ লোকেরা বুঝল—আত্ম-উন্নয়নের তথা ধনী-মানী হওয়ার যাদুমন্ত্র হচ্ছে ইংরেজীভাষা উচ্চারণ; তাই কোলকাতায় গোঁড়া হিন্দু আর জাতিচ্যুত কালো খ্রিস্টান অথবা ফারসী-সংস্কৃত প্রিয় পণ্ডিত-মুন্সী সবাই সাগ্রহে সাড়ম্বরে ১৮১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত করল বর্ণহিন্দুর জন্য হিন্দু কলেজ। এখন থেকে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী বিদ্বানেরা পরিচিত হচ্ছিলেন পণ্ডিত, মুন্সী, ও মৌলবী নামে, আর ইংরেজী শিক্ষিত তরুণেরা অভিহিত হচ্ছিল 'এজু' (Educated) আখ্যায়—এবং ডিরোজিওপন্থী দ্রোহীরা নিন্দিত হল 'ইয়ংবেঙ্গল' রূপে। সাধারণ এজুরা হল ডেপুটি, মুন্সেফ, দারোগা প্রভৃতি এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের চাকুরে, আর শিক্ষক উকিল ব্যবসায়ী প্রভৃতি। ইয়ংবেঙ্গলেরা স্বকালে ছিলেন নিন্দিত, পরবর্তী কালে হলেন বন্দিত। ইয়ংবেঙ্গল ও অন্যান্যদের অভিব্যক্ত মনীষাই একালে 'রেনেসাঁস' অভিধায় চিহ্নিত ও প্রশংসিত হয়েছে ও হচ্ছে।

সম্প্রতি রেনেসাঁস বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। হালে প্রশ্ন উঠেছে উনিশশতকী কোলকাতার প্রতীচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের-মনীষার অভিব্যক্তিকে, কর্মের উদ্যোগকে 'রেনেসাঁস' বলা যায় কি-না, গেলেও তাকে বাঙলার ও বাঙালীর রেনেসাঁস আখ্যায় অভিহিত করা যাবে কি-না।

মানবীয় মনীষার, মননের, সংস্কৃতির ও সভ্যতার য়ুরোপীয় উৎকর্ষে ও বিকাশে আমরা মুগ্ধ। তাই আমাদেরও সর্বপ্রকার জীবনস্বপ্ন য়ুরোপীয় আদলে রচিত। কাজেই নামে-কামেও আমরা সব সময়ে য়ুরোপকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি। স-তাৎপর্য 'রেনেসাঁস' কথাটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখান থেকেই নেয়া। রেনেসাঁস হচ্ছে জীবনের জাগরণ, পুরোনো ধারার বা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ নবজাগরণ বা নবজন্ম। ইতালীর জাগরণের ইতি-কথা রচয়িতা 'জর্জো ভাসারি-ই নগজাগরণ বা নবজন্ম ঘটানো সৃষ্টি-সম্ভব মনস্বিতা অর্থে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আসলে ব্যক্তিজীবনেও ঘটে নবজন্ম— নবজাগরণ। যৌবনের দৈহিক-মানসিক পরিপূর্ণতার অবচেতন অনুভবে ব্যক্তিও আত্মপ্রকাশের আত্মপ্রতিষ্টার ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষাচালিত হয়, তখন সে কল্পনায়, কর্মে, উদ্যমে, উদ্যোগে এক অনির্বচনীয় আবেগ ও আগ্রহ অনুভব করে, প্রাণের এই আনন্দিত আবেগ, অস্পষ্ট অনুভবের এই পুলক তাকে করে কস্তুরী-মৃগের মতোই চঞ্চল। দিকে দিকে আত্মবিস্তারের এই সময়কার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে তার প্রবণতা, শক্তি ও মেধা অনুসারে বানায় কোনো কিছুর স্রষ্টা বা কোনো কিছুর উদগাতা, উদ্ভাবক, আবিষ্কর্তা কিংবা প্রতিষ্ঠাতা।

সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর ধারায় প্রবহমান জনস্রোত। কোনো দেশে কোনো বিশেষ কালে আকস্মিকভাবে একই সময়ে যদি তেমন একদল শক্তিমানের মনীষা জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায়, কর্মে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে-দেশের, সেকালের মানুষের জাতীয় জীবনে 'রেনেসাঁস' ঘটেছে বলে মানতে হবে। কারণ এর ফলে অর্থাৎ ওই মনীষীদের অবদানে সেদেশে সেকালে জীবনচেতনায় ও জগৎ ভাবনায় রূপান্তর ঘটে। তখন জীবনযাত্রায়, মতে-মেজাজে, মনে-মননে, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কে, আর সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে উৎকর্ষ আর পরিবর্তন। জীবনরুচির এ সামূহিক উদ্‌বর্তন বা উৎকর্ষই ঘটায় মানব সভ্যতায় যুগান্তর—সৃষ্টি হয় নবযুগ। এ হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানস-বসন্ত।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁস এক দিনেরও নয়, একস্থানেরও সৃষ্টি নয়। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ, প্রকট হতে এবং অভিপ্রেত সামগ্রিক ফল পেতে সুদীর্ঘ চারশ বছরের নিরলস বিরামহীন আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে পুরোনো বিশ্বাসসংস্কারের, নিয়মনীতির ও রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে। সে-সংগ্রামে জানে-মালে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে অনেক। শুধু সুখ-স্বস্তি নয়, —ধনপ্রাণও দিতে হয়েছে অনেক মানবমুক্তিকামীকে—জ্ঞানসাধককে।

রেনেসাঁসের উন্মেষ ইতালীতে পনেরো শতকে। কিন্তু সেখানে তা নিবদ্ধ ছিল না—ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। এক হিসেবে সৃষ্টিশীল মনীষা বা মনস্বিতা ঠিক দেশ-কাল পরিবেশ নির্ভর নয়—ব্যক্তিক মনস্বিতা, আগ্রহ, উদ্যম ও উদ্যোগ ভিত্তিক। তাই রেনেসাঁস সম্ভব করার জন্য দৈশিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিক জীবনের উন্নতমান, সর্বজনীন শিক্ষা, কুসংস্কার মুক্তি, জনগণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক সুরুচি, শ্রমজীবী বা বৃত্তিজীবী মানুষের সহযোগিতা, সমর্থন বা দাবির প্রয়োজন হয় না। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষকালের যাজকপীড়িত নিরক্ষর সমাজ ও কোন্দলপরায়ণ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত দেশ ও রাজ্য, নির্যাতিত দাস-ভূমিদাসের দারিদ্র্য প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু রেনেসাঁসকে সার্থক ও জনকল্যাণকর করতে হলে উক্ত সব কিছুর প্রয়োজন হয়। ইতালীর রেনেসাঁসে প্রেরণা যুগিয়েছে সমকালীন আরবমনীষা ও তাদের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কৃতির সঙ্গে পরিচয়। বাঙলাদেশের কোলকাতা শহরে উদ্ভূত রেনেসাঁসের জন্য এসব কিছুই দরকার হয়নি। প্রতীচ্যবিদ্যা ও য়ুরোপীয় জীবনের উন্নত মানই তাদের সে-আদলে জীবন রচনায় প্রণোদিত করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন অবলম্বনযোগেই আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম ইন্ধন। কিন্তু আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন অনুভূত না হলে, জ্বালানোর অভিপ্রায় না জাগলে ইন্ধন উপযোগ হারায়। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, পেত্রার্ক প্রমুখ বহু বহু মনীষীর ক্রমে অভিব্যক্ত মনস্বিতার প্রসূন। এরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্পেনে আরববিদ্যার ঔজ্জ্বল্যে দেখে এবং আরবীর মাধ্যমে গ্রেকো-রোমক কৃতির আকর আবিষ্কারে। নতুন পরিচয়ে এমনি উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাবিলনীয়-আশীরীয় বিদ্যায় ইরানী, ফিনিসীয়-মিশরীয় বিদ্যায় গ্রীক, গ্রীক বিদ্যায় রোমক, গ্রেকো-রোমক বিদ্যায় আব্বাসীয় আরব এবং আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্যায় একালের বিশ্বভুবন অনুপ্রাণিত। এ তাৎপর্যে রেনেসাঁস সভ্যজগতের স্থানে স্থানে কালে কালে ফিরে আসে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক কালের বিদ্যাকেন্দ্রগুলো, মনস্বিতার আকস্মিক স্ফুরণকাল আর এককালের শহরগুলো এ সূত্রে স্মরণ্য।—কিছু মনীষী-মনস্বির মাধ্যমে কোনো দৈশিক ভাষিক কিংবা জাতিক জীবনে প্রাত্যহিকতার গ্লানিমার, আটপৌরে নীতিনিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের, বৈচিত্র্যহীন চিন্তাচেতনার, ঝিমিয়ে-পড়া জীবনের, বিরক্তি-ধরা জীবিকার নিগড়ভাঙা নতুন চেতনার, চিন্তার, উদ্যমের উদ্যোগের উন্মেষই হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পুরোনো-ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাববার, কল্পনা করবার, শিখবার, জানবার, আঁকবার, গড়বার, করবার এবং উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের আর স্বদেশকে, স্বভাষাকে ভালোবাসবার এবং নিজেকে শ্রদ্ধা করবার ও আত্মপ্রত্যয়ী হবার প্রেরণা ও স্বাধীনতা দান করে।

রেনেসাঁসের প্রভাবে জনজীবনে তথা জাতীয় জীবনে শাস্ত্র, সমাজ রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বিবর্তন ঘটে। অতএব, পরিণামে মানুষের মন-মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারে, বিজ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষের সংস্কারের ও সঙ্কীর্ণতার কবলমুক্তি ঘটে, বিবেকের প্রভাব হয় প্রবল, মানবিক বোধ পায় বিকাশ, এগিয়ে যায় সমাজ-সংস্কৃতি সভ্যতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের পুনরুজ্জীবনকামী ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন অতীতাশ্রয়ী ও অতীতমুখী বলেই রেনেসাঁস সম্পৃক্ত নয়। ওতে নতুন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, হৃতপুরাতনকে ফিরে পাবার সাধনা ছিল মাত্র।

উন্নততর চিন্তা-চেতনা-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে নতুন পরিচয়েই এই যন্ত্রযুগের আগে মানুষের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে কালান্তর ঘটত। শঙ্করাচার্য ইসলামের মোকাবিলায় বিপন্ন স্বধর্মীর স্বার্থেই নতুন মত-পথের প্রয়োজনীয় অনুভব করেন। তিনি একাধারে অদ্বৈতবাদ দিয়ে ঠেকালেন ইসলামের প্রসার আর মায়াবাদ দিয়ে আকৃষ্ট করলেন জৈন-বৌদ্ধদের। দক্ষিণভারতের রামানুজ-ভাস্কর-মাধব-নিম্বার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদ, উত্তরভারতের নানক-কবির-দাদু-রামনন্দ-একলব্য-রামদাস প্রমুখের সন্তধর্ম, বাঙলার চৈতন্যদেবের প্রেমবাদ আর পনেরো-ষোল শতকের বাঙলার ন্যায়-স্মৃতি চর্চা ইসলামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পরিচয়েরই ফল। এরও আগের পাল আমলের বিদ্যাচর্চা আর সেনযুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি ছোটো খাটো বিদ্যাচর্চা আর সেনযুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতিও ছোটো খাটো রেনেসাঁসই। এমনি তাৎপর্যে এ মুহূর্তের ঢাকায়ও রেনেসাঁস ঘটছে।

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মমতও খ্রীস্টধর্মের মোকাবিলার সৃষ্টি। পৌত্তলিকতা ছেড়ে তিনি হলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মবাদী। আর মূলে ব্রাহ্মমত ছিল সনাতনীদের আক্রমণ এড়ানোর ফিকিরমাত্র। এর জন্ম আড্ডায়-ক্লাবে-আত্মীয়সমাজে। উনিশ শতকী কোলকাতায় উদ্ভূত রেনেসাঁস তো ইংরেজী শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফল। য়ুরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান আর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবই বাঙালীদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস—এ সঙ্গে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যাটসিনি-গারিবল্ডীর ব্যক্তিত্ব তাদের প্রভাবিত করেছিল। বলেছি এজুরাই (ইংরেজী শিক্ষিতরাই) এই রেনেসাঁসের স্রষ্টা। এরা ছিলেন কোঁতে, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, রুশো, ভল্টেয়ার, হবস, লক, এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি দার্শনিকের ভক্ত। এজুদের মধ্যে সবাই একমতের ও এক পথের লোক ছিলেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়বাদী কেউ কেউ নাস্তিক, কেউ কেউ অজ্ঞেয়বাদী, অধিকাংশ আস্তিক এবং সবাই কম বেশি য়ুরোপীয় উদার মানবিকতাবাদী। আবার হিতবাদী-প্রত্যক্ষতাবাদী রূপেও ছিল এদের প্রশাখা। উনিশ শতকের এজুরা কথায়, কাজে ও লেখায় প্রকাশ করেছিলেন তাদের মনীষা—ছড়িয়ে ছিলেন তাদের চিন্তা-চেতনার বীজ। এ সব কিছুতেই-যে ঐক্য ছিল, তা নয়, বৈপরীত্যও ছিল সুস্পষ্ট। রেনেসাঁস বহুজনের নানা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ফসল। তবু এদের মধ্যে দূর থেকে চেনা যায় তিন মিনারের মতো—তিন আলোক-স্তম্ভের মতো তিন ব্যক্তিত্বকে—প্রথমে রামমোহন, মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র। এদের সহচর-অনুচর, সঙ্গী-সহযোগী ছিলেন অনেকেই। রামমোহন ছিলেন সংশয়বাদী, বিদ্যাসাগর ছিলেন নাস্তিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নাস্তিক শেষে ভক্তিমার্গী হিন্দু। রামমোহনের ছিল সমকালীন প্রাগ্রসর বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনা, বিদ্যাসাগরের ছিল দেশ-দুর্লভ নির্দ্বৈধ নিঃসঙ্কোচ উদার মানবতায় ও মানববাদে আস্থা, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল সমকালীন য়ুরোপীয় আদর্শের জ্ঞান-কর্ম-নীতিনিষ্ঠ সমাজ ও জাতিগঠনপ্রয়াস।

সচেতন বা অবচেতন ভাবে সাময়িক উৎসাহে কিংবা ব্রত হিসেবে আরও যারা স্ব-স্ব কথায়, কাজে ও লেখায় রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তাদের মধ্যে তিন খ্রীস্টান—লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত; অনেক ইয়ংবেঙ্গল—প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবকৃষ্ণ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ; তিন নাস্তিক—অক্ষয় কুমার দত্ত, রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; বহু ব্রাহ্ম—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীননাথ সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামপ্রাণ গুপ্ত; এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশ মুখার্জি প্রমুখ উদার মতের হিন্দু, আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রতীচ্যবিদ্যা প্রভাবিত গোঁড়া হিন্দু; এবং রামকৃষ্ণপরমহংস, বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রতীচ্য দর্শন প্রভাবিত সংস্কারপন্থী হিন্দু, আর আঁকিয়ে-লিখিয়ে ছাড়াও শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীরা কোলকাতাকে অঙ্গে ও অন্তরে অনুকৃত বা কৃত্রিম লণ্ডন করে তোলায় ছিলেন প্রয়াসী। তবু এর মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলনে খ্রীস্ট-ধর্মের প্রসার, রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের আন্দোলনে ব্রাহ্মমতের বিস্তার এবং স্বধর্মীর জাতীয়তাবাদের উন্মেষে প্রতীচ্যদর্শনের প্রভাব রুদ্ধ হয়ে যায়।

সপ্তম ও অষ্টম দশকে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণেরা— মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ চন্দ, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হিন্দুমেলার প্রতীকী আদর্শে নানা আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে এ রেনেসাঁসকে পূর্ণতা দান করেন। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের, সাময়িক পত্রিকার এবং নাটকের সহায়তার পরিমাণ অশেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁসের আলোচনায় কেউ ঈশ্বরগুপ্তের নাম নেন না। অথচ সাহিত্য-যে ব্যক্তিগত রসবিলাস নয়, এর-যে দৈশিক, জাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, গুরুত্ব ও উপযোগ রয়েছে; জাতি গঠনে, সংস্কৃতি নির্মাণে, নতুন চিন্তা-চেতনার প্রচারে ও প্রসারে এর দান যে অপরিমেয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে বাঙলাভাষার মাধ্যমেই-যে এর চর্চা আবশ্যিক, তা সচেতনভাবে প্রথম উপলব্ধি করেন ঈশ্বরগুপ্তই। এ চেতনা নিয়ে তিনিই প্রথম প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারের, ঐতিহ্য রক্ষণের এবং সাহিত্যের পরিচিতি সংকলনের, আর সাহিত্যসম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ ও আয়োজন করেন। তারই ফলে সংবাদ প্রভাকরে সাহিত্য প্রকাশন, কবি ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা, কবিওয়ালাদের কৃতি ও পরিচিতি সঙ্কলন এবং সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। কাজেই স্বল্পশিক্ষিত হলেও য়ুরোপীয় চেতনা-সূর্যের বাঙলায় উদয়লগ্নে ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন তার রশ্মিস্নাত একজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কালিক নিয়মে এজুদের প্রায় সবাই বাল্যে ও কৈশোরে বিবাহিত ছিলেন এবং মনস্বিদের প্রায় সবাই প্রতীচ্য-বিদ্যার মতো বিলেতী মদ্যকেও সাদরে-সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজনারায়ণ বসু, হরিশ মুখার্জি, রামতনু লাহিড়ী, রাধাকান্ত দেব, আর হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন-কমবেশি এদের সবারই ছিল মদানুরাগ। এটিকে তারা সংস্কারমুক্তির প্রথমপাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তই নাকি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বিলেতী পোশাক-পরুয়া ব্যক্তি।

বহুকাল ধরে অবক্ষয়গ্রস্ত একটা দেশের, কালের ও সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ নতুন চিন্তার-চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে এতকালের জাতীয় জড়তার ও জীর্ণতার মধ্যে জীবনের ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, লেখায়, নতুন কিছু বলে, করে, গড়ে লিখে এবং একে জনগণকে নতুন কিছু শিখিয়ে জানিয়ে লোকমনে শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও আশা জাগিয়ে এবং মাটির ও মানুষের প্রতি, স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি, জগতের ও জীবনের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়িয়ে—এক কথায় যা কিছু শ্রেয় সৌসবের প্রতি সাধারণকে আকৃষ্ট করে—জাতীয় জীবনে যে উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটান তারই নাম রেনেসাঁস। সংজ্ঞাবদ্ধ করলে রেনেসাঁস মানে—জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা, নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তি। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করলে উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার রেনেসাঁসের মূল্যায়ন সহজ হবে। এবার বাঙলার ও ইতালীর রেনেসাঁসের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখা যাক :

১. ইতালীর রেনেসাঁসের উন্মেষ সৃষ্টিশীলতায়, বাঙলার রেনেসাঁসের প্রকাশ প্রতীচ্য শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহে ও ফলে।

২. কোলকাতা শহরের রেনেসাঁস, মনীষীদের স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর স্বার্থচেতনায় ছিল সীমিত। তারা যতটা হিন্দু হলেন ততটা বাঙালীও হলেন না, আর অস্পৃশ্যদের কিংবা দেশজ মুসলিমদের হিতচেতনা ছিলই-না তাদের মনে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস উদারতায় ও মানবতায় দীক্ষা দিয়েছিল।

৩. 'এজু'দের মর্ত্যপ্রীতি, জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা ছিল বটে কিন্তু তা নির্বিশেষে মানবিকবোধের বা মানবতাবোধের বিকাশ ঘটায়নি। য়ুরোপীয় খ্রীস্টান সমাজে বর্ণভেদ ও বিধর্মীভেদ ছিল না, ছিল শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের ভেদ। 'এজুদের অনুরাগ ও শ্রেয়োবোধ নিবদ্ধ ছিল স্বশ্রেণীর ও স্বধর্মীর পরিসরে—মাটি ও মানুষ এদের চেতনার ছিল অবহেলিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃত ভূ-ভাগে ও সুদীর্ঘ কালে, উৎস ছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি (গ্রীক, রাম), এতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল সমকালীন আরব সভ্যতার। বাঙলার রেনেসাঁসের তথাকথিক উন্মেষ ও বিকাশকাল পঞ্চাশ বছরের পরিসরে ছিল সীমিত। প্রেরণার উৎস ছিল সমকালীন লন্ডন-প্যারিস।

৫. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার মোহ ঘুচিয়ে মানুষকে করেছিল মাতৃভাষামুখী, অন্ধ বিশ্বাস-সংস্কার কাটিয়ে মানুষ হয়েছিল যুক্তিবাদী ও মর্ত্যমুখী। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ, প্রোটেস্টান্ট মতের উদ্ভব, যাজকের দৌরাত্ম্যহ্রাস, কৃষকদের অধিকারচেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিকাশ, দিকে দিকে আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, শাস্ত্রীয় শিক্ষার চেয়ে মানববিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার, জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঐহিকতার প্রাধান্য দান, সর্বোপরি ব্যক্তি, সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং ন্যায় সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসাজাত তত্ত্বোপলব্ধির আলোকে জীবন-যাত্রার নিয়মনীতির ও রীতিপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং বাস্তবের হিতকর চাহিদা পূরণও ছিল য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের লক্ষ্য ও ফল। বাঙলার ব্রাহ্মমতে, রামকৃষ্ণের সেবাধর্মের আর বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত গীতানুগ কর্ম-ভক্তির তত্ত্বেই সংস্কারমুক্তির প্রয়াস অবসিত। এদের ব্যাখ্যার তত্ত্বের মধ্যে পরিহারের কথাই রয়েছে বেশি। এবং তা কেবল পুরোনোকে আস্থার ও আশ্বাসের অবলম্বনরূপে দৃঢ় করে আঁকড়ে থাকার প্রবর্তনা দেয়ার জন্যই। সমকালীন মানুষের মর্ত্যপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐহিক-মানবিক চেতনার পুষ্টিসাধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাঙলার রেনেসাঁসে সিসৃক্ষার চেয়ে সংস্কার স্পৃহাই (Reform-এর ঈহা) ছিল বেশী। এরা revivalist ও reformist-এর মতো adjustment ও accomodation-এর তথা মেরামতের প্রয়াসী ছিলেন, নতুন কিছু নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না।

৬. য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল ভাষিক ও দৈশিক জাতিচেতনা, বাঙলার রেনেসাঁস জাগাল স্বধর্মীর স্বাজাত্যবোধ। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস দিল গ্রহণশীলতা-আত্মপ্রসারের প্রেরণা, বাঙলার রেনেসাঁস মানুষকে করল আধুনিক য়ুরোপের অনুকারী আর প্রাচীন ভারতের অনুরাগী।

৭. সমাজবিপ্লব রেনেসাঁসের লক্ষণ না হলেও, চিন্তাবিপ্লব যেহেতু রেনেসাঁসের প্রাণস্বরূপ, সেহেতু রেনেসাঁস জীবনের ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রূপ বদলাতে, রঙ চড়াতে অবশ্যই সাহায্য করে। য়ুরোপে তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস কথায়, লেখায় ও রেখায় মাত্র অভিব্যক্তি পেয়েছে, কাজে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। তাই মনীষীরা ছিলেন সীমিত অর্থে ও ক্ষেত্রবিশেষ উদার, ক্বচিৎ দ্রোহী এবং প্রায়ই সনাতন নিয়মনীতির অনুগত— জাতিভেদে, বর্ণভেদে ও অধিকারভেদে আস্থাবান।

৮. নিঃস্ব নিরক্ষর মানুষ য়ুরোপেও রেনেসাঁসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়নি, তবে পরোক্ষে নানা আন্দোলনের ও ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছিল। আমাদের দেশে প্রজাপীড়নে কোন উপশম কিংবা কৃষকবিদ্রোহে কোন সহায়তা রেনেসাঁসের জনক মনীষীরা বা তাদের চেলা ভদ্রলোকেরা দেননি। আর সিপাহীবিপ্লবের সময়ে তাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাই জাগেনি, বরং ব্রিটিশের পরাজয়ের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছিলেন তারা।

আসলে আঠারো শতকের ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লুট করার মতোই অনায়াসে লব্ধ বিত্তের অধিকারী কোলকাতায় ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট ধনী-মানী-বিষয়ীরা উনিশ শতকের উষাকাল থেকে সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। মুখ্যত তাদের থেকেই উনিশ শতকে একদল জ্ঞানী কর্মী-মনীষী, শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক-সাংবাদিক-স্বাদেশিক-চিকিৎসক-শিক্ষক-প্রকৌশলী কোলকাতা শহর মাতিয়ে তুললেন। এই 'এজু'রা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়ংবেঙ্গলরা— এক কথায় মনীষাসম্পন্ন তরুণেরা প্রাচ্যদ্বেষণা ও প্রতীচ্যএষণা তথা প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই শুরু করেন তাদের জীবনের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ। এদের মনীষীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিরই সগর্বে নাম দেয়া হয়েছে 'রেনেসাঁস'। দু'একজন ব্যতিক্রম ব্যতীত এদের কারো সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। তাই উনিশ শতকী এইসব মনীষীর চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে স্ববিরোধ প্রচুর ও প্রকট। এঁদের জাগরণ নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল-জাত জ্ঞান এঁদের স্বরূপে বই-পড়ে-পাওয়া য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল-জাত জ্ঞান এঁদের মনে য়ুরোপীয় আদলে জীবনরচনার আকাঙ্ক্ষা জাগাল। কোলকাতায় বসে লন্ডন-প্যারিসের সূর্যের বিম্বিত আলোকে অনুকূল লন্ডনে য়ুরোপীয় মন-মনন-সংস্কৃতির ধারক নকল নাগরিক হতে চাইলেন এরা। য়ুরোপীয়চিত্ত অধিগত ছিল না, কেবল বাইরের আভরণটাই এঁদের আকৃষ্ট করেছিল; তাই সব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল অসঙ্গতি।

বাঙলার রেনেসাঁসকে অন্য নিরিখেও যাচাই করা যায়, সে নিরিখের ভিত্তি এই পারিবারিক জীবনে যেমন আকস্মিকভাবে পরিবারের সব সন্তানই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পদে ও বিত্তে বড় হয়, জাতীয় বা দৈশিক জীবনেও তেমনি একদল জ্ঞানী-গুণী সৃষ্টিশীল মনীষীর একই সময়ে আবির্ভাব ঘটে, প্রাচীন গ্রীসে রোমে বাগদাদে যেমন দেখা গেছে। তেমনি একই সময়ে কয়েকটি গুণী-জ্ঞানীর পরিবারও মেলে, যেমন, দুই ঠাকুর পরিবার, বসু পরিবার, সোহরাওয়ার্দী পরিবার, মুখার্জী পরিবার, নেহেরু পরিবার, হাক্সলী পরিবার, প্রাচীন বাগদাদের বখ্‌ত ঈসা পরিবার, প্রাচীন বাঙলার দণ্ডপাণি পরিবার ইত্যাদি। এ মাপে দেশের, কালের, ধর্ম-সম্প্রদায়ের, গোত্রের বা জাতির জীবনে ওই সূর্যাত্মক উঠতিই রেনেসাঁস—অন্য সব লক্ষণ বা কারণ-কার্য গৌণ। রেনেসাঁস চিরকালই শিক্ষিত শহুরে মানুষের দান বটে, তবে শিক্ষিত মাত্রেই মনীষাধর নয় বলেই চিরকাল রেনেসাঁস নিরলদর্শন ঘটনা বা অভিব্যক্তি।

বছরে বারোমাসই কোনো-না-কোনো তরুতে-লতায় ফুল পাওয়া যায়, এবং একটা গাছ দিয়ে বাগান হয় না। সুবিন্যস্ত বহু তরু-লতার সমাবেশে তৈরি স্থানই বাগান। যে-কোনো কালে ও স্থানে সাধারণ মাপের দু'চারজন মনীষী থাকেনই—বুদ্ধিজীবী থাকে অসংখ্য। তাতে রেনেসাঁস হয় না; প্রথম শ্রেণীর বহু কৃতী ও কীর্তিমান মনীষীর অবদানই কেবল রেনেসাঁস। অতএব রেনেসাঁস হচ্ছে উচ্চবিত্তের ও মধ্যবিত্তের; বুর্জোয়ার মনীষীর একই স্থানে, একই কালে, একই ভাষায় আকস্মিক নির্লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট বিচিত্র বর্ণালি প্রকাশ ও বিকাশ। কাজেই একজন মানববাদী বামপন্থীর কাছে মানব-মনীষার এই উজ্জ্বল ও বহুমুখী প্রকাশ সুন্দর হলেও সার্থক নয়। এর রূপ আছে, রস আছে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিপ্রেত উপযোগ নেই।

বলেছি, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতীচ্যবিদ্যাই বাঙলার এ রেনেসাঁসের উৎস, এ শিক্ষা 'তাসের দেশে' ঘটাল ভাববিপ্লব, শিক্ষিতদের মনে জাগাল দিগন্তবিসারী আকাঙ্ক্ষা, জীবনে সম্ভাবনার দ্বার হল উন্মুক্ত, খুলে গেল সংস্কারের নিগড়-বিশ্বাসের বাঁধন। এরকম সুফল প্রত্যাশা করেই লর্ড ম্যাকলে (১৮০০-৫৯) এদেশে ইংরেজীর মাধ্যমে প্রতীচ্য বিদ্যা প্রচারের সুপারিশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, ইংরেজী পড়লে এদেশী মানুষের গায়ের রঙ অপরিবর্তিত থাকবে বটে, কিন্তু দেশী অঙ্গে নতুন অন্তর তৈরি হবে, চিন্তায়-চেতনায়, মনে-মেজাজে, মতে-মননে, রুচিতে-সংস্কৃতিতে, দায়িত্ববোধে-কর্তব্যনিষ্ঠায় কালো অবয়বের এক এক জন মানুষ য়ুরোপের প্রাগ্রসর সুনাগরিকের সমকক্ষ হবে; এবং ওই চরিত্র, ওই যোগ্যতা, ওই উদ্যম, ওই রুচি ওই অতিক্রান্তকালে প্রাচীন আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত বিদ্যা দান করতেই পারে না। সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-প্রযুক্তিবিদ্যার এক তাক ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে গুণে, মানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যে ও তত্ত্বে তুলিত হবার যোগ্যতা সত্যিই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জ্ঞানের আকর আরবী-ফারসী-সংস্কৃত বইয়ের ছিল না। কিন্তু এ যথার্থ মূল্যায়নে সেদিনকার বাঙালীর তথা ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তাই তারা একে উপনিবেশনীতি সম্পৃক্ত চাল বলে জানল। তারা বুঝল—কেরানী, খ্রীস্টান ও অনুগত প্রজা তৈরির জন্যেই ইংরেজীভাষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা চালু করার সুপারিশ করেছেন লর্ড ম্যাকলে। ১৮৩৫ সনের দোসরা ফেব্রুয়ারীর সনেটে এ সুপারিশ করার আগে ১৯৩৩ সনের ১০ই জুলাই ম্যাকলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে যে মহৎ আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা হয় অজ্ঞতার দরুন, নয়তো অভিসন্ধি বশে উল্লেখ করেননি কেউ, ফলে লর্ড ম্যাকলে এখনো কেবল নিন্দার পাত্র। আমরা তার সে-বক্তৃতার সে-অংশ এখানে তুলে ধরছি :

"It may be that public of India may expand under our system till it has outgrown that system; that by good Government, we educate our subjects into a capacity for better Government, that having been instructed in European knowledge they may, in some future age, demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not, but never will I attempt to evert or retard it. Whenever it comes it will be the proudest day of English history. To have found. a great people sunk in the lowest depth of slavery and superstition, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all the privileges of citizens, would indeed be a title to glory all our own. The sceptre may pass away from us, unforeseen recidents may derange our most profound schemes of policy. Victory may be in constant to our arms. But there are triumphs which are followed by no reverse. There is an empire exempt from all natural causes of decay. Those triumphs are the speciffic triumphs of reason over barbarism that empire is the unperishable empire of our arts and our morals, our literature and our laws. [July 10, 1833]—ম্যাকলে-নিন্দুকদের এ ভাষণ স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ঐহিক জীবনের গুরুত্বচেতনা, মানববিদ্যার কদর, শাস্ত্রের উপর মানবতার প্রাধান্য, ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়বুদ্ধি, নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার চেতনা প্রভৃতি একাধারে রেনেসাঁসের ও আধুনিকতার লক্ষণগুলো ইংরেজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশে মন্থর গতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে।

বাঙলায় রেনেসাঁস যারা ঘটালেন আর যারা রেনেসাঁসের ফল ভোগ করলেন তারা ছিলেন কোলকাতা শহরের ধনী-মানীরা ও জমিদারেরা এবং তাদের সন্তানেরা—তাদের জীবনে যুক্তি, বুদ্ধি, রুচি, আনন্দ, আরাম বাড়ল বটে, তাদের চিন্তা-চেতনার জগৎ বিশাল হল বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, চাকরির, উৎকোচের ও উপঢৌকনের , ব্রিটিশের সহযোগীরূপে দেশী কুটিরশিল্পের বিলুপ্তিসাধনের, নীলকর সাহেবদের আদলে নীলচাষ করানোর, ব্যাঙ্কে মহাজনীতে আড়তদারীতে পুঁজি বিনিয়োগের, রাজস্ববৃদ্ধির ও আবওয়াব-সেলামীর প্রসাদ পেলেন রেনেসাঁসওয়ালারা এবং তাদের স্বগোত্রের ও স্ব-শ্রেণীর লোকেরা। আর নিঃস্বতার, দারিদ্র্যের, অনাহারের, পীড়নের, শোষণের এবং দুঃশাসনের শিকার হল দেশের শতকরা নিরানব্বই জন চাষী-মজুর-তাঁতী-মুলঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মানুষ। তা হলে রেনেসাঁসরূপ সামন্ত-বুর্জোয়ার চিৎপ্রকর্ষ গণমানবকে সমকালে কিছুই দেয়নি বরং পীড়ন ও বঞ্চনা বাড়িয়ে ছিল শত গুণ। তাদের বিদ্যা-বিত্ত-গুণ-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা তাদেরই স্বশ্রেণীর জীবনে ও জগতে বাসন্তী পরিবেশ তৈরি করেছিল মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলকাতা শহর ছিল জমিদারের, সওদাগরের, মহাজন আর শিক্ষিত চাকুরের, উকিলের, বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-দেওয়ান-দালাল-দোকানদারের স্বর্গলোক। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকণ্ঠা ছিল স্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে, ভেবেছেন ও তাদেরই সমস্যা [বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ, শিক্ষা] নিয়ে, চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশ পেয়েছে তাদেরই উপচিকীর্ষা। হিন্দুর অস্পৃশ্যতা দূর করার ইচ্ছা বা চেষ্টা ছিল না তাদের। এমনকি রেনেসাঁসের ও মানবমনীষার বহুমুখী ও মহত্তম বঙ্গীয় বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছে যে রবীন্দ্রনাথে, তার মধ্যেও সামন্ত-বুর্জোয়ার চরমতম উদার মান-বিকতাও অভিব্যক্তি পেয়েছে পঞ্চাশোত্তর বয়সে। সে-মানবিকতার নির্যাস হচ্ছে কৃপা, করুণা ও সৌজন্য: এবং বৃদ্ধবয়সে তার বিশ্বমানবতার উদারতম ও উদাত্ত বাণীতে সমাজবাদ সমর্থিত হয়নি। আবার বাণীতে যা উচ্চারিত হয়েছে, তাতেও অন্তরের সায় ছিল সামান্য। তাই জমিদারী ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে প্রবলের জোর-জুলুম থেকে দুর্বলকে রক্ষার অজুহাতে, রাশিয়া ঘুরে এসেও মানব-সাম্যে ও সম্পদ-সমতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেননি তিনি। তিরিশের দশকে বয়সে সত্তর-আশির কোঠায় পা রেখেও তিনি উনিশশতকী মন-মনন পরিহারে অসমর্থ। তাই তখন তিনি কেবল তাত্ত্বিক— জগৎ জীবনের স্বরূপসন্ধানী চিত্রে, কবিতায়, গীতিনাট্যে ও প্রবন্ধে। এমনকি বিদেশ-উদ্ভূত ধর্মের ও সংস্কৃতির ধারক বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায়— সৃষ্ট ভুবনে সাতশ বছরের দেশজ মুসলিমের ঠাঁই হয়নি হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ-রাজপুত-মারাঠা-শিখের পাশে। অতএব, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আজকের সমাজবাদবিরোধী, গণমানববাদবিরোধী যে-কোন মনস্বী-মনীষী বা সাধারণ বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক মাত্রই পরোক্ষে গণশত্রু। সুতরাং মানবমনীষার— মানব প্রতিভার সামন্তিক ও বুর্জোয়া বিকাশ ও প্রকাশ সাধারণ অর্থে মানবসংস্কৃতির ও সভ্যতার স্রষ্টা হলেও তাদের আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতা, মননশক্তি, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার অবশ্যস্বীকার্য হলেও, তাদের দানে-অবদানে গণমানব কৃচিৎ প্রত্যক্ষে ও সাধারণভাবে পরোক্ষে উপকৃত হলেও তা তাদেরকে শোষণ-পীড়নের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। আজো রোটারী ক্লাব ও লায়ন্স ক্লাব দানের ও জনসেবার ছলে দরিদ্র মানুষকে— মানবতাকে সগর্ব কৃপায় ও প্রতিষ্ঠানিক করুণায় অবমানিত করে চলেছে।

অতএব রেনেসাঁসের জন্যে গৌরববোধ করা, সগর্বে রেনেসাঁসের মহিমা কীর্তন করা, রেনেসাঁসওয়ালাদের প্রশংসা করা প্রকারান্তরে গণ-মানবের দুর্ভোগ দুর্দশাকে অস্বীকার করার এবং মুৎসুদ্দি-কমপ্রেডরের তারিফ করার সামিল।

বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, সংস্কৃতিকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কঠিন তরল বা বায়বীয় কোন পদার্থের মত সংস্কৃতিকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে একটা কিছু-যে আছে তা চেতনাসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়—উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। সংস্কৃতির কোন বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা 'অন্ধের হস্তীদর্শন-ন্যায়ে'র মতো ব্যাপার। সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যত আলোচনা করি, যতই মত-বিনিময় করি, মনে হয়, কোন দুইজন ব্যক্তির ধারণাই এ-সম্পর্কে হুবহু এক হবে না। কাজেই আমি যা বলব, তাও-যে আপনারা সবাই মেনে নেবেন, তেমন ভরসা আমার নেই। সংস্কৃতিকে যদিও ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কোন বস্তুর মত মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবহারিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার সংস্কৃতি নিহিত থাকে। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা—মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টার দ্বারা যে সৌন্দর্য-চেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগৎসৃষ্টি অর্জন করতে চায়—তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রুত জীবনচেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টনী-প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধি-সম্পন্ন ব্যক্তি-চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ— ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্বেই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং তখন তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। বাঙালী সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, য়ুরোপীয় সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি ইত্যাদি কথার তাৎপর্য এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

যে-কোন উদ্ভাবন-আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তার অনুভূতির ও প্রয়াসের ফল। সংস্কৃতির সঙ্গে এই উদ্ভাবনশক্তির সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, তাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা বা নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই। এজন্যে তারা গ্রহণশীল হয়েই সংস্কৃতিবান হয়। কাজেই সৃজনশীলতার সঙ্গে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। নইলে সংস্কৃতির ধারা সচল থাকে না।

এই-যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনুভবযোগ্য একটা বিমূর্ত বিষয় সংস্কৃতি—একে বুঝবার চেষ্টা করা অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো একটা ব্যাপার ছাড়া আর কি বলা যায়। আমাদের বাঙলাভাষী অঞ্চলের সামন্ত যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তাই এই অন্ধের হস্তী দর্শনেরই ব্যাপার।

সামন্ত যুগে বাঙলাদেশ বা বাঙলাভাষী অঞ্চল, কখনও এক ছিল না, অখণ্ড ছিল না। বাঙালী জাতি কিংবা বাঙলাদেশ বলেও কিছু ছিল না। এই অঞ্চলের, এই ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে কোন একক ঐক্যচেতনা বা জাতীয় চেতনাও ছিল না। সুতরাং সামন্ত যুগের বাঙলাদেশ যখন বলা হয়, তখন আমাদের আজকের ধারণাই জনমনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—আরোপ করা হয় ভিন্ন এক দেশ-কালের উপর। অর্থাৎ অতীতের বিচার করা হয় বর্তমানের অগ্রসর ধারণা দিয়ে।

হাজার বছর আগে অবধি এই ভূভাগ বিভক্ত ছিল ছোট ছোট রাজ্যে— জনপদরাজ্যে। অনেকগুলো ছিল জনপদ রাজ্য। তাদের মধ্যে কতকগুলোর নাম পাওয়া যায়, location-এর কথা জানা যায় এবং কতকগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সেকালে ছিল এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-অভিজ্ঞতা-আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে—বড়জোর রাজ্যকে কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলেরা চট্টগ্রাম জয় করলে বাঙলা একচ্ছত্র শাসনে আসে। আসাম কখনও জয় করতে পারেননি মুঘলেরা—যদিও আসামও ছিল বঙ্গভাষী অঞ্চল। কাজেই ব্রিটিশ শাসনের আগে গোটা বঙ্গ বা গোটা ভারত কখনও কোন একক শাসনে ছিল না। আমরা জানি, একক শাসনে না থাকলে কখনও একক জাতি গড়ে উঠতে পারে না এবং কখনও গড়েও ওঠেনি ব্রিটিশপূর্ব আমলে। ১৮১৮ থেকে সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র ইত্যাদির প্রকাশ আরম্ভ হওয়ার আগে কোন সর্ববঙ্গীয় সাহিত্যও ছিল না, কোন সর্ববঙ্গীয় একক চিন্তা-চেতনাও ছিল না। সর্ববঙ্গীয় চিন্তার আরম্ভ ইংরেজ আমলের ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনাপুষ্ট সাহিত্যে—উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে।

আমরা দেখেছি, ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলের বাইরে যায়নি। এখনকার বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশের বাইরে কখনও ধর্মমঙ্গল রচিত হয়নি। আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল পূর্ব বঙ্গের বাইরে কোথাও কৃচিৎ লিখিত হয়েছে। আমরা ষোল শতকের চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে দশ হাজার বৈষ্ণব পদ পেয়েছি, এবং তিন শ'র মত পদকার পেয়েছি—দীনেশ সেন বোধহয় ২৮৭ জনের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। —এই কবিদের কারও বাড়ী প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান বিভাগের বাইরে নয়। আমরা দেখেছি, এই-যে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল—এর একটাও পূর্ব বঙ্গে রচিত হয়নি। অতএব সারা বাঙলাদেশটা ১৮১৮ সনের আগে পর্যন্ত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কাজেই আমরা বলতে পারি—যখন থেকে কলকাতা শহর হতে পত্রিকা বের হচ্ছে, ইংরেজী শিক্ষিতরা বাঙলাতে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখছেন, তার আগে পর্যন্ত কখনও সর্ববঙ্গীয় সংহতিও ছিল না, সর্ববঙ্গীয় চিন্তা-চেতনাও ছিল না এবং কখনও সর্ববঙ্গের মানুষ পরস্পরকে আপনও ভাবতে পারেনি। যে-পরিচয় থাকলে-হৃদ্যতা থাকলে—প্রশাসনিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকলে আপনত্বের একটা দাবী গড়ে ওঠে, তা হয়নি। এখন যেমন বাঙলাভাষী মাত্রকেই আমরা বাঙালী বলছি—যদি ও-বা আমরা এক গোত্রীয় নই, তেমনি—একচ্ছত্র শাসনে থাকলে যেমন হয়—এক সময় আমরা পাকিস্তানীও ছিলাম—আমরা পেশোয়ারের, খাইবার পাসের লোককেও চিনতাম—তার political মত-পথের সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম এবং interested ছিলাম। কিন্তু ভারতেবর্ষের ছিলাম না, যেহেতু তা ছিল অন্য রাষ্ট্র। অন্য রাষ্ট্র হলেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়—পর হয়ে যায়। কাজেই সামন্তযুগে সব সময়ই আমাদের দেশ ছিল আঞ্চলিক।

আমাদের ঐতিহাসিক সূত্রের শুরু মৌর্য যুগ থেকে। মৌর্যরা উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ দখল করে রেখেছিল। পালেরা বাঙলাদেশের খণ্ডাংশে রাজত্ব করেছে বটে কিন্তু বাঙালী নয়। যে-কথাটা চালু রয়েছে, তা সত্য নয়। পালদের উত্থানও পাটনাতে—বিহারে, পতনও বিহারে। অবশ্য সেই বিহারের সীমা বোধহয় সে-যুগে আমাদের রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলটাতেই ছিলেন গোপাল। আর এতেই পালেরা পরিচিত হয়ে গেল বাঙালী বলে। আসলে পালেরা কখনও সমগ্র বাঙলাদেশের ওপর রাজত্ব করেনি। পাল আমলকে বাঙলার স্বর্ণ-যুগ বলা হয় বটে, কিন্তু পাল আমলে বাঙলাদেশে পালদের তেমন কোন অবদানের দৃষ্টান্ত আমরা পাইনে। পালেরা যদি শুধু বাঙালী হত, তাহলে পালদের আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলো বাঙলাদেশে হত। নালন্দা এখানে নয়, উড্ডীয়ানা এখানে নয়। শুধু মহাস্তানগড় এখানে, পাহাড়পুড় এখানে। এগুলো, মনে করলে, বাঙলাদেশের অন্তর্গত; আবার মনে করলে, সে যুগের বিহারের অন্তর্গতও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই মুঘল আমলের আগে—বিশেষ করে ইংরেজ আমলের আগে—উনিশ শতকের আগে—বাঙলাদেশ-বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনও এক ছিল না, একক শাসনে ছিল না, ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বাঙলাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্য ছিল, বিভিন্ন রাজা ছিল, বিভিন্ন রাজবংশ ছিল। জনসাধারণের আনুগত্যও ছিল বিভিন্ন রাজায় ও সংস্কৃতিতে। তারা পরিচিতও ছিল বিভিন্ন দৈশিক নামে। গোত্রীয় সর্ববঙ্গীয় কোন সংহতিবোধ ছিল না, জাতীয়তাবোধ ছিল না—আধুনিক জাতীয় চেতনা থাকার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আজকের আলোচনায় আমাদের ভৌগোলিক অবস্থার কথা ভাবতে হয়—প্রাকৃত অবস্থায় এই ভূভাগের মানুষের জীবনের কথা ভাবতে হবে। আজকের মন নিয়ে সে-কালের ঘটনা বিচার করতে গিয়ে আজকের অবস্থার সঙ্গে সে-কালের অবস্থাকে গুলিয়ে ফেললে আমরা বিভ্রান্ত হব।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, দুই হাজার বছরের মধ্যে—অশোক সুদ্ধ ধরলে তেইশশ' বছর হবে—এই তেইশশ' বছরের মধ্যে আমরা বাঙালী বলে মাত্র এক স্বদেশী রাজার নাম শুনি। তিনি শশাঙ্ক। তাও অন্য মত আছে। শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদে-কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি আসাম থেকে এসেছিলেন। এই একজনের নাম পাই। আর কারও নাম পাইনা। তারপর অনেক পরে নাম পাই আমরা এক বিদ্রোহী সামন্তের, নাম দিব্যক। দিব্যক, রুদ্রক আর ভীম মানে তিন পুরুষ। এই দেখি। আর আমরা বাঙালী শাসক দেখি না। হুসেন শাহ সৈয়দ হলে বাঙালী হননা। সৈয়দ হলে বাঙালী হওয়া যায় না—সে যুগে তো হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হুসেন শাহ হয় সৈয়দ হিসেবে সত্য, না হয় বাঙালী হিসেবে সত্য। আর এক বাঙালীকে জানি, যাকে বাঙালী বলে স্বীকার করলেও করা যায়, না-করলেও কোন ক্ষতি হয় না—তিনি হচ্ছেন রাজা গণেশ। গণেশ ব্রাহ্মণ যদি নন, তাহলে বাঙালী হতেই পারেন না—বহিরাগত। তার ছেলে যদু জালালুদীন বা মহেন্দ্র এবং তার পৌত্রসহ সবাই মিলে ১২/১৩ বছর রাজত্ব করেন। এ ছাড়া বাঙালী কখনও বাঙলাভাষী অঞ্চলে ১৯৪৭-এর আগে রাজত্ব করেননি। ১৯৪৭-এর পরের ইতিহাস বলার দরকার হয় না, আপনারা জানেন।

বাঙালী চিরকাল বিদেশী-শাসিত—বিজাতি-শাসিত। বাঙলাদেশের যেসব ধর্ম সেগুলোও বিদেশ থেকে আগত—হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম বিদেশ থেকে আসা, —উত্তর ভারত থেকে আসা, আরব থেকে আসা, এবং হিব্রু অঞ্চল থেকে আসা খ্রীস্টান ধর্ম। আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালীর যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব—তার কোনটাই বাঙালীর কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই-যে শিলালিপির বাহাদুরী আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী—সেই হাড়ি ডোম, চণ্ডাল, বাগদি— যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য—তাদের কথা তো বাঙলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোন অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালীল ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালী বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা— তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা—তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি। যেমন একালের মুসলমানেরা বই লেখে, বই থেকে মুখস্থ করে, এবং মনে করে যে, তুর্কী-মুঘলেরা তাদের স্বগোত্র। তারা ভাবে, ফিরোজ শাহ, শের শাহ, আকবর, আওরঙ্গজেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুদ্‌দৌলা তাদের স্বজাতি, স্বগোত্র। এবং এদের শাসনকে নিজেদের রাজত্ব মনে করে তারা গর্বে বুক স্ফীত করে। এতে তারা আত্মপ্রতারণা করে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে—মিথ্যা আস্ফালন করে। আমরাও বাঙলাদেশের ইতিহাস যখন বলি— তখন মিথ্যা গর্বে গর্বিত হতে চাই। তাতে স্বদেশের স্বজাতির আসল পরিচয় গোপন করে নানা কাল্পনিক কাহিনী দিয়ে মন ভরাতে চাই। কেন?

আজকাল যে কথাটা স্বীকৃত হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যদি অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের বংশধর হই, তাহলে এই অস্ট্রিক-মোঙ্গলেরা চিরকাল এ-দেশে ছিল নির্জিত, নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ মানুষ এখনও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের—অস্পৃশ্য। তারা কখনও মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। তাদের মধ্যে যারা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তারা সাঁওতাল, গারো খাসিয়া ইত্যাদি। যারা এখানে ছিল তাদেরকে দেখছি দাস ও অস্পৃশ্য। এদের কিছুলোক উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন রকমে আসা লোকের সঙ্গে মিশে উচ্চ বর্ণের হয়েছে, শাসকশোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকে কোন কোন বাঙালী যেমন স্বদেশকে ত্যাগ করেছে, বিলাতকে হোম মনে করেছে এবং সাহেব-ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা করেছে, ওদের সমাজে ওঠার চেষ্টা করেছে, লর্ড-সিন্‌হা পর্যন্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের মধ্য থেকেও যারা কিছুটা বড় হয়েছে, মাথা তুলবার চেষ্টা করেছে, তাদের কিছু কিছু শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা জাত বদলিয়েছে, খানদান বদলিয়েছে। যেমন আপনারা জানেন—নিজেরাও দেখেছেন—আজকে শেখ, কালকে খন্দকার, পরশু কোরেশী, তারপরের দিন সৈয়দ, ইত্যাদি ব্যাপার এখনও চলছে। আজকে দাস, কালকে চৌধুরী, মজুমদার, তার পরে দাসগুপ্ত সেনগুপ্ত ইত্যাদি খানদান পরিবর্তন ও জাতে-ওঠার প্রবণতা আজও আছে—প্রবলভাবেই আছে। খানদান ওঠা-নামার ব্যাপার চিরকাল ঘটছে। এর সবটাই যে কৃত্রিম, অন্য রকমেও বলতে পারি। এই দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন ছিল বৌদ্ধ। সে সময়ে তাদের কোন জাতিভেদ ছিল না। তারপর আবার যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণ হল, তখন সেন আমলে, নতুন করে বর্ণ বিন্যাস করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সমগ্র বর্ণ-বিন্যাসটাই হচ্ছে কৃত্রিম। অত্যন্ত কৃত্রিম। তার প্রমাণ বল্লালচরিতে আছে, কুলজীতে আছে, তার প্রমাণ জাতিমালা কাচারিতে আছে। কাজেই আমাদের পরিপূর্ণ পরিচয়টা জানতে হলে, বুঝতে হলে, সর্বপ্রকার সংস্কার ও সঙ্কোচ ত্যাগ করে আরম্ভ করতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, 'বাঙালী-বাঙালী' 'বাঙলাদেশী-বাঙলাদেশী' করে চিৎকার করলেই আমাদের আত্মপরিচয় মিলবে না। আমাদের বুঝতে হবে বাঙলাভাষী বিশাল ভূখণ্ডে সেকালে আঞ্চলিকভাবে জীবন গড়ে উঠেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, ধর্ম গড়ে উঠেছে, রাজ্য ও রাজত্ব গড়ে উঠেছে, শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সামন্তযুগে সর্ববঙ্গীয় বলে কোন কিছুই ছিল না—সমাজ ছিল না, রাজ্য ছিল না, ধর্ম ছিল না—কোন রকম সংহতিবোধই ছিল না। ধর্মের ক্ষেত্রে ও হিন্দু আমলে সারা বাঙলাদেশে একক দেবতার পূজো হয়নি। মনসার পূজো হয়েছে এক জায়গাতে, চণ্ডীর পূজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, শিবের পূজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, বিষ্ণুর পূজো হয়েছে আর এক জায়গাতে। এক ধর্মাবলম্বী হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ পূর্বকালে সামন্তযুগে—বাঙলাদেশে ছিল না।

অর্থনীতির দিক থেকেও সে-যুগে খণ্ড আঞ্চলিক রূপেরই সাক্ষাৎ পাই, কোন একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিস্থিতির পরিচয় পাই না। যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অবস্থার কোন মিল ছিল না। আজকের দিনে যেমন ঢাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজার দর আর কক্সবাজারের বাজার দর মোটামুটি একই থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে বাঙলাদেশের অর্থনীতির সম্পর্ক থাকে, তেমন অবস্থা সে-কালে কখনও ছিল না। তবে ব্যবসায় বাণিজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য আজকের মতো নয়। তার প্রকৃতি অনেক ভিন্ন। কোন অঞ্চলেই যেহেতু সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে না, সে-জন্যেই বিনিময়ের প্রচলন হয়েছিল। কাশ্মীরের শালের সেদিনও দরকার হয়েছিল। এটা কমনসেন্সের কথা। এর জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক মুদ্রা আবিষ্কার জরুরী নয়। আমাদের একটা প্রবণতা হল—সব-কিছুকে একটা সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার। বল্লাল সেন কিংবা লক্ষ্মণ সেন কিংবা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্‌র কালের কোন বিশেষ স্থানের অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন একটি ঘটনাকে যখন সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখনই সত্যের অপলাপ হয়— ইতিহাস বিকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকালের কোন কিছুরই সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার উপায় নেই।

আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সেই খণ্ডরূপ। এক অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতি বলে যে যুগের সংস্কৃতিকে অভিহিত করবার কোন উপায় নেই। এক অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের সংস্কৃতিও এক হয়নি, হতে পারেনি। সমাজে নানা রকম ভেদাভেদ ছিল। দাস-প্রভুর ভেদাভেদ ছিল। সামন্তপ্রভু আর কৃষকের মধ্যে ব্যবধান ছিল। ধর্মভেদে ছিল। জাতিভেদ ছিল। অধিকার-ভেদ ছিল। পোশাকে পরিচ্ছদে, খাওয়ায়-পরায়, চলায়-ফেরায়, কথায় বার্তায়, চিন্তায়-চেতনায়, জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল। ভেদাভেদ ছিল। তার প্রমাণ 'চণ্ডাল' : সপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ো' ইত্যাদি পাঁতি। মূল কথাটা হল, যারা চণ্ডাল, যারা ছোটলোক, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য তারা গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারবে না, গ্রামের বাইরে বাস করবে। দুই নম্বর, তারা পুরো চালের ভাত রেঁধে খেতে পারবে না, উচ্ছিষ্ট খাবে; যদি উচ্ছিষ্ট না পায় তবে তারা খুদ রেঁধে খাবে, ভাত বেধে খেতে পারবে না। পুরো কাপড়—নতুন কাপড় তারা পরতে পারবে না, তারা ছিন্ন বস্ত্র পরবে।—এগুলোর অধিকার ছিল না। আমি নিজে দেখেছি ১৯৪০-এর আগে সব লোকের জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। যেমন পিয়ন-চাপরাশির সাহেবের সামনে জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। ছোট লোকে বড় লোকে ব্যবধান ছিল। গ্রামাঞ্চলেও ব্যবধান প্রখর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছে। পোশাকে-পরিচ্ছদে, রীতিনীতিতে ভেদাভেদমূলক অনেক রীতি এখন উঠে গেছে। এগুলো আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি। কাজেই সংস্কৃতির কথা যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, মানুষের সংস্কৃতিতে সেকালে বারো আনা প্রভাব ছিল ধর্মের এবং পার্থিব ও সামাজিক নিয়মের। প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। তার সঙ্গে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতি হচ্ছে চেষ্টা দ্বারা অর্জিত আচরণ। মানুষ উৎকর্ষ অর্জন করতে চায়। উৎকর্ষ অর্জন করবার— excell করবার—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবার, সুন্দরতমকে পাওয়ার, মহত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টার পেছনেই মানুষের সংস্কৃতির অস্তিত্ব। এই সংস্কৃতির অধিকার লাভের জন্যে একটা আর্থিক পর্যায় চাই, একটা রাষ্ট্রিক স্তর চাই, শৈক্ষিক স্তর চাই। তা না হলে সুন্দরতম অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি অশিক্ষিত, অনভ্যস্ত, কোন উৎকর্ষ অর্জন করেনি, তাকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলেও তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সহজেই চোখে পড়ে। আমার বাসার চাকুরেকে আমার পোশাক পরিয়ে দিলেও সে চলতে পারবে না। যে ব্রাহ্মণ নয়, যে মৌলানা নয়, তাকে ব্রাহ্মণের বা মৌলানার পোশাক পরিয়ে দিলেও সে সেভাবে চলতে পারবে না, cheat হিসেবে সে ধরা পড়বে কিংবা লোকে তাকে cheat বলবে। তখনকার দিনে ধর্ম দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে এবং এসব বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে সাংস্কৃতিক মান নির্ণীত হত। শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েও নির্ণয় করা হত। কিন্তু এসব অর্জনের জন্যে জন্মগত অধিকার দরকার হত। আর্থিক সঙ্গতিও দরকার হত। জন্মগত অধিকার আর আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে জীবনে লাবণ্য ফোটাবার—সুন্দর চিন্তা করার এবং সুন্দর জীবন যাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হত। আমি যতই সুন্দর মনের অধিকারী হই, যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন হয় যে, আমার কোন অধিকারই নেই, কিংবা যদি আমার কোন আর্থিক সঙ্গতি না থাকে, তাহলে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, আমার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আর্তনাদে পরিণত হবে। সে যুগে এটা হয়েছে কোটি কোটি মানুষের বেলায়। ইচ্ছা করলেই মানুষ সংস্কৃতির চর্চা বা সাধনা করতে পারে না। সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, আর্থিক এবং প্রথা-পদ্ধতি, আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছুর বাধা থাকে। সে যুগের বাঙলাভাষী এলাকা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল, বৈচিত্র্য ছিল। ধর্মের পার্থক্যের জন্যেও পার্থক্য ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধের সংস্কৃতি এক ছিল না, আর মুসলমানের ছিল আরও আলাদা। আবার সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর-ভেদের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল। এই ঢাকা শহরেই নীলক্ষেত এলাকার সঙ্গে পুরোনো ঢাকার-লালবাগ-ইসলামপুরের-সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। আবার গুলশান-ধানমণ্ডি ইস্কাটন-বেলি রোডের সংস্কৃতি অন্য এলাকার সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্যের জন্যে এই পার্থক্য। জাতিভেদেও সংস্কৃতির পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-আশরাফ-আতরাফে পার্থক্য ছিল। কাজেই সেকালের সংস্কৃতিকে ঢালাওভাবে বাঙালী সংস্কৃতি বললে ভুল করা হয়। সেকালের রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য, জীবন পদ্ধতি, ধর্ম—এসবের কোনটারই জাতীয় রূপ কল্পনা করা যায় না। তা করতে গেলে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ক্ষতি হবে।

আমাদের দেশের পরিচয় নিতে হলে—জিওপলিটিকাল পরিবর্তনের কথা জানতে হবে। এই ভূখণ্ডে রাজ্য, রাষ্ট্র, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন যুগে যুগে কি-ভাবে হয়েছে—তা জনপদের যুগ থেকে আজকের বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত—সবটা জানতে হবে। জাতি পরিচয়ে আমরা অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের বংশধর—তা স্বীকার করতে হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। আত্ম অবমাননা বোধ করবারও কিছু নেই। আত্মপ্রবঞ্চনা করে মিথ্যা পরিচয়ে বড় হবার চেষ্টা করলে আমরা বড় হতে পারব না। ছোট হব।

অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। সেটাই চিরকাল বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা। তার প্রভাব থেকে বাঙালী কখনও মুক্ত হতে পারবে না। সে পরিচয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেও মুছে দেওয়া যাবে না। বাঙালীর চেতনায়, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে—যুগ যুগ ধরে চলছে। সাখ্য, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব —এগুলো হচ্ছে বাঙলার আদি মোঙ্গলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু-পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি হচ্ছে অস্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনও মুক্ত ছিল না, আজও মুক্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ-বৈশিষ্ট্য বাঙালীর চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত। বাঙালী বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনও সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এক নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙালী রূপ নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে মহাযানী-দেহতত্ত্বে ও দেব-ভাবনায় অবসিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গীতি-স্মৃতি-সংহিতা বিরুদ্ধ লৌকিক দেব-পূজায় রূপায়িত, ইসলামও লোকায়ত রূপ পেয়ে পরিবর্তিত। এখানে এসে সব শাস্ত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবনে জীবিকার অরি-মিত্র দেবদেবী—মনস্যা, শীতলা, ওলাদেবী, সত্যনারায়ণ—হিন্দুর জীবন করছে নিয়ন্ত্রিত। তেমনি কেরামত আলীর ও ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদের প্রভাবও ; পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের ধর্ম ছিল তাবিজে-কবজে-পীরে-দরগায় এবং সত্যপীর-ওলাবিবি-খাজাখিজির সেবায় সীমিত।

নির্ভেজাল মানব সংস্কৃতির কথা আমরা আজও ভাবতে পারি না। সম্প্রদায় চেতনার কূপমণ্ডুকতা আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনা যখন শুনি, তখনও মিথ্যা আস্ফালন আর অতীত নিয়ে অযথা গর্বে বুক স্ফীত করার চেষ্টা দেখতে পাই। ভাবটা এমন যেন সংস্কৃতি একটা জিয়াল মাছ। রক্ষা করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে জিয়াল মাছের মতো সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো প্রবহমান—গতিশীল। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সচল থাকে। সেই চলমানতার প্রয়াস চালালে, নতুন সৃষ্টি দিয়ে কিংবা কল্যাণকর অনুকৃতি দিয়ে সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে পারলেই আমরা কল্যাণবুদ্ধির পরিচয় দেব। সৃষ্টির ধারায় নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতির সকল রাষ্ট্রের মহত্তর যা কিছু, তা গ্রহণ করে নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে বিকশিত করতে হবে। অন্যথায় বাঙালী সংস্কৃতির গর্বে—শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টায় পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে—কোন মঙ্গলের ভরসা নেই।

লোক-সংস্কৃতির মাহাত্ম্য কীর্তনের চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মধ্যে। লোক সংস্কৃতি মানে কি? আমাদের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, জনসাধারণের এবং হাজার বছরের অতীতের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। সেই অজ্ঞতাকে, সেই কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করে আজ লাভ কি? এই বিজ্ঞানের যুগের দিকে পিছন দিয়ে অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চালালে তার পরিণতি কি হবে? আমাদের অক্ষমতা ও দীনতাকে বড় করে কি লাভ? ঢাকা শহরে আমরা নিজেদের জন্য কামনা করছি বিল্ডিং, ফ্যান-ফ্রিজ-ফোন-সোফা ইত্যাদি; অথচ এই ঢাকা শহরেই যাত্রা, জারী-পিঠা, শিকা-তালের পাখা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর দ্বারা গণমানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আমরা নিজের জন্যে যা কামনা করি না, অন্যের জন্যে তা কামনা করা উচিত নয়। মাটির ঘর আর বেড়ার ঘরকে বড় করে দেখিয়ে নিজেদের জন্য এয়ার কণ্ডিশনের এই আয়োজনে প্রবঞ্চনা আছে—প্রতারণা আছে। গ্রামের মানুষ যে দুঃখে আছে, তা দেখে আমাদের কান্না পাওয়া উচিত। সে জায়গায় লোক সংস্কৃতির। নামে এই প্রহসন করে—হাসির আর রঙ্গ-রসিকতার এই ব্যবস্থা করে লাভ কি? লোকসাহিত্য ধারা নষ্ট হয়ে গেল বলে বিলডিংএ থেকে এই দরদ দেখানো তো গণমানুষের প্রতি ব্যঙ্গ করারই শামিল। রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে এই প্রহসনে। লোকের নিঃস্বতার, দুর্ভাগ্যের, নিরক্ষরতার এবং সে-সঙ্গে লোকসংস্কৃতির অবসান চাই আমরা।

ইতিহাস চেতনা দিয়ে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হতে চাই তা-হলে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সেজন্যে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা একটা নির্জিত জাতি, আমরা একটা পীড়িত জাতি। আমরা দুই হাজার বছর ধরে বিজাতি, বিভাষী, বিদেশীদের দ্বারা পীড়িত হয়েছি, নির্জিত হয়েছি। আমাদের স্বগোত্র স্বজাতি আজও নিরন্ন, নিপীড়িত, নিম্নবিত্ত ও মানবিক মৌলিক অধিকার-বঞ্চিত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদিরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি, আমাদের ভাই। আমাদের দেহে তাদেরই রক্তের ধারা বহমান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাঁওতাল, কোচ, গারো, খাসিয়া, চাকমা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই। আমরা যারা আমাদের গোত্র পরিচয় মুছে দিয়ে আমাদের জাতি পরিচয় লুকিয়ে বিদেশী, বিভাষী, বিজাতি শাসক শ্রেণীতে মিশে যেতে চেয়েছি, শাসকের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেছি, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি—তার জন্যে আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। এটা আমাদের উপলব্ধিতে না আসলে ইতিহাস চর্চা হবে অর্থহীন। মুসলমান হয়ে যারা তুর্কী-মুঘলদের জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়ে, আরবী-ইরানী পরিচয় দিয়ে, নামের সঙ্গে সৈয়দ কোরেশী ইত্যাদি লাগিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করেছে তারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে,—আমাদের সর্বনাশ করেছে। তারা নিজেরা দুইকূল হারাবার অবস্থায় পৌঁছবে। কারণ মিথ্যা কুল-পরিচয়ে—নিজের-বাপ-ভাইয়ের পরিচয়কে মুছে ফেলে—মিথ্যা খানদান পরিচয়ে—শেষ পর্যন্ত দাঁড়ানো যায় না। বাঙলাদেশে যত সৈয়দ আছে, কোরেশরা যদি প্রত্যেকে চৌদ্দটা করে বিয়ে করতো এবং প্রত্যেকের পঞ্চাশটা করে সন্তান হত তাহলেও বোধহয় এত হত না। ভেবে দেখুন আমরা কি মিথ্যা পরিচয়ে চলছি। গত আড়াই হাজার বছর ধরে যে-ই বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছে সে-ই বলেছে যে, বাঙালী চোর, মিথ্যাবাদী, ভীরু, কাপুরুষ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি। এর কারণ কি? কারণ আমরা পরাধীন ছিলাম। যে পরাধীন, যে দাস, সে-তো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মেরুদণ্ড ঋজু রাখতে পারে না, সামনা-সামনি কথা বলে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। তাতে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণতা ও কাপুরুষতা জাগে। স্বনির্ভর হয় না, ফিকিরে বাঁচতে চায় বলে চোর ও মিথ্যাবাদী হয়। সংঘশক্তি গড়ে ওঠে না। সংঘশক্তির জন্যে দরকার নতুন আত্মচেতনা। ইতিহাস যদি সেই আত্মচেতনা আমাদের মধ্যে জাগায়—অতীতের কলঙ্ক জয় করে যদি আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি, তা-হলেই এইসব আয়োজনের সার্থকতা। নইলে মিথ্যা আস্ফালন আর জাতীয় গর্বে—বাঙালী গর্বে—আমাদের কল্যাণ নেই।

এত পীড়নের মধ্যে বাঙালী টিকে আছে। বাঙালী জনসাধারণ গণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। বাঙালী জনগণ সম্ভাবনাহীন নয়—সম্ভাবনাহীন হলে বাঙালী আজও টিকে থাকতে পারত না। বাঙালী সুস্থ এবং স্বস্থ হলে জয়ী হবেই।

কিন্তু আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার এবং দাসত্বের মনোভাব বদলাতে হবে। যে পরাধীন—পরাধীনতার মনোভাব যার প্রতি পদক্ষেপের— সে কখনও প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। বাঙালীকে মানুষ হতে হলে আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীন মানুষের চেতনা অর্জন করতে হবে। মোনাফেকের স্বভাব ত্যাগ করে, পেছনে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করে, কূর্ম-স্বভাব ত্যাগ করে, কালো পিঁপড়ের মতো তাড়া খেয়ে লুকাবার স্বভাব ত্যাগ করে, মেরুদণ্ড ঋজু করে দাঁড়াতে হবে। বাঙালীর চাই চরিত্র, চাই মনুষ্যত্ব, চাই মহত্ত্ব, চাই আদর্শপরায়ণতা, চাই মহৎ ও সুন্দরের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম। এসব অর্জনের চেষ্টা করলে বাঙালীর সুপ্ত শক্তি, অবদমিত শক্তি আড়াই হাজার বছরের অবদমিত শক্তি জেগে উঠবে। বাঙালী পৃথিবীর বুকে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে—প্রকৃত আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে। তখন পৃথিবীকে জানাবার মত একটা নতুন বাণী নিয়ে বাঙালী দাঁড়াবে।

বাঙালী নিজের মনের মত না হলে কিছুই গ্রহণ করে না, কিছুই মানে না। শক্তি দিয়ে যারা মানায়, তাদের শক্তি পশুশক্তি। পশ্বাচার মানুষের কাম্য হতে পারে না। মানুষের সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। সাধারণ বাঙালীর মধ্যে এই সাধনা দুর্লভ নয়। বাঙালী গণমানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—বারবার বিদ্রোহ করেছে-স্মরণাতীত কাল থেকে করেছে। পূর্ব বাঙলার বাঙালীরা করেছে, পশ্চিম বাঙলার বাঙালীরা করেছে—অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই বাঙালীর বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা বিজাতি, বিভাষী, বিদেশীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারাই বাঙালীর সর্বনাশ করেছে। বিদ্রোহী বাঙালী পরাজয় মেনে নেয়নি। সাধারণ বাঙালী শাসিত হতে পারে, কিন্তু দাসত্ব মানেনি-তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকিয়ে দেয়নি। এই-যে বিদ্রোহী বাঙালী, তার জয়ের সম্ভাবনা অফুরন্ত।

সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরীবের এক সংস্কৃতি, অস্পৃশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্য দিকে প্রভুর এক সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণের এক সংস্কৃতি, ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মোনাফেকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। একদিকে জালেমের সংস্কৃতি, আর একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। আমরা কোন্ সংস্কৃতি চাই? আমরা কার পক্ষে? নাকি আমরা নিরপেক্ষ? নিরপেক্ষ তো ধূর্ত, কপট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, চালবাজ, সুবিধাবাদী, মোনাফেক, মক্কর। আমরা তাহলে কোন্ সংস্কৃতির প্রতিনিধি—জালেমের না মজলুমের?

ইতিহাসের আলোচনা থেকে এটাই আমাদের শিখতে হবে যে, আমাদের স্বস্থ হওয়া দরকার—আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। বাঙলাভাষী অঞ্চলের রাষ্ট্রসত্তার বিবর্তনের পরিচয় ভৌগোলিক পটভূমির আশ্রয়ে আমাদের বুঝতে হবে—ঐতিহাসিক প্রবণতা ও ইতিহাসে ইঙ্গিত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি এ কথা স্বীকার করার সৎসাহস অর্জন করি যে, আমাদের দেহে শেখ-সৈয়দ-কোরেশীর রক্ত নেই, তুর্কী-মুঘল-পাঠানের রক্তও নেই, আর্যরক্তও নেই—আমরা এই দেশের এই মাটির সন্তান, আমরা যদি মানতে পারি যে, আমাদের শতকরা ৭০ ভাগ অস্ট্রিক, পঁচিশ ভাগ মোঙ্গল এবং বাকি পাঁচ ভাগ হাবসী, তুর্কী, মোগল, আফগান, ইরানী ইত্যাদি সঙ্কর রক্তের, এবং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে অস্ট্রিক, মোঙ্গল, হাবসী, তুর্কী, মুঘল, আফগান, ইরানী সব আজ এক দেহে লীন, এবং আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাদের দেব-দেবী, ধর্মচিন্তা, আচার, অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি কোথা থেকে এসেছে এবং এগুলোর উৎস কোথায়, আদি কোথায়, তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব, এবং অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হবে। আর্যরক্তের গৌরব করার একটা প্রবণতা সারা ভারত জুড়ে আছে, বাঙলার-বাঙলাদেশের মুসলমানেরও আছে। যে মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু, বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, সেও গর্বের সঙ্গ পরিচয় দিতে চায় এই বলে যে, ব্রাহ্মণের থেকে কনভার্ট হয়েছিল। যা কিছু ভাল, মহৎ, বড়, সবই আর্যের দান—এমন ধারণাও আজও প্রচার করা হয়। আর্য-সভ্যতা বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারক বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টার আজও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যের অবদান কি? আর্যরা ঋগ্বেদের কিছু অংশ সম্বল করে পশ্চিমের পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যেহেতু তারা সংখ্যায় অতি অল্প—সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তুলনায় আর্য একেবারেই অল্প—কাজেই তারা তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে রক্ষা করে চলতে পারেনি। যেমন মুঘল, পাঠান, তুর্কী, কেউই ভারতে এসে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি আর্যেরাও পারেনি। এ-জন্যেই ঋগ্বেদের ধর্ম তারা রক্ষা করতে পারেনি। ভারতীয় সম্পদ তারা গ্রহণ করেছে, দখল করেছে। এতে আমাদের বাঙলাদেশেরও দান আছে। আমাদের নিজেদের সম্পদ সাংখ্য, তন্ত্র এবং যোগ তারা গোড়াতেই গ্রহণ করেছে—গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, মন্দির উপাসনা, পশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা, বৃক্ষ দেবতা ইত্যাদি, বার মাসে তের পূজা সবগুলোই আমাদের এখানে থেকে তাদের নেওয়া। অতএব আর্য-ব্রাহ্মণ বললেই বড় হয় না। তারা শাসক বটে—কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিটা আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়েছে। অতএব এতেই গৌরব যা আমরা চিরকাল এসবের উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলেছি, লালন করে চলেছি। ভারতের অন্যত্র লিঙ্গায়েত, শক্তি, শৈব, রামনামী ইত্যাদির যে কোন এক দেবতার পূজা প্রচলিত। শুধু বাঙালীই সব দেবতার পূজা করে তাই পঞ্চোপাসক বলা হয় বাঙলার হিন্দু সমাজকে। আমাদের কৃতিত্ব হল এর সবগুলোই আমাদের দেবতা, আমাদের বানানো দেবতা—আমাদের প্রয়োজনে আমরা বানিয়েছি। আমাদের দেশী দেবতা। এইসব দেবতা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নামে, ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ্য নামে, মুসলমান যুগে মুসলমান নামে চালু ছিল। কালুরায় হিন্দুর কুমীর দেবতা—মুসলমানের কালুগাজী, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ-সত্যপীর প্রভতি সেব্য দেবতা। বাঙালী মুসলমান যে শতকরা পঁচানব্বই জন হাড়ি, ডোম, বাগদী, চাড়াল, মুচি, মেথর থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে, হিন্দুর মধ্যে উনিশ শতক পর্যন্ত যেমন নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না তেমনই মুসলমানে ও ছিল না। ওরা যেমন দেবতার পূজা করে—নিম্নবর্ণের লোকদের দেবতা আলাদা, সেই রকম বাঙালী মুসলমানের দেবতাও আলাদা। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেমন নিজেদের কৃতি ও কীর্তির স্বাক্ষর নিজেরা রাখতে পারেনি তেমনি বাঙালী মুসলমানও পারেনি। বাঙালী মুসলমানেরা আজ অবধি সাতশ' বছরেও একজন বাঙালী দরবেশ তৈরি করতে পারেনি। সব দরবেশ বিদেশী-বিভাষী—আল মাদানী, আল বোখারী, সমরখন্দী। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা কিছু করতে পারিনি, ফলে আমরা শুধু নিয়েছি। আমাদের দৃষ্টি এখনও আরব ইরান ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরে, আমরা এখনও আমাদের ঐতিহ্য সন্ধান করি স্বধর্মীর সাহারায় ও গোবী মরুভূমিতে। সেই জন্যেই বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ইতিহাসে মুসলমানের দান ইত্যাদি নিয়ে আজও বাঙালী মুসলমানের গর্ব-গৌরবের অন্ত নেই। এই করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। নিজের জাত-জন্মের জন্য লজ্জিত হয়ে হয়ে আত্মপরিচয় গোপন করে কুল-খান্দানের মিথ্যা পরিচয় জোগাড় করে কোন জাতি বড় হয় না—হতে পারে না। স্বরূপে জানতে হয় নিজেকে। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল'—এই মনোভাব থাকতে হয়। ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়। চোরের ছেলে চোর না হয়ে ভাল মানুষও হয়। আবার মহাপুরুষের ছেলেও কাপুরুষ, অমানুষ হয়। ঐতিহ্য কি করে! মহাপুরুষের বংশধরদেরকে চিরকাল মহাপুরুষ করে তুলতে পারে না কেন ঐতিহ্য? এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। উত্তরের দরকারও নেই। আমাদের শুধু দরকার এই মনোভাব যে, আমাদের বাঙালীদের বড় হবার সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নেই—সব আমাদের করে নিতে হবে এবং সব আমরা করে নেব। ঐতিহ্য কি করে? ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়? গ্রীসের অনেক ঐতিহ্য ছিল; কিন্তু তারা আজ কোথায়? রোমের অনেক ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তারা আজ কোথায়? শের শাহের কি ঐতিহ্য ছিল? আফ্রিকার কি ঐতিহ্য আছে? তাই বলে আফ্রিকা কি উঠবে না কোনদিন? ঐতিহ্য না থাকলে কি হয়? আমাদের কিছু নেই, কিন্তু সম্ভাবনা তো আছে? আমরা গড়ে নেব, চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের কিছু আর্য, কিছু আরবী, কিছু ইরানী ইত্যাদি করে আমরা যেন আর আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। আমাদের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচিত হবে জনপদভিত্তিক, মধ্যযুগের ইতিহাস হবে অঞ্চল ভিত্তিক, আধুনিক যুগের ইতিহাস হবে বাঙালীর জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতি ভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজব জীবিকা পদ্ধতিতে এবং সাংখ্য-যোগ ও তন্ত্র দর্শনে, মধ্যযুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজব জীবন-জীবিকার অরি-মিত্র দেবকল্পনায় ও বিদেশী প্রভাবে এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসে সন্ধান করব য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের-মনন-সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতায় ও গভীরতায়। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে চেষ্টা করলে বাঙালী উন্নতি করবেই—এটা বিশ্বাস করি।*

বে-আদবি

বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার ফলে যন্ত্রের বহুল ব্যবহারে ও কৃৎকৌশলের বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারে পৃথিবীর মানুষের জীবিকাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এল, তার অমোঘ প্রভাব পড়ল জীবনযাত্রায়, ব্যক্তিমনে ও সামাজিক আচার-আচরণে, নিয়মনীতিতে ও রীতি-রেওয়াজে। আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও যন্ত্র য়ুরোপের দান। দ্রুত পরিবর্তন এখানেই শুরু। কিন্তু তার আগেও পৃথিবী পরিক্রমার, উপনিবেশ সৃষ্টির ও বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির পরিণামে ষোল শতক থেকেই য়ুরোপের প্রাগ্রসর রাষ্ট্রগুলোতে নতুন জীবন চেতনার ও জগৎভাবনার উন্মেষ যেমন হচ্ছিল, তেমনি হচ্ছিল নতুন ও বিচিত্র কল-কৌশলের উদ্ভব, তার সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবী রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ভোগ-উপভোগের বিচিত্র সামগ্রী। ১৭৬০ সনের শিল্প-বিপ্লব কেবল ব্রিটেনের নয়, উন্নয়নশীল য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলোরও আর্থিক -সামাজিক চেহারা দ্রুত বদলে দিচ্ছিল। আবার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক শক্তি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্র ও পুরোনো যন্ত্রের উৎকর্ষ য়ুরোপীয় মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় যেমন, মনে-মেজাজে চিন্তায়-চেতনায়ও তেমনি আর একবার বিবর্তন ঘটাল। বলতে গেলে ১৮৭০ সনে পরে য়ুরোপের মানুষের ব্যক্তি চৈতন্যে, পারিবারিক মনে-মেজাজে, সামাজিক আচরণে, জীবন-ভাবনায়, জগৎ-দৃষ্টিতে, আর্থিক অবস্থানে, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায়, দার্শনিক তত্ত্বে, শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এল অভাবিত ও আকস্মিক পরিবর্তন, শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা, বিজ্ঞানে ভরসা, শিক্ষায় অনুরাগ, গণতন্ত্রে আগ্রহ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে স্বস্তি, স্বায়ত্ত শাসনে আস্থাই এ যুগলক্ষণ, যাকে এক নতুন জগৎ, নতুন জীবন ও নতুন সমাজ বলে চিহ্নিত করা চলে। পুরোনো কালের সংস্কার-পুষ্ট চেতনায় ও বয়সে প্রবীণ, এবং বিশ্বাসে-সংস্কারে ও মনে-মেজাজে প্রাচীন তরুণ তখনো অনেক ছিল।

কাজেই রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী আর গ্রহণশীল প্রগতিপন্থীর মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রুচির, যুক্তির, বুদ্ধির ও শ্রেয়োবোধের একটা অস্বস্তিকর বা অসহ্য ব্যবহারিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠল। সমাজকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখার জন্যে এ দ্বন্দ্বের আশু নিষ্পত্তি আবশ্যিক ছিল। এ দ্বান্দ্বিক অবস্থানের অবসান কল্পে, এ সমস্যার সমাধান লক্ষ্যে নীটশে জীবনে ও সমাজে পুরোনো নিয়মনীতির, রীতি-রেওয়াজের এবং মূল্যচেতনার ও মূল্যায়নের মানদণ্ড বদলানোর প্রয়োজনের কথা বললেন এবং নতুন প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার সুপারিশও করলেন। তার পরামর্শেই যে ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে

* সুকান্ত একাডেমীর সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল তা নয়, পুরোনো সমাজ কাঠামো ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আসলে নতুন প্রতিবেশ-সম্মত নীতিনিয়ম অবচেতনভাবেই লোকে সৃষ্টি করে ও মেনে চলে। সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিবর্তন ও কালানুগ বিকাশ এভাবেই হয়েছে চিরকাল। কারণ মানুষ সহজাত বৃত্তি বশেই বোঝে যে জীবন-জীবিকা দেশ-কালগত, কাজেই দেশ-কালের চাহিদার অনুগত করেই জীবন রচনা করতে হয়। জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে পরিবর্তন চিরকাল সেভাবেই এসেছে ও আসবে, অভ্যস্ত জীবনে স্বস্থ ও আশ্বস্ত রক্ষণশীলরা প্রতিবাদী হয়, প্রতিরোধের চেষ্টাও করে বটে, তবে পরিণামে তাদের পরাজয়ে ও আনুগত্যেই যুগান্তর স্থিতি পায়।

আমাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন নেই বলে, চিন্তায় চেতনায়, কলে-কৌশলে আমরা অনুকারী বলে, আমাদের ভোগ-উপভোগও অনুকৃত বলে, আমাদের চিন্তায়-চেতনায়, মনে-মেজাজে, আচারে-সংস্কারে, জীবিকা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন বিবর্তন স্বাভাবিকভাবে স্বদেশে, স্বসমাজে ও স্বোপলব্ধির ফলে উদ্ভূত নয়।

তাই আমাদের পরিবর্তন আরোপিত, এর সঙ্গে আমাদের মন-মানসের ঘনিষ্ঠ যোগ কখনো ছিল না। কৃত্রিম শহুরে অনুকৃতিই ছিল মুখ্য। তবু এ কৃত্রিম পরিবর্তনই কালক্রমে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও সার্থক বলে বিবেচিত হয়েছে।

য়ুরোপের সমস্যা ছিল প্রগতিশীল জীবনোত্থিত কালিক ও স্থানিক। আমাদের সমস্যা কালিক ও স্থানিক বটে, তবে তা আমাদের নিজেদের চিন্তা-কর্ম ও চাহিদার ফল ছিল না। তাই য়ুরোপীয় প্রভাবমুক্ত গাঁ-গঞ্জে সনাতনী জীবনধারা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। বস্তুর ব্যবহারগত বাহ্য প্রভাবও ছিল মন্থর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ ভারতে তথা পরবর্তীকালের পূর্ব-পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশে নানা কারণে গাঁ-গঞ্জের সঙ্গে শহরের ও বিদেশের ব্যবহারিক ও বস্তুগত সম্পর্ক বাড়তে থাকে, গাঁয়ের অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত লোকের যুদ্ধকালীন সৈনিক বৃত্তি উপলক্ষে বিদেশের ও বিদেশীর সঙ্গে পরিচয়, দুর্ভিক্ষের ও বেকারত্বের কারণে গ্রাম্য নারী-পুরুষের শহরে যাতায়াত বৃদ্ধি এবং গাঁয়ে শিক্ষার দ্রুত প্রসার, সর্বোপরি জমিদারী-জোতদারীরূপ সামন্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি প্রভৃতিই আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনযাত্রার সনাতনী নিয়মনীতিতে, রীতি-রেওয়াজে গভীর ও ব্যাপক ফাটল ধরিয়েছে। উনিশ শতকের য়ুরোপে যে-নৈতিক সামাজিক সমস্যা প্রকট হল, প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে ও পরে চলমান জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে যে-সমস্যার প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাধান হল—একশ বছর পরে সে-সমস্যা আমাদের নগরে-বন্দরে, গাঁয়ে-গঞ্জে দেখা দিয়েছে, সমাধানও হবে নবীন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে-মিলনে প্রতিরোধ-পরাজয়ের ও আনুগত্য-আপোসের সিঁড়ির প্রান্তসীমায়। তবে আমাদের অনুকৃত জীবনে উপজাত হিসাবে উপরি পাওনা বা অবাঞ্ছিত ও আরোপিত বলে এবং লোক আজো নিরক্ষর বলে য়ুরোপের মতো তার সমাধান সহজ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু হবে না—দেহ-মনের অদৃশ্য বিরোধ থাকবে হয়তো এক পুরো প্রজন্মকাল।

পরিবর্তন জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে সমান ও সমতালের নয়। কোথাও পুরাতন এখন বিদায়ের প্রতীক্ষায় অন্তিমলগ্নে দাঁড়িয়ে, কোথাও নতুন পুরাতন এখন পাশাপাশি চলছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে, কোথাও জয়-পরাজয় প্রতীক্ষায় নতুন-পুরাতন মুখোমুখি অপেক্ষমান। নতুনের জন্ম মুহূর্তে পুরোনোর বিদায় ঘণ্টা দিনক্ষণতিথি ধরে বাজে না বটে, তবে ক্রান্তিকালে পুরোনোর আদরে কদরে শৈথিল্য আসে, সন্ধিক্ষণে পুরোনো থাকে ম্লান ও অবহেলিত, আর নতুন পায় সাদর অভ্যর্থনা।

এবার পরিবর্তনের কিছুবাহ্য লক্ষণ, নমুনা ও ধরন পরীক্ষা করা যাক। আমরা সবাই জানি, আমাদের আদব-কায়দায় সৌজন্যে রয়েছে শাহ-সামন্ত যুগের নিয়ম-নীতির, রীতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেওয়াজের ঐতিহ্য ও আদল। যিনি প্রভু তিনি তো বটেই, যিনি শ্রদ্ধেয়, ভক্তিভাজন, মান্য তিনিও দেবতুল্য ও পূজ্য। এ ক্ষেত্রে গুরুজন-মুরুব্বীমাত্রই দেবতুল্য বা প্রভুপ্রতিম—সম্পর্কটা এক কথায় বান্দা-মনিবের, প্রভু-ভৃত্যের, দাস-মালিকের, বড়ো জোর খাদেম-মখদুমের, বা সেবক-সেবিতের তাই প্রণাম, কদমবুসি প্রয়োজন। তাই পায়ের ধুলো মাথায় মাখতে হয়, তাই প্রভুর বা গুরুজনের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে নেই, চোখ তুলে দেখতে নেই, উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে নেই, তার প্রয়োজনে তার নির্দেশ ব্যতীত তাকে স্পর্শ করতে নেই, তাকে পেছনে রেখে চলতে নেই, তার পাশ দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হলে দু'হাত ঝুলিয়ে ন্যুব্জ দেহে চলতে হয়। ঘরে-সংসারে ভোগ-উপভোগের সব ভার সামগ্রীর উপর মুরুব্বী গুরুজনের অগ্রাধিকার। এসব কারণেই সন্তানও সেবক, প্রণত দাস, খাদেম, খাকসার। আরো আগের কালের মনু-যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দাস ও বৃত্তিজীবী অস্পৃশ্যরা গৃহপালিত কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগলের আদর-কদরও পায়নি, তারা ছিল গ্রামের অন্তেবাসী, উচ্ছিষ্ট ভোগী, কৌপীনধারী, অস্পৃশ্য। ধনে-স্বাচ্ছন্দ্যে-সাচ্ছল্যে এক কথায় ভোগ-উপভোগে তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। পূর্বসংস্কারবশে বিশ শতকের গোড়ার দিকেও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের নিরক্ষর হিন্দু, মুসলিমরা সামর্থ থাকলেও সইবে না এই আশঙ্কায় নিজেদের জন্যে পাকাবাড়ি ও সোনার গয়না কামনা করত না।

চিরকালের অভ্যস্ত সংস্কারবশে গাঁয়ে-গঞ্জে নিরক্ষর গরীব লোকেরা ভদ্রলোক দেখলেই অপরিচিত হলেও, সালাম-নমস্কার জানাত, ব্রাহ্মণ বালক-কিশোরও পায়ের ধুলো নেয়া কর্তব্য ছিল হিন্দু আবালবৃদ্ধের। এ-ও সেই প্রভু-ভৃত্যের সেবক-সেবিত সংস্কারের জের। এ আদব-কায়দা বা লৌকিক সৌজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সুষ্ঠুভাবে চালু ছিল। ধনীমানীরা নয় কেবল, সাফ-কাপওয়ালা মাত্রই (white collar) মনে করত এ সম্মান ও আনুগত্য তাদের প্রাপ্য, —এ সম্মানে ও আনুগত্যে তাদের মৌরুসী অধিকার।

জমিদারী উচ্ছেদ, প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা, গ্রামের লোকের নগরে-বন্দরে যাতায়াত বৃদ্ধি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক হিসেবে দেশ-বিদেশ দর্শন, নগরের কল-কারখানার শ্রমিকরূপে গ্রামের লোকের শহরে বাস, শিক্ষার প্রসার, রেডিয়ো-সিনেমা-টেলিভিশনের, ইউনিয়ন প্রশাসনের দৌরাত্ম্যের প্রভাব প্রভৃতি গ্রামের নিরক্ষর, নিরন্ন লোককেও আর অজ্ঞ ও সরল রাখেনি। তাদের মধ্যেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্র হচ্ছে। তারা এখন জানে ও বোঝে যে—যারা তাদের আপদ-বিপদের দিনে সহায় নয়, দুঃখ-দুর্দশায় সাথী নয়, যারা কোন উপকারে আসবে না—বরং সুযোগ পেলেই প্রতারিত বঞ্চিত করে, পীড়ন-শোষণ করে, তাদের প্রতি অকারণে সম্মান-শ্রদ্ধা-আনুগত্য প্রদর্শন আত্ম-অবমাননারই নামান্তর।

ওদের থেকে সম্মান, সৌজন্য ও আনুগত্য পাওয়াটাকে যারা তাদের স্বাভাবিক ও মৌরুসী অধিকার বলে জানত, তারাই এখন ওদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা, সক্রোধে তারাই ওদের 'বেআদব' বলে এবং আজকাল ছোটলোকের—চাষীমজুরের বেআদবী ও ঔদ্ধত্যের জন্যে ভদ্রলোকের গাঁয়ে-গঞ্জে মান-সম্মান নিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এমনকি এ ক্ষোভ ও অভিযোগ মানলিপ্সু, ও সৌজন্যকামী সবশ্রেণীর বয়োজ্যেষ্ঠদেরও। তার কারণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

এ শতকের আগে এমনকি এ শতকের প্রথমপাদেও গ্রামীণ সমাজ ছিল প্রায় নিস্তরঙ্গ। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মধ্যে শিক্ষা তখনো ঠিক চালু হয়নি। ক্বচিৎ-কদাচিত কেউ শিক্ষা পাচ্ছে।

কাজেই জেলে-জোলা-নিকারী-কুমার-কামার-চাষী-মজুর সমাজে চিরকালই বয়োজ্যেষ্ঠ মাত্রই ছিল মান্য। এ মান দেয়া-নেয়া ছিল স্বাভাবিক রেওয়াজ। উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকালে অফিস-আদালতের প্রসার ছিল না অর্থাৎ বিদ্যা অর্থকর ছিল না বলে সবাই শিক্ষিত বা বিদ্বান ছিল না। তাদের মধ্যেও তাই বয়োজ্যেষ্ঠ মাত্রই ছিল মান্য। এ শতকে বিদ্যার প্রসারে, বৃত্তির বৈচিত্র্যে ও সরকারী-বেসরকারী চাকুরীর অনেকতায় ও বহুলতায় গ্রামে ও নগরে সনাতনী সমাজ-কাঠামোর অভ্যন্তরে ঘটেছে বিপ্লব। এখন আর বয়স নয়—বিদ্যা ও বিত্ত যার বেশি, ক্ষমতা ও প্রভাব যার স্বীকৃত সে-ই আবালবৃদ্ধের মান্য ও নমস্য। এ নতুন নীতি-নিয়ম মেনে নেয়া অভিমানী প্রবীণের ও আভিজাত্য-গর্বী বিদ্যাবিত্তহীনের পক্ষে দুঃসাধ্য। পীরজাদা কিংবা ব্রাহ্মণ হলেও আজকাল তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার লোক দুর্লভ হয়ে উঠেছে—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কিংবা সেজদা পেত যারা, তারা এখন সালাম-আদাবও পাবে না—এতটা সহ্য না করা তাদের পক্ষে হয়তো অসঙ্গত নয়। কাজেই বেআদবের দৌরাত্ম্য এখন ঘরে ঘরেই।

মানুষ যে পরিবর্তিত প্রতিবেশে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী হচ্ছে, লাভ-ক্ষতি, শত্রু-মিত্র বুঝতে শিখছে, নিজের আর্থিক-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর হচ্ছে, তা দেখে মানববাদী মাত্রেরই আশ্বস্ত হওয়ার কথা। এ বেআদবি ও বেআদবি বৃদ্ধিই গণমানবের ভাগ্য পরিবর্তনের পন্থা—এটিই স্বাধিকারচেতনার ও বিপ্লবমুখিতার লক্ষণ। নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারে শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমশিল্পের যে বিকাশ ঘটে, তাতে আঠারো শতকের শেষপাদে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই য়ুরোপে এ বেআদবি শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসনে শ্রমশিল্পের বিকাশ ঘটেনি বলেই আমাদের দেশে বুর্জোয়া পুঁজির উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে, ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-চেতনাপ্রসূত বেআদবির প্রকাশও ঘটে বিলম্বে।

জীবন-জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও লঘু গুরুভাবে বেআদবের উন্মেষ কিংবা বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন বিদ্যা ও বিত্ত যোগে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের বুর্জোয়া সমাজ দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে, ফলে দেশে সীমিত সংখ্যার খানদানী বা অভিজাত পরিবারে সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা পূর্তি সম্ভব নয় বলেই 'ঘর' নয় 'বর' বিবেচ্য হয়ে উঠল, আবার দেশে ব্যাপক ও বেপরওয়া মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিয়ের যৌতুক ব্যয় সাধ্যাতীতভাবে বেড়ে গেছে বলেই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরে-বাইরে কিশোর-কিশোরীদের, তরুণ-তরুণীদের প্রেম ও পরিণয় লক্ষ্যে অবাধ মেলামেশা শহুরে শিক্ষিতদের কাম্য হয়ে উঠেছে, এখন তাই বাধা নয়—উৎসাহ দানই অভিভাবকেরা শ্রেয়ঃ মনে করে। তাই যুবক-যুবতীরা ছাত্র-ছাত্রীরা শরম-সংকোচ ত্যাগ করে তথাকথিত বেহায়া-বেপরওয়া হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে, করিডরে, চত্বরে—উঠানে-উদ্যানে এবং পথে-প্রান্তরে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বিশেষ বয়সে এমনি আকুতি ও আচরণ স্বাভাবিক হলেও হাজার বছর ধরে শাস্ত্রিক ও সামাজিক সায় ছিল না বলে দায়মুক্ত লোকরা আজো এদের নিন্দায় মুখর এবং সনাতন মূল্যবোধের বিলুপ্তি ও নিয়মের অবক্ষয় দেখে ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত। অথচ নিরপেক্ষ ও শ্রেয়োদৃষ্টিতে এদেশে একালেই পারস্পরিক পরিচয়রূপ দাম্পত্যের প্রথম শর্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে—জৈব প্রয়োজনের উর্ধ্বে রুচির ও মনের গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। যৌতুকের দাবি গাঁয়ের নিরক্ষর সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে—সেখানে যৌতুক যোগাড় করা গরীব চাষী মজুরের পক্ষে সাধ্যাতীত বলে ঘরে ঘরে অসমাধ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সেখানেও অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহ দানই সমাধানের উপায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের দেশের ইতর-ভদ্রের শিক্ষিতের-অশিক্ষিতের, উচ্চশিক্ষিত বড়চাকুরের ও কেরানীর পোশাকের রূপে-স্বরূপে পার্থক্য ছিল। এটি ছিল 'অধিকারী ভেদ' নামের সনাতন সংস্কারের প্রতীক। আজ সে পার্থক্য বিলুপ্ত, —প্যান্টে ও শার্টে অধিকার শহরে এখন সর্বজনীন। গাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থ ও অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ইউনিয়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউন্সিল সদস্য, টাউট-মাতবর-মুৎসুদ্দীরাও আজকাল প্যান্ট শার্ট ধরেছে—নিদেন পক্ষে পাজামা-পাঞ্জাবী। এটিও সাধারণের হীনমন্যতা পরিহারের লক্ষণ, এটিও অবিনয়-অসৌজন্যরূপ বেআদবি।

মুসলমানরা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রতীক লায়লী-মজনু, ইউসুফ-জোরেখা, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি প্রণয়কাহিনী উপভোগ করলেও, কিংবা অমুসলিম জীন-পীর বা হিন্দু নায়ক-নায়িকার প্রণয়োপাখ্যান রচনা করলেও বাস্তবে ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে প্রেমকে পাপ বলেই জানত। এ জন্যে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে শিক্ষিত মুসলিমরা মুসলিম ঘরের প্রেম নিয়ে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখা শাস্ত্র, সমাজ ও নীতি বিরোধী গর্হিত কর্ম বলেই মানত। তাই রোকেয়া-নজরুল প্রভৃতি নিন্দিতও হয়েছেন।

ভদ্রঘরের মেয়ে নিয়ে মঞ্চাভিনয় গোটা উনিশ শতক ব্যাপী হিন্দু-সমাজেও ছিল নিষিদ্ধ। বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে হিন্দুর ভদ্র-ঘরের মহিলা থিয়েটার-সিনেমার জন্যে পাওয়া সহজ ছিল না।

তৃতীয় দশকের পর থেকে মুসলিম লেখকের কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকে মুসলিম নায়ক-নায়িকার প্রবেশাধিকার নির্বিঘ্ন হল বটে, কিন্তু তখনো নারী-শিক্ষার অভাব এবং পর্দাপ্রথার প্রভাব প্রবল থাকায় ১৯৫০ সনের আগে মঞ্চে কিংবা গানের প্রকাশ্য আসরে নারীর স্থান ছিল না। ১৯৪৭ সনের পরে শহুরে মুসলিম ঘরে নারীশিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে শিক্ষিতার অভাব ও পর্দার প্রভাব একই সঙ্গে ঘুচে গেল। টেলিভিশনের কিংবা সিনেমার বাস্তবতার ও স্বাভাবিকতার আবহ সৃষ্টির গরজেই সহ-অভিনেতার অঙ্গের স্পর্শেও ভদ্রঘরের বউ ঝিয়ের আপত্তি নেই। রক্ষনশীল প্রবীণের এটি কতকটা চোখ-সহা-হলেও এখনো মন-সহা নয়। রেওয়াজ মতো যথোচিত ব্যবহার না করাও বেআদবি।

দৈশিকরীতি অনুসারে প্রাত্যহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো নাম ধরে ডাকত না। বয়োজ্যেষ্ঠের উপস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ বা কথা বলা ছিল নিতান্ত বেলেহাজ বেহায়ার দেশাচার লোকাচার বিরুদ্ধে আচরণ। আজ স্বামী-স্ত্রী নিঃসংকোচে মা-বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, পরস্পর নাম ধরে ডাকে। ভাশুর মামাশ্বশুরের থেকেও সসঙ্কোচ সতর্ক ব্যবধান রক্ষা করে চলতে হয় না, এরা এখন দাদা-মামা মাত্র। এখানেও তাই বেহায়ার বেশরম আচরণ রক্ষণশীল প্রবীণের চোখে এখানো বেয়াদবি। আগেকার দিনে অভ্যস্ত যৌথপরিবারের সংস্কারবশে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ কুটুম্বের প্রতি ব্যক্তির একটি দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবোধ ছিল। শিক্ষিতের চাকরিগত জীবনে যৌথ পরিবার বিলুপ্ত হওয়ায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি প্রবল ও আত্মীয় পরিজনের প্রতি দায়িত্ববোধ হ্রাস অথবা লোপ পেয়েছে। এখন য়ুরোপীয় প্রভাবে পরিবার বলতে স্ত্রী-সন্তানই বোঝায়। যথাযোগ্য বা যথাপ্রাপ্য বা বাঞ্ছিত আচরণ না করাই যদি বেআদবি হয়, তাহরে এটিও আত্মীয়স্বজনের প্রতি এক প্রকার বেআদবি। কিছুকাল আগেও অর্থাৎ অষ্টম দশকের আগেও নারীরা পরত রঙবেরঙের ব্লাউস, পুরুষেরা রঙচঙে সাপ ব্যাঙ কুকুর বানর আঁকা শার্ট পাঞ্জাবী হাওয়াটই-শার্ট পরত না। এখন বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে রঙচঙে নকশার কিংবা চিত্রিত কাপড়ই পরছে। মহিলা এখন একরঙা খাটো ব্লাউস পরে, একি পুরুষকে লজ্জা দেওয়ার জন্যই। কিশোর তরুণদের চুল বাড়ছে, হ্রাস পাচ্ছে তরুণীদের কেশের দৈর্ঘ্য। ব্যক্তির সমাজেও রাষ্ট্রের সম্পর্কসম্পৃক্ত আধুনিক ধারণা এবং নাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারচেতনা য়ুরোপ থেকে পাওয়া। তাই শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত বুদ্ধিমান ছাড়া নিরক্ষরতাদুষ্ট সমাজে আর কেউ রাজনীতিরসিক হতে পারে না। যেহেতু শিক্ষিতের সংখ্যা নিতান্তই কম, সেহেতু দেশে শিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকার বিরল। তাই এদেশে সভা ডাকতে, মিছিল করতে, ইশতেহার কিংবা বিল-বিজ্ঞাপনবিলি করতে ছাত্র প্রয়োজন। জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্যসংখ্যক বয়স্ক লোকই সার্বক্ষণিক পেশা বা নেশা হিসেবে রাজনীতি করেন। তারাই নেতা, তারাই কর্মী। অন্যরা অর্থাৎ সদাগর-ঠিকাদার ডাক্তার-উকিল বা বিত্তবান বেকার জোটে ভোটের মৌসুমে, ওরা তাই মৌসুমী রাজনীতিক বা সদস্যপদ লোভী রাজনীতিক বা মৌসুমী জনসেবক খাদেমে কওম। এ জন্যেই সরকার ও রাজনীতিক দল স্ব স্ব রাজনীতির স্বার্থে ছাত্রদের সময়ে-অসময়ে কাজে লাগায়।

শিক্ষার প্রসারে শিক্ষিত লোকের জীবন চেতনা ও জগৎ-ভাবনা হয়েছে বিস্তৃত, তার আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারে আকাঙ্ক্ষা হয়েছে প্রবল, তেমনি স্থূল ভোগ-উপভোগের লোভও পেয়েছে বৃদ্ধি, ফলে জুয়া, মদ প্রভৃতি তিন প্রকারের নেশার যেমন ব্যাপ্তি ঘটেছে, তেমনি মানুষের সুকোমল বৃত্তি বিকাশ ও সুকুমারকলাদির চর্চা ব্যাপক হচ্ছে। লোক নিন্দার পরওয়া না করে সমাজ গর্হিত আচরণ যেমন অবাঞ্ছিত তথা বেআদবি, তেমনি সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে-ইতিহাসে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের নিন্দা, পুরোনো মূল্যবোধে উপহাস, পুরোনো অশ্লীলতায়, আধুনিক অনুরাগ, পুরোনো শাস্ত্রে শ্রদ্ধার স্বল্পতা, সমাজের পুরোনো নিয়ম নীতি পালনে শৈথিল্য, বিজ্ঞাননির্ভরতা, যুক্তিবাদিতা, আন্তর্জাতিকতা, স্বাধিকার চেতনা, স্বায়ত্তশাসনে আগ্রহ, আর্থিক জীবনে সুবিচার ও সমাজতন্ত্রে স্বস্তির আশ্বাস প্রভৃতিও সামন্ত-বুর্জোয়াদের কাছে বেআদবি ছাড়া কিছুই নয়।

এ বেআদবির অপর নাম নতুন। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে গোড়ায় নতুনের ধারক থাকে নগণ্য কয়জন, মধ্যে তার বাহক হয় অসংখ্য, পরিণামে সর্বজনীন হয়ে স্থিতি পায় নতুন। স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার গরজেই গণমানবকে বেআদব হতে হবে।

অতএব বেআদবি প্রগতির লক্ষণ, আত্মচেতনার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহর বীজ, বিপ্লবের সংকেত, নতুন সমাজসংস্কৃতির পূর্বাভাস। তবে প্রসার হোক বেআদবির, জয় হোক বেআদবের।

জাতি দ্বেষণা ও সহাবস্থান

ভালোলাগলেই ভালোবাসতে হয়। সে-ক্ষেত্রে দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ এ ভালোলাগার মূলে রয়েছে হৃদয়োত্থিত আবেগ। পুরুষে পুরুষে এ ভালোবাসর নাম বন্ধুত্ব, নারী নারীতে এর নাম সখিত্ব, নারী-পুরুষে এর নাম প্রেম— পরিণয়ে যার স্থিতি। ভিন্ন গোত্রের, গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, দেশের ও ধর্মের মানুষের এ ব্যক্তিক আকর্ষণ ও মিলন সর্বকালিক বাস্তব ঘটনা। এ ব্যক্তি মানুষ যেহেতু শাস্ত্রে সমাজে, মতে, আদর্শে ও দৈশিক পরিচয়ে কোন বিশেষ দলভুক্ত, যেহেতু স্বদলের প্রতি আনুগত্যের উপজাত বা প্রমাণস্বরূপ পরদলের প্রতি অবজ্ঞা, অনাস্থা ও বৈরভাব পোষণ করতেই হয়, সেহেতু আস্তিক মানুষ—দলভুক্ত মানুষ কখনো সুস্থ ও স্বস্থ মন-আত্ম-বিবেক নিয়ে নিরপেক্ষভাবে অন্যদলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন-দৃষ্টি, জগৎ-ভাবনার ও কর্ম-আচরণের গুণাগুণ বিচার করতে পারে না। অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষে এ দল, গোত্র, ধর্ম ও স্বার্থগত স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অর্থ-বিত্ত কিংবা রাজনীতিগত স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় হানাহানি ঘটায়। এ জন্যেই যে পুরুষ ভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়ের কিংবা ভিন্ন দেশের নারীকে প্রিয়ারূপে বরণ করে পরমানন্দে ঘর করছে, সেও শ্বশুরকুলের দেশ-জাত-শাস্ত্র-সমাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। কেবল সৌজন্যের খাতিরে সহিষ্ণু হয় মাত্র। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও কম বেশি এ মনোভাবই নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত থাকে। ফলে আর্থিক সামাজিক বৈষয়িক রাষ্ট্রিক কোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত জরুরী হয়ে উঠলে ভিন্ন গোত্রের, গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, দেশের ও ধর্মের মানুষের মধ্যেকার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, সখিত্ব, দাম্পত্য অটুট থাকা সত্ত্বেও তারা স্ব স্ব দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্মের মানুষের সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় সমর্থক হয়ে ওঠে। আশৈশব লালিত ও গোষ্ঠী-চেতনা থেকে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কোন আস্তিক ঐতিহ্যপ্রিয় স্বাতন্ত্র্য-সচেতন মানুষেরই মুক্তি নেই। তাই গান্ধীহন্তা স্বধর্মী বলেই নাথুরাম গডসের মারাঠা গোষ্ঠী আক্রান্ত হয় না আর ইন্দিরার হন্তা শিখ বলেই বিধর্মী শিখগোষ্ঠী নিধনে আগ্রহ জাগে।

কাজেই বিভিন্ন গোত্রের, গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, ধর্মের ও দেশের মানুষের মধ্যে কেবল নির্জলা-নির্ভেজাল সম্প্রীতি স্থাপন কখনো বাস্তব-প্রতিবেশে সম্ভব হবে না। এ জন্যে বরং সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের যৌক্তিক আহ্বান জানানোই বাঞ্ছনীয়। এ সমস্যা অনেকটা মিটে যাবে অধিকাংশ মানুষ নাস্তিক হলে আর সমাজবাদী বা সমাজতন্ত্রী হলে। তখনো অবশ্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ থাকবে।

বৈষয়িক বা মানসিক কোন প্রকার বাস্তব বা কাল্পনিক তথা ধারণাগত স্বার্থে আঘাত না লাগলে প্রাণিজগতে কোন প্রাণীই দ্বন্দ্বে-বিবাদে অবতীর্ণ হয় না—এগোয় না মুখোমুখি সংঘর্ষে। সুতরাং কারুর কাছে কারুর কারুর ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলেই কেবল সহিষ্ণুতায় শান্তিতে সহাবস্থান করতে থাকে মানুষ। কিন্তু যেহেতু মানুষ জড়পদার্থ নয়, স্বার্থসন্ধানে ও রক্ষণে সদাসচেতন মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা সার্বক্ষণিক, সেহেতু ভাগাভাগির, ঠকাঠকির, ঠোকাঠুকির এবং কাড়াকাড়ির ও মারামারির কারণ তীব্র হয়ে দেখা দেয় কখনো কখনো। তখন আবেগ তাড়িত না হয়ে যুক্তির আশ্রয়ে সংযত থাকা অতিবড় প্রজ্ঞাবানের পক্ষেও কৃচিৎ সম্ভব হয়। গণমানবের কিংবা জনতার কাছে তেমন সুবুদ্ধি ও সংযত আচরণ প্রত্যাশা করাও নিশ্চয়ই স্বল্পবুদ্ধির পরিচায়ক। অবশ্য ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্যে স্বার্থবুদ্ধি হারায় বটে, কিন্তু গোষ্ঠীগত বা দলগত ভাবে উত্তেজনার মুহূর্তেও আত্মশক্তির বা স্বার্থ-চেতনার ও লাভক্ষতির হিসেবে একেবারে লোপ পায় না। এখানেও লাভ-ক্ষতির, জয়-পরাজয়ের হিসেব চলে, কেবল চালের ভুলে কিংবা মাপের ত্রুটিতে ঘটে বিপর্যয়। সাধারণত জীবিকার ক্ষেত্রে কোন প্রবল সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠান ও আত্মপ্রসারের পথ সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলে সরকারী বা বেসরকারী রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে সে-সম্প্রদায়ের গুণ্ডারা অর্থবিত্তবান সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অসূয়া বশে এবং সম্পদ লুটের লোভে।

আজ এ সব কথা মনে জাগছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা নামে ঘন ঘন সংখ্যালঘু দুর্বল-অসহায় মানুষ-হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ছে বলেই। ১৯৪৭ সনে পাঞ্জাবে মাত্র একবারই দুইপক্ষ হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে এবং বিধর্মীকে কেটে-মেরে তাড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে চিরদিনের মতো পাঞ্জাব পাকিস্তান নিশ্চিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঙ্গা নামের হননোৎসব হয়েছে তিন-চার বার মাত্র এবং ১৯৬৪ সনেই তা অবসিত। উত্তর ভারতে বলতে গেলে গত সাঁইত্রিশ বছরের প্রতি মাসেই কোথাও না কোথাও লঘু-গুরুভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ আকারে মুসলিম হত্যা চলেছে। আগে দক্ষিণ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে গেলে ঘটেইনি, ১৯৬৪ সনে উড়িষ্যার এবং ১৯৭৫ সনের পর থেকে অন্ধ্রে-কর্ণাটে-আহমেদাবাদে-বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাধছে ঘন ঘন।

প্রাণিজগতে খাদ্যের কিংবা জানের দুশমন না হলে কেউ কাউকে হত্যা করে না। দাঙ্গাবাজ মানুষ ঘৃণ্যতম প্রাণীরও অধম, কেননা দাঙ্গাকারীরা একজনের অপরাধে অন্য অনেক নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে ক্ষোভ মেটায়। কোন শ্রেণীর, সম্প্রদায়ের, অঞ্চলের কিংবা ধর্মের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন করে। এ কাজ বুনো-বর্বরেরও নয়—অমানবের—পামরের। প্রাণীর প্রতি মানুষের পীড়নে ও জীবনবিনাশী নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হৃদয়বান, বিবেকীমানুষ যে-কালে প্রাণী-হত্যা নিবারণের জন্যে আবেদনে আন্দোলন মুখর, সে-সময়েও মানুষ জাতিক কিংবা গোষ্ঠীক অথবা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নরহত্যায় উন্মুখ, ভাবতে কষ্ট হয়।

সব দাঙ্গারই মূল কারণ যে আর্থিক-বৈষয়িক তা অস্বীকার করা যাবে না অবশ্যই। অর্থে-বিত্তে ও সংখ্যায় নগণ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী-কোন সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাই কোন দাঙ্গার নজির নেই। স্বার্থে ঘা লাগলেই ভাইও হয় জানের দুশমন। তাই তো আসামে বাঙালী-আসামী হিন্দুতে হিন্দুতে, অন্যত্র হরিজনে-বর্ণহিন্দুতে দাঙ্গা বাধে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নীতে, সুন্নী-আহমদীয়াতে বাধে লড়াই, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ও বিদেশী প্রটেস্টান্ট সরকারে চলে দ্বন্দ্ব। দক্ষিণ আফ্রিকায়—যুক্তরাষ্ট্রে চলে বর্ণ-বিদ্বেষ, আফ্রিকায় বিবাদ বাধে গোত্রে গোত্রে।

আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি যখন এসব দাঙ্গার কারণ হয়, তখন সেই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়ানুগ করাবার কুমতলবে তার সঙ্গে শাস্ত্র, গোত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনদর্শন প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যের ও দ্বান্দ্বিক অবস্থানের দোহাই উচ্চারণ করতে থাকে শাস্ত্রী, গোত্রপতি, ইতিহাসবেত্তা, ঐতিহ্যস্মার্ত, সংস্কৃতিবিদ ও জাতির দার্শনিক। ফলে বিদ্বেষের ও ব্যবধানের প্রাচীর উঁচু ও মজবুত হতে থাকে।

ভারতে অচ্ছ্যুতরা শিক্ষিত হচ্ছে, সরকারী চাকরী পাচ্ছে, বর্ণহিন্দুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, চেয়ারে বসে, মাথা উঁচু রেখে কথা বলে, আচরণে প্রত্যাশিত বিনয় নেই, অস্পৃশ্যদের ঐতিহ্যভাঙা এ আচরণ ও অবস্থান বর্ণহিন্দুর ক্ষোভের কারণ। সুযোগ পেলেই বর্ণহিন্দুরা গাঁয়ে-গঞ্জে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষোভ ও ক্রোধ মেটায় সাময়িকভাবে। বাঞ্ছিত সংখ্যায় ভারতীয় মুসলিমরা পাকিস্তানে প্রস্থান না করায় অর্থ-বিত্তের ও পেশার ক্ষেত্রে তারা হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই রয়ে গেল। কাজেই উত্তর ভারতে ঘটে নিত্য হননোৎসব। আসামেও ওই জমির লোভেই চলে মুসলিম নিধন ও বিতাড়ন প্রয়াস। দক্ষিণ ভারতেও মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে হিন্দু, কাজেই হত্যার মাধ্যমে জীবিকাক্ষেত্রে মুসলিম কমানো কিংবা বিতাড়ন সম্ভব হলে আপাতত কলে-কারখানার চাকরী মিলবে, জমি-জমাও জুটবে। কাজেই দাক্ষিণাত্যেও দাঙ্গার বিস্তার ঘটেছে। বাঙলাদেশে এখন দাঙ্গা হয় না, তার কারণ দুটো, এক হিন্দুরা এখন অর্থে-বিত্তে-বেসাতে ঈর্ষণীয় নয়, দুই নিকটে হিন্দু রাজা বড়ই প্রবল। আরো একটা কারণ হয়তো অনুমান করা যায়—ওরা দেশের প্রধান রাজনীতিকদল আওয়ামীলীগের রিজার্ভড ভোটার বা নিঃশর্ত সমর্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপমহাদেশের, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ খোঁজেন এ দেশের শাস্ত্রিক, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবীরা। তাদের মতে তুর্কী-মুঘল শাসনকালে হিন্দু-পীড়ন-শোষণের শ্রুতিস্মৃতি হিন্দু মনে যে ক্ষোভ ও জিঘাংসা জিইয়ে রেখেছে, তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতিত্ব লিপ্সু এ-কালীন মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞায় এবং স্বার্থসম্পৃক্ত কোন বাস্তব অবস্থায় সরকারী প্রশ্রয়ে রাজনীতিক প্ররোচনায় তা দাঙ্গার বা গণহত্যার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এদিকে তুর্কী-মুঘল আমলের ধনী-মানী অভিজাতদের বংশধরদের শাসিত হিন্দুর প্রতি শাসকগোষ্ঠীসুলভ অবজ্ঞা এবং সে সঙ্গে দরিদ্র দেশজ মুসলিমদেরও মানসোদ্ভূত তুর্কী-মুঘল শাসনগোষ্ঠীর স্বাজাত্য-চেতনা বিদ্যায় বিত্তে উন্নত হিন্দুর প্রতি তাদের ঈর্ষাজাত বিদ্বেষ জাগায়। ফলে হিন্দু মুসলিম কেউ সহিষ্ণু প্রতিবেশীরূপে সহযোগিতায় সহাবস্থানের মন ও মেজাজ গড়ে তুলতে পারেনি।

শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম মনে এ শাসক-শাসিত্যের তিক্ত সম্পর্কের শ্রুতি-স্মৃতি মূলক বা ইতিবৃত্ত পাঠজাত প্রভাবের মাত্রা কত গভীর ও ব্যাপক তা নির্ণয় করা সহজ নয়। আর অশিক্ষিতের সংখ্যাই যখন বেশি তখন ইতিহাস পাঠের বা জানার প্রভাবই কেন এত তীব্র ও কার্যকর হয়ে আজো দাঙ্গা বাধাবে তাও জানা-বোঝা কঠিন।

ব্রিটিশেও পীড়ন-শোষণ ছিল, ক্লাইভ-হেস্টিংস নন শুধু আরো বহু বহু ষড়যন্ত্র প্রবণ শাসক-প্রশাসক শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নয় কেবল, অধীনতা-মূলক মিত্রতা কিংবা স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করে দেশের মানুষের ও রাজন্যের সর্বনাশ করেছে, কঠোর হস্তে দমননীতি চালিয়েছে, হননে-নির্যাতনে দেশপ্রেমিকদের নির্মূল করতে চেয়েছে, তবু সে-ব্রিটিশ আজ আমাদের ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্র নয়, প্রিয়-বন্ধু ও মিত্র জাতি—আমরা কমন-ওয়েলথের অবিচ্ছেদ্য প্রীতির বাঁধনে ধন্য। তা হলে তুর্কী-মুঘলের ক্ষেত্রেই বা অন্য রূপ হবে কেন? সে কি মুসলিমরা ভারতে হিন্দুর প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিবেশী বলেই? নাকি সাম্রাজ্যিক স্বার্থ প্রণোদিত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের সচেতন ও সুপরিকল্পিত ভাবে প্রশাসননীতি অনুগ বিদ্বেষবিষ ছড়ানোলক্ষ্যে তুর্কী-মুঘল যুগের ইতিবৃত্ত রচনার ফল।

সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে এ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা জাতিদ্বেষণা চলবেই। কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, কাজেই একদিন এর অবসান হবেই। অতএব মৃত অতীত নিয়ে বৃথা ক্ষোভ-ক্রোধ-আস্ফালন না করে অর্থাৎ অতীত ও ঐতিহ্য আশ্রয়ী না হয়ে অতীত চেতনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবলেই সবার কল্যাণ হবে এবং ঘটবে মানবতার ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ।

১. অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ও হিন্দু নামে পরিচিত এ যুগের ভারতবর্ষীয়দের জানতে, মানতে ও বুঝতে হবে যে 'প্রাচীন ভারত' বলতে তারা যে-উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি -শিল্পসাহিত্য-মননের জন্যে গৌরবে গর্বে আস্ফালনে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তা একান্তভাবে হিন্দুভারত নয় এবং সব মানুষও হিন্দু ছিল না। প্রাচীন ভারতে তাদের দান ও অংশ সামান্য। আর অস্ট্রিক দ্রাবিড় [ভেড্ডিড] মঙ্গোলরা প্রাচীন আর্যদের চেয়েও প্রাচীনতর অধিবাসী। মহেনজোদারো-হরপ্পা-লোথাল-কালিবঁগান সভ্যতাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। ঋগ্বেদ ছাড়া অন্য সবগুলোই আর্য-অনার্য তথা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় (ভেড্ডিড্) মঙ্গোল, ইরাকী, ইরানী, গ্রীক, শক-হুন-কুষাণ-পার্থিয়ান প্রভৃতি নানা জাতির কালিক ও স্থানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মনন-চিন্তনের এবং অনুভব-উপলব্ধির মিশ্র দানে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারত কেবল বেদ-পুরাণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতির কাল নয়, নির্গ্রন্থ জৈন-বৌদ্ধ এবং নাস্তিক চার্বাক-আজীবিকদেরও। জন্মান্তর, দেব-দেবীর, পশু-পাখির মূর্তিপূজা, মন্দির উপাসনা, ধ্যান, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতিও অনার্য-উদ্ভূত। উপনিষদ বৈদেহী অস্ট্রিক মননের প্রসূন। প্রাচীন ভারতে বৈদিক সমাজ টেকেনি। গড়ে উঠেছিল মিশ্র দর্শনের ও আচারের সমাজ। কাজেই প্রাচীন ভারতের যা কিছু মানস সম্পদ, তা একাধারে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতির, জৈন শাস্ত্র-সংস্কৃতির, বৌদ্ধ শাস্ত্র-সংস্কৃতির এবং ইরানী গ্রীক হুন সিথিয়ান পার্থিয়ান দ্রাবিড় পল্লব-চালুক্য শাসকগোষ্ঠীর ও। আর অস্ট্রিক মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর ও মহেনজোদারো-হরপ্পার সংস্কৃতির দান। প্রাচীন ভারত শান্তি-স্বস্তি-বিত্ত-বেসাতের কোন স্বর্গলোক ছিল না। সেখানেও ছিল দাসত্ব, ছিল দারিদ্র্য, ছিল রাজায় রাজায় যুদ্ধ, ছিল সামন্তে সামন্তে হানাহানি, ছিল জৈনে-বৌদ্ধে-ব্রাহ্মণ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, ছিল বহিরাগত হানাহানি, শক্তির আক্রমণ ও লুণ্ঠন, ছিল গোত্রের লড়াই [কুরু যাদব শাক্য গোত্রের বিনাশ এ সূত্রে স্মর্তব্য], ছিল অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা, ছিল চোর ডাকাত জুয়াড়ী লম্পট মদ্যপ, ছিল ষড়যন্ত্র, ছিল বিশ্বাসঘাতকতা, ছিল জাতি বা গোত্র দ্বেষণা।

২. দাক্ষিণাত্যে কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধুবিজয় [আটশতক] এবং উত্তরাপথে তুর্কী বিজয় থেকেই [১১/১২ শতক] মধ্যযুগের শুরু স্বীকার করা মানেই যুগান্তরে আস্থা রাখা এবং যুগান্তর ঘটে কিছু নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ গ্রহণে এবং নতুন হাতিয়ার ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন জীবনদৃষ্টি বরণে। এ যদি সত্য হয়, তা হলে মানতেই হবে তুর্কী মুঘল বিজেতারা ছিল নতুন ও উন্নতর রণনীতির, অস্ত্রের ও সংস্কৃতির বাহক। এদেরই একেশ্বরবাদের প্রভাবে উদার মানবতাপ্রসূ অদ্বৈত মতের ভক্তিবাদী সন্তধর্মের উদ্ভব। ব্রাহ্মণ্য সমাজে ঘৃণ্য স্বাধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত অস্পৃশ্য মানুষ সেদিন ইসলামী সাম্যের প্রভাবেই দেবদ্বিজবেদদ্রোহী হয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের ও শাস্ত্রের শাসন ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব-পীড়নমুক্ত হয়ে স্ব স্ব নেতৃত্বে সাম্যভিত্তিক ভক্তিবাদী সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। কিংবদন্তীর মতো তুর্কী-মুঘলের হিন্দু প্রজা নির্যাতনের যেসব গালগল্প মুখে মুখে চালু রয়েছে, ইতিহাসে সেগুলো মেলে না। দরবারের কৃপাভোগী কিংবা কৃপাকামী ঐতিহাসিকরা তাদের ইতিহাসে যে-হিন্দু বিদ্বেষ লিখিতভাবে ব্যক্ত করেছেন, সে-সব হিন্দু [ভারতীয় অর্থে ব্যবহৃত] হচ্ছে, আমীরদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী সামন্ত প্রশাসক হিন্দু [ভারতীয়], সাধারণ প্রজা-হিন্দু বা জনগণ নয়। স্থায়িভাবে রাজত্বকামী কোন শাসকই সকারণেও মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন চালাতে পারে না। তা ছাড়া শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন করতে চাইলেই কি করা যায়? শাসিতজনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অসন্তোষ কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোন গুরুত্বই কি থাকে না শাসকগোষ্ঠীর কাছে? এ-ও বিবেচ্য যে ভয়-ভরসা জাগিয়ে শাসকগোষ্ঠী স্বধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে পরোক্ষ চেষ্টা করলেও শিয়াসুলতান শাসিত দাক্ষিণাত্যে কিংবা তুর্কী-মুঘল শাসিত উত্তর ভারতের প্রশাসনকেন্দ্রে অন্তত আজ মুসলিমদেরকেই সংখ্যাগুরু দেখা যেত এবং ভারতে বর্ণহিন্দুর সংখ্যাও এতো থাকত না।

তা ছাড়া গাঁয়ের-গঞ্জের হিন্দু প্রজার উপর অত্যাচার করার সাধ্য-সুযোগ তুর্কীদের, দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের কিংবা গোড়ারদিককার মুঘলদের ছিলই না। কেননা, তখনো গাঁয়ে গঞ্জে দীক্ষিত মুসলিমের বসতি বা সমাজ গড়ে ওঠেনি, বিদেশাগত তুর্কী-মুঘল-ইরানী শাসকগোষ্ঠী শাসনকেন্দ্রের বাইরে গাঁয়ে যায়নি বাস করতে। দেশজ মুসলিমের সংখ্যা বেড়েছে অতি মন্থর গতিতে। মুলতানের পূর্বদিক্কে কোথাও গুরুত্ব পাবার মতো মুসলিম জনসংখ্যা বাড়েনি। কাজেই গোটা তুর্কী-মুঘল সাম্রাজ্যে সেনা ও বিচার বিভাগ ছাড়া গাঁ অবধি প্রশাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল হিন্দু সামন্ত ও চাকুরেদের হাতেই। কেন্দ্রের তুর্কী-মুঘল রাজপুরুষেরা তাই হিন্দু পীড়নের সুযোগই পায়নি। আর কয়জন জমিদার জায়গীরদারই বা মুসলমান ছিল, যে নির্বিশেষ প্রজাপীড়ন নয়—বেছে বেছে কেবল হিন্দুপীড়ন চালাবে। তুর্কী-মুঘল আমলে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত দেশজ দরিদ্র ও নিরক্ষর মুসলিমরা বরং অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ নেড়ে-দ্বেষী হিন্দু সামন্তদের ও প্রশাসকদের দ্বারা গাঁয়ে গঞ্জে শোষিত পীড়িত অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছিল বলে অনুমান করা সম্ভব ও সঙ্গত [বিপ্রদাস পিপিলাই বর্ণিত জোলাপাড়ায় মনসার চেলার উপদ্রব স্মর্তব্য]। কিন্তু তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতিত্বগর্বী মুসলিমরা প্রজাগোষ্ঠী হিন্দুর সে-অত্যাচার স্মরণ করে না উত্তমন্যতা বশেই।

গোটা ভারতবর্ষ কখনো তুর্কী-মুঘল শাসনভুক্ত ছিল না। কাজেই তুলনায় হিন্দু রাজার রাজ্যে প্রজারা অর্থে বিত্তে বেসাতে এবং মানসিক সুখে শান্তিতে ও আনন্দে কেমন স্বর্গসুখে বা রামরাজ্যে বাস করত—তার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেই কেবল আজ সোয়া দু'শ বছর পরে হিন্দুদের মনে তুর্কী-মুঘল শাসনের স্মৃতি ক্ষোভ ও ক্রোধ জাগালে তা সঙ্গত হবে। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে কিংবা আধুনিককালে রাজ্যে রাষ্ট্রে শাসকে সামন্তে, রাজপরিবারের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত কিংবা দলগত মারামারি, হানাহানি, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ কোথাও—মিশরে গ্রীসে রোমে পারস্যে ভারতে চীনে কিংবা ইহুদী খ্রীস্টান বৌদ্ধ হিন্দু মুসলিম রাজবংশে কিছু কম হয়নি, আজো কম হয় না।

৩. এ প্রসঙ্গে এ-ও স্মর্তব্য যে স্বদেশী, স্বজাতি, স্বভাষী, স্বধর্মী হলেও রাজা বা শাসকরা একটি ভিন্নশ্রেণী বা গোষ্ঠী। সে তাৎপর্যে শাসক-শোষিত, শোষক-শোষিত, পীড়ক-পীড়িত দুটো পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দুটো আলাদা জাত বা শ্রেণী। এমনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের ঐক্য ন্যায়-নীতির আনুগত্য কেউ স্বীকার করে না। মহাভারত কাহিনী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব, কোন শাসকের প্রজা পীড়ন-নির্যাতনের জন্যে জাত-ধর্মের নাম করে নিন্দা করা অযৌক্তিক এবং অবিবেচনার কাজ। ভালো কিংবা মন্দ কর্ম-আচরণ ব্যক্তিগত রুচি-বুদ্ধির ও চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। দুনিয়ার কোথাও হেন শাসকগোষ্ঠী ছিল না কিংবা নেই, যারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে ষড়যন্ত্রের ও হত্যার আশ্রয় নেয় নি—নেয় না। কেবল ইতিহাস নয় জগতের আদি মহাকাব্যগুলোও তার প্রমাণ। সাধারণ মানুষের নীতিচেতনা বা নৈতিক আদর্শ আর রাজ্য-রাষ্ট্র পরিচালক মানুষের নীতি শাস্ত্র পৃথক। মহাভারতে পাণ্ডব স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণের চিরকেলে ন্যায়নীতি বর্জন ও ন্যায়-অন্যায়ের নতুন ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। আর এ তথ্য এবং তত্ত্ব আমাদের কারুর অজানা নয় যে দুনিয়ার রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের, রাজ্যে হাত বদলের এবং জয়-পরাজয়ের কাহিনী মাত্রই ষড়যন্ত্রের ও বিশ্বাসঘাতকতারই ইতিবৃত্ত।

৪. উপমহাদেশের মুসলিমদেরও জানা আবশ্যিক যে তাদের প্রায় সবাই দেশজ মুসলিমের বংশধর। তারা ইরানী তুর্কী মুঘল আফগান শাসকদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নয়। ওদের নিন্দা-প্রশংসা তাদের গায়ে না মাখাই শ্রেয়। যে মাটিতে তারা প্রজন্মানুক্রমে বাস করছে, সে-মাটি তাদের মায়েরও বাড়া। কেননা, মায়ের প্রয়োজন জীবনে এক সময়ে ফুরায় কিন্তু মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। দেশ-কাল-ভূগোলবিহীন স্বধর্মীর জাতি-চেতনা তাদেরকে কেবল স্বদেশে প্রবাসী করে রেখেছে। ফলে গত আটশ বছরেও দেশজ মুসলিমসমাজ আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে মননে-চিন্তনে কোন দানের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। স্বধর্মীয় গৌরব সন্ধানে তারা পনেরো শতকের পূর্বেকার স্পেনে মিশরে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায়, আরব ও গোবী মরুর ধারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারে আওয়ারা হয়ে মানস ভ্রমণ করেছে। যে-মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সে-মাটি ও তার মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণে রাখে নি। ফলে বাস্তবে এ জমিতে দৃঢ়মূল থেকেও মনোজগতে ছিন্নমূলই থেকে গেছে। তাদের এ 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থা সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাদেরকে ঘর-ঘাটের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত রেখেছে। তাদের পরগাছা-প্রবাসীর মতো কৃত্রিম জীবন।

স্বস্থ, সুস্থ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বাঁচতে হলে তাদের অবশ্যই ভুলতে হবে স্বধর্মীর দেশ-কাল নিরপেক্ষ ভ্রাতৃত্ব বা জাতীয়তা। দেশের কালের ও প্রতিবেশের বৈষয়িক ও মানসিক চাহিদাপূরণ লক্ষ্যে তাদের নিজেদের মন-মেজাজ, অনুভব-উপলব্ধি ও কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত রাখতে হবে।

উপমহাদেশে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদনে বণ্টনে-বাঁচার-জগতে জীবনে ও সমাজে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকারই কথা। তার আগে জান-মাল-গর্দান বাঁচিয়ে স্বস্থ ও সুস্থভাবে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে শান্তি-সুখ পাবার জন্যে প্রত্যেককেই স্বমত ও স্বাধিকার বজায় রেখে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকার করতে হবে। এ ছাড়া এমনি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের জানের-মালের ও মনুষ্যত্বের নিরর্থক ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে না। এখন উপমহাদেশের সরকারের, রাজনৈতিক দলের এবং শিক্ষাবিদের ও বুদ্ধিজীবীদের উচিত-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অতীতের রাজনীতিক ও সামাজিক সব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা। এবং সেভাবেই ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত রচনা করানো, যাতে শৈশবে বাল্যে কৈশোরেই মানুষের মনে-মস্তিষ্কে বিধর্মী বিদ্বেষের কীট প্রবেশ না করে।

ভারতবর্ষের গোটা রাজনীতিক ইতিহাস নতুন করে নিরপেক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখা ও লেখা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর ও রোমিলা থাপার-এর দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন ভারতের, তারাচাঁদ, সতীশচন্দ্র, রামশরণ শর্মা, হরবংশ মুখিয়া, বিপিনচন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখের মনোভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের এবং আধুনিক কালের ইতিহাস রচনা করা বাঞ্ছনীয়।

আর একটি কথা। ভারতীয় ঐতিহ্যে দৈশিক ও গৌত্রিক নামেই পরিচিত হত মানুষ। মৌর্য, গুপ্ত, পল্লব, চালুক্য, শন, হূন, কুষাণ, তুর্কী, মুঘল, সমরখন্দী, মক্কী, মদনী, বোখারী, পর্তুগীজ, ইংরেজ, দিনেমার ইত্যাদিরূপে। ইংরেজই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তুর্কী-মুঘল নামে নির্দেশ না করে, 'মুসলিম' বলে চিহ্নিত করল বিদেশাগত ভারত শাসকদের। অথচ নিজেরা 'খ্রীস্টান' নাম নিল না, রইল ব্রিটিশ বা ইংরেজ। আধুনিক যুগে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বীজ উপ্ত হল ইংরেজ লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসেই। ছড়াল সারাদেশের শিক্ষিত মনে এবং পরোক্ষে গোটা সমাজে। মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে 'মুসলিম'-ধর্ম নির্দেশক এ শব্দটির বর্জন কল্যাণপ্রসূ হবে না কি যেমন ইংরেজের হিন্দু-স্তুতি জার্মান-ফরাসীর গায়ে লাগে না, কিন্তু খ্রীস্টান-নিন্দা তাদেরও হবে ক্ষোভের কারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ ও তার পরিবেশ

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ

যারা সৃষ্টির বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস রাখে, তারা জানে লক্ষ কোটি বছর ধরে প্রকৃতি পার্থিব সব কিছুকে সৃষ্টির ও বিনাশের প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত ও আবর্তিত করছে।

প্রকৃতির এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার পৃথিবীর চেহারা ও সৃষ্টির অবয়ব বার বার বিবর্তিত হয়েছে। অনেক আদি সৃষ্টি লোপ পেয়েছে, নতুন অবয়বে গড়ে উঠেছে নব নব সৃষ্টি । এই স্থানিক ও কালিক বিবর্তনের সব খবর বিজ্ঞানীরাও দিতে পারেন না। তবে প্রমাণে ও অনুমানে অনেকটা আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে।

যেমন পৃথিবীর যাবতীয় বুনো, বর্বর ও সভ্য মানুষের সুপ্রাচীন ধারণা এই : গোড়াতে পৃথিবী ছিল অগ্নিময়, ধুম্রময়, জলময় ও অন্ধকারময় কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন। এই চেতনা সবার মধ্যে অভিন্ন নয় বটে, তবে লঘু-গুরু সাদৃশ্য রয়েছে।

তবে বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন জলময় অবস্থা থেকেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃতির নিয়মে ও নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানী ব্যাখ্যাত অভিব্যক্তিতত্ত্বের সূত্রানুসারে ভূ-প্রকৃতির যে বিভিন্ন কালিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং যে-সব তুষার বা বরফযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, তার প্রভাবে জীব-উদ্ভিদ জীবনেও ঘটেছে সৃষ্টি-প্রলয়ের লীলা।

জীব-উদ্ভিদে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের প্রভাব আনাড়ির চোখেও ধরা পড়ে। এ প্রভাব স্থানিক ও কালিক। তাই পৃথিবীর জলে-স্থলে সর্বত্র সব জীব-উদ্ভিদ মেলে না। যেগুলো সর্বত্র সাধারণভাবে মেলে, সেগুলোরও রূপে-রঙে-রসে-স্বাদে-গন্ধে পার্থক্য কিছু থাকেই। শুধু তরুলতায় ফুলে-ফলে কিংবা ইঁদুরে-কুকুরে নয়, মানুষের মধ্যেও রয়েছে সেই আবয়বিক বৈচিত্র্য।

গোড়াতে জীব-উদ্ভিদ মাত্রই ছিল প্রকৃতি লালিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃত শক্তির প্রতিকূলতায় কারো ছিল না বাঁচবার উপায় ও অধিকার। তাই বৃহৎকায় প্রাণীও পেয়েছিল লোপ। আজো যে আছে, তা নয়, তবে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি প্রাণীমাত্রকেই আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের অবচেতন প্রেরণা দেয়। এরই ফলে তারা নীড় নিবাস যেমন খুঁজে নেয় বা তৈরি করে, তেমনি প্রাণরক্ষার প্রেরণায় খাদ্যবস্তুও নির্বাচন করে। পলায়ন ছাড়া কোন কোন প্রাণীর শত্রুর মোকাবিলায় আত্মরক্ষার কৌশলও অধিকৃত ও অধিগত। এর অতিরিক্ত কিছুই পারে না বটে প্রাণীরা, তবু কোন কোন প্রাণীর জীবন-চেতনায় কিছু উৎকর্ষ দেখা যায়। তাই সব প্রাণীর বোধ-বুদ্ধি ও কৌশল-চেতনা সমান নয়। প্রাণীজগতে উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি, বানর, গরিলা, সিম্পাঞ্জী, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, পায়রা, বাজ অবধি উপযুক্ত প্রাণীরা ইশারা ইঙ্গিতেই মানুষের অভিপ্রায় উপলব্ধি করে এবং প্রশিক্ষণ পেলে মনুষ্যসম্ভব কাজে ও আচরণে অভ্যস্ত হয়।

সাধারণ মানুষের চেয়ে এদের বুদ্ধি ও ধীশক্তি কম—তা বলা যাবে না। কারণ ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগেও যখন মনুষ্য সন্তানকে একটা অঙ্ক কিংবা জটিলতত্ত্ব অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তুর ও যন্ত্রের রূপ-স্বরূপ বোঝানো যায় না, তখন বানর, কুকুর, হাতী, ঘোড়া, পায়রা, শিম্পাঞ্জীকে দিয়ে ইঙ্গিতে অভিপ্রায় বোঝানো সম্ভব হয়। কিংবা ঠোঁটে ঠোঁটে বাবুই পাখি, উই বা মৌমাছি যে নীড় তৈরি করে, তার তুলনায় হাত বিশিষ্ট মানুষের দারু-কারু-চারু শিল্প বা স্থাপত্য ভাস্কর্য গৌরব অম্লান থাকে না।

তবু অন্য প্রাণীতে ও মানুষে পার্থক্য থেকে যায়। উন্নত বোধ-বুদ্ধির প্রাণীর কৃতিগৌরবও সীমিত ও বৈচিত্র্যহীন, তাই তাকেও স্বভাব বা সহজাত বৃত্তির প্রসূন বলে চিহ্নিত করা হয়। মানুষের বোধ-বুদ্ধির স্বাধীনতা বিকাশ-বিস্তার সম্ভাবনা সীমাহীন ও অপরিমেয়, তাই মানুষ প্রাণিশ্রেষ্ঠ। 'জান' মুখ্য হওয়া সত্ত্বেও সে জানোয়ার নয়—প্রাণসর্বস্ব প্রাণী নয়। তাই সে ভিন্ন পরিচয়ে ও অতুল্য বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

তবু এর মধ্যে তার কতটুকু সহজাত তথা প্রাণীসুলভ কৃতি ও আচরণ আর কতটুকু তার স্বকীয় সৃষ্টি তা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যাবে না। যেমন জলে-স্থলে আকাশে প্রাণীরা পথভ্রষ্ট হয় না, লতাও তার অবলম্বন খুঁজে নেয়। সমুদ্রের মাছও নাকি সমুদ্র পর্যটনে ও স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনে অভ্যস্ত। কিন্তু মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে পথ ও গন্তব্য চিহ্নিত রাখতে হবে।

প্রাকৃতির নিয়মেই জীব-উদ্ভিদের উর্দ্বতন তত্ত্বে ও অভিব্যক্তিবাদে যদি আমরা আস্থা রাখি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে মানুষ অন্য প্রাণী থেকে এগিয়ে আছে মাত্র। এবং তা সম্ভব হয়েছে তার আঙ্গিক উৎকর্ষে। তার প্রধান প্রত্যঙ্গ হাতের এবং বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টির আধার মুখ-গহ্বরের অনন্য গড়নের ফলে।

হাতের বদৌলত সে খাদ্য সংগ্রহ করে মৌজুদ করতে পারে। খাদ্যের ক্ষেত্রে পর-নির্ভরও হতে পারে, যা শৈশবান্তে প্রাণিজগতে দুর্লভ। তার অবসর সে অন্য চিন্তায় ও কর্মে নিয়োগ করতে পারে। অন্য অনেক প্রাণী যৌথ জীবনে অভ্যস্ত হলেও খাদ্য এককভাবে হাতে, পায়ে, ঠোঁটে মুখে আহরণ করতে হয় বলে তাদের যৌথ জীবন বিকাশ পায়নি। মানুষ হাতের শক্তি বৃদ্ধি করেছে হাতিয়ার গ্রহণ ও নির্মাণ করে, অভিপ্রায়-গর্ভ ধ্বনি তথা ভাষা সৃষ্টি করে, বুদ্ধি ও কৌশল বিনিময় করে জীবন ও জীবিকা ক্ষেত্রে বিচিত্র উৎকর্ষ লাভ করেছে। হাতে হাতে সহযোগিতা বানর গরিলা শিম্পাঞ্জীও করে কিন্তু আঙ্গিক উৎকর্ষ না হওয়ায় তাদের শক্তি সীমিত, মানুষের সমবেত আঙ্গিক শক্তি অশেষ।

অতএব, কালিক বিবর্তনের ধারায় উদ্যোগী মানুষ বহু বহু ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে প্রকৃতির আনুগত্য অস্বীকার করে কৃত্রিমভাবে জীবন প্রতিবেশ ও জীবিকাক্ষেত্র তৈরি করেছে। সে আগুন তৈরি করে, জল ধরে রাখে, খাদ্য বানায়, জমি কর্ষণ করে, তরুলতা স্থানান্তরিত করে। আবার উষ্ণতা শৈত্য রোদ বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা যেমন করে, তেমনি এগুলোর প্রয়োজনানুরূপ পরিমিত ব্যবহার কৌশলও করছে আয়ত্ত।

স্থানিক জল-বায়ুর প্রভাব সংক্রান্ত তথা ভৌগোলিক প্রতিবেশজাত আহার্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রাপ্ত উপকরণ অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্যোগী মানুষের বিকাশ ও জীবনধারণ পদ্ধতি হয়েছে বিচিত্র। কোথাও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ প্রতিকূল, কোথাও মানুষ উদ্যোগবিহীন, তাই আজো বুনো, বর্বর এবং সভ্য মানুষেও বিকাশের তারতম্য সামান্য নয়। যেমন এস্কীমোরা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বরফের হিম বা শৈত্যকে বুদ্ধি বলে ইগলু ঘরে উষ্ণতায় করেছে পরিণত, কিন্তু জীব উদ্ভিদাদির বিরলতায় খাদ্যে কিংবা জীবনোপকরণে ঋদ্ধ হতে পারেনি। আবার উদ্যোগের অভাবে পৃথিবীর অন্য অনেক জাতির মতো ষড়ঋতুর প্রসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েও বাঙালীরা বলতে গেলে আবিষ্কার-উদ্ভাবন বিহীন। আধুনিক কালে প্রতীচ্যজগৎ তার প্রয়োজন মেটায়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ মুহূর্তেও আদিম উলঙ্গ অরণ্য মানব আর বিকাশের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ সহাবস্থান করছে।

২. শাস্ত্রীয় পরিবেশ ও মানুষ

প্রাণী হিসেবে মানুষ একাধারে পরিবেশের সৃষ্টি ও স্রষ্টা। সাধারণ মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি, বিশেষ মানুষ পরিবেশের স্রষ্টা। প্রতিবেশ স্রষ্টা মানুষ চিরকালই দুর্লভ। এ মানুষ 'কোটিকে গুটিক' মেলে। তার কারণ মানুষ স্বভাবত পরনির্ভরশীল, সে পরান্নজীবী, পরশ্রমজীবী, পরবুদ্ধিনির্ভর। তাই সব মানুষই অভাব ও অসুবিধে বোধ করলেও তা দূর করবার চেষ্টা করে না কেউ। কেবল সে-মানুষই সমস্যার সমাধানে, আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে এগিয়ে যায়, যে পুরোনো রীতি-রেওয়াজে, নিয়মে-নীতিতে, বিশ্বাসে-সংস্কারে আস্থাহীন ও অসন্তুষ্ট, যে-মানুষ জিজ্ঞাসু, আত্মপ্রত্যয়ী, উদ্যমশীল, পরিবর্তনকামী ও কল্যাণসন্ধানী এবং এমনি মানুষ জগতে চিরকালই বিরল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিই প্রথমে বিভিন্ন গোত্রে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করে এবং পরে বাঁচার ও সহাবস্থানের গরজই গোত্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য অপরিহার্য করেছে। ঐক্যে ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে গেলে কিছু নীতি, কিছু অঙ্গীকার ও কিছু শর্ত-স্বীকৃতি আবশ্যিক হয়। সর্বপ্রাণবাদ, টোটেম ট্যাবু ও যাদুবিশ্বাস স্তরও গোত্রসমূহের ঐক্যের খাতিরে বাস্তব প্রয়োজনে কিছুটা অতিক্রম করতে হয়, এ সময়েই নবী-অবতার নামের কল্যাণবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান লোকশিক্ষকই এই ঐক্যসাধনে নেতৃত্ব দেন। স্রষ্টার বা উপাস্যের পিতৃত্বে ও সর্বশক্তিমানতায় এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বে ও উপাসকতত্ত্বে আস্থাই ছিল এ নেতৃত্বের ভিত্তি। আত্মার অমরত্বে ও ইহলোকে-পরলোকে প্রসারিত জীবনে বিশ্বাসই এ আস্থার ও অঙ্গীকারের দৃঢ়বন্ধন রজ্জু। তাই আসমানী অভিজ্ঞান সম্পন্ন নবী-অবতার নামের প্রজ্ঞাবান লোকশিক্ষকদের কথা ও নির্দেশ মর্মমূলে প্রথম-নেয়া টিকার মতো অবিমোচ্য হয়ে প্রজন্মানুক্রমে আবর্তিত হয়। এঁদের বাণী ও নির্দেশিত আচরণবিধিই শাস্ত্র নামে পরিচিত। পাপরূপ অপরাধের অমোঘ শাস্তি স্বরূপ চিরযন্ত্রণার ভীতিই শাস্ত্রে আস্থা ও শাস্ত্রানুগত্য প্রশ্নাতীত করেছে। সভ্যতার আদিস্তরে এই শাস্ত্র যৌথ জীবনে সংযম, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থান তত্ত্বে দীক্ষা দিয়েছে। গোত্রীয় জীবনের অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের গোত্র সমবায়ে গড়ে তুলেছে বৃহত্তর সমাজ। এসব নানা কারণে শাস্ত্র ও সমাজ ক্ষেত্রে মুসা-কনফুসিয়াস-বুদ্ধ-ঈসা-মুহম্মদ প্রমুখ নবী-অবতার নামের কয়েকজন লোক-শিক্ষকই দেশ-দুনিয়ার মানুষের ভাবচিন্তা কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছেন। শৈশবে বাল্যে ঘরে প্রাপ্ত এই শাস্ত্রিক পরিবেশই মানুষের মন-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও মানুষ পরচিন্তা ও পরচেতনা নির্ভর। তাই সেখানেও প্লেটো-এ্যারিস্টটল থেকে ডারুইন-হেগেল-নীটশে-মার্কস-ফ্রয়েড-আইনস্টাইন প্রমুখ কয়েকজনই মানুষের বৈষয়িক-ব্যবহারিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি যোগান। জীবনের নিরাপত্তার ও জীবিকার সংগ্রাম কোথাও মানুষকে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করেছে, কোথাও বা হতোদ্যম করে কোন মতে টিকিয়ে রেখেছে। নবী-অবতাররা যে স্বকালে নীরক্ত শ্বেত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিলেন, তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। তারা স্বকালের স্বসমাজের নৈতিক সামাজিক আর্থিক বিপর্যয় ও সংকট থেকে সমাজকে উদ্ধার করে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, মানুষের চিত্তলোকেও তারা বল-ভরসার ও বিশ্বাসের দুর্গ তৈরি করে মানুষকে ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে নিশ্চিত আশ্বাসে আশ্বস্ত রাখেন। তারা ছিলেন পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারে আস্থাহীন, সমকালীন স্বসমাজে বিশৃঙ্খল নিরুদ্দিষ্ট জড় জীর্ণ অবস্থায় বিরক্ত ও বিচলিত— মানবকল্যাণ ছিল তাদের মহৎ লক্ষ্য। সর্বোপরি সেকালীন ভৌগোলিক বাধা অপসারিত করে সহমতাবলম্বী বৃহত্তর মানব সমাজ গড়ে তুলে তারা মানব মনের বিকাশ-বিস্তার ঘটিয়েছেন চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে। কাজেই সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য। তারা ছিলেন পিতৃশাস্ত্র, সমাজ ও সরকারদ্রোহী—গণবিপ্লবী। এ সবই সত্য। কিন্তু তারা কালিক সমস্যা-সঙ্কটে মানবত্রাতা হয়ে ও পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের মূলোৎপাটন করেও, আত্মরতিবশে কিংবা দূর দৃষ্টির অভাবে তারা নিজেদেরকে দাবি করেছেন চিরন্তন অপরিবর্তনীয় অমোঘ সত্যের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হিসেবে। ফলে মানবমুক্তির যে-কালিক ও আপাত বক্তারা জীর্ণ বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিলেন, তারা হলেন ভাবী বন্ধনের জন্মদাতা, এভাবেই হলেন তারা একাধারে মুক্তিদাতা ও ভাবী বন্ধনের নিমিত্ত। কারণ দেশ-কালের বিভিন্নতা এবং সৃষ্টিশীল আবিষ্কারক-উদ্ভাবক মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন ও বিকাশ তাদের প্রচারিত তত্ত্বে অস্বীকৃত।

একে তো যে-কোন নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, কালান্তরে ও স্থানান্তরে উপযোগ হারায়, তা ছাড়া স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে যে-নীতি-আদর্শ ও প্রয়োগ-প্রণালী কেজো, তা যুগান্তরে ও দেশান্তরে অকেজো ও ক্ষতিকর হওয়ারই কথা। বিশেষত স্বকালের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান লক্ষ্যে যে নিয়ম-নীতি নির্দেশ স্বকালীন মানুষ অনুভবের ও উপলব্ধির মাধ্যমে গ্রহণ, বরণ ও পালন করেছে, তাদের উত্তর প্রজন্মে বাস্তব সমস্যার অনুপস্থিতির কারণে সে-সব নিয়ম-নীতি-রেওয়াজ তাৎপর্য হারায়। তখন উত্তর পুরুষদের কাছে তা কেবলই অকারণ অযৌক্তিক শৃঙ্খলমাত্র। চলার পথের প্রবল বাধামাত্র। তাৎপর্যহীন নিরুদ্দিষ্ট নিয়ম ও আচার তাদের তখন কেবলই ধরে রাখে, কেবলই পিছুটান দেয়, কেবলই অবক্ষয়ের দিকে, জড়তার ও জীর্ণতার দিকে টেনে নেয়, নতুন দিনের নতুন মনের মানুষের নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও দেয় না, কোন চাহিদা মেটানোর শক্তিও যোগায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরোনো মাত্রই জৌলুসও গুরুত্ব হারায়, হারায় উপযোগ। কোন অতীতই বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। অতীতের পোশাক, আসবাব, জীবন-যাত্রা পদ্ধতি নতুন মানুষে নতুন কালে অচল, কেননা প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে মানুষ হয় নতুন, সে চলমান, তাই পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যার ও সম্পদের, নতুন আনন্দের ও যন্ত্রণার সাক্ষাৎ ও সন্ধান পায় সে। সে সমস্যার ও যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে হয় স্থানেরও ও কালের মানুষের প্রয়োজনের ও উত্তরণ বাঞ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে। তাই স্বস্থানে ও স্বকালে সমকালীন মানুষের সমস্যার সমাধান কেবল স্বকালের মানুষের পক্ষেই সম্ভব। নতুন পরিবেশে পুরোনো মন্ত্রের ও যন্ত্রের প্রয়োগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া আমরা জানি, প্রকৃতিদত্ত দেহে পায়ের পাতা সমুখেই প্রসারিত, চোখের দৃষ্টিও সামনের দিকে, ব্যতিক্রম করতে গেলে অর্থাৎ পাশে ও পিছে দৃষ্টি দেয়ার জন্যে গতি রুদ্ধ করতে হয়, চোখ ফেরাতে হয়, পিছনে দেখতে হলে থামতে হয়, পুরো দেহটাই ঘোরাতে হয়, এতেই বোঝা যায়, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সামনেই, মানুষের গতিও সম্মুখপানে, মানুষের আশা-প্রত্যাশার ও অভিপ্রায়ের সিদ্ধি-সাফল্য রয়েছে ভবিষ্যতে (বর্তমান নিতান্ত ক্ষণিক, তাই বিশেষ অভিপ্রায় পরবর্তী মুহূর্তও ভবিষ্যৎ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব স্বকালে নবী-অবতার ছিলেন মানবত্রাতা, বিপ্লবীনেতা। তাদের বাণী ও নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থ সে-তাৎপর্যে বিপ্লবশাস্ত্র ও মুক্তিমন্ত্র। কিন্তু কালান্তরে তা অপ্রয়োজ্য, কারণ তা উপযোগরিক্ত। এখন তা শৈশব বাল্যের তাৎপর্যহীন সংস্কার মাত্র, ভূতে ভগবানে বিশ্বাস-সংস্কারের উৎস অভিন্ন। শাস্ত্র তাই কালান্তরে ও দেশান্তরে একান্তই তাৎপর্যহীন আচারিক। তাই প্রলোভন প্রবল হলে, লোভলিপ্সার ক্ষেত্রে শাস্ত্র মানুষকে পাপ-অন্যায় থেকে বিরত সংযত রাখতে পারে না। কারণ হিত-চেতনার সঙ্গে এর কোন দৃঢ় সম্পর্ক নেই। এ জন্যেই যুগান্তরে ও দেশান্তরে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে মানুষ শাস্ত্রনিরপেক্ষ নীতিমালা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। পাপ-ভীতি (sin) যার নেই, তাকে নিন্দা (vice) ভয়ে সংযত ও বিরত রাখার প্রয়াস চলে। তাতেও প্রলুব্ধ মানুষকে সংযত সংহত রাখা সম্ভব হয় না বলেই সরকার প্রদেয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ (crime) বোধ জাগিয়ে শায়েস্তা রাখার ব্যবস্থা দৃঢ় করতে হয়।

যদিও আস্তিক মানুষে শাস্ত্রীয় শাসন তথা শাস্ত্র-সৃষ্ট মানস পরিবেশ মৌখিকভাবে স্বীকৃত, কিন্তু পরিণাম আসন্ন নয় বলে এবং তাৎপর্যচেতনাও অস্পষ্ট বলে, তা দুর্বলের সংস্কারেই পর্যবসিত হয়েছে। শৈশবে বাল্যে যেমন ভূত ভীতি, ক্ষীণ প্রাণ, জীর্ণতাদুষ্ট বার্ধক্যে তেমনি ভগবান ভীতি। অন্য বয়সে কৃচিৎ কোন পরিণামদর্শী দুর্বল চিত্তে ভগবান ভীতিজাত সংযতকর্ম ও আচরণ দেখা যায়। এ কারণেই ধূর্ত মানুষ সাধারণত স্বস্বার্থে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বস্থ ও সুস্থ জীবন-জীবিকার বিকাশে প্রসারে বাধা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

সাধারণ মানুষ বিচার-বিবেচনা করে না অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা দিয়ে চালিত হয় না—আবেগ ও অনুকরণই তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম বিশ্বাস ও জাগতিকতা এমন মানুষকেই দ্বৈধ বা দ্বৈত সত্তার (split personality) ভোগার অর্থাৎ এ সব মানুষে চারিত্রিক বা আদর্শিক সঙ্গতি দুর্লভ্য।

অতএব শাস্ত্রীয় পরিবেশ এ যুগে মানুষকে মহৎ বা কল্যাণকর জীবন-চেতনায় ও কর্মে-আচরণে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করে না। হিসেব করলে দেখা যাবে দ্রোহী মানুষই নির্বিশেষে মানবের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছে অধিক সংখ্যায়।

ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত তাৎপর্যবিরহী আচারিক ধর্ম কালান্তরে ও দেশান্তরে সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ কেজো হয়নি। তাত্ত্বিক ও আচারিক মতানৈক্য স্বসমাজেও অনেক হত্যাযজ্ঞের এবং চিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ হয়েছে। ভিন্ন ধর্মমতের ও শাস্ত্রের লোক আস্তিক মানুষের চির অবজ্ঞেয় ও শত্রুকল্প। তাই আস্তিক মানুষ সাধারণত উদার হতে পারে না, পারে না সহিষ্ণু হতে। এই দ্বেষ-দ্বন্দ্বও বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাসের অন্তরায় হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য। অতএব ধর্মীয় পরিবেশও মানুষকে পরমত অসহিষ্ণু করে তোলে। তাই শাস্ত্রনিষ্ঠাও কারো সুখের কারণ হয়নি। স্বধর্মীর ঐক্যে ও স্বার্থ-চেতনায় আর রাজনীতি দল-চেতনায় কিংবা অর্থবিত্তগত শ্রেণীচেতনায় পার্থক্য লক্ষ্যগত নয়, মাত্রাগত। ইতিহাস বলে শাস্ত্রানুগত্য বা শাস্ত্রপ্রীতি কালান্তরে মানুষের ক্ষতি যত করছে, মানুষকে উপকৃত করেনি সে-পরিমাণে। ধর্মীয় দল এক হিসেবে রাজনীতিক দল থেকেও ক্ষতিকর। রাজনীতিক দলে সব মানুষ যোগ দেয় না, ইচ্ছেমত বদল করা চলে, ধর্মীয় দল ভাঙে না। আজো আস্তিক মানুষ মাত্রেরই চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি শাস্ত্রসংলগ্ন বা শাস্ত্র প্রভাবিত। তাই চিন্তা-চেতনায় কিংবা সাংস্কৃতিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আস্তিক মানুষের সমাজে নির্বিশেষে মানুষের কোন মিলন-ময়দান তৈরি হয়নি। আস্তিক মানুষ মাত্রই কৃত্রিম দেয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা দুর্গে শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যে বাস করে। আমাদের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা তার প্রমাণ। সমাজবাদী-সাম্যবাদীরাই প্রথম এ দেয়াল ভেঙে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় স্বাধিকারে সহাবস্থানের নীতি উচ্চারণ করে। দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানবের ময়দান তৈরি সম্ভব কেবল নাস্তিক্যে ও মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে।

৩. আর্থিক নৈতিক সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ

মধ্যযুগ অবধি শাস্ত্রে সমাজে শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ছিল নিতান্ত মন্থর। এতো মন্থর যে বাহ্যত মনে হত চির অপরিবর্তিত। কেননা তখন বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছিল না, ছিল না কৃৎকৌশলেও বিচিত্র বিকাশ।

পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রা যখন থেকে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রচালিত হচ্ছে, তখন থেকে মানুষের মনোজগতে ও ব্যবহারিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। ব্যবহারিক জীবনে মানুষ সহজেই গ্রহণশীল ও অনুকারক। উপযোগ-চেতনা, সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও সৌকর্যবোধ বলে সে সহজেই পরের নতুন যন্ত্র, আসবার, পোশাক প্রভৃতি গ্রহণ ও অনুকরণ করে। কিন্তু জীবন পরলোকেও প্রসারিত জেনে সে জন্ম-সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার বশে মনোলোকে রক্ষণশীল। তাই যুক্তিগ্রাহ্য হয়েও এমন কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে প্রমাণিত তথ্য হলেও সে তার শাস্ত্রীয় বিশ্বাস পরিহার করে বাস্তব সত্য ও তথ্যকে গ্রহণ করতে নারাজ। ফলে সাধারণভাবে ব্যক্তি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ও মনোজগতে ব্যবধান হাজার বছরের। তাই পৃথিবীর সর্বত্র চেতনাজগতে মানুষের বিকাশ অসম—নরদেবতা ও নরদানব একই পরিবারে যেমন মেলে তেমনি যুক্তিবাদী ও সংস্কারপুষ্ট দৈবনির্ভর মানুষও একই সমাজে বাস করে। বিজ্ঞানে-দর্শনে-জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় বিশ্বসভ্যতায় আধুনিক য়ুরোপের যে দান, তার অধিকাংশই দ্রোহী-সংশয়বাদী কিংবা নাস্তিকের দান, য়ুরোপে আর যারা বাস করে, নাস্তিক সংশয়বাদীর কৃতির ফল ভোগ-উপভোগ করে তারা আজো আস্তিক এমনকি কুসংস্কারদুষ্টও।

আত্মপ্রত্যয়ী য়ুরোপীয় মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যা কিছু আবিষ্কার উদ্ভাবন করেছে তা ছিল বাস্তব ও মানস প্রয়োজন চেতনার প্রসূন। তাই সেখানে সাধারণভাবে ব্যক্তি ও সমাজ মানসে বিচলন তেমন গুরুতর হয়নি। ফলে পরিবেশের রূপান্তর হয়েছে স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম না করেই। য়ুরোপ বহির্ভূত পৃথিবীতে য়ুরোপীয় যন্ত্র-নির্ভর জীবন হয়েছে আকস্মিকভাবে অনুকৃত। এর জন্যে প্রস্তুতি ছিল না কারো। ফলে সামন্ত ব্যবস্থা অকস্মাৎ অবলুপ্ত হল বটে, কিন্তু সামন্ত মানসিকতা রইল টিকে। এক সামন্তের স্থলে লক্ষ শিক্ষিত বুর্জোয়া এল বটে, কিন্তু সে না হল সামন্ত, না রইল গণমানব, সে যেন ছিন্নমূল ভাসমান কচুরী, শ্রেণী আছে স্থিতি নেই—কেউ সামন্তশক্তির ও মেজাজের হচ্ছে অধিকারী ধন বলে কিংবা আমলারূপে ক্ষমতার অপব্যবহারে, কেউবা চালের ভুলে নেমে যাচ্ছে লুম্পেন বুর্জোয়া স্তরে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাধারণভাবে এক একটি দেশ বা অঞ্চল এক একটি দ্বীপের মতোই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র জীবন-জীবিকার আধার ছিল। শাস্ত্রসূত্রে পাওয়া রীতি-রেওয়াজে ও আচার-সংস্কারে সাদৃশ্য বা অভিন্নতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকট থাকলেও যানবাহনের অভাবে দুর্গমতার দরুন মানস কিংবা ব্যবহারিক জীবনের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকত। এ জন্যে এক অঞ্চলের আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত সামগ্রী কিংবা চিন্তার প্রসাদ অন্য অঞ্চল সহজে পেত না। তাই শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আঞ্চলিকতা ছিল লক্ষণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাঙলাদেশ ছিল ঐতিহাসিকযুগে বিজাতি বিধর্মী বিভাষী বিদেশী শাসিত ও শোষিত। তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব হয়নি। চর্যাগীতির কাল থেকে আমরা সাধারণভাবে তাই দীন-দুর্বল, ভেতো-ভীতু কুঁদুলে, মিথ্যুক-প্রতারক বাঙালীর সাক্ষাৎ পাই। চাঁদ কিংবা চৈতন্যের মতো মহৎ মানুষ পাই ক্বচিৎ। আমরা জানি, প্রাণ ধরে রাখার জন্যে অন্ন আবশ্যিক। অন্নে প্রাণ সুস্থির থাকলেই মনের জন্যে দরকার হয় আনন্দ, পরশাসিত ও শোষিত মানুষে অন্ন ও আনন্দ চিরকাল দুর্লভ। দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা অন্ন প্রাপ্তিতেই সীমিত। তাই এদেশের মানুষের মনে স্বাধীন জাতিসুলভ কোন বৃহৎ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা লালিত হয়নি। পার্থিব জীবনে বঞ্চনার জ্বালা ভুলবার জন্যেই ভোগবিমুখতায় ও ত্যাগ প্রবণতায় উৎসাহ দিয়ে মানুষকে অধ্যাত্মচেতনায় প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা হয়েছে বাঙলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে। তবু মাটির মায়াসক্ত দীন-দুর্বল আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। তারাই জীবন-জীবিকার দেবতা সৃষ্টি করে দৈব-নির্ভর হয়ে দেবানুগ্রহে বাঁচবার সাধনা করেছে। পরাধীনতাপ্রসূত আর্থিক দৈন্যই রয়েছে এই দেবনির্ভর জীবনের মূলে।

দারিদ্র্য মানুষের সবগুণ নষ্ট করে। অন্নের কাঙাল অন্ন প্রাপ্তির জন্যে সব মানবিক গুণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। যে ধনে কাঙাল, সে সাধারণত মনেও কাঙাল। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগে এদেশের কাঙাল মানুষ পরাধীনতার গ্লানি, শোষিতের যন্ত্রণা, জঠরের জ্বালা ভুলবার জন্যে এক পলায়নী পন্থার সাধনা করেছে—ভোগবিমুখতা, বৈরাগ্য, আকাশচারিতা যেমন একদিকে মহৎ মানবিক সাধনা বলে পরিকীর্তিত হয়েছে, তেমনি দেবানুগ্রহে প্রয়াসবিহীন প্রাপ্তির ও নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে নব নব লৌকিক দেবতা ও অপদেবতার উদ্ভাবনে ও পূজায় আর যাদুতুকতাক দাবড়ে টোনায়। প্রথমোক্ত প্রয়াসের প্রমাণ বৌদ্ধ মন্ত্রযান কালচক্রযান বজ্র-চক্রসহজযান-বাউলমত ও চৈতন্য মতবাদ এবং যোগতন্ত্র। আর শেষোক্ত প্রয়াসের প্রমাণ চণ্ডী-মনসা-বাসুলী-শনি-লক্ষ্মী-সরস্বতী-শীতলা-ওলা এবং পীর-নারায়ণ সত্য ও তার চেলা পীর-দেবতারা। খাদ্যের সুলভতা ও দুর্লভতা যে জীব-উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, অন্ন ও আনন্দই যে প্রাণ-মনের খাদ্য তথা পালক পোষক, এ তত্ত্ব ও তথ্য বাঙালীর ইতিহাসে সুপ্রকট। ব্যক্তিক জীবন জীবনধারণে প্রয়োজনীয় অর্থবিত্তের হ্রাস-বৃদ্ধিই নৈতিক জীবন প্রভাবিত করে। ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সমাজ, কাজেই দরিদ্রের সমাজ কখনো সুস্থ স্বস্থ বা সুশৃঙ্খল থাকে না। কালে পিঁপড়ের মতোই উদ্বিগ্ন দরিদ্র মানুষ অন্নের সন্ধানে অর্থবিত্ত প্রাপ্তিলোভে দিশেহারা হয়েই ছুটোছুটি করে। দুর্বল ও অনন্যোপায় বলেই সে চুরি-ডাকাতি ও ছল-চাতুরী-প্রতরণার আশ্রয় নেয়। ন্যায়-অন্যায় চেতনা ও ঘৃণা-লজ্জাবোধ বর্জন করতে বাধ্য হয়। এককভাবেই সে আত্মরক্ষার ব্রতী হয়, তাই সে সংঘবদ্ধ হয়ে কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। পরাধীনতায় ও পরশোষণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী চরিত্রে তাই উক্ত সব দোষ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

বিদেশী শাসক-শোষকের সহযোগী কিছু দেশী মানুষ উচ্চ ও অন্যেরা মধ্যবিত্ত হওয়ার সুযোগ চিরকালই পেয়েছিল। তারাই মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ। অন্যেরা কামার-কুমার-বারুই-বাগদী-চাঁড়াল-নাপিত-ধোপা-সদগোপ-কৃষক-ক্ষেতমজুররূপেই আবহমানকাল ধরে নিঃস্ব নিরন্ন নিরক্ষর দীন দুর্বলের অভাবদুষ্ট জীবন যাপনে ছিল বাধ্য। কাজেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালীর আর্থিক নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অসুস্থ ও পঙ্গু। মন মানস ছিল আত্মপ্রত্যয়হীন। পরিবেশ ছিল স্বাধীন আত্মবিকাশের প্রতিকূল। দরিদ্র জননীর সন্তান ভ্রূণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা থেকেই অপুষ্টিতে ভোগে, ফলে তার দেহ-মন-আত্মার গঠন ও বিকাশ থাকে অপূর্ণ। অনুকূল পরিবেশের অভাবে সে-মানুষ মনে-মননে স্বাভাবিকতা পায় না। তাই হয়-ও না বাঞ্ছিত মানুষ।

পরাধীন বাঙালীর বাহ্য স্বকীয়তা দুর্লক্ষ্য। মানস স্বকীয়তাও আত্মোত্থিত হলেও গৌরবগর্বের নয়—দুর্দিন দুর্ভোগের সাক্ষ্য মাত্র। বাঙালীর ধর্ম, ভাষা, পোশাক, প্রশাসন-প্রণালী প্রভৃতি সবটাই বিদেশীর। তাই প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত নয়—আরোপিত।

অতএব তাৎপর্যবিরহী শাস্ত্রের শাসনেও পরশোষিত জীবনে আর্থিক অনটনে কেটেছে বাঙালীর জীবন। এ পরিবেশ ছিল সুস্থ বিকাশের অন্তরায়। এ পরিবেশ তাকে ধরে রেখেছে, এগুবার উপায় বাতলায়নি। তাই সে কেবল লাটিমের মতো ঘুরেছে—অগ্রসর হয়নি।

৪. আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালে বাঙলার পরিবেশ ও মানুষ

মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ, শাস্ত্রিক, রীতি-নীতি ও আচার-সংস্কার, অর্থবিত্তের সুলভতা ও দুর্লভতা, সামাজিক নীতি-আদর্শ ও রীতি-রেওয়াজ এবং রাষ্ট্রিক নিয়ম-নীতি ও জীবিকাসম্পৃক্ত হাতিয়ারে উৎকর্ষ অপকর্ষ।

ক. প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী মানুষের জীবিকা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করে, মেরু কিংবা মরু অঞ্চলে জীবনোপকরণের অভাব বলে তাদের হাতিয়ারে, খাদ্যব্যবস্থায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে উৎকর্ষ দুর্লক্ষ্য। যাযাবর কিংবা স্থায়ীনিবাসী থাকাও প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর। বলেছি, মানুষ প্রাকৃত শক্তিকে অনেকাংশে দাস ও বশ করে ফেলেছে। ঝঞ্ঝা-খরা, বন্যা-ভূকম্প নিয়ন্ত্রণ আজো সম্ভব হয়নি বটে, তবে এর প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন-ইট পাথরের বাড়ি ঝড়ে, কূপ-নলকূপ খরায়, বাঁধ-খাল দালান বন্যায়, জাপানী বাড়ি ভূকম্পে নিরাপদ আশ্রয়। রোগ-মহামারীরও প্রতিষেধক হয়েছে আবিষ্কৃত। অতএব মানুষ আজ আগের মতো প্রকৃতির কৃপাজীবী কিংবা প্রকৃতি-পীড়িত নয়। ফলে ভীত ত্রস্ত আদিম অসহায় মানুষ যেমন প্রকৃতি ও প্রাকৃতশক্তির প্রতীকপূজায় নিষ্ঠ ছিল, আজ আর তেমন মানুষ সভ্যজগতে নেই—আদিম অবস্থার আরণ্য মানবে রয়েছে অবশ্য। প্রকৃতিকে দাস-বশ করার কৌশল বিশেষ মানুষের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন। এ মানুষকেই আমরা পরিবেশ-স্রষ্টা বলেছি। একজন স্রষ্টা—অন্যেরা অনুকারক-অনুসারক, একের সৃষ্টি অপরের সম্পদ।

খ. সভ্যতার উষাকালে নবী-অবতার সন্ত-নামের জনহিতব্রতী লোক-শিক্ষকরা জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান লক্ষ্যে ঐশ্বরিক শক্তির অভিপ্রায়ের দোহাই উচ্চারণ করে ব্যক্তির ও সমাজের কার্য ও আচরণ সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি তৈরি করেন। আদিকালে তারা তাদের ব্যক্তিত্বের ও উচ্চারিত বাণীর প্রভাবে কৌম-গোত্র-গ্রামের পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘুচিয়ে, বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান লুপ্ত করে আঞ্চলিক বাধা অতিক্রম করে বৃহত্তর ও সংহত মানব সমাজ গঠন করে সেদিন মানুষের আত্মবিকাশের ও মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসারের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। মানব কল্যাণে ও মানব সভ্যতায় তাদের এ ভূমিকা ও দান অতুল্য। তারা ছিলেন স্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানববাদী প্রগতিবাদী ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মানুষ। এরা সবাই পিতৃধর্মদ্রোহী নবযুগ ও নব সমাজ প্রবর্তক।

কিন্তু কালান্তরে ও দেশান্তরে ভিন্নতর জীবনের সমস্যায় ও সম্পদে, যন্ত্রণায় ও আনন্দে, চাওয়ায় ও পাওয়ায় তাদের বাণীরূপ শাস্ত্র তাৎপর্যরিক্ত অসঙ্গত অযৌক্তিক আচার-সংস্কার সর্বস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনভিপ্রেত ও অকেজো ঐতিহ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। কালান্তরে অন্য অনেক জীবনোপকরণের মতো প্রবহমান ও অগ্রসরমান মানবযাত্রায় শাস্ত্র তার স্বকালীন উপযোগ হারিয়ে চলার পথে কেবল বাধা ও বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে একই শাস্ত্রশাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা দ্বান্দ্বিক শাখা-উপশাখা সৃষ্টি হয়ে দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও হানাহানির কারণ হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও চিরন্তর দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষ-সংঘাতের কারণ হয়ে রয়েছে। আস্তিক মানুষ মাত্রেরই রয়েছে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা এবং বিধর্মীমাত্রই শত্রুকল্প। উদারতম আস্তিকও সংস্কারবশে এই অমানবিক চেতনার শিকার। তাই ধর্মশাস্ত্র কালান্তরে মানুষে মানুষে কেবল ব্যবধানের বেড়াই বৃদ্ধি করেছে, বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল তুলে তুলে মানব সমাজকে কেবলই খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র করেছে। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখে মানুষের মনকে বিদ্বিষ্ট ও অসুস্থ রেখেছে—সংকীর্ণ চেতনায় রেখেছে আবিষ্ট। যেহেতু শৈশবে-বাল্যে ঘরোয়া পরিবেশে শাস্ত্রই সংস্কাররূপে মনে অবিমোচ্য ও গভীর ছাপ ফেলে, সেহেতু আস্তিক মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা বহুলাংশে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসই নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সমাজে কখনো নির্বিশেষে মানব-কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। ফলে লেন-দেনের বৈষয়িক জীবনে বিভিন্ন মতাবলম্বী শাস্ত্রিক মানুষের স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতার সহাবস্থান কঠিন এবং কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতীতের নয় কেবল, আজকের জগতেও এ দৃষ্টান্ত অবিরল।

গ. 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'—এ আপ্তবাক্য সনাতন ও সর্বজনস্বীকৃত। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয়, প্রাণে বাঁচার জন্যে দরকারী সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে অর্থবিত্তরূপ সংস্থান না থাকলে হাতিয়ার পুষ্ট যৌথজীবনে তথা সভ্য সামাজিক জীবনে স্বাধিকাররিক্ত মানুষ শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক অঙ্গীকার ভঙ্গ করে—তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়।

আমাদের দেশে দুই হাজার বছর ধরে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চাঁড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, কপালী প্রভৃতি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য দাস ও বৃত্তিজীবী সদ্‌গোপ-নাপিত-ধোপা, কামার-কুমার প্রভৃতি ব্রিটিশ পূর্বকালের কখনো বৃত্তি নির্বাচনের তথা আত্মোন্নয়নের স্বাধীনতা পায়নি। জন্মসূত্রে হত তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রিত। এরা ছিল চিরকাল ধরে প্রাণ ধরে রাখার মতো সামান্য সম্পদের অধিকারী। প্রাচুর্যে বা অর্থ-বিত্তে তাদের অধিকার ছিল না। এরা ছিল ঝড়-খরা-বন্যা-মহামারী দুর্ভিক্ষের চির শিকার। এদের কোন কোন বর্গের মানুষের অবস্থা গৃহপালিত পশুর চেয়েও ছিল করুণ। দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে দু'হাজার বছর ধরে অমানবিক ও ইতর প্রাণিসুলভ জীবন যাপনে বাধ্য ছিল, সেখানে মানবিক পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। এমনি সমাজে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মানুষের মন-মেজাজ ও কর্ম আচরণ ছিল সংলগ্ন। সে পরিবেশ সুস্থ ও স্বস্থ থাকার অনুকূল ছিল না। শাহ সামন্তরা ও তাদের সহযোগী মধ্যবিত্তেরা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী শাষক ও পীড়ক জীবনে ছিল অভ্যস্ত। সদ্ধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) বা ইসলামও গণমানবের জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন দান করেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে অবশ্য সন্ত-সংস্কারক শঙ্কর, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব, ভাস্কর, নানক, কবির, দাদু, রামানন্দ, রামদাস, চৈতন্য প্রমুখ সন্ত-সাধক সংস্কারকেরা নিঃস্ব নিরন্ন নিরক্ষর দাস-দুঃস্থ মানুষের আর্থিক না হোক, মানসমুক্তির সহায় হয়েছিলেন। এরা সবাই স্বধর্মদ্রোহীবিপ্লবী ও নব পরিবেশ স্রষ্টা তথা নব সমাজ প্রবর্তক।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' উপযুক্ত পরিবেশে তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের এবং এ যুগেরও বাঙালীরা চোর, প্রতারক, মিথ্যেবাদী, তোষামুদে, ঈর্ষ্যু, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝগড়াটে, মামলাবাজ, ভীরু ও ভেতো বলে বিদেশীর নিন্দা পায়। কাজেই আমাদের পরিবেশ সৎ, নীতিনিষ্ঠ ও বিবেকবান হবার অনুকূল নয়।

ঘ. প্রাচীন ও মধ্যযুগ হয়ে ব্রিটিশ আমলের প্রথম শতক অবধি বঞ্চিত শোষিত দাস-বশ, দীন দুর্বল নিরুপায় মানুষ শাস্ত্রপতি, সমাজসর্দার ও শাসকগোষ্ঠী আরোপিত বিধি-বিধেধ মানাই তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া বিধিলিপি বলে মেনেছে ও জেনেছে। তাই নীরবে সহ্য করার মতো মন ও প্রবোধ পাওয়ার মতো যুক্তি তাদের ছিল। এ জন্যে সে-কালে এক ধরনের তথাকথিত সামাজিক নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা চালু ছিল। যদিও তা ছিল অনেকাংশে অযৌক্তিক ও অমানবিক। তবু ভদ্রলোকের দর্পদাপটে পীড়নে-শোষণে কাবু ছিল গণমানব, সামরিক শাসনে কার্ফু কালে যে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য লোক যাত্রায় দেখা যায়, এ ছিল অনেকটা সে-রকম। সুখ-সম্পদ ভোগ-উপভোগ করত শাসকগোষ্ঠীরা ও তাদের সহযোগীরা। অন্যসব ভোগবঞ্চিত গণমানব ছিল তাদের সেবক ও ভোগ-উপভোগের যোগানদার। গণমানব ছিল আশাহীন প্রত্যাশাহীন আবর্তিত জীবনে অভ্যস্ত। ব্রিটিশ আমলে শেষ শতকে দ্রুত গতিতে যন্ত্রের আবিষ্কার ও কৃৎকৌশলের অভাবিত উৎকর্ষ ও প্রসার বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজেও মানবমুক্তির প্রত্যাশা জাগায়। এ সময়েই যে-কোন মানুষ অভিপ্রায় ও যোগ্যতানুসারে কর্মগ্রহণের অধিকার পায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার অবাধ অধিকার মেলে এ সময়েই। এ সময়েই রেল, স্টিমার, বিমান, ডাক-তার, রেডিও, সংবাদপত্র, ব্যাংক, বীমা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টাইপরাইটার, টেলিপ্রিন্টার, টেলিভিশন, মোটরগাড়ী, কম্পিউটার এবং কৃৎকৌশল সম্পৃক্ত হাজার প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, আর দুটো মহাযুদ্ধ বিশ্ব মানবকে যেমন নানাভাবে এক অভিন্ন স্থানিক, কালিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি দান করে, এমনটি আগে কখনো ছিল না। ব্যবহারিক জীবনের এসব উপকরণের সঙ্গে মানস জীবনের চিন্তা-চেতনায় বিপ্লব ঘটালেন মুখ্যত ডারুইন, মার্কস ও ফ্রয়েড। মানব মনীষার এই য়ুরোপীয় প্রকাশ ও বিকাশ গোটা পৃথিবী প্রভাবিত করল। জীবন-জীবিকায় ও হাতিয়ারে এল আমূল পরিবর্তন। ফলে আকস্মিকভাবে এল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সঙ্গে আরো অনেক 'বাদ'। ঘরে সংসারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র ঘটল যুগান্তর—পুরোনো শাস্ত্র সমাজ ও সরকার হারাল গুরুত্ব ও প্রভাব। নবযুগে নতুন পরিবেশে জাগ্রত বঞ্চিত শোষিত জনতা হল স্বাধিকার সচেতন। গণমানবের সংগ্রাম হল শুরু, বাধল লড়াই। পুরোনো মূল্যবোধ হল বর্জিত, নতুনমূল্যবোধে থেকে গেল অস্পষ্টতা ও অপূর্ণতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন করল আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশ। এসব জানা কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

স্বাধীনতা বাঙালীরাও পেল, প্রথমে পাকিস্তানরূপে, পরে বাঙলাদেশ নামে এ স্বাধীনতা গণমানব ও রাজনীতিকের যৌথ প্রয়াসের প্রসূন।

কিন্তু এই বাঙালীরা কারা? নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ইসলামে দীক্ষিতদের বংশধরেরা যে আজকের বাঙলাদেশী বাঙালী তা-আজকাল আর কেউ অস্বীকার করে না। এরা তাই দু'হাজার বছর ধরে বঞ্চিত শোষিত পীড়িত লোকের উত্তরপ্রজন্ম। এদের অর্থবিত্তের কিংবা শিক্ষা-সংস্কৃতির তেমন কোন ঐতিহ্য ছিল না, ব্যতিক্রম ছিল বিরল। এরা ছিল প্রতীচ্য শিক্ষার ও রুচির, চিন্তার ও চেতনার ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড়। তাদের গাঁয়ের নিবাস ছিল খড়ির, বাঁশের বেড়ার, মাটির দেয়ালের কিংবা টিনের। সাধারণভাবে গরীব ঘরের সন্তান ওই শিক্ষিত স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের সম্পদ ও সম্মান আহরণ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্নে করে দিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতারূপী নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান। এই প্রথমবারের মতো তারা ভোগ্য উপভোগ্য সামগ্রী-সম্পদের শহুরে অধিকার পাচ্ছিল, তাই ক্ষুধিত শ্বাপদের গরজ ও লিপ্সা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা অর্থ-বিত্ত-মান-যশ সংগ্রহে। ন্যায়-নীতি ভালো-মন্দ বিবেক-বিচার প্রভৃতি কোনটাই লক্ষ্য করবার মতো স্বস্থ ছিল না লুব্ধচিত্ত ও প্রাপ্তি-সুখ সন্ধানীরা। মুক্ত বাঙলায় আমরা এ বুভুক্ষুদেরই অবাধ অসংযত ও অসংকোচ লুটপাট, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি ও ঠেলাঠেলির চরমলীলা দেখছি। তাদের কপালগুণে এ সুযোগ তাদের তিনবার তিনভাবে মিলেছে, বিদেশী ব্রিটিশ যাওয়াতে ও স্বতন্ত্ররাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ফলে একভাবে, বিধর্মী বিতাড়নে আর একভাবে এবং শেষে বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠায়ও বিভাষী বিতাড়নে। শিক্ষিত হয়ে হয়ে প্রতি বছর নতুন নতুন দল আসছে গাঁ-গঞ্জ থেকে অর্থ-বিত্ত অর্জনের সন্ধানে। তাই ভিড় এখন বেড়ে চলেছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার জন্যে সবাই প্রতিযোগিতা করছে। সিঁড়িতে এ মুহূর্তেও বেজায় ভিড়। তাই ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কিও চলছে, এতে বলবান-বুদ্ধিমান ও ভাগ্‌নেরা উৎরে যাচ্ছে আর প্রাণ হারাচ্ছে সহায় সম্বলহীন অধূর্ত অভাগ্‌নেরা। ঠিক এমনি অবস্থা ছিল কোম্পানি আমলের কোলকাতায়ও।

গাঁ-গঞ্জে টাউট-মাতব্বর মুৎসুদ্দী থেকে শহুরে কোন বুর্জোয়া আমলা-ঠিকাদার, মৌজুদদার, সদাগর-চোরাকারবারী কলকারখানার মালিক ও রাজনীতিক প্রভৃতি সব চালাকচতুর মানুষের একই রকম আত্মরতি ও স্বার্থবুদ্ধি। নতুন কিংবা পুরোনো মূল্যবোধ এ শ্রেণীর মানুষে দুর্লক্ষ্য। কেউ বহুজনহিতে বহুজনসেবায় কিছু ভাবে না। কারণ এ শ্রেণীর মধ্যে মানবপ্রেমিক বা দেশপ্রেমিক কিংবা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নেই। নির্বোধ নিষ্ক্রিয় বাঁচে অতীত ঐতিহ্যের রোমন্থনে, ধূর্ত বুদ্ধিমান লিপ্সু বোঝে স্বকাল ও সুযোগ আর স্থিতধী প্রজ্ঞাবান ভাবে ভবিষ্যৎ। শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ দুর্লভ।

তাই ঘরে বাইরে কোথাও পাপ-পুণ্যের কথা ন্যায়-অন্যায়ের কথা, ভালো-মন্দের কথা, বিচার-বিবেচনার কথা কেউ উচ্চারণ করে না—এসব যারা ভাবে তারাও আজ নির্বোধ বলে উপহাসের পাত্র। এই পরিবেশের স্রষ্টা সহজে ও সহসা পাওয়া স্বাধীনতা, লালনকর্তা সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী আত্মরতি সর্বস্ব রাজনীতিক এবং পোষক লুণ্ঠননীতিতে বিশ্বাসী শ্রেণীর মানুষ-পরিচালিত সরকার।

তাই আজকের বাঙলার পরিবেশের সৃষ্টি শঠ, প্রতারক ও লুটেরা। বাঙলার বর্তমান যুগকে কোন নামে চিহ্নিত করতে হলে, সে-নাম হবে 'ভেজালযুগ'। এ পরিবেশ দুরাত্মা ও দুর্নীতিপ্রসূ।

অথচ মানবকাম্য পরিবেশ হবে সেটাই, যাতে জীবিকার ক্ষেত্রে সম-সুযোগ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন, ব্যক্তি জীবনের মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্বীকৃতি, মানব জীবনে শ্রেয়ঃ বরণের ও সংস্কার বর্জনের স্বাধীনতা লাভ, রাষ্ট্রিক জীবনে ব্যক্তিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার চেতনা সুষ্ঠুকরণ, আর সমস্বার্থে ব্যক্তি মনে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

তাহলেই কেবল ব্যবহারিক, বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনেও সম্পৃক্ত মানবিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, এমনি পরিবেশেই ব্যক্তির জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা থাকে, ফলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশেরও সুযোগ ঘটে। সাম্যতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রই কেবল এ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ-লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে অন্তত সমাজতন্ত্র আবশ্যিক।*

* ১৯৭৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশনে দেয়া বক্তৃতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ

আস্তিক ধার্মিক রক্ষণশীল অতীতমুখী মানুষের মনোজগতে কালপ্রবাহ আকস্মিকভাবে স্তব্ধ ও জব্দ হয়ে যায়। তাদের মতে বেদ-বাইবেলেই ধরা পড়েছে চিরকালের জন্যেই মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেক। তার আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশার প্রয়োজনের সবকিছুর চাবিকাঠি—সিসম মন্ত্র ওই বেদ-বাইবেলই। তাই অতীতের ডিগদড়িই নিয়ন্ত্রিত করছে তাদের নিশ্চিত-নির্ভাবনার জীবন। নতুন করে কিছু ভাবার চিন্তার উদ্ভাবনের আবিষ্কারের জিজ্ঞাসার ও সৃষ্টির প্রয়োজনই অনুভব করে না তারা। তাদের মতে সত্য উদঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত, নতুন পরীক্ষার ও সন্ধানের কিছুই নেই, এখন কেবল নিষ্ঠ আচরণই বাকী। নাস্তিকরা-সংশয়বাদীরা তথ্যের, তত্ত্বের, যন্ত্রের ও প্রযুক্তির আকারে যা কিছু উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছেন, তা যদিও জীবনযাত্রার ও জীবিকাপদ্ধতির চেহারা বদলে দিয়েছে, তবু সেসব না হলেও চলত—স্বল্পায়ু পার্থিবজীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের ও সুখকরতার এসব উপকরণ ফজুল ঝামেলামাত্র—এমনি একটা অব্যক্ত তাচ্ছিল্য তাদের কথায় কাজে আভাসিত হয়।

যদি কেউ এদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে যে বেদ-বাইবেলের পরেও যখন পৃথিবী রইল, জনপ্রবাহও রইল, তখন তাদের জীবনের ও জীবিকার প্রয়োজনের ও প্রত্যাশার অনুকূল পরিবেশ রচনার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাধ্য-সামর্থ্যই বা থাকবে না কেন? প্রতিদিন নতুন করে সূর্য ওঠে, প্রতি মাসেই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, প্রতি নবজাত মানুষ পৃথিবীকে নতুন বিস্ময়ে ও আনন্দে প্রত্যক্ষ করে, প্রতি মানুষ স্ব স্ব চেতনার পরিসরে জগৎ ও জীবন অনুভব করে, কোন কোন ব্যক্তি আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-মননে ও যন্ত্রনির্মাণে বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত বুদ্ধির ও শক্তির পরিচয় দেয়। এসব তত্ত্ব বা তথ্য যদি সত্য হয়, যদি যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রমাণসম্মত হয়, তা হলে প্রতি প্রজন্মের প্রতি মানুষ ও প্রতি সমাজই স্ব স্ব জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে স্ব স্ব মননে-উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে ঋদ্ধ হয়ে স্ব-সৃষ্ট জীবন প্রতিবেশে স্ব স্ব জীবন-ভাবনায় জগৎচেতনায় স্বকালে স্বস্থানে বাঁচবার স্বাধিকার পাবে না কেন?

তখন আস্তিক রক্ষণশীলদের রুষ্ট, ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু প্রতিবাদী কণ্ঠে একই কথা ধ্বনিত হবে—মুনি-ঋষি, নবী-অবতারের কাল অপগত। কাজেই নতুন জ্ঞান প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিবেকের উন্মেষ ঘটতেই পারে না, কেননা জ্ঞান-প্রজ্ঞা শক্তির উৎস হচ্ছেন স্রষ্টা। আর স্রষ্টা মানুষের প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ ও পূর্ণ জ্ঞান বা পরাজ্ঞান ও ব্রহ্ম জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন মুনি-ঋষি-নবী-অবতারের মাধ্যমে। কাজেই যে যতই অবজ্ঞাবশে জ্ঞান-বুদ্ধির অহংকার করুক না কেন, জ্ঞান আর কারো আয়ত্তের মধ্যেই নেই।

পারত্রিক পরিণাম চেতনা তাদের রেখেছে পূর্বসূরীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেকের পূর্ণতা সম্বন্ধে প্রশ্নহীন ও নিয়মনিষ্ঠ। কালোপযোগী জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা লাভে আমাদের এ বাধা আজো দুরতিক্রম্য। এবং কমবেশি পৃথিবীর সর্বত্রই এ মানসবদ্ধতা সুলভ। এ কারণেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সভ্যভব্য সমাজেও অধিকাংশ মানুষে সমকালীনতা দুর্লভ। তাই পৃথিবীর প্রাগ্রসর সমাজেও আশানুরূপ তথা প্রয়োজনানুরূপ সমকালীনতা বিদ্যমান নেই। এমনি এক তৃপ্তম্মন্যতা আর হীনমন্যের নিজের শক্তি-সামর্থ্যে আস্থাহীনতাই মানুষকে অতীতনির্ভর ও ঐতিহ্যপ্রাণ করে রাখে। এমনি মানুষই অতীতকেই-ঐতিহ্যকেই জীবন-ভাবনার ও জগৎ-চেতনার উৎস বা পুঁজি বলে জানে বা মানে। তখন তাদের জানবার, বুঝবার, করবার, ভাববার আর কিছুই আছে বলে তারা মনে করে না।

অথচ অতীত ও ঐতিহ্য কাউকে কখনো কিছুই দেয়নি, দেয় না, দিতে পারে না। অতীত ও ঐতিহ্য যদি জীবনযাত্রায় পিতৃধনের মতো সম্পদ ও পাথেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারত, তা হলে গ্রীসের, রোমের, মিশরের, বাগদাদের, ভারতের, চীনের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ধারা, মনন-চিন্তন আগ্রহ, উদ্ভাবনে আবিষ্কারে উৎসাহ, সৃষ্টির উদ্যম, নির্মাণের উদ্যোগ বহু বহু শতকের জন্যে শীতকালীন ঔষধির মতো নিশ্চিহ্ন সুপ্তিতে আশ্রিত হত না।

গ্রীকরা যেদিন জানল বা বুঝল জ্ঞানে বিজ্ঞানে তাদের চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই নেই, সবটাই পূর্বসূরীরা করে গেছেন, সেদিন থেকেই তারা পিতৃসম্পদের মতোই অতীতকে ও ঐতিহ্যকে করল নিষ্ক্রিয়-নিশ্চিন্ত জীবনের পুঁজি ও দিশারী—প্রেরণা পাবার জন্যে নয়, গৌরবগর্বের ছলে অক্ষমতার গ্লানি ঢাকবার অবলম্বনরূপে, —এ হচ্ছে 'বাপের নামে আধা থাকবার-পিতৃ-নামা 'চ মধ্যম' হবার নির্লজ্জ কৌশল মাত্র। অতএব ঐতিহ্যপ্রীতি জীবন-প্রেরণা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। একই মনোভাবের পরিণাম দেখলাম আমরা সুমারে মিশরে ব্যাবিলনে রোমে ইরানে বাগদাদে ভারতে চীনে। তবু পর-বুদ্ধিজীবী, পরসম্পদজীবী, পরচিন্তা-কৌশল নির্ভর বদ্ধ-মনের জড়চেতনার মানুষ আজো অতীত ও ঐতিহ্য নির্ভর। তাই দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজের, সংস্কৃতির ও চিন্তা-চেতনার কালোপযোগী প্রয়োজনানুরূপে বিকাশ-বিস্তার ঘটেনি, হয়নি আত্মবিধ্বংসী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান।

অতীতস্মৃতি ও ঐতিহ্যই যদি উঠতির ও অগ্রগমনের প্রেরণাস্বরূপ হত, তা হলে গৌরবময় ঐতিহ্যবিহীন কোন বুনো-বর্বর মানুষের ভব্য সভ্য হবার অধিকার বা উপায়ই থাকত না। কোন অতীতই কোন ঐতিহ্যই বর্তমানের চাহিদা মেটাতে পারে না, নতুন দিনের নতুন মানুষের নতুন চাহিদা, জীবনের বাঁকে বাঁকে নতুন সমস্যা, নতুন প্রয়োজন, স্থান-কালের নতুন দাবি নতুন মানুষকে নতুন করেই পূরণ করতে হয়।

প্রতিটি মানুষ যুগের সৃষ্টি, কোন কোন মনস্বী-মনীষী যুগন্ধর এবং ক্বচিৎ কেউ কোন শতকে যুগস্রষ্টা। সাধারণত যুগন্ধর না হলে যুগ-স্রষ্টা হওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যে-মানুষ স্বযুগের বৈশিষ্ট্য জানেন, স্বযুগের চাহিদা বোঝেন, স্বযুগের রোগ চিহ্নিত করতে সমর্থ, তিনিই যুগন্ধর। যুগন্ধরদের কেউ ব্যক্তিকে ও সমাজকে কু-প্রবণতামুক্ত করে ব্যক্তি-মনের ও সমাজমানসের জরা-জীর্ণতা-জড়তা ঘুচিয়ে নবজন্ম বা জাগরণ দান করেন—এবং তিনিই যুগনায়ক বা চিন্তানায়ক—যুগ-স্রষ্টা।

অতীত বা পিছন কখনো সম্মুখগতি দিতে পারে না। পিছনটা সম্যক দেখতে হলে গতি রুদ্ধ করে সারা দেহ ফিরাতে হয়, তবেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। চোখ দুটো সুমুখেই স্তাপিত, পা দুটোই সামনের দিকেই পাতা, কাজেই সম্মুখই বর্তমানে দ্রষ্টব্য এবং ভবিষ্যতের ভরসা। অতএব অতীত ও ঐতিহ্য সম্মুখগতির উৎস ও ভিত্তি—এ ধারণা অদ্ভুত চিন্তার প্রসূন। রামমোহন রায়ের মতো যুক্তিনিষ্ঠ মুক্তবুদ্ধির মানুষও স্বজাত্যভিমানবশে বেদ-উপনিষদের মোহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্যাগ করতে পারেন নি। ব্যক্তির বা সমাজের দৈশিক-কালিক প্রয়োজন মেটানোর উপায় খুঁজেছেন তিনি অতীতের জ্ঞান-প্রজ্ঞার আকরে। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল সারা জীবন সে-বদ্ধতা, আবাল্য-তার মন ভুলিয়ে ছিল প্রাচীন ভারত আর চোখ ধাঁধিয়ে ছিল সমকালীন য়ুরোপ। ফলে তার মন-মনন ছিল স্ববিরোধের শিকার। তাই তিনি যেমন ঔপনিষদিক পরাজ্ঞানে আস্থা রাখতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব মানতেন, তেমনি চাইতেন; য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের আর বিজ্ঞানের অনুগত হতে। কিন্তু দু-টোতে ছিল দুই মেরুর ব্যবধান, তাই রবীন্দ্র-চেতনায় আধুনিক য়ুরোপ ও প্রাচীন ভারত-চেতনা কখনো সমন্বিত হয়নি। তাঁর রচনাই তার সাক্ষ্য। প্রাচীন ভারত হচ্ছে বিশ্বাসের জগৎ, আর আধুনিক য়ুরোপ হচ্ছে যুক্তির ও বিজ্ঞানের ভুবন, একটি স্বপ্নের ও অনুভবের সম্পদ, অন্যটি বাস্তবজীবনের সম্বল।

মধুসূদনেরও ছিল না সমকালীনতা। সতেরো শতক অবধি কালের য়ুরোপের এবং প্রাচীন ভারতেরই সঙ্কীর্ণ সড়কে বিচরণ করেছে তার মন। দুনিয়ার অধিকাংশ আস্তিক কবি-লেখক কেবল স্বধর্মীর স্বদেশীর সেবক ও ভাবক। তাই হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, টি.এস.এলিয়ট, হালী, ইকবাল, নজরুল, হাফিজ জালন্ধরী, ফররুখ আহমদ প্রমুখ আমাদের চেনা কবিরা মুখ্যত স্বধর্মীর কবি হিসেবেই প্রখ্যাত। চেতনার আঞ্চলিকতা, স্বধর্মীয়তা, স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা থেকে বৈশ্বিকতায়, মানব-চেতনায় তথা বৈশ্বিক উত্তরাধিকার বা অভিন্নমানব-প্রজাতি বোধে উত্তরণ আজকের এ যুগে যন্ত্রনির্ভর মানুষের স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যেই জরুরী। অজ্ঞ মোহান্ধ ঐতিহ্যগর্বী স্বাতন্ত্র্যকামী মানুষকে-গোত্রকে-জাতিকে আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোন পুরাতনই নতুনের সমকক্ষ নয়, কোন পুরাতন সম্পদই নতুন দিনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না, পিতৃধনে ক্ষয় আছে বৃদ্ধি নেই, পুরোনোতে কখনো নতুনের ঔজ্জ্বল্য নতুনের জৌলুস সৃষ্টি করা চলে না। অঙ্গে অবয়বে অন্তরে কালের দাবির ঠাঁই করেই দিতে হয়, পূরণ করতে হয় কালিক ও স্থানিক প্রয়োজন। যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত আজকের জীবনে পুরোনো ধ্যান-ধারণা-আচার-নিয়ম-নীতি পরিহার করে যন্ত্রানুগ জীবনভাবনা, জগৎচেতনা, সমাজবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, ব্যক্তিক আচার-আচরণ ও সামাজিক-নৈতিক নিয়মনীতি বদ্ধচিত্তের অজ্ঞ মানুষ-আকীর্ণ সমাজে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই নতুনে পুরাতনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ কেবল যে ব্যক্তিক সামাজিক আর্থিক রাষ্ট্রিক জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা নষ্ট করছে তা নয়, মানব-সংস্কৃতির বিকাশধারাও ব্যাহত করছে, ফলে চলছে লড়াই, ঘটছে বিপর্যয়।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'জ্ঞ' বা 'বিৎ' হচ্ছে কেবলই জিজ্ঞাসার উত্তর, কৌতূহলের, নিবৃত্তিসন্ধিৎসা, —অন্য উপকারিতা ও উপাদেয়তা ছিল পরোক্ষ উপযোগ মাত্র। শিক্ষার গোড়ার কথাই ছিল সৃষ্টির ও স্রষ্টার, জগতের ও জীবনের রহস্য সম্পর্কে পরাজ্ঞানলাভ এবং তজ্জাত বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন আর স্ব-চরিত্রে সমাজসদস্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণের অনুশীলন। এ তাৎপর্যে জ্ঞান ও বিদ্যা দেবে সততা সৌজন্য সুবুদ্ধি। সেবাপরায়ণতা করবে বিনয়ী, বিবেকবান, যুক্তিবাদী ন্যায়নিষ্ঠ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন মানুষ তথা সমাজসদস্য। এ ধারণা থেকেই আজো শিক্ষিত বা জ্ঞানী মানুষে অন্যায়-অসদাচরণ অপ্রত্যাশিত। তাই শিক্ষিত মানুষে অসঙ্গত ভাব-চিন্তা -কর্ম-আচরণ আজো সরলপ্রাণ মানুষের নিন্দার ও ক্ষোভের বিষয়।

অতএব জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যই ছিল জগতের ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে নানা স্বাভাবিক ও গূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান বা কৌতূহলের নিবৃত্তি সাধন। জীবিকার প্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন হাতিয়ার সন্ধিৎসা ও নির্মিৎসা জেগেছে, চালুও রয়েছে, তেমনি নতুন নতুন মানুষের জ্ঞান বা বিদ্যা আয়ত্ত করার স্পৃহা জাগরূক হয়েছে। কোন কোন জ্ঞান বা বিদ্যা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বাস্তব বৈষয়িক জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে জীবনে স্বচ্ছন্দতা সুখরতা দান করছে। ক্রমে জ্ঞান-বিদ্যা-প্রজ্ঞা মানুষকে করেছে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে যন্ত্রনির্মাণে কৌশলপ্রয়োগে উৎসাহী-উদ্যোগী। তারই ফল আজ যন্ত্র লাভ করেছে অবারিত ও বিস্ময়কর উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য, শক্তি ও কার্যকরতা। মানুষের বুদ্ধির, জ্ঞানের, প্রজ্ঞার অচিন্ত্য বিকাশের ও মানুষের মন-মস্তিষ্কের বিস্ময়কর শক্তি সামর্থেরই সাক্ষ্য এ সব যন্ত্র। তা ছাড়া সমতালে ও সম-পর্যায়ে মানুষের ব্যবসায়িক, বৈষয়িক, বাণিজ্যিক, প্রাশাসনিক বুদ্ধিরও আশ্চর্য আর জটিল বিকাশবিস্তার ঘটেছে, ফলে যে-শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন গোড়ায় পরাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ লক্ষ্যে শুরু তা-ই ক্রমে বাস্তব প্রয়োজন সম্পৃক্ত হয়ে হয়ে পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা এবং মানববিদ্যা—এ দু'ভাগে পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পায়, আবার যন্ত্রের প্রসার-প্রভাবের ফলে মানববিদ্যায় বৃত্তিবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যা সঙ্গত কারণে বিশেষ, মুখ্য ও জরুরী হয়ে ওঠে। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-প্রকৌশল তাই লোককাম্য হয়ে উঠেছে। হাজারো রকমের কলের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক জীবন হয়ে উঠেছে জটাজটিল। তাই বাঁচবার ও বাঁচবার প্রয়োজন বুদ্ধিই বৈষয়িক ও জীবিকা ক্ষেত্রে বৃত্তি-বেসাতমূলক বিদ্যার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। কৃষি বিদ্যা, পশুবিদ্যা, মৎসবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, বীজবিদ্যা, যন্ত্রশিল্পবিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা, ব্যবসায় প্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পুঁজি বিনিয়োগ বিজ্ঞান, বিপণন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা বিদ্যা, রাষ্ট্র প্রশাসনবিদ্যা, প্রশিক্ষণবিদ্যা এবং নানা প্রযুক্তি প্রকৌশলবিদ্যা দান ও গ্রহণই যখন প্রাধান্য পেল, তখন পরাজ্ঞান দানে গ্রহণে যে অনুরক্তি-অভিভূতি গুরুতে-শিষ্যতে উস্তাদে-ছাত্রে পীরে-সাগরেদে ছিল, এসব বৃত্তি-বেসাত ও প্রযুক্তি-প্রকৌশল মূলক জ্ঞানদানে গ্রহণে তেমন কোন রোমাঞ্চকর বিস্ময়কর গভীর ও ভাবগত অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগে না, তেমনি শিক্ষককেও জ্ঞানদাতা মনস্বী মহৎ গুরু বলে মনে হয় না। স্বীকার করাই উচিত যে এ যুগের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বার্থেই বিদ্যাবিক্রয়ের বিপণী মাত্র। অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা ঘরে-বাইরে সর্বত্র বেচাকেনা চলছে। আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকটা 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এর মতো ব্যঞ্জনাবিহীন পাথুরে নীতিভিত্তিক।

শিক্ষার তথা জ্ঞান দান-গ্রহণের প্রথা-পদ্ধতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য, বিষয়-আশয় সব বদলে গেছে, তবু প্রাচীন পরাবিদ্যার গুরুর মতো ছাত্র থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রত্যাশা করেন শিক্ষকরা। ছাত্ররা দেশ-কালের নিয়মে পয়সা দিয়ে (বা না দিয়ে) বিদ্যা কেনে বা পায়, যেমন অন্য সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও শ্রম কেনে। তাহলে যুগান্তর এবং অবস্থান্তরে ও ব্যবস্থান্তরে বিদ্যা বা কৌশলক্রেতা শিক্ষার্থীরা বা বিদ্যার্থীরা কেন শ্রদ্ধা-ভক্তি-আনুগত্যের ফাও শিক্ষা বিক্রেতাকে নেবে, তা তারাও বুঝে উঠতে পারে না। কাজেই মানের দাবিদার শিক্ষকের এবং মানতে অস্বীকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুগত্য লেন-দেন নিয়ে আজকাল বেশ ঠোকাঠুকি চলছে—বলতে গেলে দুনিয়ার সর্বত্রই। এ হচ্ছে যন্ত্রযুগের দান। শিক্ষকদের এ দাবি ছাড়তে হবে, কেননা, যুগান্তরে বিবর্তিত সমাজে সংস্কৃতিতে মন্ত্রগুপ্তির কালের সামন্ত সমাজের অনুগৃহীত-অনুগ্রাহক সম্পর্ক জ্ঞাপক এ প্রথা চলতেই পারে না। কঠিন বাস্তবকে মেনে নেয়া সবার পক্ষেই কল্যাণকর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু এ সত্য ও স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে আজো জিজ্ঞাসু ছাত্রের এবং জিজ্ঞাসার উত্তরদানে নিষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকের সম্পর্ক স্নেহ-প্রীতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বিহীন নয়। অতএব শিক্ষককে শ্রদ্ধা-ভক্তি পাবার মতো জ্ঞানী-গুণী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ হতে হবে। তাতে বেআদব ছাত্রও বিবেকের প্রণোদনায় সৌজন্য রক্ষা করে চলবে। আসলে জ্ঞানের ও অনুভবের যুগ্ম অনুশীলন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী অথচ যৌথ জীবনে কল্যাণবাদে আস্থাবান যুক্তিবাদী মানুষের সমাজ নির্মাণ করে।

এমনিভাবে যুগান্তরে শাস্ত্রে-সমাজে, আচারে-আচরণে, সম্পর্কে-সম্বন্ধে, রীতিতে-রেওয়াজে, নিয়মে-নীতিতে বিবর্তন হয় অপ্রতিরোধ্য, আবশ্যিক হয় পরিবর্তন। নইলে ব্যবহারিক, বৈষয়িক ও মানবিক জীবনে, সামাজিক সম্পর্কে, রাষ্ট্রিক সম্বন্ধে ব্যক্তিক সংযোগে চিড় ধরে, দেখা দেয় অসামঞ্জস্য অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধ। মূল্যবোধে ঘটে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য, প্রকট হয়ে ওঠে অবক্ষয় ও বিপর্যয়। বিশেষ করে যখন যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত আজকের সংহত বিশ্বে জাতে-জন্মে-বর্ণে-গোত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বঘরের ও স্বআদর্শের অনুসরণ করে বিভিন্ন ধর্মের, বহু মনের, বিচিত্র মননের, নানা মতের মানুষ অধ্যুষিত রাষ্ট্রে কেবল আত্মবিনাশই ত্বরান্বিত করা হয়। অতীত স্মৃতিকে পাথেয় করে সংকীর্ণ সড়কে চলার এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করাই কালগত কারণেই শ্রেয়।

মানুষের চিন্তা-চেতনার বদ্ধতার মূলকারণ কেবল ঘরোয়া জীবনে প্রাপ্ত আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কৃতি রুচি নয়, মূলকারণ ওই বিশ্বাস-সংস্কারের প্রবক্তা-প্রবর্তক মুনি-ঋষি-নবী-অবতারে অমোঘ অনড় আস্থা বা সবিস্ময় ভক্তি। ওরা নিজেরা যদিও পিতৃ শাস্ত্র সমাজ ও বিশ্বাসসংস্কারদ্রোহী, কিন্তু নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাস-বাণী-উপদেশ-উপলব্ধিকে চিরন্তন সত্য-ভিত্তিক বলে প্রচার করে সমকালীন মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটাতে গিয়ে তাদের অজ্ঞাতেই কালান্তরের মানুষের মন-মানস নতুন নিগড়ে শক্ত করে বেঁধে গেছেন। সাধারণ মানুষের অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতির এ-ই হচ্ছে কারণ।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেক কারুর বা কোন কালের একক সম্পদ নয়—এ তত্ত্বে আস্থাবান বিজ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই অতীতমুখী শাস্ত্রভীরু রক্ষণশীল বদ্ধচিত্তের মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এ অবস্থা সৃষ্টিতে অবশ্যই খোলামনের জিজ্ঞাসু ও যুক্তিপ্রিয় শিক্ষিত মানুষের কথার ও আচরণের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যিক। যুক্তিই ন্যায়-নির্ধারক ও নীতিনিয়ামক। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তি মানুষকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করে না। কাজেই এখন অজ্ঞ সংস্কারচালিত বিশ্বাসনির্ভর রক্ষণশীল মানুষের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে, প্রতিরোধে ফলপ্রসূ করতে হলে কেবল গণমানবের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা, আর্থিক সুবিচারের কথা বললে চলবে না, তার সঙ্গে স্থান-কালের প্রতিবেশে জীবন-যাত্রার গরজে জীবিকার্জনের প্রয়োজনে জ্ঞানের ও যুক্তির হাতিয়ারও প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে মানুষ যদিও সুন্দর ও কেজো সামগ্রী বা যন্ত্র কিছু পেলেই স্বদেশী-বিদেশীর বা আপন-পরের ভেদ মানে না, তাদের জাত্যাভিমানে লাগে না, কিন্তু নতুন জ্ঞান, মত, সত্য ও তথ্য গ্রহণে তারা অসমর্থ। তার একটি কারণ—ইহ-পরকালে প্রসারিত আস্তিক মানুষের জীবনে বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধন, অন্যকারণ—নবশ্রুত জ্ঞান, মত, তথ্য, তত্ত্ব বা সত্য বস্তুর মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ কোন ফল দেয় না বা কাজ করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু পার্থিব ও বাস্তব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়েই তার মনের অর্গল খুলতে হবে। কাজেই বিশ্বাসের মোকাবেলা করবে যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষতাবাদ। যুক্তিবাদে ও পজিটিভিজমে অনুরাগবৃদ্ধি পেলেই মানুষ ঐহিক জীবন-চেতনার অনুগত হবে। পারত্রিক-জীবনে যন্ত্রণা-ভীতি হ্রাস পাবে, জেনে-বুঝে-ভেবে পার্থিব জীবন রচনায় ও যাপনে থাকবে নিরত। যুক্তিবাদের প্রসারে ভাববাদ অবশ্যই হ্রাস পাবে, হ্রাস পাবে পরাবুদ্ধি। আর যুক্তির সঙ্গে বিবেকযুক্ত থাকলেই ব্যক্তি মানুষের মনে যৌথজীবনে প্রয়োজনীয় পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নীতিবোধ সদাজাগরূক থাকবে।

স্রষ্টা ও শাস্ত্র

জীব-উদ্ভিদের রূপবৈচিত্র্যে এবং এক অদৃশ্য আবর্তিত নিয়মে বহু ও বিবিধ স্বভাবে ও স্বরূপে, তাদের জীবনের ও জীবনযাত্রার বিচিত্র প্রকাশে ও বিকাশে আর খরা-ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় প্রকৃতির সাংবৎসরিক খেয়ালী-খেলায় বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও ভীতিতে অজ্ঞ, অসহায় মানুষ এক বা একাধিক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য নিয়ন্তার বা নিয়ন্তা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুভব করে। জগৎ ও জীবন স্রষ্টার অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থার উদ্ভব ঘটে এভাবেই।

স্রষ্টা আছে জানলে ও মানলে, তাঁর সঙ্গে মানুষের স্বতই একটা ভয়-ভরসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্ষতির ভয়ে কিংবা অনুগ্রহের আশায় তাকে স্তবে-স্তুতিতে-সেবায় এবং ভোগ-উপভোগের উপচারে বশ করার প্রণোদনাও জাগে।

ক্রমে সভ্যতার স্থানিক ও কালিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে স্রষ্টার আর সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশ-বিস্তার ঘটে। গোত্রীয় ও গোষ্ঠী জীবনে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানের প্রয়োজনে তৈরি নিয়ম-নীতি-গুলোও স্রষ্টা-নির্দেশিত বলে চালিয়ে দিল গোত্রপ্রধান, গোষ্ঠীপতি, সমাজ-সর্দার ও বুদ্ধিমান দলপতিরা। এভাবে পার্থিব জীবনের প্রাত্যহিকতায় স্রষ্টার বিধি-নিষেধ ব্যক্তি মানুষের, পরিবারের ও সমাজের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

জনসংখ্যার কালিক ও স্থানিক বৃদ্ধির ফলে এবং মানুষের প্রয়োজন-বুদ্ধির প্রসারের দরুন সহাবস্থানের ও সহযোগিতার গরজবোধে বৃহত্তর সমাজ গঠন যখন আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তখনই সভ্যতার সমাজে অভিন্ন স্রষ্টার বা উপাস্যের অঙ্গীকারে আবির্ভাব ঘটে নবী-অবতারের। নবী-অবতারের কাল থেকে স্রষ্টার ও শাস্ত্রের সম্পর্ক হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ, এবং অভিন্ন শাস্ত্রে আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সম্প্রদায় ও জাতি, এমন কি দেশ আর রাষ্ট্র।

সুবিন্যস্ত লিখিত শাস্ত্র মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে কিংবা জাতিতে জাতিতে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের, অনুভবের, মতের ও শ্রেয়োচেতনার পার্থক্য এমন দুরতিক্রম্য ও স্থায়ী করে দিল যে, প্রাণিজগতে অভিন্ন শ্রেণীর ও সত্তার প্রাণী হিসেবে এক অভিন্ন বিশ্বমানবিক মিলন-ময়দান নির্মাণ আজো স্বপ্নের স্তরেই রয়ে গেল। স্বধর্মী না হলেই কাউকে সাধারণভাবে পর, শত্রু এবং ঘৃণ্য ভাবা আস্তিক মানুষ মাত্রেরই একটা সামাজিক কিংবা মানসিক আধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রষ্টা থাকলেই শাস্ত্রও থাকবে কিংবা স্রষ্টাকে মানলেই শাস্ত্রকেও মানতে হবে—এমন বিশ্বাসে কিংবা দাবিতে পরিচ্ছন্ন চিন্তার বা যৌক্তিক চেতনার সমর্থন মেলে না। কেননা আমরা দেখেছি আদিম ও আদি মানবরা যে-সব দেবতা মানত, শাস্ত্রীয় যে-সব আচার-আচরণ, পূজা-উপাসনা ও পার্বণিক অনুষ্ঠান করত, সেগুলো পরবর্তীকালে তাদেরই বংশধরদের কাছে মিথ্যা, ভুল ও হাস্যকর বিশ্বাস ও আচার বলে অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য হয়েছে, তেমন পরিহার-প্রক্রিয়া আজো চলছে নানাভাবে বিভিন্ন সমাজে।

জীব-উদ্ভিদের বিচিত্র রূপ ও উপযোগ-চেতনা দীন-মনীষার মানুষের মনে এক বা একাধিক স্রষ্টার ধারণা জন্মায়। এ অনুভূতি বা উপলব্ধি থেকে কোন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধিই হয়তো মানুষকে বিচ্যুত করতে পারবে না কোন দিন। অবশ্য তার প্রয়োজনও নেই। কাজেই নাস্তিক ও নাস্তিক্য টিকে থাকবে ব্যতিক্রম হিসেবেই। কিন্তু স্রষ্টা স্বয়ম্ভ হলেও শাস্ত্র যে কালিক মানুষের স্থানিক সৃষ্টি তা মানবার বুঝবার মতো-মনীষীর উৎকর্ষ একালে প্রত্যাশিত ছিল। এ প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলেই আজো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও রাষ্ট্রের মানুষ আর্থিক জীবনের ও রাষ্ট্রিক প্রশাসনের সঙ্কটকালে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়—উসকে দেয় বিদ্বেষ-বিভেদ। এভাবে টিকে থাকে শাসক-শোষক-পীড়ক সরকার।

ধর্মীয় মতবিরোধে ও অসহিষ্ণুতায় এবং স্বশাস্ত্রীয় মতগত কোন্দলে আজ অবধি পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়েছে, মানুষ মানুষে যত দ্বেষ-দ্বন্দ-সংঘর্ষ টিকিয়ে রেখেছে, যত প্রাণহানি ঘটেছে, এমনটি কোন খরা-ঝড়-বন্যায়-ভূকম্পনে-মহামারীতে কিংবা সাম্রাজিক যুদ্ধেও সম্ভব হয়নি।

অথচ জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি প্রয়োগে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় সচ্চিদানন্দ স্রষ্টা চির অজর অমর হলেও শাস্ত্র চিরন্তন হতে পারে না। স্বয়ং স্রষ্টাই স্থানে স্থানে কালে কালে নব নব নবী-অবতার মাধ্যমে তার বাণী ও বিধান বদলেছেন, দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করে জারি করেছেন নতুন বিধি-নিষেধ।

এ সূত্রের, তথ্যের ও উপলব্ধির আলোকে আজ যদি মানুষ কেবল স্রষ্টার অনুগত তথা উপাসক হয়, কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে তৈরি শাস্ত্রকে অবহেলা করে অথবা স্বদেশের স্বকালের স্বসমাজের মানুষের জীবন-জীবিকার ও পরিবর্তমান জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনুগত করার লক্ষ্যে গ্রহণে-বর্জনে শাস্ত্রের সংস্কার-সংশোধন করে (প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সংবিধান যেমন সংশোধন করা হয়) তা হলে আজকের পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মানবিক সমস্যার অনেকগুলোর সমাধান সহজে মিলবে।

ঐতিহাসিক সততাবশে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর প্রতিটি নতুন শাস্ত্রই স্বকালে স্বস্থানে উদ্ভূত জটিল ও জীবনবিনাশী মানবিক সমস্যার সমাধান লক্ষ্যে সেকালের মানুষের যৌথ জীবনে আচরণ-সাধ্য নিয়ম-নীতি ও বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে সুশৃঙ্খল সমাজে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও বিকাশের ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধের দেশ-কাল সমাজ-সরকার নিরপেক্ষ চিরন্তন উপযোগের দাবিই মানুষের সমূহ দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছে। শাস্ত্রের উপযোগ ও আবশ্যিকতা যে দেশগত ও কালগত, দেশান্তরে ও কালান্তরে পরিবর্তিত পরিবেশে ও অবস্থানে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান যে অকেজো হয়ে পড়ে, তা উপলব্ধিগত না হওয়ায় আজো শাস্ত্র-জাত সঙ্কট থেকে মানুষ মুক্ত হয়নি।

অথচ আমরা জানি, প্রলোভন প্রবল হলে স্রষ্টার উপস্থিতি সর্বত্র এবং তিনি অন্তর্যামী জেনেও মানুষ লোকনিন্দার ও শাস্তির ভয় এড়িয়ে গোপনে সব পাপ কর্মই করে। তখন স্রষ্টা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্র তাকে সংযত ও বিরত রাখতে পারে না। কাজেই মানুষের শাস্ত্রানুগত্য আসলে পাপভীতিপ্রসূত নয়, লোকাচারের অনুগত থাকার সামাজিক ভড়ং মাত্র।

তাছাড়া স্বার্থসচেতন বৈষয়িক মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে লাভের লোভে ভাঙে না হেন শাস্ত্রিক-সামাজিক-নৈতিক ও সরকারী নিয়ম নেই, কম-বেশি করে না হেন অপকর্ম নেই—ব্যক্তিবিশেষ ব্যতিক্রমমাত্র এবং তা তাও ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে।

আমরা সবাই জানি, কামে-প্রেমে মানুষ কখনো দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের বাধা মানেনি, অর্থ-সম্পদ অর্জনেও ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা মনে রাখেনি, অভাবে-আকালে যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেনি, এ যুগে দেশে-বিদেশে শহরে-বন্দরে অশনে-বসনে নিবাসে-নিদানে আচারে-আচরণে, ভাব-চিন্তা-কর্মে কোথাও কারুর শাস্ত্র-নির্দেশিত স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ম-নীতি মানা সম্ভব হচ্ছে না। তবু মানুষ নাস্তিক হয়নি, পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে বলেও গ্লানিবোধ করে না।

কাজেই আজকের দিনে কালিক ও স্থানিক জীবন-জীবিকার প্রতিবেশ-বিরোধী শাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতি পরিহার করা জীবনপথের ও জীবনযাত্রার বিঘ্ন অপসারণেরই নামান্তর মাত্র। এ উপলব্ধি যে মানস-মুক্তি ঘটাবে, তা সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে মানুষের মনুষ্যত্বের এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্রুত বিকাশ ঘটাবে,—যা গোড়ায় ধর্মশাস্ত্রের ছিল মূল লক্ষ্য।

নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্রে উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণচেতনার ব্যঞ্জনা, আচরণে সৌজন্যের আভা, সজ্জায় সৌন্দর্য, কথায় মাধুর্য, চোখে প্রীতির প্রভা এবং জীবনাচার সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই যদি হয় সংস্কৃতি, তাহলে ঐহিক জীবনে সংস্কৃতিবানের বাঞ্ছিত হবে ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয়োবরণের ও সংস্কারবর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিকজীবনে দায়িত্বনিষ্ঠা ও অধিকারচেতনা।

এজন্যে শাস্ত্রের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য পরিহার ও মুক্তবুদ্ধি প্রয়োজন।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের রেশ ও লেশ

সিন্ধুতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত [৭১১ খ্রীঃ] হওয়ার পরে পরেই ওই অঞ্চলে মুসলিমদের একেশ্বরবাদের প্রভাব হতে থাকে। শঙ্করাচার্যও [৭৮৮-৮২০] ওই একেশ্বরবাদের প্রভাবে অদ্বৈতবাদী হয়ে মূর্তিপূজা বিরোধী হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন—কেবল ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা। এ রূপময় জগৎ ও জীবন স্বরূপে মায়ামাত্র—এ নশ্বর ও নিঃসার। কাজেই শঙ্কর ছিলেন একাধারে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী, জ্ঞানবাদী, মায়াবাদী এবং সেকারণেই বৈরাগ্যবাদী। উল্লেখ্য যে, এ মায়াবাদ ও বৈরাগ্যবাদ বৌদ্ধ শাস্ত্রের আর দর্শনেরও গোড়ার কথা। তাই শঙ্করের প্রচারে ও প্রচারণায় প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে গোটা ভারতেই বৌদ্ধেরা দলে দলে শঙ্কর-মত বরণ করে। বৌদ্ধ শ্রমণ-ভিক্ষুরা, ডাক-ডাকিনীরা, যোগী-যোগিনীরাও শঙ্করে নবসন্ন্যাসবাদে আশ্বস্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাঙ্কর সন্ন্যাস বরণ করে। এমনিভাবে বারো-তেরো শতকের মধ্যেই গোটা ভারতে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। সংরক্ষণকারীর অভাবে বৌদ্ধদের শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোও বিনষ্ট হয়ে গেল বিহারগুলোতে। অযত্নে বৌদ্ধবিহারের পাষাণ ও ইষ্টক নির্মিত ইমারতগুলোও হৃতসর্বস্বের সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের রেশ ও লেশ হয়ে ভারতের নানা স্থানে মহাকালের শিকাররূপে নিঃশেষে বিলীন হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

অবশ্য সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে কেবল শঙ্করাচার্যই বৌদ্ধবিলুপ্তির জন্যে দায়ী নন। বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্তি, অজ্ঞতার ও অশিক্ষার ক্রমপ্রসারে শাস্ত্রানুগত্যে শৈথিল্য, লোকায়ত আচারে ও সংস্কারে আস্থার আধিক্য, নব নব লৌকিক দেবতার প্রতি অনুরাগ ও দেব-দেবী পূজার প্রসার এবং বৌদ্ধদের রাজার ও রাজ্যের অভাব প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বাস্তবে নানাভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও আচার-ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। নির্বাণকামী নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর বৌদ্ধরা যখন মনে-মননে জড়তার ও জীর্ণতার শিকার, তখন শঙ্করমতবাদের এবং পরবর্তীকালের মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক, ভাস্কর, রামানন্দ প্রমুখের বৈরাগ্যপ্রবণ ভক্তিবাদের তোড়ে কিংবা তান্ত্রিক যোগী সন্ন্যাসীদের প্রভাবে বৌদ্ধরা বুঝে-না বুঝে ভয়ে-ভরসায় ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে গেল।

তবু কোন কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম ও শাস্ত্র বজায় রেখে বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে টিকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। গোর্খনাথী, কানফাড়া প্রভৃতি নাথপন্থী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সহজিয়ারা, নানা গুরুবাদী বাউলেরা, নাথযোগীরা (তাঁতীরা) এবং কোন কোন তান্ত্রিক, যোগী আর সূফী সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমতবাদীই।

এখনকার বিহার অঞ্চলই গৌতমবুদ্ধের মুখ্য বিচরণ ক্ষেত্র। সেই রাজগৃহে, পাটলীপুত্রে, অবন্তীতে, নালন্দায়, বুদ্ধগয়ায়, সারনাথে বৌদ্ধশাস্ত্রের, সাহিত্যের, ইতিহাসের, দর্শনের সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থও পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকে তিব্বত-নেপাল-সিংহল-বার্মা থেকেই জাতক, অবদান, ত্রিপিটক প্রভৃতি নতুন করে সংগ্রহ করে প্রথমে য়ুরোপীয় বিদ্বানেরা পরে দেশী পণ্ডিতরা বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন, ইতিহাস ও ইতিকাহিনী আলোচনা শুরু করেন।

এখন আমরা নিঃসংশয়ে জানি হীনযান অপেক্ষা মহাযানমতই অধিক জনপ্রিয় ছিল এবং মহাযানমতও আবার বহু উপমতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল। বাঙলাদেশে মহাযান জাত মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান এবং বজ্রযানের উপশাখা সহজযান লোকপ্রিয় ছিল। বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র এসব যানীদের চর্যার ও সাধনার অবলম্বন ও বাহন ছিল। সাধনাও ছিল দু'ধারার—বামাচারী ও বামাবর্জিত। ধর্মঠাকুরপন্থীরা, নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা, বৈষ্ণব সহজিয়ারা, নানা শাখার বাউলেরা এবং গৃহীনাথযোগীরা (তাঁতী সম্প্রদায়) উক্ত বৌদ্ধমতগুলোর ধারক, বাহক ও সাধক।

আজকের দিনে, সবাই জানে ভুসুকু, কানুপা, সরহ প্রমুখ সিদ্ধা কবিদের রচিত চর্যাগীতি ও 'দোহা, শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান, ধর্মমঙ্গল, অনিলপুরাণ, ডাক-ডাকিনীর, যোগী-যোগিনীর কাহিনী ও বাণী, নিরঞ্জনের রুষ্মা (ছোট-বড় জালালী), গোরক্ষবিজয় বা মীনচৈতন্য, ময়নামতীর, মানিকচন্দ্র রাজার ও গোপীচন্দ্রের গাথাগুলো, সহজিয়া ও বাউল গান এবং বাঙলায় প্রচলিত যোগের, তন্ত্রের ও সূফীমতের গ্রন্থগুলো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধ প্রভাবিত তাত্ত্বিক রচনা। এগুলোতে দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, চর্যারীতি ও সাধনপন্থ বর্ণিত বলেই বৌদ্ধবিলুপ্তির পরেও বৌদ্ধজ হিন্দু-মুসলিমের বংশধরেরা আজো তা নিজেদের মত-পথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুগত করে চর্চা করছে। তাই চর্যাগীতিতে, সহজিয়াপদে ও বাউল গানে ব্যক্ত তত্ত্ব মূলত অভিন্ন।

বৌদ্ধরা নিজেদের পরিচয় দিত সদ্ধর্মী (সৎ+ধর্মী) বলে। খ্রীস্টের নামে খ্রীস্টান, মুহম্মদের নামে মেহোমেডান যেমন, তেমনি বুদ্ধের নামে তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বলত বৌদ্ধ। গোটা ভারতবর্ষেই বৌদ্ধবিলুপ্তি ঘটে। এর জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধবিদ্বেষও কিছুটা দায়ী ছিল।

চট্টগ্রাম ছিল শত শত বছর ধরে হরিখেল (অরি-ক্রীড়া) অঞ্চলভুক্ত এবং প্রায়ই থাকত আরাকানরাজ্যের অন্তর্গত। তাই এটি ছিল বাঙলার তথা উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন। আরাকানী বৌদ্ধেরা প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা কাজে চট্টগ্রামে এসে স্থায়িভাবে বাস করেছে এবং স্থানীয় ভাষাও বরণ করেছে। রক্তে ও গোত্রীয় পরিচয়ে এরা মঙ্গোলয়েড বা মঙ্গোলীয়। কিন্তু হিন্দু মাত্রই যেমন আভিজাত্যলোভে নিজেকে আর্য বলে, মুসলিমমাত্রই যেমন আরবী-ইরানী বলে সর্গবে নিজের পরিচয় দেন, আরাকানী রাজারা আর দেশবাসীরাও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবক্ষেত্র মগধ থেকেই আগত বলে আত্মপরিচয় দিতেন, সে সূত্রেই চট্টগ্রামের বৌদ্ধরাও হিন্দু-মুসলিমের কাছে 'মগ' বা 'মঘ' নামে পরিচিত। দুই পুরুষ আগেও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-নারী-পুরুষের আরাকানীভাষায় নাম ছিল। বিশ শতকেই চাকমারা আর মঘরা হিন্দুদের প্রভাবে সংস্কৃত শব্দে নাম ও লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি-শাড়ি ধরেছে এবং শুকর-গরু প্রভৃতির মাংস খাওয়াও ছেড়েছে বিশ শতক থেকেই, বৌদ্ধ-সৃষ্ট অনেক লৌকিক দেবতাই পরবর্তীকালে বৌদ্ধজ হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন স্বনামে কিংবা ঈষৎ রূপান্তরে। যেমন- বাসুলী (বৎসলা), জাঙ্গুলী (মনসা), তারা (কালী), আদিনাথ (শিব), ক্ষেত্রপাল, ধর্ম ঠাকুর, যক্ষ, অবলোকিতেশ্বর (বিষ্ণু) প্রভৃতি।

চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা থেরবাদী (স্থবিরবাদী) তথা গুরুবাদী। এ থেরবাদ আসে বার্মা থেকে, সম্ভবত তেরো শতকেই চট্টগ্রামে থেরবাদ প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। চট্টগ্রাম শত শত বছর আরাকানী বৌদ্ধ শাসনে ছিল বলেই শাস্ত্রসম্পৃক্ত নানা আরাকানী পরিভাষা ও চালু রয়েছে চট্টগ্রামে—ফোরাচেই, ক্যায়াঙ প্রভৃতি তার সাক্ষ্য। তাছাড়া দক্ষিণ চট্টগ্রামের অনেক গ্রামের নামও আরাকানী, সোয়াঙ-ফ.লঙ প্রভৃতি। আরাকানী শাসনকালে চালু মঘীসন ও ভূমি পরিমাপে চল্লিশ শতাংশের 'কানি' বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের বাস্তব সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের নানাস্থানে আরাকানী প্রশাসনে কেন্দ্রের ও দুর্গগুলোর স্থিতি চিহ্নিত করে উৎখনন কার্য চালালে, আরাকানী বৌদ্ধ সংস্কৃতি-সভ্যতার নানা নিদর্শন অবশ্যই মিলবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আরাকানী চিকিৎসাবিদ্যা বিশেষ করে শিশুচিকিৎসা শাস্ত্র চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনে বিশেষ অবদান। শিশু চিকিৎসক ছিলেন প্রধানত মহিলারা। চট্টগ্রামে চালু মুসলিমদের সাধা, রোঁয়াঝা, খোঁয়াঝা, ছুয়ানা, পাঁঝা প্রভৃতি বংশনামগুলো আরাকানী শাসনের স্মারক।

বলেছি, উনিশ শতক থেকেই বৌদ্ধ শাস্ত্রে, সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে আগ্রহ জেগেছে বিদ্বানদের। এ ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা, এরাই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের কাহিনী অবলম্বনে বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও জনতা

আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে মোটামুটি অনেক বৈচিত্র্যই ছিল, দেবকথা ও প্রণয়-কথা ছাড়াও ছিল চরিতকথা, তত্ত্বকথা আর গান ও গাথা। দেশ-কালের প্রতিবেশে লেখক-পাঠক-কথক-শ্রোতাদের মধ্যে রুচি-বুদ্ধির ও ভাব-চিন্তার মাত্রাগত পার্থক্য ছিল সামান্য। পায়ে হাঁটা পথে দ্রুত পা চালিয়ে গেলে ও মন্থর গতিতে যে চলে তাকে অতিক্রম করে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই সে-সাহিত্য লিখিত আর শিল্পায়িত হলেও খুব উঁচু মার্গের ছিল না, ফলে মৌখিক লোকসাহিত্য আর লিখিত শিল্পসম্মত সাহিত্যের মধ্যে রসগত, রুচিগত, আদর্শগত ও লক্ষ্যগত ব্যবধান দুস্তর ছিল না—পার্থক্যটা ছিল মূলত ভাষাগত। তাই মধ্যযুগের লোকসাহিত্যের ও শিষ্ট সাহিত্যের কথকে ও শ্রোতায় তেমন অধিকারীভেদ ছিল না। এ জন্যে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য এক হিসেবে ছিল জনসাহিত্য বা জনতার সাহিত্য। সে-সাহিত্যের মান ছিল নীচু, তাই বোধগত ছিল অনেকেরই।

সে-সাহিত্যের পরিসর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সে-সাহিত্যে দেব-দৈত্য-ভূত-প্রেত-পিশাচ-অপ্সর-কিন্নর-বিদাধর-জীন-পরী সবাই মানুষের শত্রু-মিত্র প্রতিবেশী। সে-সাহিত্যে স্বাভাবিক ও সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র বিস্তৃত। তবু লোভে-ক্ষোভে, দ্বন্দ্বে, প্রেমে-ঘৃণায়, বুদ্ধিতে-রুচিতে, দোষে-গুণে, দেব-দৈত্যে-মানুষে, ভূতে-প্রেতে-জীনে-পরীতে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। সে-সাহিত্যের তত্ত্ব ও তথ্য, চিন্তা ও চেতনা, আনন্দ ও যন্ত্রণা বড় বেশি মাটি-গন্ধী, বড় বেশি গ্রামীণ জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত, সম্পদ ও সমস্যা-ঘেঁষা—সব কিছুর আড়ালে থাকে কাঙাল মনের দরিদ্র মানুষ, হিংসুটে, লোভী, ভীরু, মিথ্যুক মানুষ,-দয়া-স্নেহ-ক্ষমা-প্রেম প্রত্যাশী মানুষ।

আমাদের মধ্যযুগের শিল্পসাহিত্য সংস্কৃত বা ফরাসী ও বাঙলা-জানা কবিদের রচনা। তবু সে-সাহিত্য সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ বিষয় নিয়ে সাধারণ শক্তির রচকের হাতে রচিত। এজন্যে একে যথার্থ অর্থে জনসাহিত্য বা জনতার সাহিত্য বলা চলে। এ সাহিত্য ছিল তাদের সাধারণভাবে ধর্মঅর্থকামমোক্ষ লাভের মানস সহায়। কেবল রস পরিবেশন লক্ষ্যে সাহিত্য রচিত হয়েছে ক্বচিৎ ও কদাচিৎ।—এ কেবল জনসাহিত্য নয়, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও এঅর্থে বাঙলার ও বাঙালীর সাহিত্য। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষাসাহিত্যের প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে সীমিত পরিসরের বদ্ধ জলাশয়ের কিংবা গ্রামসংলগ্ন খালের সঙ্গে তুলনা করা চলে, ওতে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মিটেছে, গ্রামীণ মানুষ তাতে তার ব্যবহারিক জীবনযাত্রার ও মানসজীবনের বিম্বিত রূপও দেখেছে। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমিত, চিন্তা-চেতনা হত আবর্তিত, তাই ঐ সাহিত্যের কোন অপূর্ণতা তার মনে অতৃপ্তি জাগায়নি। ফলে বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনায়, আশা-প্রত্যাশায় তেমন বিকাশ বিস্তার ঘটেনি। তার প্রয়াস-প্রযত্নের নির্দশন তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য। বিষয়ে বক্তব্যে ভাবে ভাষায় ছন্দে অনুকৃতি ও পুচ্ছগ্রাহিতাই কেবল এর অঙ্গে ও অন্তরে প্রকট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করল, তার পরিণামে ১৮১৮ সনের বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশনা ও তজ্জাত নতুন শহুরে জীবনচেতনা বাঙালীকে সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল, মানুষকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গ্রাম্য ও শহুরে, নতুন ও পুরোনো—এ দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করেনি, শুধু মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর, অপরিচয়ের বাধা আর অনাত্মীয়তার ব্যবধানও করল চিরস্থায়ী। ১৮০১ বা ১৮১৮ থেকেই শিক্ষিত শহুরে নতুন মানুষের জাতে-জগতে ও জীবনে আর অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরোনো মানুষের দেশে-দুনিয়ায় ও সমাজে সৃষ্টি হল প্রায় আসমান জমিনের ফারাক—স্বর্গ মর্ত্যের ব্যবধান। তখন থেকেই শিক্ষিত শহুরের মন-মত-লক্ষ্য হল আলাদা, ঘরে-ঘাটে, হাটে-বাটে পাশাপাশি থেকেও তখন থেকেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালী দুই ভিন্ন জাতের, জগতের ও জীবনযাত্রার মানুষ। গত শতক থেকে প্রতীচ্য-বিদ্যাপ্রাপ্ত বাঙালীর সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তো বটেই, শাস্ত্র ও সমাজ কিংবা ইতিহাস ও দর্শন বিষয়েও তার যা কিছু চিন্তা ও চেতনা, অভীষ্ট ও অন্বিষ্ট, কৃতি ও কীর্তি সবটাই নিয়োজিত হয়েছে তার স্বশ্রেণীর প্রয়োজনে ও স্বার্থে।

আজ যদি প্রশ্ন ওঠে—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির ও মননের বিচিত্র বিকাশ ও উৎকর্ষ কাদের করেছে উপকৃত ও আনন্দিত, তারা কারা ও কয়জন, তাদের সঙ্গে গণমানবের স্বার্থগত ও সমাজগত সম্পর্ক কি, তারা কাদের স্বদেশী ও স্বজাতি, গণমানবের জীবনে-জীবিকার তাদের প্রাসঙ্গিকতা কি, দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাদের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সম্বন্ধ কি? —তা হলে স্বশ্রেণী-সৃষ্ট সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবগর্বী ধনী-মানী শিক্ষিত কিংবা ধন মান লিপ্সু মধ্য ও নিম্নবিত্ত শিক্ষিত বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার কথা।

সৃষ্ট ও সঞ্চিত এ সাহিত্য জাতীয় জীবনে, সম্পদ, না শক্তির ও সময়ের অপচয় প্রতীক—তাও নতুন করে বিচার করতে হবে, শহরে ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ সমন্বিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবনে ও অট্টালিকায় বসে, য়ুরোপীয় আদলে জীবন-বিলাসী শিক্ষিত মানুষের লোক-জীবন, লোক-আচার, লোক-শিল্প, লোক-সাহিত্য কিংবা লোকসংস্কৃতির মহিমা কীর্তন গণমানবের প্রতি নির্দয় বর্বর ব্যঙ্গবিদ্রুপ কিনা, —তাও আজ বিবেচ্য।

অতীতের লোকচিন্তা-চেতনা ও কৃতি-কীর্তি সমাজের ও সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে যে অত্যন্ত মূল্যবান, তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করার যুক্তি কোন সুস্থ চেতনার মানুষ কখানো খুঁজে পায় না। কারণ 'লোক' (Folk) কারা! নিরক্ষর নিম্নমানের আর্থিক অবস্থানের, অমার্জিত রুচির ও বুদ্ধির প্রাকৃত জনই যদি লোক হয়, প্রবল দুর্জনের প্রভাবে প্রতাপে শোষণে বঞ্চনায় যারা কখনো নিরাপদে নির্বিঘ্নে আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিকাশের সুযোগ পায়নি, আশাহীন, ভাষাহীন, প্রতিকারের উপায়হীন, প্রতিবাদের সাহস ও প্রতিরোধের শক্তিহীন নিস্ব-রিক্ত মানুষই যদি 'লোক' হয়, তবে তাদের অক্ষমতার অসামর্থ্যের সাক্ষ্যরূপে তাদের তৈজস, তাদের আসবাব, তাদের ঘর-দ্বার তাদের আচার-আচরণ, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম, তাদের চিন্তা ও কর্ম, তাদের গান-গাথা, উপকথা, ইতিহাস, ব্রতকথা, কৃতি ও কীর্তি প্রশংসার বিষয় হতে পারে না। বরং আবহমান কাল থেকে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানের দাপটে যে বিশ্বের কোটি কোটি লোক বা প্রাকৃতজন স্বাধিকারবঞ্চিত হয়ে অমানবিক জীবন ধারণ করে অকালে অনাহারে অসহায়ভাবে অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে, তার জন্যে ভাগ্যবানদের বংশধরদের লজ্জিত হওয়ার কথা। কিন্তু তারা শহুরে সংস্কৃতির উত্তরাধিকরার নিয়ে প্রচ্ছন্ন কৃপা-করুণার পাত্ররূপে 'লোক' এবং তজ্জাত লোক-ঐতিহ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকশিল্প ও লোক-সাহিত্য দেশে বিরাজমান দেখতে চান কেবল প্রাণিজগতে অন্যতম প্রাণী লোকদের জীবনযাত্রার কৌতুককর চিত্র দেখার ও দেখানোর জন্যেই। এ কারণেই তাঁরা লোক সাধারণের সাক্ষরতা কিংবা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না, তা হলে যে লোক-সংস্কৃতির গৌরব করা যাবে না! নিজেদের জন্যে যা পরিত্যাজ্য বলে জানে, তা অন্যের জন্যে কামনা করতে পারে কি কোন বিবেকবান মানুষ? অথচ এরা চান দেশের লোক নিরক্ষর ও প্রাকৃতজন তথা 'লোক' (Folk) হয়েই থাক, জেলে-সাপুড়ে-কৃষাণ নৃত্য বজায় থাক, বজায় থাক তাদের খড়ো কুঁড়েঘর, লুঙ্গী-গামছা, খালি গা পা, টিকে থাকুক তাদের হাঁড়ি-সরা-সানকি। তাতেই শহুরেদের লোক-সংস্কৃতির চর্চার আনন্দ ও বিলাস থাকবে বজায়।

ইয়াঙ্কি পয়সায় ও উৎসাহে এখন ফোকলোর চর্চা এক শ্রেণীর তথা-কথিত বিদ্বানের ও গবেষকের পেশায় পরিণত হয়েছে। এবং শহরের কেন্দ্রে বসে পেশাদার লিখিয়েরা পল্লীগীতি রচনা করে, আঁকিয়েরা লোক-শিল্প সৃষ্টি করে, নটেরা লোকনৃত্য চর্চা করে। যাঁরা বামপন্থী বলে পরিচিত, তাঁদেরও নতুন করে ভেবে দেখবার সময় এসেছে তাঁরা কি লেখেন, কেন লেখেন, কাদের জন্যে লেখেন, আর কাদের পক্ষে লেখেন। দেশের গণমানবকে নিরক্ষর রেখে তাদের মুক্তির জন্যে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লেখা কি ফলপ্রসূ হয়? যেখানে শ্রমিকের চাষী-মজুরের নেতৃত্বেই তাদেরই সক্রিয় সংগ্রামে বিপ্লব ও বিজয় সম্ভব বলে স্বীকার করা হয়, সেখানে তাদের অজ্ঞ রেখে, তাদের অজ্ঞাতে বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে উঠবে কি করে—তা গভীরভাবে চিন্তা করা এবং তাদের অনুপ্রাণিত ও সক্রিয় করার উপায় উদ্ভাবন আজ জরুরী হয়ে উঠেছে।

গণসঙ্গীতের কিংবা গণযাত্রার বা নাটকের মাধ্যমে গাঁয়ে গঞ্জে গণ-প্রণোদনা দেয়া যেত বটে, কিন্তু রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি সরকারী ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত বলে সে-পথ বন্ধ। বাকি থাকে রাজনীতিক দল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ সেবক বা সংস্কৃতিকর্মী দিয়ে গাঁয়ে গঞ্জে গণগীতির ও গণনাট্যের অনুষ্ঠান করানো। এর জন্যে যে অর্থবল, জনবল ও মনোবল প্রয়োজন তা অর্জন ও সঞ্চয় করা সহজ নয়। কাজেই মানুষকে দ্রুত সাক্ষর করার চেষ্টা করাই আশুকর্তব্য। এবং আনুষঙ্গিক প্রয়াস হিসেবে গণগীতি, গণসভা, গণনাট্য ও চিত্রিত পোস্টার প্রভৃতির যথাসম্ভব ব্যবস্থা রাখাও আবশ্যিক।

জনতা ও মানবতা

পৃথিবীর জীব-উদ্ভিদ জগতে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি। একই প্রজাতির বা বর্ণের কোন দুটোতেও নেই অবিকল মিল। সমাজেও থাকে না অভিন্নতা, কেবল অবয়বে নয়, বৃত্তি-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিতেও থাকে না প্রত্যাশিত মিল। অতুল্য-অনুপম হয়ে বিচিত্রভাবে আত্মবিকাশই প্রকৃতির নিয়ম। একেই বলে unity in diversity—বৈচিত্র্যে ঐক্য। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে সৃষ্টির বা প্রকৃতির এ বিচিত্র রূপ মানুষকে বিস্মিত, ভাবিত এমন কি আবেগের প্রবলতায় উদভ্রান্ত করে তোলে, স্বল্পবুদ্ধি সংবেদশীলকে করে দিশেহারা বিবাগী-বৈরাগী। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাসীরাই হয় পরিণামে সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশ। কুরআনের আল্লাহ বলেন 'আমার এ সৃষ্টি ভাবুকদের ও জ্ঞানীর (উপলব্ধির) জন্যেই। আমার সৃষ্টি দেখে কি মনে হয় না আমি কত 'মহান আর শক্তিমান'। 'আল্লাহর শক্তির ও মহত্ত্বের নিদর্শন হচ্ছে এ সৃষ্টি। ব্রহ্ম তো আনন্দ আস্বাদনের জন্যেই বহু হয়ে আত্ম-অভিব্যক্তি দিচ্ছেন। এমনি আরো বহু বহু সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা রয়েছে কবি-দার্শনিক-সাধকদের বাণীতে।

স্রষ্টাতত্ত্ব স্বীকার করলেই সৃষ্টিতত্ত্বে গূঢ় ও গভীর তাৎপর্য-সন্ধিৎসা অপ্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ায়। তা থেকেই আসে আত্ম-অসহায়তার চেতনা। আর তা-ই হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়হীনতার, পরনির্ভরতার, আনুগত্যের, ভয়-ভয়সার, দায়িত্ববোধের এবং কর্তব্যজ্ঞানের ও অনুভূতির উৎস। এ থেকেই বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-রীতি-নীতি আর আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি হাজারো শাস্ত্রিক-সামাজিক-নৈতিক নিয়মের উদ্ভব ও বিকাশ। আর স্থানান্তরে ও কালান্তরে তাৎপর্যবিরহী নিগড়রূপে এগুলোর বিকৃত প্রতিষ্ঠা।

এসব পুরোনো তত্ত্ব রোমন্থনে আমাদের আগ্রহ নেই, এ নিতান্ত ভনিতা মাত্র, আমাদের এ মুহূর্তের প্রসঙ্গ ভিন্ন।

টেলিভিশনে দেখলাম ব্যাঙকেও যায় বশ করা, মানুষের প্রয়োজনে দেয়া যায় কর্মে দীক্ষা এবং কৌশলে প্রশিক্ষণ।

প্রাণী হিসেবে সব প্রজাতির প্রাণীরই রয়েছে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি। প্রয়োজন ও পরিবেশ না থাকলে ওই সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির কোন শোধন, বিকাশ বা বিস্তার ঘটে না—সম্ভব হয় না উৎকর্ষ। অথচ প্রাণীর অনুশীলন জাত বিকাশের ও উৎকর্ষের সম্ভাবনা থাকে প্রায় অশেষ। পায়রা শুক বাজপাখী, হাতী ঘোড়া কুকুর বানর বাঘ সিংহ, এমনকি কোন কোন জলজ প্রাণীকেও প্রশিক্ষণে অতুল্য ও অসামান্য বোধের, গুণের, কৌশলের, কর্মের ও আচরণের প্রাণী করা সম্ভব। তখন তারা মানুষের মনের, মেজাজের, অভিপ্রায়ের, কর্মের ও আচরণের সাথী, সহযোগী ও সহায়।

মানুষের সম্পর্কে না আসলে কোন প্রাণী তার জড় বা সুপ্ত শক্তির, চেতনার ও আচরণের বিকাশ ঘটাতে পারে না, চিরটা জীবন কেবল স্থূল প্রবৃত্তি শৃঙ্খলে থাকে বাঁধা। মানুষের সান্নিধ্যে-সমহায়তায় যে-কোন প্রাণী তার জড় শক্তির সন্ধান পায়, খুঁজে পায় সুপ্ত শক্তির প্রকাশের অনুশীলনপন্থা।

প্রাণীর প্রজাতি হিসেবে আদিম বুনো বর্বর মানুষও কমবেশি সহজাত প্রবৃত্তি তাড়িত এবং আত্মরক্ষণে অবচেতন প্রেরণা চালিত। অতএব বানরের বানরত্ব, কুকুরের কুকুরত্ব, কপোতের কপোতত্ব, মানুসের মনুষ্যত্ব, অশ্বের অশ্বতা, গজের গজতা, মানুষের মানবতার মতেই অনুশীলনী-সাপেক্ষ সুপ্ত বা জড় শক্তি মাত্র।

আমরা বুনো কুকুরের যে আচরণ প্রত্যক্ষ করি তা নিতান্ত জৈবিক। আর পোষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া কুকুরের প্রভুভক্তি, আনুগত্য, প্রভুর শত্রু-মিত্রজ্ঞান, প্রভুর স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা, প্রভুর প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য চেতনা প্রভুকে সঙ্গ দেয়া ও তার আদর-কাড়া, প্রশিক্ষণ পেয়ে অন্ধ প্রভুকে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা, অপরাধী ব্যক্তিকে নাকে গন্ধ শুঁকে শনাক্ত করা, প্রভুর মন বুঝে প্রভুর প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা, বিপন্ন প্রভুকে সময়োচিত সাহায্য করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রভৃতি হচ্ছে কুকুরের মানস উৎকর্ষের, কুকুরের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশের ফল। এই হচ্ছে কুকুরের বিশেষ কুকুরতা। অর্থাৎ, তার শক্তির, সম্ভাব্যতার, সুপ্ত গুণের পরিপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপের সুপ্রকাশই কুকুরতা। আর এই অনুশীলিত ও অর্জিত কুকুরতাতেই নিহিত রয়েছে কুকুর জীবনের সার্থকতা, প্রাণিজগতে কুকুর প্রজাতির বিশিষ্টতার পরিচয়। এসব অনুশীলিত ও পরিশীলিত গুণেই কুকুর অতুল্য ও অনুপম।

তেমনি 'মানুষ' জন্মেই মনুষ্যত্বের অধিকার পায় না, মানবশিশু বলেই সে জন্মসূত্রে হয় না মানবতার অধিকারী। উৎকর্ষ সাধনে বিকাশ-পাওয়া শক্তি ও গুণই মানবতা। এই জন্যেও আশৈশব, আবাল্য আজীবন অনুশীলন-প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পৃথিবীর বৈরী পরিবেশে বাঁচতে হলে মানুষের দল চাই। তাই মানুষ দলে চলে। যূথবদ্ধ জীবনে শান্তিতে স্বস্তিতে বাঁচার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমস্বার্থে, স্বাধিকারে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থান করার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। শাস্ত্র-সমাজ-সরকার গড়ে উঠেছে সভ্যতার ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় যৌথ জীবনে আপন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েই। শাস্ত্র-সমাজ-সরকার অরোপিত বিধিনিষেধ হচ্ছে মূলত এবং কার্যত পারস্পরিক ব্যবহারিবিধি, আচরণ-নীতি—জন্মগত বা সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে, যৌথ জীবনে সুখ-স্বস্তি-নিরাপত্তা থাকে না। আত্মকল্যাণেই, স্বস্বার্থেই নিজে বাঁচবার জন্যই রাখতে হয় অপরের কল্যাণের ও স্বার্থের প্রতি নজর, বাঁচতে দিতে হয় অন্যদের। আপ্তবাক্যেও এসব তত্ত্ব বিধৃত রয়েছে। যেমন ভালো হও, ভালো থাক, অপরের ভালো চাও, বেঁচে থাক, বাঁচতে দাও। [লিভ এ্যাণ্ড লেট লিভ]। আমি বোকাদের বলছিনে, কাজেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বাড়িয়ে বলার দরকার নেই।

শাস্ত্রের উপকারিতা, সমাজের অভীষ্ট কার্যকারিতা এবং সরকারের উদ্দেশ্য ও উদ্দিষ্ট সার্থক ও সফল রাখা না-রাখা নির্ভর করে মূলত ব্যক্তি চরিত্রের উপর। কেননা ব্যক্তির সমষ্টিতে গড়ে ওঠে সমাজ ও সরকার, টিকে থাকে শাস্ত্র। শাস্ত্র নির্দেশিত, সমাজ নির্ধারিত এবং সরকার বিঘোষিত নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করলেই বাধে ঠোকাঠুকি, শুরু হয় কাড়াকাড়ি, লাগে মারামারি, চলে হানাহানি। এমনি আচরণই শাস্ত্রে পাপ (সিন), সমাজে গর্হিত কর্ম (ভাইস), সরকারে অপরাধ (ক্রাইম)। সব মানুষ কখনো কোথাও সংযমী ও নীতি-আদর্শবাদী হয় না। যে সমাজে শতকরা ষাটজন নিয়ম-নীতির ও বিধি-নিষেধের অনুগত, সে-সমাজই সাধারণভাবে স্বস্তি-শান্তির সমাজ। কেননা সংখ্যাগুরুর ভয়ে ও প্রভাবে দুষ্ট লোকেরাও অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

আর যখন শতকরা পঞ্চাশজনও অপকর্মাসক্ত হয়, লোভ-লালসাবশে নীতি আদর্শ, ন্যায়বোধ, বিবেক, সংযম-সৌজন্য প্রীতি-মৈত্রী-করুণা এবং ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করে, তখন সে-দেশের মানুষের নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। তখন সমস্বার্থে দেশের নৈতিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক নিয়মনীতি মানার আবশ্যিকতা কেউ মনে রাখে না। তখন সৌজন্যে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় ও সহাবস্থানেই যে জীবনের ও জীবিকার নিরাপত্তা, শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ নিহিত, তা কেউ উপলব্ধি করে না।

আমাদের দেশের আজকের মানুষ সাক্ষর নয় বটে, কিন্তু রেডিও টেলিভিশন-সিনেমা-ভি.সি.আর দেখে-শুনে এবং হাটে-বাজারে সরকারের ও মানুষের হাল-চাল ও কর্ম-আচরণ জেনে-বুঝে বাস্তবে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেছে, সে-শিক্ষা অবশ্যই মনুষ্যত্ববিধ্বংসী সমাজবিনাশী মারাত্মক 'কু' বা অবাঞ্ছিত অপশিক্ষা—যা ছল-চাতুরী-প্রতারণায় ও মেরে-কেড়ে-লুটে বাঁচতে প্রণোদনা দিচ্ছে।

এমনি অবস্থায় ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে ঘটে জান-মালের নিরাপত্তার অভাব, সামজিক জীবন হারায় গুরুত্ব, রাষ্ট্রিক জীবনে দেখা দেয় দুঃশাসন, আর্থিক জীবনে নেমে আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চয়তা, সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবল হয় কুরুচি, ঘটে অপকর্ষ, রাষ্ট্রিক জীবনেও ঘোচে না সঙ্কট। এ ভাবে আসন্ন ও আপন্ন বিপদে-সঙ্কটে-সমস্যায় দরিদ্র রাষ্ট্র থাকে সদা উদ্ব্যস্ত, গণমানব থাকে সদা শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। তখন দুর্জনের হয় পোয়াবারো আর দুর্বলের ঘটে আর্থিক-মানসিক অপমৃত্যু।

আমাদের বাঙলাদেশে আজ এ অবস্থাই চলেছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মানবতার আন্তরিক ও নিষ্ঠ অনুশীলন চাই। অঙ্গে ও অন্তরে সুসংযত মানুষ হওয়া চাই শতকরা ষাটজনের। আবার এ-ও সত্য যে 'মানুষ' করার দায়িত্ব কেউ না নিলে, মানবসন্তান 'মানুষ' হয় না। আগের যুগে এ দায়িত্ব নিতেন নবী-অবতাররা। এ যুগে এ দায়িত্ব কার—কাদের?

সংকটের উৎস

গাঁয়ের মানুষের ধনগত বৈষম্যটা হচ্ছে সিঁড়ির ধাপের মতো। সে-সমাজে ক্ষেত মজুরে ও বর্গাচাষীতে, বর্গাচাষীতে ও প্রান্তিকচাষীতে, বাজারের দোকানদারে ও মহাজনে, মাঝারি জোতদারে ও ঘুষখোর কেরানীতে আর্থিক বৈষম্য তেমন ভয়-ঘৃণা-ঈর্ষা জাগাবার মতো নয়, সেখানে কারো অতি অভাবের এবং কারো অতি সম্পদের প্রকট পার্থক্য নেই। তাই নৈতিক, সামাজিক, মানবিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতির বন্ধন হত সাধারণভাবে স্বীকৃত, স্বভাবে-স্বার্থে-সৌজন্যে তা সবাই কিছুকাল আগেও প্রায় নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চলত। তখনো মানুষের মনে অপরাধবোধ, পাপভীতি, লোকনিন্দার ভয় প্রবল ছিল। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষের ঐতিহ্যিক বন্ধন ও পরিচিতি পুরুষানুক্রমিক। সম্পর্কটা ও তাই আত্মিক এবং পারিবারিক।

নগর বন্দর হচ্ছে বাজারের মতো। স্ব স্ব উদ্দেশ্যে ও স্বার্থে নানা অঞ্চলের অপরিচিত ব্যক্তিমানুষ হাজির হয় এখানে। এখানে মানুষ একত্রিত হয় কর্মসূত্রে। জনে জনে এখানে গড়ে ওঠে জনতা। এখানে মনে ও মতে মেলার দরকার হয় না। এখানে লক্ষ্যে ও স্বার্থে মিল হলেই কাজ চলে। তাই শহরে সৌহার্দ্যে, সৌজন্যে কিংবা সামাজিক দায়িত্ববশে মানুষে মানুষে কোন স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তা ছাড়া এখানে বিদ্যা, বৃত্তি ও বিত্তগত পার্থক্যও হচ্ছে একতলা-পাঁচতলার মতো, সিঁড়ির ধাপের মতো নয়।

কাজেই কর্মক্ষেত্রে জনে জনে জনতা হয়, —কখনো একতা হয় না, ঘরে-ঘাটে, এক বাটে-হাটে তাদের কাজ বটে, কিন্তু মনে মতে ভিন্ন ভিন্ন জগতের মানুষ তারা। তাই এক অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে বা প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর বাস করেও কেউ কারুর আপন হয় না, —অপরিচয়ের ও অসম্পর্কের বাধা কিছুতেই ঘোচে না। তাই বদলীর কিংবা বাসা বদলের ফলে চোখের আড়াল হলেই এতোদিনের নিত্যদেখা বাহ্যপরিচয়ের পরিবার মনের আড়ালেও হারিয়ে যায় চিরকালের মতোই। আমরা যোগ্যতমের উর্দ্ধতন ও জয় তত্ত্বে আস্থা রাখি বলে, বাহুবলে ও ধূর্ততায় আমাদের ভরসা আছে বলে এবং দেশের অর্থসম্পদকে লুঠের মাল মনে করি বলে আর 'জোর যার মুলুক তার' তত্ত্ব স্বীকার করি বলেই দুর্নীতিই বাঁচার ও বড়ো হবার প্রকৃত পন্থা বলে মানি। তাই শহরে মানুষ অনাত্মীয় অপর মানুষের প্রতি নৈতিক, সামাজিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতির বন্ধন তেমন স্বীকার করে না। অস্থায়ীনিবাসের বন্ধন-শৈথিল্যই শহরে সর্বপ্রকার নীতি লঙ্ঘনের ও দুর্নীতি বরণের প্রেরণা যোগায়—প্রবৃত্তি সঞ্চার করে। সৌজন্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করে সবাই যেন কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিকেই 'জীবন-সংগ্রাম' বলে মেনেছে। এতোকাল পরে আবার জিগীষুরা 'যোগ্যতমের উর্দ্ধতন' নামের ডারুইন ব্যাখ্যাত বিজ্ঞানের তত্ত্বকে হার্বার্ট স্পেনসারের অনুসরণে শোষণলক্ষ্যে 'জীবন সত্য' বলে জানে। সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থ-সম্পদের ব্যক্তিক-সঞ্চয় নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। তাই সেখানে দুর্নীতিও দুর্লভ।

তা ছাড়া সেখানে অর্থ-সম্পদের-ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর বৈষম্য সিঁড়ির ধাপের মতো স্বল্পমাত্রার, তাই ব্যবধানও স্বল্প। কাড়াকাড়ির, মারামারির, হানাহানির সুযোগ নেই বলে এবং এ সব নিরর্থক বলে সেখানকার জনগণ সৌজন্য-সোহার্দ্য-সম্প্রীতি এবং ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করার গরজও অনুভব করে না। আমাদের উঠতি বুর্জোয়া দেশে ও সমাজে নানা ঐতিহাসিক ও বাস্তব কারণে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্র নিয়ন্তারা অর্থ-সম্পদ-শিক্ষা-সংস্কৃতিরিক্ত পরিবারের বিদ্যা ও বৃত্তি প্রাপ্ত বিত্তকামী প্রথম প্রজন্মের মানুষ। স্বল্প সংখ্যার ব্যতিক্রম ছাড়া স্ব-স্ব পরিবারের শহরে-আসা প্রথম মানুষ। এদের লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যা, বৃত্তি ও বিত্তবলে শহরে ধনের, মানের ও যশের মানুষ হওয়া, গাঁয়ের কুটির পরিহার করে শহরে অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সবাই ভুঁইফোড় হওয়ায় এ ক্ষেত্রে ভিড় প্রতিদিনই বাড়ছে। কেননা শিক্ষিত হয়ে বিপুলতর দলে সবাই শহরে আসছে। তাই নগরে-গাঁসের (BUS) মতো উঠবার সিঁড়িতে প্রচণ্ড ভিড়, চাপের চোটে সিঁড়িতেও দেখা দিয়েছে ফাটল। প্রবল প্রচণ্ড চাপে কেউ পড়ছে, কেউ পিষ্ট হচ্ছে, কেউবা হচ্ছে পরাভূত ও পর্যুদস্ত এবং মরছে অনেকেই। ফলে শহরে সমাজে এক শ্রেণীর অতি অভাব এবং অপর এক দলের অতি সম্পদ সমাজের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট করেছে। অতি অভাব যেমন জীবনের সর্ব প্রকার মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন করে, অতিধনও তেমনি মানুষের সর্বপ্রকার নৈতিক চেতনা বিলুপ্ত করে। এ কারণেই হিন্দু পুরাণে লক্ষ্মীর বাহন পেচক। বিভিন্ন কারণ-করণের উপজাত হিসেবে পাওয়া রাষ্ট্রের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্যে কিংবা স্বাধীনতার প্রসাদ উপভোগ করবার মতো স্বস্থ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার অবকাশ আমাদের হয়নি। আমরা ব্যক্তিস্বার্থেই রাষ্ট্রনীতি, প্রাশাসনিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করেছি। ফলে গণস্বার্থ-রক্ষক রাষ্ট্রনিয়ন্তা, প্রশাসক কিংবা ব্যবসায়ী আমরা সাধারণভাবে পাই না। তাই অর্থ-সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় 'অতি' ও 'অনা-র সংকট হয়েছে তীব্র। অতি প্রাপ্ত আর অপ্রাপ্ত শ্রেণীই সমাজের স্থিতিশীলতা করেছে বিনষ্ট।

এমনি অবস্থায় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয়েছে নিরুপায় অসহায়। কয়েক হাজার ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের অর্থ-সম্পদ। এদের অসম প্রতিযোগীরা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং উচ্চাভিলাষী অনুকারকরা তদবীরে তকদীর বদলানোর জন্যে নীতিচেতনা ও বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ধূর্ততা ও প্রতারণাকে পুঁজি করে জুয়াড়ীর মোহ নিয়ে, দুর্বৃত্তের সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাল-ভেজালের বেসাতে। তাই সমাজের কোন স্তরেই আজ আর জীবনের কোন নৈতিক মূল্যমান বিবেচ্য বা আলোচ্য নয়, জীবনোপলব্ধির, জীবনানুভবের কোন প্রয়োজনই যেন নেই। বিত্তই যেন কাম্য—যে বিত্ত দিয়ে জীবনের সর্বপ্রকার স্থূল চাহিদা পূরণ সম্ভব। দেশ-দুনিয়ায় আজো ভাববাদীরা সংখ্যাগুরু, কাজেই এ সংকট-সমস্যা সম্বন্ধে তাদের নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে ভাব-ভাবনার দায়িত্ব ও গরজ রয়েছে। ভালোবাসায় আস্থা রেখে বাঁচা, মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করে বাঁচা, মানুষের সৌজন্যে সহায়তায় ভরসা রেখে বাঁচা যেন দিন দিন অলীক হয়ে উঠেছে—দুলর্ভ হচ্ছে সে-চেতনা।

আমাদের ভালোবাসার অবলম্বন রয়েছে বলেই তো জীবন এতো প্রিয়, বেঁচে থাকার এমনি গভীর সাধ। ভালোবাসাই তো জীবন-প্রেরণা, কিংবা নামান্তরে জীবন। অনুভবের ও উপলব্ধির, চিন্তার ও চেতনার, অন্নের ও আনন্দের উচ্চতর, সূক্ষ্মতম ও মহত্তর স্তরে ও লোকে যদি উন্নয়ন ও উত্তরণ না ঘটবে, তাহলে মানুষে ও অন্য প্রাণীতে পার্থক্য কি! দেখে শুনে মনে হয়, জীবনানুভূতি এখন ত্বকে আর চোখের কোলে এসে ঠেকেছে। চোখ মেলে মানুষ যাদের দেখে, তা-ই সে সার ও সত্য বলে মানে। এবং তাতেই তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, চিন্তা-চেতনা, ভাব-অনুভব জড়িত ও সীমিত। চোখ বুজলে বা চোখ ফেরালে ঘুম-ভাঙা মানুষের লঘু স্বপ্নের জালের মতোই বিস্মৃতির বিলুপ্তির গহনে সব মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ এরা চোখ বুজে ভাবতে পারে না, মনের চোখে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে কিছুই দেখতে জানে না।

একেতো প্রায় সব মানুষই সহজ বা অনায়াস সিদ্ধিতে বিশ্বাসী অর্থাৎ তারা পরনির্ভরতায় স্বস্তি খোঁজে—পরান্ন-জীবিতার মতো পরবুদ্ধি-পরকর্ম-জীবিতাও তাদের মজ্জাগত কিংবা সহজাত। তার উপর আমাদের একালের শিক্ষাব্যবস্থাও এর জন্যে কিছুটা দায়ী। মনের তথা ভাবের ও অনুভবের জগৎ বিস্তৃত করাই, জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় বিজ্ঞতা দানই, এবং জগৎ ও জীবন চেতনায় সূক্ষ্মতা ও প্রসার ঘটানোই যে বিদ্যার প্রথম ও শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত— এ তত্ত্ব সেকেলে বলে পরিত্যক্ত। এখনকার স্বীকৃত তত্ত্বানুগ নীতি হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনে কেজো বা অর্থকর বিদ্যার্জন। মনোভূমি চাষের ব্যবস্থা এখানে সীমিত কিংবা অবহেলিত। তাই কৃৎকৌশল, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, অর্থবিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, স্থাপত্য প্রভৃতিই সন্তানকে 'মানুষ' (অর্থাৎ রোজগেরে করার) উৎকৃষ্ট বিদ্যা বলে অবিসম্বাদে স্বীকৃত। ফলে, 'এমন মানবজমিন, রইল পতিত।' যে-জমি আবাদে মানবমনের ফসল মানবিকতার, মানবতার, মানবমহত্ত্বের সোনা ফলত এবং ফলে। মন-মননের, চিন্তা-চেতনার সে-জগতের দ্রুত প্রসার ও উৎকর্ষ ঘটে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায়। এ বিদ্যার চর্চা ছিল বলে আগেকার দিনে কিছু মানুষ লোকবন্দ্য মহৎ আদর্শের অনুগত থাকার চেষ্টা করত। এখন মহৎ-জীবনের অনুধ্যান করার লোক বিরল। কিছুমানুষ অবশ্য কৃতি ও কীর্তিযোগে দেশে-কালে এবং দেশান্তরে কালান্তরে প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে চিরকাল চেয়েছেন এবং এখনো চান। এজন্যে পন্থা রয়েছে তিনটে—ধনে, মানে কিংবা গুণে বড়ো হওয়া। তবু দৈশিক কালিক পরিবেশগত কারণে কৃতির ও কীর্তির পন্থায় ও রূপে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা বা মাত্রাভেদ দেখা যায়।

আমাদের দেশের মতো নিরক্ষরতা-নিরন্নতাদুষ্ট সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে প্রথম প্রজন্মের গোড়ার দিকের শহরে আসা প্রথম কয়েক তরঙ্গের শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতরা ধূর্ততার ও প্রতারণায় পুঁজি নিয়ে 'জোর যার মুলুক তার' নীতিতে দৃঢ় আস্থা রেখে কাড়া-মারা-হানাকেই উপায় রূপে গ্রহণ করে অর্থ-সম্পদ অর্জন বা আত্মসাৎ করতে থাকে। এজন্যে এখানে ধনের মানুষ হওয়াকে 'বড় লোক' হওয়া বলে, অর্থ-ব্যবসায়ীকে বলে 'মহাজন'। ছলে বলে ধনোপার্জনই তার শ্রেষ্ঠ কৃতি এবং সে-ধনের কিঞ্চিৎ ব্যয়ে নিজের কিংবা মা-বাপের নামে দীঘি-স্কুল-হাট-ঘাট-বাট কিছু নির্মাণই হচ্ছে তার অবিস্মরণীয় কীর্তি। লোকে বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়' কিন্তু অভাব ঘুচে গেলেও স্বভাব নষ্ট হলে তা আর ভালো হয় না। ধনে যে কাঙাল, একসময়ে তারও অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু মনে যে কাঙাল তার সেই কাঙালপনা ধনে-মানেও ঘোচে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একদল আছে যারা জীবনে মানের সাধনা করে। অর্থাৎ তারা স্বোপার্জিত কিংবা পৈত্রিক ধনবলে ধনব্যয়ে ক্ষমতাবান হয়ে লোকমান্য হতে চায়। লোকে তাদের ভয় করুক, সম্মান করুক, তাদের অনুগত থাকুক—এ ধরনের লোক মানের ও খ্যাতির কাঙাল।

ধনের ও মানের মানুষ ছাড়া আর এক ধরনের মানুষ থাকে, তারা হচ্ছে গুণের মানুষ। ধনের ও মানের মানুষ বাঁচে দেশে ও কালে। যথার্থ গুণের মানুষ দেশের কালের উর্ধ্বে মৃত্যুঞ্জয়। গুণের মানুষের সম্পদ আছে—সে-সম্পদ মানস সম্পদ, সে-সম্পদের বাহ্য প্রকাশ ও বিকাশই তাকে কৃতী ও কীর্তিমান করে। জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র এবং সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন কলাদি সর্ববিষয়ে আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সৃষ্টি এবং অনুশীলনী প্রভৃতিতেই এ গুণের প্রকাশ ও বিকাশ।

যেহেতু ধনের ও মানের মানুষের উদ্ভব ও বিনাশ উল্কার মতো, গোধূলি লগ্নের পাখা-গজানো উই-পিঁপড়ের মতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের ও স্বল্পকালের পরিসরে সীমিত থাকে, সেহেতু ধনের বা মানের মানুষের চরিত্রগুণ না থাকলেও চলে অর্থাৎ তাদের স্বভাব, কর্ম ও আচরণ লোকনিন্দিত হলেও তাদের কোন ক্ষতি নেই। নির্গুণ বলেই লোক তাদের ভুলে যায়, যদিও তাদের বংশধরেরা ধনের ও মানের গৌরবগর্ব করে কিছু সামাজিক ফায়দা পায়।

কিন্তু গুণের মানুষের চরিত্র, কর্ম ও আচরণ নির্দোষ হওয়া আবশ্যিক। তারা অবিস্মরণীয় বলেই তারা জীবিতবৎ আলোচ্য। চরিত্রহীনের মহৎ কীর্তিও ঔজ্জ্বল্য হারায়। তাদের কীর্তির সঙ্গে তাদের কলঙ্কও স্মরণ্যে হয় বলে, তাদের বংশধরদেরও লজ্জিত করে, গর্বিত করে না। এমন মানুষের জীবনেও সংযম থাকা চাই, থাকা চাই সততা, লাভের লোভ প্রতিরোধের এবং ক্ষতি স্বীকারের মানসশক্তি থাকা চাই। নইলে তার অবদান সত্ত্বেও তার চরিত্র লোকের নৈতিক অবনতির কারণ হতে পারে। দুনিয়ার কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক, কবি ও দার্শনিকের উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও স্বভাব অনুকৃত হয়ে অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনর্থ ঘটিয়েছে এমন সাক্ষ্য বিরল নয়।

আমাদের দেশে এখন ধনের ও মানের মানুষেরাই বড়লোক—গ্রেটম্যান। অনুন্নত দেশে উঠতি সমাজে এ-ই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতেও গুণের মানুষ হতে উৎসাহবোধ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হবার লক্ষণ নেই। কারণ শিক্ষার ব্যবহারিক দিকই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঘরে ঘরে নানা আপাত ও বাহ্য কারণে। তাই এ মুহূর্তে সংখ্যাগুরুর উচ্চকণ্ঠ 'বল-বিদ্যার' গৌরবই ঘোষণা করছে। জনবলে কিংবা যুক্তির জোরে অন্য অনেকের ক্ষীণ কণ্ঠ স্তব্ধ করা বা রাখা সহজ হলেও মন বন্ধ করা যায় না। আর সে-মন বলছে—শিক্ষার গোড়ায় কোথাও যেন গলদ রয়ে গেছে, তবে সে গলদ শাস্ত্রশিক্ষার অভাব অবশ্যই নয়। বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনেই কেবল শিক্ষা গলদমুক্ত হতে পারে। এজন্যেও সমাজে মানুষের অর্থ-সম্পদের অধিকারে দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান-বৈষম্য অবশ্যই ঘুচাতে হবে। কঠোর হস্তে দুর্নীতিনিরোধ ও সততার সামাজিক অনুশীলন আর বাণিজ্যে বিলাসসামগ্রী বর্জন আপাতত পতন ও অবক্ষয় রোধ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালে শিল্পীর দায়িত্ব

আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোন রূপ নেই, মানুষেরও তেমনি নিরবলম্ব কোন অনুভূতি বা চিন্তা-চেতনা নেই। এই অর্থে জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনামাত্রই প্রমূর্ত—যথার্থ অর্থে বিমূর্ত কিছুই নয়। এ কারণেই আদিম মানুষ নাচে-গানে-চিত্রে যাদুশক্তি যোগে এক প্রকার মৃগয়া-সফল মায়াজাল সৃষ্টি করত—অমূর্ত শক্তিকে প্রমূর্ত করার লক্ষ্যেই।

এ প্রয়োজন-বুদ্ধি মানুষ কখনো পরিহার করেনি, বরং জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ-উন্নতি সত্ত্বেও উন্নততর অনুভব ও মনন-মণ্ডিত হয়ে তা বিশ্বাসের ও তত্ত্বের আকারে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক গুরুত্বে চিরন্তন ও আবশ্যিক হয়ে রয়েছে। তাই পূজা-উপাসনায় চোখ-কান-নাক গ্রাহ্য পরিবেশ প্রয়োজন হয়। মূর্তি-সুর-ধূপ-ধুনা-লোবান-চন্দন-আতর-ফুল-চিত্র প্রভৃতি মন্দিরে চৈত্যে গির্জায় নয় শুধু, মসজিদে-সিনাগোগেও সুর, গন্ধ ও রূপ চর্চার রেওয়াজ রয়েছে। তাই কবরে ফুলের মালা-তোড়া দেয়া আজ কেবল সাংস্কৃতিক রীতি নয়, রাষ্ট্রিক রেওয়াজও বটে। মানুষ নিরবলম্ব ভাব-চিন্তায় অভ্যস্ত নয় বলেই জেনেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে চিত্তলোকে ভাব-চিন্তার অনুশীলনের জন্য বাহ্যজগতের রূপ-সুর-গন্ধেরও প্রতিবেশ প্রয়োজন। সুখদ সুন্দর সুগন্ধও সঙ্গীতমধুর পরিপার্শ্ব মনোজগতে মহৎ ভাব-চিন্তার ও কল্পবিহারের অনুপ্রেরণা যোগায়। এ জন্যেই সম্ভবত 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবে থাকে' এবং 'জনম অবধি রূপ' দেখলেও 'নয়ন তৃপ্ত হয় না'—তৃষ্ণা থেকেই যায়। আর চোখে দেখারও আগে নাম শুনে, বাঁশীর সুর শুনে, গান শুনেও গন্ধ বিজড়িত দেহের ঘ্রাণ পেয়ে আত্মসমর্পণের আকুতি জাগে।

একারণেই আজো শাস্ত্রিক কিংবা সামাজিক আচারে-অনুষ্ঠানে টোটেমট্যাবু প্রতীক যাদুবিশ্বাস অনুগ অনেক কিছুর আয়োজন দেখা যায়—আলপনা, কলাগাছ, আমপাতা, পূর্ণ কলসী, ধান, দূর্বা, হলুদ, দীপ, ধূপ, কুলা, দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন প্রভৃতির আকারে। কাজেই মানুষ তার চিৎ-সাধনায় অমূর্তকে প্রমূর্ত এবং প্রমূর্তকে বিমূর্ত করেই আত্মার ও আত্মিক জগতের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়েছে এবং ঘটায়। অর্থাৎ ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে যাওয়া-আসা চিরকাল এভাবেই ঘটেছে। তাই সাধকরা 'অরূপরতন' সন্ধানে রূপসাগরেই ডুব দেয়। এ তাৎপর্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে রূপধর্ম এবং এ তাৎপর্যে এ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বও কেবল সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নয়। চোখের কানের ও নাকের ভেতর দিয়ে বহির্জগতের রূপ গান গন্ধ প্রতিমুহূর্তে চিত্তলোকে লঘু-গুরু আলোড়ন সৃষ্টি করছে, তারই ফল বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিক ভাবে-চিন্তায় ও কর্মে-আচরণে অভিব্যক্ত হচ্ছে। যেহেতু মানুষও একশ্রেণীর প্রাণী সেহেতু মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিও চিরকাল অভিন্ন। তার দৈশিক কালিক বৈষয়িক ও মানসিক অবস্থান ভেদে তার রূপান্তর ও লক্ষ্যের পরিবর্তন অবশ্যই থাকে। কিন্তু বৃত্তি-প্রবৃত্তির গভীরে প্রাণিসুলভ মৌল যে চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি রয়েছে তার কোন পরিবর্তন নেই। সেজন্যেই দুনিয়াব্যাপী মানুষের চিরন্তন রসপিপাসা ও রূপতৃষ্ণা সাহিত্যে-সঙ্গীতে-চিত্রে, বাস্তুকলায়, মূর্তি-শিল্পে, নৃত্যে, অভিনয়ে, আবিষ্কার প্রয়াসে, উদ্ভাবন প্রবণতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। তার দৈশিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিক প্রায়োজনিক-প্রায়োগিক উৎকর্ষে এবং রূপও রস-চেতনার বিকাশে স্তরগত পার্থক্য প্রকট হলেও এর মধ্যে থেকেই মানুষের অভিন্ন মানস-চাহিদার ও মন-মননের অভিন্ন উৎসের সন্ধান মেলে। এ জন্যেই সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, নৃত্য ও অভিনয় যখন মানব-মনীষার উন্নত ও উৎকৃষ্ট প্রসূনরূপে অভিব্যক্ত, তখন তা 'দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-ধর্মের উর্ধ্বে' এক সর্বকালিক ও সার্বমানবিক সৃষ্টিরূপে চিরমানবের সম্পদ রূপে স্বীকৃতি পায়।

দেশ-কাল-সামর্থ্য ভেদ ছাড়াও শিল্পে আমরা অবস্থান ও শ্রেয়োবোধ জাত প্রয়োজনপার্থক্য এবং লক্ষ্যভেদও প্রত্যক্ষ করি। উৎকর্ষের সঙ্গে বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঘটেছে একারণেই। সুতরাং সর্বপ্রকার কলাচর্চার মূলে রয়েছে জীবনের প্রয়োজনীয় ভাবকে রূপে এবং রূপকে ভাবে তথা প্রমূর্তকে অমূর্তরূপে অনুভব করার এবং বিমূর্তকে প্রমূর্তরূপে প্রত্যক্ষ করার বাসনা ও প্রয়াস। অতএব 'শিল্পের খাতিরে শিল্প' তত্ত্বে তথা রসকৈবল্যবাদে কোন সত্য নেই। কখনো ছিলও না। প্রত্যক্ষ ও স্থূল প্রয়োজনের অনুপস্থিতি পরোক্ষ মানস প্রয়োজনের শূন্যতা নির্দেশ করে না।

আদিকালে মানুষ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সর্বপ্রাণবাদী যাদু-বিশ্বাসী ছিল, ক্রমে মন-মননের বিকাশে ও হাতিয়ারের উৎকর্ষে জীবন প্রতিবেশের উন্নয়নে তার চিন্তা-চেতনা ভাব-কল্পনা ও যুক্তি-বুদ্ধি প্রসারিত হয়—এ স্তরে তার প্যাগান ধারণার 'ধর্ম মতে' উত্তরণ ঘটে, তার সমাজ ও সংহতি, আচার ও আচরণ নীতিনিয়মের বন্ধনে দৃঢ়মূল হয়। তখন মানুষ তার বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিকে, মন ও মননকে একান্তভাবে ধর্মশাস্ত্রের বিধানের অনুগত রাখার চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগ অবধি বিভিন্ন দেশ-কালের মানুষের শ্রেয়ঃবোধে ও প্রেয়ঃচেতনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এভাবেই।

একালে মানুষ সংশয়বাদী, নাস্তিক এবং বেশি মাত্রায় ঐহিক জীবনবাদী হয়েছে। তাই আগেকার ভাববাদে, অপার্থিব অধ্যাত্মবাদে ও অলৌকিতাবাদে তথা কেরামতিবাদে বা ঐশ্বর্যবাদে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের তেমন কোন আস্থা নেই আজ। আজকের মানুষের ঐহিক চিন্তা-চেতনাই আজকের সাহিত্যে-সঙ্গীতে-চিত্রকলায়-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-নৃত্যে-অভিনয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। আজকের মানুষ ঐহিক জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত, তাই আজকের সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি সব রকম কলা স্বকালের মানুষের সমস্যার ও সম্পদের, আনন্দের ও যন্ত্রণার, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রায় স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। এ তাৎপর্যে সাহিত্যাদি শিল্পকলা চিরকালই ছিল স্বাকালিক ও স্বাদেশিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনার প্রতিরূপ। সে-যুগের অজ্ঞমানুষের প্রতিবেশী ছিল মিত্র ও অরি দেবতা, রাক্ষস-খোক্কস, দেও-দানো, জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত। তাই তার প্রতিচ্ছবি রয়েছে তাদের অভিব্যক্ত সর্ব প্রকার কর্মে ও আচরণে এবং সর্ব-প্রকার শিল্পসৃষ্টিতে।

আজকের মানুষ ডারুইন-মার্কস-ফ্রয়েড আবিস্কৃত তত্ত্বে ও তথ্যে আস্থাবান, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-নির্ভর। তাই আগের ও আজকের শিল্পচিন্তায় ও লক্ষ্যে পার্থক্য প্রকট। আগেকার দৈবনির্ভর মানুষ-সৃষ্ট সাহিত্যাদি ছিল একাধারে পার্থিব ও অপার্থিব, ভূমিনির্ভর হলেও ভূমায় উত্তরণ প্রত্যাশী। এখন মাটি ও মানুষই সাহিত্য-সঙ্গীতাদির মুখ্য বিষয় আর সব আনুষঙ্গিক কিংবা প্রাসঙ্গিক। আগে এদেশী আলংকারিকের মতে সাহিত্য ছিল 'ব্রহ্মা-স্বাদ সহোদর' আজ সাহিত্য-সঙ্গীত গণ-সংগ্রামের সহায়ক হাতিয়ার আর প্রায়োগিক বা ফলিত হওয়াই কাম্য। শিল্পের প্রাণস্বরূপ যে সৌন্দর্য বা লাবণ্য তার প্রয়োজন কেবল মন-গলানোর জন্যেই—ভাবিয়ে তোলার জন্যেই—মানবমনে হিতবাদ বা কল্যাণবুদ্ধি জাগিয়ে রাখার জন্যেই। মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করার যে-শক্তি সাহিত্য-সঙ্গীতাদির মধ্যে রয়েছে, তা-ই শিল্প বা সৌন্দর্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি। একারণে শিল্প আত্মাকে উন্নত ও উন্নীত করার সামর্থ্য রাখে। আগে উন্নীত করার অর্থ ছিল অধ্যাত্মবাদী বা মরমী করা, কারণ তখন জনসংখ্যা ছিল নগণ্য, খাদ্যবস্তু ছিল সুলভ ও প্রায় অনায়াসলভ্য। যদিও নিরন্ন দাস-দুর্বল মানুষ সেদিনও বিরল ছিল না। এবং মানুষ ছিল প্রকৃতি-নির্ভর—খরা-ঝড়-বন্যা-মহামারীর অসহায় শিকার এবং রাক্ষস-খোক্ষস ভূত-প্রেত-জ্বীন-পরীর প্রতি আস্থা ও দেও-দেবতায় ভরসা-ই ছিল সম্বল। তাই আগের সাহিত্য জীবন-সংগ্রামের কথা বিরল। তারা তখন ছিল অমৃতসন্ধানী, মোক্ষকামী স্বর্গ প্রত্যাশী, এখন কাম্যবস্তু হচ্ছে অন্ন ও আনন্দ, তাই এখন এর অর্থ হবে ব্যক্তি মানুষকে ঐহিক জীবনে ন্যায়-পরায়ণ, বিবেকবান, শ্রেয়োবাদী ও সমকল্যাণকামী করা ও সমস্বার্থে স্বাধিকারে সংগ্রামে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার নীতি-নিয়মে দীক্ষা দান। শুধু সাহিত্যে-সঙ্গীতে-নৃত্যে ও অভিনয়ে নয়, বাস্তকলায়, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে জীবনের বাস্তব চাহিদার ও প্রত্যাশার রূপায়ণই হবে আঁকিয়ে লিখিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে এবং স্থপতি-ভাস্করের বাঞ্ছিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। জনগণের উচিত সর্বপ্রকার শিল্পকলার আদর-কদর করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ পরিচিতি

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য প্রথম খণ্ড

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নামের দুই খণ্ডে বিভাজিত গ্রন্থ ডক্টর আহমদ শরীফের বিদ্যাসত্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এবং এটি তাঁর সবচেয়ে সুখ্যাত রচনাও । এটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তবে সাধারণ বর্ণনাত্মক ইতিহাস নয়। এই ইতিহাস একদিকে প্রভূত তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ; অন্যদিকে তা গভীর ব্যাখ্যা, বিচার, বিশ্লেষণ ও তত্ত্বদৃষ্টিপূর্ণ। রচনাটিতে ডক্টর শরীফের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় রয়েছে। বাংলা নামের ভূখণ্ড, এই ভূখণ্ডের মানুষ, এই মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, ধর্মদর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গ ডক্টর শরীফের গভীর আগ্রহের বিষয়। সারাজীবন এই সব বিষয়েরই চর্চা, গবেষণা, আলোচনা ও লেখালেখির সূত্রে তিনি বড় পণ্ডিত হিসেবে বিদ্বৎ সমাজে বৃত হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশারদ হিসেবে তিনি সুপরিচিত। এই পরিচিতি একদিনে অর্জিত হয়নি। প্রেরণা পেয়েছিলেন পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অনুসন্ধান-চিন্তা ও পুথি সংগ্রহের তাৎপর্য থেকে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা সূত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তিনি গভীর অনুধ্যান ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বাঙালি জনমানসের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাব-চিন্তা-কর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা ও সামাজিক রীতিনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চালচিত্র, সাংস্কৃতিক অভিপ্রায় ইত্যাদি নানা দিকে আলোকপাত করে যে-ভাবে তুলে ধরেছেন তাতে সহজে বলা যায় এটি একটি জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিচর্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উন্মোচিত করেছে। উদারপন্থা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রকাশ এই রচনা। ধর্মবর্ণগোত্রগোষ্ঠী নির্বিশেষে বঙ্গ ভূমিতে বসবাসকারী সকল বাংলাভাষীই বাঙালি। এই সব বাঙালির রসানুভূতি, মনোভাবনা, আবেগ ও মননচিন্তার শিল্পিত ভাষারূপই বাংলা সাহিত্য। এই তাৎপর্যে *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থ নামের সার্থকতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহিত্য তা স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেয় সাহিত্যের এই ইতিহাস-গ্রন্থ। এই দিকটি মনে রাখলে বলতে হবে, এইটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ইতিহাস। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলে ডক্টর শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* সাহিত্যের ইতিহাসগুলোর মধ্যে অনায়াসে উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে এবং নিঃসন্দেহে ডক্টর শরীফও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, গোপাল হালদার, ডক্টর সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের সন্মান ইতিহাসকারদের পংক্তিভুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকতার, পুথিসম্পাদনার ও গবেষণার সূচনালগ্ন থেকে ডক্টর আহমদ শরীফ বাংলা, বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর ভাবনা বিভিন্ন নিবন্ধে ও আলোচনায় প্রকাশ করছিলেন। এগুলো তাঁর *বিচিত চিন্তা, জীবনে সমাজে সাহিত্যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, যুগযন্ত্রণা, কালিক ভাবনা* ইত্যাদি গ্রন্থে স্থান পায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচিত চিন্তা গ্রন্থভুক্ত 'বাঙলা সাহিত্যের খসড়াপত্র' নামের সুদীর্ঘ রচনাটি। এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অলেখ্য। আকারে ছোট হলেও প্রকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ। ডক্টর শরীফের বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের ছকচিত্র এই রচনাতেই লব্ধ।

ডক্টর শরীফের কাছে সব সময় ছাত্র, গবেষক, পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী জনের এই প্রত্যাশা ছিল যে তিনি একটি বড় আকারের বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করবেন, যেহেতু মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি স্বনামখ্যাত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে, এ-প্রত্যাশা পূরণে ডক্টর শরীফ এগিয়ে এলেন তার এরই অভিপ্রকাশ তাঁর *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* নামের দুখণ্ডে বিভক্ত বৃহৎকবলের গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার প্রণোদনা, বাসনা ও গ্রন্থনামের তাৎপর্য সম্বন্ধে ডক্টর শরীফের বক্তব্য এই রূপ –

> মধ্যযুগের কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক একখানা ইতিহাস রচনার প্রবল আগ্রহ জেগেছিল জীবনের অন্তিমলগ্নে পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের। ভূমিকা স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্য পরিক্রমা নামের একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি। বিরাশী বছরের জীবন-পরিসরে ষাট বছরের লেখক-জীবনে বিভিন্ন কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধও ছিল তাঁর আয়ত্তে। কাজেই দেহ বার্ধক্যজীর্ণ না-হলে এবং প্রকাশকের সন্ধান পেলে হয়তো কাজ শুরু করে দিতেন; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক না পেয়ে তিনি এ বাসনা ত্যাগ করেন।
>
> ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর অপূর্ণ অন্তিম বাসনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং অক্টোবর মাসেই তাঁর আবিষ্কৃত কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করি। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই অমুদ্রিত পুথিভিত্তিক এ ধরনের কাজের অসার্থকতা উপলব্ধি করি এবং তাঁর আবিষ্কৃত প্রধান ও বিশিষ্ট কাব্যগুলোর সম্পাদক ও প্রকাশনাই প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকার করি। সুখের বিষয় উল্লেখযোগ্য পুথির অধিকাংশই সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।
>
> গত চৌত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করি। সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রায় সাতাশ বছর ধরে। এক্ষেত্রে আমার সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবসে এ গ্রন্থের সূত্রপাত। বাঙালীর রচনায় বাঙালীর চিত্ত-চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা-ই মুখ্যত জানবার-বুঝবার প্রয়াস পেয়েছি এ গ্রন্থে। তাই গ্রন্থের নাম রেখেছি 'বাঙালী ও বাঙলা-সাহিত্য'।
>
> নিবেদন–'বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য' ১ম খণ্ড।

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ বাংলা)। প্রকাশক – তাজুল ইসলাম, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, দাম ৫০ টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী–কাইয়ুম চৌধুরী।

খণ্ডটির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ঢাকার নিউ এজ পাবলিকেশন্স থেকে, জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে; প্রচ্ছদ শিল্পী – উৎপল দাস, মূল্য ২৫০.০০ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ হয় ১৯৮৩ সালে, বাংলা একাডেমী থেকে। এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি অর্থাৎ উপক্রম অংশটি (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপ) নিউ এজ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। ডক্টর শরীফের জীবদ্দশায় তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের দুই খণ্ডের বিষয় পরিসজ্জা এইভাবে হয়েছে।

ডক্টর আহমদ শরীফ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে। উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ –

পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ -এর
অপূর্ণ বাঞ্ছার অক্ষম রূপায়ণ মুহূর্তে
তাঁকেই স্মরণ করছি।

মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য

বিচিত চিন্তা (১৯৬৮) গ্রন্থভুক্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি হল 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র'। প্রবন্ধটি এতই বড় যে, এটি একটি ছোট গ্রন্থে রূপ নিতে পারত, কিন্তু ডক্টর শরীফ রচনাটিকে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন ঐ বিচিত চিন্তাতেই ঠাঁই দেন। বলতে হবে, এটি ডক্টর শরীফের একটি অনুপম রচনা, তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ও মনীষার একটি অসামান্য প্রকাশ। বড় বিষয়কে ছোট আকারে রূপ দেওয়ার অপূর্ব দক্ষতা, সংযম ও নিয়ন্ত্রণ তিনি দেখিয়েছেন এই রচনায়। প্রকৃত পক্ষে, এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বিষয়টি ব্যাপক ও বিশাল, প্রায় দেড় হাজার বছরের সাহিত্য ইতিহাস। বাংলা ভূখণ্ড, বাংলাভাষী মানুষের অর্থাৎ বাঙালির পরিচয়, বাঙালির ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, জনজীবন, বাঙালির ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস-সংস্কার, ভাষা, সাহিত্য ও ভাবসাধনার নানা দিক তথ্যে-উপাত্তে-বিবরণে-বিশ্লেষণে চমৎকার শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যে বিন্যস্ত হয়ে এটি একটি নিটোল রচনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই রচনারই সম্প্রসারিত রূপ ডক্টর শরীফের দুই খণ্ডে রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*।

বাংলা একাডেমী যখন আশির দশকের মধ্য পর্যায়ে নানা বিদ্যা ও বিষয় ভিত্তিক ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা নামের নাতিদীর্ঘ বই প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন ডক্টর শরীফকেও অনুরোধ করা হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য। তখন ডক্টর শরীফ 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র' রচনাটি সামান্য একটু সংযোজনসহ বাংলা একাডেমীকে দেন। এইটিই *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* নামে বাংলা একাডেমীর ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়। সামান্য সংযোজনটি গ্রন্থের শুরুতেই থাকে —

> এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চল বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুর থেকে আসামের করিমগঞ্জ-কাছাড় অবধি এবং উড়িষ্যার কটক থেকে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অবধি বিস্তৃত। এবং আদিকাল থেকে এ অভিন্ন ভাষাই হয়েছে উক্ত অঞ্চলের মানুষগুলোর আত্মীয়তার ও জ্ঞাতিত্বের, মানসিক ঐক্যের, বিশ্বাস-সংস্কারের ও সমাজ-সংস্কৃতির, মিলের এবং আংশিকভাবে জীবনাচারে নিয়মনীতির ও রীতি-পদ্ধতির সাদৃশ্যের বা অভিন্নতার বন্ধনসূত্র বা কারণ।

সূচনার এই পরিচ্ছেদটুকু ছাড়া গ্রন্থের বাদবাকি সব অংশ *বিচিত চিন্তা* ভুক্ত 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্রে'র অবিকল অনুলিপি, কোথায়ও কোনো শব্দ ও বাক্য যোজিত বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়োজিত হয় নি। তবে *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থে 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্রে'র সঙ্গে একটি ভাঁজকরা ছকচিত্র ছিল, সেটি *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থে ত্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চাশ ষাটের দশক কিংবা তারও কিছু আগে থেকেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু, প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত-গবেষকেরা উদার ও অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতদের রচিত সাহিত্য-ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের যথাযথ পরিচয় ফুটে ওঠেনি। সেজন্য মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থে ডক্টর শরীফকে বলতে হয়েছে—

> 'মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালী মুসলমানের বিশেষ গর্বের অবলম্বন হতে পারে।
> ... মুসলমান কবিও সংখ্যায় হয়তো অমুসলমান কবির চেয়ে কম ছিলেন না। এভাবে বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মুসলমানের বিশেষ সাধনা ও দান।"

মধ্যযুগে হিন্দু কবিদের অবদান সুবিদিত, কিন্তু মুসলমানদের সাহিত্যসৃষ্টি অনালোচিত থাকায় এ ব্যাপারে প্রাগুক্ত সবাইকে প্রযত্ন নিতে হয়েছে, ডক্টর শরীফকে তো বটেই, বেশি আয়োজন সহকারে। ফলে তাঁর রচিত *মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থদ্বয়ে এবং আরও অনেক রচনায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যাবদানের বিশদ বিবরণ রয়েছে।

বলা হয়েছে, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* বাংলা একাডেমীর ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। এটির প্রথম প্রকাশ : এই পৌষ ১৩৯২/২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮৫; প্রকাশক শামসুজ্জামান খান, পরিচালক গবেষণা সংকলন ও–বিভাগ, বাংলা একাডেমী; প্রচ্ছদ শিল্পী – কাইয়ুম চৌধুরী, মুদ্রক– ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস, মূল্য – পনের টাকা, বিদেশে : দেড় মার্কিন ডলার।

বইটি তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত। এঁরা হলেন, ডক্টর শরীফের ভাষায়,

স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগীতপ্রসাদ সেন
গণমানবসেবী আসহাবউদ্দীন আহমদ
চট্টলৈতিহাসিক আবদুল হক চৌধুরী

কালের দর্পণে স্বদেশ

কালের দর্পণে স্বদেশ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক–চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১, প্রচ্ছদ শিল্পী- আবু বারক আলভী, মূল্য - ৩৭ টাকা। ডক্টর আহমদ শরীফ এ-গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর তিন প্রিয়ভাজনকে, এঁরা কথাকার আবুল হাসনাত, ছড়াকার ওবায়দুল ইসলাম, প্রবন্ধকার মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ।

কালের দর্পণে স্বদেশ গ্রন্থে প্রবন্ধ আছে চৌদ্দটি। প্রবন্ধগুলো সংকলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থের সূচনায় একটি আলাদা পৃষ্ঠায় ডক্টর শরীফ জানাচ্ছেন এই কথাগুলো—

> বিষয়গত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সব কথা স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজাতি সম্পৃক্ত বলেই বক্তব্যের ও লক্ষ্যের ঐক্যসূত্রে প্রবন্ধগুলো গ্রন্থিত। স্বদেশের বিভ্রান্ত বিপন্ন মানুষের আপন্ন ও আসন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধি ও সমস্যা অন্তত কোন এক পাঠকমনে জিজ্ঞাসা জাগাবে, নিদান-সমাধানচিন্তা যোগাবে এ প্রত্যাশা রইল।

ডক্টর শরীফের কথাগুলো থেকে বোঝাই যাচ্ছে এই প্রবন্ধ সংকলনের মুখ্য প্রসঙ্গ স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজাতি। স্বদেশ মানে বাংলাদেশ, স্বজাতি হল বাঙালি জাতি। ইতিহাসের ধারাক্রমে দেশ ও জাতির বিবর্তন ও বিকাশ সূত্রগুলো এবং স্বকালে এগুলোর বিচিত্র অভিব্যক্তি ডক্টর শরীফ তাঁর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলোতে তুলে ধরেছেন। এ-কথার সাক্ষ্য তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ-নামও, যেমন– ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালী, ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাঙলাদেশ, বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। বাংলা ও বাঙালি ডক্টর আহমদ শরীফের গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রধান বিষয় উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব অভিমত সম্বলিত তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে এ-সংকলন। এ-নামের প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন লোকায়ত পত্রিকার জন্য। বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে যারা অতিমাত্রায় উৎসাহিত ও গদগদ, ডক্টর শরীফ তাঁদের দলে নন। তাঁদের উদ্দেশেই তাঁর নিম্ন বক্তব্য,

> অতএব রেনেসাঁসের জন্য গৌরববোধ করা, সগর্বে রেনেসাঁসের মহিমা কীর্তন করা, রেনেসাঁসওয়ালাদের প্রশংসা করা প্রকারান্তরে গণ-মানবের দুর্ভোগ দুর্দশাকে অস্বীকার করার এবং মুৎসুদ্দি-কমপ্রেডরদের তারিফ করার সামিল।

সংস্কৃতি ডক্টর আহমদ শরীফের প্রবন্ধিক-চিন্তার একটি প্রিয় প্রসঙ্গ এবং এ-নিয়ে তাঁর প্রচুর লেখাও আছে। 'বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' একটি মৌখিক বক্তৃতা। এটি তিনি দিয়েছিলেন সুকান্ত একাডেমীর এক সেমিনারে। 'মানুষ ও তার পরিবেশ' নামের প্রবন্ধটি ১৯৭৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা। 'সাহিত্য ও জনতা' লেখক সমাবেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য রচিত। 'বেআদবি' প্রবন্ধটির শিরোনাম কারও কারও মনঃপুত না হতে পারে; কেউ কেউ অবশ্য এরূপ নাম নিয়ে কটাক্ষও করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায়, বেআদবি বলতে আমরা যা বুঝি এটি তা নয়। ডক্টর শরীফ বেআদবি বলতে বুঝিয়েছেন বিরুদ্ধ ও নতুন চিন্তা, নতুন অভিমত। তাঁর মতে, এ-রকম বেআদবি না হলে মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এগিয়ে আসতে পারে না, প্রগতির পথে যেতে পারে না। ডক্টর শরীফের কথাগুলো এই রকম —

> এ বেআদবির অপর নাম নতুন। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে গোড়ায় নতুনের ধারক থাকে নগণ্য কয়জন, মধ্যে তার বাহক হয় অসংখ্য, পরিণামে সর্বজনীন হয়ে স্থিতি পায় নতুন। স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার গরজেই গণমানবকে বেআদব হতে হয়।

অতএব বেআদবি প্রগতির লক্ষণ, আত্মচেতনার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহের বীজ, বিপ্লবের সংকেত, নতুন সমাজ সংস্কৃতির পূর্বাভাস। তবে প্রসার হোক বেআদবির, জয় হোক বেআদবের।

সংকলিত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল

ইতিহাসের দর্পণে দুইশতকের বাঙালী –১১/১২.১১.১৯৮০
ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাংলাদেশ –২৪/২৫.১০.১৯৮০
উনিশ শতকের বাংলায় জাগরণের স্বরূপ –৫-৯.৯.১৯৮২ (লোকায়ত পত্রিকার জন্য)
বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে –(সুকান্ত একাডেমীর সেমিনারে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বে-আদবি –১৪/১৫.১১.১৯৮০
জাতিদ্বেষণা ও সহাবস্থান –২২.৮.১৯৮৪
মানুষ ও তার পরিবেশ –১২/১৩/১৪.৪.১৯৭৯ (সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, ১৯.৪.১৯৭৯তে পঠিত)
আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ –৮.১.১৯৮৩
স্রষ্টা ও শাস্ত্র –২৯.৭.১৯৮৪
বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের রেশ ও লেশ –১৩.৮.১৯৮৪
সাহিত্য ও জনতা –২৯.৬.১৯৮২
সংকটের উৎস – রচনাকাল সম্ভবত ১৯৭৭, সে সময় জাতীয় সংকট নিয়ে কয়েকটা লেখা লিখেছিলেন।
একালে শিল্পীর দায়িত্ব –২১.২.১৯৮১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~